সূচী

চীন সাহিত্য

চীন সাহিত্য আজকের নয়।

চীনা প্রাচীরের চাইতেও দীর্ঘতর আর প্রাচীন চীন সাহিত্যের এ ইতিহাস। চার হাজার বছর আগেই পীত নদীর অববাহিকার পীতাভ বাসিন্দাগুলি নিজেদের লিখিত ভাষার প্রথম উদ্ভাবন করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁদের লিখিত ঐ ভাষাকে বলা হতো 'যু' (tzu)। আর এ 'যু' ছিল পিক্টোগ্রাম, ইডিওগ্রাম, ফোনোগ্রাম প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের কতকগুলি চিত্র বা শব্দলিপির সমষ্টি। গুটিকতক ফুটকি, আঁচড় আর লাইনের সাহায্যে লিখিত হতো চীনের এ ভাষা। প্রতিটি শব্দ বা বর্ণ ছিল তার সুসমঞ্জস ও লালিত্যময়। যেন কুশলী কোনো চিত্রকরের হাতে-আঁকা কতকগুলি টুকরো টুকরো ছবি। একটির নীচে একটি এমনি চিত্রলিপিগুলি সাজিয়ে চার হাজার বছর পূর্বে চীনের আদি সাহিত্য গড়ে ওঠে মাটির ধরণীকে কেন্দ্র করে।

আদি চীন সাহিত্যের একটি নমুনা ঃ

'যখন সূর্য ওঠে, আমি তখন
করতে থাকি কাজ;
যখন সূর্য যায় পাটে, আমি
তখন করতে থাকি বিশ্রাম;
আমি ইদারা খুঁড়ি জলের আশায়;
আমি চাষ করি শস্য লাভে;
রাজার শক্তি আমায় করবে কি?'

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ সেকালের চীনা কবিতার সুন্দর কয়েকটি দৃষ্টান্ত এবার চয়ন করা গেল। রবীন্দ্রনাথের কথায়ঃ চীনের কবি লি-পো যখন কবিতা লিখছিলেন সে তো হাজার বছরের বেশী হলো। তিনি ছিলেন আধুনিক; তাঁর ছিল বিশ্বকে সদ্য-দেখা চোখ। চারটি লাইনে সাদা ভাষায় তিনি লিখেছেনঃ

'এই সবুজ পাহাড়গুলোর মধ্যে থাকি কেন।
প্রশ্ন শুনে হাসি পায়, জবাব দিই নে। আমার মন নিস্তব্ধ।
যে আর-এক আকাশে আর-এক পৃথিবীতে বাস করি—
সে জগৎ কোনো মানুষের না।
পীচ গাছে ফুল ধরে, জলের স্রোত যায় বয়ে।'

আর একটি ছবিঃ

'নীল জল···নির্মল চাঁদ,
চাঁদের আলোতে সাদা সারস উড়ে চলেছে।
ঐ শোনো, পানফল জড়ো করতে মেয়েরা এসেছিল;
তারা বাড়ি ফিরছে রাত্রে গান গাইতে গাইতে।'

একটি বধূর কথাঃ

'আমার ছাঁটা চুল ছিল খাটো, তাতে কপাল ঢাকত না।
আমি দরজার সামনে খেলা করছিলুম, তুলছিলুম ফুল।
তুমি এলে আমার প্রিয়, বাঁশের খেলা-ঘোড়ায় চ'ড়ে,
কাঁচা কুল ছড়াতে ছড়াতে।
চাঙ্‌কানের গলিতে আমরা থাকতুম কাছে কাছে।
আমাদের বয়স ছিল অল্প, মন ছিল আনন্দে ভরা।
তোমার সঙ্গে বিয়ে হল যখন আমি পড়লুম চোদ্দয়।
এত লজ্জা ছিল যে হাসতে সাহস হত না,
অন্ধকার কোণে থাকতুম মাথা হেঁট করে,
তুমি হাজার বার ডাকলেও মুখ ফেরাতুম না।

পনেরো বছরে পড়তে আমার ভুরকুটি গেল ঘুচে,
আমি হাসলুম।...
আমি যখন ষোলো তুমি গেলে দূর প্রবাসে—
চ্যুটাঙের গিরিপথে, ঘূর্ণিজল আর পাথরের ঢিবির ভিতর দিয়ে।
পঞ্চম মাস এলো, আমার আর সহ্য হয় না,
আমাদের দরজার সামনে রাস্তা দিয়ে তোমাকে
যেতে দেখেছিলুম,
সেখানে তোমার পায়ের চিহ্ন সবুজ শ্যাওলায় চাপা পড়ল—
সে শ্যাওলা এত ঘন যে ঝাঁট দিয়ে সাফ করা যায় না।
অবশেষে শরতের প্রথম হাওয়ায় তার উপরে
জমে উঠল ঝরা পাতা।
এখন অষ্টম মাস, হলদে প্রজাপতিগুলো
আমাদের পশ্চিম-বাগানের ঘাসের উপর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।
আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে, ভয় হয় পাছে আমার
রূপ যায় ম্লান হয়ে।
ওগো, যখন তিনটে জেলা পার হয়ে তুমি ফিরবে
আগে থাকতে আমাকে খবর পাঠাতে ভুলো না।
চাঙ্‌ফেঙ্‌শার দীর্ঘ পথ বেয়ে আমি আসব, তোমার
সঙ্গে দেখা হবে।
দূর বনে একটুও ভয় করব না।'

['সাহিত্যের পথে' : রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৩ খণ্ড]

পাশাপাশি দু ভাষার প্রয়োগ চীনে চলে আসছিল বহু কাল থেকে। ওয়েন-লি হলো বিশুদ্ধ সাহিত্যের ভাষা আর পেই-হুয়া চলিত কথ্য ভাষা। দু-একজন ছাড়া প্রায় সব প্রাচীন লেখকই লিখতেন ওয়েন-লিতে। জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য ছিল না এ ভাষা। দুর্বোধ্য এ ভাষায় রচিত চীনের সাহিত্য-সম্পদ ছিল তাই কেবল

পণ্ডিতদের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ—সাধারণ লোকের নাগালের বাইরে। আর পেই-হুয়া ছিল গল্প-উপন্যাসের বাহন। ১৯১৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত চলিত ভাষা পেই-হুয়াতে লেখা সাহিত্যের সংখ্যা ছিল নগণ্য।

চীনের সাহিত্যকে মোটামুটি এ কয় ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

প্রথম—প্রাচীন বা ক্লাশিকাল যুগ (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২০০০—২০২)। এ যুগেই প্রথম চৈনিক সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্যের ব্যাপক উন্মেষ ঘটে।

দ্বিতীয়—কনফুশিয়ান যুগ (খৃঃ পূঃ ২০২—২২০ খৃষ্টাব্দ)। সামরিক শৌর্য-বীর্য আর শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হান-বংশীয় এই যুগ চীনের জয়যাত্রার যুগ। এ যুগে চীন সাম্রাজ্য পূর্বে উত্তর কোরিয়া, পশ্চিমে এখনকার সেচুয়ান প্রদেশ, উত্তরে অন্তর্মঙ্গোলিয়া ও দক্ষিণে ইন্দো-চীন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজিত ছিল। আর তার পরিপোষক শিল্প-সাহিত্যের অনুশীলন চলেছিল অবলীলাক্রমে। পূর্ববর্তী সম্রাট শি-হুয়াং শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতীক যেসব প্রাচীন গ্রন্থকে ধ্বংস করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ইটের দেয়াল আর মাটির কবরের সংগোপন স্থান থেকে সেসব দুর্লভ সম্পদ আবার বের করা হলো। ক্লাশিকাল ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ ছাড়াও বহু রম্যরচনা সে যুগে রচিত হয়।

তারপর এলো তাও ও বৌদ্ধ যুগ (খৃঃ ২২০—৫৯০)। এর পরবর্তী অধ্যায় চীনা কাব্য-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। 'চুয়ান-চি' বা দুর্লভ কাহিনী নামে এক রোমান্টিক গল্প-সাহিত্যেরও গোড়াপত্তন হয় এ সময়। এর লেখকেরা আপন আপন বন্ধু বা ইয়ারদের মনোরঞ্জন করার উদ্দেশ্যেই প্রধানত সেসব কাহিনী রচনা করতেন। তার কোনো কোনো কাহিনীর সঙ্গে কবিতা বা ছড়াও সংযোজিত থাকত। কোনো কোনোটি বা ছিল নির্জলা কবিতার ঢঙে লেখা। সুং বংশে (খৃঃ ৯৬০—১২৪০) চীনের সাহিত্য ও সংস্কৃতির আরও ব্যাপক উন্নতি হয়।

কিংবদন্তী থেকে জানা যায় চীনের প্রথম রাজবংশ সিয়া প্রথমে পত্তন করেন মহামতি য়ু আনুমানিক এক হাজার খৃষ্ট পূর্বাব্দে। য়ু চীনের বন্যা নিবারণ করেছিলেন বলে চীনের ইতিহাসে আজও প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। য়ু-র প্রশস্তি প্রাচীন ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজে বিস্তর লিপিবদ্ধ আছে। সিয়া বংশের পর শ্যাং (এক হাজার পাঁচ শত তেইশ থেকে এক হাজার সাতাশ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত) রাজবংশের উদ্ভব হয় খৃঃ পূঃ দেড় হাজার থেকে বারো শত শতকের মধ্যে। শ্যাং রাজারা তাঁদের রাজধানী এ্যানিয়াং-এ স্থাপন করেন, এবং রাজবংশের নাম নতুন করে রাখেন ইন (Yin)। হোনান প্রদেশের উত্তর অঞ্চলে সম্প্রতি খনন-কার্যের পর আবিষ্কৃত হয়েছে যে শ্যাং-ইন আমলের চীনারা কেবল কৃষিকার্যে পারদর্শী ছিলেন না, তখনকার দিনের চীনারাও মহেঞ্জো-দারো সভ্যতার অনুরূপ মাটির প্রাচীর ও নগর পত্তন করতে জানতেন। তাঁরা কাঁসার বাসন-কোসন নির্মাণেও দক্ষ ছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা চীনা-মাটির বাসনপত্র ব্যবহার করতেও জানতেন। তাঁদের ভাষা ছিল সুপরিপুষ্ট। সে যুগের চীন সভ্যতা ও সাহিত্যের কিছু কিছু নিদর্শন 'শি-চিং' (গীতাবলী) আর ঐতিহাসিক দলিল 'সু-চিং'-এ অনেকখানি ছড়িয়ে রয়েছে। শ্যাং-ইন রাজবংশের পতন ঘটে চৌ রাজাদের হাতে। মহারাজা ওয়েন, মহারাজা য়ু আর রাজপুত্র চৌ-এর শৌর্য-বীর্যের সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। মহারাজা য়ু শিক্ষার প্রসারকল্পে তাঁর রাজ্যের মধ্যে বিদ্যায়তন স্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায়। প্রায় তিন শত বৎসর পর্যন্ত চৌ-রাজবংশ চীনে সগৌরবে রাজত্ব করেন। এবং সুদক্ষ শাসন-বিধির প্রবর্তন করেন। চৌ-বংশধরগণের এই কীর্তিকলাপের হদিস 'চৌ-লি', 'য়ি-লি', 'সি-চিং', 'য়ি-চিং' প্রভৃতি প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থসমূহে মেলে।

এ সময় চীন সাহিত্য ও শিল্পকলারও প্রভূত উন্নতি ঘটে। খৃঃ পূঃ সাত শত একাত্তর সাল থেকে কিন্তু চৌ-রাজাদের গৌরবসূর্য অস্তমিত হতে থাকে। এবং পরবর্তী কালে (চীন এ সময় 'মধ্য রাজ্য'

নামে পরিচিত ছিল) সমগ্র দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরস্পরের মধ্যে আত্মঘাতি হানাহানি, দ্বেষ, বিসংবাদ তাঁদের যেমন পেয়ে বসেছিল, তেমনি দরবারী জাঁকজমক, বিলাসিতা আর নিজ নিজ রাজসভায় গণ্য-মান্য পণ্ডিত পোষণের রেওয়াজও বিদ্যমান ছিল। ফলে দেশের বিদ্বৎসমাজ এ সকল সামন্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আপন আপন জ্ঞানগরিমা প্রদর্শনে প্রভূত সুযোগ লাভ করলেন। তাই চীনের সাহিত্য, শিল্পকলা আর দর্শনশাস্ত্রের ব্যাপক উন্নতি ঘটে।

এই যুগের বিশিষ্ট চীনা দার্শনিকের মধ্যে লৌ-ৎসু (Lao Tzu), কনফুশিয়াস, মো-ঝু, মেনং-সু বা মেনশিয়াস (খৃঃ পূঃ আনুমানিক ৩৭২-২৪৯), সুন-চীং প্রভৃতি দিকপালগণ চীনা ধ্যান-ধারণা আর দর্শন-শাস্ত্রের সমূহ উন্নতি বিধান করেন। এই সব দার্শনিক মনীষীদের প্রায় সকলেই পীত নদীর অববাহিকার ছিলেন বাসিন্দা। ইয়াংশি নদীর দু কূলের তখনকার মনীষীরা দর্শনশাস্ত্রানুশীলনে কেবল আত্ম-নিয়োগ না করে কাব্য ও সাহিত্য চর্চাতেও মেতে ওঠেন। কেবল লোক-সঙ্গীত আর লোক-গাথায় তুষ্ট না থেকে নতুন আঙ্গিকের এক গদ্য-কবিতা 'ফু'-রও করেন প্রবর্তন। ইয়াংশি নদীর উপকূলভাগের এই সব কবিদের মধ্যে চু-ওয়ান, চু উয়ান চৌ (মৃত্যু ঃ খৃঃ পূঃ ২৭৫), লিউ প্যাং প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চু-ওয়ান (খৃঃ পূঃ আনুমানিক ৩২৮ থেকে ২৮৫) কিছুকাল চৌ সামন্ত রাজদরবারে মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সামন্ত রাজদরবারের অপটুতা আর পারিষদবর্গের কুটিল ষড়যন্ত্র প্রভৃতি হীন পরিবেশ তাঁকে এমনি পাগল করে তুলেছিল যে, তিনি পরিশেষে মাইলো নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দেন বলে প্রকাশ। (তাঁর এ অকালমৃত্যুকে স্মরণ করেই বুঝি সেই থেকে চীনে 'ড্রাগন নৌ-বাচ' উৎসবের প্রচলন আজও চলে আসছে)। চু-ওয়ান এই ভাবে আত্মাহুতি করেন বটে কিন্তু তাঁর সৃষ্ট রচনা এখনও বেঁচে আছে। তাঁর 'শনিকে'র

(মৃত্যু-গাথা), অথবা 'লি-সাউ' (দুঃখ জয়ের প্রশস্তি) প্রভৃতি কাব্য যুগ যুগ ধরে চীনের জনসাধারণের মধ্যে আনন্দ বর্ধন করে আসছে। তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বুঝি তারা আজও গেয়ে উঠে :

যদিও তোমার দেহের হয়েছে অবসান,
অবিনশ্বরতা অর্জন করেছে তোমার চিত্ত ;
মৃত্যুলোকেও তুমি বীর সৈনিক—
মরণবিজয়ী যোদ্ধা, হে যোদ্ধা।

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ এমনি আর একটি প্রাচীন চীনা কবিতা :

'পাহাড় একটানা উঠে গেছে বহু শত হাত উচ্চে ;
সরোবর চলে গেছে শত মাইল,
কোথাও তার ঢেউ নেই ;
বালি ধূ ধূ করছে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র ;
শীতে গ্রীষ্মে সমান অক্ষুণ্ণ সবুজ দেওদার-বন ;
নদীর ধারা চলেইছে, বিরাম নেই তার ;
গাছগুলো বিশ হাজার বছর
আপন পণ সমান রক্ষা ক'রে এসেছে—
হঠাৎ এরা একটি পথিকের মন থেকে
জুড়িয়ে দিল সব দুঃখ বেদনা,
একটি নতুন গান বানাবার জন্যে
চালিয়ে দিল তার লেখনীকে।'

['সাহিত্যের পথে' : রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৩ খণ্ড]

প্রাচীন চীনা-কাব্যের পূর্ণ মাধুর্য ফুটিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ এমনি বহু কবিতার অনুবাদ মারফত। ১৩৪১-র বৈশাখ মাসে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গদ্যছন্দ' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রেষ্ঠ গদ্য-কাব্যের সুসম্বন্ধ মাধুর্য বিশ্লেষণ করে তিনি দৃষ্টান্ত হিসাবে

একজন চীনা কবির গদ্য-কবিতার অনুবাদ পড়ে শোনান এবং শেষে মন্তব্য করেন, 'এতে পদ্যছন্দ নেই, এতে জমানো ভাবের ছন্দ। শব্দবিন্যাসে সুপ্রত্যক্ষ অলঙ্করণ নেই, তবুও আছে শিল্প।' রবীন্দ্রনাথের অনূদিত কবিতাটি ঃ

'স্বপ্ন দেখলুম, যেন চড়েছি কোনো উঁচু ডাঙায় ;
সেখানে চোখে পড়ল গভীর এক ইঁদারা।
চলতে চলতে কণ্ঠ আমার শুকিয়েছে ;
ইচ্ছে হল, জল খাই।
ব্যগ্র দৃষ্টি নামতে চায় ঠাণ্ডা সেই কুয়োর তলার দিকে।
ঘুরলেম চারদিকে, দেখলেম ভিতরে তাকিয়ে,
জলে পড়ল আমার ছায়া।
দেখি এক মাটির ঘড়া কালো সেই গহ্বরে ;
দড়ি নেই যে তাকে টেনে তুলি।
ঘড়াটা পাছে তলিয়ে যায়
এই ভেবে প্রাণ কেন এমন ব্যাকুল হল।
পাগলের মতো ছুটলেম সহায় খুঁজতে।
গ্রামে গ্রামে ঘুরি, লোক নেই একজনও,
কুকুরগুলো ছুটে আসে টুঁটি কামড়ে ধরতে।
কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেম কুয়োর ধারে।
জল পড়ে দুই চোখ বেয়ে, দৃষ্টি হল অন্ধপ্রায়।
শেষকালে জাগলেম নিজেরই কান্নার শব্দে।
ঘর নিস্তব্ধ, স্তব্ধ সব বাড়ির লোক ;
বাতির শিখা নিবো-নিবো, তার থেকে সবুজ ধোঁয়া উঠছে,
তার আলো পড়ছে আমার চোখের জলে।
ঘণ্টা বাজল, রাতদুপুরের ঘণ্টা,
বিছানায় উঠে বসলুম, ভাবতে লাগলুম অনেক কথা।

মনে পড়ল, যে-ডাঙাটা দেখছি সে চাং-আনের কবরস্থান ;
তিনশো বিঘে পোড়ো জমি,
ভারি মাটি তার, উঁচু-উঁচু সব ঢিবি ;
নীচে গভীর গর্তে মৃতদেহ শোওয়ানো।
শুনেছি, মৃত মানুষ কখনো-কখনো দেখা দেয় সমাধির বাইরে।
আজ আমার প্রিয় এসেছিল ইঁদারায় ডুবে-যাওয়া সেই ঘড়া,
তাই দুচোখ বেয়ে জল পড়ে আমার কাপড় গেল ভিজে।'*

কাব্যের স্বর্ণযুগ

চীনের কাব্য সাহিত্যের স্বর্ণযুগের সূচনা হয় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষার্ধ থেকে। প্রায় চার শত বছর পর্যন্ত চীন সাহিত্যের এই স্বর্ণযুগ বিরাজিত ছিল। যুগ যুগ ধরে দেশে অরাজকতা, রাজনৈতিক হানাহানি আর দুঃখ-দুর্দশার পর শূই রাজবংশে প্রতাপশালী সম্রাটবর্গের সুশাসনের ফলে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা আবার ফিরে আসে। শূই বংশের পর ত্যাঙ সম্রাটগণ যখন সিংহাসনে অধিরূঢ় হলেন, দেশের মধ্যে শুধু শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে নি, চীনের রাজ্য-সীমানাও পূর্বে কোরিয়া থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত আর পশ্চিমে মঙ্গোলিয়া থেকে সুদূর ইন্দো-চীন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল।

ত্যাঙ সম্রাটদের দরবারে ভারত, ইন্দো-চীন, মদিনার খলিফা, এমন কি জাপানের রাজারা পর্যন্ত উপঢৌকন পাঠাতে ইতস্তত করেন নি। ত্যাঙ সম্রাট তাই-সুঙ (খৃঃ ৬২৭-৬৯৪) শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্পকলা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুখসুবিধার উন্নয়নকল্পে সচেষ্ট ছিলেন। ধর্ম-কর্ম, জ্ঞান-গরিমার যেমন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ত্যাঙ সম্রাটরা, তেমনি চীন সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—পৃথিবীর আদি সংবাদপত্রের প্রবর্তন ('কোর্ট গেজেট'), বারুদের প্রথম ব্যবহার, ব্লক মুদ্রণের প্রচলন, কম্পাস, শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণের উপায় প্রভৃতি

---

*বিশ্বভারতীর সৌজন্যে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি আবিষ্কার করে বিশ্বের বিস্ময় সৃষ্টি করেন। এই ত্যাঙ আমলেই চীনা কাব্য-সুষমার স্বর্ণযুগ সূচিত হয়েছিল, বলা হয়।

তু-ফু হলেন এই স্বর্ণযুগের বাস্তবপন্থী মরমী কবি। ৭১২ থেকে ৭৭০ খৃঃ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। লি-পো'কে যদি চীনের 'কালিদাস' বলা হয়, তাহলে তু-ফু'কে তেমনি বলা যেতে পারে আমাদের 'ভবভূতি'। দরিদ্র কৃষক পরিবারে তু-ফু'র জন্ম। দীন-দরিদ্রের দুঃখ-দুর্দশা, খামখেয়ালীপনা, রাজা-মহারাজাদের যুদ্ধ জয়ের উন্মাদনা প্রভৃতি যুদ্ধের বীভৎসতা তু-ফু'র কাব্যের উল্লেখযোগ্য উপজীব্য। মানব-দরদী তু-ফু যুদ্ধ-পিপাসু সম্রাটদের কার্যের ছিলেন তীব্র সমালোচক। ইতালীয় কবি গেব্রিয়েল রসেটির মতো তু-ফু চিত্রশিল্পেও ওস্তাদ ছিলেন।

লি-পো (—ত্যাঙ সম্রাটদের আমলের) প্রাচীন চীন সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁকে চীনের 'কালিদাস' বলা হয়ে থাকে। লি কোনো নাটক লেখেন নি, উপন্যাসও লেখেন নি ; কোনো মহাকাব্যও না। তিনি ছিলেন গীতিকার বা 'লিরিসিস্ট'। নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, ফুল-ফল ইত্যাদিই ছিল তাঁর কাব্যের প্রধান উপজীব্য। এক কথায় লি ছিলেন প্রকৃতি-পূজক। লি লেখাপড়ায় খুব পণ্ডিত ছিলেন না। কিন্তু সৈনিক জীবন বা বীরত্বগাথা রচনাতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ছোট ছোট কবিতা, দোঁহা, গান নিয়েই তাঁর ত্রিশ খণ্ড কাব্যগ্রন্থ।

লি-পো'র একটা চুটকি কবিতার নমুনা। এটি নাকি রচনা কবির বয়স যখন ছিল দশ বৎসর। জোনাকি পোকা দেখে বালক লি নীচের ছোট কবিতাটি রচনা করেন যার ইংরেজী অনুবাদের বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় :

'বৃষ্টিতে নিবাতে পারে না তোমার বাতির আলো,
বাতাসে তোমারে করে আরও বেশী প্রোজ্জ্বল।
ঐ দূর আকাশের কোলে তুমি উড়ে যাও না কেন ?
রাত্রির তারার মতো তুমিও যে তা হোলে শোভা পেতে।'

লি-পো'র আর একটি ক্ষুদ্র কবিতা ঃ

'আকাশে আমার চিত্ত এত কেন ধায় ? শুধালে তুমি,
শুনিয়া হৃদয় হাসে, না পারি জবাব দিতে !
পীচফুল নদী স্রোতে কোথায় বা যায় ভাসি,
জানি নাকো আমি।
সখা, মোর নতুন জগৎ না পারিবে বুঝিতে।'

লি-পো'র নীচের এই কবিতাটিতে নানকিং শহরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে ঃ

'নান্‌কিঙ্‌ ! তুমি দেখিয়াছ ছয় রাজ্যের অবসান ;
তোমারি তরে এই গৌরব গীত ও তিন পেয়ালা পান।
মাঠের শোভা সোনার বাগান আছে কত স্থানে ;
তাদের চেয়ে সুন্দর তুমি,—নীল পাহাড় এখানে।
নান্‌কিঙেতেই 'উ' রাজাদের উত্থান ও পতন,
ধ্বংসের মাঝে বিরাজে যেথা বন জঙ্গল এখন।
এই নান্‌কিঙেতেই তো—'চীন' বংশের রাজা—
সূর্যাস্তের স্বপ্ন দিয়ে গড়েছে পাথর ধ্বজা।
মৃত্যু জগতের নিয়ম, সবারি এক পরিণাম,
বিজয়ী ও বিজিত লভিবে একই বিরাম।
ইয়াংশি-কিয়াঙ-এর বারি তরঙ্গে তরঙ্গে
নাচিয়া মিশিবে শেষে সাগরেরি সঙ্গে !'

[অনুবাদ ঃ বিনয়কুমার সরকার]

পো-চুই-এর (খৃঃ ৭৭২-৮৪৬) 'বীণাওয়ালী' কবিতাটি ভাব, ভাষা আর আবেগের দিক থেকে সেকালের চীন সাহিত্যের আর একটি 'লাখে হাজারে একটা' কবিতা। লি-পো'র 'ছয় ইয়ারে'র মতো পো-চুই-এর 'সিয়াং-শানের নয় বুড়ো'ও চীন সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ রচনা। রাজরোষে পড়ে কবি পো-কে একবার নির্বাসনে যেতে হয়েছিল।

তাঁকে যখন নির্বাসনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তিনি তখন এক গৃহে অতিথি হন। সেখান থেকে আবার যখন যাত্রা করলেন, তখন একখানি নৌকোর মধ্যে তিনি শুনতে পেলেন বীণার ঝঙ্কার। এই বীণার ঝঙ্কারকে কেন্দ্র করেই 'বীণাওয়ালী' অমর কাব্য রচিত।

ত্যাঙ আমলের (খৃঃ ৬১৮-৯০৬) আর একজন প্রখ্যাত কবি হলেন হ্যান-যু। তাঁর জন্ম ৭৬৮ খৃষ্টাব্দে। অর্থাৎ লি-পো'র মৃত্যুর দু-এক বছর পরে এবং তু-ফু'র মৃত্যুর দু-এক বছর পূর্বে তাঁর জন্ম। তিনি ৮২৪ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি ছিলেন চীনের 'সাহিত্য-রাজ'। হ্যান-যু শুধু উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন না, স্পষ্ট বক্তা, তেজস্বী প্রবন্ধকার হিসেবেও তিনি খ্যাত ছিলেন। তাঁর রচনাবলী 'হ্যান চ্যাঙ লি চুয়ান সি' নামে সঙ্কলিত হয়েছে।

শুধু ত্যাঙ যুগ নয়, সু আমলেও চীন সাহিত্য ও শিল্পকলা সমূহ প্রভূত উন্নতি লাভ করে। চু-সি, উ-ইয়্যাং সিউ, সুমা কুয়াঙ ('ইতিহাস দর্পণ'), সু-শি, লু-ইউ প্রমুখ লেখক, কবি, চিন্তানায়ক ও শিল্পীর আবির্ভাব ঘটে এই যুগে। লু-ইউ বুঝি দ্বাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কাব্য স্বাদেশিকতা ও দেশপ্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আরও কিছু প্রাচীন চীনা কবিতার নমুনা উৎকলন করলাম এখানে। হান রাজাদের সময়কার 'ময়ূর উড়ে যায় দক্ষিণ-পূর্বে' নীচের এই লোক-সঙ্গীতটির মধ্যে ব্যথাতুর মাতৃহৃদয়ের একটি সকরুণ সুরের রেওয়াজ মেলে।

'আজ ঠাণ্ডা ঝড়,
ঝড়ে ক্ষতি হবে গাছপালার,
ভয়ের কুয়াশা উঠানে ঝোলানো খোঁচা খোঁচা পরগাছাটা
হয়তো ফেলবে মেরেই।
ছেলে তোমার আজ চলেছে ছায়ার জগতে,
এর পর থেকে তোমাকে মা একলা থাকতে হবে।
কারণ ? সে মনস্থির করে ফেলেছে, বড়ই অশুভ।

আমার আত্মার শান্তিভঙ্গ করো না।
তোমার জীবন দক্ষিণ পর্বতের পাথরের মতই যেন হয়
দীর্ঘস্থায়ী।
মৃত্যুর পর তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন সমান শুয়ে থাকে।'
[অনুবাদ : অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

চতুর্থ শতকের চীনা কবি থাও ইউয়ান-মিং-এর এমনি একটি কবিতায়ও সেই প্রাচীন লোক-গীতির সুর অনুরণিত হয়। থাও ইউয়ান-মিং-এর কবিতায় 'তাও' দর্শনবাদের সহজিয়া মর্মবাণী প্রতিধ্বনিত। এ লোক-গীতিটিও বাংলা অনুবাদ করেছেন অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'ছোটবেলায় কাজের চাপ ছিল কম
তখন ভাব জমিয়েছি নানান বইয়ের সাথে।
ক্রমে চল্লিশে পৌঁছে দেখি
একেবারেই ডুবেছি, সবই বৃথা।
ভদ্রতা রাখতে গিয়ে
শীত আর ক্ষিদের অভিজ্ঞতা হয়েছে যথেষ্ট।
জীর্ণ কুটীর মিতালি পাতিয়েছে দুখের হাওয়ার সাথে
বুনো ঘাসে আঙ্গিনা একেবারে ঢাকা,
চাদর মুড়ি দিয়ে লম্বা রাত কাটাই,
ভোর বেলা মোরগ আর ডাকে না,
বন্ধু মং-কুং সেও এখানে নেই,
শেষে আমার মনের আবেগ ঢাকা দিয়েই রাখি।'

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাচীন চীনা কবিতার সেরা নমুনা পাই লি-পো (খৃঃ ৭০১-৭৬২) ও তু-ফু'র (খৃঃ ৭১২-৭৭০) গীতি-কাব্যে। প্রেম আর সুরাই নাকি লি-পো'র কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। শোনা যায়, তিনি নাকি খালি প্রেমের কবিতাই লিখতেন আর মদ খেয়ে করতেন মাতলামি। একদিন মাতাল-বেহুঁশ হয়ে জলের উপর চাঁদের ছায়া ধরতে গিয়ে কবি লি-পো'কে নাকি মৃত্যুমুখে

পতিত হতে হয়। প্রেমে মাতোয়ারা এই লি-পো'র কবিতায় আবার সেছোয়ান প্রদেশের আশ্রয়প্রার্থী ঘরছাড়া হতভাগাদের অভিশপ্ত জীবনের প্রতিচ্ছবিও দেখা যায়ঃ

'আমরা পালিয়ে এসেছি,
নিষ্ঠুর বাঘের মুখ থেকে,
অবিশ্বাসী সাপের ছোবল থেকে,
যেখানে মানুষকে বটগাছের মতন
দু'খান করে ফেলা হয়েছে,
বুনো জন্তুতে চিবিয়েছে তাদের মাংস।'

তু-ফু'র এমনি এক বাস্তবপন্থী কবিতায়ও আবার শুনতে পাইঃ

'লালরঙে ফটকের ওধারে
মদ আর মাংস পচে ধসে যাচ্ছে,
আর এধারে রাস্তার পাশে
না খেতে পেয়ে ঠাণ্ডায় জমে মরা
মানুষের হাড়।'

সে যুগের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি পো চু-ই-এর (খৃঃ ৭৭২-৮৪৬) কবিতাতেও মানুষের কথা—মানুষের জয়-যাত্রার কথার অনুরণন ধ্বনিত হয়ঃ

'লম্বা সবুজ ঘাস,
প্রতি বছর মরে যায়,
আবার জেগে ওঠে প্রতি বসন্তে,
আগুনে জ্বালিয়ে দিলেও ওদের মৃত্যু নেই,
বসন্তের বাতাস আবার ওদের
জাগিয়ে তুলবে নতুন করে।
প্রাচীন সড়কের উপরে
কত জৌলুস চোখ ধাঁধিয়ে চলে গেছে,
সে রাস্তায় ও বিছিয়েছে মাধুর্য ;

যুদ্ধে চুরমার শহরের উপর
ও দিয়েছে সবুজ ঢাকনা,
হাওয়ায় হেলে আগেকার
কতো রাজা আর সেনাপতিকে ও প্রণতি জানায় ;
আর সব গৌরব নিয়ে অপেক্ষা করে
সেই মানুষের, যারা ফিরে আসবেই।'

[অনুবাদ : অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

প্রেমের গতি কোনো কালেই অবাধ নয়। সেকালের চীনের প্রেমের কাব্য-সাহিত্যও সামন্ত যুগের রীতি অনুযায়ী দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দলাদলি, লাঠা-লাঠি, যুদ্ধ-বিগ্রহকে কেন্দ্র করে রচিত।

এমনি একটি প্রণয় কাহিনী :

রাজকন্যার নাম ৎজে-য়ু। রাজ্যের নাম উ। রাজকন্যা প্রেমে পড়লেন সুন্দর যুবা পুরুষ হ্যান-চঙের সাথে। শুধু প্রণয়ই জন্মাল, বিয়ে হলো না দয়িত-দয়িতার। বংশপরম্পরা বিরোধ হলো প্রতিবন্ধ। হ্যান-চঙ হলো প্রবাসী। আর রাজকন্যা ৎজে-য়ু মারাই গেলেন বিরহের দুর্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে। রাজকন্যার কবরের নিকট হ্যান একদিন এসে উপস্থিত হলো। রাজকন্যা তখন ছায়ামূর্তি ধারণ করে দেখা দিল দয়িতকে। কবি প্রেমিক-যুগলের সেই মিলন-চিত্রই আঁকছেন এখানে :

'দক্ষিণের পাখি দেয় না ধরা উত্তরের জালে ; চিরন্তন বিরোধ সেরূপ তোমার আর আমার কুলে। তোমার আমার ভালবাসার সাহস প্রচুর ; কর্তারা করত না কিন্তু বিয়ে মঞ্জুর! তোমার সাথে ঘুরতাম আমি অবাধে ; কুচুকে লোকের নিন্দা বাদ সাধল। পরনিন্দা (কিন্তু) লোকের স্বভাব ; ভয় কি তাতে? বস্তুত দুর্ভাগ্যই আমাদের অন্তরায়। দীর্ঘ বছর তিনেক কাঁদলাম তোমার বিরহে, 'ফিনিকসিনী' যেমন কাঁদে আপন দোসরকে হারিয়ে।

মৃত্যুই করল আমার শোকাশ্রুর শেষ। তোমাকে ছেড়ে অপরের কথা ভাবি নি প্রাণেশ !··· আমার প্রেতাত্মা তাই এসেছে তোমার সকাশে ! ······হায় ! শীঘ্রই ফিরে যেতে হবে এখন ; দেহে দেহে কখনো হবে না মিলন। চিরজীবন কিন্তু একাত্মা দুজনার। প্রেমের মিলন হবে আবার পরলোকে।'

[বাডের সংগ্রহ থেকে—অনুবাদ : বিনয়কুমার সরকার]

আর একটি বিয়োগান্ত কবিতার বিদায়-চিত্রটিও সুন্দর। সেনাপতি যুদ্ধে যাচ্ছেন—যাবার সময় পত্নীর নিকট শেষ কথা বলে বিদায় নিচ্ছেন, প্রণয়-কবিতা হিসেবে এটিও অনবদ্য।

এ ছাড়া একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনাও নাকি এর সঙ্গে বিজড়িত। খৃষ্ট পূর্ব একশত অব্দে কবিতাটি রচিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি স্‌-উ হ্যান সম্রাট উ-তি'র (খৃঃ পূঃ ১৪০-৮৭) প্রতিনিধি হিসেবে হূন মুল্লুকে প্রেরিত হয়েছিলেন। হূনেরা তখন মধ্য এশিয়া হতে দক্ষিণে ভারত এবং পূর্বে চীনে আক্রমণ চালিয়ে দেশের পর দেশ পর্যুদস্ত করে তুলছিল। এ উৎপাত নিবারণ করবার জন্যই উ-তি সবিশেষ সচেষ্ট ছিলেন এবং বহুবার হূনদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন।*

দর্শনশাস্ত্র

প্রাচীন চীনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার দর্শনশাস্ত্র। বিশ্বভারতীর 'চীন-ভবনে'র অধ্যাপক থান য়ুন-শান সম্প্রতি** 'ভারত-চীন' পত্রিকায় চীনা দর্শনশাস্ত্রের এই প্রাচীন, ব্যাপক ও বহুমুখী বিষয়বস্তুর ছোট একটি পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। এখানে চীনের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয় ও বিশেষত্ব আলোচনা করা গেল।

* বিনয়কুমার সরকার : 'চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ' দ্রষ্টব্য

** 'ভারত-চীন'—শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৮৮০ শক।

'ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সূত্রপাত যেমন চতুর্বেদ—বিশেষ করে ঋগ্বেদ থেকে, চীনের দর্শনশাস্ত্র তেমনি আরম্ভ হয়েছে 'ছয় ছিঙ' বা ছয়টি ধর্মগ্রন্থ থেকে—বিশেষ করে 'ঈ-ছিঙ' বা পরিবর্তন গ্রন্থ থেকে।

' 'ঈ-ছিঙ'-এর আরম্ভ ৬৪টি 'কোয়া' বা অঙ্কিত চিত্রে। কথিত আছে সম্রাট ফু-শী (খৃষ্ট পূর্ব ২৮৫৭-২৭৩৮) এই ৬৪টি অঙ্কিত চিত্রের প্রবর্তক।

'৬৪টি অঙ্কিত চিত্রের পরেই আসে দুটি গ্রন্থ 'কোয়া-সু' ও 'ইয়াও-সু'। 'কোয়া-সু'তে ৬৪টি সঙ্কেতের নাম ও অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'ইয়াও-সু'তে ৬৪টি সঙ্কেতের প্রতিটি রেখার অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই দুই গ্রন্থের রচয়িতা কে, তা নিয়ে মতভেদ আছে। হয়তো সম্রাট হোয়াঙ-তি (খৃষ্ট পূর্ব ২৬৯৭-২৫৯৮) ও চৌ বংশের প্রতিষ্ঠাতা উ-ওয়াং (খৃষ্ট পূর্ব ১১২২-১১১৫)-এর পিতা ওয়েন ওয়াঙ যথাক্রমে এই দুই গ্রন্থের লেখক। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের উপমা দিলে বলতে হয়, 'কোয়া-সু' ও 'ইয়াও-সু' চতুর্বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণের মতন। এর পরে আসে 'শী-ঈ' বা দশ পক্ষ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একে আখ্যা দিয়েছেন পরিশিষ্ট বা টীকা। এই শী-ঈ হলো: ১. সঙ্কেতের অর্থ সম্পর্কে টীকা, ২. সঙ্কেতের রেখাগুলির অর্থ সম্পর্কে টীকা ও ৩. সাধারণ মন্তব্য।

'উপরোক্ত তিনটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত—উচ্চ ও নিম্ন এবং এগুলি একত্রে ছয়টি ভাগ করা হয়—৪. ওয়েন-ইয়েন, প্রথম দুইটি সঙ্কেতের উপর বিশেষ মন্তব্য (অসম্পূর্ণ), ৫. 'শও-কোয়া', সঙ্কেতের বিষয় আলোচনা, ৬. 'সু-কোয়া', সঙ্কেতের ফলাফল সম্পর্কে প্রবন্ধ, ৭. 'ৎসা-কোয়া', সঙ্কেতগুলি সম্পর্কে পাঁচমিশাল প্রবন্ধ। বলা হয়, এই টীকা ও আলোচনাগুলি কনফুশিয়াস করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শী-ৎসু ও ওয়েন-ইয়েন, এই দুইটির রচয়িতা কনফুশিয়াস। প্রথম দুইটি রচনা করেন উ-ওয়াং (খৃষ্ট পূর্ব ১১২২-১১১৫)-এর ভ্রাতা

চৌ-কুঙ ; শেষ তিনটি কনফুশিয়াসের শিষ্যরা অথবা পরবর্তী মনীষীরা রচনা করেন। এই সকল টীকা প্রাকৃতিক রহস্য ও প্রাকৃতিক ঘটনার প্রভাব মানুষের জীবনে কি ভাবে হয় তাই নিয়ে আলোচনা—যেমন আলোচনা আছে আরণ্যক ও উপনিষদে।

'চীনের অন্যান্য পাঁচটি ছিঙ বা প্রধান ধর্মগ্রন্থ হলো—

'১. 'শু-ছিঙ' অথবা দলিল গ্রন্থ ; পুরাতন রাজাদের বক্তৃতা ও উপদেশের সমাবেশ—প্রধানত এগুলি নীতিমূলক লেখা। ২. 'শী-ছিঙ' অথবা কাব্যগ্রন্থ ; পুরাতন লোক-সঙ্গীত ও রাজবংশীয় সঙ্গীতের সঙ্কলন —এগুলির বিষয়বস্তু সাধারণভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক। ৩. 'লি-ছিঙ' অথবা রীতি-নীতি গ্রন্থ। এই গ্রন্থের তিনটি বিশেষ ভাগ আছে : ক. 'চৌ লি' : চৌ বংশের বিশেষ রীতি-নীতি। খ. 'ঈ লি' : অনুষ্ঠান ও প্রক্রিয়া। গ. 'লি চি' : রীতি-নীতির অর্থ সম্পর্কে আলোচনা। ৪. 'ছুন-চিউ' অথবা বসন্তের ও হেমন্তের গাথা : এর বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক বিবরণী ও সেই বিবরণী সম্পর্কে কনফুশিয়াসের মন্তব্য ; মন্তব্য কখনও প্রশংসামূলক, কখনও নিন্দা-মূলক। ৫. 'ঈয়ে-ছিঙ' অথবা সঙ্গীত গ্রন্থ। বহু আগেই এটি লুপ্ত হয়েছে।

'এই গ্রন্থগুলিতে মানুষের জীবন, আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এগুলি থেকে চীনের ন্যায়নীতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্য এবং দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যায়।

'চীনের বিভিন্ন মতের দার্শনিকরা ঐ ছয়টি ধর্মগ্রন্থের ভিত্তিতে তাঁদের মতবাদ গড়ে তুলেছেন। চৌ বংশের আমলে (খৃষ্ট পূর্ব ১১২২-২৫৫) বহু দার্শনিক মতবাদ গড়ে ওঠে, যাকে বলা হয়েছে 'দর্শনের শত মতবাদ'। সম্প্রতি চীনের (অবসরপ্রাপ্ত) রাষ্ট্রপতি মাও সে-তুঙ এরই উল্লেখ করে নতুন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নীতি ঘোষণা করেন ; 'শত মতবাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হোক।' আসলে কিন্তু

চৌ বংশে শত মতবাদ সত্যই ছিল না, এতগুলি মতবাদের উদ্ভব সম্ভবও নয়। প্রকৃতপক্ষে মাত্র ছয়টি চীনা দার্শনিক মতবাদ আছে :

'১. রু-চিয়া—কনফুশীয় মতবাদ; ২. তাও-চিয়া—তাও মতবাদ; ৩. মো-চিয়া—মো মতবাদ; ৪. ফা-চিয়া—আইনবাদ; ৫. ঈন-ঈয়াঙ-চিয়া—বিশ্ব বিজ্ঞানবাদ; ৬. মিঙ-চিয়া—ন্যায়বাদ।

'এই ছয়টি দার্শনিক মতবাদীদের আরও বিশ্লেষণ করলে তিনটি মূল ভাগে বিভক্ত করা যায়। বিধিতত্ত্ববাদীদের কনফুশিয়াস মতাবলম্বীদের সঙ্গে, ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ববাদীদের তাও মতাবলম্বীদের সঙ্গে ও ন্যায়বাদীদের মো-মতাবলম্বীদের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে।

'ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় মো আর তাও মতবাদের সঙ্গে যথাক্রমে ন্যায়-বৈশেষিক ও সাংখ্য-যোগের যথেষ্ট মিল আছে। তেমনি বিধিতত্ত্ব দর্শনের সঙ্গে ভারতীয় মীমাংসা দর্শনের সাদৃশ্য বর্তমান।'

'এ ছাড়াও আরও কয়েকটি দার্শনিক মত চীনে আছে, যথা, 'ৎসা-চিয়া', 'নুঙ-চিয়া, 'হেঙ-চিয়া' ও 'শিয়াও স্যুয়-চিয়া'। কিন্তু এগুলির বিষয়বস্তুতে দার্শনিক ছাপ প্রায় নেই বলা চলে। চীনা দর্শনশাস্ত্রে তাদের তেমন কোন গুরুত্বও দেওয়া হয় না।

'এটা অস্বাভাবিক নয় যে চীনা দার্শনিক মতবাদগুলি বিভিন্ন বিষয়ে স্বতন্ত্র ও পরস্পর-বিরোধী মত পোষণ করবে। তা সত্ত্বেও এই মতগুলির মধ্যে অনেকটা মিল আছে। বহুর মধ্যেও ঐক্য বর্তমান। প্রধানত প্রতিটি সম্প্রদায়ই মানুষের জীবন ও ন্যায়-নীতির উপর গুরুত্ব দেয়। মানুষের জীবন ও ন্যায়-নীতি চীনা দর্শনের মূল বক্তব্যই শুধু নয়, এ দুটি হল তার চরম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। 'তা-ছিঙ' নামক একটি বিশেষ জনপ্রিয় গ্রন্থে বলা হয়েছে :

'প্রকৃত জ্ঞানের উদ্দেশ্য উজ্জ্বল উৎকর্ষকে উজ্জ্বলতর করা; জনসাধারণকে সংশোধন করা; শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ অর্জনেই এর শেষ।'

'ন্যায়-নীতি' কথাটি চীনে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। তাই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কই শুধু এর বিষয়বস্তু নয়, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির, মানুষের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্কও ন্যায়-নীতির অন্তর্ভুক্ত। চীনা দার্শনিকদের মতে মানবতা অর্থে ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন নয়, মানবতা অর্থে বহুর মধ্যে সামঞ্জস্যের জীবন। মানবতার চরম লক্ষ্য সমস্ত মানবজাতির কল্যাণ। এই মানবতা কোনো ব্যক্তি-বিশেষ, জাতিবিশেষ বা রাষ্ট্রবিশেষে সীমাবদ্ধ নয়। 'লী-উন' নামক অপর একটি চীনা গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

'প্রাকৃতিক নিয়মের গতিপথে, সমস্ত পৃথিবী মুক্ত, সকলেরই পৃথিবীতে সমানাধিকার। যাঁরা জ্ঞানী ও কর্মিষ্ঠ তাঁদেরই হাতে শাসনভার থাকা উচিত। সকলের উচিত বিশ্বাস ও শান্তিমূলক মনোভাব অর্জন ও রক্ষা করা। মানুষ কেবলমাত্র তার নিজের পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততিকেই ভালবাসবে না, তাব চেষ্টা করা উচিত বৃদ্ধদের বিশ্রাম দেওয়া, পরিণত বয়স্কদের দিয়ে কাজ করান ও নাবালকদের বলিষ্ঠ মন ও শরীর গড়ে তোলার জন্য সাহায্য করা। বিপত্নীক, বিধবা, পিতৃমাতৃহীন শিশু, দরিদ্র ও অক্ষমের প্রতি ভাল ব্যবহার করা উচিত ও তাদের প্র'ত বিশেষ যত্ন নেওয়া কর্তব্য। মানুষের জীবনে প্রতিটি পুরুষ ও নারীর নির্দিষ্ট কাজ আছে। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যকে আহরণ করে কাজে লাগান উচিত—ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই নয়। ব্যক্তিগত গুণগুলির বিকাশ করা ও কাজে লাগান উচিত—ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই নয়। এর ফলে ষড়যন্ত্র, চুরি, ডাকাতির কোন সম্ভাবনা থাকবে না। রাত্রে দ্বার উন্মুক্ত থাকলেও প্রতিটি গৃহ নিরাপদ থাকবে। এরই নাম 'তা-তুঙ' অথবা মহান একতা।'

'আনন্দের কথা, দু হাজার বছর আগে যে মত প্রচারিত হয়েছিল, আজ চীনের নতুন সরকারেব আমলে তা কার্যকরী হয়ে উঠেছে। আশা করি, শুধু চীনের জনগণের স্বার্থেই নয়, সারা পৃথিবীর জনগণের

স্বার্থে এই মত কার্যকরী হোক। তাই হবে মানবতাবাদী চীনা দর্শনের সমর্থনে সর্বশ্রেষ্ঠ যুক্তি।' *

ধ্যান-ধারণা

বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়া চীনে আরও দুটি প্রধান ধর্মমত প্রচলিত ছিল; একটি আচার্য কনফুশিয়াসের সহজজ্ঞান-প্রণোদিত 'সমূহবাদ' আর অপরটি লৌ-ৎসু'র প্রবর্তিত 'তাও'-বাদ বা ব্রহ্মবাদ। ৬০৪ খৃষ্ট পূর্বাব্দে লৌ-ৎসু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবে খুব গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন বলে লোকে তাঁকে বলত লৌ-ৎসু বা 'শুক্ল-কেশ শিশু'। শোনা যায় তিনি বিদ্যানুশীলন সমাপ্ত করে ভারতবর্ষ, পার্থিয়া প্রভৃতি বহু দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হন এবং পিথাগোরাসের মতো ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যায় দীক্ষিত হন। লৌ-ৎসু 'তাও'-এর স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে যা লিখেছেন তা উপনিষদের ব্রহ্ম-স্বরূপ কথনের অনুরূপ।

লৌ-ৎসু রচিত প্রধান গ্রন্থের নাম 'তাও-তে চিং' অর্থাৎ 'তাওপথ-উপনিষদ'। লৌ-ৎসু'র 'তাও-তে চিং-'এর কয়েকটি কলি হলো:

> 'সকলেই কর্ম করে এবং কর্মাবসানে সমতা প্রাপ্ত হয়। বিকাশের পূর্ণতা ঘটলেই আদিম দশায় প্রত্যাবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে, আদিম অবস্থায় ফিরে নিয়তির সম্পূর্ণতা বলে; নিয়তির পরিপূরণ বিশ্রামের নামান্তর। এ একটি চিরন্তন বিধান। যে এ বিধান জেনেছে সে মনীষী; যে জানে নি সে দুর্ভাগ্য। এই সত্যের সহিত পরিচয় সাধন হলে মানুষ উদারচরিত হয়; উদার-চরিত হলে ন্যায়দর্শী হয়; ন্যায়দর্শী হলে রাজগুণে ভূষিত হয়; রাজগুণে মণ্ডিত হলে দেবোপম হয়; দেবোপম হলে 'তাও'-এর অধিকারী হয়। 'তাও'-এর অধিকারী অমরতা লাভ করে, তার শরীর ধ্বংস হলেও সে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। যে 'তাও'-এর সঙ্গে যোগস্থাপন করে কর্ম করে, সে 'তাও'-এর সঙ্গে এক হয়ে যায়।'

* থান য়ুন-শান: 'চীনা দর্শনশাস্ত্র'—ভারত-চীন, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৮৮০ শক।

আচার্য লৌ-ৎস্থ'র প্রায় দুই শত বছর পরে চুয়াংস্থ-র জন্ম। চুয়াংস্থকে লৌ-ৎস্থ'র মানসপুত্র বলা যেতে পারে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় ইনি 'প্রতিভাবান অথচ আলাপবিমুখ, উৎসাহী অথচ উদাসীন, কূটতাত্ত্বিক অথচ কল্পনাকুশল, সংশয়াত্মা অথচ ব্রহ্মনিষ্ঠ।' কনফুশিয়াসের আচার-সর্বস্ব ধর্মনীতিসূত্রকে স্বীকার না করে তিনি লৌ-ৎস্থ প্রবর্তিত তাও-বাদে দীক্ষিত হন। চুয়াংস্থ-র রচনাবলী সৌন্দর্য ও সরসতায় প্রাচীন চীন সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ।

লৌ-ৎস্থ যে সকল ভাব অঙ্কুরিত করে গিয়েছিলেন, চুয়াংস্থ তাদের ফল-পুষ্পিত করেন। চীনের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আর সমালোচকদের মতে, চুয়াংস্থ-র রচনা সমুদ্রের মতো ; হাজার ডুব দাও, সকল রত্ন নিঃশেষে আহরণ করতে পারবে না। অনেক রহস্য অনাবিষ্কৃত থেকে যাবেই যাবে। গভীরতা তার পরিমাণ করতে পারবে না কেউ। ব্যঞ্জনায় ও অব্যক্ত ভাবের সূচনায় চুয়াংস্থ অদ্বিতীয় এবং এই দুটি গুণই মনস্বীদের অনুকরণীয় রচনার প্রধান লক্ষণ।

চুয়াংস্থ-র দর্শন কাব্যের মতো মনোজ্ঞ ; তাঁর গদ্য পদ্যের মতো শ্রুতিমধুর। তিনি তর্কসঙ্কুল দার্শনিক জটিলতার মধ্যে লঘু গতিতে বিহার করতে পারতেন অবলীলাক্রমে।

চুয়াংস্থ-র দর্শন-কাব্যের মনোজ্ঞ কয়েকটি উদাহরণ ঃ

> ''একবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, আমি যেন একটি প্রজাপতি। খেয়ালের ঝোঁকে ইতস্তত উড়িয়া বেড়াইতেছি ; ষোল আনাই প্রজাপতি! আমি যে মানুষ সে কথাটা আমার মনেই ছিল না। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল, দেখিলাম, আমি আমিই ; যেখানকার মানুষ সেইখানেই পড়িয়া আছি।'

> 'আমি মানুষ, স্বপ্নে পতঙ্গ হইয়াছিলাম, না, আমি পতঙ্গ, স্বপ্নে মানুষ হইয়াছি ? কে জানে! পতঙ্গ ও মানুষের মধ্যে অবশ্য তফাত আছে, সেই সীমাটুকু পার হওয়ার নামই জন্মান্তর।

'কূপমণ্ডূকের কাছে সাগরের কথা তুলিয়ো না; সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যাহার দিন কাটিয়াছে সে সাগরের মর্ম কি বুঝিবে? স্বল্পায়ু পতঙ্গের কাছে সনাতন সত্যের উল্লেখ করিয়ো না; সে ক্ষুদ্র প্রাণী, মহৎ ভাবের ধার ধারে না। পাঠশালার পণ্ডিতকে 'তাও'-এর তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়ো না; কার্ক ক্রান্তির ক্ষুদ্রতা যাহার হাড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সে স্বর্গ ও মর্ত্যের আদিম সত্ত্বা, বিশ্বজগতের বিধানদাতা সনাতন 'তাও'-এর তত্ত্ব—ধারণায় আনিতে পারিবে না।...

'শরতের একটি তৃণমঞ্জরী পৃথিবীর মধ্যে বড় জিনিস; প্রকাণ্ড পর্বত তাহার তুলনায় তুচ্ছ, যে শিশু শৈশবে মরিয়াছে তাহার মতো বৃদ্ধ জগতে নাই। বিশ্বজগতের যেদিন জন্ম হইয়াছে আমার জন্মও সেই দিন; বিশ্বজগৎ আমার যমজ ভাই।...

'চতুঃসাগর বিশ্বসংসারের তুলনায় কি গোষ্পদের মতো নহে? সাগরবেষ্টিত চীন সাম্রাজ্য সে কি শস্য ভাণ্ডারের মধ্যস্থিত একটা তণ্ডুলকণার মতো নহে, অসংখ্য সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষ অশ্বগাত্রের একটি কেশাগ্রের মতোই অগণ্য।...

'তপ্ত লৌহের একটা বুদ্বুদ যদি হঠাৎ উদ্ভূত হইয়া লৌহকারকে বলে: 'ওগো আমাকে শাণিত তরবারিতে পরিণত কর', তবে আমার মনে হয়, ঐ প্রগল্‌ভ বুদ্বুদটাকে লৌহমল বিবেচনা করিয়া, লৌহকার কটাহ হইতে তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবে। আমার মতো অধম যদি ক্রমাগত ভগবানকে বলে: 'ওগো আমাকে মানুষ কর', আমার মনে হয়, তিনিও আমাকে বাচাল বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিবেন। এই সংসার তপ্ত কটাহ; ভগবান লৌহশিল্পী; তিনি আমাকে যেমন করিয়া গড়িবেন তাহাতেই আমি খুশী হইব; তিনি আমাকে যেখানে রাখিবেন আমি সেইখানেই থাকিব:—এবং অতীতের কথা সম্পূর্ণ

বিস্মৃত হইয়া জন্মে জন্মে, স্বপ্ন-বিবর্জিত-নিদ্রার অবসানে নব আনন্দে জাগিয়া উঠিব।—'

['চীনের ধূপ' : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত]

কনফুশিয়াসের মৃত্যুর প্রায় এক শত বছর পরে আচার্য মাংস্থ-র জন্ম। মাংস্থ শৈশবে পিতাকে হারিয়েছিলেন। তাঁর মা খুব বিদুষী মহিলা ছিলেন। মাংস্থ কনফুশিয়াসের রচনা পড়েই তাঁকে গুরুদেব বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। ৪০ বছর যখন মাংস্থ-র বয়স তখন তিনি শিষ্য-সেবকদল সঙ্গে করে দেশ ভ্রমণে বের হন। দেশের দুর্নীতি ও দুর্দশার প্রতিকারকল্পেই তাঁর এই স্বদেশ পরিক্রমা। তিনি বহু পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করে জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হন। খৃষ্ট পূর্ব ২৮৯ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

কনফুশিয়াসের প্রবর্তিত পিতৃপূজার প্রাচীন মার্গ অক্ষুণ্ণ রেখে এবং জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের মর্যাদার ক্রম বজায় রেখে সাম্রাজ্যের মধ্যে পারিবারিক আদর্শ পুনঃ সংস্থাপন করাই আচার্য মাংস্থ-র জীবনের এবং গ্রন্থ-রচনার প্রধান লক্ষ্য। মাংস্থ-র উক্তি ঃ

'পৃথিবীরূপ বিপুলায়তন বাস্তুভিটায়, সমগ্র মানবজাতিরূপ প্রকাণ্ড পরিবারের মধ্যে, নির্বিবাদে যে ঠিক নিজের উপযুক্ত আসন বাছিয়া লইতে পারে সে-ই মহাপুরুষ।

'ন্যায়ানুমোদিত পন্থাই যথার্থ মহাযান, এই পথ মহাজন-দিগের।...

'জলের ধারা পূর্ব দিকেও বহিতে পারে, পশ্চিম দিকেও বহিতে পারে ; তাই বলিয়া নির্বিচারে নীচের দিকে গড়ায় বলিয়া ঊর্ধ্বদিকে কখনও গড়াইয়া যাইতে পারে না। জলের যেমন স্বাভাবিক গতি নিম্নাভিমুখী, মানুষের তেমনি স্বাভাবিক গতি সততার অভিমুখে। জলে ঢিল মারিলে উহা উদ্ধত হইয়া উষ্ণীষে আসিয়া লাগিতে পারে, বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে জল

পাহাড়েও চড়ে। কিন্তু এই সব উন্মার্গগামিতা উহার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। ইহা বল-প্রয়োগের ফল, কৌশলের কর্ম। মানুষও যখন সততার বিরোধী কোন আচরণে প্রবৃত্ত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে বাহ্যিক বল-প্রয়োগের ফলেই এই বিকৃতি। বাহিরের কৌশলে মোচড় খাইয়া সে নিজের স্বাভাবিক পথটি পরিত্যাগ করিয়াছে। ···

'বুদ্ধি, বিবেচনা শক্তি, ন্যায়ানুবর্তিতা এবং হিতৈষণা—এ সমস্তই মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি; ইহা বাহির হইতে পাইবার নয়। ইহা চিত-পুরুষের শীর্ষ, হৃদয়, বাহু এবং জঙ্ঘা।

'জিহ্বা স্বাদু অন্নের অন্বেষণ করে, চক্ষু সৌন্দর্যের পক্ষপাতী, কর্ণ সুস্বরের প্রয়াসী, হস্তপদ মাঝে মাঝে আরাম চায়; কিন্তু সকল অবস্থায় সকল মানুষের পক্ষে ঐ সমস্ত সুখ-সম্ভোগ সহজ হইতে পারে না, সুতরাং 'অমুক অমুক জিনিস না হইলে আমার চলিবেই না' এমন কথা বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবের কথ্য হওয়া উচিত নয়।···

'মানুষ যতই মন্দ হউক, সে যদি চিত্ত সংযম অভ্যাস করিতে পারে, তবে ভগবৎ-পূজার অধিকারী হয়।

'হৃদয়টি যাহার শিশুর মতো সেই মহাত্মা।···

'তরবারির সাহায্যে যে জয় করে, সে হৃদয় জয় করিতে পারে না; যে মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়া বশীভূত করিতে পারে সেই জগতের মন পায়।···'

['চীনের ধূপ' : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত]

বাণী মঞ্জুষা

চীন সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার দার্শনিকদের বাণীর আরও কয়েকটি এখানে উৎকলন করা গেল। চীনের দার্শনিক পণ্ডিত কনফুশিয়াসের অনেক বাণীই চাণক্যশ্লোক বা অপরাপর সংস্কৃত শ্লোকের

সঙ্গে তুলনা করা চলে। তাঁর নীতি ও শিক্ষামূলক উপদেশ-বচন কি শিশু, কি বৃদ্ধ, বিশ্বের সবাই শ্রদ্ধাবনত শিরে আজ মেনে আসছে।

'নিজের পরিবারকে যে শিক্ষা দিতে পারে না, অন্যকে শিক্ষা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।...

'মহৎ ব্যক্তি যা সন্ধান করেন তা আছে তাঁর নিজের মধ্যে। নীচাশয় ব্যক্তি যা কামনা করে তা আছে অপরের নিকটে।...

'জ্ঞান কি? যে বিষয় জানো, তা যে সত্যি জানো, সে সম্বন্ধে মনে দৃঢ় প্রত্যয় থাকা চাই; যে বিষয় জানা নেই, তা স্পষ্ট করে স্বীকার করতে হবে। এ হলো প্রকৃত জ্ঞান।...'

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, কনফুশিয়াসের মতো তাও'পন্থীদের গুরুস্থানীয় লৌ-ৎস্যু'র বাণীও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের জনসাধারণ কর্তৃক অকুণ্ঠ স্বীকৃতিলাভ করেছে। সমারসেট মম্, এজরা পাউণ্ড বা এ্যাল্‌ডুস হাক্‌সলি প্রমুখ চিন্তাশীল লেখকবর্গের বহু রচনায় তাও'পন্থীদের দার্শনিক মর্মবাণী ধ্বনিত হয়।

'কোনো কিছুর জন্য আকাঙ্ক্ষা না করাই দুঃখ জয়ের একমাত্র হাতিয়ার।...

'আকাঙ্ক্ষাহীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষা করো, তাহলে দুর্লভ বস্তুর মুখ্য তোমার কাছে আর থাকবে না। না-শেখার কৌশল শেখ, তাহলে মানুষ যে অবস্থা হারিয়েছে তা আবার ফিরে আসবে।...

'রাজ্যে বিধিনিষেধ যত বৃদ্ধি পায়, জনসাধারণ ততই দরিদ্র হয়। জনসাধারণের উপর শাসনের বন্ধন যত দৃঢ় হয়, দেশে ততই অরাজকতা দেখা দেয়।...'

'...মানুষ কেউ বর্জনীয় নয়; জিনিস কিছুই ত্যজ্য নয়; একেই বলে শুদ্ধ বুদ্ধি; এরই নাম সম্যক্ দৃষ্টি।

'অনাড়ম্বর প্রারম্ভ যার দৃষ্টি এড়ায় না সে দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছে; দুর্বলতাকে স্বীকার করেও যে নিজের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে সেই প্রকৃত শক্তিমান।'

'ভালো কথা বলে মানুষের হাটে সুখ্যাতি অর্জন করতে পারা যায়; কিন্তু ভালো কাজ করলে অপরিচিতের মধ্যেও সুহৃদলাভ ঘটে।

'ভালো মানুষের কাছে আমি ভালো মানুষ; যে ভালো নয় তার কাছেও আমি ভালো—তাকে ভালোর দিকে টানবার জন্য।

'…'তাও'-এর রাজপথ চমৎকার কিন্তু লোকে গলিঘুঁজিই ভালোবাসে।

'যেখানে প্রাসাদ ও অট্টালিকা সংখ্যায় ও শোভায় অতুলনীয়, সেখানে শস্যক্ষেত্রে আগাছার ভাগই বেশী দেখবে, এবং গোলা ও মরাই দেখবে শূন্য।…

'ভোজনবিলাস এবং শয়নবিলাস 'তাও'পন্থীর পক্ষে অশোভন। স্বর্ণখচিত পরিচ্ছদ এবং রত্নমণ্ডিত তরবারি ব্যবহারকে আমি প্রকাশ্য দস্যুতা বলে মনে করি; এ কখনই 'তাও'-এর অনুমোদিত নয়। ঐশ্বর্যমত্ততা 'তাও'বিদের একান্ত পরিহার্য।

'জিহ্বাকে সংযত করো; বাহ্যাড়ম্বর কমিয়ে দাও; নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে সামঞ্জস্যের শৃঙ্খলা স্থাপন করো; একেই 'তাও'-এর পন্থা অবলম্বন করা বলে। যে এরূপ করতে পারে সে অনুগ্রহ ও নির্যাতন, সম্মান ও অপমান, লাভ ও ক্ষতি, কিছুতেই বিচলিত হয় না; এরূপ পুরুষকে লোকে পুরুষোত্তম বলে থাকে।…

'কর্মবিরতিই 'তাও'বেত্তার একমাত্র কর্ম; সে শিক্ষা দেয় কিন্তু বাক্যব্যয় করে না।…

'মুখ বন্ধ করো; ইন্দ্রিয়-দ্বার রুদ্ধ করে দাও; জীবন যতই দীর্ঘ হউক, কষ্ট পাবে না। বাগ্মিতা অবলম্বন করো; নিজের স্বার্থ সাত কাহন করে তোলো; আমরণ শান্তির আস্বাদ স্বপ্নেও জানতে পারবে না।…

'নিষ্কাম হবার কামনা করো; দুর্লভের লোভ করলে আপনা

হতেই ক্ষয় পাবে। না-শেখাটাই ভালো করে শিখে নাও; তবেই সেই ধন পাবে, যা মানব-সাধারণ আজ খোয়াতে বসেছে।...'

কনফুশীয় ত্রিপিটক

লৌ-ৎসু'র আবির্ভাবের ৫৩ বৎসর পর চীন দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন কনফুশিয়াস বা আচার্য কং। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা কনফুশিয়াসকে প্রাচ্যভূমির কোঁত্‌ বলে থাকেন। আচার্য কং পণ্ডিত, দার্শনিক, নীতিকুশল নব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা; আমাদের কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের মতো তাঁকে বলা চলে চীন দেশের প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার-কর্তা।

কনফুশিয়াসের নব ধর্মে স্বর্গের ভরসা বা নরকের ভয় নেই। তাঁর মতেঃ অন্যায় করলে ফল ভোগ তাকে করতেই হবে ইহজীবনে। যে ব্যক্তি পাপের ভোগ ভুগবার পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করে, সে তার কৃতকর্মের বোঝা পুত্র বা পৌত্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় মাত্র।

কনফুশিয়াসের ধর্ম অনেকটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; মূলত জ্ঞানমূলক বলে তা নৈতিক আদর্শ থেকে স্খলিত হতে পারে নি। সমাজের সুবৃহৎ জীবনের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের ঐক্যতান, সর্বত্র পিতৃ-পূজারূপ প্রাচীন পদ্ধতির অনুবর্তন এবং ন্যায়ধর্মের সম্যক্ সংরক্ষণ —আচার্য কং-এর এই বুঝি ত্রিপিটক।

কনফুশিয়াসের নীতি সংহিতার আরও কয়েকটি বাংলা অনুবাদ এখানে উৎকলন করা গেল কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'চীনের ধূপ' থেকেঃ

'নৈতিক জীবনের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা এবং পিতা-মাতাকে মানিয়া চলা, মানবজীবনে ইহাই কেবল শিক্ষণীয়; যে নিজের পিতা-মাতাকে মানিতে শিখিয়াছে, সে সাম্রাজ্যরূপ বৃহৎ পরিবারের পিতৃস্থানীয় রাজাকেও মানিবে এবং যে নৈতিক জীবনের মর্ম বুঝিয়াছে সে কখনও বিচারাসনে বসিয়া লোভে বা মোহে ন্যায়ধর্মের মর্যাদা হানি করিবে না।...

'মানবজাতির উন্নতির জন্য আড়ম্বরের সঙ্গে যে সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহার মূল্য যৎসামান্য।

'যে নির্বোধ অথচ অন্যের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে, দরিদ্র অথচ প্রভুত্ব ফলাইতে চায়, বর্তমানের রাজ্যে বাস করে অথচ অতীত যুগের পৌরাণিক আচারের অনুষ্ঠান করিতে যায়, তাহার দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

'চিত্তচেষ্টাশূন্য শাস্ত্রাধ্যয়ন বিড়ম্বনা, শাস্ত্রচর্চাহীন চিত্তচেষ্টা ভয়ঙ্কর।

'জ্ঞানার্থী সমুদ্রে আনন্দ লাভ করে, ধর্মার্থী পর্বতপ্রবাসে সুখী হয়; কারণ, জ্ঞানার্থী চঞ্চল, ধর্মার্থী প্রশান্ত। ...

'সারবেত্তা যদি সৌন্দর্যকে ছাড়াইয়া উঠে তবে সেই সারবেত্তা সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যতার নামান্তর; বাহিরের অলঙ্কার যদি সারবেত্তাকে ছাপাইয়া যায় তবে তাহা চাকচিক্যময় বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। উভয়ের পরিমাণ-সাম্যই বাঞ্ছনীয়।

'শূন্য যেখানে পূর্ণতার ভান করে, নিঃস্ব যেখানে ঐশ্বর্যের ভান করে, অক্ষম যেখানে ক্ষমতার অহঙ্কার করে, সেখানে আমার এ অভিলাষ আংশিকভাবে পূর্ণ হওয়াও কঠিন।

'আত্মমর্যাদা হারাইও না, লোকে তোমায় শ্রদ্ধা করিবে; উদার হও, হৃদয় জয়ের যোগ্যতা লাভ করিবে; সত্যনিষ্ঠ হও, লোকে তোমায় বিশ্বাস করিবে; প্রযত্নবান হও, মহৎ সিদ্ধি তুমিই লাভ করিবে; পরের উপকার কর, তোমার কথা লোকে ঋষিবাক্যের মতন আনন্দের সহিত পালন করিবে।

'কোন্ গাছটি যে চিরহরিৎ তাহার পরিচয় কেবল শীত-কালেই পাওয়া যায়।'

উপন্যাসের যুগ

চীন সাহিত্যের ইতিহাসের পরবর্তী পদচিহ্ন উপন্যাস ও নাটকের যুগ (খৃঃ ১২৮০—১৩৬৮)। এ যুগে মঙ্গোলেরা এসে সুং বংশের

পতন ঘটায়। ১২৭৭ সালে কুবলাই খাঁন নিজেকে চীনের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন এবং পিকিং-এ নিজ য়ুয়ান বংশের রাজধানী স্থাপন করেন। কুবলাই খাঁন ও তাঁর অনুবর্তিগণ চীনের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরম পৃষ্ঠপোষক হলেও আত্মাভিমানী বহু চীনা পণ্ডিত ও সাহিত্যিক বিদেশী রাজশক্তিকে স্বীকার করে নেন নি। তাঁরা দূরবর্তী মঠ বা অন্যত্র গিয়ে নিজেদের অবসর যাপনের জন্য যা রচনা করলেন, তাই আখ্যা পেল চীনা উপন্যাস নামে। 'চুয়ান-চি' (দুর্লভ উপাখ্যান)-র লেখকদের মতো এঁরাও প্রথমে আপন আপন ইয়ারদের চিত্তবিনোদনকল্পে উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। তবে চুয়ান-চি লেখকদের মতো এঁরা শুধু রোমান্টিক দুর্ধর্ষ ডানপিটে কাহিনীর অবতারণা করলেন না। বরং আশ্রয় নিলেন সাহিত্যরসে পুষ্ট প্রচলিত লৌকিক কাহিনীর। এমনি করে রস-সমৃদ্ধ নতুন এক সাহিত্য-সম্পদের হলো দ্বারোদ্ঘাটন। এসব উপন্যাসের কোনোটির বিষয়বস্তু ছিল ঐতিহাসিক তথ্য-বর্ণনা, কোনোটির বা সামাজিক নীতি প্রচার। বাদবাকি অধিকাংশই নির্জলা প্রেমের কাহিনী। এগুলি এক-একটি আয়তনে টলস্টয়ের বা ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসকে হার মানায়। ঘটনার অসংলগ্নতার জন্য তাদের তুলনা করা চলে ডি. এইচ. লরেন্স-এর কোনো কোনো উপন্যাসের সঙ্গে। দু-একটি ছাড়া অধিকাংশ উপন্যাসই সাধারণবোধ্য পেই-হুয়া'তে লেখা। প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসের প্রতি অধ্যায়ের প্রথম ও শেষে একটি করে শ্লোক বা কবিতা লিপিবদ্ধ থাকত।

এসব উপন্যাসের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয়—'সান কুও-চি' ('তিন রাজ্যের রোমান্স'), 'শুই হু-চুয়ান' ('সব লোক ভাই ভাই'—পার্ল বাক-এর ইংরেজী অনুবাদ করেছেন *All Men Are Brothers* নাম দিয়ে), 'তাও হুং-মেঙ' ('দি ড্রিম অফ দি রেড চেম্বার'), কিংবা 'চিং পিং মেই' ('স্বর্ণপদ্ম'—ইংরেজী অনুবাদ করেছেন ক্লেমেণ্ট এগার্‌টন : *The Golden Lotus*), 'চিন কু চি কুয়ান', 'লিও তাই' ('আজব কাহিনী') প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্য প্রসিদ্ধ রোমান্টিক

উপন্যাস 'শূই হু-চুয়ান'-এর পটভূমি হলো ত্রয়োদশ শতাব্দীর মহাচীন। বইটির মধ্যে প্রায় শতাধিক চরিত্র আছে। একদা আইনের চোখে যারা ছিল দস্যু নামে পরিচিত—সরকারের তাড়া খেয়ে অথবা সমাজের অন্যায় অত্যাচারে হাত থেকে নিষ্কৃতির পাবার জন্য যারা দূর শানটুং প্রদেশের পর্বতসঙ্কুল প্রদেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরই কাহিনী। দলবদ্ধ হয়ে এই সব দস্যুরা অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করত। দরিদ্র আর লাঞ্ছিতের সাহায্যে এগিয়ে আসত চীনের এ 'ভবানী পাঠক' আর 'রবিন হুডে'র দল।

চিং, পিং আর মেই ছিল এক ধনীর তিন উপপত্নী। এ তিন নারীকে কেন্দ্র করেই মিং আমলের এই উপন্যাস 'স্বর্ণপদ্ম' বা 'চিং পিং মেই'-এর আলোচ্য কাহিনী। সামন্ততান্ত্রিক চীনের সাংস্কৃতিক ধারার পরিচয় মেলে এ উপন্যাসখানিতে। তবে এর ভাষা স্থানে স্থানে কিছুটা অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। 'দি ড্রিম অফ দি রেড চেম্বার' মান্দারিন ভাষায় লেখা একটি বিয়োগান্ত প্রেমের কাহিনী। এর নায়িকা যাকে ভালোবাসত তাকে বিয়ে করল না আর ব্যথাতুর ভগ্নহৃদয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল মৃত্যুর পথে। এর প্রধান উপাখ্যানটি দুটি তরুণ নিকট আত্মীয় ভাইবোনকে কেন্দ্র করে, আর অপ্রধান অংশের মধ্যে ছোটখাটো বহু প্রেমের আখ্যায়িকা রয়েছে।

'দি ড্রিম অফ দি রেড চেম্বার' (ইংরেজী অনুবাদঃ ফরেন্স ও ইশাবেল ম্যাক্‌হাগ) উপন্যাসখানির একটু বিশদ আলোচনা করা গেল এখানে। বইখানি সেকালের চীনা ভাষার এক সুবৃহৎ উপন্যাস। নানা চরিত্র-সংবলিত প্রায় ১২০টি পরিচ্ছেদেরও উপর এবং উপন্যাসখানিও রূপকধর্মী। বিংশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত এই গ্রন্থখানির লেখকের নাম অজানা ছিল। সুপণ্ডিত ডক্টর হু শী-র ব্যাপক গবেষণার ফলেই এর প্রকৃত রচয়িতা সাও হুয়ে-চিন (Tsao Hsueh Chin) এবং কাও-গো (Kao Ngoh)-র কথা প্রথম জানা যায়। সাও হুয়ে-চিন ও কাও-গো চিঙ-রাজত্বের

আমলের লেখক এবং মূল গ্রন্থখানার রচনা শেষ হয় অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে।

উপন্যাসের গোড়াতেই নু-কুয়া নাম্নী দেবী এবং স্বর্গের স্তম্ভ নির্মাণের জন্য ছত্রিশ হাজার পাঁচ শত একটি পাথরের উল্লেখ দেখা যায়, অসংখ্য নুড়ির মতোই অগঠিত মানুষের বাস এই পৃথিবীতে। বিধাতা-পুরুষ তাদের মধ্য থেকেই কয়েকজনকে বেছে নিয়ে রাজ্যশাসনের ভার দিয়ে অপরকে নৈরাজ্য অনাচারের হাত থেকে রক্ষা করেন। এই উপন্যাসের নায়ক পাও-য়ু প্রথমে রাজ্যশাসনের অনুপযুক্ত প্রমাণিত হয় এবং আলস্য-শৈথিল্য তাকে আর দশটি সাধারণ পাথরের মতোই করে তোলে; কিন্তু পরে এক সমুচ্চ অজেয়-শক্তির তাড়নায় 'মূল্যবান পাথর' হিসাবে সে তার স্বমূল্য উপলব্ধি করে এবং তার এই আত্মোপলব্ধির মধ্যেই 'দি ড্রিম অফ দি রেড চেম্বার' মহা-উপন্যাসের সার্থকতা। উপন্যাসের প্রারম্ভেই এমনিভাবে তাও ধর্ম বা তাও'বাদের পরিচয় পাওয়া গেলেও এই মহা-উপন্যাসখানি যে কেবল তাও'বাদ প্রচারের ফিরিস্তি মাত্র, তা অনুমান করা ভুল হবে। কেন না, এই বিরাট উপন্যাসের অসংখ্য চরিত্র আর বিপুল ঘটনাবর্তে প্রথম প্রথম মনে হবে সব কিছুই যেন অসংলগ্ন, অসামঞ্জস্য। কিন্তু আপাতঃদৃষ্ট এই অসংলগ্ন ঘটনাবলী বা চরিত্রগুলির মধ্যেই কোথাও যেন একটা আশ্চর্য রকম অন্তর্কির্ণ শুদ্ধ-শান্ত সুর বেজে চলেছে। বলা বাহুল্য, একাজ খুব সহজ নয়। চরিত্র-চিত্রণের দক্ষতা, ঘটনা-বিন্যাসের নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি কাহিনীগত আকর্ষণীয়তায় দীর্ঘকাল পর্যন্ত পাঠকবর্গকে আকৃষ্ট ও আবিষ্ট করে রাখবার ক্ষমতা না থাকলে এ ঐক্য-সামঞ্জস বজায় রাখা সম্ভব নয়। দেড়-শত বছর আগে লেখা প্রধানত একটি বিশিষ্ট মতবাদাত্মক উপন্যাস হয়েও গ্রন্থখানি কোথাও এতটুকু ক্লেশ-পাঠ্য বলে মনে হয় না।* তিন পুরুষ-পর্যায়ের চিয়া-পরিবারের কাহিনীভিত্তিক এই মহা-উপন্যাসে সম্পূর্ণ একটি যুগ ও তৎকালীন

* সমালোচনা: কল্যাণ দাশগুপ্ত। চতুরঙ্গ, শ্রাবণ, ১৩৬৫।

সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাস এবং সর্বোপরি চীনের ধর্ম-জগৎ রূপায়িত হয়েছে। 'দি ড্রিম অফ দি রেড চেম্বার' তাই চীন সাহিত্যের অতুলনীয় ক্লাশিক উপন্যাস। আঙ্গিক ও অবয়বের দিক থেকে এটি যেন 'গন্ উইথ দি উইণ্ড'-কেও ছাড়িয়ে যায়। এ ছাড়া কয়েকটি সার্থক গল্প সঙ্কলনও সে যুগে সঙ্কলিত হয়।

আধুনিক কাল

চীন সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয় উনবিংশ শতব্দীর শেষ পাদে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চীনের তখন মহা দুর্দিন। পঙ্গু মাঞ্চু সম্রাটদের অক্ষম দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান প্রমুখ বিদেশী বণিকেরা এসে এ সময় মহাচীনের বুকে আসন গেড়ে বসে আর আফিম-এর নেশায় ঘুম পাড়িয়ে 'চীনা নেকলেসে'র মহামূল্য মণি-মুক্তাগুলি একটি একটি করে ছিনিয়ে নিতে থাকে। হংকং, ম্যাকাও, এ্যাময় প্রভৃতি চীনের নিজস্ব বন্দর ও উপনিবেশগুলি হাতছাড়া হয়ে গেল। বিদেশী এসব শ্বেত-গৃধ্নুদের সঙ্গে যখন সাম্রাজ্য-লোভী প্রতিবেশী জাপানও এসে হাত মিলাল, চীনা ড্রাগনের তখন আফিম-এর নেশা টুটল। চীনের এ নব জাগরণের ঢেউ তার সাহিত্য-ক্ষেত্রেও এসে লাগল। এ সংস্কার আন্দোলনের পুরোহিত ছিলেন প্রসিদ্ধ মনীষী ক্যাঙ ইউ-উই (১৮৫২—১৯২৭) আর কুং যু কাই-চি-কাও। চীন গণতন্ত্রের জনক ও 'সান মিন চু-আই' ত্রয়ী নীতির ঋত্বিক ডাঃ সুন ইয়াৎ-সেন-ও এই নব-জাগৃতিতে এসে দীক্ষা নিলেন। ডাঃ সুন ঘোষণা করলেন : 'জানার চাইতে করা অনেক সোজা'। জাপবিরোধী রাষ্ট্রীয় আলোড়নের এই আঘাতে চীনের চলিত ভাষা পাই-হুয়া স্বীকৃতি লাভ করে সৎ সাহিত্যের বাহনরূপে। চীনের সাহিত্যে বিপ্লবের সূচনা হলো ডাঃ হু-শী আর অধ্যাপক চেন তু সিউ-র নেতৃত্বে। কিন্তু এ বিপ্লবের প্রধান কর্ণধার ছিলেন চীন সাহিত্যের ম্যাক্সিম গোর্কি লু সুন। ১৯১৯ সালের '৪ঠা মে' আন্দোলন মূলত রাজনৈতিক হলেও

তা সাহিত্য-বিপ্লবকে করল জোরদার। ফলে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি চীন ভাষায় অনুবাদ হতে লাগল। এমন কি, দর্শন ও বিজ্ঞানের বইও প্রচুর লেখা হলো। প্রাচীন রচনা-রীতির পরিবর্তে সাহিত্যে নতুন আঙ্গিকেরও প্রচলন হলো। জাতীয়তা ও পাশ্চাত্য আদর্শে সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন নতুন লেখকরা। কিন্তু এসব বিপ্লবী পরিবর্তন সত্ত্বেও তখনকার লেখকেরা বাস্তববাদী প্রাণবন্ত সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারলেন না। কেন না, তাঁদের সঙ্গে গণ-জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয় বিশেষ ছিল না। 'সারা চীন লেখক সমিতি'র প্রাক্তন সভানেত্রী মাদাম তিঙ লিঙ প্রাক্-বিপ্লব চীনের এ সাহিত্যকে টবের ফুল বা ছাদের বাগানের ফুলের সঙ্গে তুলনা করলেন।

লু স্যুন

[১৮৮১—১৯৩৬]

জাপ-প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে চীনের যে প্রগতিশীল গণ-সাহিত্যের সূচনা হয়, তার পুরোধা ছিলেন লু স্যুন। বস্তুনিষ্ঠ তাঁর ভাবধারা ও মানবিকতার জন্য কেউ বলেন তাঁকে চীনের গোর্কি, কেউ বলেন চেকভ্, কেউ বা বলেন বার্নার্ড্ শ। এক কথায় তিনি আধুনিক চীন সাহিত্যের জনক ও পথিকৃৎ। লু স্যুন-এর ছোট গল্পগুলি আধুনিক চীন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। তাঁর 'কোনো এক উন্মাদের রোজনামচা' ও 'আঃ কি-উ-র জীবন-কাহিনী' (লু-স্যুন-এর অনেক লেখাই বাংলা অনুবাদ হয়েছে।) বৈপ্লবিক বাস্তবতায় সমুজ্জ্বল। তাঁর রচনায় গগোলের প্রভাব দেখা যায়। 'কোনো এক উন্মাদের রোজ-নামচা' সম্পর্কে লু স্যুন নিজে বলেন ঃ

আমি এর মধ্যে চীনের পারিবারিক প্রথা আর চিরাচরিত নৈতিকতার আদর্শের অনুগত হবার কুফল দেখানোর প্রয়াস পেয়েছি। আমার কাছে এর নায়ক গগোলের থেকে আরও গভীরভাবে অবসাদগ্রস্ত এবং নীট্‌শের অতিমানবের থেকে কম অস্পষ্ট। অবশ্য

এর পর থেকে আমি বিদেশী প্রভাবমুক্ত হবার চেষ্টা করেছি এবং আমার মনে হয়, আমার লেখার কায়দায় আর একটু 'গভীরতা ও পরিপক্বতা এসেছে'।

ঘুণে ধরা ক্ষয়িষ্ণু সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আজীবন তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। সাহিত্য-সৃষ্টি তাঁর কাছে ছিল বিশেষ দায়িত্বের। 'শিল্পীকে সঙ্গী হতে হবে সমাজ-সংস্কারকের।' তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি চরিত্রে ফুটে উঠেছে তাদের প্রতি লেখকের গভীর ভালোবাসা। এমন কি 'আঃ কি-উ'র প্রতিও তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। বহু বিনিদ্র রজনীর ফল হীরের টুকরোর মতো তাঁর এক একটি গল্প। পিকিং-এ তাঁর ঘরের দেয়ালগুলি টুকরো টুকরো নানান কাগজে ঢাকা থাকত, যার মধ্যে ছড়ানো থাকত, যেখানে সেখানে গল্পের উপাদান। এমনি টুকরো টুকরো লেখা কাগজগুলো পরে সাজিয়ে তিনি নাকি রাজমিস্ত্রীর মতো গড়ে তুলতেন তাঁর গল্পের পুরো সাতমহল।

চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙ তাঁর 'নয়া গণতন্ত্র' নামক প্রবন্ধে লু স্যুন সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ

'লু স্যুন ছিলেন চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রধান সেনাপতি; তিনি শুধু সাহিত্যিক নন, একাধারে তিনি মহান চিন্তানায়ক ও মহান বিপ্লবীও ··· সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে লু স্যুন ছিলেন জাতির বৃহৎ জনগণের প্রতিনিধি; শত্রু দমনের সবচেয়ে খাঁটি, সাহসী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অবিচলিত ও উৎসাহী বীর।'

লু স্যুন হলো তাঁর লেখক-নাম। আসল নাম ছিল চৌ শু-জেন। ১৮৮১ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর চো-শিয়াং প্রদেশের শাও-শিঙ শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুরদা ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী; বাবাও ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। অল্প বয়সে লু স্যুন-এর পিতৃবিয়োগ হয়। শৈশবে যে পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে লু স্যুন বড় হয়ে ওঠেন, তা তাঁর নিজের সাহিত্য-জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। বাল্যকালেই তিনি কৃষকদের সঙ্গে মিশবা'র

সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর 'আমার জন্মভূমি' গল্পে আমরা যে কৃষক বালক 'রুনথু'র সন্ধান পাই, সে 'রুনথু' ছিল লু স্যুন-এর শৈশবের বন্ধু. অবশ্য তার সত্যকারের নাম ছিল আর একটা। লু স্যুন-এর 'গ্রাম্য যাত্রা' গল্পে যে সকল চরিত্র দেখতে পাই, তারা সকলেই গ্রাম্য চাষীর ছেলে যাদের সঙ্গে একদা লু স্যুন খেলাধুলো করে বেড়াতেন; এক সঙ্গে যাত্রা-গান শুনতেন; এক সঙ্গে পরের ক্ষেত-খামারে ঢুকে ফল-মূল চুরি করে খেতেন।

লু স্যুন খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। প্রতি বছরই স্বর্ণপদক লাভ করতেন। সরকারী বৃত্তি নিয়েই চিকিৎসা-শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি জাপানে এসেছিলেন। আর এখানেই তাঁর জীবনের অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন! ঘটনাটি হলো: লু স্যুনদের কলেজে একদিন সিনেমা দেখানো হচ্ছিল। চলচ্চিত্রের নির্বাক পর্দায় দেখলেন, রাশিয়ার গুপ্তচর-বৃত্তির অপরাধে একদল অপরাধীকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এসব অপরাধীদের মধ্যে একজন চীনাবাসীও ছিল। চলচ্চিত্রের দৃশ্যটি দেশপ্রেমিক লু স্যুন-এর মনকে করল বিক্ষিপ্ত। তিনি ভাবলেন: 'একটি দুর্বল ও অনগ্রসর দেশের জনসাধারণ, তা তারা যতই বলবান ও স্বাস্থ্যবান হোক না কেন, তারা শুধু ঐ রকম দৃশ্যের উপাদান বা দর্শকই শুধু হতে পারে।' তিনি তাই ঠিক করলেন, মানুষের মনের চিকিৎসাই বর্তমানে সবচেয়ে অধিক প্রয়োজন। হাজার হাজার বছরের সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষণে পক্ষাঘাতগ্রস্ত জনগণের চেতনাশক্তিকে ফিরিয়ে আনতে তাই সাহিত্যই তার একমাত্র অস্ত্র। চিকিৎসা শাস্ত্রের ছাত্র চৌ শু-জেন হলেন সাহিত্যিক লু স্যুন।*

জাপানে অবস্থানকালেই চীনের নির্বাসিত দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী চিন্তানায়ক দলের সংস্পর্শে আসেন লু স্যুন এবং স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে ব্রতী হন। টোকিও থেকে প্রকাশিত 'হোনান' পত্রিকায়

---

* লু স্যুন: সেন না-লান (শ্রীনারায়ণ সেন), 'ভারত-চীন' ত্রৈমাসিক পত্র, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৮৮০ শক।

তিনি গল্প-কবিতা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে লিখতে শুরু করলেন। এ সময় বিশ্বের প্রগতিশীল সাহিত্যের সঙ্গে চীনা জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য তিনি বিদেশী সাহিত্য অনুবাদের কাজেও আত্মনিয়োগ করেন। জাপানী ও জার্মান ভাষা তাঁর আগেই জানা ছিল। রুশ ভাষাও তিনি এ সময় শিখে নিলেন। এবং গোর্কি, গগোল, ফাদায়েভ, প্লেখানভ প্রভৃতি রুশ লেখকদের অমর সৃষ্টির অনুবাদ করে চীন সাহিত্যকে করলেন সমৃদ্ধতর।

'পাগলের ডায়েরী'ই লু স্যুন-এর প্রথম প্রকাশিত গল্প (১৯১৮)। কথ্য ভাষায় লিখিত লু স্যুন-এর এই গল্পটি আধুনিক চীন সাহিত্যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। একে একে 'খুং ইচি', 'ঔষধ', 'আগামী কাল', 'আঃ কিউ-র সত্য জীবনী' প্রভৃতি তাঁর বহু গল্পই প্রকাশিত হতে থাকে। মানবতাই লু স্যুন-এর বিপ্লবী সাহিত্যের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। অবহেলিত জনগণকে তিনি বাসতেন ভালো; শোষকদের করতেন অবজ্ঞা। তাঁর 'পাগলের ডায়েরী'তে তিনি শোষক ও শাসকের হাজার বছরের অমানুষিকতার মুখোশ খসিয়ে দিয়েছেন। জাতির এ অবমাননা, অজ্ঞতা ও অনগ্রসরতার জন্য কনফুশিয়াসের দর্শনকেই প্রধানত তিনি দায়ী করলেন। অতীতের ইতিহাসের পাতায় তাই তিনি দেখতে পেলেন 'মানুষে মানুষ-খাওয়া সমাজে'র ছবি। এক 'অসাধারণ সমাজ'ই সৃষ্টি করতে পারে 'পাগলের' ন্যায় চরিত্র।* 'পাগলের ডায়েরী'র এই হলো মূল সুর। লু স্যুন এই 'অসাধারণ সমাজের' আর একটা দিক তুলে ধরেছেন তাঁর 'ঔষধ' কাহিনীতেও। ক্ষয়-রোগাক্রান্ত সন্তানের পথ্যের ব্যবস্থা হয়েছে দেখতে পাই মানুষের [বিপ্লবীর] রক্তে চোবান রুটি দিয়ে। 'আঃ কিউ-র সত্য জীবনী'তে ** লু স্যুন তাঁর বিপ্লবী সমাজ-চেতনার পূর্ণাঙ্গ রূপ ব্যক্ত করেছেন।

---

* 'লু স্যুন': সেন না-লান। 'ভারত-চীন' ত্রৈমাসিক পত্র: শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৮৮০ শক।

** বাংলা অনুবাদ: পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলি.।

পরবর্তী কালে 'কি ভাবে আঃ কিউ-র সত্য জীবনী লিখলাম' এক প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে জবাবদিহি করেছেন ঃ

'আমার মনে হয় চীনে যতদিন পর্যন্ত না বিপ্লব হচ্ছে ততদিন আঃ কিউও বিপ্লবী হবে না। কিন্তু বিপ্লব শুরু হলে সেও হবে একজন বিপ্লবী। আমার আঃ কিউ-র ভাগ্যই হচ্ছে এমন, তার চরিত্রে কোনো দ্বৈততার অবকাশ নেই—ভবিষ্যতে যদি কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তন আসে, আমার বিশ্বাস আঃ কিউ-র মতো অনেক বিপ্লবীরই সৃষ্টি হবে।'

লু স্যুন তাঁর ছোট গল্প ও প্রবন্ধে তথাকথিত জাতীয় ধারা ও সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির,—চীনের জনগণের নিষ্ক্রিয়তা, বিষণ্ণ ও বিষাদময় জীবনের যেমন কড়া সমালোচনা করেছেন, তেমনি তাদের নিজেদের চেতনার অভাব ও তাদের পক্ষাঘাতগ্রস্ত মনের জন্য দায়ী করেছেন তথাকথিত 'জাতীয় ধারা'কে। কিন্তু তাই বলে তিনি কোনো দিন চীনের সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করেন নি। চীনের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা কিছু ভালো, তা তিনি অকুণ্ঠচিত্তে সমর্থন করেছেন। 'শুধু নিজের দেশের সংস্কৃতির উপর নির্ভর করলে চলবে না, পৃথিবীর অপরাপর দেশের সংস্কৃতিও আমাদের জানতে হবে, শিখতে হবে সেই সব দেশের উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান।' লু স্যুন-এর এই ছিল ব্যক্তিগত অভিমত।

লু-স্যুন-এর পর একাধারে আধুনিক বিশিষ্ট কথাশিল্পী, কবি, নাট্যকার, দার্শনিক ও রাষ্ট্রনেতা হিসেবে ভাইস-চেয়ারম্যান কুও মো-জো'র স্থান বলা যেতে পারে। সেচুয়ান প্রদেশে ওমেই পর্বতের সানুদেশে এক সুন্দর পল্লীতে ১৮৯২ সনে জন্মগ্রহণ করেন কুও মো-জো। সাতাশ-আঠাশ বছর বয়স থেকে তিনি লিখতে শুরু করেন। গল্প, উপন্যাস আর নাটক রচনার চেয়েও আধুনিক চীন সাহিত্যে কুও মো-জো-র প্রধান অবদান—প্রাচীন চীন ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত গবেষণামূলক প্রবন্ধাবলী। 'দেবী', 'তারাময় আকাশ', 'আঁধার', 'আবিষ্কার', 'রণনিনাদ', 'সিকাডা', 'ওড টু নিউ

চায়না' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তাঁর কবি-মানসের শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর 'দেবতার পুনর্জন্ম' ও 'ফেঙ আর হুয়াঙের নির্বাণলাভ' রচনা দুটি চীনের 'অক্টোবরের বিপ্লব' আর '৪ঠা মে' সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। কুও মো জো আন্তর্জাতিক শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত।

কুও মো-জো-র প্রতিভা সত্যিই সর্বতোমুখী। কুও মো-জো-র সহযোগিতা লাভ না করলে লু স্যুন বর্তমান চীনের প্রগতিশীল গণ-সাহিত্যের গোড়াপত্তন করতে সক্ষম হতেন কি না সন্দেহ। তিনি প্রচুর লিখেছেনও। দশখানা তাঁর নামকরা উপন্যাস, ছয়খানা নাটক-নাটিকা, পাঁচ খণ্ড কবিতার বই, আর প্রবন্ধ-গ্রন্থাবলীর সংখ্যাও ছয়খানি। এ ছাড়া, টলস্টয়, গ্যাটে প্রমুখ মনীষীদের বারোখানি গ্রন্থের অনুবাদ তিনি চীন ভাষায় করেছেন।

ডাঃ লিন ইউ-ত্যাঙ (খৃঃ ১৮৯৫—) বহির্বিশ্বে চীনা সংস্কৃতির প্রচারে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন তাঁর 'মাই কান্ট্রি এ্যাণ্ড মাই পিপ্‌ল', 'দি ইম্পর্ট্যান্স অফ লিভিং' প্রভৃতি জনপ্রিয় গ্রন্থের মারফত। তাঁর সঙ্কলিত গ্রন্থ 'উইসডম অফ কনফুশিয়াস' ও 'দি উইসডম অফ চায়না এ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া' একদা (জেনারেল চিয়াং কাইশেকের আমলে) চীন-ভারত মৈত্রীর রাখি-বন্ধন সুদৃঢ় করে তুলেছিল।

ডাঃ হু-শী (খৃঃ ১৮৯১—) কেবল 'পাই-হুয়া' আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক নন, তিনি একাধারে দার্শনিক, পণ্ডিত, কবিও।

এ ছাড়াও আধুনিক চীন সাহিত্যের আরও কয়েকজন শক্তিমান কবি ও কথা-সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করা গেল। তাঁদের মধ্যে মাদাম তিঙ লিঙ (খৃঃ ১৯০৭—) সবিশেষ সুপরিচিতা। হুনান প্রদেশে এক গরীবের ঘরে তাঁর জন্ম। রক্ষণশীল পরিবেশে নানান দুঃখ-কষ্টের মধ্যে তাঁকে লেখাপড়া শিখতে হয়। তিনি এখন প্রগতিশীল 'চীন সাহিত্য সমিতি'র সম্পাদিকা ও চীন গণরাষ্ট্রের সহ-সভাপতি।

মাও তুণ্ড (খৃঃ ১৮৯৬—) একজন সাধারণ প্রুফ-রীডার থেকে

বর্তমানে চীনের অন্যতম সেরা লেখকরূপে আদৃত। তিনি 'চাইনীজ লিটারেচার' পত্রিকার সম্পাদক। ছদ্ম নাম 'সেন ইয়ে-লিং'। তাঁর অনেকগুলি গল্পের বাংলা অনুবাদ হয়েছে। গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ-সাহিত্যে সুন সি চেন-এর (খৃঃ ১৯০৬—) অবদানও কম নয়। একাধারে বিদ্রূপ ও সামাজ-চেতনাবোধ দু-ই তাঁর লেখায় দেখা যায়।

তি য়েন চ্যুন (খৃঃ ১৯০৮—) জাপ-প্রতিরোধ গণ-সাহিত্য-গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান শক্তিশালী লেখক। তাঁর 'ভিলেজ ইন অগাস্ট' ফ্যাসী-বিরোধী গেরিলা বাহিনীর এক বাস্তব চিত্র। চেন শো-চু-র বিখ্যাত উপন্যাস 'বসন্ত নির্ঘোষ' আর য়্যাঙ সুয়ে-ইং-এর 'লাল শালগম' প্রতিরোধ আন্দোলনের এমনি এক বলিষ্ঠ আলেখ্য। শক্তিধর লাও শে ওরফে লাও চাঅঃ বিখ্যাত উপন্যাস 'রিক্সাওয়ালা'র লেখক। এই উপন্যাসখানিরও সফল বাংলা অনুবাদ* হয়েছে। এঁকে অনেকে মার্ক টোয়েন বা আর্নস্ট হোমিংওয়ের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। 'রিক্সাওয়ালা' ছাড়াও বহু বিদ্রূপাত্মক নাটক ও কবিতায় তাঁর রচনানৈপুণ্যের সুষ্ঠু পরিচয় পাওয়া যায়। মাদাম তিঙ লিঙ-এর 'সূর্যালোকে সানকান নদী', চাও শূ-লি-এর 'লি-পল্লীর নতুন রূপ' প্রভৃতি কৃষক-জীবনের অপরূপ চিত্র।

চাও শু-লি শুধু নতুন চীনের শক্তিশালী কথাশিল্পী ও নাট্যকার নন, চীনের সুপ্রসিদ্ধ প্রকাশ-ভবন 'সিনহুয়া প্রেস'-এর অন্যতম সম্পাদকও। শান্সির এক প্রাচীন পল্লীতে তাঁর জন্ম প্রায় ৫৫ বৎসর পূর্বে। নর্মাল স্কুলের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর যখন তিনি ছাত্র, দুর্নীতিপরায়ণ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার অপরাধে তিনি স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হন। তারপর থেকে চীনে জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ শুরু হওয়া পর্যন্ত সাধারণ স্কুল মাস্টার থেকে শুরু করে ভবঘুরের বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রা অতিবাহিত করেন তিনি। গত যুদ্ধের সময়ও জাপ অধিকৃত চীন ভূখণ্ডে শত্রু-লাইনের পশ্চাতে গেরিলা বাহিনীতে সক্রিয়

* অনুবাদ : অশোক গুহ, অগ্রণী বুক ক্লাব, কলিকাতা।

ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন একাধারে শাসনকর্তা, রাজনৈতিক কর্মী ও প্রচারকর্তা হিসাবে। 'সিনহুয়া প্রেসে' কর্মরত অবস্থাতেই সাহিত্য সৃষ্টির প্রতি তিনি ক্রমশ আকৃষ্ট হন। তাঁর সাত খণ্ড গল্প সংগ্রহ, পাঁচটি নাটক ও দুটি 'কু-সু' বা বর্ণাত্মক গাথা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। 'সেকেলে প্রথা' চাও শু-লি-এর *Rhymes of Li Yu-tsai and Other Stories* গল্প-সংগ্রহে একটি অনবদ্য কাহিনী। সমালোচকদের মতে, চাও শু-লি চীনের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা-লাভ করেছেন আজকে তাঁর খ্যাতি অর্জনের বহু পূর্বেই। স্বকীয় মৌলিক রচনা-বৈশিষ্ট্যে তিনি সত্যই অনন্য। সাধারণ মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ—অতি সাধারণ ঘটনাই তাঁর লেখার বিষয়বস্তু।

কৃষক জীবনের রস-সমৃদ্ধ সার্থক চিত্র অঙ্কন করেছেন ওয়াং লি, ওয়াং সি-চিয়েন, লি পো প্রভৃতি আরও অনেক কথাশিল্পী। বিশেষ করে লি পো'র 'ঝড়'-এর নাম এখানে করতে হয়। চাও মিং লিখিত নাটক 'লাল ঝাণ্ডার গান' ও 'ক্ষয়িষ্ণু শক্তি' উপন্যাস শ্রমিক জীবনকে প্রতিফলিত করেছে। কৃষক, শ্রমিক ও নয়াচীনের গণ-ফৌজের সৈনিকেরাও আজ সাহিত্যে ও ছায়াচিত্রে নিজ নিজ অভিজ্ঞতাকে শিল্প-সাহিত্যের মারফত রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রমিক তিয়েন চীন-এর লেখা 'চালকের জীবনী' এবং গণ-ফৌজের সৈনিক শী কোয়াং ইয়াং প্রণীত উপন্যাস 'জীবন্ত মানুষের দর্পণ'-এ।

পেশাদারী সাহিত্যিক ছাড়াও নয়া চীনে আরও দুই শ্রেণীর লেখক ও শিল্পী আছেন। এঁরা হলেন কৃষক, শ্রমিক ও সৈনিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত লেখকগোষ্ঠী আর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বা 'কালচারাল স্কোয়াডে'র সহিত সংশ্লিষ্ট লেখকবর্গ। তিয়েন চিন ও শী কোয়াং হলেন যথাক্রমে কৃষক ও সৈনিক স্কোয়াডভুক্ত নতুন চীনের নতুন লেখক।

কবিতা

শুধু কথা সাহিত্যে নয়, আধুনিক নাটক ও কাব্যেও কুও মো-জো, আই-চিঙ, শী ফ্যাঙ-য়ু, লি-তিয়েন-মিন, এমি সিয়াও প্রমুখ নতুন চীনের নতুন সাহিত্যের ঋত্বিকগণ গণ-মানসের জন্য সাহিত্য সৃষ্টির এই ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। চীনের আধুনিক কাব্য জগতে রাষ্ট্রনায়ক মাও-র স্থান বিশিষ্ট। মাও সে-তুঙ-এর কবিতার সহজ অনাবিল, নিরাভরণ সুর বাস্তবিক লক্ষ্য করবার। মহাচীনের ইতিহাস, ভূগোল, তার সাধারণ মানুষ আর লাল ফৌজই মাও-র কবিতার বিষয়বস্তু। অপূর্ব বাক্ সংযম তাঁর কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য। নীচে মাও-র কয়েকটি কবিতার অনুবাদ উৎকলন করা গেল :

'লাল জাফরান জরদা সবুজ নীল অতিনীল বেগুনি,
রঙের মেখলা হাতে ধ'রে ঐ হাওয়ায় নাচছে কে শুনি ?
বর্ষণান্তে আবার সূর্য অভঙ্গ,
তোরণ পাহাড় ঝলকায় নীলে কি রঙ্গ !

সে বছরে হল গুরুতর এক যুদ্ধ,
অগ্র গামের পাঁচিলে বুলেট রুদ্ধ।
সাজাও এবারে পাহাড় এই দেশ,
চতুর্দিকের রূপ দেখ আজ খোলে বেশ।'

['মাও ৎসে-তুং—আঠারোটি কবিতা' : বিষ্ণু দে]

মাও সে-তুঙ-এর এমনি আর একটি ইতিহাস বিজড়িত কবিতা : 'চাং-চেন' :

'লালফৌজ নির্ভীক দীর্ঘ দূর যাত্রা বহু বাধার,
অযুত ধারা হাজার চূড়া কিছুই নয় ভাবার,
পাঁচ শিখর পথের বাঁক ফেনিল নদী ছোট্ট ঢেউ বুঝি,
উ বিশতোয়া মুং পাহাড় মাটির ঢেলা লাফিয়ে হই পার,

তুঙ্গ শিলা তপ্ত, করে চিনশা স্রোত প্রহার,
তাতুর সাঁকো পথেই ঝোলে হিম শিকল লোহার,
আর তুষার শতযোজন মিন্ পাহাড়ে সুখী
গোটা ফৌজ পার হয়েছে হাসির হো হো সবার ॥'

['মাও ৎসে-তুং—আঠারোটি কবিতা' : বিষ্ণু দে]

মাও গীতিকাব্য রচনাতেও সমান সিদ্ধহস্ত। তাঁর রচিত নীচের এই গান কয়টিতে এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে।

এক*

লাউশান গিরিপথ

('য়ি চিন ও' গানের সুরে)

হিমেল পশ্চিমী বাতাস ;
দূরে উষার চাঁদের আলোয়
তুষার-শীতল বাতাসে বুনো হাঁস ডাকছে।
ভোরের চাঁদের আলোয়
ঘোড়ার খুরের প্রখর আওয়াজ আসছে।
বিউগল এখন স্তব্ধ ···।
তুমি বোল না, এই সুদৃঢ় গিরিপথে
ইস্পাত-কঠিন পাহারা
আজই আমরা কদমে কদমে এর চূড়ায় উঠবো,
চূড়ায় উঠবো।
আর তখন নীল পাহাড়গুলো মনে হবে
যেন প্রসারিত সমুদ্র
অস্তগামী সূর্যে মনে হবে রক্তের উজ্জ্বলতা ॥

* কোয়েকাউ-এর সুনয়ি প্রদেশের লুসান পর্বতমালায় একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। লাল ফৌজ ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে সুবিখ্যাত লং মার্চের সময়ে সুনয়ি প্রদেশ দখল করে এবং তার অল্প কয়েকদিন পর এই গিরিপথে প্রবেশ করে।

দুই*

হিউ চাউ

('চিয়াঙ পিঙলো' গানের সুরে)

এখুনি উষার নতুন আলো পুবের আঁধার ঘোচাবে
আর আমাদের অভিযান,
বোল না শুরু হল সময়ের পূর্বক্ষণে,
এই যে সবুজ পাহাড়ে পাহাড়ে পরিক্রমায়
আমরা এখনো হই নি স্থবির,
আর এখানের এই নৈসর্গিক শোভা অনন্যা।
সামনে হাওচাঙ-এর উঁচু পর্বতের দেওয়াল
সারি সারি ক্রমশ এগিয়ে চলেছে
পুব সাগরের দিকে,
আর আমাদের সেনারা অনিমেষ চেয়ে আছে
কোয়াঙতুঙের দিকে
ওই দূরে কী অপূর্ব নীল, আর কী সবুজ ॥

তিন**

টাপোটি

('প সা মান'-এর গানের সুরে)

লাল কমলা হলুদ সবুজ
আকাশি নীল আর বেগুনি ;
আকাশ-আঙিনায় কে নাচছে,
রঙের জাল বুনছে ?

* কিয়াঙসি-এর একটি দেশ। পূর্ব সীমান্তে ফুকিয়েন ও দক্ষিণ সীমান্তে কোয়াঙ তুঙ। ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে কবি লাল ফৌজের সঙ্গে এখানে আসেন ও দক্ষিণ কিয়াঙসি বিপ্লবী ঘাঁটির প্রতিষ্ঠা করেন।

** কিয়াঙসি বিপ্লবী ঘাঁটিতে থাইকিনের কাছে একটি জায়গা। ১৯৩০-এর শেষ থেকে ১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চিয়াং কাইশেক চার বার ব্যাপক আক্রমণ চালায় এর উপর। কিন্তু প্রতিবারই লাল ফৌজ তাদের হটিয়ে দেয়।

বৃষ্টির পরে অস্তমিত সূর্যের প্রত্যাবর্তন
আর সারি সারি পাহাড় আর গিরিপথ
নীল আস্তরণে ঢাকা।
এখানে একদিন ভীষণ উন্মাদ যুদ্ধ হয়েছিল,
গ্রামের দেওয়ালে বুলেট-দাগের হিসেব,
যেন মনে হয় শিল্পীর কারুকার্য,
আর এই সব পাহাড়
আজ মনে হয় আরো রমণীয়॥ [অনুবাদ : শ্যামসুন্দর দে]

এখানে আর একজন কবির নাম উল্লেখ না করলে নয়। তিনি হলেন ওয়েন ই-তো। তিনি ছিলেন চীনের বিখ্যাত ছিং-হোওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে চীনে যে 'নতুন সাহিত্যে'র গোড়াপত্তন হয় তার সঙ্গে ওয়েন ই-তো-র যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। যৌবনে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রভক্ত চীনের কবি সুচি-মো-র অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁরই পরিচালিত পত্রিকায় শুরু করেন কবিতা লিখতে। তারপর মধ্যবয়সে চীনা কবিতার প্রাচীন যুগের খুঁটিনাটি নিয়ে গবেষণাও করেন। জীবনের শেষের দিকে কবি ওয়েন বুঝতে পারেন, চীনকে অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে গড়ে তুলতে হবে এক নতুন ছেলেমেয়ের দল। তাই আসেন তাদের মাঝে নতুন সমাজ গড়বার প্রেরণায়। ১৯৪৬ সালে খুনমিঙে তাঁকে হত্যা করা হয়—বোধ হয় দেশকে আর নিজের দেশের ছেলেমেয়েদের ভালোবেসেছিলেন বলে! তখন তাঁর বয়স মাত্র আটচল্লিশ। কবি ওয়েন ই-তো-র দুটি কবিতা :

'তুমি সূর্যের দিকে হাত তুলে শপথ করেছিলে,
ডেকেছিলে শীতের বাজপাখিকে,
বলেছিলে তুমি ভক্ত, তুমি শুদ্ধ,
বেশ তো—আমি তোমায় বিশ্বাস করছি,

যদি মনের আবেগে কান্নার ফুল ওঠে ফুটে
তবু আমি অবাক হবো না।
সত্যি! তুমি কি-যে শপথ করলে
'যতদিন সমুদ্র না শুকোয়, পাথর না ক্ষয়ে যায়'
তাতে আরো হাসি পায়।
কেবল একটা ফুৎকারের অপেক্ষা।
এখনও কি আমি মাতাল হই নি?
আবার কি বলছো, 'চিরকালের জন্য'?
ভালোবাসা, জানো তুমি একটা নিশ্বাসের লোভ
আমার এখনও আছে,
এসো, তাড়াতাড়ি আমার মনটাকে ঘিরে ফেল,
তাড়াতাড়ি, তুমি চলো, তুমি চলো···
তোমার এই চালটা আমি আগেই ভেবেছিলুম
বদলও কিছু হয় নি
'চিরকালের জন্য', আগেই হয়তো অন্য কাউকে দিয়ে দিয়েছ,
আমার ভাগে খুদকুঁড়ো
অন্যে পেয়েছে তোমার বিচিত্র পাতার সমারোহ—
পরিপূর্ণ হাজার বসন্ত।
তুমি বিশ্বাস করছো না?
যদি একদিন মৃত্যুদূত দেখায় তোমার নামের সই
তখন যাবে না? যাও চলে যাও,
তার কোলে গিয়ে থাকো,
তার সঙ্গে বলো তোমার
'সমুদ্র না শুকায়, পাথর না ক্ষয়ে যায়'
শপথের কথা—
বুঝিয়ো তোমার শুদ্ধতা।'

[অনুবাদ : অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

॥ ২ ॥

'এক ঝাঁক বুনো হাঁস,
ভয় পেয়ে পার হয়ে গেল
আকাশগঙ্গা,
শীত-মরস্থমি হাঁসের এই দুঃখ
ওর হৃদয় যেন গেঁথে নিয়েছে,
'মানুষ, ওগো মানুষ' সে গুমরে ওঠে
'তুমি কোথায় ? কোথায় আমাকে ডাকছো ?'
ভয় জড়ানো এই গোধূলি,
ধেয়ে আসে ওর দিকে,
গভীর ব্যথার স্তূপ
থিতিয়ে আসে ওর হৃদয়ের মধ্যে,
'আকাশ, ওগো আকাশ', ও ডাকে,
তবে শেষে ? শেষে তবে এর অর্থ কি !'

কত দূরের পাড়ি,
রাত্রির মাঝে এই যাত্রা,
জীবনমরণের দেহলীতে দাঁড়িয়ে তার দ্বিধা,
'দুঃখ, দুঃখ,' সে ভাবে,
'চিরদিনের মতো আমার, চিরদিনের মতো
তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি !'

স্থির নিশ্চয় লিখে গেছে তার মুখে,—
নিশ্চয়তার সহজ ভাব—
হঠাৎ দোলনার মাঝে 'ওঁয়া',
বেজে ওঠে সাবধানের ঘণ্টা
'খোকারে, খোকা', সে ওঠে কেঁদে,
'আমি কি করছি ? কিসের স্বপ্ন দেখছি ?' '

[অনুবাদ : অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

আধুনিক চীনা কবিদের অন্যতম এমি সিয়াও 'নিখিল চীন লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে'র সক্রিয়া সদস্য। এঁর প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থগুলির 'শান্তির পথ' (*The Path of Peace*) আধুনিক চীনের কাব্যজগতে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। নীচের অনূদিত কবিতাটি ১৯৩৬ সালে রচিত। এমি সিয়াও-র কবিতাতেও নতুন চীনের সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার সুর বেজে উঠেছে। তাঁর 'প্রাচীন নগরীর বিলাপ' এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য।

'বসন্তে ॥

ফাল্গুনের দিনগুলি স্বচ্ছ, স্বাধীন ;
পুব দিকের তোরণ পেরিয়ে
মেয়েরা মেঘের মতন
নেমে এল ধীরে,
সোনারঙ অরিয়ল আর
সোয়ালোর গানের সুরে
অকাল বসন্তের আমন্ত্রণ ;
মেয়েরা যখন হাসে চটুল কথায়
উইলোর ঝুরিগুলি এলোমোলো ওড়ে।

গ্রীষ্মে ॥

এক খাড়াই প্যাগোডা সোজা মাথা তুলে
নীলনির্জনে নির্দেশরত ; সূর্যাস্তে
পাখিরা ফিরে যায় নিজের কুলায় ;
আমার অবাধ দৃষ্টি
সুদূর দিগন্তে মেশে—
নদী ও আকাশের মিলন-রেখায় ; যেখানে
নিস্তরঙ্গ জলে দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্গ জাহাজ।

শরতে ॥

দুপুরে চায়ের কিংবা মদের আড্ডায়
দিলখুশি লোকদের ভিড় জম্‌লে
চড়া সুর মেতে ওঠে দরাজ গলায়।
শরতের বল্‌গাহীন হাওয়ার ঝাপটায়
জিবের আগায় জাগে মাছের আস্বাদ।
আর, সীমান্তের ঘর-ফেরা সেনানীরা বুঝি
জড় হয় শান্ত মন্দিরের আঙিনায়।

শীতে ॥

ছিন্[১] দিনের মতন এই চাঁদ,
এই গিরিখাদ যেন হান্[২]-যুগের,
য়ু[৩]-যুগের সেই ঘাস, ফুলের বাহার,
সিন্[৪]-রুচি আজো আছে
পোশাক-আহারে ;
প্রস্ফুটিত প্লাম্‌ফুল অন্বেষণে বেরিয়ে
হিমকঠিন পথে পথে হেঁটে
প্রাচীন নগরী আমি
নবজন্মে বাঁচলাম। অথচ পাহাড়ে শত্রু !
তবে কী লড়াই ছাড়াই হব পরাধীন ?

[অনুবাদ : রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়]

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ চীন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে তাকে যেমন সমৃদ্ধতর করেছিলেন, আধুনিক চীন সাহিত্যের কর্ণধারগণ তেমনি চীনা ভাষায় রবীন্দ্র-কাব্য-সুষমা অনুবাদ

[১] ছিন্-যুগ : ২২১—২০৭ খৃঃ পূঃ ; [২] হান্-যুগ : খৃঃ পূঃ ২০৬—২২০ খৃষ্টাব্দ ; [৩] য়ু-যুগ : ২২২—২৮০ খৃষ্টাব্দ ; [৪] সিন্-যুগ ; ২৬৫—৩১৬ খৃষ্টাব্দ।

করে নিজেদের সাহিত্যের গৌরব বর্ধনও করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা', 'মালঞ্চ', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি বহু রচনা চীনা ভাষায় আজ অনূদিত হয়েছে। চীন-ভারতের ধ্যান-ধারণা ও সাংস্কৃতিক ঐক্যসূত্রের রাখি-বন্ধন করেছেন আরও দৃঢ়মূল।

একদা লু স্থন, কুও মো-জো আর মাদাম তিঙ লিঙ প্রমুখ সাহিত্য-সুরিগণ চীনের যে গণ-সাহিত্যের অভিযান শুরু করেছিলেন, তা আজ পূর্ণতা লাভ করেছে, নয়া চীনের কর্ণধার মাও সে-তুঙ-এর বিখ্যাত 'ইয়েনান ঘোষণা'য় (১৯৪২ সালে)। সাহিত্য ও শিল্পের আদর্শ সম্পর্কে তিনি ঘোষণা করেছেন: চীনের নতুন সাহিত্য ও শিল্প জনসাধারণের জীবনধারা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করবে। প্রয়াস পাবে প্রাচীন ও আধুনিক জীবন-দর্শনের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উন্নততর সাংস্কৃতিক আদর্শে পৌঁছুতে। নতুন চীনের নতুন সাহিত্য আজ মাও সে-তুঙ-এর সেই বাণীই বহন করে চলেছে আশা ও উৎসাহ ভরা মানব-মুক্তির সহায়ক সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টির জয়যাত্রার পথে।

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

হার্বার্ট গুডরিচ : জেমস্ অফ চায়নীজ লিটারেচার
ডাঃ লিন ইউ-ত্যাঙ : মাই কান্ট্রি এ্যাণ্ড মাই পিপ্‌ল্‌স
দি উইসডম অফ চায়না এ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া
চোও য়্যাঙ : চায়নাস্ নিউ লিটারেচার এ্যাণ্ড আর্ট
মাও সে-তুঙ : অন আর্ট এ্যাণ্ড লিটারেচার
আর্থার ওয়েলি : চায়নীজ পোয়েম্‌স
রেউই ওলি : পিস থ্রু দি এজেস (চীনা কবিতার ইংরেজী অনুবাদ)
'চায়নীজ লিটারেচর,' জানুয়ারী, ১৯৫৯
বিনয়কুমার সরকার : চীন সভ্যতার অ, আ, ক, খ

মঙ্গোল সাহিত্য

'দশ হাজার 'লি' পথের নিশান দিচ্ছো তুমি ?
আমরা তো প্রায় এসেই গেছি
শীতের কামড় নাইকো যেথা ;
যদি বাঁচি, যদিই মরি,
এখন তাতে আসে কিবা ?
যেথায় আমায় উড়িয়ে নেবে সেথায় যাবো !'

উত্তর চীনের ঝড়ো এক শীতার্ত রাত্রি ; তুষারাচ্ছন্ন তিয়েনসান পাহাড়ের সানুদেশ দিয়ে যেতে যেতে আশাহত সৈনিকদের প্রাণে নব প্রেরণার বাণী মূর্ত হয়ে উঠেছে উপরের ঐ পংক্তি কয়টিতে।

অথবা-

'আমাদের চিরেক নদী
বয়ে চলেছে তরতরিয়ে কালো পর্বতের
নীচ দিয়ে,
যেখানে আকাশ দেখায় তাঁবুর
ঢালু গায়ের মতো,
ছড়িয়ে আছে যা খাড়া তৃণভূমি ছেয়ে
ধূসর আকাশ—ধূসর বরণ
আর তৃণভূমি বিস্তীর্ণ বিপুল,
ঘাসের উপর দিয়ে খেলে যায় দমকা হাওয়া
চড়ে বেড়ায় মেষ মনের আনন্দে।'

স্বদেশের তৃণভূমির জন্য দূর-বিদেশে পড়ে থাকা রণক্লান্ত যাযাবর যোদ্ধার কাতর আকুলতা। পদদলিত চীন সাম্রাজ্যের সুরম্য প্রাসাদ, সুদৃশ্য রাজপথ আর রাজধানীর বিপুল আকর্ষণের চাইতেও বুঝি আলতাই উপত্যকার সহজ গোচারণভূমি, পার্বত্য অঞ্চলের ঠাণ্ডা নিষ্করুণ হাওয়া আর উদার উদাত্ত আকাশ শ্রেয়। বিজয়ী যোদ্ধা চেঙ্গিস খাঁ-র যাযাবরী মন তাই 'কুরিলতাই'-এর জন্য—স্বদেশের পর্বত কন্দরের জন্য—উড়ু উড়ু!

'কুরিলতাই'-এ সম্রাট চেঙ্গিস খাঁ-র রাজধানী নির্মিত হলে অনুগত বহু সামন্ত রাজা, সেনাপতি আর যোদ্ধা এসে সমবেত হয়েছিল সেই প্রতিষ্ঠা উৎসবে। উঁচু পাহাড়ের গায়ে তাঁর তাঁবু থেকে নীচের অভ্যাগতদের দেখে নিরক্ষর চেঙ্গিস খাঁ নাকি বলে উঠেছিলেন :

> 'আমার তীরন্দাজ আর যোদ্ধাদের দূর থেকে দেখে যেন মনে হয় নিবিড় অরণ্যের সারি সারি কালো গাছ। আমার সাধ যায় সুমিষ্ট শর্করা উপহার পাঠিয়ে তাদের সকলের মিষ্টি মুখ করাতে, নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ আর যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম পাঠাতে, পার্বত্য নদী থেকে সুমিষ্ট জল নিয়ে এসে তাদের পান করাতে, তাদের চতুষ্পদ জন্তুদের পেট পুরে ঘাস খাওয়াতে। এ আমার কর্তব্যও।'

নির্মম, নিষ্করুণ, নৃশংস যোদ্ধার কঠিন হৃদয় বুঝি সেদিন অনুগত স্বজনদের সুখ-সুবিধা বিধানের জন্য বিগলিত হয়ে উঠেছিল বিজয়ী যোদ্ধার চরিত্রের উপেক্ষিত একটা দিক উদ্ঘাটিত করে।

চুরি করা ছিল মহা অপরাধ। চেঙ্গিস খাঁ-র 'নির্দেশ-নামা'তে তাই লিখিত আছে :

> 'যদি কেউ চুরি করে কারও কোনো ঘোড়া বা অনুরূপ মূল্যবান কোনো দ্রব্য, তবে তাকে দণ্ডিত করা হবে মৃত্যুদণ্ডে। দেহ তার করা হবে দ্বিখণ্ডিত। আর যারা ছিঁচকে চোর, তাদের বেলায় দণ্ডাজ্ঞা হবে কিছুটা হ্রাস—অপহৃত দ্রব্যের অনুপাত ৭, ১৭, ২৭ থেকে ৭০০ ঘা বেতের ব্যবস্থা। কায়িক শাস্তি

মকুফ হতে পারে যদি দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি অপহৃত দ্রব্যের নয় গুণ ক্ষতিপূরণ করতে প্রস্তুত থাকে।'

এই হলো সম্রাট চেঙ্গিস খাঁ-র বিধান। কিন্তু একদা তারও হলো ব্যতিক্রম। আরগুন ছিলেন খাঁ-দের প্রিয় গায়ক। কিন্তু তিনি ছিলেন দারুণ মদিরাসক্ত। সোনামোড়া একটি বাদ্যযন্ত্র একদিন তিনি চেয়ে এনেছিলেন সম্রাটের দরবার থেকে। তারপর যা হয়—সুরার মাত্রাধিক্যে সম্রাটের প্রিয় বাদ্যযন্ত্রটি বিকিয়ে দিতে একটুও ইতস্তত করলেন না এই খেয়ালী গায়ক। তাই শুনে চেঙ্গিস খাঁ তো রেগে আগুন। আজ্ঞা দিলেন আরগুনের মৃত্যুদণ্ডের। আর এ আজ্ঞা প্রতিপালন করতে পাঠালেন দুই দুইজন ভয়ংকর-দর্শন 'কিয়াং' অনুচরকে। আরগুনের তাঁবুতে এসে দেখে বেচারা তখন মদে বেহুঁশ আর গেয়ে চলেছেন আপন মনে। আরও খানিকটা মদ খাইয়ে দিয়ে ওরা তাঁকে সম্রাটের সামনে হাজির করলে।

চেঙ্গিস খাঁকে দেখে আরগুন না কি তখন গেয়ে উঠলেন :

'তিঙ-তাঙ সুরে বুলবুল পাখি গেয়ে চলেছে আপন মনে; এমন সময় ঝাঁপিয়ে পড়ল এক বাজপাখি তার উপর। গান তার হলো না শেষ। আমার উপরও পড়েছে প্রভুর রোষনেত্র। হায়, সুরার পেয়ালায় মেতে গিয়েছিলাম। নইলে আমি কি চোর ?'

আরগুনের এ গানই দিলে তাঁকে বাঁচিয়ে। রসজ্ঞ চেঙ্গিস খাঁ সেবার তাঁর প্রাণদণ্ড করেছিলেন মকুফ।

এমনি ধারা আর একটি কাহিনী :

'ই-লিয়ু চুৎসাই নামে এক বৃদ্ধ চীনা দার্শনিক ছিলেন চেঙ্গিস খাঁ-র সহচর। যুদ্ধ-বিগ্রহ উপলক্ষে যেখানেই তিনি যেতেন সঙ্গে নিতেন এই দার্শনিক পণ্ডিতবরকে। যুদ্ধান্তে অপর সৈন্য-সামন্তরা যখন লুণ্ঠন ও পরদ্রব্য অপহরণে লিপ্ত থাকত, এই বৃদ্ধ তখন রাজ্যের যত দর্শন, চিকিৎসা আর জ্যোতিষ-শাস্ত্রের পুরনো

পুঁথি সংগ্রহ করে বেড়াতেন। আর এঁকে রাখতেন সম্রাটের জয়-যাত্রার পথ। তা লক্ষ্য করে এক পারিষদ একদিন বুঝি বলে উঠেছিল : 'মিছি মিছি কেনই বা এঁদের এখানে নিয়ে আসা ?'

কথাটা বৃদ্ধ দার্শনিকের কানেও পৌঁছুল। তিনি একটু বিজ্ঞের হাসি হাসলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন : 'যুদ্ধের সময় ধনু তৈয়ারি করতে কারিগরের যেমন হয় প্রয়োজন, তেমনি যুদ্ধান্তে প্রয়োজন এমনি সব পুঁথি-পত্রের। আমি তাই এ সব সংগ্রহ করে বেড়াই।'

এমনি ধারা মুখে মুখে প্রচলিত নানান দেশজ কাহিনী, খোশগল্প, শিলালিপি আর লোক-গীতি নিয়ে সেকালের মঙ্গোল সাহিত্যের সূত্রপাত।

চেঙ্গিস খাঁ

মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ এই যাযাবর জাতির কাহিনী সত্যই ইতিহাসের এক বিস্ময়। বৈকাল হ্রদের দক্ষিণে শীতার্ত পার্বত্য অঞ্চলে বাস এই সব রুক্ষ প্রকৃতি তাঁবুচারীদের। মেষপালন আর বন্যজন্তু শিকারই ছিল তাদের পেশা। মঙ্গোলিয়ার এই যাযাবরগণ যেমন ছিল বলিষ্ঠ তেমনি কষ্টসহিষ্ণু। কিন্তু মঙ্গোলদের সামরিক অভিযানের সাফল্য তাদের শারীরিক শক্তি ও কষ্টসহিষ্ণুতার দরুন ততখানি নয়, যতখানি নেতাদের পরিচালন নৈপুণ্যে।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে মঙ্গোল যাযাবরদের নেতা ছিলেন চেঙ্গিস খাঁ। অসামান্য ক্ষমতাশালী ছিলেন এই চেঙ্গিস খাঁ। ১১৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। আসল নাম ছিল তিমুচিন। শৈশবেই পিতা ইয়েসুগি বাগাতুরের ('বাগাতুর' মানে মঙ্গোল ওমরাহ বা বীর। 'বাগাতুর' থেকে উর্দু শব্দ 'বাহাদুর' এসেছে বলে পণ্ডিতদের ধারণা) মৃত্যু হয়। শৈশবে জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আপন প্রচেষ্টায় চেঙ্গিস খাঁ ক্ষমতার আসনে অধিরূঢ় হন। মঙ্গোলদের জাতীয় সমিতি কর্তৃক

তিনি 'কেগান' বা সর্বশ্রেষ্ঠ খান মনোনীত হন। [এই নির্বাচনের কথা চীন দেশে ত্রয়োদশ শতকে লিখিত এবং চতুর্দশ শতকে প্রকাশিত 'মঙ্গোল জাতির গুপ্ত ইতিহাস' পুস্তকে উল্লেখ রয়েছে।*]

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে চেঙ্গিস খাঁ-ই প্রথম ভুঁইফোড় এই সব বন্য উপজাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে অজেয় এক সামরিক শক্তিতে পরিণত করেন। তাঁর প্রথম শিকার হয় প্রতিবেশী তাতার উপজাতি। চীনের 'কিন্ রাজ-বংশে'র তখন মুমূর্ষ অবস্থা। চীন হয় মঙ্গোলদের দ্বিতীয় বলি। ১২১৪ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিস খাঁ পিকিং আক্রমণ করেন। দক্ষিণাংশের এক রাজ্য ভিন্ন সমগ্র চীন নেন তিনি কুক্ষিগত করে। চেঙ্গিস খাঁ-র বৈজয়ন্তী বাহিনী এবার হলো পশ্চিম-মুখো। দুর্বার তার গতিধারা। অফুরন্ত তার প্রাণশক্তি আর সৈন্যবল। নিতান্ত দুঃস্বপ্নের মতো অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে একে একে তারা গ্রাস করে নিতে লাগল তুর্কিস্তান, পারস্য আর দক্ষিণ রুশিয়ার কিয়েভের গ্র্যাণ্ড ডাসির খাস মসনদ। ১২২৭ সালে চেঙ্গিস খাঁ-র মৃত্যুকালে বিশাল মঙ্গোল সাম্রাজ্য তখন আমুদরিয়া আর পীত সাগরের উপকূলভাগ থেকে শুরু করে সুদূর পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

এখানেই শেষ নয়। তাঁর বংশধর ওগ্‌লাই খাঁ, হলাগু আর সুবিখ্যাত কুবলাই খাঁ-র আমলে পূর্ব ইয়োরোপের জর্জিয়া, আর্মানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, পোলাণ্ড ও সমগ্র রুশিয়া এবং সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্য পর্যুদস্ত হয় বারবার মঙ্গোলীয় শাণিত তরবারির মুখে। কুবলাই খাঁ-র রাজত্বকালেই চীন সাম্রাজ্যে ভেনিস দেশের সুবিখ্যাত পর্যটক মার্কো পোলোর হয় আগমন। ১২৮০ খৃষ্টাব্দে কুবলাই খাঁ সুঙ-বংশীয় সম্রাটদের পরাস্ত করে চীন-বিজয় সম্পূর্ণ করেন এবং পিকিং-এ য়ুয়ান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৬৮খৃঃ পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য বিদ্যমান ছিল। তিনি কেবল সুনিপুণ যোদ্ধাই ছিলেন না, সাহিত্য ও শিল্পকলার একজন প্রকৃত সমঝদারও

* জওহরলাল নেহরু : গ্লিমসেস্ অফ ওয়ার্ল্ড

ছিলেন। তাঁরই নির্দেশে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় চীন সাহিত্যে উপাখ্যান-উপন্যাস আর নাটক রচনা প্রথম প্রচলিত হতে থাকে। পেশাদার লেখকরা মঙ্গোল রাজাদের পক্ষপুটে বাস করে রোমাঞ্চ উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। নাট্যকাররা 'পুতুল নাচ' ছেড়ে সত্যিকারের বীর রসাত্মক নাটক লিখতে উদ্যোগী হলেন। 'সান কুও চি' বা তিন রাজ্যের রোমান্স, 'শূই হূ চুয়ান' বা সব মানুষই ভাই ভাই কিংবা 'চাও-এর অনাথ বালক' প্রভৃতি উপাখ্যান-নাটক চীন সাহিত্যে মঙ্গোল (মাঞ্চু) সাহিত্য ও সংস্কৃতির বলিষ্ঠ স্বাক্ষর আজিও বহন করছে।

সাংস্কৃতিক ঐক্য

বহির্মঙ্গোলিয়া, অন্তর্মঙ্গোলিয়া ও বৈকাল হ্রদের পূর্ববর্তী বুরিয়াৎ রিপাব্লিক প্রভৃতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে মঙ্গোলরা আজ ছড়িয়ে থাকলেও নিজেদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য ও ভাষাসমূহের সামঞ্জস্য বিদ্যমান রয়েছে। 'চক্রবর্তী', 'দেবাদিদেব' ও 'আর্য' উপাধিধারী সম্রাট চেঙ্গিস খাঁ-ই ১২০৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম মঙ্গোল-লিপির প্রবর্তন করেন। মঙ্গোল সাহিত্যের প্রকৃত গোড়াপত্তন হয় তাঁর হাতেই। ১২২৫ খৃষ্টাব্দে প্রাপ্ত চেঙ্গিস খাঁ-র শিলালিপিতে প্রথম মঙ্গোল ভাষার উল্লেখ দেখা যায়।

সম্রাট কুবলাই খাঁ-র আমলে মঙ্গোল ভাষা আরও অধিক উন্নতি লাভ করে। চীনের মাঞ্চুরাও মঙ্গোল-লিপি গ্রহণ করেছিল। পরবর্তী দীর্ঘকাল ধরে মঙ্গোলিয়ায় এই লিপির প্রচলন ছিল। বিংশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ পাদেই কেবল বুরিয়াৎ-মঙ্গোল ও বহির্মঙ্গোল সরকারী ভাষারূপে রুশ-লিপি গ্রহণ করে। কাজেই দেখা যায় মঙ্গোল ভাষায় তুর্কী ও মাঞ্চু ভাষার সংমিশ্রণ রয়েছে।

শুধু তাই নয়, ভারতীয় মাত্রেই হয়তো আশ্চর্য বোধ করবেন যে, মঙ্গোল বাক্যের গঠনবিধি অনেকটা হিন্দীরই অনুরূপ। এবং বৌদ্ধ 'কাঞ্জুর' ও 'তাঞ্জুর' সাহিত্যের বিপুল প্রভাব সেকালের মঙ্গোল সাহিত্যে

দেখা যায়। বহির্মঙ্গোলিয়ার 'খালখা' ও অন্তর্মঙ্গোলিয়ার 'অর্দোস' ও 'চাহার' প্রভৃতি কথ্য ভাষায় বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার উপাখ্যান ও নীতি-গল্পের বহু উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে। দণ্ডীর 'কাব্য দর্পণ' ও পাণিনির 'ব্যাকরণ' ছাড়াও সংস্কৃত ভাষার বহু শব্দের প্রচলন যেমন মঙ্গোল সাহিত্যের অনেক স্থলে দেখা যায় তেমনি বহু মঙ্গোল শব্দও যথা 'লাল বাহাদুর', 'দারোগা' প্রভৃতি ভারতীয় সাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে।

এই সম্পর্কে 'ইন্দো-মঙ্গোল কালচারাল সোসাইটি'র সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর রঘুবীর, এম. পি. কর্তৃক সঙ্কলিত 'সংস্কৃত-মঙ্গোল অভিধান' ও 'মঙ্গোল-সংস্কৃত অভিধান' দ্রষ্টব্য। ডাঃ রঘুবীর সম্প্রতি বহির্মঙ্গোলিয়া ও অন্তর্মঙ্গোলিয়া পরিদর্শন করে ভারত ও মঙ্গোলিয়ার সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত সম্পদের ব্যাপক তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন।

মঙ্গোল ভাষা আলতাই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব মঙ্গোলিয়ার 'খালখা', পশ্চিম মঙ্গোলিয়ার 'কাল্‌মুক' আর 'বুরিয়াতিক'—এই তিন উপভাষাই প্রধানত তার অঙ্গ। মঙ্গোল দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই বৌদ্ধ-লামাপন্থী; কিছু কিছু মুসলমানও আছেন আর বুরিয়াতির বাসীন্দাদের অনেকে এখনও প্রাচীন 'সামনি' ধর্মে বিশ্বাসী।

প্রচলিত পুরাতন উপকথা ('চেঙ্গিস খাঁ-র ঢিলে জামা', 'চেঙ্গিস খাঁ-র সহ-নায়কের সঙ্গে দরিদ্র বালকের বিবাদ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য) আর উপাখ্যান নিয়ে যে সাহিত্যের হাতেখড়ি, তাকে পূর্ণাঙ্গীন করে তোলে প্রতিবেশীদের সমৃদ্ধতর সাহিত্য। চীনা উপাখ্যান আর তিব্বতী বৌদ্ধ উপকথা (সিদ্ধিকু) ছাড়াও খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী থেকে বহু বিদেশী গ্রন্থ মঙ্গোল ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। অনুবাদই ছিল তখনকার সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ। সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্র', 'বত্রিশ কাষ্ঠপুত্তলিকা', 'বিক্রমাদিত্য ও বেতাল ভট্টের কাহিনী'ও চীন বা তিব্বতী ভাষার মারফত অনূদিত হয় মঙ্গোল ভাষায়। সপ্তদশ শতকে রচিত পূর্ব মঙ্গোলিয়ার ইতিহাস 'সেনাঙ সে-ৎজেন' ও

'আলতাই তোরচি' প্রভৃতি গ্রন্থ জনপ্রিয়তা অর্জন করে ঘরে ও বাইরে অনেকের নিকট। 'উলিজার উন দালাই' (উপমা সমুদ্র), 'ঘেসার খাঁ-র বীরত্ব কাহিনী' অথবা 'জঙ্গীরিয়া'দের কাব্যগাথা সেকালের এমনি ধারা জনপ্রিয় গ্রন্থ যার রুশ আর জার্মান অনুবাদ রসিক সমাজে আজও সমাদৃত।

সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে চীন সাম্রাজ্যের বহু চীনা ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজও মাঞ্চু বা মঙ্গোল ভাষায় অনুলিখিত হয়। মাঞ্চু ভাষায় মৌলিক গ্রন্থের মধ্যে 'নীতিশাস্ত্র শিক্ষার্থী শাসনকর্তাদের নিকট সম্রাটের বক্তৃতা'ই (১৬৫৫ খৃঃ) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাতারদের নিয়ে লিখিত পুস্তকের সংখ্যা বেশী না হলেও, 'অষ্ট পতাকার উৎপত্তি কথা' বা 'পরবর্তী বংশধরদের দর্পণ' (জালান জালান-ই হাফু পুলেবু) প্রভৃতি ঐতিহাসিক পুস্তকে তাদের জীবনধারার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। মঙ্গোলদের যুদ্ধ ও শাসন সংক্রান্ত বিষয়ের বিবরণ পাওয়া যায় 'কালকাই জুলিমবি চুগাই গোসা'তে। অষ্টাদশ শতকে উপমা, প্রবাদ আর আলোচনামূলক বহু সংকলন পুস্তক মাঞ্চু বা মঙ্গোল ভাষায় প্রকাশিত হতে থাকে। তারপর থেকে দীর্ঘকাল মাঞ্চু বা মঙ্গোল ভাষায় পুস্তক প্রকাশের কদর কমে আসে অনেক পরিমাণে। তার স্থান অধিকার করে সুসমৃদ্ধ চীন সাহিত্য, ফলে দেশজ মঙ্গোল সাহিত্যের সঙ্গে অপর দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ব্যাহত হয়ে ওঠে।

লোক-কাহিনী

মঙ্গোলীয়-ওইরাৎ (কাল্‌মুক) ভাষায় সুপ্রাচীন কাল হইতে 'জাদু-মৃতদেহ' নামে কতকগুলি লোক-কাহিনী-সংগ্রহ প্রচলিত ছিল। এই গল্পগুলির সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় লোক-কাহিনী 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'র আশ্চর্য মিল দেখা যায়। 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'তে রাজা বিক্রমাদিত্য প্রত্যেক বার একটি মৃতদেহ বহন করে আনেন এবং সেই মৃতদেহ ভর

করে বেতাল তাঁকে একটি করে গল্প শোনায় ও গল্পের শেষে একটি প্রশ্ন করে; বিক্রমাদিত্য প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে তাঁর কার্যোদ্ধার করেন এবং রোমাঞ্চ অভিযানে জয়লাভ করেন। এই কাহিনীর মঙ্গোলীয় রূপান্তর 'জাদু-মৃতদেহ'তেও অনুরূপভাবে রাজপুত্র আমুগুলাং-এদ্‌লেগ্‌চিকে তাঁর গুরু নাগার্জুনের নির্দেশে একটি ভৌতিক মৃতদেহ বহন করে আনতে দেখা যায়। মৃতদেহটি মঙ্গোল রাজপুত্রকে যেসব গল্প বলে, সেগুলির নাম-ধাম-চরিত্র-পরিবেশ ইত্যাদি মঙ্গোলীয় পরিবেশে রূপান্তরিত হয়ে গেলেও, বেতাল-পঞ্চবিংশতির সঙ্গে তাদের অনেকখানি সাদৃশ্য আছে।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ থেকে তিব্বতের মধ্য দিয়ে মঙ্গোলিয়া হয়ে চীন পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব বিস্তারের কথা পূর্বেই কলা হয়েছে। সমগ্র বৌদ্ধ-জগৎ জুড়ে যেসব ভারতীয় পণ্ডিতের খ্যাতি প্রচারিত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে মহাপণ্ডিত নাগার্জুন অন্যতম। বেতাল-পঞ্চবিংশতির এই কাহিনীগুলি তিব্বত হয়ে মঙ্গোলিয়ায় গিয়ে পৌঁছায় এবং সেখানে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বৌদ্ধ গুরু নাগার্জুনের নাম এর সঙ্গে যুক্ত থাকায় কালক্রমে মঙ্গোলীয় পরিবেশে রূপান্তরিত হয়ে এগুলি মঙ্গোলদের জাতীয় লোক-কাহিনী হিসাবে পরিগণিত হয়।

বিশিষ্ট সোভিয়েত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ বোরিস ভ্লাদিমির্‌ৎসফ একটি প্রাচীন ওইরাৎ (কাল্‌মুক) পাণ্ডুলিপি থেকে ১৯২২ সালে এই লোক-কাহিনীগুলি রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন এবং এই রুশ সংস্করণের ভূমিকা হিসাবে তিনি একটি মূল্যবান ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধও লেখেন। তাঁর মতে, মোটামুটি সপ্তম শতাব্দীতে এই গল্পগুলি ভারত থেকে তিব্বতের মধ্য দিয়ে মঙ্গোলিয়ায় পৌঁছায়। তিব্বতী কথকরা তাঁদের সামাজিক রীতিনীতি ও শ্রোতাদের রুচি অনুযায়ী এই গল্পগুলির কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। পরে মঙ্গোলীয় কথকরাও একই কারণে আরও কিছু রদ-বদল করেন।

বোরিস ভ্লাদিমিরৎসফ উত্তর-পশ্চিম মঙ্গোলিয়ায় একজন ওইরাৎ রাজন্যের নিকট থেকে এই পাণ্ডুলিপিটি ক্রয় করেন এবং ১৯২২ সালে ইহার রুশ অনুবাদ প্রকাশ করেন। সম্প্রতি মস্কোর প্রাচ্য-সাহিত্য প্রকাশন ভবন থেকে এই রুশ অনুবাদটি পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু আশার কথা, রুশ বিপ্লবের ঢেউ মঙ্গোলিয়ার উত্তুঙ্গ গিরি-কান্তারে আর তৃণভূমিতেও এসে ছড়িয়ে পড়ে। আজ মঙ্গোলিয়াতে 'মঙ্গোল রিপাবলিক' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গোল সংস্কৃতি ও সাহিত্য নতুন করে গড়ে উঠবার পেয়েছে সুযোগ ও সুবিধা। সমকালীন মঙ্গোল সাহিত্যে আজ নব জীবনের জয়গান। জনসাধারণের জীবনধারাই তাতে প্রতিফলিত—তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাই হয়ে উঠেছে মূর্ত। রুশ, চীন, জাপান, ভারত, ইন্দোনেশীয়া, তুর্কী, ইরান প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সম্পদ আজ যেমন নতুন এই জনসাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করে তুলছে, তেমনি তার দাসদরজিন নাৎতাদ্গরজ, সদিন দামসিনসোওরেন, বি. রেনচিন, ডি. সেনঘি ও সেভেগ্মিড্ প্রমুখ যশস্বী কবি ও কথা-শিল্পীরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাকে নতুন মর্যাদায়। আর এশিয়া ও ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক রাখি-বন্ধন করে তুলেছে দৃঢ়মূল।

॥ গ্রন্থ-পঞ্জী ॥

এল. ফরব্যাথ : দি নিউ মঙ্গোলিয়া (১৯৩৬); জি. গিলমোর : এমং দি মঙ্গোলস (১৮৮৮); এ. সি. ঝাপিকৃকা : এবরিজিন্যাল্ সাইবেরিয়া (১৯১৪); এল. এইচ. ডি. বাক্সটন : দি পিপ্ল্স অফ এশিয়া (১৯২৫); চায়না—দি ল্যাণ্ড এ্যাণ্ড দি পিপ্ল্স (১৯২৯); ডাঃ রঘুবীর : সংস্কৃত-মঙ্গোলীয় অভিধান।

তিব্বতী সাহিত্য

আশ্চর্য কিংবদন্তীর দেশ এই তিব্বত !

তুষারময় তার পরিবেশের মতো তার প্রাচীন ইতিহাসও রহস্যময়। প্রবাদ আছে : একজন ভারতীয়ই সর্বপ্রথম তিব্বতে রাজ্য স্থাপন করেন। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিব্বতের ভারতীয় এই প্রথম সম্রাট নহ্-থি-ৎসন্‌পো (Nya-Tri-Tsen-po)। তাঁর ভারতীয় নাম যে কি ছিল, পণ্ডিতদের পুঁথিতে তার উল্লেখ নেই। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ছিলেন নাকি তাঁর পিতা। তিনি ছিলেন রাজা প্রসেনজিতের পঞ্চমপুত্র। কিম্ভূতকিমাকার হয়েই তিনি নাকি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গায়ের রং ছিল তাঁর তুর্কীদের মতো কটা, ভুরু জোড়াটি নীল, চোখ দুটি খুদে খুদে—কোটরে বসা ; আর হাতের আঙুলগুলি ছিল অস্বাভাবিক রকমের। জলচর প্রাণীদের মতো সরু চামড়ায় পরস্পর সংযুক্ত। সদ্যজাত রাজপুত্রের মুখেও ছিল পুরো দু-পাটি দাঁত। রাজা প্রসেনজিৎ পুত্রকে দেখেই ভাবলেন অলুক্ষণে ! রাজ্যের অমঙ্গলের আশঙ্কায় রাজপুত্রকে তিনি তাই গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে এলেন এক তামার পাত্র করে। রাজপুত্র এদিকে ভেসে চললেন গঙ্গার বুকে। এক কৃষাণ তাঁকে দেখতে পেয়ে বাড়ি নিয়ে আসে আর বড় করে তোলে আপন ছেলের মতো করে।

রাজপুত্র এদিকে বড় হয়ে উঠলেন। একদিন পালিত পিতার মুখে আপন জন্মবৃত্তান্তের কথা শুনে মনে বুঝি তাঁর দুঃখ হলো। প্রতিজ্ঞা করলেন : 'রাজার ঘরে জন্মেছি, যদি রাজা হতে পারি তবে এ জীবন রাখব ; নতুবা নয়।'

এই বলে রাজপুত্র চিরতুষারময় 'কংগ্রি' বা হিমালয় পর্বতের দিকে চললেন। আর চেন-রে-সি বা অবলোকিতেশ্বরের অনুগ্রহে দুস্তর হিমালয় পর্বত অতিক্রম করে তিব্বতে এসে উপস্থিত হলেন। তিব্বত মালভূমির অপূর্ব শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে রাজপুত্র যখন নীচে অবতরণ করছিলেন তখন স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে ঘিরে ধরল। তাঁর মহিমান্বিত অবয়ব দেখে পরিচয় জিগ্যেস করতে লাগল। বালক রাজপুত্র তিব্বতীদের ভাষা জানতেন না। কিন্তু আকার-ইঙ্গিতে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, তিনি হলেন রাজার ছেলে। তিব্বতীরা তাঁকে উপর থেকে নীচে নামতে দেখেছিল। সুতরাং তারা তাঁকে দেবতা বলে মনে করলে। আর সবাই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে মেনে নিল দেশের রাজা বলে। কাঠের এক আসনে বসিয়ে কাঁধে করে নতুন রাজাকে নিয়ে গেল রাজ্যের মধ্যে। কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিল বলেই নতুন রাজার নাম হল নহ্-থি-ৎসন্‌পো।

প্রথম সম্রাট নহ্-থি-ৎসন্‌পোর উত্তরসাধক নাম-রি-সং-ৎসেন-এর (মৃত্যুঃ ৬৩০ খৃঃ) আমলে তিব্বতীদের প্রথম পরিচয় ঘটে গণিত আর চিকিৎসা শাস্ত্রের সঙ্গে চীনের দৌলতে। দেশের কৃষি ও বাণিজ্য সম্পদের উন্নতিও হয় এ সময়ে। রাজ্যের সমৃদ্ধি এমনি বেড়ে ওঠে যে শোনা যায়ঃ জলের পরিবর্তে চমরি গাইয়ের দুধ আর সিমেন্ট দিয়ে রাজ-প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন রাজা নাম-রি-সং-ৎসেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র স্রোন্-ৎসন-গম্পো (Strong-Tsan-gampo : খৃঃ ৬৩৭—৬৯৩) আমলে বর্তমান লাসা নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিতও। তিনি সংস্কৃত, চীন আর নেবারী (নেপালী) ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ইতিপূর্বে তিব্বতের নিজস্ব কোনোরূপ 'লিখন-প্রণালী-সংবলিত-ভাষা' ছিল না। তিব্বতীরা বিদেশী ভাষায় নিজেদের কাজ-কারবার চালাত। রাজা স্রোন্-

---

* *Encyclopaedia Britannica*—11th Edition ও 'বিশ্বকোষ' দ্রষ্টব্য।

ৎসন-গম্পো দেখলেন, লিখিত ভাষা ছাড়া রাজকার্য বা ধর্মপ্রচার চলে না। তাই তিনি থোন্-মি সম্ভোট (Ton-mi Sambhota) নামে এক পণ্ডিতের নেতৃত্বাধীনে একটি প্রতিনিধিদলকে ভারতে পাঠালেন সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভের জন্য। বলা বাহুল্য স্রোন্-ৎসন-গম্পোর আমলেই তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রথম তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলে।

'উ চন'

পণ্ডিত থোন্-মি সম্ভোট কাশ্মীরে এসে ভারতের পণ্ডিতদের নাকি স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকন দিয়ে ভারতীয় লিখন প্রণালী আয়ত্ত করেন এবং সংস্কৃত লিপি অবলম্বনে তিব্বতী উচ্চারণানুসারে নতুন এক বর্ণমালার উদ্ভাবন করেন। নতুন এই বর্ণমালার নাম 'উ চন'। 'উ চন' বর্ণমালায় ৩০টি ব্যঞ্জনবর্ণ ও ৫টি স্বরবর্ণ ছিল। সম্ভোট ও তাঁর সহকর্মীরা পালি ভাষা শিক্ষা করে বহু বৌদ্ধ প্রবচন ও রহস্যগ্রন্থ পাঠ করেছিলেন বলে জানা যায়। দেশে ফিরে গিয়ে এঁরাই প্রথম তিব্বতী ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। রাজা স্রোন্-ৎসন-গম্পোর পৃষ্ঠপোষকতায় এমনি করে তিব্বতে প্রথম নতুন অক্ষরমালার প্রচলন হয়। ভারতীয় জ্ঞান-গরিমার সেরা নিদর্শন—তার ধর্ম, তার কাব্য, উপাখ্যান, দর্শন, জীবনচরিত, আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তিব্বতী ভাষায় ক্রমশ অনূদিত হতে থাকে।

রাজা স্রোন্-ৎসন-গম্পো কেবল নতুন বর্ণমালা প্রবর্তন করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। মাত্র তেরো বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করে দীর্ঘকাল তিনি রাজত্ব করেন। দুর্ধর্ষ বিজয়ী বীর হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর। তাঁর রাজ্য কত দূর বিস্তৃত ছিল অবশ্য সঠিক জানা যায় না। তবে তাঁর রাজ্য যে নেপাল ও হিমালয় পর্বতের সানুদেশস্থ ব্রাহ্মণ্যদের রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় চীনা বংশ-তালিকায় (যদিও ভারতীয় ইতিহাসের কোথাও এর উল্লেখ বড়

দেখা যায় না)। তবু সমতলভূমি বঙ্গদেশও যে এককালে তিব্বতের শাসনাধীন ছিল তার একটি প্রমাণ বুঝি খৃষ্টীয় দশম শতকেও বঙ্গোপসাগর 'তিব্বতীয় সাগর' নামে পরিচিত ছিল।

সংস্কৃত বর্ণমালা অনুসরণে তিব্বতের যে লিখিত ভাষার প্রচলন হয় তা 'ভো-কা' (Bod-Skad) নামে সাধারণত পরিচিত। তিব্বতী ভাষাকে মোটামুটি এই কয়টি কথ্য ভাষায় ভাগ করা যায়।

১. কেন্দ্রীয় বা রাজধানী লাসার প্রচলিত ভাষা। এটি তিব্বতের রাষ্ট্রভাষা। ২. লাদক, লাহুল, বালুচিস্তান প্রভৃতি পশ্চিম অঞ্চলের কথ্য ভাষা। ৩. পূর্বাঞ্চলীয় 'ক্ষোম' প্রদেশের কথ্য ভাষা। এ ছাড়া হিমালয় সীমান্তে কিংবা পূর্ব আসামের পার্বত্য অঞ্চলের ও উত্তর তুর্কীস্তানের 'হর-পা' বেদুইন উপজাতির অনেকেও তিব্বতী উপভাষায় কথা বলে থাকে। তিব্বতী ভাষা বর্মী ভাষার সমগোত্রীয়।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির যে প্রসার লাভ ঘটে তা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বিশেষ করে লক্ষণীয় যে, জাভা, সুমাত্রা আর বোর্নিও প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিন্দু প্রচারকরাই প্রথমে গিয়ে ভারতীয় সাংস্কৃতিক উপনিবেশের গোড়াপত্তন করেছিলেন। বৌদ্ধ শ্রমণ আর পণ্ডিতেরা গিয়েছিলেন তাঁদের পরে। কিন্তু তিব্বত, মধ্য এশিয়া আর চীনে ঘটেছিল তার বিপরীত। নেপালে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার লাভ ঘটলেও তিব্বত, চীন আর মধ্য এশিয়ার হিন্দু সাংস্কৃতিক ধারার নিদর্শন খুব বড় একটা মেলে না, মেলে 'এশিয়ার আলো' বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে উড়িষ্যা বা কলিঙ্গের পণ্ডিত পদ্মসম্ভব আর কাশ্মীরের বিরোচন একদল বৌদ্ধ শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে তিব্বতে যান ও রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। একাদশ শতকে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নেতৃত্বে নালন্দা আর বিক্রমশীলার বহু বৌদ্ধ পণ্ডিতের আগমন ঘটে তিব্বতে। পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর বিক্রমশীলার মঠ থেকে ভারতীয় জ্ঞান-বর্তিকা নিয়ে তিব্বতে যান। দীর্ঘ চতুর্দশ বৎসরকাল তিনি

তিব্বতে শাস্ত্র অনুশীলনে রত ছিলেন। 'চো-ও রিম-পো-চে' বা 'তুর্লভ মহাপ্রভু' নামে তিব্বতে তিনি ছিলেন পরিচিত। তিনি তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্মের এক নতুন সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন আর বৌদ্ধ তান্ত্রিক-শাস্ত্রের তথ্য সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ রচনা করেন। নালন্দা আর বিক্রমশীলার বৌদ্ধ মঠ থেকে বহু উদ্বাস্তু শ্রমণও ত্রয়োদশ শতকে তিব্বতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম-গ্রন্থ ও তাদের টীকা-টিপ্পনীর সঙ্গে তাঁরা বহু মহামূল্য সংস্কৃত পুঁথিও তিব্বতে নিয়ে যান। এই সব তুষ্প্রাপ্য পুঁথির অনেক স্থলেই তৎকালীন বাংলার রাজা ধর্মপাল কিংবা পঞ্চদশ শতকের সুবিখ্যাত পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র প্রমুখের উল্লেখ দেখা যায়। কি পরিমাণে এসব ভারতীয় গ্রন্থ তিব্বতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সঠিক তা জানা যায় না। তবে পণ্ডিতদের মতে, কাঞ্জুর আর তাঞ্জুর সংগ্রহশালায় তিব্বতীয় অনুবাদের মারফত প্রায় সাড়ে চার হাজার সংস্কৃত পুঁথি তিব্বতে সংরক্ষিত ছিল। শুধু তাই নয়, ভারতে আজ যেসব মূল সংস্কৃত পুঁথির অস্তিত্ব নেই, তিব্বতের মঠাগারে সেসব পুঁথির হদিস এখনও পাওয়া যায়। যদিও তিব্বতী লামাদের অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের ফলে কিংবা অগ্নিকাণ্ডে কিছু কিছু মূল সংস্কৃত পুঁথি নষ্ট হয়ে গেছে, তা হলেও প্রাচীন তিব্বতী সাহিত্যের মারফত সংস্কৃত সাহিত্যের বহু অমূল্য সম্পদ আজ রক্ষা পেয়েছে, একথা জোর করেই বলা যায়। আর যেসব বিদেশী পণ্ডিত ভারতের এই গুপ্ত সম্পদের পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী হলেন মঁসিয়ে লেভি, ডাঃ টুসি (Tucci) প্রমুখ অনেকে। Bsamyes মঠের তথাগত বুদ্ধের এক ভাঙা মূর্তির মধ্যে এমনি বহু ভারতীয় ধর্ম-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কিছুকাল আগে পাওয়া গেছে। পবিত্র পুঁথিগুলি সযত্নে রক্ষিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই পোকায় কেটে নষ্ট করে ফেলেছিল। শুধু তাই নয়, এক শ্রেণীর তিব্বতী লামার মধ্যে এ দৃঢ় বিশ্বাসও ছিল যে, যদি ভারতীয় ধর্ম-গ্রন্থের ধোয়া জল খাওয়া যায়, তাহলে জ্বর-জারীর হাত থেকে নিষ্কৃতি

মিলবে আর হবে মোক্ষলাভ। এই সব লামাদের অন্ধ-বিশ্বাসের মাশুল জোগাতে গিয়ে তালপাতার লেখা বহু মূল্যবান ভারতীয় পুঁথি বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে পণ্ডিতদের বিশ্বাস।*

তবু যা রক্ষা পেয়েছে মূল্য তারও কম নয়। ভারতের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের—বিশেষ করে বেদান্ত দর্শনের—মীমাংসার তিব্বতী ভাষায় অনূদিত এই সব দুষ্প্রাপ্য পুঁথির মূল্য অপরিসীম। মহাযান দর্শনের ক্রমবিকাশের ধারার অনেক হারান খেইও ধরিয়ে দেয় এই সব গ্রন্থ।

তিব্বতে ভারতীয় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য যে কতখানি সমাদৃত ছিল, তিব্বত পরিব্রাজক স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র দাশ ('কা-চে-লামা') মহাশয়ের 'লাসা ভ্রমণকাহিনী'র এক দিনের একটি দিনপঞ্জী থেকে তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে। তিনি লিখছেন:

> '৩০শে জানুয়ারী, ১৮৮২ : তিব্বতী অক্ষরে লেখা তিনখানি সংস্কৃত গ্রন্থের আমি আজ সন্ধান পেলাম। বইগুলি হলো আচার্য শ্রীদণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ'; চন্দ্রগোমিনের 'চান্দ্রব্যাকরণ'; আর আচার্য অমি-র 'সারস্বত ব্যাকরণ'। শেষোক্ত বইখানিতে তিব্বতীয় টীকাও রয়েছে।
>
> 'বিকালের দিকে শ্রীদণ্ডীর গ্রন্থখানি মন্ত্রী বাহাদুরকে দেখালাম। কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেলাম, এ দেখে যে, তিনি শুধু বইখানি সম্পর্কেই আমাকে আরও অধিক সংবাদ দিলেন না; গড় গড় করে বেশ খানিকটা মুখস্থও বলে গেলেন বই থেকে। বললেন: 'শ্রীদণ্ডী নিশ্চয়ই হাজারখানেক বছর পূর্বে জন্মেছিলেন। কেন না, এই গ্রন্থখানি শাক্য বংশধরদের কেউ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন এবং তা প্রায় ৬০০ বছরের কম হবে না। তিব্বতে এ বই নিয়ে আসার আরও বহু পূর্বে নিশ্চয়ই বইখানি প্রথম রচিত হয়ে থাকবে'।'

* Dr. A. S. Altekar : *Cultural Importance of Sanskrit Literature Preserved in Tibet :* Orient Review, Oct. 1955.

ভারতীয় পুঁথি

তিব্বতী সাহিত্যের অধিকাংশ গ্রন্থই ভারতীয় পুঁথির অনুবাদ। তিব্বতের এই অনূদিত সাহিত্যকে দুই শ্রেণীতে ফেলা যায়। এক হলো কাঞ্জুর (Bkah hgyur) আর অপরটি হলো তাঞ্জুর (Bstan hgyur)। কাঞ্জুর হলো বুদ্ধের বচন আর তাঞ্জুর বৌদ্ধ শাস্ত্র অর্থাৎ বুদ্ধের পরবর্তী পণ্ডিতদের রচিত প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী।

তিব্বতে যে সব সংস্কৃত গ্রন্থ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের অধিকাংশ ছিল বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যবিষয়ক। তিব্বতী ভাষায় এই সব গ্রন্থের যেমন অনুবাদ হয়েছিল, অ-বৌদ্ধ গ্রন্থ ও সাহিত্যেরও বিস্তর অনুবাদ হয়। 'যবন-জাতক' নামে এক আরবী ও গ্রীক জ্যোতিষ-শাস্ত্রের পুস্তকও আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া রাজনীতি সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় লিখিত হয়েছিল। সংস্কৃত 'কামশাস্ত্র', 'রতি রহস্য' প্রভৃতি গ্রন্থ 'নিষিদ্ধ দেশ' তিব্বতে প্রবেশ করে। মঠের ভিক্ষুক-ভিক্ষুণীদের আচার-নীতিবিষয়ক সামাজিক গ্রন্থও সেকালের তিব্বতী ভাষায় রচিত হয়েছিল। তখনকার তিব্বতের বৌদ্ধ সমাজের সাংস্কৃতিক ও দৈনন্দিন জীবনধারার একটি আলেখ্য হলো জয় রক্ষিত-এর ভাষ্যসহ 'শ্রমণের টীকা'। এই সব গ্রন্থের মূল সূত্র ভারতে হলেও ভারতীয় ভাষায় আজ তাদের অনেকগুলির কোনো হদিস পাওয়া যায় না।

শাস্ত্র আলোচনা ও সন্ত মহাপুরুষদের জীবন-আলেখ্যে তিব্বতী সাহিত্য সমৃদ্ধতর হয়ে উঠছিল ঠিক, কিন্তু তার কাব্য আর লোক-সাহিত্যও খুব উপেক্ষিত ছিল না। F. A. von Schefner-এর অনূদিত তিব্বতী 'লোক-কথা'ই তার প্রমাণ। এই সব লোক-কথার অধিকাংশ কাহিনী আর উপাখ্যানের মূল উৎস কিন্তু পালি বা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতের 'জাতকের কাহিনী', 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ', ও 'বত্রিশ-সিংহাসন' প্রভৃতি।

লোকগীতি

তিব্বতীয় সাহিত্যের আর একটি প্রধান অঙ্গ হলো তার লোক-গাথা ও লোকগীতি। বলা হয় তিব্বতে যতগুলি পর্বতচূড়া রয়েছে তার লোকগীতির সংখ্যাও নাকি ততগুলি। এক কথায় প্রত্যেকটি পর্বত-চূড়াই যেন এক-একটি মৌন সংগীত। সৃষ্টির আদি থেকে তাই তিব্বতীয় মালভূমি সংগীতের লীলা নিকেতনরূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে —ক্ষেতের ফসল তুলতে তুলতে, মাটি কুপিয়ে বীজ বপনের সময়, মেষ চড়াতে গিয়ে বা মাটির কাঁচা দেয়াল তৈরী করতে গিয়ে কিংবা কাপড় কাচতে কাচতে বা জল আনতে গিয়ে—তিব্বতী মেয়ে ও পুরুষেরা প্রত্যহ এই শ্লোক-গীতি গাইতে কসুর করে না। তিব্বতের একটি লোকগীতির নমুনা বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়ঃ

'মায়ের পেটে কি জন্ম নেয়নি মেয়েটি ?
পীচ্-কাঠে কি গড়া তার হিয়া ?
দয়িতের প্রতি প্রেম তার গেল কেন উবে ?
পীচ্-ফুলও যে অত শীঘ্র যায় না ঝরে।

'ঠিক বটে,
তার সাথে ছিল আমার হৃদয়ের মিতালী।
কিন্তু আমি যে তার
হৃদয়ের তল খুঁজে পায়নি।

'মাটির বুকে খালি রেখে যেতে হবে
গুটি কয়েক নখের আঁচড়।
আকাশের তারাদের দূরত্ব কি
কখন সঠিক যায় গো মাপা ?'

['য়ুৎদ চুয়ান'-এর ইংরেজী অনুবাদ থেকে]

আর একটি তিব্বতী লোকগীতি। এটি হলো বিয়ের ছড়া ঃ

ভোর রাতে বাগ্-মা বা কনে সেজে-গুজে বাপের বাড়ি থেকে আসছে বরের বাড়িতে। পালকি বা চতুর্দোলার নয়, ঘোড়া বা খচ্চরের পিঠে চড়ে। বরপক্ষ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কনে আর তার বাগ্-মা ঠোগ্-মা বা সহচরীদের সাদরে বরণ করে নেয়। নানান সুরে লোক-গীতি তখন দুই পক্ষ গাইতে থাকে। 'ওঁ স্বস্তি' বলে বরপক্ষ স্বস্তি পাঠ করে। সংস্কৃত মন্ত্র পাঠের সঙ্গে তিব্বতীতে কল্যাণ বাণীও উচ্চারিত হয় ঃ 'দে-লেক-সু-জুর চীগ'— কল্যাণ বর্ষিত হোক!'

বরপক্ষ তখন গান ধরে ঃ

'গো-মো টাসি ইয়াং ছাগ্ তি।
ইয়ার থেম ঙেহান্ পো সু য়ী চে।
রু সি বৈ-দুর্ য়া য়ী চে।
মার্ থেম সের-পো সের গী চে।
দুঙ গি ইয়ে সিং লু গু জ্যু।
গোঙ ঘোর গো শান্ সের গী চে।
গো মো নোর গো জ্যু গো নাঙ।
নম সে নোর গি বাং জোদ্ ইয়ো;
দে ইয়ে বার চে পাই গো দার।
নঙ জোদ্থি মে জিগ এ ইয়ো॥'*

অর্থাৎ, এই দরজাটি হলো কুবের বা বৈশ্রবণের ভাঁড়ার ঘর। এর চৌকাঠের উপরে নীলা আছে, নীচে বৈদুর্য, চারকোণে স্ফটিক বসানো আছে। সোনার কপাটের উপর শাক বা শঙ্খের শিকল ঝুলে রয়েছে। ঐ ঘরের ভিতরে কুবেরের অটুট ধনসম্পদ রয়েছে। কার এমন পবিত্র আঁচল আছে, যার আঁচলের পরশ লেগে দরজাটি খুলে যাবে!

পাত্রীপক্ষও ছড়া গেয়ে তার উত্তর দেয়। এমনিতর ছড়া কাটার মধ্যে দিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়ে থাকে।

* সুনীতিকুমার পাঠক : 'যুগান্তর' সাময়িকী,—২২শে মে, ১৯৫৫

খৃষ্টীয় সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে বহু সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। এই সমস্ত গ্রন্থ কাশ্মীর, নেপাল, নালন্দা, বিক্রমশীলা জগদ্দল প্রভৃতি বিহার থেকে সংগৃহীত হয়েছিল।

বৌদ্ধ সাহিত্য

স্বর্গীয় ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় অনূদিত তিব্বতী বৌদ্ধ সাহিত্যের মোটামুটি একটা গ্রন্থ-তালিকা সংগৃহীত করেছেন। তালিকাটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

"১. 'কাঞ্জুর' হচ্ছে বুদ্ধের বচন। কাঞ্জুর নয় ভাগে বিভক্ত : বিনয়, প্রজ্ঞাপারমিতা, অবতংসক, রত্নকূট, সূত্রবর্গ, শতসহস্রতন্ত্র, প্রাচীন তন্ত্র, কালচক্র ও ধারণী-সংগ্রহ। এই বিভাগ যে কৃত্রিম তা নামগুলি দেখলেই বোঝা যায়। পালি, চীনা কিংবা নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যের বিষয় বিভাগের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। ক. বিনয়—তিব্বতী বিনয় হচ্ছে মূল সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের বিনয়। এ বিনয়ের উদ্ভব কাশ্মীরে, নেপাল থেকে আবিষ্কৃত 'দিব্যাবদান' নামক গ্রন্থ এই বিনয়ের মূল গ্রন্থের খণ্ডিতাংশ মাত্র। সম্প্রতি কাশ্মীর থেকে এই বিনয়ের মূল গ্রন্থের কতকগুলি অংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। তিব্বতী অনুবাদে আছে বিনয়বস্তু, প্রাতিমোক্ষ সূত্র, বিনয়বিভঙ্গ, ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ, ভিক্ষুণী বিনয়-বিভঙ্গ, বিনয় ক্ষুদ্রকবস্তু এবং বিনয়-উত্তর গ্রন্থ। এই সমস্ত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ ১৩ খানি তিব্বতী মুদ্রিত পুঁথিতে সম্পূর্ণ। প্রত্যেক পুঁথির পত্র-সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ৩০০। খ. প্রজ্ঞাপারমিতা মহাযান সূত্র। প্রজ্ঞাপারমিতায় সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থ হচ্ছে 'শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'। এ গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ ১৩ খানি পুঁথিতে সম্পূর্ণ। প্রত্যেক পুঁথির পত্রসংখ্যা প্রায় ৪০০। এ ছাড়া 'পঞ্চসাহস্রিকা', 'প্রজ্ঞাপারমিতা,' 'দশসাহস্রিকা'—, 'অষ্ট-সাহস্রিকা—', 'সপ্তশতিকা—', 'পঞ্চশতিকা—' প্রভৃতি নানা সংক্ষিপ্ত-

সারেরও তিব্বতী অনুবাদ আছে। প্রজ্ঞাপারমিতার অন্তর্গত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'বজ্রচ্ছেদিকা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ. অবতংস—৪ খানি পুঁথিতে সম্পূর্ণ। এ একখানি বিপুল গ্রন্থ। এর সম্পূর্ণ নাম 'বুদ্ধবতংসক নাম মহাবৈপুল্য সূত্র'। নেপালে এই গ্রন্থেরই অংশ বিশেষ গণ্ডব্যূহ নামে প্রচলিত। ঘ. 'রত্নকূট'—এ বিভাগের প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে 'মহারত্নকূট'। অন্যান্য অপ্রসিদ্ধ সূত্রও এই বিভাগে স্থান পেয়েছে। সমস্তই মহাযান গ্রন্থ। ঙ. সূত্রবর্গ—এ বিভাগের প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে—ভদ্রকল্পিক নাম মহাযান সূত্র, ললিতবিস্তর, সুখাবতীব্যূহ, সুরঙ্গম সমাধি, মহাসন্নিপাত সূত্র প্রভৃতি মহাযান গ্রন্থের অনুবাদ আছে। চীনা ত্রিপিটকে এ বিভাগের নাম—মহাসন্নিপাত। তবে চীনা মহাসন্নিপাত থেকে তিব্বতী সূত্রবর্গ অনেক বড়। এ বিভাগে মোট সূত্র সংখ্যা ২৬৬। চ. তন্ত্র-শতসহস্র—এ বিভাগে প্রায় ৪৬৮ খানি বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থ স্থান পেয়েছে। এ সমস্ত তন্ত্র মহাযান, বজ্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের। কয়েকখানি প্রধান গ্রন্থের নাম করলেই এ সব গ্রন্থের স্বরূপ বোঝা যাবে—কালচক্রোত্তর তন্ত্র, অভিধানোত্তর তন্ত্র, বজ্রডাক নাম উত্তরতন্ত্র, বুদ্ধকপাল নাম যোগিনীতন্ত্ররাজ, ভূতডামর মহাতন্ত্ররাজ ইত্যাদি। ছ. প্রাচীন তন্ত্র—এ বিভাগে কতকগুলি অপ্রসিদ্ধ তন্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ স্থান পেয়েছে। জ. কালচক্র—এ বিভাগে একখানি মাত্র গ্রন্থ—বিমলপ্রভা-নাম-লঘুকালচক্র তন্ত্ররাজ-টীকা। ঝ. ধারণী-সংগ্রহ—এ বিভাগের মোট সংখ্যা ২৬৪ খানি।

"২. তাঞ্জুর: তাঞ্জুর হচ্ছে শাস্ত্র। তাঞ্জুর কাঞ্জুর হতে অনেক বড়। কাঞ্জুরের গ্রন্থ সংখ্যা ১১০৮। কিন্তু তাঞ্জুরের গ্রন্থ সংখ্যা ৩৪৫৯। তাঞ্জুর ১৭ ভাগে বিভক্ত: ক. স্তোত্র—এই সব স্তোত্রের মধ্যে নাগার্জুন ও অশ্বঘোষের নামাঙ্কিত অনেক স্তোত্রের অনুবাদ আছে। অনেকের মতে মাতৃচেট অশ্বঘোষের নামান্তর। এই মাতৃচেটের রচিত অনেকগুলি স্তোত্রের তিব্বতী অনুবাদ আছে। এই

স্তোত্রগুলির মধ্যে অনেকগুলি যে উচ্চাঙ্গের কাব্য ছিল, তা নতুন আবিষ্কৃত কয়েকখানি মূল গ্রন্থ হতেই বোঝা যায়। খ. তন্ত্র—এ সমস্ত তন্ত্র বুদ্ধ বচন নয়। বৌদ্ধ পণ্ডিত ও সিদ্ধাচার্যদের রচনা। এগুলি বেশীর ভাগ মূলতন্ত্রের টীকা-টিপ্পনী। তাঞ্জুরের এই অংশই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও মূল্যবান। মোট গ্রন্থ সংখ্যার মধ্যে ২৬০৫ খানিই এই অংশে স্থান পেয়েছে। গ. প্রজ্ঞাপারমিতা—এই অংশে কাঞ্জুরে সন্নিবিষ্ট প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের নানা টীকা-টিপ্পনী স্থান পেয়েছে। ঘ. মাধ্যমিক—নাগার্জুনের প্রতিষ্ঠিত মাধ্যমিক দর্শন সম্বন্ধীয় নানা গ্রন্থ। এ অংশের গ্রন্থাবলীর মধ্যে নাগার্জুনের নিজের রচিত মূলমধ্যমক-কারিকা, বিগ্রহব্যবর্তনী প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। ঙ. সূত্রবৃত্তি—কাঞ্জুরে উল্লিখিত নানা সূত্রের টীকা। চ. বিজ্ঞানবাদ—অসঙ্গ বসুবন্ধু প্রভৃতি আচার্যদের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানবাদ দর্শনের নানা প্রামাণিক গ্রন্থ—যেমন অসঙ্গের সূত্রালংকার, মধ্যমবিভঙ্গ, যোগাচার্য ভূমিশাস্ত্র ইত্যাদি। ছ. অভিধর্ম—সর্বাস্তিবাদের অভিধর্মকোষ ও তৎসম্বন্ধীয় নানা গ্রন্থ। জ. বিনয়—বিনয়, প্রাতিমোক্ষ প্রভৃতির টীকা। ঝ. জাতক—এই অংশের প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে অশ্বঘোষের 'বুদ্ধ চরিত' কাব্য। ঞ. লেখমালা—এ অংশে নাগার্জুনের 'সুহৃল্লেখ এবং ঐ জাতীয় শিষ্যলেখ, বিমলরত্নলেখ প্রভৃতি গ্রন্থ স্থান পেয়েছে। ট. ন্যায়শাস্ত্র, প্রমাণসমুচ্চয়, আলম্বন-পরীক্ষা, বাদন্যায় প্রভৃতি বৌদ্ধ ন্যায় গ্রন্থ। ঠ. শব্দশাস্ত্র—নানা ব্যাকরণ গ্রন্থ, চন্দ্রগোমিনের 'চান্দ্র ব্যাকরণ', কলাপসূত্র, দুর্গসিংহের কলাপবৃত্তি, অমরকোষ, কাব্যাদর্শ ইত্যাদি। ড. চিকিৎসা বিদ্যা—বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা ও অন্যান্য গ্রন্থ। ঢ. শিল্প-শাস্ত্র—প্রতিমা লক্ষণ, চিত্র লক্ষণ, প্রভৃতি। ণ. সাধারণ—নীতিশাস্ত্র, চাণক্য-নীতিশাস্ত্র, শালিহোত্র-আয়ুর্বেদসংহিতা ইত্যাদি। ত. নানার্থ—নিঘণ্টু, ব্যাকরণ, অর্থবিনিশ্চয় প্রভৃতি। থ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রণীত নানা গ্রন্থ।"*

* 'বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য'—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একটা কথা উল্লেখ না করে পারা গেল না। বাংলা ভাষার আদি খুঁজতে হলে তিব্বতী সাহিত্যে এর হদিস নিতে হবে। কথাটা অবশ্য নতুন। তবে তা যে কতখানি সত্য তার প্রমাণ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'। শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায়ঃ

> 'সুতরাং মুসলমান বিজয়ের পূর্বে বাংলা দেশে একটা প্রবল বাংলা সাহিত্যের উদয় হইয়াছিল। তাহার একটা ভগ্নাংশমাত্র আমি বাঙ্গালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করিতেছি। ভরসা করি, তাঁহারা যেরূপ উদ্যমসহকারে বৈষ্ণব সাহিত্য ও অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার করিয়াছেন. ঐরূপ উৎসাহে বৌদ্ধ ও নাথ সাহিত্যের উদ্ধার সাধন করিবেন। ইহার জন্য তাঁহাদিগকে তিব্বতী ভাষা শিখিতে হইবে, তিব্বত ও নেপালে বেড়াইতে হইবে, কোচবিহার, ময়ুরভঞ্জ, মণিপুর, সিলেট প্রভৃতি প্রান্তবর্তী দেশে ও প্রান্তভাগে ঘুরিয়া গীতি, গান ও দোহা সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাতে অনেক পরিশ্রম হইবে, অনেকবার হতাশ হইয়া ফিরিতে হইবে। কিন্তু যদি সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, যাঁহারা এ পর্যন্ত কেবল আপনাদের কলঙ্কের কথা কহিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা একেবারেই সত্য কথা কহেন নাই।'
>
> [ভূমিকাঃ 'বৌদ্ধগান ও দোহা']

তাঞ্জুরের একটা অংশে অনেকগুলি গীতির তিব্বতী অনুবাদ আজ পাওয়া গেছে। এদের মূল ভাষা কি ছিল, তা আজ বলা দুঃসাধ্য। কিন্তু এদের একটিও যে অন্তত বাংলা ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে পণ্ডিতদের নিকট। তাঞ্জুরের 'তন্ত্রবৃত্তি' (র্গ্যুদ) অংশে অনেকগুলি গীতিকাও দেখা যায়। (Cordier-এর *Catalogue du Fonds Tibetain*, Vol II. পৃঃ ২৩০ দ্রষ্টব্য)। এদের মধ্যে দুইটি গ্রন্থের নাম 'সহজগীতি' ও 'লুইপাদগীতি'। 'সহজগীতি'র লেখক শান্তিদেব; 'লুইপাদগীতি'র লেখকের নাম গ্রন্থমধ্যে বা তাঞ্জুরের

শেষে যে গ্রন্থতালিকা আছে, তার কোথাও উল্লেখ নেই। তবে 'লুইপাদ'ই যে গীতিকার, তা ধরে নেওয়া অসঙ্গত নয়; লেখকের নামে গীতের পরিচয়ের উদাহরণ দুর্লভ নয়। 'সহজগীতিকা'র শান্তিদেব যে কে ছিলেন, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে কিছু বলা যায় না। লুইপাদ সম্বন্ধে কিন্তু নানা আলোচনা হয়েছে। নানা লোকে তাঁর সময়ের ভিন্ন ভিন্ন হিসাব দিয়েছেন। লুইপাদ আদি সিদ্ধাচার্য। তাঁর সময় সম্বন্ধে আধুনিকতম মত শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মশায়ের 'সাধনমালা'র ২য় খণ্ডের ভূমিকায় পাওয়া যায়।

আদি সিদ্ধাচার্যের রচিত গ্রন্থ বলে এই গ্রন্থটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। কিন্তু সে মূল্য যে কতখানি, অনুবাদ পাঠ করলেই বোঝা যাবে। শাস্ত্রী মশায় একে 'বাঙ্গালা সঙ্কীর্তনের পদাবলী' বলেছেন। চারিটি পদের সমষ্টিকে গ্রন্থ বলা চলে কিনা জানি ন', পদাবলী বললেও বোধ করি, বেশী বলা হয়।

দুখানি গ্রন্থই 'গীতি'; অর্থাৎ এগুলি গানের জন্য রচিত হয়েছিল। প্রথম গ্রন্থ 'সহজগীতি'র মধ্যে যে কাব্যরস আছে, তা অনুবাদের মধ্যেও সুস্পষ্ট; কিন্তু দ্বিতীয় গ্রন্থটি কতকটা স্তোত্র ধরনের; দেবতার গুণ বর্ণনাচ্ছলে তার সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলা হয়েছে। দুখানিই সহজযানের পুঁথি। গ্রন্থ দুটির মূল তিব্বতী পাঠ 'বিশ্বভারতী' গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

['হরপ্রসাদ-সংবর্ধন লেখমালা': ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য]

ভোট ভাষায় লিখিত 'সহজগীতি'র একটি বাংলা অনুবাদ ঃ

সদ্‌গুরুকে নমস্কার

'শূন্য বন হইতে ফুল ফুটিয়াছে;
একটি ফুলের রং বিচিত্র।
অনুপম পুষ্প জন্মিয়া সকলের উপর জয়ী হয়।
অমূল্য পুষ্প, তুমি ওঠ॥ ১॥

তাহার মূল নাই, শাখাপল্লব নাই।
সঙ্গিগণ, উত্তম ছিদ্রের দিগ্বিজয় দেয়।
অনুপম পুষ্প ইত্যাদি॥ ২॥
কেশর লইয়া মায়াবী হয়।
বজ্রেশ্বর ধর্মধাতুকে পূজা কর।
অনুপম পুষ্প ইত্যাদি॥ ৩॥
উত্তম ও অপ্রিয় ইহাদের বিচার করিয়া গ্রহণ কর।
সদ্‌গুরুর চরণকে ভক্তির সহিত পূজা কর।
অনুপম পুষ্প ইত্যাদি।। ৪॥'

[যোগীশ্বর শান্তিদেব-কৃত সম্পূর্ণ]

টীকা

১—এই 'ফুল' কি 'উষ্ণীষকমল'?

২—'উত্তম ছিদ্র' অর্থে 'শূন্য'।

৩—'কেশর' অর্থাৎ 'বিভূতি'?

শুনে আশ্চর্য হতে হয়, তিব্বতী ভাষায় এখনও কিছু কিছু 'ভারতীয়' শিল্পশাস্ত্র বর্তমান রয়েছে। তাদের মধ্যে 'চিত্রলক্ষণম', 'প্রতিমামানলক্ষণম' প্রভৃতিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ['হরপ্রসাদ সংবর্ধন লেখমালা' : ২য় খণ্ড]

তিব্বতী সাহিত্যের সেকালও যা একালও তাই।

অনুবাদ তিব্বতী সাহিত্যে প্রধান ভূমিকা পরিগ্রহণ করে থাকলেও মৌলিক সাহিত্যও যে আদৌ রচিত হয় নি, তা নয়। জাতীয় কবি মিলা-রাসপা (Mila-raspa)-র নাম এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রায় এক লক্ষ তিব্বতী শ্লোক বা কবিতা রচনা করেন। অষ্টাদশ শতকে তাঁর শিষ্য ৬ষ্ঠ দলাই লামা তাঁর 'আত্মচরিত' খানি সম্পূর্ণ করেন।

শেক্সপীয়র সম্পর্কে মৌলিক আলোচনা করতে গেলে আজ যেমন ডলারের দেশ মার্কিন মুল্লুকে ধরনা দিতে হয়, তেমনি তিব্বতী সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে ইটালী কি ফরাসী পণ্ডিতদের

শরণাপন্ন না হয়ে আমাদের উপায় নেই। ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শরৎচন্দ্র দাশ, রাহুল সংস্কৃত্যায়ণ, ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, এ. এস. আলতেকার প্রমুখ পণ্ডিতরা এই ক্ষেত্রে সবিশেষ অগ্রণী। তিব্বতের প্রাচীন ভারতীয় পুঁথির রত্নোদ্ধারে ভারত সরকার আরও সচেষ্ট হবেন আশা করা যায়।

সারা দুনিয়ার চোখে তিব্বত এতকাল এক 'আজব দেশ' বলে পরিচিত ছিল। বিদেশী পর্যটকের দল তিব্বতের সব কিছুকেই আজগুবি, অদ্ভুত, তুকতাক বলে গণ্য করে এসেছে। কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিত ও বিদেশী পুরাতত্ত্ব-সন্ধানী মনীষীর দৌলতে সে ধারণা আজ অনেকটা ভেঙেছে। তিব্বতের মর্যাদা ধরা পড়েছে অন্যরূপে। তার সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্পকলা ও দর্শনের নানা গবেষণার মারফত তিব্বতের বহু অজ্ঞাত তথ্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়েছে। তিব্বতের আঁকা-বাঁকা গুহার প্রায়ান্ধকারে আজ আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন ভারতের ফেলে আসা দিনের বহু শত পদচিহ্ন। শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভব, কমলশীল, দীপঙ্কর প্রভৃতি ভারতের মূর্ত মনীষার স্বাক্ষর আজ ভারতের ঘরে নেই; তিব্বতী লামারা সে কীর্তিকলাপগুলি কিন্তু রেখে দিয়েছেন বুকে করে। তার জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূতত্ত্বের বহু বৈজ্ঞানিক সম্পদ একদা যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিজ্ঞানীদের বিস্ময় জাগ্রত করবে না, সেদিন বুঝি বেশী দূর নয়।

॥ গ্রন্থ পঞ্জী ॥

স্ভেন হেডিন: দক্ষিণ তিব্বত; সার ফ্রান্সিস ইয়ং হাজব্যাণ্ড: ভারত ও তিব্বত; সার টমাস্ হোলডিস: তিব্বত, দি মিস্টিরিয়াস, (১৯০৬); টি. এল. সেন ও এস. সি. লিউ: তিব্বত ও তিব্বতায়·(১৯৫৩); সার চার্লস্ বীল: তিব্বত, অতীত ও বর্তমান (১৯২৭); বি. এইচ. হডসন: নেপাল ও তিব্বতের সাহিত্য ও ধর্ম; এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা (১২শ খণ্ড); শরৎচন্দ্র দাশ: লাসা অভিযান; এফ. এ. ভন. সেফনার: তিব্বতী কাহিনী; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়: ইণ্ডিয়ান লিটারেচার ইন চায়না এ্যাণ্ড ফার ইস্ট।

'পুরোনো পুকুর,
ব্যাঙের লাফ,
জলের শব্দ ।*

'বাস্! আর দরকার নেই। জাপানী পাঠকের মনটা চোখে ভরা। পুরোনো পুকুর মানুষের পরিত্যক্ত, নিস্তব্ধ, অন্ধকার, তার মধ্যে একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়তেই শব্দটা শোনা গেল। শোনা গেল—এতে বোঝা যাবে পুকুরটা কি রকম স্তব্ধ। এই পুরোনো পুকুরের ছবিটা কি ভাবে মনের মধ্যে এঁকে নিতে হবে সেইটুকু কেবল কবি ইশারা করে দিলে; তার বেশি একেবারে অনাবশ্যক।'

আর একটি কবিতা:

'পচা ডাল,
একটা কাক,
শরৎকাল ।**

'আর বেশি না। শরৎকালে গাছের ডালে পাতা নেই, দুই-একটা ডাল পচে গেছে, তার উপরে কাক বসে। শীতের দেশে শরৎকালটা হচ্ছে গাছের পাতা ঝরে যাবার, ফুল পড়ে যাবার, কুয়াশার আকাশ ম্লান হবার কাল—এই কালটা মৃত্যুর ভাব মনে আনে। পচা ডালে কালো কাক বসে আছে, এইটুকুতেই

* ফুরুইকে ইয়া	An old pond
কোওয়াজু তোবিকমু	A frog leaped
মিজু নো ওতো	Sound of the water.

—মাৎসুও বাসো

** ক্যারীদা নি	On the withered branch
ক্যারেস্থ নো তোমারিকেরি	A crow has alighted
আকি নো কুরে	The end of autumn.

—মাৎসুও বাসো

পাঠক শরৎকালের সমস্ত রিক্ততা ও ম্লানতার ছবি মনের সামনে দেখতে পায়। কবি কেবল সূত্রপাত করে দিয়ে সরে দাঁড়ায়। তাকে যে অতি অল্পের মধ্যে সরে যেতে হয় তার কারণ এই যে, জাপানী পাঠকের চেহারা দেখার মানসিক শক্তিটা প্রবল।···

'···এই কবিতাগুলির মধ্যে কেবল যে বাক্-সংযম তা নয়, এর মধ্যে ভাবের সংযম। এই ভাবের সংযমকে হৃদয়ের চাঞ্চল্য কোথাও ক্ষুব্ধ করছে না। আমাদের মনে হয়, এইটেতে জাপানের একটা গভীর পরিচয় আছে। এক কথায় বলতে গেলে, একে বলা যেতে পারে হৃদয়ের মিতব্যয়িতা।···'

['জাপান যাত্রী' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

জাপানী কাব্যের মূল সুরটি সপ্তদশ শতকের দুইটি বিখ্যাত 'হাইকু' কবিতায় সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ সুর কেবল জাপানী কাব্যের নয়, গোটা জাপানী সাহিত্যেরই বুঝি মূল কথা।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর আগে পর্যন্ত জাপানীদের কোনো লিখিত ভাষা ছিল না। পৌরাণিক কাহিনী, কিংবদন্তী আর গীতিরচনাগুলি মুখে মুখে ঘুরে বেড়াত বংশপরম্পরায়। সরকারী ভাষ্যে এসব শ্রুতিধরকে বলা হতো 'কাতারিবি'! প্রতিবেশী চীনের কাছ থেকে জাপানীদের প্রথম হাতেখড়ি হয় জাপানী বর্ণমালা অ-আ ক-খ'র। এটি হয় চার শত পাঁচ খৃষ্টাব্দে। ওয়ানগিন বা ওয়ানি নামে এক কোরীয়ান চীনা ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন জাপানী এক রাজকুমারের। এ শিক্ষকই জাপানে প্রথম প্রচলন করেন চীনা লিখন-পদ্ধতির। জাপানী সাহিত্যের ইতিহাসে এমনি আর একটি স্মরণীয় তারিখ হলো ৫৫২ খৃষ্টাব্দ। সে দিন দুর্গমগিরি হিমালয় আর মহাচীনের কান্তার মরুভূমির দুস্তর পথ অতিক্রম করে আমাদের এ ভারতের বৌদ্ধ ধর্মের প্রদীপ্ত জ্ঞানশিখা প্রথম উদ্ভাসিত করে দিয়েছিল তখনকার তমসাচ্ছন্ন

জাপানী সংস্কৃতি জগৎকে। এ জ্ঞানমার্গের সংস্পর্শে এসে সাহিত্য, শিল্পকলা আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাপান সমধিক প্রসারতা লাভ করে।

কাব্যচর্চাই ছিল তখনকার (খৃষ্টীয় ৪০৫-৭৯৪) জাপানী সাহিত্যের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। 'মনিওস্যু' জাপানের শ্রেষ্ঠ আদি কাব্যের সংগ্রহ-গ্রন্থ। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে রচিত হয় এটি। জাপানী সাহিত্যে গদ্যের সূচনা হয় নি তখনও। কাকিনোমতো নো হিতোমারো, ইয়ামাবে নো আকাহিতো প্রমুখ প্রায় সাড়ে চার শতের মতো কবির কবিতা-সংকলন হলো গ্রন্থখানি। গ্রন্থখানার শ্লোক ও কবিতার সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার হাজারের উপর।

জাপানী সাহিত্যের ইতিহাসে এর পরবর্তী কাল (খৃষ্টীয় ৭৯৪-১১৯২) হলো ক্লাশিকাল যুগ। ময়ূরপুচ্ছ-পরা চীন ভাষা আর সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জাপানী বিদগ্ধ সমাজ রুখে দাঁড়াল। সুগাওয়ারা মিচিজান নামে এক সুপণ্ডিত আন্দোলন শুরু করলেন। চীনের রাজ-দরবারে সাংস্কৃতিক দূতের জন্য আর ধরনা দেওয়া চলবে না নিপ্পনের। তাঁর এ আন্দোলনের ফলেই জাপানে নতুন ঢঙের এক সাহিত্যের উদ্ভব হলো। জাপানী 'বেলে লেটার্স' বা রম্য-রচনার উন্মেষ হয় এ সময়।

'জেঞ্জী কাহিনী'কে বলতে হয় জাপানের সত্যিকারের প্রথম উপন্যাস। সিয়ান রাজদরবারের হুবহু চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এ উপন্যাসে। এটি পৃথিবীর সেরা উপন্যাসের মধ্যে একটি বলে আজও সমাদর লাভ করে আসছে রসিক-সমাজে। এই আখ্যায়িকায় সূক্ষ্ম মনোবিকলনের যে সুন্দর বিশ্লেষণ করা আছে তা এখনকার অতি-আধুনিক বহু গল্প-উপন্যাসকেও হার মানিয়ে দেয়। এ যুগের আর একজন শক্তিশালিনী লেখিকা হলেন সিই শোনাগন।

'জেঞ্জী কাহিনী'(জেঞ্জী মনোগাতারি)-র লেখিকা হলেন মুরাসাকি সিকিবু (আনুমানিক খৃষ্টীয় ৯৭৫-১০২৫)। মিঃ আর্থার ওয়েলি

৬ খণ্ডে (১৯২৩-৩৫) এই গ্রন্থখানির ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। এর পৃষ্ঠা-সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজারের মতো।

সুবৃহৎ এই উপাখ্যানে রাজকুমার জেঞ্জী, বিশেষ করে তাঁর পুত্র-পৌত্রের প্রণয় কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। জাপানী সাহিত্যের এই 'জেঞ্জী কাহিনী'কেই প্রথম বস্তুনিষ্ঠ আখ্যায়িকা বলা যেতে পারে। হিইয়ান যুগের (৭৯৪-১১৯২) দরবারী জীবনযাত্রার যথাযথ খুঁটিনাটি চিত্র—সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনযাত্রা চিত্রিত হয়েছে। রাজ-দরবারের ঐশ্চর্যময় জাঁকজমক পারিপাট্যের পাশে হাস্য, করুণা ও বিষাদের বিচিত্র সমাবেশ হয়েছে সুবিশাল এই গ্রন্থে। মনোবিকলনের সুষ্ঠু প্রয়োগও দেখা যায়। ভাষা ও রচনা-রীতিতেও গ্রন্থখানি তথাকথিত আধুনিক উপন্যাসের সংজ্ঞাভুক্ত না হলেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অনন্য। মুরাসাকি এ ছাড়া আরও দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন—'মুরাসাকি সিকিবু নিক্কি' আর অপরখানি 'মুরাসাকি সিকিবু ওয়ু' (মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে তার আত্মগত অনুভূতিগুলির সংগ্রহ)। জেঞ্জী কাহিনী এখানে সংক্ষেপে বলা গেল :

কোকিডেন হলেন জাপানের প্রধান রাজমহিষী। জাপ সম্রাট যখন অপূর্ব সুন্দরী কিরিৎসুবোকে নতুন বিয়ে করে রাজঅন্তঃপুরে এনে তুললেন তখন প্রধানা রাজমহিষী কোকিডেনের ঈর্ষা আর ধরে না। প্রধানা রাজমহিষীর দুঃখের সীমা আর পরিসীমা রইল না যখন কিছু-কাল পর কিরিৎসুবোর সর্বগুণসম্পন্ন দেবতুল্য এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। কোকিডেন-এর মনে মনে আশঙ্কা হলো, তাঁর পুত্রের বরাতে বুঝি আর রাজসিংহাসন জুটল না। সুতরাং রাজঅন্তঃপুরে কিরিৎসুবোর বিরুদ্ধে সলা-চক্রান্তের যেন আর অবসান হলো না, তার ফলেই বুঝি কিরিৎসুবো মারা যান।

মায়ের মৃত্যুর পর শিশু রাজকুমারকে সম্রাট জেন বা গেন্ কুলপতির রক্ষণাবেক্ষণে পাঠিয়ে দিলেন। জেন কুলপতি রাজকুমারকে নতুন আখ্যা দিলেন জেঞ্জী রাজপুত্র। রাজপুত্র দেখতে

দেখতে বড় হয়ে উঠল। রাজদরবারের আর সব রাজকুমারকে শৌর্যে-বীর্যে জ্ঞান-গরীমায় ছাড়িয়ে গেল। জেঞ্জী রাজপুত্রকে দেখে প্রধানা রাজমহিষী কোকিডেনের মনেও আর কোনো হিংসা রইল না। জেঞ্জীর রাজপুত্র শীঘ্র সম্রাটের চোখের মণি হয়ে উঠল।

বারো বছরে সে যখন পদার্পণ করল সম্রাট তাকে তখন জায়গিরদার বানিয়ে দিলেন আর 'দক্ষিণদ্বারী'র মন্ত্রীর কন্যা অই (Oie) রাজকন্যার সঙ্গে তার বিবাহ দিলেন। রাজকন্যা অই বরের চাইতে বছর চারেকের বড়। যে কারণেই হোক, রাজপুত্র জেঞ্জীর সঙ্গে তার খুব একটা বনিবনাও হলো না।

জেঞ্জী এদিকে রাজ প্রহরীদলের সেনাপতি পদে বৃত হলো। আর বেশীরভাগ সময় তাকে রাজকার্য উপলক্ষে বাইরে বাইরে কাটাতে হয়। তরুণী রাজকন্যা অইও তখন বাপের বাড়িতে গিয়ে সারা বছর কাটাতে লাগল।

এদিকে সেনাপতি জেঞ্জীর জীবনে ফুজিৎসুবো নামে যে তরুণীটি রেখাপাত করল, সেও তার পরিণীতা রাজকন্যার মতো বছর কয়েকের বড়ই। জেঞ্জীর দ্বিতীয় শিকার হলো তরুণী রূপসী উৎসুসেমি। অমাত্য কি-নো-কামীর গহে এক অনুষ্ঠানে রূপসী উৎসুসেমির সঙ্গে হয় তার প্রথম পরিচয়। জেঞ্জী ওকে 'সম্মার্জনী বৃক্ষ' নামে ডাকত। জাপানে সম্মার্জনী বৃক্ষ হলো এক শ্রেণীর গুল্ম যা দূর থেকে দেখে মনে হয় অনেকটা ছায়াঘন বৃক্ষ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। উৎসুসেমির ঘরে গিয়ে একদিন জেঞ্জী দেখে, ও তখনও ঘুমিয়ে পড়ে নি, ওকে দেখে উৎসুসেমি তখনই পালিয়ে গেল। কিন্তু ওর ঘরে ছিল আর একটি তরুণী মেয়ে। সে তখন ঘুমোচ্ছিল। সে যখন জাগল, জেঞ্জীর সঙ্গে তার আলাপ হলো। আর এই আলাপ ঘনিষ্ঠতর হয়ে পরিণতি লাভ করল।

দিন যায়, জেঞ্জী এক দিন তার ধাত্রীমাতার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। আর সেখানে তার সাক্ষাৎ হলো জুগাও নামে আর একটি

মেয়ের সঙ্গে। বেশভূষায় মেয়েটির দারিদ্র্যের ছাপ—যদিও সে এসেছে বড় ঘর থেকে। এমনি ধারা একটানা মেয়েদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের মারফত গা এলিয়ে দিয়ে জেঞ্জী এক সময় ক্লান্ত হয়ে উঠল বুঝি। রূপসী জুগাও শত রাত্রির নিবিড় ছাপ রেখে তার বুকে সহসা মারা যায়। জুগাও-এর অকস্মাৎ মৃত্যুর জন্য সবাই করতে লাগল কানাকানি। জেঞ্জী অবশ্য রাজদরবারের বন্ধুবান্ধবদের সহযোগিতায় সে যাত্রায় কোনরকমে রক্ষা পায় কেলেঙ্কারীর হাত থেকে।

জুগাওর শোচনীয় মৃত্যুর পর জেঞ্জীও কঠিন রোগে আক্রান্ত হলো। আর রোগের হাত থেকে আরোগ্য লাভ করার উদ্দেশ্যে সে গিয়ে ধরনা দিলে এক সন্ন্যাসীর দ্বারে। আর সেখানে আলাপ হলো তার মুরাসাকির সঙ্গে। ছোট্ট মেয়ে। সুন্দর, ফুটফুটে দেখতে। বড় ঘরের মেয়ে। তবে বাপ-মা কেউ নেই। মুরাসাকিকে দেখে জেঞ্জীর নিজের কথা মনে পড়ে গেল বুঝি। সে ওকে সঙ্গে নিতে চাইল। কিন্তু মুরাসাকির অভিভাবকের দল আপত্তি তুললে। বললে, এখনো অল্প বয়স, তাকে উপপত্নী করা যায় না। পরে বিস্তর বলা-কওয়ার পর ওরা অবশ্য রাজী হলো মেয়েটির ভবিষ্যতের কথা ভেবে। মুরাসাকিকে নিয়ে জেঞ্জী স্বগৃহে ফিরল। পাছে তার মতলব কেউ ভুল বুঝে এই ভয়ে সে মুরাসাকির বয়স আর পরিচয় গোপন রাখলে সাধারণের কাছে—এমন কি তার অসংখ্য উপপত্নীর কাছেও। এদিকে মুরাসাকির উপস্থিতিতে হিংসায় ওরা জ্বলে-পুড়ে মরতে লাগল।

রাজদরবারে জেঞ্জী যখন মুরাসাকিকে নিয়ে ফিরে এলো, বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ওকে নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠানে যোগদানে অনুরোধ করা হয়। জেঞ্জী তখন 'নীল সাগরের ঢেউ' নৃত্যটি করেন সম্রাটের সম্মুখে। সম্রাট তার নাচ আর কাব্য-রচনায় এমনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে সঙ্গে সঙ্গে তার পদোন্নতির আদেশ দিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী যখন সুপ্রসন্ন সেই সময় জেঞ্জীর ভাগ্যাকাশে এমন করে কালোমেঘ ঘনিয়ে উঠল যে সে বুঝি চারিদিক অন্ধকার দেখল। ফুজিৎসুবো ছিল

সম্রাটের অসামান্যা রূপসী উপপত্নী। সে হলো সন্তান-সম্ভবা। আর যখন তার এক পুত্র সন্তান জন্মাল, আশ্চর্য, দেখা গেল তার সঙ্গে জেঞ্জী রাজকুমারের হুবহু আদল রয়েছে। তবে কি জেঞ্জী রাজকুমারের ঔরসজাত সন্তান হলো নব রাজকুমার? সবাই কানাকানি করতে লাগল। মুখ টিপে টিপে হাসি। জেঞ্জী রাজকুমার অবশ্য পার পেয়ে গেল এ যাত্রায়, কেউ কেউ আবার বলল: আদল থাকবে বই কি? জেঞ্জী রাজকুমার আর নবজাতপুত্র হলেন একই পিতার সন্তান। একই রক্তধারা। তা একটু হবে বই কি! সম্রাটও তাই বিশ্বেস করলেন। জেঞ্জী রাজপুত্রকে তিনি সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী করে দিলেন।

এদিকে জেঞ্জীর বিবাহিত জীবনটাও দিন দিন ঘোলাটে হয়ে উঠতে লাগল। স্ত্রীর সঙ্গে তার ব্যবধান হয়ে উঠল অতলান্তিক। এদিকে স্ত্রীও হলো আবার সন্তান-সম্ভবা। কিন্তু মা হবার আনন্দের চাইতে রাজকন্যা অই-এর অন্তরটি হিংসা ও ঈর্ষায় পূর্ণ হয়ে উঠল। মনে কিছুতেই সে শান্তি পেল না। আর অতৃপ্ত, অশান্ত হৃদয়ে সে মারা গেল তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সময়। শোকসন্তাপে জেঞ্জীও ভেঙে পড়ল। তারপর বছরখানেক কেটে গেল। মুরাসাকি এদিকে ষোলোকলা শশিকলায় রূপায়ীত হয়ে উঠল। তারপর এক দিন বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনদের সনির্বন্ধ অনুরোধে মুরাসাকির সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল তার।

'জেঞ্জী কাহিনী'র এক স্থলে উপন্যাসের শিল্পকলা সম্পর্কে মুরাসাকি রাজদরবারে এক বিদুষী মহিলাকে তন্ময় হয়ে রহস্য উপন্যাস পড়তে দেখে চটুল ব্যঙ্গসহকারে যা লিখেছিলেন, এখানে তা কিছুটা অনূদিত করা গেল:

'বস্তুত, উপন্যাস সম্পর্কে আমি যা তোমাকে বলতে চেয়েছি তার অনেক কিছু এখনো বলা হয় নি। ব্যবহারিক জীবনেও মূল্য এর অপরিসীম। এ ছাড়া আমরা জানতাম কি করে অতীতের জীবনধারা ছিল কিরূপ—দেবতাদের যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত? জাপানের

কুলপঞ্জী প্রভৃতি ইতিহাস পুস্তকে জীবনের দৃষ্টিকোণের কতটুকুও বা পরিচয় আমরা লাভ করে থাকি? এই যে তোমার আশে পাশে ছড়ান ডাইরী আর রহস্য উপন্যাসের মধ্যে কতজনার ব্যক্তিগত জীবনের সংগোপন কথাটি না বলা হয়েছে? খুঁটিনাটিভাবে কত না-বলা বাণী ভাষা পেয়েছে ···

নায়ক একটু হাসল। তার পর আবার বলে চলল:

এই উপন্যাস কথাশিল্পের শুরু হলো কি করে সে বিষয়ে আমার নিজস্ব একটি বক্তব্য আছে। প্রথমে বলতে হয়, শুধু ব্যক্তিবিশেষের অভিযানমূলক চটকদার এক কাহিনী লিপিবদ্ধ করা ঔপন্যাসিকের ধর্ম নয়, বরং মুরাসাকি তাঁর ডাইরীতে নিজের সম্পর্কে লিখেছেন:

অনেকের ধারণা আমি নাকি খুব চাপা, অসামাজিক, লোকজনের কাছ থেকে সব সময় দূরে দূরে থাকতে চাই। দেমাকে আমার পা দুটো নাকি মাটিতে পড়ে না। প্রাচীন গল্প-উপাখ্যান পড়াশুনার মধ্যে আমি নাকি সারাক্ষণ মশগুল হয়ে থাকতে চাই। চোখঠারা গোছের আপন-গড়া এক কাব্যময় জগতে আমি নাকি বিচরণ করে থাকি। আশপাশের পরিবেশ ও লোকজনের অস্তিত্ব নাকি স্বীকারই করি না—সুযোগ পেলেই সাধারণ লোকজনকে তুচ্ছ অবজ্ঞার চক্ষে দেখতে ছাড়ি না। আমাকে যারা চেনে না তারা আমার সম্পর্কে এমনি ধারা বিরূপ ধারণা পোষণ করে থাকে। কিন্তু আমার সঙ্গে আলাপ করে তাঁরা বুঝি অবাক হয়ে যান; আমি তা নই। বরং সহৃদয়া, ভদ্র ও নম্র। আমার সম্পর্কে পূর্বে যা ধারণা করেছিলেন তা অমূলক বলে অনেকেই আমার নিকট অকপটে স্বীকার করে গেছেন। সত্যিই, রাজদরবারের মান্যগণ্য সজ্জনদের মধ্যে আমি যেন 'হংস মধ্যে বক যথা'! তাই আমি অমন মুখচোরা, তাতে আমি অবশ্য কিছু মনে করি না। আমার তা গা-সহা হয়ে গেছে। এ যে কখনো শুধরে নিতে পারব না, আমি জানি। সম্রাজ্ঞীও সেদিন বলছিলেন, ওঁদের সামনে যেন আমি বড় একটা নিজেকে জাহির

করতে না চাই। তবু ওঁরা আর সকলের চাইতে আমাকে কিন্তু অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে জানেন।'

[আর্থার ওয়েলি : ভূমিকা—'জেঞ্জী কাহিনী']

'জেঞ্জী কাহিনী'র অনুরূপ আর একটি উপন্যাস হলো 'ইস্ই কাহিনী'। 'ইস্ই কাহিনী'র একটি আখ্যায়িকা এখানে উৎকলন করা গেল।

দূর গাঁয়ে বাস করত এক লোক, এক দিন সে তার প্রিয়াকে ডেকে বলল : মামলা ব্যাপারে তাকে আলাদতে যেতে হচ্ছে, এ বলে সে তার প্রিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করলে। এদিকে তিন বছর কেটে গেল, দয়িতের ফেরার নাম নেই। মেয়েটি দীর্ঘদিন ধরে একক নিঃসঙ্গ জীবন কাটালে, অবশেষে বিরহ যাতনা আর সহ্য করতে না পেরে অপর এক যুবকের সঙ্গে রাত্রি যাপন করতে সম্মত হলো। আর সে রাত্রেই ফিরে এলো তার প্রেমিক। করাঘাত করে দোর খুলে দিতে বললে সে তার আপন প্রিয়তমাকে। প্রিয়া কিন্তু তার দরজা দিলে না খুলে। জানলা দিয়ে শুধু একটি কবিতা ছুঁড়ে দিলে :

'তিন তিন বছর একলা নিশি যাপন করলুম তোমার পথপানে চেয়ে! আর আজ রাত্রে যেই আর একজনের সঙ্গে শয্যা গ্রহণ করতে যাচ্ছি এমন সময় আগমন হলো তোমার!'

পূর্ব প্রেমিকও প্রত্যুত্তর দিলে কবিতায় :

'ভালবাসতে চেষ্টা করো ওকে, আমি যেমন দীর্ঘ এতকাল তোমায় ভালবেসে এসেছি!'

কবিতাটি লিখে সে ধরলে ফেরার পথ। কিন্তু প্রিয়া তাকে পিছু ডাকলে :

'যা কিছু ঘটল আর যা কিছু ঘটে নি, পূর্বের মতো কিন্তু তুমি এখনো আমার প্রিয়।'

তবু তার প্রিয়তম ফিরল না আর। অনুতাপে দগ্ধ হয়ে ছুটে চলল সে তার পিছু পিছু। কিন্তু সন্ধান পেল না প্রিয়তমের। চলতে

চলতে এবার সে এসে পৌঁছল স্বচ্ছ এক স্রোতস্বিনীর তীরে। হাঁটতে আর পারছিল না সে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল স্রোতস্বিনীর পারে। আর আঙুল কেটে রক্তের অক্ষরে এক শিলার বুকে সে শুধু লিখে জানালে :

'সে গেল চলে। পারলুম না আটকাতে। আমার কথা ভাবলে না একবারটি। আমিও নিলাম বিদায়।'

সে ফেললে শেষ নিশ্বাস।

'নো' ও 'তনকা'

জাপানী সাহিত্যে নাটক পূর্ণাঙ্গীন রূপ অর্জন করে চতুর্দশ শতকে। ইতিপূর্বে পাল-পার্বণে আনুষ্ঠানিক নৃত্যগীতই ছিল জাপানী নাট্য-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। চতুর্দশ শতকেই প্রথম গীতধর্মী 'নো' নাটকের বিকাশ। কাব্য-জগতে এই সময় 'তনকা' টাইপের সার্থক 'হাইকু' কবিতার প্রচলন হতে থাকে। কবি মাৎসুও বাসো (খৃষ্টীয় ১৬৪৪-৯৪) ছিলেন এই 'হাইকু' বা 'হোক্কু' কবিতার শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এঁরই কবিতার অনুবাদ করেছেন তাঁর 'জাপান-যাত্রী'তে।*

কবির অনূদিত একটি জাপানী কবিতা :

'স্বর্গ এবং মর্ত্য হচ্ছে ফুল,
দেবতা এবং বুদ্ধ হচ্ছেন ফুল—
মানুষের হৃদয় হচ্ছে ফুলের অন্তরাত্মা।'

ক্ষুদ্রাকার এই কবিতাকেই বলা হয় 'তনকা' বা 'ওয়াকা'। তনকা হলো পাঁচ চরণের (৫+৭+৫+৭+৭=৩১) ৩১ অক্ষর বা মাত্রাবিশিষ্ট কবিতা। মিল বা ছন্দের খুব একটা প্রয়োজন হয় না (জাপানী কবিতামাত্রই তো ছন্দপ্রাণ!)। আবেগময়, ব্যঞ্জনাত্মক আর গীতধর্মী হতে হবে এ শ্রেণীর কবিতাকে। মোদ্দা কথাটি ছাড়া বাহ্যাড়ম্বরের অবকাশ নেই। মানুষ, প্রকৃতি বা মানবীয় প্রেম 'তনকা'র বিষয়বস্তু। 'ম্যানিওসু'-র শতকরা নব্বুইটি কবিতাই 'তনকা' জাতীয়।

ম্যানিওস্থ-তে দীর্ঘাকৃতি 'ছোক' শ্রেণীর কিছু কিছু কবিতাও যে স্থান পায় নি, এমন নয়। কয়েকটি তনকা কবিতার নমুনা নীচে পেশ করা গেল :

'বসন্ত কাল সবুজ মাঠ
এসেছিলাম ভায়লেট ফুল তুলতে,
সারা রাত কিন্তু ঘুমিয়েই কাটালুম—
এমনি মুগ্ধ করে তুলেছিল সবুজ মাঠ।'

[ইয়ামাবে নো আকাহিটো : ৮ম শতক]

আর একটি তনকা :

'আমি যখন মগ্ন ছিলাম দিবা নিদ্রায়
প্রিয়া এসে দেখা দিল নিমিষের জন্য,
দিবাস্বপ্নই হবে বুঝি
অটুট হলো বিশ্বাস।'

[ওনো নো কোমাচি : ৯ম শতক]

'হ্যাইকু' বা 'হক্কু' তনকার অনুরূপ কবিতা। তার অক্ষরমাত্রা ৫+৭+৫=১৭, আর চরণ মাত্র তিনটি। তনকার মতোই মানুষ, প্রকৃতি আর প্রেম তার প্রধান বিষয়বস্তু; তেমনি ইঙ্গিতময়, প্রতীকধর্মী আর সংক্ষিপ্ত। 'হ্যাইকু'-র প্রচলন শুরু হলে 'তনকা'র জনপ্রিয়তা বহুলাংশে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে।

মাৎসুও বাসো লেখাপড়া শিক্ষা করেন কিয়োটায়। ইডো যুগের তিনি ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। কবিতা গাঁথার গতানুগতিক প্রথা ছেড়ে তিনি নিজস্ব 'শফু' ঢঙের কবিতার প্রবর্তন করেন যা সহজ সাবলীল প্রকাশ ধর্মে ও প্রতীকে অনন্য। মাৎসুও বাসোর এই সৃষ্টি 'হ্যাইকু' কাব্যকে রসসমৃদ্ধ করে নতুন মর্যাদা দান করে। পরবর্তী-কালের বহু কবিই তাঁর কাব্য-রীতি অনুসরণ করেন। তাঁর উত্তরসাধক 'হ্যাইকু' কবিদের মধ্যে ইনমোতো কিকাকু (১৬৬১—১৭০৭), কাগা নো চিয়ু (১৭০৩—৭৫), তানিগুচি বুসন (১৭১৬—৮৩), কোবায়াসি

ইসা (১৭৬৩—১৮২৮), মাসাওকা সিকি (১৮৬৬—১৯০২), নাৎসুমে সোসেকি (১৮৬৭—১৯১৬), ওনো বুসি (১৮৮৮—), তাকাহামা কিওসি (১৮৭৪—), মুরাকামি কিজো (১৮৭০—) প্রমুখ অনেকেই সবিশেষ খ্যাত।

মাৎসুও বাসোর একটি 'হ্যাইকু' চেরীফুল :

'মেঘের চূড়া
চূর্ণ হলো—
চাঁদের হাসি হাসল পাহাড়।'

জাপানী কবিতার মধ্যে হ্যাইকু যে 'তনকার' মতো শতেরোটি অক্ষরবিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকার স্বয়ংসম্পন্ন কবিতা, তা আগেই বলা হয়েছে। গুটিকয়েক শব্দের সংযোজনে হ্যাইকু কবি যে সুন্দর একটি চিত্র তাঁর অগণিত পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরেই ক্ষান্ত হন তা নয়, নিপুণ শিল্পীর হস্তে, না-বলা অনেক কথার হদিস পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে হ্যাইকু কবিতার প্রচলন হতে দেখা যায়। ফুজিওয়ারা নো সদেয়া তাঁর সংকলিত 'সিন কোসিনসু' ও 'হিয়াকুনিন ইস্যু' কাব্যগ্রন্থে সার্থক বহু হ্যাইকু কবিতার নমুনা সংগ্রহ করেছেন। যেমন—

'চেরীফুলের পাপড়ি
যেন এক পক্ষ-সঞ্চালনী মরাল,
এলো ঝড়!'

কবি মাৎসুও বাসোর (১৬৪৪—৯৪) হাতে হ্যাইকু কবিতার পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্তি হয়। সহজ অকপট নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর চিত্রাঙ্কনেই তিনি শুধু ক্ষান্ত ছিলেন না, অন্তঃগূঢ় এক মহত্তর ভাব-সমৃদ্ধির সন্ধানও তাঁর কাব্যে পাওয়া যায়।

হ্যাইকু কবিতা প্রসঙ্গে কবি বাসোর পরেই তানিগুচি বুসন-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হ্যাইকু কবিতা তাঁর হাতে নতুন

আঙ্গিকের পারিপাট্য অর্জন করে। তিনি শুধু দরবারী কবিতা লিখতেন না, সাধারণের বোধগম্য চলিত ভাষায় পল্লীচিত্র অঙ্কনেও সমান সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বসন্তকালে এক বর্ষার চিত্র কবি নীচের এই দুটি হাইকুতে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ

১ ॥

'ওরে, বসন্তের বরষা
যেন প্রিয়ার কানাকানি,
একই সাথে চলেছি মোরা।'

২ ॥

'বসন্তের বরষা
এখনও হয়নি সিক্ত
ব্যাঙাচির বক্ষদেশ।'

হাইকু কবিদের মধ্যে ইসা'ই বুঝি ছিলেন সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি। ইসার জীবনটাই ছিল যেন আগাগোড়া একটা বিয়োগান্ত নাটক—দুঃখে ভরা আশা-হত জীবনের পুনরাবৃত্তিময়। কবি দু হাতে যা কিছু আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন, তারাই তাঁকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। ইসার কাব্য-দর্শন তারই প্রতিচ্ছায়া। তাঁর একটি কবিতা ঃ

'সর্পিল পদক্ষেপে এগিয়ে যা,
এগিয়ে যা, ওরে ক্ষুদ্রজনা—
ধীর পদক্ষেপে উঠতে থাক
ফুজিসান-এ!'

কবি ইসা পরলোক গমন করার সময়ে কোনো কবি-গোষ্ঠীকে উত্তরসাধক হিসেবে রেখে যান নি। বুসন-পন্থী কবির দলও শক্তিমান প্রতিভার অভাবে নিষ্প্রাণ কাব্য রচনা করেই খালি চলেছিলেন। মাসাওকা সিকি বুঝি ছিলেন তার ব্যতিক্রম। কবি মাসাওকার হাতে হাইকু কবি পেল যেন নতুন জন্ম। জলো নিষ্প্রাণ, গতানুগতিক

কাব্যধারায় তিনি যেন বয়ে আনলেন বস্তুকেন্দ্রিক সত্যিকারের জীবনসত্তার প্রাণগঙ্গা। মাসাওকার একটি কবিতা :

'মেঘের পাহাড় চূড়া,
সাদা পাল,
দক্ষিণে হলো পুঞ্জীভূত···'

তনকা, হাইকু, মাগাউতা, রেন্‌গা বা গাথা আকারে লিপিবদ্ধ কাব্য মোনোগাতারি প্রভৃতি হলো সে কালের জাপানী কাব্যের প্রস্রবণ। হাইকু-মোনোগা তারি প্রভৃতি কবিতা যন্ত্রসহযোগে গাওয়া হোত। এই প্রসঙ্গে জরুরী এবং নো (No) গীতিনাট্যকাব্যও উল্লেখযোগ্য। দরবারী গণ্ডির বাইরে পল্লী জাপানের বৃহত্তর পরিবেশ, তার হাসি-কান্নার একত্র সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায় এই সব জনপ্রিয় লোক-সাহিত্যে। ইংরেজী লিমারিক (Limerick)-এর মতো হাস্য-কৌতুকমুখর মেনরিয়রের উল্লেখ এখানে করতে হয়। এই তো গেল সামন্তযুগীয় জাপানের কবিতার কথা। তারপর এলো নতুন যুগ, নতুন জাপান। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় দীক্ষিত জাপানী সাহিত্যের উন্মেষ হলো পূর্ব এশিয়ার দিগন্তে। তারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

আধুনিক কবিতা

গান ॥

'গেয়ো না গান,
গান গেয়ো না লাল ফুলের কিংবা
প্রজাপতির চটুল ডানার।
গেয়ো না গান মলয়ানিল কিংবা
প্রিয়ার কুন্তল সৌরভের।
তফাত রাখো যা কিছু পঙ্গু
যা ম্রিয়মাণ,
যা কমনীয়
যা কিছু মিথ্যা।

করো বর্জন যা শোভন
আর করো গান যা খালি সত্য।
উদর যাক ভরে,
বক্ষ উঠুক প্লাবিত অলস অবসন্ন মুহূর্তে।
গাও সেই গান যে গান
পদানত মানুষের মৌন ভাষা
অপমান
আর কলকণ্ঠে গাও এই গান : আশার বাণী
গান নয়
যেন এই সব
হাতুড়ির ঘা
পথচারী জনতার বুকে।'

[নাকানো শিজেহারু (জন্ম ১৯০২—)]

আর একটি গান ॥

'সংক্ষিপ্ত মোর গানগুলি
তাইতো লোকে ভাবছে বসে
আমি নাকি কথার চোরা ভাণ্ডারী।
ভাবে ওরা। কতটুকু মোর দান
কিবা মোর সংযোজন?
মাছের মতো নই তো আমি,
হৃদয় আমার সাঁতার কাটে জলের বুকে
গান গাই,
থামবে গান দম ফুরালে।'

[ই   নো আকিকো (১৮৭৮-১৯৪২)]

রাতের রেলগাড়ি ॥

'দিন-ভাঙার ধূসর ফ্যাকাশে আলো
ঘাসের দুয়ারে আঙুলের ছাপ ঠাণ্ডা শীতল,
আর পর্বত কিনারা নগ্ন শুভ্র
রূপার পাতে লেখা এখনও ঝলমল।
যাত্রীরা সব জাগেনি বুঝি এখনও,
মিটি মিটি জ্বলছে খালি বিজলি আলো।
বার্নিশএ মিঠা-কড়া গন্ধ—অসুস্থ,
আমার চুরুটের ঝাপসা ধোঁয়াতেও বুঝি
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হয়ে এলো
রাতের রেলগাড়িতে।

মন্দ কতখানি সহজেই অনুমেয় যে
কোনো এক স্ত্রীলোকের পক্ষে,
ইয়ামাশিনা এখনও কি যায়নি পার হয়ে ?
হাওয়া-বালিশের ছিপিটা সে দিলে খুলে
দেখলে চেয়ে ফাঁপান বালিশটা
তুমড়ে গেল ক্রমে ক্রমে।

দুঃখের ছায়া যেন নামলো সহসা
আর তার টানে আকৃষ্ট হলাম আমরা দুজন।
জানালার বাইরে আমি এবার তাকালাম
ট্রেনের জানালার বাইরে ; ভোর হয়ে
এসেছে, পার্বত্য পল্লী
অজানা অচেনা স্থান
পুষ্পিত হয়ে উঠেছে অদূরে
বুঝি এক শুভ্র কলামহিন্স-এর কলি !'

[হাজিওয়ারা সাকুতারো (১৮৮৬-১৯৪২)]

জাপানী কবিদের মধ্যে যিনি বোধ করি এদেশে (বিশেষ করে বাংলায়) সর্বাধিক পরিচিত তিনি হলেন য়োনে নোগুচি। শিক্ষা-দীক্ষা তাঁর মার্কিন মুল্লুকে। সাহিত্যের হাতেখড়িও বলতে গেলে সেখানে। জাপানী ও ইংরেজীতে কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। গত মহাযুদ্ধের আগে নোগুচি ভারতেও এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের তিনি ছিলেন অনুরক্ত। নোগুচির বহু কবিতা বাংলায় অনূদিত হয়েছে। 'সিন এ্যাণ্ড আনসিন' তাঁর ইংরেজী কাব্যগ্রন্থ। নোগুচির একটি কবিতার বাংলা অনুবাদ ঃ

বর-ভিক্ষা ।।

'চিত্তহারিণী জাপানী বালিকা
ওহারু তাহার নাম,
বুকে তার চেরী-ফুলের স্তবক
রক্তিম অভিরাম !
জানু পাতি বালা পতি-বর মাগে
প্রজাপতি মন্দিরে,
থরে থরে ফুটে চন্দ্রমল্লি
ওহারুর তনু ঘিরে।

'কহিছে ওহারু করযোড়ে "প্রভু !
দাও মোরে হেন বর,
উৎসুক যার উষ্ণ নিশ্বাসে
নিবে আসে চরাচর,
নিশ্বাস যার নেশা হয় ক্ষণে
ক্ষণেকে দৃষ্টি হরে।"
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি
চেরী-ফুল থরে থরে।

' "দাও, প্রজাপতি। দাও মোরে পতি
দাও মোরে হেন বর,
গোপন সানুর মর্ম্মর সম
যার কণ্ঠের স্বর ;
সেই সানু দেশে চুপে চুপে পশে
বাসন্তী চাঁদ একা।"

ওহারুর বুকে চারু চেরী-ফুল
চন্দ্রমল্লি লেখা।
হেন পতি দাও কটাক্ষ যার
পাগল করিবে প্রাণ,—
আফিম ফুলের রক্তিম বীথি
মৃদু বায়ে আন্‌চান্‌।

ভালবাসা যার কানন উদার
পাখী-ডাকা, ছায়া-ঢাকা।
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি
মুখে চেরী-ফুল আঁকা।

"দাও হেন বর সাগরের মত
গম্ভীর যার বাণী,
আন্‌ ভুবনের অজানা সুরভি
পরাণে মিলাবে আনি,
কল্প-আঙুলে ফুটাবে যে মোর
সকল পাপ্‌ড়িগুলি !"
ওহারুর প্রাণে চন্দ্রমল্লি
চেরী-ফুল উঠে ছুলি !
"দাও হেন স্বামী যে আমার পানে
চাহিবে সহজ সুখে।

'যে চোখে শ্যামল প্রান্তর চায়
উষার অরুণ মুখে,
চুম্বনে যার তরুণী ওহারু
নারী হবে রাতারাতি !"
ওহারুর চোখে চন্দ্রমল্লি
চুলে চেরী-ফুল পাঁতি।

"দাও হেন বর হাসে ভাষে যার
প্রাণে সান্ত্বনা আসে,
কাব্য-ভুবনে জোছনার মত
রহিবে যে পাশে পাশে ;
স্নেহ হবে যার মধুর উদার
নিদাঘের শ্যাম ছায়া।"
চন্দ্রমল্লি ওহারুর প্রাণে,
চেরী-চারু তার কায়া।

"দাও হেন পতি যাহার মূরতি
হৃদে অহরহ রয়।
জনমের আগে সাথী যে ছিল গো
মরণে যে পর নয় ;
জন্ম-তোরণে জন-অরণ্যে
হারায়ে ফেলেছি যায়।"
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি
চেরী-ফুল মূরছায়।

"দাও সে যুবকে আছে যার বুকে
অঙ্কিত মোর নাম।
যদিও বলিতে পারিনে এখন
কবে তাহা লিখিলাম।

'কোন্ সে জনমে কোন্ সে ভুবনে
কোন্ বিস্মৃত যুগে !"
চেরী-ফুল মনে চন্দ্রমল্লি
জাগে ওহারুর বুকে !'

['কাব্য-সঞ্চয়ন' : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত]

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জাপান প্রথম সাগর-পারের বিদেশী বণিকদের সংস্পর্শে আসে। বিদেশীদের মধ্যে পর্তুগীজ নাবিকরাই প্রথম সূর্যমামার দেশ নিপ্পনে পদার্পণ করেছিল। পর্তুগীজ হারমাদদের পর ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকেরা আসতে থাকে একে একে। কিন্তু জাপানের তকুগাওয়া সামন্তরা শ্বেত-গৃধ্র এসব বিদেশী বণিকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং পুরো দু শ' বছর পর্যন্ত বিদেশীদের কাউকে জাপানের পাশ ঘেঁষতে দেয় না। জাপানের এ যুগ 'ইডো' নামে খ্যাত। সমগ্র বহির্বিশ্ব থেকে জাপান একরূপ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এ সময়। কাজেই এ সময়কার জাপানী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য আপন অন্তরঙ্গের দিকে যতখানি, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের দিকে ততখানি নয়। পুরুষগণ কর্তৃক অভিনীত এক ধরনের 'কাবুকি' নাটকও এ সময় লোকপ্রিয় হয়ে ওঠে। ইডো যুগের উপন্যাসও রাজ-রাজড়াদের দরবারের জাঁক-জমকময় পরিবেশ পরিত্যাগ করে জনসাধারণের দিকে প্রথম মুখ ফেরাল। জনসাধারণ এতদিন ছিল উপন্যাসে অপাংক্তেয়, অবজ্ঞেয়। তাদের সুখ-দুঃখ এবার কিছু কিছু উপন্যাসে স্থান পেতে লাগল। আইবাবা (খৃষ্টীয় ১৬৪২-৯৩) সমসাময়িক জীবনধারার ভিত্তিতে নতুন ধরনের এক উপন্যাস রচনার প্রথম সূত্রপাত করেন।

আধুনিক যুগ

১৮৬৮ থেকে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ পার্ল হারবারে জাপানী সমর-শক্তির চমকপ্রদ সাফল্য পর্যন্ত জাপানী সাহিত্যের ধারায় আধুনিক

কাল বলা যেতে পারে। তারপর আসে সমকালীন যুগ। ১৮৬৭ সালে তকুগাওয়া সামন্তপ্রথার অবসান হয় এবং মিকাডো বা জাপ সম্রাটের ক্ষমতা হলো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। শুধু তাই নয়, জাপানের শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রভূত রূপান্তর হতে থাকে। বিদেশী সাহিত্য ও ভাষানুশীলনের মাধ্যমে পাশ্চাত্য ভাবধারা ও আধুনিক শিল্প-বিজ্ঞান প্রচারিত হতে থাকে জনসাধারণের মধ্যে। অনুবাদ সাহিত্যের মারফত জনসাধারণ রুশো, ভলতেয়ার, মণ্টেগু, মিল, বেন্থাম প্রভৃতির ভাবাদর্শে প্রভাবান্বিত হয়ে ওঠেন। জাপানী লেখকগোষ্ঠীও নতুন রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকর হন। য়্যানফুমিও, ফুকুজাওয়া ইউকিচি (খৃষ্টীয় ১৮৩৪-১৯০১), তুবাউচি শোয়া (খৃষ্টীয় ১৮৫৯-১৯৩৫) প্রভৃতি প্রতিভাবান লেখকরা নতুন করে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ব্যাখ্যায় লেগে গেলেন নিজেদের সৃষ্ট রচনায়। প্রসিদ্ধ সমালোচক ও নাট্যকার তুবাউচি-র যুগান্তকারী প্রবন্ধ-পুস্তক 'এসেন্স অফ দি নভেল' বা উপন্যাসের সারমর্ম (প্রকাশ কাল ১৮৮৬) এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বইতে তিনি আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাস রচনার উপাদান নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন এবং জাপানী নীতিবাগীশদের মুখোশ দেন খসিয়ে। তুবাউচি-র নাটকগুলিতে শেক্সপিয়রের প্রভাব লক্ষ্য করবার মতো। জাপানী নাট্যশালারও তিনি প্রভূত সংস্কারসাধন করেন।

তুবাউচি-র মতো ফুতাবাতিয়াই সিমাই, য়্যামাদা বিমিও এবং ওজাকি কোয়াও তখনকার দিনের শক্তিশালী লেখক। ওজাকি-র প্রেমের কাহিনী 'ভগ্ন-হৃদয়া' ও 'সোনালী দানব' আগ্রহ সহকারে জাপানী পাঠক এখনও পড়ে থাকে। মেয়েদের মধ্যে হিগুচি ইচিয়ো-ই হলেন বোধ হয় সেরা লেখিকা। 'তাকেকুরাবে'ই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তোকুতোমি রোকা-র নাম ঔপন্যাসিক বলে যতখানি নয়, আত্ম-চরিতকার হিসেবে তার চেয়ে বেশী। 'প্রকৃতি ও মানুষ' তাঁর নামকরা আত্মজীবনী।

মেইজী যুগের (খৃষ্টীয় ১৮৬৮-১৯১২) শেষের দিকে জাপানী সাহিত্যে ন্যাচারেলিজ্‌ম বা অনুকৃতিবাদ বিশেষভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। প্রচলিত জলো রোমান্টিক রচনার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়াও দেখা দেয়। টলস্টয়, জোলা, ইব্‌সেন, হাক্সলি, ডারউইন, নীটশে প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীদের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাপানী লেখকরা কেবল মাত্র 'আর্টের জন্য আর্ট' সৃষ্টিতে বিমুখ হয়ে উঠলেন। এঁদের চোখে জাপানী সাহিত্য কেবল নীল আকাশ, চেরীফুল আর কিমনোর আশপাশের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে চাইল না। শিমারো হোগেৎসু প্রভৃতি সমালোচকরাই এই ন্যাচারেলিজ্‌ম আন্দোলনের উদ্যোক্তা। কবি শিমাজাকি পাশ্চাত্য ধরনের কবিতা 'শিনতাই'-র প্রবর্তক। 'আই'ই (দুই পরিবার), 'হারু' (বসন্ত) প্রভৃতি নামকরা কয়েকখানি উপন্যাসও তাঁর লেখা। এ সব উপন্যাসে সামন্ততান্ত্রিক জাপানী সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন তিনি। সমাজ-সংস্কারমূলক তাঁর 'হারু' (প্রকাশ কাল ১৯০৮) উপন্যাসখানি তরুণ লেখকগোষ্ঠীর উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। দু খণ্ডে সম্পূর্ণ তাঁর সুবৃহৎ উপন্যাস 'ওয়াকে মাই' (সূর্যোদয়ের পূর্বাহ্ণে) রচনা করতে লাগে তাঁর পুরো ছয়টি বৎসর। প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা দেড় হাজারের মতো। এর নায়ক হান্‌জু হলো গ্রাম্য এক বুদ্ধিজীবী। মেইজী পুনরভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লেখক তৎকালীন জাপানের সাধারণ মানুষের ইতিহাস, সমাজ-ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি-ধাবার অনবদ্য এক আলেখ্য অঙ্কিত করেছেন এই উপন্যাসে সহজ, সরল ও সাবলীল ভঙ্গিতে। বস্তুত জাপানী সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে শিমাজাকির এপিক উপন্যাস 'ওয়াকে মাই'।

ন্যাচারেলিস্ট এ সব সাহিত্যের বিরুদ্ধধর্মী সাহিত্যও যে কিছু রচিত হয় নি এমন নয়। নাৎসুমি সোসেকি এর বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ লেখনী

ধারণ করেন। তাঁর 'আমি হলাম বেড়াল', 'বোটচান' প্রভৃতি ব্যঙ্গ-রচনা সেরা কাটতি জাপানী বইয়ের পর্যায়ভুক্ত।

মেইজী যুগের শেষের দিকে জাপানী কথা-সাহিত্যে ন্যাচারেলিজ্‌ম বা অনুকৃতিবাদের যে জোয়ার আসে তার মূল উৎস স্বদেশ নিপ্পনে নয়—ছিল সুদূর ফ্রান্সে। কাতাইতায়ামা, তস্নু শিমাজাকি প্রভৃতি এই মতাবলম্বী শক্তিধর কথাশিল্পীরা ব্যষ্টির চাইতে ব্যক্তিবিশেষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার সংগ্রাম, তার ব্যর্থতার পূর্ণাঙ্গীন বাস্তব চিত্র অঙ্কনেই মশগুল হয়ে থাকতেন। জীবনটাকে দেখতেন তাঁরা কাব্যের কাঁচের মাধ্যমে। সাহিত্য ক্ষেত্রে আদর্শের তাঁরা ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। এঁদের কাছে জীবনের সুর কেবল নিষ্প্রাণ, নিরানন্দময়—মানুষ শুধু অসহায় নিয়তির দাসমাত্র।

অপর দিকে সুজুকি, ওগাওয়া, মরিতা প্রভৃতি আর এক দল রোমান্টিক লেখকের আবির্ভাব হয় যাঁরা হলেন মানুষের অন্তর্গূঢ় সহজ ধর্মে বিশ্বাসী। সাহিত্য-মুকুরে জীবনের পরিপূর্ণ সুন্দর পরিবেশ প্রতিফলিত করাই তাঁদের সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান লক্ষ্য। এজন্য বোধ হয়, পরবর্তীকালে সুজুকি ও ওগাওয়া শিশু-সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন পুরোপুরিভাবে।

কিকুচি কান এই দলের একজন সেরা লেখক। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তিনি প্রথম উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। প্রথম জীবনে তিনি অনেকগুলি সার্থক একাঙ্কিকা নাটিকাও রচনা করেন। বাংলার শরৎচন্দ্রের মতো তিনি জাপানের সাধারণ পাঠকদের জন্য সহজবোধ্য জনপ্রিয় উপন্যাসের অপূর্ব টেকনিক প্রবর্তন করেন। 'সান কাতাই' (তিন পরিবার), 'সানাই' (জয়-পরাজয়), 'মাদাম পার্ল' প্রভৃতি লোকপ্রিয় তাঁর উপন্যাসগুলি জাপানী কথা-সাহিত্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-মহিমায় উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। আকুতাগাওয়া রাইনেসুকি-ও (খৃষ্টীয় ১৮৯২-১৯২৭) একজন সেরা কথা-সাহিত্যিক। তাঁর লেখা 'রসোমন' আর 'হানা' (নাসিকা) খুবই নামকরা। আন্তর্জাতিক ফিল্ম

উৎসবের দৌলতে আকুতাগাওয়া-র 'রসোমন' চলচ্চিত্রটি একদা এ দেশেও অকুণ্ঠ সমাদর লাভ করেছিল।

একদল পণ্ডিত লেখকগোষ্ঠীও এই ন্যাচারেলিজ্‌ম-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। এ দলে ছিলেন কিওতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসী সাহিত্যের অধ্যাপক বিন উইদা, ডক্টর ওগাই মোরি, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক সোসেকি নাৎসুমি প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ। অধ্যাপক নাৎসুমির প্রভাব তরুণ জাপানী লেখকদের উপর বিপুল আকারে দেখা দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানী সাহিত্যে হঠাৎ ধর্মঘেঁষা আর একশ্রেণীর উপন্যাস রচনার দিকেও বিশেষ ঝোঁক যায়। কাগাওয়া তাওহিকো ও কুরতা মমজো-র নাম এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

তাইসো যুগ

কাজেই দেখা যায়, ন্যাচারেলিজ্‌ম-পন্থীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া দানা বাঁধতে থাকে তাইসো যুগে (খৃষ্টীয় ১৯১২-২৬)। 'হোয়াইট বার্চ স্কুল'-পন্থী ও তার মুখপত্র 'শিরাকাবা' পত্রিকা এ আন্দোলনের পথিকৃৎ আর মুশাকোজি হলেন তার নেতা। একমাত্র তাকিও অরিশিমা ছাড়া 'শিরাকাবা' পত্রিকার সকল লেখকই ছিলেন বয়সে অতি তরুণ। আদর্শনিষ্ঠ মুশাকোজির জীবন-দর্শন অনেকটা ঋষি টলস্টয়ের উদার মানবিকতা ও কবি হুইটম্যানের উৎকট মহাপ্রাণতার অপূর্ব সমন্বয় বলা চলে। আদর্শবাদী মুশাকোজি জাপানী পাঠকদের দৃষ্টিকোণ দিলেন উন্মোচন ও প্রসারিত করে। নতুন করে জাগিয়ে তুললেন তাদের মধ্যে বস্তুমূল্য-বোধ—কেবল সাহিত্যে নয়, অপরাপর সুকুমার শিল্পচর্চাতেও তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়ল।

তবে 'শিরাকাবা' পত্রিকার অধিকাংশ লেখকই ছিলেন ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। এঁরা মুশাকোজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও সাহিত্যিক জীবনে হলেন নিজ নিজ রচনারীতির পরিপোষক। তাকিও অরিশিমা আর নাওয়া শিগা তার মধ্যে বিশেষ নামকরা। অরিশিমা কেবল

মানুষের আত্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাদের আত্মশক্তিতেও ছিলেন আস্থাবান। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অধিকতর বস্তুতান্ত্রিক, বিশ্লেষণপন্থী ও সমালোচকধর্মী। মানুষের সদিচ্ছাতে তিনি পুরোপুরি বিশ্বাসী হলেও তিনি জানতেন, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক পরিবেশের ঘূর্ণিপাকে মানুষ তার সহজাত মানবধর্ম পরিহার করতে যে পারে না, তা নয়। ওকে দূর করতে হলে চাই সমাজতন্ত্রবাদ। ১৯২২ সালের জানুয়ারী মাসের এক 'ঘোষণায়' তিনি তাই জানালেন :

'ধনী ও বুর্জোয়া সমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব সমাজ-কল্যাণের উদ্দেশ্যে, নির্বিত্তদের জন্য পথ করে দেওয়াই তাদের কর্তব্য।'

নিজের ঘোষণামত তিনি তাঁর হোক্কাইডোর জমিদারি আপন প্রজাদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। নিজের এ আদর্শ ও ত্যাগনিষ্ঠা সত্ত্বেও তিনি নির্বিত্তদের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে চলতে পারলেন না। তাই জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে পরে আত্মহত্যার পথই তিনি বেছে নেন। নাওয়াশিগা 'শিরাকাবা'-গোষ্ঠীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। সহজ, প্রাঞ্জল ভাষা, অভিনব রচনাভঙ্গি, শব্দ-চয়ন ও রুচিবান লিপি কুশলতার মাধ্যমে তিনি আধুনিক জাপানী গদ্য-সাহিত্যের সেরা নিদর্শন সৃষ্টি করে গেছেন।

আদর্শবাদী অরিশিমার শোচনীয় পরিণাম থেকে প্রমাণিত হয় বিদেশের নতুন নতুন বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় যুদ্ধোত্তর জাপানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি কি ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। দেশের দ্রুত শিল্প-সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে শোষিত শ্রমিকদের সংগ্রামও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। জাপানের যুব-লেখক সম্প্রদায়ের অনেকেই এই শ্রেণী-সংগ্রামকে বরণ করে নেন। তাঁরা লেখনী ধারণ করলেন সর্বহারা এ সব নিপীড়িত মানবাত্মার স্বপক্ষে। 'তানেমাকুহিটো' (বীজ-বপনী) পত্রিকাই ছিল তাঁদের প্রধান হাতিয়ার। কইচিরো মেইডুকো, সুইকিচি ওনো, হাতসুনোসুকি হিরাবায়াসি, উজাকু আকিতা

প্রভৃতি বামপন্থী লেখকেরা ছিলেন 'তানেমাকুহিটো'র নিয়মিত লেখক। 'তানেমাকুহিটো'র পর 'বুনজিআই সেন্‌সেন' (সাহিত্য রণভূমি) পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'জাপানী নির্বিত্ত সাহিত্যিক সঙ্ঘ' নামে এক প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী প্রতিষ্ঠানও সংগঠিত হয়।

এ সময় জাপানে আর এক দল লেখকগোষ্ঠীরও আবির্ভাব হয় যাঁরা বামপন্থী নন কিংবা 'বার্চ স্কুল'-পন্থীও নন। রাজনৈতিক বা দলীয় রেষারেষির উর্ধ্বে 'নির্জলা সাহিত্যের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি'ই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। 'সিন-সিচো' (নয়া ধারা) ছিল তাঁদের মুখপত্র। কান কিকুচি, বাইনোস্থকি আকুতাগাওয়া, মাসাওস্থকি আকুতাগাওয়া, মাসাওকুমি প্রভৃতি রোমান্টিক শক্তিশালী লেখকবর্গ ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক।

তাইসো যুগের শেষ পাদে সু-রিয়ালিস্ট নামে আর এক শ্রেণীর কথাশিল্পীর আবির্ভাব হয়। রীচি ইকোমিট্‌সু, কাওয়াবটা, কাতাওকা, নাগাগাওয়া প্রভৃতি সু-রিয়ালিস্ট লেখকদের হাতে জাপানী কথা-সাহিত্য সার্থক প্রকাশভঙ্গি, অনবদ্য সুন্দর উপমা ও নতুন বিষয়বস্তুতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

সোয়া যুগ

সোয়া যুগ যখন শুরু হয় তখন সোসেকি, বিন উইদা ও অরিশিমা ছাড়া সমসাময়িক লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রায় সকল লেখকই ছিলেন বেঁচে। লেখনীও তাঁদের নিরত ছিল না। দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাপানী পাঠকসংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল ক্রমশ। প্রকাশক মহলও এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়লেন না। সুলভ সংস্করণ "এক ইয়েনি" (এখানকার প্রায় আড়াই টাকার মতো) পুস্তক ছাপতে তাঁরা লেগে গেলেন কোমর বেঁধে।

কাইঝোসা এ সময় 'সমকালীন জাপানী সাহিত্য' (৬৩ খণ্ড) প্রকাশিত করেন। আর তার কাটতি ছিল বছরে ৪ লক্ষ কপি। শিন্‌চোসার 'বিশ্ব-সাহিত্য' (৫৯ খণ্ড), সুনিওডোর 'মেইজী ও তাইসো

যুগের লেখক-গ্রন্থাবলী' (৪৮ খণ্ড), সুনজোসা-র 'বিশ্বের মহামনীষী' (১৫৪ খণ্ড), দাইচি সোবো-র 'আধুনিক নাটক' (৪৪ খণ্ড) ও আইওয়ানমি-র সস্তা পকেট সংস্করণগুলির লক্ষ লক্ষ কপি জাপানী পাঠকমহল সাদরে গ্রহণ করে নেয়।

প্রগতিশীল বামপন্থী লেখকবর্গের পক্ষেও হাওয়াটা অনুকূলে বইতে থাকে। কইচিরো মেইডকো, কানেকা, হিরাবায়াসি, কিই মোরিমোরি, ফুসাও হায়াসি প্রভৃতি "জাপানী নির্বিত্ত লেখকও শিল্পী সঙ্ঘের" (NAPF) লেখকদের হাতে গণসাহিত্যও নতুন বাঁক নেয়। এ সঙ্ঘের মুখপত্র 'সেন্‌কি' বা রণ-পতাকা তার ঝাণ্ডাতলে প্রগতিশীল বিভিন্ন লেখক, কবি, নাট্যকার ও শিল্পীকে সমবেত করার কাজে লেগে যায়। প্রাচীন তনকা-কবিতা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশে 'নির্বিত্ত তনকা-কবি সঙ্ঘ'ও (KOPF) একটি সংগঠিত হয় (খৃঃ ১৯৩১)। 'বিত্তহীন সংস্কৃতি' পত্রিকা এ আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে (১৯৩১-৩৪)। কোবায়সির 'কারা অন্তরালের ফুল', কিসি সান্‌জির 'কমরেড লণ্ড' প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করে পারা গেল না।

'তেরোজনের ক্লাব'

নয়া এ গণ-সাহিত্য আন্দোলনের ধারা বেশী দিন আর অব্যাহত রইল না। 'তেরোজনের ক্লাব' নামে শক্তিশালী এক কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রতিষ্ঠান এ সময় গড়ে উঠে। (তাকিও ক্যাটো, শিরোও-জাকি, সুরাও নাকামুরা, কাওয়াবাতা প্রভৃতি বিশিষ্ট লেখকবর্গ এ ক্লাবের সদস্য।) 'তেরোজনের ক্লাব' এই সাহিত্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে শাণিত অস্ত্র হানতে শুরু করল। এ সময় আবার ঘটল 'মাঞ্চুরিয়ার ঘটনা' (খৃঃ ১৯৩১)। আর শাসকবর্গের আদেশে দেশের সব রকমের স্বাধীন মত ও ভাব প্রকাশের নিয়ন্ত্রণের পালা হলো শুরু। ফলে চীনের মূল ভূখণ্ডে ফ্যাশিস্ট জাপ সমর-শক্তির ব্যাপক আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের গণ-আন্দোলন ও গণ-সাহিত্যের কণ্ঠরোধ হতে লাগল।

এমন কি মৃত লেখকেরা রেহাই পেলেন না। একাদশ শতকের বিখ্যাত রচনা 'জেঞ্জী-কাহিনী' ও সপ্তদশ শতকের সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক সাইকাজুর রচনাকে নিষিদ্ধ করা হলো প্ররোচনামূলক অ-সাহিত্য বলে। আর সমসাময়িক যুগের রোকা তকুতোমির 'প্রকৃতি ও জীবন', মুসাকোজির 'চার বোন' প্রভৃতি বহু সার্থক রচনাকে বাজেয়াপ্ত করা হলো। বহু পত্রিকাকে দেওয়া হলো বন্ধ করে। জাপানী ফ্যাশিস্ট শাসকবর্গের সাম্যবাদ-বিরোধী এ মহাযজ্ঞ নির্বিবাদে চলল ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত। তারপর তো শুরু হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—পার্ল বন্দরে জাপানী সমর-শৌর্যের চটকদার কেরামতি।

যুদ্ধকালীন জাপানী লেখকদের আর কোনো স্বকীয় সত্তা রইল না। যাঁরা শারীরিক যুদ্ধক্ষম তাঁদের রণক্ষেত্রে পাঠান হলো। কাউকে বা পাঠান হলো অধিকৃত দেশ—নতুন জাপ-উপনিবেশগুলিতে বিজয়ী জাপানী সাংস্কৃতিক ধারা উদ্বুদ্ধ করে রাখতে। আর যারা অক্ষম বা অথর্ব, তাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার কোনো-না-কোনো কাজে মোতায়েন করা হলো। তাই যুদ্ধকালীন যে সব জাপানী সাহিত্য সৃষ্টি হয়, তার অধিকাংশই উদ্দেশ্যমূলক ও প্রচারধর্মী। কাজেই সাহিত্যিক রস-বিচারে অধিকাংশ হয়ত ধোপে টিকবে না। তবু আসিহিআই হিনোর ত্রয়ী উপন্যাস—'গম ও সৈনিক', 'মাটি ও সৈনিক' ও 'কুসুম ও সৈনিক'; তাৎসুজো ইসিকাওয়া এবং ফনিও নিওয়া-র 'কাইরান্নু চুতাই' ('যাঁরা আর ফিরল না'), 'কাইসেন' ('নৌ-যুদ্ধ ১৯৪২') প্রভৃতি রচনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'নানিওয়াবুসি' নামে এক লোক-সাহিত্য রচনার দিকেও জাপানী কর্তৃপক্ষ সাহিত্যিকদের উৎসাহিত করতে থাকেন।

এ কালের জাপানী নাট্যকারদের মধ্যে কাওয়াতাকে মোফয়ামি, ফুকুচি ওচি, তুবাউচি শোয়ো, ওকামতো কিডো, য়্যামামতো ইউজো, কুরাতা মমজো প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। জাপানী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ হলো তার কাব্য-সম্পদ। তার বৈশিষ্ট্য—সসকি নবুৎসুনা,

ওসানো হিরোসি, কুজো তাকেকো, মাসাওকা, তাকাহামা কিয়োসি, মুরাকামি কিজো, য়োনে নগুচি, ওনো বুসি, কিতাহারা হাকুস প্রভৃতি বিশিষ্ট কবিদের হাতে পুরোপুরি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। মৌলিক রচনার সঙ্গে সঙ্গে জার্মান, ফরাসী, ইংরেজী ও মার্কিন সাহিত্যের ঢালাই অনুবাদ হতেও শুরু হয়েছে। আমেরিকায় সেরা কাটতি বই বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই জাপানী ভাষায় তার অনুবাদ হয়ে যায়। ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' ও কবির আরও কয়েকটি বইও জাপানী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ অনুবাদ করেন স্নুবুরো মাসিনো। শিশু-সাহিত্যেও আইওয়া সাজানমি-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জাপানের তুইটি সমৃদ্ধ শহর—হিরোসিমা আর নাগাসাকিকে শক্তি-মদমত্ত বৈদেশিক তুশমনরা একদা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল সত্য আণবিক বোমার সাহায্যে; কিন্তু চির-সৌন্দর্যের লীলা-নিকেতন নিপ্পনের সাহিত্যসূর্য তাতে অস্তমিত হয় নি। হিরোসিমা আর নাগাসাকিরই চিতাভস্ম থেকে জাপানী হাসুনোহানা [জাপানী শব্দ: মানে—পদ্মফুল।—('চলন্তিকা')] নব-প্রস্ফুটিত পুষ্পকোরক নিয়ে জাপানী সাহিত্যে আবার আত্মপ্রকাশ করছে।

যুদ্ধোত্তর বা সমকালীন যুগ

হিরোসিমা আর নাগাসাকির ভস্মস্তূপ থেকে যে জাপানী হাসুনো-হানার পুষ্পকোরক জন্মলাভ করে আধুনিক জাপানী সাহিত্যের ইতিহাসে তাকে যুদ্ধোত্তর বা সমকালীন যুগ বলা যেতে পারে। ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে ম্যাকআর্থার কর্তৃক যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই জাপানের সাধারণ মানুষ স্বস্তির হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচল। বিগত পনেরো বৎসর ধরে জাপানী সমরনায়কদের বেপরোয়া অন্ধ চণ্ডনীতির ফলে সারা দেশ জুড়ে বিধ্বস্ত ঘর-বাড়ি আর ভাঙা সমাজ-জীবনের একটানা দৈন্য, হতাশা আর হাহাকার ছাড়া জাপানী সাহিত্য আর সংস্কৃতিতে অবশিষ্ট আর কিছুই ছিল না বলা

চলে। সকুনোস্থকি ওদা, ওসামু দাজাই প্রভৃতি লেখকরা তিমিরাচ্ছন্ন এই অধ্যায়টিকে সাহিত্যের মুকুরে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করলেন শাণিত বিদ্রূপ, প্রহসন আর আত্ম-টিটকারীমূলক রচনার মাধ্যমে। কিন্তু তাঁদের লেখা বুঝি ধোপে টিকল না বেশী দিন। আর বেশী দিন বেঁচেও ছিলেন না এঁরা। সকুনোস্থকি ওদা-র মৃত্যু ঘটে আকস্মিক ভাবে আর ওসামু দাজাই করলেন আত্মহত্যা। এঁদের বিকৃত মনের ব্যঙ্গরচনা জাপানী পাঠক নিরুপায় হয়ে গ্রহণ করলেও তারা নিজেদের রুচি-কৌলিন্য তখনও হারায় নি একেবারে। হারায় নি তার প্রমাণ জুনিচিরো তানিজাকি-র (১৮৮৭—) ভিন্ন রুচির ও ভিন্ন প্রকৃতির লেখা 'সাজামি-উকি' (তুষার কণা) ১৯৪৬ সালে যখন প্রকাশিত হয়, জাপানী পাঠকমহলে তখন এক বিপুল সাড়া পড়ে যায়। কাটতি তার বাড়তে থাকে হুহু করে। বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে তানিজাকি-র লেখাটিও অনবদ্য। একাদশ শতকের বিখ্যাত রোমান্স 'জেঞ্জী কাহিনী'র অনুকরণে রচিত এ উপন্যাস। ওসাকা ও কোবে অঞ্চলের ধনী এক বণিক পরিবারের চারটি বিভিন্ন চরিত্রের নারীকে কেন্দ্র করে উপন্যাসখানি লেখা। উপরতলার জীবন-আলেখ্যের পাশে পাশে নীচের তলার সাধারণ মানুষের সুন্দর পরিচয়ও মেলে বইটিতে। মধ্য-যুগীয় রাজরাজড়াদের কোর্ট-রোমান্সের আঙ্গিকে রচিত হলেও তানিজাকি-র 'সাজামি-উকি'তে জাপানী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৌন্দর্য ও রস-বোধের অভাব হয় নি কোথাও। ১৯৪২ সালে এই উপন্যাস-খানি যখন সাময়িক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই কর্তৃপক্ষের রোষ-নজর গিয়ে পড়ে তার উপর। ফলে উপন্যাস-খানির প্রকাশ তখন বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধের পর বইখানি সমাপ্ত হয়। সমালোচকদের মতে, 'সাজামি-উকি' সমকালীন জাপানী সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা এবং সেরা কাটতি বই তো বটেই।

তানিজাকি-র মতো বৃদ্ধ কাফু নাগাই (খৃঃ ১৮৭৯—), যিনি জাপানী সাহিত্যের 'এমিল জোলা' বলে পরিচিত, আর হাকুচো

মাসামুনিও এ সময়কার শক্তিশালী লেখক যাঁরা শক্তিমত্ত শাসকবর্গের রোষ-নেত্রের সম্মুখে নিজেদের লেখনী ক্ষান্ত করেন নি। ছাপবার আশু কোনো সম্ভাবনা নেই জেনেও নিজেদের সৃষ্টি-প্রতিভার অগ্নি অনির্বাণ রেখেছেন বছরের পর বছর ধরে। যুদ্ধ যখন থামল, তাঁদের রচিত উপন্যাস, ছোট গল্প, এমন কি দিনপঞ্জী পর্যন্ত প্রকাশিত হতে লাগল, আর তা জাপানী পাঠক বরণ করে নিলেন সাদরে। এঁদের এসব রচনায় সমসাময়িক জাপানের হালচাল, বিশেষ করে মধ্যযুগীয় বর্বর সমাজ-ব্যবস্থায় জাপানী মেয়েদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ মূর্তিময়ী হয়ে উঠেছে।

ওসামু দাজাই ও তামুকা প্রমুখ সমকালীন ঔপন্যাসিকদের রচিত খানকয়েক জাপানী উপন্যাসের একটু বিশদ আলোচনা করা গেল এখানে।

ওসামু দাজাই ১৯০৯ সালে উত্তর জাপানের এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অবক্ষয়ধর্মী লেখক। দাজাই মাত্র কয়েকটি উপন্যাস ও ছোট গল্প লিখেছেন। যক্ষ্মা এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। জলে ডুবে তিনি আত্মহত্যা করলেন যন্ত্রণা এড়াবার জন্য। দাজাই-র মৃতদেহ যেদিন জল থেকে উদ্ধার করা হলো সেদিন ছিল তাঁর উনচল্লিশতম জন্মদিবস।

'দি সেটিং সান'-এর গল্প বলছে নায়িকা কাজুকো। কাহিনী যখন শুরু হলো তখন তার বয়স উনত্রিশ। পিতার মৃত্যু হয়েছে কয়েক বছর পূর্বে। একমাত্র ছোট ভাই নাওজি যুদ্ধে গেছে; শুনেছে, সে প্রশান্ত মহাসাগরের কোন্ এক অঞ্চলে গেছে জাপানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে। বহুদিন যাবৎ তার কোনো সংবাদ নেই—বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল তবু নাওজি-র খবর পাওয়া গেল না।

কাজুকো মাকে নিয়ে থাকে টোকিও শহরে পৈতৃক বাড়িতে। এ বাড়িতে তার জন্ম; এখানে বড় হয়েছে; বাবার মৃত্যু হয়েছে এ বাড়িতে। বাড়ির সঙ্গে নাড়ীর যোগ। কিন্তু জাপান বিনা শর্তে

আত্মসমর্পণ করার পর টোকিও ত্যাগ করার জন্য উদ্যোগ করতে হলো। মামা ওয়াদা তাদের অভিভাবক। তিনি জানালেন, তাদের সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হয়ে এসেছে; তাঁর ব্যবসার অবস্থা খারাপ, সুতরাং তিনি নিজে আর্থিক সাহায্য করতে পারবেন না। এখন টোকিওর বাড়ি বিক্রয় করে গ্রামাঞ্চলে কোনো সস্তা জায়গায় যেতে হবে। আর তুলে দিতে হবে ঝি-চাকরের পাট। যতই বেদনাদায়ক হোক, এ প্রস্তাব মেনে না নিয়ে উপায় নেই। মামা শহর থেকে অনেকটা দূরে ছোট একটা বাড়ি ঠিক করে দিলেন। সেখানে যাবার আয়োজন শুরু হলো। মা এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়ান। গম্ভীর ম্লান মুখ। বনেদি সমাজের যেন শেষ প্রতিনিধি মা। তাঁর নীরব বেদনা অল্প কয়েকটি কথায় চমৎকার ফুটেছে কুশলী শিল্পীর কলমের মুখে।

নতুন বাড়িতে এসে মা অসুখে পড়লেন। শ্বশুরের ভিটে ত্যাগ করবার বেদনা তিনি সইতে পারলেন না। কাজুকো-র মনও ভালো নয়; এই ছোট্ট বাড়ির অপরিচিত পরিবেশে সে হাঁফিয়ে উঠছিল। তার উপর ঝি-চাকর নেই; আশানুরূপ অর্থ নেই; সংসারের দায়িত্ব তাকেই নিতে হলো। কিন্তু দায়িত্ব নেওয়া তো মুখের কথা নয়! সাংসারিক কাজের অভিজ্ঞতা নেই। রান্না করতে গিয়ে অসাবধানতার ফলে রাত্রিবেলা আগুন লেগে গেল। পাড়ার লোক এসে সাহায্য না করলে বাড়িটা ভস্ম হয়ে যেত।

মা শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। ডাক্তার-ওষুধের খরচ আছে। কাজুকো স্থির করল এবার থেকে সে মাঠে কাজ করবে। কিছুদিনের মধ্যেই কাজুকো-র মনে হলো সে যেন কৃষক রমণী হয়ে গেছে। গায়ের রঙ ময়লা হয়েছে, মুখে লালিত্য নেই; তার দেহে ও চলাফেরায় গ্রাম্য ভাব সুস্পষ্ট। এখন মাঠই ভালো লাগে; উল ও কাঁটা নিয়ে ঘরে বসলে অস্বস্তি বোধ হয়। এর মধ্যেই নীল রক্ত লাল হয়ে এসেছে।

অবশ্য শারীরিক পরিশ্রম এই প্রথম নয়। যুদ্ধের সময় সেনা-বাহিনীর সাহায্যের জন্য তাকে বাধ্যতামূলকভাবে কঠোর দৈহিক

পরিশ্রমের কাজ করতে হয়েছে। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাধ্য করা হয়েছে কত কাজ করতে। জাপান যুদ্ধ জয় করবে, সকলের মঙ্গল হবে—এই লোভ দেখান হয় তাদের। তারা মাটি কেটেছে, মোট বয়েছে এবং করেছে আরও কত কী কাজ! অভিজাত ঘরের তরুণী সে; বদলী দিয়ে সে এই কঠোর পরিশ্রমের কাজ থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করেছিল, পারে নি। পরিবর্তে অন্য লোক গ্রহণ করতে কর্তৃপক্ষ রাজী হয় নি। নিয়মিত দেহ সঞ্চালন করে কাজুকো-র স্বাস্থ্য কিন্তু ভালো হয়েছিল। তখন থেকেই সে তার আভিজাত্য হারাতে শুরু করেছে।

একদিন মা ডেকে বললেন: তোর মামার চিঠি পেলাম। খবর আছে।

—কি?

—নাওজি শীগগিরই দেশে ফিরে আসছে। ওয়াদা আরও জানিয়েছে, বাড়ি বিক্রির সব টাকা নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার ব্যাঙ্কের টাকা সরকার আটক করায় সে এক পয়সাও সাহায্য করতে পারবে না। নাওজি এলে খাবার লোক হবে তিনজন। কি করে চলবে? তোর মামা লিখেছে, তুই আবার বিয়ে কর অথবা চাকরির খোঁজ কর।

—চাকরি? কি চাকরি পাব? ঝি-গিরি?

মা তাড়াতাড়ি বললেন—না, না, তা নয়। ওয়াদা-র নাকি জানাশোনা এক পরিবারের ছেলেমেয়েদের তদারকের চাকরি আছে।

—ও তো ঝি-গিরির নামান্তর!—কান্নায় উদ্বেল হয়ে উঠল কাজুকো। এখন নাওজি আসছে—তোমার আদরের ছেলে—তাই আমাকে আর দরকার নেই। আমাকে তাড়াতে পারলে সুখী হবে। আমি সংসারের জন্য প্রাণপাত করতে প্রস্তুত, করছিও তা। তোমার কাছে থাকব, তোমার ভালোবাসায় আমার জীবন পূর্ণ হবে এই ছিল আমার আকাঙ্ক্ষা। বেশ, তুমি যখন আর চাও না, আমি

চলে যাব। আমার আশ্রয় আছে, সে জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।

কথাগুলি মুখ থেকে বেরিয়ে যাবার পরই কাজুকো-র অনুশোচনা হলো—মায়ের বিরুদ্ধে বড় নিষ্ঠুর অভিযোগ করেছে। চেয়ে দেখল, মায়ের মুখের মর্যাদাব্যঞ্জক চেহারা এত বড় আঘাতেও ক্ষুণ্ণ হয় নি ; আভিজাত্যের লক্ষণ।

মা শান্ত কণ্ঠে বললেন : তোর মামার কথা শুনে এতদিন চলেছি। এবার লিখে দেব আমার ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের দায়িত্ব এবার থেকে আমিই নিলাম।

একদিন নাওজি হঠাৎ এসে উপস্থিত হলো। সংসারের কোনো উপকার তাকে দিয়ে হবার আশা নেই। স্কুলে পড়বার সময় থেকে সে আফিম ও অন্যান্য নেশা ধরেছে। তার নেশার গুরু ছিল বিখ্যাত তরুণ লেখক উএহারা জিরো। উএহারা-র লেখায় অবক্ষয়ের সুর ; এই সুর তার ভক্তদের উদ্বুদ্ধ করেছে নেশা ও নারী অবলম্বন করে জীবনকে ধুলোর মতো উড়িয়ে দিতে। নাওজি-র বিরূপ জীবনযাত্রার জন্য তারা অনেকবার সঙ্কটে পড়েছে। সে মোটা টাকা ধার করেছে ; আর মা তা শোধ করেছেন। কত চেষ্টা হয়েছে নাওজিকে সংশোধন করবার, কিন্তু সফল হয় নি কোনো চেষ্টা।

কাজুকো-র বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রধান কারণ নাওজি-র নেশা। নতুন শ্বশুরবাড়ি গেছে। তারপর থেকেই নাওজি কেবল টাকা চাইতে শুরু করল। বড় বিপদ ; এবার দিলেই নেশা ছাড়ব ; আর কক্ষনো এমন নেশা করব না। স্বামীর বাড়িতে নতুন এসেছে। টাকা সে কোথায় পাবে? আর, এত টাকা? তবু একমাত্র ছোট ভাইয়ের অনুনয় অগ্রাহ্য করতে পারে না। কিন্তু নাওজি বারবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে চলেছে। কাজুকো নাওজি-র চরিত্র সংশোধনের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবার উদ্দেশ্যে দেখা করতে গেল উএহারা জিরো-র সঙ্গে। উএহারা এই সুযোগ ছেড়ে দিল না। নাওজি-র প্রসঙ্গ চাপা পড়ল।

কাজুকো-র জীবনে এই প্রথম ব্যভিচার! উএহারা-র স্পর্শ তার ভালো লাগে নি; আবার খুব বিরক্তিকরও মনে হয় নি। সে বাড়ি ফিরে এলো একটা গোপন অভিজ্ঞতা নিয়ে। এই গোপন অভিজ্ঞতা তার অবচেতন মনে বাসা বেঁধে রইল। এর পর থেকে স্বামীর সঙ্গে শুরু হলো মতবিরোধ এবং পরিণামে বিবাহ-বিচ্ছেদ।

নাওজি ফিরে এসেছে অনেকদিন পরে। কিন্তু তার স্বভাবের পরিবর্তন হয় নি। বরং সেনাবাহিনীতে থেকে চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতা আরও বেড়েছে। ওকে দিয়ে সংসারের কোনো উপকার হবে না। অল্পদিনের মধ্যেই সে দেনা করে মাকে আবার বিব্রত করে তুলেছে।

কাজুকো-র বয়স হলো ত্রিশ। জীবন বৃথাই শেষ হতে চলেছে। আভিজাত্যের খুঁটি আলগা হয়েছে। নতুন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার আশা নেই। ঘরে-বাইরে সর্বত্র হতাশা আর অনিশ্চয়তা। সামনে কোনো পথের নিশানা নেই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে থাকার চেয়ে নাওজি-র মতো নিজেকে যদি অধোগতির পথে ভাসিয়ে দেয় তাহলে ক্ষতি কি? নিজেকে পলে পলে ক্ষয় করে দেবার একটা নেশা আছে; একেবারে শূন্যতার চেয়ে ক্ষয় হয়ে যাবার, ভেসে যাবার অনুভূতিটা হৃদয়ের তবু যা হোক একটা অবলম্বন হবে।

কিন্তু কাকে অবলম্বন করে সে ভাঙনের পথে যাত্রা শুরু করবে? তাদের প্রতিবেশী ষাট বছরের বৃদ্ধ শিল্পী প্রস্তাব করেছিল তার জীবন-সঙ্গিনী হতে। টাকার অভাব নেই; সুখে থাকবে। শুভ্রকেশ বৃদ্ধকে ভালো করে দেখে কাজুকো সে প্রস্তাব অস্বীকার করল। সে নীটশের সন্তানলোভী নারী; বিলাস-ব্যসনের লোভ তার নেই। সে সন্তান চায়, নিজেকে বিস্তার করতে চায় সন্তানের মধ্যে।

মনে পড়ল উএহারা-র কথা। তাঁকে ভোলা যায় না। তার লেখা উপন্যাসের মধ্যে কাজুকো উএহারা-কে পায়। উপন্যাস হাতে করে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। উএহারা-র সান্নিধ্য অনুভব

করে। তার মধ্যে আছে ধ্বংসের বীজাণু। সে বীজাণু কাজুকো-র জীবনে প্রবেশ করলে ধ্বংসের পথ হবে দ্রুত।

কাজুকো উএহারা-কে চিঠি লিখল। একে একে তিনখানা চিঠি। চিঠিগুলি যেন পাপড়ির মতো। ক্রমশ একটু একটু করে তার হৃদয়ের কথা প্রস্ফুটিত করেছে। প্রথম চিঠিতে যা ছিল ইঙ্গিত, শেষ চিঠিতে তা স্পষ্ট হয়েছে। উএহারা-র সন্তানের সে মা হতে চায়। উএহারা বিবাহিত; সুতরাং তাকে বিয়ে করা সম্ভব হবে না। এর জন্য কাজুকো-র ভাবনা নেই। সে না হয় সকল কলঙ্ক স্বীকার করে উএহারা-র রক্ষিতা হয়েই থাকবে। লোকে বলে উএহারা পাষণ্ড। কাজুকো-র মনে হয় উএহারা সংস্কারাচ্ছন্ন না হয়ে সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা পথ চলে। আমি যা চাই তাকে পাওয়াই সুস্থ জীবনের মূল সূত্র। কাজুকো উএহারা-র সন্তানের জননী হতে চায়, অন্য কারও নয়। সুতরাং এই কামনা সফল করবার জন্য সকল সংস্কার ও সঙ্কোচ সে অগ্রাহ্য করেছে।

তিনটি চিঠির কোনো উত্তর নেই। তবু সে ধৈর্য হারায় নি। জীবনের শতকরা নিরানব্বুই ভাগই তো প্রতীক্ষা। শুধু এক ভাগ প্রত্যক্ষ ঘটনার সজ্ঘাতে পূর্ণ থাকে।

ভুগে ভুগে মা মারা গেলেন। আরও শূন্য হয়ে গেল জীবন। একদিন নাওজি তার এক কর্মসহচরীকে বাড়ি নিয়ে এলো। মনের কোথায় ধাক্কা খেল কাজুকো। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে টোকিওর গাড়ি ধরল।

বহু আড্ডায় খুঁজে খুঁজে উএহারা-র দেখা পেল। অপরিচিত পরিবেশ। সকালে ঘুম ভাঙবার পর দেখল উএহারা শুয়ে আছে তার পাশে। বয়সের প্রভাবে মুখের চেহারা অনেক জীর্ণ হয়েছে; সামনের ক'টা দাঁত নেই। মুখের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়েছে। এ রক্তের রঙ তার অজানা নয়। ক্ষয়রোগের অভ্রান্ত চিহ্ন। চাষীর ছেলে উএহারা মৃত্যুপথযাত্রী; তার সন্তানের জননী হতে চলেছে সে। আভিজাত্যের নীল রক্ত লাল হয়ে এলো।

খানিক বাদে সংবাদ এলো জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে নাওজি আত্মহত্যা করেছে। বনেদী পরিবারের অভিজাত বংশধারার সমাপ্তি ঘটল। বংশ-গৌরবের সূর্য অস্তমিত হলো।

সূর্যোদয়ের দেশে 'অস্তগামী সূর্য'! [ইংরেজী অনুবাদ : জেনাও কীন] লেখক ওসামু দাজাই। আধুনিক ঔপন্যাসিক। ওসামু দাজাই-এর উপন্যাসে গেঈশা মেয়েদের নাচের বর্ণনা নেই, চা-উৎসবের কথা নেই, চেরী-ফুল নিয়ে উচ্ছ্বাস নেই, ফুজিয়ামার সৌন্দর্য কীর্তনও বড় একটা নেই। আছে প্রাচীন একটি অভিজাত পরিবারের বিস্তারিত মৃত্যু বর্ণনা। নায়িকার স্মৃতি রোমন্থনের মধ্যে যুদ্ধরত জাপানের পরিক্রমা। প্রাচীন জাপানের গ্লানি আর মৃত্যুযন্ত্রণার গর্ভে লিপিবদ্ধ রয়েছে আধুনিক জাপানের জন্মবৃত্তান্ত। সূর্য়াস্তের অন্ধকার আজ তাকে গ্রাস করেছে বটে কিন্তু সে তিমির ভেদ করে নবজাতকের ভোরের কান্নাও ধ্বনিত হয়েছে। নতুন কালের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গত মহাযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত জাপানের যন্ত্রণাকাতর চিত্রটির পাশে নতুন জীবনের প্রাণোচ্ছল আলেখ্যটিই নিপুণ কথাশিল্পীর কলমের মুখে ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে।*

অবরোধকালীন ম্যাকআর্থারী শাসনকালে কমিউনিস্ট বা বামপন্থী প্রগতি লেখক ও শিল্পীদের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা সব প্রত্যাহার করা হয়। এভাবে নিজ নিজ মত প্রকাশের অবরোধ থেকে অব্যাহতি লাভ করে প্রথমেই তাঁরা নিজেদের মুখপত্র 'নয়া জাপানী সাহিত্য' পত্রিকা সংগঠনে বদ্ধপরিকর হন। এ পত্রিকার নিয়মিত লেখক-গোষ্ঠীতে ছিলেন উজাকু-আকিতা, কিয়োসি ইগুচি, উরিকো মিয়ামোটো প্রভৃতি বিশিষ্ট তরুণ লেখকরা। উরিকো মিয়ামোটো-র 'দুই বাগান' (১৯৪৭) ও 'দোহিও' বা মাইল স্টোন (১৯৪৮-৫০); সুনাও তোকুনাগা-র 'ঘুমাও, হে মোর প্রিয়া' (১৯৪৬-৪৮); জুজি নাকানোর-র 'গোসাকু নো-সাকি' প্রভৃতি লেখা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। এসব প্রগতি

* 'গ্রন্থবার্তা' : চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

লেখকদের সম্পর্কে এ অভিযোগ করা হয় যে, এঁরা নিজেদের মত ও আদর্শ প্রচারে এমনই মুখর ও মশগুল থাকেন যে, সাহিত্যের রস-বিচার বা কারু-চাতুর্যের প্রতি মোটেই নজর দেন না। তাছাড়া পার্টিগত দলাদলিও তাঁদের সৃষ্টি-প্রয়াসের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে ১৯৫০ সালে কোরিয়ায় যখন রণ-দামামা বেজে ওঠে, তাঁদের কার্য-কলাপের উপর আবার বাধা-নিষেধ আরোপিত হয়। প্রকাশ্য কর্ম-তৎপরতাও তাঁদের হ্রাস পায়।

বামপন্থী প্রগতি লেখক ছাড়াও এ সময় আর একদল তরুণ লেখকের অভ্যুদয় ঘটে যাঁরা 'Apres-Guerre' ঔপন্যাসিক বলে ছিলেন পরিচিত। 'কিন্‌দাই বুন্‌গাকু' বা আধুনিক সাহিত্য (১৯৪৬ সালে প্রকাশিত) ছিল এঁদের মুখপত্র। এ দলের লেখকদের মধ্যে আছেন রিনঝো সাঈনা, উকিয়ো মিশিমা, তাইগুন তাকিদা, হিরোশি নোমা প্রভৃতি অনেকেই।

রিনঝে সাঈনা সাধারণ এক শ্রমিক পরিবারের ছেলে। 'ওমোকি নাগারে সোনাকা নি' (স্রোতের টানে) আর 'ফুকাও সিআইজি নো সুকি' (জীবন ও সিআইজি ফুকাও) তাঁর নামকরা রচনা। ডস্টয়ে-ভস্কির প্রভাব তাঁর লেখায় বিশেষ করে লক্ষ্য করবার। মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয়, ঈশ্বর-অন্বেষা আর ব্যক্তিগত জীবনের বিচিত্র মরবিড অভিজ্ঞতার খুঁটিনাটি বিবরণের সন্ধান মেলে তাঁর উপন্যাসগুলিতে।

উকিয়ো মিশিমাও এই দলের একজন শক্তিশালী লেখক। লেখেনও তিনি বিস্তর। তবে তাঁর লেখায় যুদ্ধোত্তর যুগের মনমরা হতাশার সুর অনুরণিত হয় না। তাঁর 'কামেন নো কাকুসাকু' (মিথ্যা স্বীকৃতি) উপন্যাস স্বকাম ও আত্মরতির শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে বলিষ্ঠ আলেখ্য। তাইগুন তাকিদা-র 'ফুইবাইকা' (বায়ুকলুষিত পুষ্প, ১৯৫১) ও হিরোশি নোমার 'চিন্‌কু-চিতাই' (শূন্য-এলাকা, ১৯৫২) প্রভৃতি বইতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে।

এ ছাড়া এ দলের জনপ্রিয় লেখক হচ্ছেন মাস্থজি আইসে (ইনি একজন সুপ্রসিদ্ধ কবিও), বুনরকু শিশি ('জিয়ু গাকু' বা স্বাধীনতা বিদ্যানিকেতনের লেখক), সি. আই. ইটো, ওজিরো ইশিজাকি প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এঁদের সুখপাঠ্য রচনাবলী বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে ও উদার হৃদয়বেত্তার গুণে প্রাকযুদ্ধকালীন বহু জাপানী সাহিত্য-সৃষ্টিকে ম্লান করে দেয়।

নীতি-উপন্যাস

'নীতি উপন্যাস' নামে এক ধরনের লেখাও এ সময় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মার্কিন অবরোধকালীন জাপানের সামাজিক ও নৈতিক অধঃপতিত জীবনযাত্রা এসব উপন্যাসের বিষয়বস্তু। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ধর্মঘেঁষা ও জাপানী দর্শনের পটভূমিতে রচিত যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, এ যেন তাদেরই পালটা জবাব। নগ্ন সমাজচিত্র ও যৌন অবদান এসব 'নীতি উপন্যাসে'র উপজীব্য। অশ্লীল রতিবিলাস আর দৈহিক ক্ষুধার অভিব্যক্তি হলো এসব 'নীতি-সাহিত্যে'র অঙ্গ। সকুনোস্থকি ওদা, যুন ইশিকাওয়া, তাইজিরো তামুরা, সি. আই. চি. ফুনাবাসি প্রভৃতি শক্তিধর লেখকেরা হলেন এই শ্রেণীর সাহিত্য-সৃষ্টির কর্ণধার। সকুনোস্থকি ওদা-র 'সেসো' (জীবনের এক অধ্যায়) ও 'দোয়ো ফুজিন' (শনিবারের মেয়েমানুষ), যুন ইশিকাওয়া-র 'শোজো কাইতাই' (অন্তঃসত্ত্বা কুমারী), অথবা তাইজিরো তামুরা-র 'নিকুতাই নো মন' (দেহ মাংসের খিলান) প্রভৃতি যৌন-উত্তেজনাপূর্ণ উপন্যাস এ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত।

তামুরা ও ফুনাবাসির সঙ্গে আর দুজন শক্তিশালী লেখকের নাম এসে যায়—যাঁরা যুদ্ধের সময়কার ও যুদ্ধের পরবর্তীকালের জাপানের কামগন্ধী, যৌন-চিত্র অঙ্কনেই তাঁদের সর্বশক্তি অপচয় করেন এবং সস্তায় বাজি মাত করেন। এঁরা হলেন ফুমিও নিয়া ও তোমোইচিরো ইনোউয়ি। ফুমিও নিয়া-র 'অবাঞ্ছিত কাল' যৌন-সাহিত্যের চরম

নিদর্শন। সিয়াই ইটো-ও আর একজন জনপ্রিয় লেখক, যিনি ১৯৫০ সালে ডি. এইচ. লরেন্সের 'লেডি চ্যাটার্লির প্রেম'-এর জাপানী ভাষায় অনুবাদ করে মহা ফাঁপরে পড়েছিলেন। 'অশ্লীল পুস্তক প্রকাশ আইন'-এর কবলে পড়ে দীর্ঘ দু বছর প্রায় তাঁকে নানা টানা-হেঁচড়ায় পড়তে হয়। পরে অবশ্য জুরীদের মতে তিনি বেকসুর খালাস পান। সামান্য এই একটি উদাহরণ থেকেই যুদ্ধোত্তর জাপানী কথা-সাহিত্যের ধারা কোন্ খাতে বইতে শুরু করেছিল তার আভাস পাওয়া যায়। এমিল জোলা বা থিওডোর ড্রেজারের মতো সমাজের গলদ সমূহ গঠনমূলক সহৃদয় সমালোচনার মারফত আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিয়ে অধিকাংশ জাপানী সাহিত্যিকই বরং বিকৃত কুরুচিপূর্ণ উলটো পথ বেছে নিয়েছিলেন। তাছাড়া, লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও আত্ম-স্বীকৃতির ভিত্তিতে আর এক শ্রেণীর 'প্রাইভেট নভেল' লেখারও রেওয়াজ চলেছিল যার লেখক আর সৃষ্ট প্রধান চরিত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্যই নেই—দুজনেই এক।

তবে আশার কথা, শোহিআই ওকার-এর মতো একদল প্রতিভা-শালী তরুণ লেখকেরও সৃষ্টি হয়েছে যাঁরা পূর্বোল্লিখিত প্রবীণ অনেক কথাশিল্পীর মতো রস-সমৃদ্ধ জাপানী সাহিত্যকে তার উচ্চ আসন থেকে অবনমিত করতে রাজী নন। তাঁদের সমবেত শক্তিশালী লেখনী নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ জাপানী সাহিত্যের সুষ্ঠু পরিচয় দেবে। কর্তৃপক্ষও নিস্পৃহ হয়ে বসে নেই। সম্প্রতি ওশি হোতা ও কোহো এবে—এই দুজন শক্তিশালী নতুন লেখককে জাপানের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার 'সাহিত্য এওয়ার্ড' এবং 'আকুতা গাওয়া এওয়ার্ড' (প্রসিদ্ধ জাপানী বুদ্ধিজীবী লেখক রাইউনোসুকি আকুতা গাওয়ার স্মরণে। ১৯২৭ সালে তিনি আত্মহত্যা করেন।) অর্পণ করেছেন সরকার পক্ষ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত শোহিআই ওকা-র (Shohei Ooka) 'ফায়ার অন দি প্লেন' আর একখানি উল্লেখযোগ্য জাপানী উপন্যাস। যুদ্ধকে পটভূমিকা করে লিখিত হলেও এই উপন্যাসে

যুদ্ধকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নি ; শত্রুপক্ষের নৃশংসতা কিংবা যুদ্ধের বীভৎসতাকে বড় করে তোলা হয় নি। সৈন্যবাহিনী থেকে বিতাড়িত এক জাপানী সৈন্য দৈন্যের তাড়নায় ঘটনাচক্রে কি ভাবে দুঃখ-দুর্দশার চরম কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে নিজের মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুত্বের পর্যায়ে পরিণত হলো, লেখক অত্যন্ত দরদের সঙ্গে তার চিত্র অঙ্কিত করেছেন এই উপন্যাসে। উপন্যাসখানির আর একটি বৈশিষ্ট্য, বইখানিতে একটিও নারী-চরিত্র নেই। উপন্যাসখানির জাপানী নাম "নোবি'।

ওকা-র লেখা উপন্যাসের সংখ্যা এখানেই শেষ নয়। ফরাসী সাহিত্য থেকে তিনি জাপানী ভাষায় কিছু মণিমুক্তাও আহরণ করেছেন। ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যে তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত। বর্তমানে তিনি জাপানের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী সাহিত্যের অধ্যাপনা-রত।

কিছুকাল পূর্বে 'এনকাউন্টার' পত্রিকায় জাপানে বইয়ের জগৎ সম্বন্ধে একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। জাপানীদের মধ্যে প্রবল পাঠস্পৃহার পরিচয় দেখে বিস্মিত হতে হয়। জাপানী লেখকদের সামাজিক মর্যাদা এবং উপার্জনও পাশ্চাত্যের যে কোনো দেশের লোকদের সঙ্গে তুলনীয়। জাপানে এক হাজারের অধিক লেখক আছেন যাঁরা প্রায় সম্পূর্ণরূপে লেখার আয়ের উপরেই নির্ভর করেন। লেখকরা ডাক্তার ও উকিলদের মতো আয় গোপন করতে পারেন না ; সুতরাং আয়করদাতাদের তালিকায় লেখকদের স্থান বেশ উপরের দিকেই আছে। অনেক লেখক মোটর গাড়ির মালিক। সব লেখকই খুব ব্যস্ত, সর্বদাই লিখছেন ; যত লিখবেন, তত আয়। অনেকের লেখার পরিমাণ বালজাকের রচনাবলীকেও ছাড়িয়ে গেছে। লেখকদের প্রতিষ্ঠার পেছনে আছে পাঠকদের বই পড়ার আগ্রহ। এই আগ্রহের কারণস্বরূপ বলা হয় যে, জাপান দরিদ্র দেশ, কম পয়সায় আনন্দ পাবার একমাত্র উপায় হলো বই। জাপানের সকল প্রকার পত্রিকার সংখ্যা প্রায় ১,৩০০ ; বছরে বই প্রকাশিত হয় পরিবার পিছু গড়ে আটখানা করে। বাংলা দেশে সকল শ্রেণীর পত্রিকার সংখ্যা

প্রায় আড়াই শ' এবং গড়ে প্রতি ৮,১৫০ জন ভারতবাসীর জন্য বছরে বোধ হয় একটি নতুন বই বের হয়। অথচ জাপানে সাময়িক পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা কোনো কোনোটির দশ লক্ষেরও উপর। এক থেকে পাঁচ লক্ষ কপি কাটতি এমন কাগজের সংখ্যাও অনেক। এ সব সাময়িক পত্রিকার আয়তনও বিরাট। 'চুও কোরন' কাগজটির প্রতি সংখ্যায় ৩৫০ থেকে ৪০০ পৃষ্ঠা থাকে। পৃথিবীর আর কোনো দেশে এমন বৃহৎ আকারের সাময়িক পত্রিকা আজকাল প্রকাশিত হয় না। একমাত্র আধুনিক কবিতার উপরে জাপানে কুড়িটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য আলোচনার জন্য প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা হলো আরও ১০৭টি।

যে দেশে এত বই প্রকাশিত হয়, যেখানকার লেখকদের এত মর্যাদা, সেখানকার সাহিত্যের স্বরূপ যে কী তা জানবার উপায় আমাদের বড় একটা নেই। জাপানী সাহিত্যের যে সব সঙ্কলন (ইংরেজী) আমরা সাধারণত পাই তাদের মধ্যে আধুনিক লেখকদের রচনা প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যতটা পরিচয় প্রাচ্যের কোনো দেশের সাহিত্যের সঙ্গেই তার এক-শতাংশ পরিচয়ও আমাদের নেই। অথচ এশিয়ার সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রয়োজনে আজ এই পরিচয় আরও নিবিড় হওয়া অত্যাবশ্যক।

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ দিয়েই এ আলোচনা শেষ করা গেল। যুকিও মিশিমা (Yukio Mishima)-র উপন্যাস 'দি সাউণ্ড অফ ওয়েভ্‌স' (The Sound of Waves) অল্পদিনের মধ্যেই একটি প্রথম শ্রেণীর প্রেমের কাহিনী হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বইটির জাপানী নাম 'শিওসাই'।

মাইল তিনেক লম্বা ছোট একটি দ্বীপ। নাম 'উতাজিমা'। মোট হাজার দেড়েক লোকের বাস এই দ্বীপে।

অধিবাসীরা প্রায় সকলেই মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। ইঞ্জিন-চালিত ছোট ছোট জেলে ডিঙি প্রত্যেক দিন সকালে তীর

ছেড়ে যাত্রা করে; সন্ধ্যার সময় ফিরে আসে মাছ নিয়ে। বিক্রির জন্য কো-অপারেটিভ আছে; কো-অপারেটিভের অফিসে মাছ পৌঁছে দিয়ে জেলেদের ছুটি। প্রচণ্ড ঝড় না উঠলে ওরা একদিনও বিশ্রাম পায় না। পাহাড়ের চূড়ায় আছে সমুদ্র-দেবতার মন্দির। সেখানে গিয়ে দেবতার কাছে সবাই প্রার্থনা জানায় সমুদ্র যেন শান্ত থাকে। সাধারণের ব্যবহারের জন্য স্নানাগার আছে, আর আছে তরুণদের জন্য বৈঠকখানা। সারাদিনের কাজের পর তারা এ দুটি জায়গায় যায় অবসর বিনোদনের জন্য। যদিও দরিদ্র জেলেদের দ্বীপ তবু এখানে ইলেকট্রিসিটি আছে, মাছ ধরবার জন্য ইঞ্জিন-চালিত নৌকা ব্যবহার করা হয়, সমবায় সমিতি মাছ বিক্রির ব্যবস্থা করে। তাছাড়া যারা মাছ ধরে তারাও একেবারে অশিক্ষিত নয়, সকলেই স্কুলে লেখাপড়া শিখেছে।

এই দ্বীপেরই ছেলে শিন্‌জি-সান। বয়স হয়েছে আঠারো। পড়া শেষ করে মাছের নৌকায় কাজ শুরু করেছে। বেশ সুন্দর, স্বাস্থ্যবান তরুণ। গত যুদ্ধে বিমান থেকে গুলিবর্ষণের ফলে তার বাবা মারা গেছেন। ছোট ভাই আর মা—এই নিয়ে তার সংসার। সামান্য যা মাইনে পায় অনেক কষ্টে তা দিয়ে দিন চলে। মা মাঝে মাঝে কিছু উপার্জন করেন ডুবুরীর কাজে। দ্বীপের পুরুষরা মাছ ধরে, মেয়েরা মুক্তার সন্ধানে সমুদ্রে ডুব দেয়।

শিন্‌জি-সান একদিন সন্ধ্যায় নৌকা থেকে নেমে সামনে দেখতে পেল প্রায় তারই বয়সী এক অপরিচিতা তরুণীকে। এই ছোট দ্বীপে সবাই তার পরিচিত। কিন্তু একে কখনও দেখে নি সে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। শিন্‌জি ভালো করে দেখবার জন্য মেয়েটির নিকটে এসে একটু অভদ্রভাবেই কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। চিনতে পারল না, কিন্তু অপরিচিতার রূপ দেখে সে মুগ্ধ হলো। কি এক নতুন ধরনের অস্বস্তিতে সে রাত্রিতে শিন্‌জি ভালো করে ঘুমোতে পারল না। পরদিন জাল ফেলে তাদের নৌকা যখন সমুদ্রের উপর দিয়ে ভেসে

চলেছে তখন শিন্‌জির কর্তা প্রসঙ্গক্রমে পরিচয় দিল অপরিচিতা মেয়েটির। তেরু মিয়াতার মেয়ে সে,—নাম হাৎসুয়ে! হাৎসুয়ে ছেলেবেলায় চলে গিয়েছিল অন্যত্র, অনেক দিন পরে মিয়াতা তাকে বাড়ি ফিরিয়ে এনেছে। মিয়াতা-র আর কেউ নেই; সুতরাং স্থির করেছে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে জামাইকে নিজের বাড়িতে রাখবে, সম্পত্তি যা কিছু আছে মেয়ে-জামাই পাবে। কর্তা তার দুই তরুণ কর্মচারী শিন্‌জি ও রাইয়ুজিকে বলল—তোমরাও চেষ্টা করে দেখবে নাকি? দুজনেরেই মুখ লাল হয়ে উঠল। সেদিন সন্ধ্যায় শিন্‌জি পাহাড়ের উপরে উঠে সমুদ্র-দেবতার পায়ের কাছে একটি মুদ্রা দক্ষিণা দিয়ে প্রার্থনা করল, সমুদ্র যেন শান্ত থাকে, সে যেন একটি নৌকা কিনতে পারে। হাৎসুয়েকে পাবার তো কোনো আশাই নেই। হাৎসুয়ে ফিরে আসবার পর থেকে গ্রামে সবচেয়ে ধনী ও প্রতিপত্তিশালী যুবক ইয়াসুও মিয়াতার বাড়ি যাতায়াত শুরু করেছে। মিয়াতার ঘরজামাই যে ইয়াসুও-ই হবে সে বিষয়ে কারও আর সন্দেহ নেই।

কয়েকদিন পরের কথা। পাগলা হাওয়া উঠেছে; মেঘ নেই, কিন্তু সমুদ্রে উত্তাল ঢেউ। মাছ ধরা আজ বন্ধ। শিন্‌জি শুকনো খড়কুটো নিতে এসেছে পাহাড়ের উপরে। চমৎকার নির্জন স্থান; দূরে প্রশান্ত মহাসাগর দেখা যাচ্ছে। শিন্‌জি কাঠ কুড়ানো ভুলে সমুদ্র দেখছিল, হঠাৎ কানে এলো নারীকণ্ঠের কান্না। কান্না অনুসরণ করে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল হাৎসুয়েকে। পাহাড়ে উঠে সে পথ হারিয়ে ফেলেছে, কোন্ পথে নেমে যাবে তার হদিস পাচ্ছে না। শিন্‌জি ওকে পথ দেখিয়ে চলল। যেতে যেতে ওদের আলাপ হলো। হাৎসুয়ে তার নাম জেনে নিল; রোদে-জলে পুড়ে তার গায়ের রঙ যে কালো হয়েছে সে সম্বন্ধেও মন্তব্য করল হাৎসুয়ে। লোকালয়ের কাছে এসে দুজনে দু পথ ধরল। শিন্‌জি হুঁশিয়ার করে দিল হাৎসুয়ে যেন কাউকে না বলে যে, পাহাড়ের উপরে তাদের সাক্ষাৎ হয়েছে এবং আলাপ হয়েছে।

যদিও দ্বীপের মেয়েরা নিরাবরণ হয়ে সমুদ্রে মুক্তার সন্ধানে ডুব দেয়, তীরে বসে বিশ্রাম করতে করতে দেহের সৌন্দর্যে কে শ্রেষ্ঠ তার প্রতিযোগিতা করে এবং সে সময় পুরুষদের সামনেও তাদের সঙ্কোচ নেই। তথাপি অবিবাহিতা মেয়ে অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে আলাপ করলে সমাজে নিন্দা হয়।

সেদিন সপ্তাহের বেতন পেয়েছে শিন্‌জি। বাড়ি পৌঁছে খেয়াল হলো, খামসুদ্ধ সব টাকা পকেট থেকে তার পড়ে গেছে। সমুদ্রের তীরে ছুটে এলো সে। টাকাটা পেয়েছে হাৎসুয়ে। শিন্‌জির হাতে সে তুলে দিল। তাকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলে গেল শিন্‌জি। বরং এই মেয়েটি তার জীবনের শান্তি হরণ করেছে বলে যে ক্ষোভ হয়েছে তার মনে তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া গেল এই আকস্মিক প্রশ্নে : তুমি নাকি ইয়াসুওকে বিয়ে করছ?

—ইয়াসুও কে?

উদ্দাম হাসিতে ভেঙে পড়ল হাৎসুয়ে। হাসতে হাসতে বালির উপরে বসে পড়ল সে। সূর্য অস্ত গেছে; অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে; তীরের উপরে সারি সারি ঢেউয়ের দোলা—শ্রান্ত জেলে নৌকাগুলি বিশ্রাম করছে। একটা নৌকার আড়ালে বালির উপরে ওরা দুজন পাশাপাশি বসেছে। শিন্‌জিরে মনেব মেঘ কেটে গেল। নতুন আশা জেগে উঠল। হাৎসুয়ে একেবারে আশাতীত হয়ে যায় নি। ধীরে ধীরে ওরা ঘন হয়ে উঠল।···ঠোঁটের স্বাদ লবণাক্ত। সমুদ্রের স্বাদ। জীবনের স্বাদের এই প্রথম অভিজ্ঞতা।

আর একদিন। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। শিন্‌জির ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগল না। ঘুরতে ঘুরতে চলে এলো পাহাড়ের উপরে। যুদ্ধের সময় একটা অবজারভেটরি তৈরি করা হয়েছিল। এখন সে বাড়িটা খালি পড়ে আছে। সেখানে ঢুকে আগুন জ্বেলে শিন্‌জি তার ভিজা কাপড়-জামা শুকোতে লাগল। দৈবক্রমে হাৎসুয়েও সেখানে এসে উপস্থিত হলো। চারিদিকে জনমানব নেই, দুজনেই

ভিজা কাপড় আগুনে শুকোচ্ছে, চোখের সামনে পরস্পরের নিরাবরণ দেহ, মাঝখানে শুধু অগ্নিশিখার ব্যবধান। প্রবল আকর্ষণ সত্ত্বেও তারা, কামনা জয় করে ধর্ম রক্ষা করল। হাৎসুয়ে সুস্পষ্টরূপেই ঘোষণা করল সে শিন্‌জিকে বিয়ে করবে বলে স্থির করেছে। এই দৃশ্যটি লেখক আশ্চর্য মুন্সিয়ানার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

ওদের দুজনের হৃদ্যতা গোপন থাকল না। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। কুৎসা ছড়াতে সাহায্য করল দুজন। লাইট হাউসের কর্তার মেয়ে চিয়োকো আর ইয়াসুও। চিয়োকো টোকিও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়ে, সে শিন্‌জিকে মনে মনে ভালবাসত। জোর করে সে ভালবাসা কখনও প্রকাশ করতে পারে নি। কেননা, সে সুন্দরী নয়, তার মুখশ্রী কুৎসিত,—এ সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সচেতন। ছুটিতে বাড়ি এসে একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে শিন্‌জিকে পাহাড় থেকে নামতে দেখে তার মনে তীব্র ঈর্ষা জেগে উঠল। আর ইয়াসুও-র মনেও সেই ঈর্ষা। সে যখন মনে মনে নিজেকে হাৎসুয়ের স্বামী বলে স্থির করে বসে আছে, তখন কোথা থেকে শিন্‌জি এসে জুড়ে বসল!

এই আলোচনা হাৎসুয়ের বাবার কানে পৌঁছল। মেয়ের উপর আদেশ হলো সন্ধ্যা থেকে সকালে জেলে ডিঙিগুলি সমুদ্রে না যাওয়া পর্যন্ত সে বাড়ির বাইরে যেতে পারবে না। ঐ সময়টা শিন্‌জি দ্বীপে থাকে, অন্য সময় সমুদ্রের বুকে। বাবার আদেশ অমান্য করা অসম্ভব। সুতরাং ওদের দুজনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার আর সম্ভাবনা রইল না।

হাৎসুয়ে চিঠি লিখে শেষ রাত্রিতে বাড়ির বাইরে রেখে দেয়। শিন্‌জির সহকর্মী রাইয়ুজি মাছ ধরতে যাবার সময় সে চিঠি নিয়ে যায়। তীর থেকে অনেক দূরে নৌকায় বসে শিন্‌জি, তার বন্ধু ও কর্তা তিনজনে একসঙ্গে হাৎসুয়ের চিঠির মর্ম অনুধাবন করে। দুটি প্রেমার্ত হৃদয়ের বেদনায় অন্য দুজনও সমব্যথী।

ক্রমে হাৎসুয়ের চিঠিও বন্ধ হয়ে গেল। হয়তো তার বাবা ধরে

ফেলেছেন। আর কোনো আশাই নেই। বেদনাক্ষুব্ধ দিনগুলি একে একে কাটতে লাগল।

হঠাৎ একদিন মিয়াতা-র কাছ থেকে প্রস্তাব এলো সে তার জাহাজে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করতে পারে। দুটো জাহাজ আছে মিয়াতার। সম্মত হলো শিন্‌জি। পরে জানতে পারল ইয়াস্যুও তার মতোই শিক্ষানবিশ হয়ে যাচ্ছে।

নানা বন্দর ঘুরে জাহাজ যখন উতাজিমায় ফিরে এলো তখন জাহাজের কাপ্তেনের রিপোর্টের ভিত্তিতে শিন্‌জিকে মিয়াতা ভাবী জামাই বলে বেছে নিল।

ইয়াস্যুও ও শিন্‌জির কর্মক্ষমতা এবং ঐকান্তিকতা বিচার করবার জন্যই তাদের জাহাজে শিক্ষানবিশ হিসাবে নেওয়া হয়েছিল।

উপন্যাসের কাহিনীতে তথাকথিত আধুনিকতা নেই; মনোবিশ্লেষণের প্রাধান্য নেই। সহজ সরল রোমান্টিক গল্প। তবু এশিয়ার একটি নতুন দেশ ও নতুন সমাজের পরিবেশটি আকর্ষণীয়। কতকগুলি ঘটনার বর্ণনায় লেখক বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রচণ্ড ঝড়ের রাত্রিতে শিন্‌জি জাহাজ রক্ষার জন্য সমুদ্রের পর্বতপ্রমাণ ঢেউয়ের সঙ্গে যেভাবে সংগ্রাম করেছে তার বর্ণনা মনে গভীর দাগ রেখে যায়। কনরাডের 'টাইফুনের' বর্ণনার চেয়ে ন্যূন নয় এই বর্ণনা।

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

কোকুসাই সিজকোসাই : ইনট্রডাকসন টু কনটেম্পোরারী জাপানীজ লিটারেচার
তাডাও কুজিটোমো : জাপানীজ লিটারেচার
জর্জ বি. স্যান্‌সম : জাপান : এ সর্ট কালচারের হিস্ট্রি
ডবলু. জি. এ্যাস্টন : এ হিস্ট্রি অফ জাপানীজ লিটারেচার
রবার্ট সি. আর্মস্ট্রং : লাইট ফ্রম দি ইস্ট
আর্থাব উইলি : দি 'নো' প্লেজ ('No' Plays) অফ জাপান
আর্থার উইলি : জাপানীজ পোয়েট্রি
ডবলু. বি. ইয়েটস্‌ ও এজরা পাউণ্ড : সারটেন নোবল প্লেজ অফ জাপান
বুক্‌স অ্যাব্রড (কোয়ার্টারলি), ১৯৫৯

কোরীয় সাহিত্য

কিংবদন্তী হলেও ঐতিহাসিক বলে চলে আসছে এখনও।

একদা নাকি শাপভ্রষ্ট এক দেবদূত নেমে এসেছিল ধুলার ধরণীতে। সাধ গিয়েছিল জন্ম নিতে মানুষের ঘরে। সুযোগও ঘটে গেল। তরতর করে বয়ে-চলা ছোট এক পাহাড়ী নদীর ধারে জলে পা ডুবিয়ে বসেছিল অপরূপ রূপসী এক কন্যা। স্বর্গের দেবদূত ভর করল তাকে। বায়ুর আকারে প্রবেশ করল তার জঠরে। কুমারী কন্যা লাভ করল মাতৃত্বের অমোঘ আশীর্বাদ। যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হলো কুমারী মাতার অমিতবিক্রম এক পুত্র সন্তান। নাম হলো তার তানগুন। এই পুত্রসন্তানই নাকি সমগ্র কোরিয়া জাতিকে দান করে গেছেন জ্ঞানের প্রথম আলো। এঁরই প্রতিষ্ঠিত বংশ খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ছিল নাকি অবস্থিত। সদলবলে তারপর কোরিয়ায় আগমন করেন চৈনিক ঋত্বিক কিজা। প্রতিষ্ঠিত করেন চোসুন বা 'প্রভাতী স্তব্ধতা' রাজ্যের রাজধানী—তাটং নদীর তীরে—পিয়াংযিয়াং-এ। উত্তর অঞ্চলের সমগ্র দেশ—হান নদী থেকে শুরু করে ইয়ালু নদীর পরপার পর্যন্ত আপনার কুক্ষিগত করে নেন তিনি। রাজ্য বিস্তার করেন আপনার। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশের ৪২জন রাজা প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেন এই দেশে।

প্রধানত জনশ্রুতি হলেও চোসুন বা 'প্রভাতী স্তব্ধতা' রাজ্যের উল্লেখ মেলে প্রাচীন চীনের নানান পৌরাণিক কাহিনী আর ইতিবৃত্তে। তাদের কীর্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন কিছু কিছু এখনও দেখা যায় এখানে ওখানে।

'প্রভাতী স্তব্ধতা'র দেশ কোরিয়ার কথা দীর্ঘকাল থেকে ইতিহাসের বুকে লিখিত হয়ে থাকলেও খৃষ্টীয় পনেরো শতাব্দীর আগে পর্যন্ত কোরিয়ার লিখিত ভাষার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। 'এশিয়ার আলো' বৌদ্ধ ধর্ম খৃষ্টীয় ৩৭২ সালে কোরিয়ায় এসে যখন

পৌঁছল, তখনও কোরিয়ার নিজস্ব কোনো বর্ণমালা বা সাহিত্য বলতে কিছুই ছিল না। চীনা অক্ষরই ছিল প্রচলিত। চীনা ভাষাতেই লেখা হতো বই। ১৪০৩ সাল থেকে প্রথম কোরীয় ভাষায় বই ছাপা হতে শুরু করে। ইতিহাস, দর্শন, জ্যোতিষশাস্ত্র, ভূ-বিদ্যা, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, গণিত-বিদ্যা, সমর-বিজ্ঞান (১৬শ' শতাব্দীতে লৌহ-বর্ম আবৃত কোরিয়োর ড্রাগন মার্কা নৌ-জাহাজ মধ্যযুগীয় জাপানী সমর-কর্তাদের নৌ-বহরকে পরাস্ত করে আসে খাস জাপানের ঘাটে গিয়ে), আইনশাস্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে বহু বই লেখা হলেও বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত কোরিয়ার নিজস্ব সাহিত্য বলতে প্রধানত বুঝাত তার কাব্য, পৌরাণিক উপাখ্যান বা রম্যরচনা। সেকালে কোরিয়ার বিদগ্ধ সমাজে কবি বা বিদ্বান ব্যক্তির কদর ছিল বিপুল। ধনীদের চাইতে গুণী বা লেখকরা ছিলেন বরণীয় ও পূজনীয়। চতুর্থ শতকে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাবে কোরিয়ার সাহিত্য অধিকতর সমৃদ্ধি লাভ করে। বৌদ্ধ শ্রমণরা তার সাহিত্য ও মননশীলতার উৎকর্ষতা বৃদ্ধিসাধন করেন বহুল পরিমাণে। জাপানের বুকে শানিত ছোরার উদ্যত ফলকের মতো চোসুন বা কোরিয়ার ভৌগোলিক গুরুত্বের মতো তার প্রাচীন সাহিত্যের মূল্যও নেহাত কম নয়, একথা বলা যায় জোর করে।

কোরিয়ার সাহিত্যকে মোটামুটি এ কয়ভাগে বিভক্ত করা চলে : (১) আদিযুগ : খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে তার প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাকাল (তেরশ' বিরানব্বুই খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) ; (২) তেরশ' নিরনব্বুই খৃষ্টাব্দ থেকে জাপান কর্তৃক কোরিয়া অধিকার কাল উনিশ শ' দশ খৃষ্টাব্দ ; (৩) উনিশ শ' দশ সাল থেকে উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশ সাল পর্যন্ত। তারপর একালের সাহিত্য বা সমকালীন যুগ।

সেকালের কোরিয়ার সাহিত্যে চীনা ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ও লিখন পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য প্রচলনের পর থেকে তার ব্যাপকতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং বিশেষ

করে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কনফুশিয়াস-এর ধর্মপ্রচার পর্যন্ত ধারা তার অব্যাহত থাকে। ইতিমধ্যে কোরিয়াই চীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকবর্তিকা নিয়ে যায় জাপানের দ্বারে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সোল চোং (আনুমানিক সপ্তম শতাব্দী) কোরিয়ায় চীনা ধর্মগ্রন্থ শিক্ষার জন্য 'আইদু' নামে এক লিপিমালার উদ্ভাবন করেন। এই লিপিমালাতে ২৩৩টি বর্ণ ছিল। চোই-চিওয়েন (আনুমানিক খৃষ্টীয় ৮৫৮—৯১০) চীনা ভাষায় কবিতা রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'কাই ওয়ান পিল জিওয়াং' (দারুচিনি বাগানে লেখনীর চাষ) আর একখানি নামকরা গ্রন্থ। ৯৫৭ সালে কোয়াগো বা চীনা ধরনের রাজপুরুষ নিয়োগের সরকারী পরীক্ষা প্রথা প্রবর্তিত হয়। ফলে অনেক জায়গায় কনফুশীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। আর তার দৌলতে কনফুশীয় শাস্ত্র প্রচারিত হয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে। কবি ও ইতিবৃত্তকার কিম পুসিক (১০৭৫—১১৫১)-এর 'সমগুকসা' একালের আর একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। সৃষ্টির আদি থেকে খৃষ্টীয় প্রথম সহস্র বৎসরের পৌরাণিক ইতিবৃত্তের ধারাবাহিক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে এই বইতে। আই কিউবো (১১৬৮—১২৪১), আই চেহিয়ন (১২৮৭—১৩৬৭) প্রভৃতি বিশিষ্ট রাজপুরুষেরা চীনা ভাষায় কাব্য রচনা করে সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষ পাদ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত চীনা হরফে কোরীয় গদ্য-সাহিত্য ও কাব্যগাথার উৎকর্ষতা চরম শিখরে উন্নীত হয়। জাপান ও চীনে কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত চোং মংজু (১৩৩৭—৯২) বহু চীনা কবিতা রচনা করেন যা শুধু স্বদেশে নয়, বিদেশেও প্রচুর সমাদর লাভ করে। রাজা সেজং (১৪১৯—৫১) কোরিয়ার আধুনিক বর্ণমালার পরিকল্পনা করেন ১৪৪৩ সালে। রাজা রেজং কোরিয়ার নতুন লিপিমালার প্রবর্তন করলেও উলকোক, চা চোলে আই, ওয়াং সং সিরিওল প্রভৃতি চীনের শিক্ষা-দীক্ষায় দীক্ষিত সেকেলে পণ্ডিতেরা তখনও কিছুকাল ধরে মামুলী চীনা

পদ্ধতিতে কাব্য রচনা করতে থাকেন। 'টংমুন স্থন'-কেই সেকালের কোরিয়ার কবিতার শ্রেষ্ঠ সঙ্কলন বলে পরিগণিত করা চলে। এই কবিতা-সঙ্কলন একশ' ত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত এবং সরকারী তত্ত্বাবধানে ২৩ জন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত কর্তৃক সংগৃহীত হয় ১৪৭৮ সালে। কাব্য-সম্পদ ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সে যুগের বহু চীনা কাব্য সঙ্কলনকেও এই গ্রন্থ যায় ছাপিয়ে।

এই সময় থেকে কোরিয়ার কাব্যে লোক-সাহিত্যের প্রভাব বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায় এবং তা প্রেমের কবিতা, শ্রমজীবীর গান, ধান-মাড়ানি গ্রাম্য ছড়া, কি স্যাং বা নর্তকীদের গীতাঞ্জলিতে রূপ নেয়। ছন্দ বা মাত্রার কড়াকড়িও অনেকটা হ্রাস পায়।

কোরীয় ভাষায় লেখা অনেক উপন্যাসই চীনা উপন্যাসের ঢঙে লেখা। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের দিক থেকেও অনেকটা চীনা উপন্যাসের অনুরূপ। অধিকাংশ নায়কই তাদের অসাধারণ পুরুষ। নায়ক হবে তাদের সরকারী পরীক্ষায় তাক্-লাগান গোছের সাফল্য লাভ করার কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে অমিতবিক্রমশালী কোনো এক যোদ্ধা যিনি একাই শত্রুদের জয় করে এসেছেন; দুস্তর বাধা-বিঘ্নের পাহাড় লঙ্ঘন করে নায়িকাকে তারা জিতে নেয়। আব যারা 'ভিলেন' বা দুরাত্মা তাদের দুষ্কৃতির তো সীমা নেই। কিম্ মঞ্জুং (১৬৩৭—৯২)-এর বিখ্যাত উপন্যাস 'কুয়ান মং' (মেঘস্বপ্ন) সে যুগের এক শ্রেষ্ঠ রচনা। এই উপন্যাসে চীনের তাং আমলের বহু-বিবাহের সমস্যাটিকে তুলে ধরা হয়েছে অতি সুন্দরভাবে য়্যাং ও তার পতিব্রতা ৮ জন মহিষীর চরিত্র মারফত। এই উপন্যাসটির ইংরেজী অনুবাদ বিশ্বসাহিত্যের দরবারে বিশেষ সমাদৃত। কিম চুন-ডেইক-এর 'সাসি নাম জংগি' উপন্যাসটিও অনুরূপ বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা। চুং হিয়াং চোন-এর লেখাও সেকালে কোরিয়ার জনসাধারণ আগ্রহের সহিত পাঠ করত নানান পালপার্বণে।

ইনাম ব্যাং (১৬৪০—১৭২৩) বৌদ্ধজাতকের কাহিনী আর কনফুশীয় নীতিমূলক আখ্যায়িকা লিখে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

অলৌকিক কাহিনী, তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্র ও স্বপ্নাদ্য অলীক কাহিনীমূলক আখ্যায়িকা এই সময় বিস্তর লেখা হয়। সো কোজং-এর ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'টংগুক টংগম' ও বিখ্যাত বিশ্বকোষ 'টংগুক মুন্‌হং বিগো' গ্রন্থও রচিত হয় এ যুগে।

গল্প, উপন্যাস বা বিবিধ গ্রন্থ রচনা ছাড়া কোরিয়ায় নাট্য সাহিত্যের অনুশীলনও চলে একালে। কোরিয়ার জনসাধারণের কাছে নাটকের জনপ্রিয়তা গল্প, উপন্যাসের চেয়েও বেশী। সুতরাং তার চর্চাও চলে পুরোমাত্রায়। 'সান ডেইকুক' আদি যুগের এক প্রসিদ্ধ নাটক। এই নাটকে কনফুশীয় অভিজাত মহল ও বৌদ্ধ শ্রমণদের তীব্র কষাঘাত করা হয়েছে। কোরীয় সমাজের শ্রেণী-প্রথাকেও আক্রমণ করা হয়। সেকালে কোরীয় সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ অনেকগুলি সুমধুর গীতি-কবিতাও সন্নিবেশিত আছে এ বইতে। বিখ্যাত উপন্যাস 'চুংহিয়াং চোন'-এর নাট্যরূপের অনেকগুলি সংস্করণ হয় পর পর। নাট্য-সমালোচক ও গীতিকার সিনো উইচ্যাংও অনেকগুলি জনপ্রিয় নাটক লেখেন। চীনা নাটকের মতো কোরিয়ার নাট্য সাহিত্য বাস্তবধর্মী। অলৌকিক ঘটনা সন্নিবেশ খুব একটা নেই। জীবনের হাসি-কান্না, ত্যাগ-নিষ্ঠা ও সত্যের জয় প্রতিফলিত করাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য। আধুনিক কোরীয় নাটকে অবশ্য পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

আধুনিক কাল

'প্রভাতী স্তব্ধতা'র দেশ কোরিয়ার অবগুণ্ঠন ১৮৭৬ সালে বিশ্বের হাটে উন্মোচন করে দেয় প্রতিবেশী জাপান। সাম্রাজ্যবাদী জাপান তাকে তারপর কুক্ষিগত করতে থাকে ধীরে ধীরে এবং পুরোপুরি গ্রাস করে নেয় ১৯১০ সালে। প্রতিবেশীর এই আচরণ কোরিয়ার জনসাধারণ কোনোদিন গ্রহণ করে নেয় নি সহজভাবে। তুষের আগুনের মতো ভেতরে ভেতরে তারা জ্বলতে থাকে। কোরিয়ার এই পরাজয়ের গ্লানি দেশের সাহিত্য ও শিল্পেও প্রতিফলিত হয়। জাপানী

অবরোধের প্রতিবাদে দেশের অনেক স্থানে গুপ্ত ঘাঁটি স্থাপিত হলো সাহিত্য প্রচারের। কোরিয়ার জাতীয় লিপিমালা 'এনগুল' আবার মর্যাদা লাভ করল জনগণের নিকট। দেশাত্মমূলক গানও এন্তার রচিত হতে লাগল। কোরিয়ার পুরাতন ঐতিহ্য—সুদূর সাইবেরিয়া, মাঞ্চুরিয়া কিংবা প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় কোরিয়ানদের বিজয় অভিযানের প্রাচীন কাহিনী অবলম্বন করে রচিত এসব স্বদেশী গান। এ সময় চোই নাম্‌সন 'সোনিয়েন' নামে এক নির্ভীক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় তাঁর বহু দেশাত্মমূলক গন্থ-কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ সালে 'সিচোয়ুচিপ্‌' নামে তাঁর এক কবিতা সঙ্কলনও প্রকাশিত হয়। কিন্‌ পেইন এ যুগের আর একজন স্বদেশী গীতিকার। শুধু কবিতা ও গানে নয়, গল্প উপন্যাসেও এই জাতীয়তাবোধের ছাপ পড়তে থাকে। কিম্‌ টংগিন্‌ ও অন্যান্য কথাশিল্পীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ ও মার্কিনী উপন্যাসের অনুকরণে উপন্যাস লিখতে শুরু করলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে চোই সোহাই প্রথম সমাজ-সচেতন উপন্যাস রচনা করেন। সমাজের নীচের তলার মানুষেরা তাঁর উপন্যাসেই প্রথম স্থান লাভ করে। ম্যাক্‌সিম গোর্কি, হেনরী বারবুস প্রভৃতি মার্ক্‌সপন্থী লেখকদের এবং সমসাময়িক জাপানী প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের নিকট প্রেরণা লাভ করেন এ সাহিত্যিকগোষ্ঠীর দল। 'পিওন বিওক জি' ছিল তাঁদের মুখপত্র। আর পাক্‌ হিয়াং হুই, কিম্‌ কিজিন প্রভৃতি শক্তিধর ঔপন্যাসিকরা ছিলেন তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও লেখক।

কে-এ-পি'র ভূমিকা

১৯২৫ সালে কোরিয়ার বিত্তহীন সাহিত্য ও শিল্প সঙ্ঘ (KAP বা Korean Association of Proletarian Literature and Art) স্থাপিত হয়। এ সাহিত্য ও শিল্প সঙ্ঘের পেছনে ছিলেন লী জি জেং, হান সেল ইয়া, লিম হুয়া প্রভৃতি কোরিয়ার তরুণ

প্রগতিশীল লেখকগোষ্ঠী। আধুনিক কোরিয়ার সাহিত্যের মূলেও রয়েছে এঁদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম। কেননা কে-এ-পি সংগঠিত হবার আগে পর্যন্ত কোরিয়ার অধিকাংশ লেখক ও সাহিত্যিক ছিলেন 'বিশুদ্ধ শিল্পে'র উপাসক। জাপানী শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরা চোখঠারা গোছের রোমান্টিক সাহিত্যের প্রবর্তন করতে লেগেছিলেন উঠে পড়ে। প্রাণহীন অলঙ্কারসর্বস্ব ছিল তাঁদের রচনা। আর তাঁদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তথাকথিত 'রিয়ালিস্ট', দৈনন্দিন জীবনের দুঃখকষ্ট আর আপন ভাগ্যের জন্য বিধাতাকে অভিশাপ বর্ষণই ছিল তাদের জোলো অন্তঃসারশূন্য রচনার বিষয়বস্তু। কে-এ-পি'-র প্রগতিশীল লেখকরা এঁদের বিরুদ্ধে করলেন জেহাদ ঘোষণা। কোরিয়ার মূঢ় মূক অগণিত জনগণের জীবনকে এঁরা দিলেন ভাষা। লী জি জেং তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'গৃহভূমি' ও 'দুঃস্থ মানব', 'ছুটির আলো' ও অন্যান্য বহু গল্পে কোরিয়ার নীচের তলার মানুষের দুঃখ-দুর্দশার আলেখ্য তুলে ধরলেন সাহিত্যের মারফত। হান সেল ইয়া-ও তাঁর 'ক্ষুধা', 'সংগ্রাম', 'সেদিনের রাত্রি' প্রভৃতি কাহিনীতে ভাষায়িত করেন তাদের সার্থকভাবে।

কোরিয়ার প্রগতি সাহিত্য ও শিল্প সঙ্ঘের কার্যকলাপ বেশীদিন অব্যাহত থাকতে পারল না। জাপানী সেন্সর বোর্ডের রক্তচক্ষু গিয়ে পড়ল তার উপর। ১৯৩৪ সালে কে-এ-পি'র প্রায় ৮০ জন লেখক ও শিল্পীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হলো। সঙ্ঘকেও বেআইনী ঘোষণা করা হলো সরকারীভাবে। কিন্তু বেপরোয়া গ্রেফতার, অথবা নির্যাতন বা রুদ্ধ কারার দিনগুলি কোরিয়ার প্রগতি লেখকবর্গের মনোবল ভাঙতে পারে নি। কাগজ-কলম ছাড়াও তাঁরা চললেন সাহিত্য সৃষ্টি করে নির্জন কারাকক্ষের দেয়ালে দেয়ালে। হান সেল ইয়া-র বিখ্যাত উপন্যাস 'গোধূলি' এমনিভাবে রচিত হয়েছিল নির্জন কারাকক্ষে। 'গোধূলি' কোরিয়ার শ্রমিক জীবন নিয়ে লেখা এক বাস্তবধর্মী বলিষ্ঠ উপন্যাস।

১৯৪০ সালে জাপানী শাসকবর্গ কোরিয়ার জাতীয় ভাষাকে পর্যন্ত দেয় নিষিদ্ধ করে। কোরিয়ার স্কুলের ছাত্রদেরও মুখ ফুটে মাতৃভাষায় কোনো শব্দ উচ্চারণ করা ছিল মানা। ভুলে কদাচিৎ বলে ফেললে জরিমানা দিতে হতো তাদের। শুধু তাই নয়, মাতৃভাষায় একখানা চিঠি লিখলেও বিদেশী আইনের চোখে তা হতো দোষণীয় ও দণ্ডনীয়। কিন্তু যেসব লেখক জাপানী তাঁবেদারি মেনে নিল তাদের হলো পোয়াবারো। সরকারী পুরস্কার আর উপঢৌকন বর্ষিত হতে লাগল তাদের উপর অযাচিতভাবে। লী কোয়াং সু ছিলেন এমনি এক জাপ-তাঁবেদার লেখক। কি ওয়ান যুং-এর লেখা 'গ্যাসলাইট' কাব্য-গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় গত যুদ্ধের সময়।

প্রতিরোধ সাহিত্য

১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে কোরিয়ায় জাপানী অবরোধের অবসান হয় লালফৌজের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে। কোরিয়ার প্রতিবোধ-কালীন সাহিত্য তখন থেকে রূপ নেয় গণতান্ত্রিক সমাজ-সেবার দুরূহ কাজে। কোরিয়ার জনসাধারণ এতদিন পর যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। নতুন জীবনের বান ডাকল বুঝি তাদের মধ্যে। লী জি জেং, হান সেল ইয়া, লী বাকমিয়ম প্রভৃতি শক্তিধর প্রবীণ লেখকরা নতুন উদ্যমে আবার লেখনী ধারণ করলেন।

লী জি জেং তাঁর শক্তিশালী উপন্যাস 'বন্যা' ও লী থাই ডুন তাঁর উপন্যাস 'মৃত্তিকা'য় কোরিয়ার কৃষক সমাজের বলিষ্ঠ চিত্র অঙ্কন করেন। হান সেল ইয়া-র 'ভাই-বোন', লী বাকমিয়ম-এর 'দেশভক্ত', চেই মিয়ং আইক-এর 'মেসিন' এবং হোয়ান গন্-এর 'কয়লা খাদের শ্রমিক' প্রভৃতি রচনা যুদ্ধোত্তর কোরিয়ার গণ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলে। হান সেল ইয়া-র সুবিখ্যাত উপন্যাসগুলিতে জাপানী অবরোধকালীন সংগ্রামী মানুষের জীবনচিত্র নিখুঁতভাবে রূপায়িত হয়েছে। কিম থাই ডিং ষোড়শ শতকের কোরিয়ার জাতীয় বীর সুবিখ্যাত নৌ-সেনাপতি

লী-সুং সিং-এর স্মরণে এক ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। তিয়ন তাং সং, হান মেং তিয়ন, চো জি তিয়ন প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত তরুণ সাহিত্যিকরা গল্প ও কবিতায় জাপানী অবরোধকালীন প্রচার-সমৃদ্ধ এক অভিনব সাহিত্য সৃষ্টি করেন। আধুনিক কোরিয়ান সাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী কথাশিল্পী লী থাই ডিয়েন-এর গল্প 'প্রথম যুদ্ধ', ওডিয়ং ওয়াং-এর কবিতা 'প্রতিরোধ' এবং লিম হোয়ান-এর বিভিন্ন কবিতায় যুদ্ধোত্তর কোরিয়ার মার্কিনী দখলকারী অবস্থার স্বরূপটি উৎকটভাবে ফুটে ওঠে। কবি ঘিয়ক ইন ডিয়ান তাঁর 'ঘৃণা' কবিতায় সাগরপারের এসব বিদেশী 'উড়ে এসে জুড়ে বসা' শ্বেতগৃধ্নের বিরুদ্ধে কোরিয়ার জনসাধারণের ঘৃণা ও বিতৃষ্ণাকে মূর্তিময়ী করে তুলেছেন। থিন সং ওয়ং তাঁর 'বিচার চাই' কবিতায় একই সুরে মার্কিনী ফৌজের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন।

গণ-মনের প্রতিভূ এই সব তরুণ কবিদের মধ্যে ঘিয়ক ইন ডিয়ান-এর 'ঘৃণা' কবিতাটির অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

ঘৃণা

সারাক্ষণ ধরে
পশুগুলো মাড়িয়ে চলে
আমাদের বাগান
দলিয়ে চলে আমাদের ফুলগুলি।
বিক্রি-করা বস্তার তলানি ঝাড়া
বাসিটক ময়দার গুঁড়ো ছিটিয়ে
হৃদয়ের মাটি কি
বাড়তে পারে তাতে,
বলো তো দেখি ?
মুখে তাদের চিউইং-গাম
চিবুতে থাকে সারাক্ষণ,

চক্ষে তাদের ভাল
মানুষের মুখোশ ঃ
থুথু ফেলি আমি ঘৃণা
আর প্রতিহিংসায় !

সাহিত্যের এই আদর্শগত রূপ পদ্মা ও মেঘনার জলধারার মতো পৃথক দুভাগে ছড়িয়ে পড়ল জাপানী আওতার অবসানে যুদ্ধোত্তর দুই কোরিয়ায়। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সাহিত্যগত এই প্রভেদ রাজনৈতিক নীতি হয়ে দাঁড়াল। কিম ইর সেন-এর নেতৃত্বে উত্তর কোরিয়ায় মেহনতি জনগণের নতুন সাহিত্য যেমন দানা বাঁধতে থাকে, মার্কিন দখলীয় দক্ষিণ কোরিয়ায় তেমনি মার্কিন প্রভাবাধীন এক ভুঁইফোড় সাহিত্যেরও সৃষ্টি হতে থাকে। লী হুয়ান জুং, হং হ্যিয়ং ই, কিম নাম চোং, আন হি নাম প্রভৃতি তরুণ লেখকরা উত্তর কোরিয়ার এই নতুন প্রগতি সাহিত্যকে জোরদার করে তোলেন। তৎকালীন সিং ম্যান রী সরকারের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার বহু প্রগতিশীল সাহিত্যিক এ সময় দল বেঁধে উত্তর কোরিয়ায় চলে আসতে শুরু করেন। আর যাঁরা রয়ে গেলেন, তাঁরা নিজ নিজ আত্মসত্তা বিসর্জন দিয়ে সরকারী নীতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে লিখতে শুরু করলেন। এই প্রসঙ্গে লী বং কু, পাক্ তাই হোয়ান প্রভৃতি লেখকদের নাম উল্লেখ করতে হয়। 'বিজয় তোরণ', 'রাত্রি ও দিন' প্রভৃতি এঁদের রচনায় মার্কিনী প্রভাব বিশেষ করে লক্ষ্য করবার। জাঁ পল সাঁতার-এর অনুবাদ এ সময় দক্ষিণ কোরিয়ায় খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সমালোচক সং বিয়ং সিক আমেরিকার জয়-জয়কার গাইতে থাকেন কোরিয়ার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়।

জাপানী নিপীড়ন ও সেন্সর বোর্ডের দৌরাত্ম্যে কোরিয়ার সত্যিকারের সাহিত্যের বিকাশ লাভ যে ঘটে নি, ইতিপূর্বে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তবু যেসব সাহিত্য পত্র ও পত্রিকা এই সাহিত্যিক ধারাটি জিইয়ে রেখেছিল, তাদের মধ্যে 'মুন জেন' বা 'সমন্বয়'-এর দান

সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাত্র দুটি বৎসর ছিল তার আয়ুষ্কাল। কিন্তু এরি মধ্যে রসঘন বহু গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধের দ্বারা কোরিয়া সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করে তোলে পত্রিকাটি। লী য়ো সুপ-এর ছোট গল্প 'পাউডার মাখা ফুল', লী সুয়েন-এর প্রবন্ধ 'ডানা' এবং সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক কিম ডং নি-র লেখা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'মুন জেন' পত্রিকায় জার্মান, ফরাসী ও রুশ সাহিত্যের বহু মনীষীর রচনা-সম্ভার ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতো অনূদিত হয়ে। কি কোয়ান জুং-ও ছিলেন এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম। ফরাসী কবিদের অনুকরণে তিনি কাব্য রচনা করবার চেষ্টা করতেন কোরীয় ভাষাকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমতুল্য করে তুলবার উদ্দেশ্যে।

মধ্য যুগের কোরীয় সাহিত্যের মতো এ সময় বিভিন্ন সাহিত্যিক মতবাদও মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। আদর্শগত এই সাহিত্যিক দ্বন্দ্বে কিম ডং নি-র দল পক্ষ নিলেন 'সৌন্দর্যের জন্য শিল্পে'র পক্ষ আর কিম ডং সন লেখনী ধারণ করলেন 'শ্রমের জন্য শিল্পে'র। কিম ডং সন ছিলেন জাপানের মার্কসীয় সাহিত্যিক কুদাহারা-র একমতাবলম্বী। তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মুখে কিম ডং নি-র 'সৌন্দর্যের খাতিরে শিল্পে'র দল অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে যুদ্ধোত্তর কোরিয়ার কাব্য সাহিত্যও নতুন বলিষ্ঠ রূপ ধারণ করে নেয়। কবি পাক্ তু চিং এই নতুন কাব্যধারার ছিলেন প্রবর্তক। তাঁর কবিতা 'সূর্যের গান' রবি-কর-দীপ্ত এ নব প্রাণবন্যার প্রতীক। চো জি য়োং সুষ্ঠু এক সমালোচনা সাহিত্যেরও সূত্রপাত করেন নতুন কাব্য আলোচনার মারফত।

সাহিত্য ও কাব্যের এই নতুন হাওয়ার ঢেউ নাট্য-সাহিত্যেও এসে লাগে। হেম চে দোক্ ও পুসানের জাতীয় নাট্যশালার অধ্যক্ষ যুচি ঝিন ঢেলে নতুন রূপদান করেন কোরিয়ার নাট্য-সাহিত্যের চীনা নাটকের মামুলী প্রথা ভেঙে আধুনিক জাপানী রঙ্গমঞ্চের ধাঁচে। হেম চে দোক্-এর নাটক 'তং সং' (এক জারজ সন্তানের কাহিনী অবলম্বনে

লিখিত।) ও 'মালিকদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরোধ বাহিনীর লড়াই' শীর্ষক নাটক এবং য়ু চি ঝিন-এর দেশাত্মবোধমূলক নাটকগুলি রঙ্গমঞ্চে সবিশেষ সমাদর লাভ করে। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ায় বাস করে বেশী দিন তাঁদের সাহিত্য সাধনা করা চলল না। সিং ম্যান রী-র পুলিস আর ফৌজ নিল তাঁদের পিছু। হন্যে কুকুরের মতো তাঁদের অবশেষে দেশ ছাড়তে হলো। এবং তাঁদেরও আশ্রয় নিতে হলো লী তাই-জুং, কবি লিম হুয়া ও আন্ ফে নাম-এর মতো উত্তর কোরিয়ায় গিয়ে।

উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই কোরিয়ার লড়াইয়ের সময় সমকালীন কোরিয়ার সাহিত্য আবার যুদ্ধের হাতিয়ারে রূপান্তরিত হলো জাপ-প্রতিরোধকালীন অবস্থার মতো। উত্তর কোরিয়ার দেশপ্রেমিক লেখকরা মার্কিন যুদ্ধবাজদের কুটিল চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রচারে সাহিত্যকে পুরোপুরি নিয়োগ করলেন। দক্ষিণ কোরিয়ায় ঘটল ঠিক তার বিপরীত। সেখানে সাহিত্যকে করা হলো একরূপ নিষিদ্ধ। সেন্সর বোর্ডের কড়া নজর এড়িয়ে যা-ও বা রেহাই পেল, প্রকাশকের অভাবে তাও পড়ে রইল ধামাচাপা হয়ে। কোনো প্রকাশকই যুদ্ধবিরোধী প্রচারমূলক সাহিত্য ছাপতে অগ্রসর হলেন না। লী মুন অং (নৌ-ফৌজের শিক্ষা ও নৈতিক দপ্তরের অধ্যক্ষ)-এর কিছু কিছু সামাজিক কাহিনী শুধু ছাপার অক্ষর দেখবার সুযোগ লাভ করল। তাছাড়া দক্ষিণ কোরিয়ার বেশীর ভাগ লেখকই সিউল বা পুসানের কফিখানায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। কাপের পর কাপ চা-কফি পান করতে কবতে তাঁরা মান্ধাতা আমলের পুরনো রেকর্ড শুনতে লাগলেন গ্রামোফোনে, আর নিজেদের অক্ষমতার দোহাই পেড়ে কামু বা সার্তার-এর আলোচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। সাহিত্য-কৃতি বুঝি শিকেয় উঠল।

ঈ কোয়াঙ্-সু (১৮৯২—)-কে আধুনিক কোরীয় সাহিত্যের জনক বলা যায়। একাধারে তিনি কবি ও কথাশিল্পী। তাঁর স্বার্থক

সাহিত্যকৃতি আধুনিক কোরীয় সাহিত্যকে দান করেছে নতুন মর্যাদা। 'পথিকৃৎ', 'জীবনের সৌরভ' ও 'ভালবাসা' তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর নিরীক্ষামূলক কাব্যগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থে তিনি অতীতের ঐতিহ্যবাহী মামুলী কাব্যধারাকে উপেক্ষা করে জনসাধারণের সহজবোধ্য এক নতুন চলতি রীতির প্রবর্তন করেন। কাব্য কেবল মুষ্টিমেয় একশ্রেণী শিক্ষিত রসগ্রাহীর একচেটিয়া বিষয়বস্তু কিংবা রাজনীতির ধ্বজাবাহীদের হাতিয়ার নয়, কাব্য হল তাঁর মতে জীবনেরই একান্ত প্রতিফলন—বর্তমান যুগে আর সকলের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে হলে সত্য ও বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে যাকে অনুক্ষণ অনুসরণ না করে চলে না। ঈ কোয়াঙ স্যু-ব একটি কবিতার নমুনা দেওয়া গেল পিটার হিউস অনূদিত 'Voices Of The Dawn' (৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত কোরীয় কাব্য-সংকলন) থেকে।

বন্ধুজনের লাগি আকুলতা

ভাই আর বোন সব!
তোমরা কি শুনিতে পাও, শুনিতে কি পাও
কি গান গাহিছি আমি
বসি নতজানু হয়ে অবনত শিরে
বিধ্বস্ত প্রাচীরের নীচে ?

*　　　*　　　*

ভাই আর বোন সব!
তোমরা কি ঘ্রাণ পাও, ঘ্রাণ কি পাও
সুরভি কাঠের সৌরভ ?
কম্পিত আমার হাত, তবু জ্বেলে যাই
ধূপ ভগ্ন ধুনুচীতে।

ভাই আর বোন সব!
তোমরা কি দেখিয়াছ কভু, দেখিয়াছ মোরে
আছি কার প্রতীক্ষায় নগর প্রাচীর বহির্দ্বারে ?
নীরবে ফেলিছি অশ্রু,
আকুল হয়েছি কত তোমাদের লাগি!

[ঈ কোয়াঙ স্থ]

ঈ কোয়াঙ স্থ-র অনুবর্তী আধুনিক কবিদের মধ্যে ঈ ইয়াক সা (১৯০৫-১৯৪৪) ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রতিভাবান তরুণ কবি। জাপ সাম্রাজশাহীদের বর্বর আক্রমণে যাকে অকালেই মৃত্যুবরণ করতে হয়ে ছল। সুব ও ব্যঞ্জনায় তাঁর কিছু কিছু কবিতা করুণাত্মক হলেও, তাঁর কাব্য ছিল তীক্ষ্ণ জ্বালাময়ী ও অনাবিল প্রতীকধর্মী। ১৯৪৪ খৃষ্ট'ব্দে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায় তাঁর কবিতা জাপানী সমর অধিকর্তাদের বিষনজরে পতিত হয় এবং 'নিরাপত্তা'ব অজুহাতে ধৃত হয়ে তাঁকে জাপ পুলিস হাজতে প্রাণ দিতে হয়। ঈ ইয়াক সা-র একটি কবিতার অক্ষম অনুবাদ—

হ্রদ

আর কোথা যেন চলে যেতে চায় মন যে আমার
বায়ু বিধৌত চোখ দুটি চায় কিন্তু থাকতে হেথায়।
ক্রন্দনরত মরালগুলিকে বিতাড়িত করি প্রায় তো শিক্ত
রাত্রির আঁধার নেমে আসে যবে নিজেই পড়ি তখন ঘুমিয়ে।
মুমূর্ষু-তারাদের কথা যত ভাবি বসে তাহাদের মৃত ছায়াতলে—
ধূসর এক আবরণ ছেয়ে দেয় যেন ধ্যান-মৌন সর্বদিক।

[ঈ ইয়াক সা]

কিম কি-রিম (১৯০৯—)-ও সমকালীন কোরীয় সাহিত্যের একজন শক্তিশালী কবি যাঁর মতে কবিতা হবে নিও-রোমান্টিশিজিম বা নিও-রিয়ালিজমের উর্ধ্বে। প্রকৃত কবিকে হতে হবে নয়াদুনিয়ার ঋত্বিক—নতুন ইতিহাসের পথিকৃৎ। কবিকে কেবল পাশ্চাত্ত্য শিল্প ও

সংস্কৃতির গুণগ্রাহী হলে চলবে না, প্রকটিত করে তুলতে হবে তাঁকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন স্বরূপটিও। তাঁর কাব্যাদর্শের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ "প্রজাপতি ও সমুদ্র-এ"।

এমনি আর একজন শক্তিধর বুদ্ধিজীবী তরুণ কবি হলেন পাক তাই-জিন (১৯২১—)। আর মহিলা কবিদের মধ্যে অগ্রণী হলেন মহ্-উযান-স্থক (১৯২০—)। হোয়াও জিম-ই-কে যদি প্রাচীন মহিলা কবিদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত কবতে হয়, তবে এ যুগে তাঁর সে আসনেব উত্তবাধিকারিণী হলেন মহ্-উয়ান-স্থক। তিনি যেন স্বর্গ আর মর্তের ভাবাবেগ ও বুদ্ধিমত্তার প্রকৃত সমন্বয় সাধন করে গেছেন।

প্রজাপতি ও সমুদ্র

শ্বেত প্রজাপতিটিব কিসেব ভয় সমুদ্রের,
অতল সাগব গভীবতা তাব হয়নি বলা।
সাগব তো নয় যেন সবুজ মাঠ—সবুজে সবুজ
ডুবিয়ে নেয় সে তার ডানাদুটি ওই সাগর জলে।
তাবপর বুঝি কাঁপতে থ'কে অসহায় ক্ষুদে এক রানীর মতন।
লোহিত বেগুনি নীল মাস :
সাগরের বুক ফুলে ফুলময়
কিন্তু ঘ্রাণ তার কই ?
অমাবস্যার চাঁদ নীল পাণ্ডুর রঙে রাঙা
প্রজাপতির ডানায় ডানায়।

[কিম কি-বিম]

।। গ্রন্থপঞ্জী ।।

—সি. ওসগুড : দি কোবিয়ান এ্যাণ্ড দেয়াব কালচার
এম. এন. ট্রোলপ : কোবিযান বুক্‌স এ্যাণ্ড দেয়ার অথর্‌স
হিউম পিটাব : ভয়সেস্ অফ দি ডন অনুবাদ
এন্‌সাইক্লোপিডীয়া ব্রিটানিকা (১৩শ খণ্ড)
সো ভয়েট লিটাবেচার—১নং সংখ্যা, ১৯৫৫

ইন্দোনেশীয় সাহিত্য

'অর্থ আজ হারায়েছে সে-যুগের লিখা,
নেমেছে বিস্মৃতি কুহেলিকা
অর্ঘশূন্য কৌতূহলে দেখে যায় দলে দলে আসি
ভ্রমণবিলাসী,—
বোধশূন্য দৃষ্টি তার নিরর্থক দৃশ্য চলে গ্রাসি।'

[বোরোবুদুর : "পরিশেষ"]

নতুন নামকরণ খুব বেশী দিনের কথা নয়। পূর্বে পরিচিত ছিল 'দ্বীপময় ভারত' বলে। এখন নাম হয়েছে ইন্দোনেশিয়া। প্রফেসর এ. ব্যাস্টিয়ন প্রথম এ নামে অভিহিত করেন ১৮৮৪ সালে। ছোট-বড়-মাঝারি হরেক রকমের হাজার হাজার দ্বীপের সমষ্টি। জাভা বা যবদ্বীপ, বলি, সুমাত্রা, কালিমন্তন (বোর্নিও), লম্বক, সুম্বা, মালাক্কা, ইরিয়ান (নিউগিনির অংশবিশেষ), সুলাবিসি (সেলিবিস)—ভারত মহাসাগরের প্রশস্ত বুক জুড়ে এমনি অসংখ্য দ্বীপের পর দ্বীপ। মোট আয়তন প্রায় ৭৩ লক্ষ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ৮ কোটির উপর।

প্রাচীন ভারতের সঙ্গে এই দ্বীপমালার ছিল একদা ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও পরিচয়। 'মকর-চূড় মুকুট' পরে হাতে 'ধনুক-বাণ' ধারণ করে 'রাজবেশী' ভারত উপনিবেশ স্থাপন করেছিল সাগর পারের ঐ দূর পরদেশে গিয়ে। একাসনে বসে 'নটরাজেরে' ডালি সাজিয়ে পূজা করেছিল ভারত আর ইন্দোনেশিয়া। 'শিব-শিবানী'র আলোক-ছায়া দুলে উঠেছিল একদা তার সাগর জলে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি : ভারতের ব্রাহ্মণ্য·বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের অমৃতবাণী এসে আছড়ে পড়েছিল এর উপকূলে। দিগ্বিজয়ী ভারতের বণিক আর পুরোহিত, বৌদ্ধ শ্রমণ আর ভিক্ষু, জ্ঞানী-গুণী সম্প্রদায়ের দৌলতে দু দেশের মধ্যে

এই যোগসূত্রের ভিত পাকা হয়ে ওঠে। যীশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করার পূর্ব থেকে ভিনদেশী ভারতের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনের গাঁটছড়ার বন্ধন নিবিড় হতে শুরু করে বলে পণ্ডিতদের ধারণা।

যবদ্বীপের প্রাচীন পুরাণে উল্লেখ আছে, খৃষ্টীয় প্রথম শতকে 'আজি-বক' নামে ভারতের এক রাজা গুজরাট থেকে প্রথম গিয়ে নাকি উপনিবেশ স্থাপন করেন যবদ্বীপে। আর তাঁর থেকে যবদ্বীপে প্রথম হিন্দু রাজবংশের সূত্রপাত। পরবর্তী কালের বহু শিলালেখ, অনুশীলন ও বিভিন্ন গ্রন্থে এমনিধারা উপনিবেশ স্থাপনের বহু উল্লেখ দেখা যায়। শুধু গুজরাট থেকে নয়, ভারতের বিভিন্ন স্থান: তামিলনাদ, কলিঙ্গ, উড়িষ্যা এমন কি পূর্ববঙ্গ থেকেও বহু সম্প্রদায়ের লোক গিয়ে বসতি স্থাপন করতে লাগল এই নতুন উপনিবেশে। সুমাত্রা বা সুবর্ণদ্বীপ. যবদ্বীপ প্রভৃতি সুসমৃদ্ধ এলাকার বিপুল ঐশ্বর্যই যে ভারতীয় বণিকদের প্রলুব্ধ করত তা বলা বাহুল্য। এ সম্পর্কে প্রাচীন এক গুজরাটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রবাদটির মর্মকথা হলো: যারা জাভায় যায়, তাদের খুব অল্প লোকই ফিরে আসে, কিন্তু যারা ফেরে তাদের ধন-দৌলতের কুলকিনারা থাকে না। দক্ষিণ ভারতের লোকদের এখনও ইন্দোনেশিয়া আর ইন্দোচীনে 'কিলিঙ' বলে অভিহিত করে থাকে বলে লিখেছেন শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'দ্বীপময় ভারত' ভ্রমণ কাহিনীতে। 'কিলিঙ' প্রাচীন কলিঙ্গদেশের অপভ্রংশ। এটা তখন ছিল অন্ধ্র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

জাভা, বলি, সুমাত্রা, কালিমন্তন প্রভৃতি দ্বীপের বাসিন্দারা ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে একান্ত আপনার করে নেয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এমনিধারা সাংস্কৃতিক লেনদেন চলতে থাকে দুই মহাদেশের মধ্যে। তারপর কোন্ সময়ে যে তা মন্দা হয়ে আসে সঠিক জানা যায় না। হিন্দুদের কালাপানি পার নিষিদ্ধ হবার পর থেকে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে যোগাযোগের সূত্র যায় একরূপ ছিন্ন হয়ে।

বিচ্ছিন্ন এই সাংস্কৃতিক ধারার পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যেই বুঝি এই সেদিন—১৯২৭ সালে—ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীন ভ্রমণে গিয়েছিলেন সমগ্র এশিয়ার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ধারার প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথ। কবির হাতে এবার আর 'ধনুকবাণ' ছিল না, ছিল শুধু 'বীণা'! বাতাবিয়ায় (জাভা) পৌঁছে 'শ্রীবিজয়' (Shriwidjaya) সাম্রাজ্যের লুপ্তগৌরব স্মরণ করে বুঝি কবি লিখেছিলেন ঃ

'তোমায় আমায় মিল হয়েছে
কোন্ যুগে এইখানে।
ভাষায় ভাষায় গাঁট পড়েছে,
প্রাণের সঙ্গে প্রাণে।'

শ্রীবিজয়নগর ছিল আধুনিক পালেমবাঙ শহরের নিকট অবস্থিত। বৌদ্ধ শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজারা এ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। খৃষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত জ্ঞান-গরিমা ঐশ্বর্য-বীর্যে শ্রীবিজয়লক্ষ্মীর বিজয়গৌরব ছড়িয়ে পড়ে দেশ-বিদেশে। দূর চীন, ভারত, সিংহল, পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিদেশী শিক্ষার্থীরা আসত তখন এদেশে। বোরোবুদুর বা বুদুর গ্রামের বৌদ্ধ বিহার এঁদেরই অমরকীর্তি। নৌ-শিল্পেও ছিলেন এঁরা অতুলনীয়। বোরোবুদুর বিহারের গাত্রে এখনও সমুদ্রগামী জাহাজের খোদাই চিত্র সাক্ষী দেয় তাঁদের এ যশগৌরবের। বৌদ্ধ শ্রীবিজয়ের সঙ্গে ভারতের প্রেমপ্রীতির রাখিবন্ধন যে কত নিবিড় ছিল তার প্রমাণ মেলে নালন্দাতে প্রাপ্ত তাম্রলিপি থেকে।

'পরিশেষে'র অন্তর্ভুক্ত রবীন্দ্রনাথের 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী' কবিতাটি ডাচ ভাষায় ও পরে জাভানি ভাষায় অনূদিত হয়। অধ্যাপক ডক্টর অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা 'জাভা-যাত্রীর পত্র' (পত্রসংখ্যা ১৫) থেকে জানা যায়—রবীন্দ্রনাথ 'কথা ও কাহিনী' থেকে কয়েকটি কবিতা জাভানী শ্রোতাদের আবৃত্তি করে শোনান। জাভানী এক ভদ্রলোক কবির কয়েকটি কবিতা জাভানী ভাষায় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন। কবি

জাভানী ভাষায় গাওয়া একটি গানের বাংলা অনুবাদ করেন নিজে। অনুবাদটি হলো :

প্রেমাস্পদা

'হে রমণী, বিশ্ব ভুবনের ভূষণে তুমি যুক্তা।
অবসন্ন তোমার দাস, বিরহে বিষাদে বিমর্ষ,
তাকে আরোগ্যের অমৃত-ঔষধি দাও।
ওগো আমার কপোতিকা, আমার প্রাণপুতুলি,
বলো দেখি, আমার দুঃখ কে জানে।
এমন পাষাণ চিত্ত কার, হে নারী,
তোমাকে দেখে যার মন ভালবাসায়
না ব্যথিত হয়।
বৃষ্টির পরে আকাশে ছড়িয়ে-পড়া তারাগুলি
জ্বলজ্বল করে,
মনে হয় ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় ওরা অভিভূত—
আমার উষ্ণীষের ফুলও শিথিল হোল
সেই পীড়নে।
তোমার কবরীর দিকে তাকিয়ে,
তারাগুলির এই দশা।'

['বিচিত্রা'—১৩৩৫, কার্তিক]

সুবর্ণদ্বীপের বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের পতনের পূর্বে মধ্য জাভায় মজ্‌পহিত (Madjaphit, খৃষ্টীয় ১২৯২—১৫২০ সাল) নামে প্রতাপশালী নতুন এক হিন্দু সাম্রাজ্যেরও উদ্ভব হয়। প্রাম্বানানের 'শিব-শিবানী'র বিরাট মন্দিরগায়ে রামায়ণের খোদাই করা চিত্রাবলীর মতো অমন সুন্দর চিত্র খাস ভারতবর্ষের ভাস্কর্যে খুব কমই আছে বলে উল্লেখ করেছেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সুতরাং খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলতে বুঝাত ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঔপনিবেশিক

রূপান্তর মাত্র। খৃষ্টীয় শতকের প্রারম্ভেই নারিকেল বনাচ্ছাদিত সাগরপারের এই দূরাঞ্চল স্মরণ নিয়েছিল বুদ্ধের প্রেমের বাণীর। বিষ্ণু আর দশভুজা তারপর 'অজানা ওই সিন্ধুতীরে' নিয়েছিলেন তাঁদের পূজা। রামায়ণের কবি উঠেছিলেন উদ্‌গ্রীব হয়ে 'দূর সাগরের স্রোতে বাণী' তাঁর পার করে দিতে। 'বেদব্যাসের ভাষা' উথল হয়ে উঠেছিল দূর ওই সাগরপারে নতুন বাসা বাঁধবার জন্য। মজ্‌পহিত সাম্রাজ্যের কীর্তিকলাপে তার প্রমাণ মেলে।

মধ্য জাভার মজ্‌পহিত সাম্রাজ্যের ভাঙনের আগে থেকেই আরব আর ইসলাম ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকে সুমাত্রা, জাভা আর বোর্নিওতে। তাদের শক্তি ও সংহতি ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে এবং হিন্দু মজ্‌পহিত সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ৪টি মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ দেমাক, হাজাঙ, বন্তাম আর মাতারাম-এ। পোর্তুগীজ হার্মাদরাও আসতে থাকে এ সময়। আসে ডাচ বণিকরাও। তারপর 'বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে' দেখা দিল একদিন। পরস্পর লড়াই-রত দুর্বল মুসলমান সুলতান আর নবাবদের পরাজিত করে ডাচরাই গোটা দেশটাকে করায়ত্ত করে নিল এক সময়। তিন-চারশত বছরের মুসলমান ও ডাচ প্রভাব-প্রতিপত্তি আর শাসনের আওতায় ইন্দোনেশিয়ার সাংস্কৃতিক জগৎ সত্যই আজ এক অভিনব রূপ নিয়েছে। সাহিত্যে পড়েছে তারই অপরূপ প্রতিফলন।

আগেই বলা হয়েছে ইন্দোনেশিয়া ছিল দিগ্বিজয়ী ভারতেরই উপনিবেশ। ভারতের সঙ্গে এ উপনিবেশের যোগসূত্র কেবল রাষ্ট্রীয় ও ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না; ছিল সাংস্কৃতিক ও আত্মিক। সুতরাং সেকালের ইন্দোনেশীয় সাহিত্য প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ঔপনিবেশিক নামান্তর মাত্র বলা যায়। ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার সাংস্কৃতিক ধারার আলোচনাকালে আমরা তা দেখেছি।

প্রাচীন ইন্দোনেশিয়ার ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে সুন্দানি, মাদুরাই ও জাভানী—এ তিনটি হলো প্রধান। পশ্চিম জাভার পাহাড়ী

অঞ্চলের বাসিন্দারা সুন্দানি ভাষায় কথাবার্তা বলত। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে পর্যন্ত তাই ছিল তাদের কথ্য ভাষা। মাতুরাই ভাষা সুন্দানিদের ভাষার চাইতে ছিল ভিন্ন। অনেক মালাই শব্দ মাতুরাই ভাষার মধ্যে প্রচলিত হয়ে পড়ে। জাভার প্রাচীন ভাষার আর এক নাম 'কবি'। তার কাব্য-সাহিত্যকে বলা হয় ককবিন (Kakawin), আর গদ্যকে 'পর্ব'। খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকে এ 'কবি'-সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। শৈলেন্দ্র বংশের রাজত্বকালই ছিল সেকালের ইন্দোনেশীয় সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। মজ্‌পহিত সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত গৌরব-রেখা তার অটুট থাকে। সংস্কৃত ও বৌদ্ধ ভাবধারা এ যুগের ইন্দোনেশীয় সাহিত্যকে বিশেষ করে প্রভাবান্বিত করে। আরবদের আগমনের পর ইসলাম ও ডাচ প্রভাবে মধ্যযুগীয় ইন্দোনেশীয় সাহিত্য রূপ নেয় নয়া 'কবি'-সাহিত্যের মধ্যে। সংস্কৃত বর্ণমালা রূপান্তরিত হয় তখন 'আরবী পগন'-এ।

সেকালের ইন্দোনেশীয় সাহিত্যকে মোটামুটি এ কয় ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

১॥ বেদ-পুরাণ—'সূর্যসেবন', মন্ত্র ও পূজার অনুষ্ঠান সংক্রান্ত পুঁথি।

২॥ আগম—ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র ও নীতি-গ্রন্থ।

৩॥ বরিগ (Wariga)— দেব-দেবীর উপাখ্যান, জ্যোতিষশাস্ত্র, অলঙ্কার, ব্যাকরণ প্রভৃতি গ্রন্থ। 'উসদ' (ঔষধ) বা চিকিৎসাশাস্ত্রও বরিগ সাহিত্যের পর্যায়ের মধ্যে পড়ে।

৪॥ ইতিহাস—রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুটি মহাকাব্যের ইন্দোনেশীয় সংস্করণ। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত গদ্য (পর্ব) ও পদ্যে (ককবিন) বিভিন্ন গ্রন্থ। এ ছাড়া রামায়ণ-মহাভারত এ দুই অমর কাব্যের আখ্যায়িকা নিয়ে রচিত প্রসিদ্ধ ছায়াচিত্রনাট্য (Wayang) সাহিত্যকেও এ 'ইতিহাস'-এর মধ্যে ধরা যায়।

৫॥ পক্ষি সাহিত্য।

৬ ॥ ববদ্ বা পদ্য-ইতিহাস।

৭ ॥ তন্ত্রি কামন্দক প্রভৃতি নীতিমূলক জন্তু-জানোয়ারের কাহিনী।

ইন্দোনেশিয়ার সেকালের সাহিত্যে পৌরাণিক কাহিনী ও কিংবদন্তির সংখ্যাই বেশী। এসব কাহিনী নানান আগম বা ধর্মগ্রন্থে, বরিগ, 'ইতিহাস' বা মহাকাব্যে, নীতিশাস্ত্র, ববদ্ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর পুস্তকে ছড়িয়ে আছে। এমনি এক প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ থেকে জানা যায়ঃ দেবী দারুকী নামে রূপবতী এক স্ত্রীলোককে কেন্দ্র করে পুরাকালে এক জাতীয় মহাসমর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তার দেড় হাজার বছর পর দেবী সীন্তা (সীতা?) নামে আর এক রূপবতী নারীকে উপলক্ষ করে আর এক জাতীয় মহাসমর হয়। এর প্রায় দু হাজার বৎসর পরে দেবী দ্রৌপদীকে নিয়ে তৃতীয় এক মহাসমর সংঘটিত হয়েছিল।...

ইন্দোনেশিয়ার এমনি আর এক পৌরাণিক আখ্যায়িকা হলো 'মানিকময়'। জাভার এই প্রাচীন পুরাণে সৃষ্টিতত্ত্ব অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ পুরাকাহিনী থেকে জানা যায়ঃ আদি মানবের বংশধর 'সঙ্গযঙ্গ তুঙ্গল' নামে এক স্বর্গ নির্মাণ করেন। একদা তিনি কৌস্তভবৃক্ষের একটি পাতা পূজা করে মাটিতে ফেললেন আর তা থেকে অপরূপ রূপবতী এক কন্যার জন্ম হয়। এ কন্যার গর্ভে এবং তাঁরই ঔরসে চারিটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। প্রথম পুত্রের নাম সংয়মপুগ; দ্বিতীয় পুত্রের নাম সংয়মপুঙ্গ; তৃতীয় পুত্রের নাম সংয়মগুরু বা স্বয়ম্ভু এবং চতুর্থ পুত্র সংয়মপঙ্গৎ। চার পুত্র বড় হয়ে উঠল। আর স্বর্গের অধিকার নিয়ে বড় ও মেজো ছেলের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। আদি মানব পূর্বলিঙ্গয়ন তখন করলেন কি, এঁদের দুজনকে দুহাতে ধরে দুদিকে নিক্ষেপ করলেন মর্ত্যে। প্রথম পুত্র পুগ গিয়ে পড়লেন সাবঙ্গদ্বীপে এবং দ্বিতীয় পুত্র পুঙ্গ গিয়ে পড়লেন যবদ্বীপে। তৃতীয় পুত্রের কণ্ঠ ছিল নীলবর্ণ। তিনি নীলকণ্ঠ নামে পরিচিত হন

এবং স্বর্গের রাজা হন। স্বর্গরাজ্যের দেবতারা তাঁকে পরম গুরু মহাদেবের মতো পূজা করতেন। আর চতুর্থ পুত্র পঙ্গৎ কনকপুত্র নামে প্রসিদ্ধ হন এবং পরে নারদ ঋষি নামে বিদিত হন।

এখন হয়েছে কি, একদিন নীলকণ্ঠ কল্পতরু পাতা নিয়ে মন্ত্রপাঠ করছিলেন। মন্ত্রপাঠ করতে করতে হঠাৎ অপূর্ব রূপসী এক কন্যার উদ্ভব হয় কল্পতরু পাতা থেকে। এ কন্যার নাম উমা, নীলকণ্ঠ উমাকে আপনার কন্যার মতো লালনপালন করতে লাগলেন। শশিকলার মতো উমাও দিন দিন বড় হতে লাগল। পূর্ণ যৌবনশ্রী উমাকে দেখে নীলকণ্ঠ তখন কামাতুর হয়ে উঠলেন। উমা তাই বুঝে পলায়ন করলেন। নীলকণ্ঠও তাঁর পিছু নিলেন। উমাকে কিছুতেই ধরতে না পেরে স্বয়ম্ভু তখন চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করলেন। এবার আর তাঁর একান্ত ঈপ্সিতাকে লাভ করতে কোনো বেগ পেতে হলো না। উমার দেহ লাভ করলেও নীলকণ্ঠ পেলেন না তাঁর মন। এভাবে দুজনের এই মিলনের ফলে কামশর ও মহাপ্রলয় নামে দুটি রাক্ষসের জন্ম হলো। উমার মন পান নি বলে নীলকণ্ঠ তাঁকে রাক্ষসী হবার অভিসম্পাৎ দিলেন। উমা তখন শাপমোচনের *জন্য* বিস্তর কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন। তাঁর প্রার্থনাতে তুষ্ট হলেন নীলকণ্ঠ। উমাকে কালীদুর্গা হবার বর দিলেন। কামশর ও মহাপ্রলয়ের প্রতি সদয় হয়ে তাদের দুজনকেও পৃথিবী থেকে স্বর্গে যাবার সিঁড়ির পথে প্রহরী বানিয়ে দিলেন। এর পর নীলকণ্ঠ পাঁচটি কল্পতরু পাতা নিয়ে শম্ভু, ব্রহ্মা, মহাদেব, বাসুকি ও বিষ্ণুকে সৃষ্টি করলেন। এভাবে ইন্দ্র, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের সৃষ্টি হয়।

এ ছাড়া 'মানিকময়' ধর্মগ্রন্থে আরও অনেক দেবদেবীর উল্লেখ দেখা যায়। 'বিশ্বকোষে' ইন্দোনেশীয় সাহিত্যালোচনায় প্রসিদ্ধ এই পৌরাণিক কাহিনীর আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ আছে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব 'মানিকময়' গ্রন্থে বিশেষ করে লক্ষ্য করবার। নয়া জাভানী গদ্যতে লেখা বইখানি এবং রচনাও অনেক পরের। 'আল্লা' শব্দের

উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় এটি রচিত হয় ইন্দোনেশিয়ায় মুসলমান আগমনের পর। 'মানিকময়'র মতো 'তন্তু পাংগেলারণ', "আদিপুরাণ' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থেও এমনি ধারা অজস্র পুরা-কাহিনীর বিবরণ লক্ষিত হয়।

সেকালের ইন্দোনেশীয় সাহিত্যের অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে তার 'ইতিহাস' বা রামায়ণ ও মহাভারত—এই দুই মহাকাব্য ও তাদের কাহিনী-আশ্রিত বহু 'পর্ব' ও 'ককবিন'-ভাণ্ডার। এ দুই মহাকাব্য কখন প্রথম ইন্দোনেশীয় সাহিত্যে আপন আসন জুড়ে বসেছিল সে নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে তর্কবিতর্কের মীমাংসা না হলেও, 'রামায়ণ ককবিন', কি 'ভারতযুদ্ধ', কি 'অর্জুন বিবাহ' কিন্তু আজও শোভা পায় ইন্দোনেশিয়ার প্রতি ঘরে ঘরে। 'ভারতযুদ্ধ' কাব্য মহাভারতের অংশবিশেষ নিয়ে লিখিত। এর কবি পু সেদা (Mpu Sedah)। রচনাকাল ১১৫৭ খৃষ্টাব্দ। কবি পু সেদা ছিলেন কেদেরি-রাজ শ্রীপাউকের শিক্ষাগুরু। তাঁর রাজত্বকালে এ কাব্য লিখিত হয়। 'অর্জুন বিবাহ' আর একটি অপূর্ব কবি-ককবিন। ৩৬টি স্বর্গে এ কাব্য বিভক্ত। কবি পু-কণ্ব (Mpu Kanvay) এর রচয়িতা। 'জাভার ভারবী' নামে তিনি সাধারণত খ্যাত ছিলেন। ১১ শতকের গোড়ার দিক এ কাব্যের রচনাকাল। 'অর্জুন বিবাহে'র প্রথম সর্গেই দেখা যায় দেবাধিপতি ইন্দ্র ও অপরাপর দেবতারা দৈত্যরাজ নিবাত-কবচের দৌরাত্ম্যে সদা ভয়-সন্ত্রস্ত। স্বর্গ-মর্ত্যে দেবাসুর কেউ পেরে ওঠেন না নিবাত-কবচের সঙ্গে। দেবাদিদেব মহাদেবের বিশেষ বরে বলীয়ান সে। পাশুপত ব্রহ্মাস্ত্রের জন্য অর্জুন তখন ইন্দ্রকিলা পর্বতে তপস্যা করছিলেন। সুরপতি ইন্দ্র অর্জুনকেই নিয়োগ করলেন দৈত্যরাজকে নিপাত করতে। সুপ্রভা নামে স্বর্গের এক অপ্সরাকেও পাঠালেন অর্জুনকে সহায়তা করতে। সুপ্রভা নিবাত-কবচের রাজপুরীতে গিয়ে নানান ছলনায় প্রলুব্ধ করে তার মৃত্যুর গোপন কথাটি জেনে এলো। জানলে, জিভই হলো দৈত্যরাজের দুর্বলতম

স্থল। সুপ্রভার কাছ থেকে তা জানতে পেরে অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত করলেন নিবাত-কবচকে মুখের মধ্যে বাণ ছুঁড়ে। এ হলো সংক্ষেপে 'অর্জুন বিবাহে'র কাহিনী। শেষের সর্গে দেখা যায়, অর্জুন স্বর্গে অবস্থান করে স্বর্গের নর্তকী মেনকা, সুপ্রভা, তিলোত্তমা প্রভৃতিদের সঙ্গে রতি-বিলাস করছেন।

এ ছাড়া, পু-ত্রদ'র 'ব্যোম কাব্য', পু-মোনাগিনা'র 'সুমনাসান্তক', পু-ধর্মজা'র 'স্মরদাহন', পু-ত্রিগুণ-এর 'কৃষ্ণায়ন', পু-তানাকিং-এর 'লুব্ধক', পু-বিদ্যাত্মকা'র 'পার্থযজ্ঞ', নিরার্থ'র 'উসন বলি' প্রভৃতি পুস্তক ইন্দোনেশীয় কবি-সাহিত্যির অপূর্ব সম্পদ। শুধু কাব্য-গাথায় নয়, মন্ত্রতন্ত্রও সেকালের ইন্দোনেশীয় সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে রেখেছিল। 'সূর্য সেবাননে'র অন্তর্ভুক্ত একটি মন্ত্র অনূদিত হলো এখানে ঃ

হে রাজা হনুমান,
জানি আমি তোর জন্মকথা!
মা তোর রাজপুত্রী সীন্তা দেবী
আর বাপ রাজা শীরিরাম।
কৃপা কর মোরে
আমি যেন পাইরে তারে
পাগল বানাই দে রে!
যদি শুনবি না মোর কথা
তবে শাপ-শাপান্ত করবো তোরে।

এ তো গেল ইন্দোনেশীয় সাহিত্যের সেকাল। এখন আসা যাক একালের কথায়।

ঔপনিবেশিকতার প্রভাব এড়িয়ে ইন্দোনেশিয়ার একালের সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। প্রস্তুতি কিন্তু তার চলছিল আরও আগে (১৯৩৩-৪১ সাল) থেকে। আর এর মূলে ছিল 'পুযঙ্গ বারু' (Pudjangga Baru) বা নতুন লেখক নামে

সাংস্কৃতিক এক মাসিক পত্রিকা। নতুন এই মাসিক পত্রিকাখানাই আধুনিক ইন্দোনেশীয় সাহিত্যের ভিত প্রতিষ্ঠিত করে। ডাঃ তাকির আলিযবন (Dr. Takdir Alisjahbana) ছিলেন এই 'নূতন লেখক' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক এবং এ সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। 'পুযঙ্গ বারু' পত্রিকার মারফত তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শ তুলে ধরলেন দেশবাসীর সামনে। আবেদন জানালেন জাতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পাশ্চাত্যের অনুকরণে নতুন ভাবাদর্শে। 'নতুন লেখক' পত্রিকার দৃষ্টিকোণ ছিল র‍্যাডিকেল ও প্রগতিমূলক। ঘুণেধরা পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করেছিল সে তার পৃষ্ঠায়। পরাধীনতার জিঞ্জির থেকে জাতি ও জাতীয় সাহিত্যের মুক্তির স্বপ্নও দেখতেন এর লেখকেরা। সম্পাদক আলিযবন তো জানিয়ে দিলেন উদাত্তকণ্ঠে :

> শান্তি আর অনাবিল চুপচাপ ?
> নহে, নহে, হে প্রভু,
> নহে আমাদের জন্য ;
> শান্তি আর অনাবিল চুপচাপ—
> কবর দিয়েছি তাদের মাটির তলে।

ডাঃ আলিযবনেরও পূর্বে সামাজিক অব্যবস্থার কিছু কিছু চিত্র তখনকার কথা ও কাহিনীগুলিতে ফুটে উঠেছিল। তাদের মধ্যে মিরারি সিরেগর-এর 'আজব দান সংসার সুরঙ্গ গদিস্' (দুঃখ-কাতরা) আর রুস্লি র 'সিথি নুরবায়া' বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। প্রাগ 'পুযঙ্গ বারু'র এসব সামাজিক রোমান্সগুলিতে দেখা যায় নারী কি করে ক্রীতদাসে পরিণত হতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের। স্বকীয় কোনো সত্ত্বা নেই যেন তাদের। 'আজব দান সংসার সুরঙ্গ গদিস্' আগাগোড়া এই সামাজিক অবস্থার জ্বলন্ত প্রতিবাদ। সমাজচিত্র হিসেবে এসব রচনার মূল্য থাকলেও তাদের অধিকাংশই নীতিমূলক ও গতানুগতিক একঘেঁয়ে মামুলী ঢঙে লেখা। রোমান্টিক ন্যাকামিতে ভরা। 'পুযঙ্গ

বারু'র নয়া লেখকগোষ্ঠী নিয়ে এলেন রচন ও বচন ভঙ্গীর নতুন ফোয়ারা। সৃষ্টি করলেন সাহিত্যের প্রাচীন কাঠামো ভেঙে আত্ম-সচেতন এক নয়া সাহিত্যের বনেদ। বিদেশী—ইংরেজ, ফরাসী, রুশ ও মার্কিন—সাহিত্যের উৎকর্ষতার দিকে ইন্দোনেশীয় পাঠকদের দৃষ্টি করলেন তাঁরা আকর্ষণ। পুশকিন, ডস্টয়েভস্কি, টলস্টয়, চ্যেহভ, ইলিয়া ইরেনবুর্গ, আঁদ্রে জিদ, আঁদ্রে মারলো, এলডুস হাক্সলি, হেমিংওয়ে, স্টেইনবেক প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকদের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রচনার সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। মৌলিক রচনাও লেখা হলো বিস্তর। ডাঃ তাকির আলিযবন, সানুসি পানে (Sanusi Pane) ও তাঁর ভাই আর্মিন পানে (Armijn Pane), কবি আমির হামজা, আবদুল মুইস্ (Abdul Muis), আই গুস্টি নিমন পঞ্জি তিষ্ণা (I Goesti Njoman Pandji Tisna) প্রভৃতি শক্তিধর কবি ও লেখকরা গল্প-কবিতা-উপন্যাসে 'পুযঙ্গ বারু' যুগের ইন্দোনেশীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। সুবিখ্যাত সমালোচক এইচ. বি. জস্‌মিন-এর দানও নেহাত নগণ্য নয়। তাঁর 'জেম তানা এয়ার' (স্বদেশের প্রতিধ্বনি) আধুনিক ইন্দোনেশীয় সাহিত্যের এক স্মরণীয় গ্রন্থ।

এ নয়া সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রসিদ্ধ কবি, গদ্যলেখক ও নাট্যকার ডাঃ মহম্মদ যমিন (ইনি পরে ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন), কবি জে. ই. তাতং কেঙ (J. E. Tatang Keng) ও 'যোগী' (আবদুল রিভাইয়ের ছদ্মনাম) বিশিষ্ট আসন গ্রহণ করে আছেন। এ লেখকগোষ্ঠী ছাড়া আরও একটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠান একালের ইন্দোনেশীয় সাহিত্য-সৃষ্টিতে অগ্রণী ছিলেন। এ প্রতিষ্ঠানে সকলেই ধর্মে মুসলমান এবং তাঁদের পরিচালিত পত্রিকা দুটির নাম 'পঞ্জি ইসলাম' ও 'পিওমন মাজারকৎ'। জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হামকা হলেন শেষোক্ত পত্রিকার কর্ণধার।

ইন্দোনেশিয়ার বুকে ডাচ সাম্রাজ্যশাহীর শোষণ ও শাসন চলে প্রায় তিন শ সাড়ে-তিন শ বছর ধরে। দীর্ঘ দিনের এ অবস্থিতির

ফলে বিজাতীয় ডাচ ভাষায় কিছু কিছু সার্থক কবিতা ও জীবনচারিতও রচনা করেন ইন্দোনেশীয় লেখকেরা। কিন্তু ক্রমশ তাঁরা বিজাতীয় ভাষায় রচিত আপন রচনার ব্যর্থতায় সচেতন হয়ে ওঠেন এবং মাতৃভাষায় লেখার দিকে বিশেষ করে মনোযোগী হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে জাপানী সমর-শক্তির চটকদার অগ্রগতির মুখে ইন্দোনেশিয়া ডাচদের হাতছাড়া হয়ে জাপানীদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। ১৯৪২-৪৫ সাল পর্যন্ত এ-জাপ অবরোধকালে ইন্দোনেশীয় ভাষায় বিস্তর সাহিত্য রচিত হয়। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিল প্রচারমূলক ও জাপানী যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহায়ক। তাছাড়া জাপানী কড়া সেন্সর বোর্ডের দৌলতে ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগস্ট পর্যন্ত খাঁটি ইন্দোনেশীয় সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে নি। ঐ দিনটি ইন্দোনেশিয়ার সাহিত্যকালেও স্মরণীয় হয়ে থাকবে ; কেননা, ঐ দিন আণবিক বোমা-বিধ্বস্ত জাপান ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করে বিদায় নিতে বাধ্য হয় দ্বীপময় ভারতের সামরিক রঙ্গমঞ্চ থেকে। আধুনিক ইন্দোনেশীয় সাহিত্যের অনেক প্রসিদ্ধ রচনাই রচিত হয় জাপ অবরোধকালে, কিন্তু সেগুলি তখন আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি জাপান প্রভাবান্বিত 'পুসৎ কেবাদ্‌যানে'র (সাংস্কৃতি কেন্দ্রের) রক্তচক্ষুর ভয়ে।

আধুনিক ইন্দোনেশীয় সাহিত্যিক ডাঃ তাকির আলিযবনের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'পুযঙ্গ বারু'র তিনি যে কেবল সম্পাদকই ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, সমালোচক, শিক্ষাগুরু ও আইনজীবী। ১৯২৯ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নিত্যভাগ্য বিড়ম্বিত' (Ta' Putus di Rundung Malang) প্রকাশিত হয়। পিতৃমাতৃহীন এক ছেলেমেয়ের বিড়ম্বিত জীবন-কথা বিবৃত হয়েছে এই উপন্যাসে। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'চির প্রজ্বলিত প্রদীপ' (দিয়ান য়ং তক্ কুনজুং পাদম) প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে। গরীব এক গ্রাম্য যুবক ও ধনাঢ্য এক অমাত্য কন্যার প্রেম ও বিরহকে কেন্দ্র করে লেখা তাঁর এই উপন্যাস। 'লাজর টেরকেমব্যাঙ'-ই

(পূর্ণ পাল) আলিযবনের সর্বজন সমাদৃত উপন্যাস। প্রকাশকাল ১৯২৮ সাল। মানবিকতাই আলিযবনের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'শিল্পের জন্যই শিল্প' (Art for art's sake)—এর পক্ষপাতী তিনি নন। ইন্দোনেশিয়ার স্বকীয় ভাবধারাকে জগতের সামনে তুলে ধরাই তাঁর লেখার প্রধান উদ্দেশ্য। কবি হিসেবেও তাকির আলিযবন সুবিদিত। তাঁর 'তেবরেন মেগা' (ছড়ান মেঘ) কাব্যগ্রন্থে তাঁর কবি-হিয়ার পরিচয় মেলে। আলিযবনের সমকালীন আর একজন কবি হলেন আমীর হামজা (১৯১১-৪৫)।

'পুযঙ্গ বারু' লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে পানে ভ্রাতৃদ্বয়—সানুসি ও আর্মিন পানের স্থান আলিযবনের পর বলা যেতে পারে। সানুসি পানে ১৬ বছর বয়স থেকে কবিতা লিখতে শুরু করেন এবং তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। পাশ্চত্য লেখকদের—বিশেষ করে ভাবতীয় কবিদের—প্রভাব তাঁর উপর লক্ষ্য করবার। ভারতবর্ষে দীর্ঘ কিছুকাল তিনি অবস্থানও করেছিলেন। তাঁর সৃষ্টির প্রেরণা তিনি গ্রহণ করেন ভারতীয় সাহিত্য ও ভাবধারা থেকে। তাঁর প্রসিদ্ধ নাটক 'মানুসিয়া বারু'র (নতুন মানুষ) কাহিনী প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষকে নিয়ে, যদিও তা ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাঁর ৫টি নাটকের মধ্যে দুটি ডাচ ভাষায় এবং বাকি তিনটি ইন্দোনেশীয় ভাষায় লেখা।

তাঁর প্রত্যেক নাটকই জাভার প্রাচীন ইতিহাসকে আশ্রয় করে। ইন্দোনেশিয়ার আধুনিক সাহিত্য তার পুরাতন ঐতিহ্য থেকে সংশ্রবচ্যুত হবে, আলিযবনের মতো এ কথা তিনি বিশ্বাস করেন না। সাহিত্য জিজ্ঞাসায় ডাঃ তাকিরের সঙ্গে এখানেই তাঁর মতভেদ।

আর্মিন পানে কিন্তু সাহিত্যাদর্শে ভাইয়ের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং আলিযবনের মতাবলম্বী। তাঁকে সমকালীন ইন্দোনেশীয় কথা-সাহিত্যের পথপ্রদর্শকও বলা যেতে পারে। ভাষা তাঁর সহজ, অনাড়ম্বর ও বাহুল্যবর্জিত। তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'বেলেঙ্গু' বা শৃঙ্খল

প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে। বিষয়বস্তু, টেকনিক ও স্টাইলের দিক থেকে এই উপন্যাসখানি একালের ইন্দোনেশিয়ার কথা-সাহিত্যে দিয়েছে নতুন সম্ভাবনায় প্রতিশ্রুতি।

আবদুল মুইস্ প্রাচীনপন্থী লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে পড়লেও তাঁর 'সালা আসুয়ান' (১৯২৮ সালে প্রকাশিত) সেরা কাটতি উপন্যাস। সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা হিসেবেও তিনি সবিশেষ খ্যাত। আই গুস্টি নিয়মন পাঞ্জি তিষ্ণা হলেন বলিদ্বীপেব লেখক। বলিদ্বীপের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাঁর সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত। তাঁর 'আই স্বস্তি-সেতাছুন দি বেদ হুলু' প্রভৃতি উপন্যাস ইন্দোনেশীয় সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ।

আধুনিক কাব্য

আধুনিক ইন্দোনেশিয়ার কাব্যে সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেন বিদ্রোহী কবি খয়রিল আনওয়ার (Chairil Anwar)। জাপানী অবরোধ কালে—১৯৪৩ সাল থেকে তিনি প্রথম কবিতা লিখতে শুরু করেন। বয়স তখন তাঁর একুশ। তখনকার তার অধিকাংশ কবিতা জাপানীদের যুদ্ধ প্রচার কাজের সহায়ক ছিল না বলে ছাপার অক্ষরের মুখ দেখে নি ১৯৪৫ সালের আগে পর্যন্ত। ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত না হলেও খয়রিলের উৎসাহী বন্ধু ও ভক্তরা তাতে দমেন নি একটুও। সস্তা কাগজে টাইপ করে কবিতা তাঁবা প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন নিজেদের মধ্যে। খয়রিলের কবিতার মৌলিকতা ও অপূর্ব শব্দ-চয়ন নতুন প্রেরণা যোগাল বহু তরুণ কবি আর লেখকদের। ব্যর্থ অনুকরণ করবার চেষ্টাও করল কেউ কেউ। খয়রিল আনওয়ার শুধু কবিতা লিখেই ক্ষান্ত হন নি। আধুনিক ইন্দোনেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের তিনি একজন ঋত্বিকও। নতুন নতুন শব্দের প্রচলন করে জাতীয় সাহিত্যকে তিনি বৈশিষ্ট্য দান করেছেন প্রভূতভাবে। ভাষা ও রচনা-রীতিও ছিল তাঁর অনাড়ম্বর—বাহুল্য-

বর্জিত। বস্তুত যুদ্ধোত্তর কালের ইন্দোনেশিয়ার সাহিত্যের কর্ণধার বলা চলে খয়রিল আনওয়ারকে।

বিচিত্র তাঁর ভবঘুরে জীবন। আজ হয়ত তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে লড়াই করছেন সৈন্যদের সঙ্গে, কাল হয়ত মেতে গেছেন গেরিলা ফৌজদের সঙ্গে দেশের দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জাভার অভ্যন্তর প্রদেশে। আবার তার পরদিন হয়ত দেখা যায় তাঁকে জাকার্তায় আপন সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে বসে নতুন সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করছেন। সব্যসাচী এই অদ্ভুতকর্মা যুবকটি ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামেও বিশিষ্ট ভূমিকাও গ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত এ সব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিই রূপ পেয়েছে তাঁর কবিতায়। তাঁর প্রথম কবিতা সংগ্রহ "দেরু জার্মপুর দেবু" (ছ্যাকরাগাড়ির ঘরঘর ও ধুলি) প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ "কেরিকেল তাজম" বা ধারাল উপল। ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে খয়রিল আনওয়ারের অকাল মৃত্যু ঘটে। মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করলেও খয়রিল আনওয়ারের কবিতা প্রজ্বলিত হয়ে থাকবে চিরকাল উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো আধুনিক ইন্দোনেশিয়ার কাব্য-জগতে। ডাচ, ইংরেজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় তাঁর কবিতা অনূদিত হয়েছে। 'বন্দরে গোধূলি', 'রাতের প্রহরী', 'স্বর্গ', 'দীন তামেলা' (Dien Tamaela), 'আকু আই' প্রভৃতি কবিতা কাব্য-রসিকদের আনন্দ পরিবেশনে কোনদিন বিমুখ হবে না। খয়রিল আনওয়ারের একটি কবিতার বাংলা অনুবাদ ঃ

আমার অন্তিমকালে মোর লাগি
করিও না শোক
ক্রন্দন করো না যেন কেউ ;
তুমিও ফেলো না কিন্তু,
এক ফোঁটা তপ্ত আঁখিজল।

আঘাতে আঘাতময় ছেয়ে আছে
সর্বাঙ্গ আমার ঃ
দলভ্রষ্ট আমি ভাই যেন এক বন্য জানোয়ার
গুমরি মরিছি শুধু লাঙুল কামড়ি।
শূন্যে দুটি মুঠিহানি ফুলিতেছি
ব্যর্থতার রোষে।
বিষাক্ত ক্ষতার্ত আমি পলাতক মন নিয়ে ছুটি,
ধারণ করিতে প্রাণ আরো এক সহস্র বৎসর।

খয়রিলের কাব্য-প্রতিভার নিকট কিছুটা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লেও রিভাই আপীন ('যোগী')-এর স্থানও ইন্দোনেশিয়ার আধুনিক কাব্য সাহিত্যে তুচ্ছ নয়। রিভাই আপীন-এর 'দুই জগতের মাঝখানে' প্রভৃতি কবিতায় তাঁর স্বদেশপ্রেমের চরম পরাকাষ্ঠার পরিচয় মেলে। রিভাই আপীনের মতো মহম্মদ আকবর যুহানা-ও (Djoehana) আর একজন দেশপ্রাণ কবি। ইনি কিছুকাল ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডাঃ শারিয়রের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর 'স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া', 'অভিশপ্ত কবি' (Poet Maudit) প্রভৃতি অনেক কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ হয়েছে। 'অভিশপ্ত কবি'-র দুটি কলি ঃ

লিখছ তুমি! লিখছ বসে এমন রাতেও!
আকাশ কালো তিমির ঘন রাত ঃ
বইছে বায়ু শনশনিয়ে,
থরথরিয়ে কাঁপছে দেখো জানলাগুলি।
কাঁদছে কে বা ওই?
মাথা গুঁজবার নাইকো ঠাঁই—বলছে বুঝি?

* * *

বসে বসে স্বপ্ন দেখার এই কি সময়?
মাথার উপর ছুটছে বুলেট পাও না টেরও?
লিখলে কেবল কোন ক্রমে হলো নাকি?

১৯শে নভেম্বর ১৯৪৬ সালে কবি খয়রিল আনওয়ার আপনার কয়েকজন বন্ধু ও অনুগামী নিয়ে 'গেল্যাংগ্যাং' বা চক্র নাম দিয়ে এক প্রগতিশীল লেখক শিল্পী দল সংগঠিত করেন। এ চক্রে ছিলেন কবি রিভাই আপীন, আস্রুল সানী, জে. মুলিওনো (J. Moeljono), মহম্মদ আকবর যুহানা, সুমাজো (Soemardjo), তব্রিফ, সিতর সিতুমুরাং, জাতি, মহিলা-কবি নুরসামসো (Noersjamsoe) প্রভৃতি কবি ও লেখকবর্গ। সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মিম্‌বার ইন্দোনেশিয়া', 'সিয়াসত' (Siasat) ও 'ইন্দোনেশিয়া' ছিল তাঁদের মুখপত্র। 'গেল্যাংগ্যাং' চক্রের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়:

বিশ্ব সংস্কৃতির আমরা ন্যায্য উত্তরসাধক; নিজেদের মতো করে আমরা সংস্কৃতির অনুশীলনে ব্রতী হব। জনগণের মধ্যেই আমাদের জন্ম—জনগণের অর্থ আমাদের কাছে মিশ্র এক বৈচিত্র্য ধারার সমষ্টি যা থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত নতুন পৃথিবী জন্ম নেবে।

আমাদের ইন্দোনেশীয়পনার লক্ষণ কেবল চর্মের পিঙ্গলতা; আমাদের চুলের কৃষ্ণতা, আমাদের চোয়ালের হাড়ের প্রকটতা নয়। আমাদের হৃদয় ও আত্মার প্রকৃত মুক্তিও তার লক্ষণ। ইন্দোনেশিয়ার সংস্কৃতি কি দিয়ে সংগঠিত হবে, তার সংজ্ঞা নিরূপণ করতে যাচ্ছি না। ইন্দোনেশিয়ার সংস্কৃতি পুরাতন সংস্কৃতিকে মেজে-ঘষে নতুন বোতলে পারবেশন করা নয়। ...

'গেল্যাংগ্যাং' চক্রের মূল কথাই আধুনিক ইন্দোনেশীয় সাহিত্যের মর্মবাণী।

রোসিয়ান আনওয়ারও জাপানী অবরোধকালে প্রথম কবিতা লিখতে শুরু করেন। জাপানী সেন্সর কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দিয়ে তাঁর কিছু কবিতা ও গল্প প্রকাশিত হয়। টুকরো টুকরো কতগুলি চিত্র হিসেবে তাঁর এই সংক্ষিপ্ত লেখাগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যতার দাবি জানাতে পারে। ভাষাও তাঁর বেশ সহজ। কোথাও উচ্ছ্বাসের লেশমাত্র নেই। সাংবাদিক হিসাবেও খ্যাতি তাঁর কম নয়। প্রসিদ্ধ

সাপ্তাহিক 'সিয়াসতে'র তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন নিয়মিত তার লেখকও। বহু সরস প্রবন্ধ তাঁর প্রকাশিত হয় এই সাপ্তাহিকে।

ইদ্রাসও (Idrus) এ সময়কার এক শক্তিশালী কথাশিল্পী। ছোট গল্প রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। 'আত্মগোপনকারীর ডায়েরী' যুদ্ধের সময়কার লেখা হলেও বইখানি প্রকাশিত হয় বিপ্লবের পর। অর্থাৎ ১৯৪৯ সালে। তাঁর 'সুরবায়া' গ্রন্থে বিপ্লবকালীন ইন্দোনেশিয়ার বাস্তবজীবনের এক আলেখ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ইদ্রাসের রুক্ষ বাস্তবতা আধুনিক ইন্দোনেশীয় গদ্য-সাহিত্যে এক অভিনব ধারার সূচনা করেছে। তাঁর গল্প সংগ্রহ 'এভ্ মেরিয়া থেকে রোমের পথে আর এক সড়ক' ও উপন্যাস 'আকি' বা ঠাকুরদা সবিশেষ খ্যাত।

আকদিয়াত কে. মির্জা (Achdiat K. Mihardja), উতে সনাতনি, প্রমুদিয়া অনন্ত তুর প্রভৃতি শক্তিশালী লেখকরাও উপন্যাস রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মিহাজ্যর উপন্যাস 'এথিস্' বা নাস্তিক, উতে সনাতনির ঐতিহাসিক উপন্যাস 'তামবেরা' ও জনপ্রিয় নাটক 'বুঙা রুমা মাকন' বা রেস্তোঁরার ফুল এবং অনন্ত তুরের 'ব্লারা' দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সকলের। অস্‌রুল সানী কবি হিসেবে পরিচিত হলেও কুশলী গল্প-লেখকরূপেও খ্যাতি তাঁর কম নয়। অনন্ত তুরকে ১৯৪৭ থেকে '৪৯ সাল পর্যন্ত ডাচ সরকারের কারাগারে বন্দী থাকতে হয়। এ সময় তিনি স্টেইনবেকের প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'অফ মাইস্ য়্যাণ্ড মেন' অনুবাদ করেন। যুদ্ধের সময়কার অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে বহু গল্পও তিনি রচনা করেন। অনন্ত তুরের এমনি এক গল্পের কাহিনী হলো :

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দেশের শত্রু ডাচ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল বলে কিশোর দুটি বালক তাদের বাপকে হত্যা করে বসল। তারপর রাজধানী জাকার্তা থেকে পালিয়ে গিয়ে যোগদান করল ইন্দোনেশীয় গেরিলা ফৌজের সঙ্গে। ছোট ভাইটি একদিন

বন্দুক ঘাড়ে করে শিবির পাহারা দিচ্ছে। হঠাৎ মৃত পিতার মুখখানি ভেসে উঠল তার চোখের উপর। অনুতপ্ত হলো সে তার কৃতকর্মের জন্য। দাদাকে সে জানাল ঘটনাটি। দাদা ছোটভাইকে অনেক-করে বোঝালে। কিন্তু কিছুতেই মুছে গেল না তার মন থেকে বীভৎস সেই দৃশ্য। পিতার সকরুণ মুখ! অনুশোচনায় ছেয়ে গেল তার মন। তাই করল সে সংকল্প প্রায়শ্চিত্ত করবে লড়াই-ক্ষেত্রে আত্মাহুতি দিয়ে। এমন সময় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। নামডাকা শুরু হয়েছে।…

আধুনিক নাটক 'সনিবারা'রও (Sandiwara) বিস্তর উন্নতি সাধিত হয় একালে। পানে ভ্রাতৃদ্বয়, মহম্মদ যমিন প্রভৃতি নাট্যকাররা যুদ্ধের আগে থেকেই সনিবারা রচনায় সিদ্ধিলাভ করেন। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশ নাটক ক্লাশিকেল বিষয়বস্তু আর পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে লেখা। এল. হাকিম (ডাঃ আবু হানিফার ছদ্ম-নাম) প্রভৃতি সমকালীন নাট্যকাররা সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটক রচনা করে চলেছেন। এল. হাকিমের 'এশিয়ার বুকে তুফান' (তুফান দিয়াতস্ এশিয়া) প্রভৃতি নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হচ্ছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইন্দোনেশিয়া অব্যাহত রেখেছে তার অপূর্ব শিল্প, সাহিত্য আর সাংস্কৃতিক ধারা যার সঠিক পরিচয় সম্ভব নয় এই স্বল্পপরিসরের মধ্যে। তা ছাড়া ভাষাগত চীনা প্রাচীর তো রয়েছেই। তবু একথা নিশ্চয় করে বলা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে তার সাহিত্যিক পূর্ণ পরিচয় নিশ্চয়ই জানা যাবে, যেমন করে আজ সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকার রাজনৈতিক দৃষ্টি গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে বোগর ও বাংদুঙ-এ।*

এই প্রসঙ্গে বালি দ্বীপের একটি আখ্যায়িকাও এখানে উৎকলন করা গেল শিক্ষিত ভারতীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য।

* এ প্রবন্ধ আলোচনায় ইন্দোনেশীয় কন্‌সল অফিসের মিঃ কে. সেন বহুভাবে সাহায্য করেছেন।

'জয়প্রাণ' বলিদ্বীপেরই একটি গাথা। এর ইংরেজী সংস্করণ কিছুকাল আগে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়েছে। জয়প্রাণের কাহিনী বহু প্রাচীন। তালপাতার পুঁথিতে এই গাথার বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায়। বলিদ্বীপের সাহিত্যে এরূপ অনেক গাথা আছে। কিন্তু জয়প্রাণের গাথা লোকে আজও ভোলে নি। বছর দশেক পূর্বেও জয়প্রাণের গল্পকে কেন্দ্র করে সমগ্র বলিদ্বীপে এক প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। এখন পর্যন্ত বলিদ্বীপের অধিবাসীদের নিকট জয়প্রাণ জাগ্রত দেবতা হিসাবে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

এক গ্রামে মহামারীর আক্রমণে একটি পবিবারের সবাই মারা গেল; বেঁচে রইল শুধু একটি অসহায় শিশু। এই অনাথ ছেলেটিকে রাজা অলক অগুঙ্গ রাজপ্রাসাদে আশ্রয় দিলেন। রাজার স্নেহে ছেলেটি বড় হয়ে উঠল। ছেলেটির সৌম্যকান্তি সকলকে আনন্দ দেয়। তাই এর নাম রাখা হলো জয়প্রাণ। জয়প্রাণ যৌবনে পদার্পণ করবার পর রাজা বললেন, আমার রাজধানীব যে মেয়েকে তোমার পছন্দ তাকেই তুমি বিয়ে করে ঘবে আনতে পার। জয়প্রাণ একদিন বাজারে লায়ন সারির রূপ দেখে মুগ্ধ হলো। লায়ন সারিও জয়প্রাণকে দেখেই মনে মনে আত্মদান করেছে।

জয়প্রাণ রাজার কাছে এসে বলল, বন্দেশার মেয়ে লায়ন সারিকে সে বিয়ে করতে উৎসুক। রাজা শুভদিন স্থির কবে বিয়ের প্রস্তাব করে চিঠি দিয়ে জয়প্রাণকে বন্দেশার নিকট পাঠালেন। জয়প্রাণকে দেখে লায়ন সাবির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রাজার আদেশ; মেয়ের সম্মতি আছে; সুতরাং এ বিয়েতে বন্দেশার আপত্তি করবার প্রশ্ন ওঠে না।

মহাসমারোহে বিয়ে হয়ে গেল; জয়প্রাণ লায়ন সারিকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে এলো। তাদের দুজনের দিন খুব সুখে কাটছে। কিন্তু লায়ন সারির অপরূপ সৌন্দর্যে তাদের সুখে বাদ সাধল। রাজা তাঁর রূপে মুগ্ধ হলেন। তাঁর মনে হলো লায়ন সারিকে না পেলে রাজত্ব,

ঐশ্বর্য—সবই বৃথা! পথের কাঁটা জয়প্রাণকে মারবার জন্য তিনি সঙ্কল্প করলেন।

রাজ্যের প্রধানদের ডেকে বললেন, বলিদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম তীরে বিদেশীরা নামবার উদ্যোগ করছে বলে সংবাদ এসেছে। তাদের বাধা দেবার জন্য অবিলম্বে তোমরা ঘটনাস্থলে যাত্রা কর। জয়প্রাণও সঙ্গে যাবে।

পরদিন সকালেই যাত্রা করবার কথা। লায়ন সারির বুক কাঁপছে। কি জানি কি হবে! মঙ্গল মতো ফিরে আসবে তো জয়প্রাণ? প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠে জয়প্রাণকে সে বলল—প্রিয়তম, রাত্রিতে বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

জয়প্রাণ জিজ্ঞাসা করল—কি স্বপ্ন?

—যেন আমার পদ্মফুল দুর্বার বন্যাস্রোতে ভেসে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লায়ন সারিকে প্রবোধ দিয়ে জয়প্রাণ যাত্রা করল। দলের নেতাকে রাজা বলে দিয়েছিলেন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে জয়প্রাণকে হত্যা করতে। রাজার আদেশ অমান্য করা চলে না। সুতরাং নিরপরাধ জয়প্রাণ রাজধানী থেকে বহু দূরে অকস্মাৎ প্রাণ হারাল। নিরপরাধ লোক হত্যা করলে প্রকৃতি প্রতিশোধ গ্রহণ করে। জয়প্রাণের কাহিনীর নৈতিক শিক্ষা এই। সুতরাং দলের লোকেরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো। অল্প কয়েকজন মাত্র রাজধানীতে ফিরে এলো।

লায়ন সারিকে কেউ কিছু জানাল না। জয়প্রাণ কেন ফিরছে না? আশঙ্কায় সে অস্থির হয়ে উঠেছে। মাথার উপরে আর্তনাদ করে কাক উড়ে বেড়াচ্ছে; তাতে তার উৎকণ্ঠা আরও বাড়ল। অমঙ্গলের ইঙ্গিত।

জয়প্রাণের মৃত্যুর কথা খুব গোপন রাখা হয়েছিল। তথাপি লায়ন সারি একদিন শুনতে পেল স্বামীর শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ। একান্তে যে একটু শোক করবে এমন সুযোগ পর্যন্ত তার নেই। রাজা ডেকে পাঠালেন। বললেন—জয়প্রাণকে তো কখনও ফিরে পাবে

না। শুধু শুধু কেঁদে লাভ কি? আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে বিয়ে করে নিজে সুখী হব, তোমাকেও সুখী করব।

লায়ন সারি বলল—স্বামীর চিতায় সহমৃতা হব।

রাজা হেসে বললেন—তা সম্ভব নয়, কারণ জয়প্রাণের মৃতদেহ পাওয়া যাচ্ছে না।

রাজা আদেশ দিলেন বিয়ের আয়োজন করতে। লায়ন সারি নিজের সম্মান রক্ষার জন্য আত্মহত্যা করলে। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে রাজা উন্মত্ত হয়ে গেলেন। রাজপ্রাসাদে উন্মুক্ত তরবারি হাতে করে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। যাকে সামনে পেলেন তাকেই হত্যা করলেন। শেষে রাজা নিজেও আত্মহত্যা করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন।

বালি দ্বীপের প্রবাদ অনুসারে জয়প্রাণ হচ্ছে সে দেশে হিন্দু ধর্ম প্রচারকারী নিরর্থ। নিরর্থ সর্বপ্রথম ভারত থেকে বালি দ্বীপে গিয়েছিল হিন্দু ধর্মের বাণী নিয়ে। যে রাজা নিরর্থকে প্রথম আশ্রয় দিয়েছিল পরে সেই তাকে হত্যা করে। জয়প্রাণ যে বিদেশী ছিল তা অনুমান করা যেতে পারে লায়ন সারির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ থেকে। জয়প্রাণের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য লায়ন সারি একবার তাকিয়েই লক্ষ্য করেছে।

নিরর্থ পুলাকি অঞ্চলে অবতরণ করেছিল। এর প্রমাণ ইতিহাসে নেই; এটা হলো প্রবাদ। বালি দ্বীপের উত্তরাঞ্চলে কালি আঙ্গেত নামক জনপদে জয়প্রাণ রাজার আশ্রয় লাভ করেছিল। প্রাচীন কাল থেকে জয়প্রাণের কাহিনী এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মন অধিকার করে আছে। নিরপরাধ জয়প্রাণের আত্মার সদগতির জন্য কোনো পারলৌকিক ক্রিয়া না করবার অপরাধ বোধ এই অঞ্চলের লোকদের কয়েক শতাব্দী যাবৎ পীড়িত করে আসছিল। এখানকার অধিবাসীরা অত্যন্ত দরিদ্র; নানারকম রোগ এদের মধ্যে লেগেই আছে। এই দুর্ভাগ্যের জন্য জয়প্রাণের আত্মার যথাযোগ্য পারলৌকিক ক্রিয়া না

করাকেই এরা দায়ী করে। একান্ত আগ্রহ সত্বেও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে না পারায় শত শত বৎসর যাবৎ এদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এদের দুঃখত্বর্দশা বৃদ্ধি পেল; অনেকে নানা প্রেতমূর্তি দেখতে লাগল। সুতরাং বালি দ্বীপের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীরা মরিয়া হয়ে স্থির করল, যে করে হোক জয়প্রাণের আত্মার সদগতির জন্য শাস্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠানাদি করতে হয়। ১৯৪৯ সালে এই উপলক্ষে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হয়। বালি দ্বীপের সকল অঞ্চল থেকে সেই দীর্ঘ-স্থায়ী উৎসবে হিন্দুরা যোগ দিয়েছিল। অনেক মুসলমান এবং খৃষ্টানও জয়প্রাণের উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছে।

জয়প্রাণের গাঁথা এখনও গান করা হয়; নৃত্যনাট্যের আকারে পরিবেশন করা হয় এবং শিল্পীরা এই কাহিনী অবলম্বনে ছবি আঁকেন।

জয়প্রাণের গাঁথাটি সম্পাদনা করেছেন সি. হুইকাস (C. Hooykaas) রোমান লিপিতে মূল গাথা ও তার পাশে ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। পরিশিষ্টে বালি ভাষার কতকগুলি শব্দের অর্থ দিয়েছেন সম্পাদক। বহু শব্দই আমাদের নিকট পরিচিত। কারণ এগুলি সংস্কৃত শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। ভূমিকায় সম্পাদক জয়প্রাণের কাহিনীর ঐতিহাসিক, সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক পটভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই সুসম্পাদিত সচিত্র বইটি ভারত ও বালি দ্বীপের মধ্যে যোগাযোগের উপর আলোকপাত করতে সহায়তা করবে নিশ্চয়।*

আর একটি কবিতা

বিপ্লবী কবি খয়রিল আনওয়ার-এর একটি কবিতার বাঙলায় রূপায়িত করে আধুনিক ইন্দোনেশীয় সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করা গেল।

*"গ্রন্থবার্তা"—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। দৈনিক "যুগান্তর" থেকে।

দিয়েন তামেলা : একটি মেয়ের কথা ।।

আমি হলাম পত্তিরদ্যবানি
আমি দেবগণ সুরক্ষিত,
আমি একলা ।

আমি হলাম পত্তিরদ্যবানি,
সমুদ্রে সফেন,
রক্ত-ধারা নীল সাগরের ।

আমি হলাম পত্তিরদ্যবানি ;
আমার যখন জন্ম হলো
স্বর্গের দেবগণ ভেট দিয়েছিল নৌকো ।

আমি হলাম পত্তিরদ্যবানি,
জয়ত্রী ফলের বন করেছে আমায় রক্ষা ;
তীরভাগে জ্বলিছে আগুন । যদি কেহ চাহে আগাইতে
তিনবার স্মরণ করিতে হয় আমারই নাম !

নিথর নিশুতিরাত্রে আর
নৃত্য করে আগাছার দল
আমার বাদ্যের তালে তালে ;
জয়ত্রী লতারা তখন রূপ ধরে শবরীরি রাত্রির আঁধারে
তারপর যায় মিলে প্রভাতের আলো-অন্ধকারে ।

এসো এসো—আছো কেবা কোথা,
করো নৃত্য—করো রঙ্গ
বিস্মৃতি আসুক তারপর নেমে ।

ক্রোধান্বিত করো না আমায়, হুশিয়ার !
জয়ত্রী লতার আমি নেব তবে আশ্রয়
স্বর্গের দেবগণ ভর হবে তখন তোমায় ।

সারা রাত্রি সারা দিন
নৃত্য করে আগাছারা আমার ছন্দে-তালে।
অগ্নি জ্বলে দ্বীপময় আমার জঠরে।

আমি হলাম পত্তিরদ্যবানি,
আমি দেবগণ-সুরক্ষিত,
আমি একলা।

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

দ্বীপময় ভারত : ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ইন্দোচীন : ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী
নিউ এশিয়া : ডঃ কালিদাস নাগ
বিশ্বকোষ : নগেন্দ্রনাথ বসু বিদ্যার্ণব
এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা
ইন্দোনেশিয়ান স্টাডি : চার্লস ওয়ালফ্
স্প্যান (SPAN) : লাইনেল উইগমোর (সম্পাদিত)
"বুক এ্যাব্রড" : ১৯৫৪ ও ১৯৫৫
"ইউনাইটেড এশিয়া" : ১২শ খণ্ড ২য় সংখ্যা, ১৯৬০ ;
দি ফ্ল্যাইমিং আর্থ (ইন্দোনেশীয় কবিতা) : আহমেদ আলি সম্পাদিত

ইন্দোনেশিয়া ফ্‌্‌ফরেন আইচ্ : মিনিস্ট্রি অব ইনফরমেশন, জাকার্তা

ভিয়েৎনাম সাহিত্য

এখন নাম হয়েছে ভিয়েৎনাম। তাও আবার ফরাসী সাম্রাজ্য-বাদীদের চক্রান্তে ১৭ অক্ষরেখা বরাবর দ্বিধাবিভক্ত—উত্তর ভিয়েৎমিন ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম রাষ্ট্রে। নইলে একই দেশ। ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকেও এক। আগে নাম ছিল ইন্দো-চীন। এক অঙ্গ-বিশেষ বৃহত্তর ভারতেরই।

খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের দিকে সাগর-মেখলা এই ভিয়েৎনাম-কেই ভারত একদা 'মকর-চূড় মুকুটখানি' তার কবরী ঘিরে পরিয়ে দিয়েছিল, মাধবী নিশিথিনী হয়ে উঠেছিল তখন মধুর, হয়েছিল বুঝি বিধুর। মহাকাশের কোলে হেসে উঠেছিল পূর্ণ চাঁদ। সাগরজলে দোল খেয়েছিল শিব শিবানীর আলোছায়া। তারপর সহসা বায়ু বইল প্রতিকূল। প্রলয় এল সাগরতলে দারুণ ঢেউ তুলে। চম্পা (এখনকার নাম আন্নাম) আর কম্বোজ বা সিয়ামে ঔপনিবেশিক ভারতের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলি ফুরাল। হিন্দু আর বৌদ্ধ ধর্ম আর সংস্কৃতির রতন-ভরা তরী ডুবল বুঝি লবণ-জলে!

তারপর দীর্ঘকাল কেটে গেছে। উত্তর দিক থেকে আগত চীনাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর পর্তুগীজ, স্প্যানিশ, ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী বণিকের দল একে একে এসে হানা দিয়েছে এই দেশে। শোষণ ও লুণ্ঠনের মধ্যেও ভিয়েৎনামের ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বনিয়াদ হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধতর। পঞ্চদশ কি ষোড়শ শতকের দিকে চীনা লে সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভিয়েৎনামের জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে ওঠার সুযোগ লাভ ঘটে। চু নম নামে ভিয়েৎনামী ভাষার লিখন-পদ্ধতির যে প্রচলন হয় তার অক্ষর ছিল চীনা। চীনা বর্ণমালার পরিচয়-জ্ঞান না থাকলে চু নম ভাষার পাঠোদ্ধার ছিল না

সম্ভব। ফলে ঐ ভাষা ছিল রাজা, মান্দারিন, সামন্ত সেনাপতি, মঠাধ্যক্ষ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। জনসাধারণের নাগালের বাইরে।

তাই মুখে মুখেই রচিত হতো সেকালের ভিয়েৎনাম লোক-সাহিত্য। কিছুটা কিংবদন্তী, লোকগাথা, সামন্তযুগীয় বীরত্বগাথা ছিল এই সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। দরবারী নয়। কাজেই সূক্ষ্ম রসবোধ ও উৎকর্ষের সীমা অতিক্রান্ত ঠিক বলা চলে না। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা সুখ-দুঃখের প্রতিফলন খোঁজা তাতে বিড়ম্বনা। তবু মহিলা-কবি ডোয়ান থি ডিয়েম (সৈনিক-পত্নীর বিলাপ), হো জুয়ান-হুয়াং অথবা সুবিখ্যাত কবি গুয়েন-দূ-র ক্ষুদ্র লোককবিতা কা-দাও সেকালের ভিয়েৎনাম সাহিত্যের অনেকখানি স্থান ছিল জুড়ে। বিদ্রূপাত্মক হাল্‌কা রসের তাঁদের কাদাওগুলি পঠিত হতো সমাদরের সঙ্গে। বস্তুত চার পংক্তি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুই পংক্তির ভাবসমৃদ্ধ রসঘন এই কাব্যকলিগুলি ভিয়েৎনামী সাহিত্যের অনবদ্য সম্পদ। জাতীয় সত্তার শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। শুধু সেকালের সাহিত্য নয়, আধুনিক ভিয়েৎনামী কাব্যেও স্থান তার সু-উচ্চে।

অনেকটা পিছিয়ে আছে বলে মনে হবে এশিয়ার আর পাঁচটা দেশের সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করলে পাশাপাশি রেখে। প্রাচীন এক সুসভ্য জাতির পক্ষে সাহিত্যক্ষেত্রে এমনি পিছিয়ে থাকা গৌরবের কথা নয়—শ্লাঘার বস্তু। এ পিছিয়ে থাকার প্রধান কারণ অবশ্য বৈদেশিক অধীনতা। বিদেশী শাসকদের উন্নত সাংস্কৃতিক প্রভাবে ভিয়েৎনামের জাতীয় সাহিত্যের পুরোপুরি বিকাশলাভ হয় নি। তবু শত শত বৎসরের বিদেশী শাসন ও আধিপত্যের মধ্যেও ভিয়েৎনামের জনসাধারণ নিজেদের ভাষা ও সাহিত্যের কথা বিস্মৃত হয় নি একেবারে।

দীর্ঘকাল ধরে ভিয়েৎনামের ভাষা সরকারী চীনা ভাষার দ্বারা

ছিল আচ্ছন্ন। চীনা ভাষার মারফতই সেকালের ভিয়েৎনামে (ইন্দো-চীনে) প্রাচ্যের বিভিন্ন ধর্মমত, শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতার আলো ছড়িয়ে পড়ে। ভিয়েৎনামে চীনের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব এমনি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, চৈনিক শাসকদের বিদায় নেবার বহু বৎসর পরও ভিয়েৎনামের পণ্ডিতরা চীনা ভাষাকে পবিত্র দেবভাষা হিসেবে গণ্য করতেন। পূজা-অর্চনা, বিবাহাদি প্রত্যেকটি শুভ অনুষ্ঠান চীনা-ভাষা দিয়েই প্রথম শুরু হতো। আধুনিক ভিয়েৎনামের বর্ণমালা 'কুই নগু'র, কোনো কোনোটির মূল উৎস হলো চীনা লিপিমালা। সেকালের ভিয়েৎনামের লিপিমালা 'নম'ও চীনা হরফ থেকে গৃহীত। নগুয়েন দিয়ুর সুপ্রসিদ্ধ কাব্য 'কিম্ ভন কিয়েন' প্রভৃতি সেকালের বহু ভিয়েৎনাম ক্লাশিকাল সাহিত্য এ বর্ণমালায় লেখা।

চীনাদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ইন্দো-চীনে ক্রমশ ম্রিয়মাণ হতে থাকে ফরাসীদের আগমন ও আধিপত্যের সঙ্গে। পাম কুইন আর নগুয়েন ভন বিন প্রমুখ শক্তিধর লেখকরা ফরাসী সাহিত্যের অনুবাদ ও বিভিন্ন লেখার ভিতর দিয়ে এ নতুন সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচারে ব্রতী হন। জাতীয় ভাষার শব্দভাণ্ডারকেও তাঁরা সমৃদ্ধ করে তোলেন নতুন নতুন শব্দচয়ন মারফত।

অবশ্য একথা সত্য, সেকালের ভিয়েৎনাম সাহিত্য চীনা ও জাপানী সাহিত্যিকদের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। ভিয়েৎনামের কাব্য-সাহিত্যে এই প্রভাব তাই বিশেষ করে লক্ষ্য করবার। বিষয়বস্তু, আঙ্গিক ও ব্যঞ্জনার দিক থেকে সেকালের ভিয়েৎনাম কাব্যকে চীনা তাং বংশের (খৃঃ ৬১৮—৯০৭) কাব্যের ব্যর্থ অনুকরণ বলা চলে। সেকালের ভিয়েৎনাম কবিরা ছত্রে ছত্রে চীনা কবিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতেন।

১৯২৫ সালেই প্রথম ভিয়েৎনাম সাহিত্য মুক্তির স্বাদ পায়। ভাষা ছিল এতদিন টোল-পণ্ডিত আর বিদ্বান ব্যক্তিদের ছাঁদনাতলায়

বন্দী। এবার ছাড়া পেল বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে। লিখন-প্রণালী ও বিষয়বস্তুরও হলো অনেক পরিবর্তন। পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে নতুন করে যোগসূত্র স্থাপিত হবার পর নতুন ভাবধারার বান ডাকল ভিয়েৎনাম সাহিত্যে। ছককাটা মামুলী সাহিত্যসৃষ্টির বাঁধ গেল বুঝি ভেস্তে তারই তোড়ে।

কাব্য-সাহিত্য

গত কয়েক বছরের মধ্যে ভিয়েৎনামের কাব্য-সাহিত্যের বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়। চীনা কবিতার অনুকরণে 'মাছিমারা' শব্দ-সম্বল* কবিতা রচনার বিরুদ্ধে ভিয়েৎনামের তরুণ কবির দল রুখে দাঁড়ালেন এবং চীনা কাব্য-ঘেঁষা কবিতার বিপরীতধর্মী নতুন ধরনের কবিতা লিখতে হলেন বদ্ধপরিকর। ছন্দ, মাত্রা ও মিল রেখে নতুন ভাবধারার এমনি কবিতা রচনা খুব সহজসাধ্য ছিল না। ফলে বহু তরুণ কবি কবিতা লিখতে গিয়ে খালি আঙ্গিক-সর্বস্ব হয়ে পড়ছিলেন। তবু চেষ্টার কিন্তু ত্রুটি হলো না। কবি নগুয়েন ভন বিন লা ফঁতের 'উপকথাগুলি'র অনুবাদ করেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে ১৯২৮ সালে। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত কবি পান খই-র নতুন কাব্যগ্রন্থ সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করবার। প্রাচীন প্রথা মত যাঁরা কবিতা লিখতেন তাঁরা হলেন সব বৃদ্ধের দলের। চীনা শিক্ষা-দীক্ষার জারক-রসে তাঁরা হয়েছেন জারিত। তুং লাম, হুয়ুন থাক্ খাং প্রমুখ এই প্রাচীনপন্থী কবির দল নতুন কবিতার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করলেন এই বলে যে, নতুন কবিতা কেবল কতকগুলি ঠুনকো কথার সমষ্টিমাত্র—না আছে তাতে ছন্দ, না আছে ভাবের গাম্ভীর্য বা বিষয়-বস্তুর সুসামঞ্জস্য। আজকালকার কবিরা মিল রেখে কবিতা লিখতে পারে না বলে বিস্তর বিলাপ শুরু করলেন এঁরা। দিতে লাগলেন টিটকারি।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে সেকালের ক্লাশিকাল জনকয়েক কবির—ত্রান তুয়ান খাই, ডং-হো এবং তান দা (নগুয়েন থাক্ হিউ-এর ছদ্মনাম)—নাম উল্লেখ না করে পারা গেল না। ত্রান তুয়ান খাইয়ের হাস্যরসাত্মক বহু কবিতায় তাঁর গভীর দেশপ্রেম, জন্মভূমির প্রতি কবির নিবিড় ভালোবাসা আর জাতীয় বীরপুরুষদের শৌর্য-বীর্যের অলৌকিক বীরত্বগাথা ছড়িয়ে আছে। তাঁর রচিত 'আন খোয়া' পণ্ডিতের গান দীর্ঘকাল ধরে জনসাধারণের মুখে মুখে বিরাজ করত—বিশেষ করে উত্তর ভিয়েৎনামে। ডং-হো'র কবিতায় নৈসর্গিক সৌন্দর্যের বর্ণনা আর বন্ধু-প্রীতিব জয়গানে ভবপুর।

সেকালের কবিদের মধ্যে তান দা-ই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তান দা-র জীবদ্দশাতে মামুলী প্রথাতে কবিতা রচনা করার অবসান ঘটে। সূচনা হয় বন্ধনমুক্ত নতুন আঙ্গিকের কবিতা-রচনার। তান দা ছিলেন দুঃখবাদী। বিচিত্র এই সংসারেব গোলক-ধাঁধায় নাজেহাল মানব-শিশুর ব্যথায় তিনি ছিলেন সমব্যথী। তাঁব রচিত কাব্যে রয়েছে তাঁর এই জীবন-দর্শনেরই প্রতিচ্ছায়া। ব্যক্তিগত জীবনেও তান দা ছিলেন নিতান্ত মুখচোরা ও খামখেয়ালী প্রকৃতির মানুষ। তাঁব বন্ধু-বান্ধবেরা যখন একে একে দিব্যি সরকারী চাকরি বাগিয়ে নিচ্ছিলেন, তিনি তখন ঢুকলেন কাব্য-জগতে। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তিনি চিবকাল থেকে গেলেন নিস্পৃহ নিরুত্তাপ। রূঢ় বাস্তবতা থেকে—মানুষ ও সমাজের নানান জটিল সমস্যা থেকে—তিনি দূরে থাকতে ভালোবাসতেন। ব্যক্তিগত জীবনের এই নিরুত্তাপ-নিস্পৃহতাভাব এবং পলায়নী বৃত্তি তাঁর কাব্য-জগতেও ছায়া ফেলে পুরোমাত্রায়। কবি তান দা অবশ্য আপন ভাগ্যকে ধিক্কার দিতেন না। কিন্তু দুনিয়ার সুখী পরিবারদের বিরুদ্ধে তাঁর ছিল আক্রোশ। শাণিত ব্যঙ্গোক্তিতে তিনি পড়তেন ফেটে। তাঁর কাব্যে প্রেম হলো অবিনশ্বর। নারী হলো দেবী—ধরাছোঁয়ার ঊর্ধ্বে। তাই তাঁর কাছে কোনো ধীবর-কন্যা কিংবা কোনো সুপারি-

বিক্রেতা মেয়ের প্রেম হলো প্রত্যুত্তরের আশা না রেখে একতরফা খালি পত্র লিখে যাওয়া। তাতেই কবির তৃপ্তি। তান দা জীবনটাকে দেখতেন অনেকটা রঙিন কাঁচের ভেতর দিয়ে। তান দা-র পৃথিবী ছিল তাই স্বপ্নরাজ্যের কাছাকাছি আর কোথা—অন্য কোনস্থানে!

১৯৩৮ ও ১৯৪০ সালে কোয়াক তানের সম্পাদনায় দুটি কবিতা-সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। এ সঙ্কলন দুটিতে আধুনিক কবিতার পাল্টা জবাব মিললেও, এগুলি ছিল প্রধানত প্রাচীনপন্থী কাব্যধারার প্রতিধ্বনি মাত্র। পাঠকরা সাগ্রহে তাদের বরণ করে নিল ঠিক। কিন্তু এরা কোনো দাগ কাটল না পাঠকদের মনে। পাঠকরা নতুন কবিতার দিকে ঝুঁকলেন। ১৯৩৬ সালে দি লু-র প্রথম কবিতার বই আত্মপ্রকাশ করল, তখন থেকে শুরু হলো জয়যাত্রা পুরোপুরিভাবে আধুনিক ভিয়েৎনাম কবিতার।

কবি দি লু-র অমিল কবিতা অগণিত তাঁর তরুণ পাঠকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখল। তাঁর অনেক কবিতায় হদিস পাওয়া যায় মানুষের ব্যথা-বেদনা, ব্যর্থ প্রেম আর মনমরা হতাশার সুরের। 'অরণ্যের বিলাপ' কবিতাটি তাঁর সমধিক প্রসিদ্ধ। অনবদ্য এই কবিতাটিকে তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ এক বাঘের বনে ফিরে যাবার আকুল আকূতিকে রূপায়িত করেছেন কবি-শিল্পীর নিপুণ কলা-কুশলতায়। কবিতাটি প্রতীক-ধর্মী। বনের ব্যাঘ্রটিকে শক্তিশালী কোনো ব্যক্তির রূপক পরিকল্পনা হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে—জীবনের উপান্তে এসে যে ব্যক্তি গোঙিয়ে মরছে ব্যর্থ পঙ্গুতায় যৌবনের উদ্দামতাকে ফিরে পাবার জন্য, কিংবা হয়তো কোনো পরাধীন জাতি জাবর কাটছে অতীতের, তার স্বাধীন, মুক্ত, যশ-সমৃদ্ধ দিনগুলির কথা স্মরণ করে। কাব্য-সুষমার দিক থেকেও দি লু-র কবিতাটি অপূর্ব।

দি লু-র পরবর্তী কবি উয়ান দিয়ু-ও প্রসিদ্ধি লাভ করেন এ সময়। প্রেম ভালোবাসা, কালের দুর্বার যাত্রা আর মানুষের স্বপ্ন-আলেখ্য হলো তাঁর কবিতার প্রধান বিষয়। বর্দেল্যায়র, রিম্বঁ প্রভৃতি

ফরাসী কবিদের প্রভাব তাঁর কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। উয়ান দিয়ু-র পরের কবি হাই কান-এর কবিতাতেও ('লুয়া থিয়েং' বা পবিত্র অগ্নিতে) সমসাময়িককালের রোমান্টিক সুবের আভাস মেলে।

হান মাক-তু (খৃঃ ১৯১৩-৪০) দুখানা কবিতার বই প্রকাশিত করেন। আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম, মৃত্যু আর শূন্যতা ছিল তাঁব কবিতাব বিষয়। কবির জীবনটাও ছিল সংক্ষিপ্ত আর দুঃখপূর্ণ। অতি শৈশবে তিনি উৎকট কুষ্ঠ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। কুই-হোয়া কুষ্ঠ স্যানা-টোরিয়ামে অবস্থানকালে তিনি প্রথম কবিতা লিখতে শুরু কবেন। কবিতাই ছিল তাঁব নিরানন্দময় জীবনেব একমাত্র সহায়—খানিকটা সান্ত্বনাব ললিতবাণী।

নগুয়েন বিন-এব কবিতায় প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য কোনো কবিব প্রভাব বিশেষ দেখা যায় না। আশপাশেব সাধারণ জীবনই হলো কবিব কাব্যেব প্রধান উপজীব্য। লুউ ত্রংলু ঔপন্যাসিক হিসাবে সবিশেষ পবিচিত। কবিতাও লিখেছেন তিনি অনেক। আব সেগুলি অনাড়ম্বর শব্দ-চয়ন, ছন্দময় আর রসঘন ভাবের মাধুর্যে অনুপম।

১৯৪৫-এর রাজনৈতিক ঘটনাবলীর আগে থেকে কিছু কিছু সাম্যবাদী কবিতা গোপনে প্রচার হতে থাকে ভিয়েৎনামে। বিপ্লবী কবি তো হুউ হলেন এই শ্রেণীর কবিতার পথিকৃৎ। বিপ্লবাত্মক কার্যাবলীর জন্য যৌবনে তাঁকে দীর্ঘকাল কারা-অন্তরালে যাপন কবতে হয়েছিল। অন্যান্য কবিদের মতো তাঁব কবিতা লিরিকধর্মী না হলেও শোষিত আর বঞ্চিত জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাষা পেয়েছে তাতে। তাঁর কবিতার সুরটিও রীতিমত জঙ্গী।

প্রাচীন ভিয়েৎনাম কাব্যের অনুরূপ কিছু রচিত না হলেও আধুনিক ভিয়েৎনাম সাহিত্যে ভালো কবিতা যে একেবারে লেখা হচ্ছে না, একথা বলা চলে না আজ।

উপন্যাস

সত্যিকারের উপন্যাস লেখা শুরু হয়েছে ভিয়েৎনামে বেশী দিন নয়—হালেই বলা চলে। ভিয়েৎনামী পাঠকেরা ইতিপূর্বে উপন্যাস পাঠের সাধ মিটিয়ে নিত চীনা উপন্যাসের অনুবাদ, ঐতিহাসিক বিবরণ, দুঃসাহসিক কাহিনী আর রোমান্টিক আখ্যায়িকার মারফত। উপন্যাসের উপাদান ছন্দবদ্ধ নানান কাব্য বা গাথার আকারেও পরিবেশিত হতো পাঠকদের মধ্যে। কিন্তু দুধের সাধ কি ঘোলে মেটান যায়? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শগত সঙ্ঘাত, সামাজিক বনিয়াদে ফাটল, জাতীয়তাবোধ, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে নানান সমস্যা ও নতুন পাঠক-সমাজের সৃষ্টি—ভিয়েৎনাম সাহিত্যে সার্থক উপন্যাস রচনায় সহায়তা করে ব্যাপকভাবে।

১৯২৫ সালে হোয়াং নগক্ পাক্ নামে তরুণ এক অধ্যাপক চটি একখানি উপন্যাস প্রকাশ করেন। এটিই ভিয়েৎনাম সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। নাম 'তো তাম্' (উপন্যাসের কোনো এক চরিত্রের নাম অনুসারে)। নতুন এই উপন্যাসখানি বের হবার পর তরুণ অধ্যাপকের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। অবশ্য তাঁর এ খ্যাতির মূলে ছিল উপন্যাসখানির সাহিত্যিক উৎকর্ষের চেয়ে কালোপযোগী বিষয়বস্তু নির্বাচন। অলৌকিক বা পৌরাণিক কোনো কাহিনীর আশ্রয় না নিয়ে লেখক তাঁর উপন্যাসে যুব-সমাজের চিত্রই অঙ্কিত করেন। উপন্যাসের কাহিনীটি হলো বৈচিত্র্যহীন, সহজ ও অনাড়ম্বর। এক তরুণ ভালোবাসলো সুন্দরী এক তরুণীকে। কিন্তু তাদের দুর্বার প্রেমে বাদ সাধল দুজনেরই বদ্‌মেজাজী একরোখা পিতা। সমাজ ও আত্মীয়-স্বজনের চাপে পড়ে মেয়েটি শেষে বেঁকে বসল। আপন দয়িতকে দিল ফিরিয়ে। কিন্তু এখানেই শেষ নয় কাহিনীর। সুখ আর শান্তি কোনোটাই এলো না মেয়েটির পরিণত জীবনে। ব্যর্থ প্রেম অবশেষে জীবনের শেষ আশ্রয় খুঁজল লেকের গভীর জলে।

এর পরবর্তী উপন্যাসে ফ্লবার্ট ও মোপাঁসার লিপিকুশলতার প্রভাব

দেখা যায়। নহাৎ-লিন (নগুয়েন তুয়ং তাং) ছিলেন পরবর্তী এই 'তু লাক' শ্রেণীর উপন্যাসের পথপ্রদর্শক। ভিয়েৎনামের নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল নহাৎ-লিনের উপন্যাস 'তুয়ান তুয়েৎ' (ছেদ) ও 'লান লুং' (উপেক্ষা) খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাঁর "তুয়ান তুয়েৎ"-এ দেখা যায়, বিদূষী এক যুবতী কন্যা সনাতনী সমাজ-ব্যবস্থার চাপে পিষ্ট হয়ে গুমরে মরছে ব্যর্থ আক্রোশে। পদে পদে তাকে বিসর্জন দিতে হচ্ছিল আপন ব্যক্তি-সত্তাকে। নায়িকা এবাব তার সমাজের বাধা-নিষেধ সব ছিন্ন করে পালিয়ে গেল।

নহাৎ-লিনের আর একখানি উপন্যাসেও এমনি সুরের বেওয়াজ মেলে। তবে নায়িকা এবার আর সমাজের বাধা-নিষেধ ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয় নি। নতি স্বীকাবই তাকে কবতে হলো চিরাচরিত সামাজিক বিধি-নিষেধেব নিকট। এ উপন্যাসের নায়িকা হলো তরুণী এক বাল্যবিধবা। ভালোবেসেও সে আপনাব প্রিয়তমকে পুনরায় বিয়ে করতে পারল না সামাজিক অনুশাসনকে অমান্য করে। পরিশেষে তাকে এই অনুশাসনের পায়েই দিতে হলো আত্মবলি।

প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী খাই-হুং ও নহাৎ-লিন বহু রোমান্টিক কাহিনীও রচনা করেছেন। 'হুন বুয়ম্ মো তিয়েন' বা প্রজাপতির অপরূপ স্বপ্নকথা এবং 'নুয়া চুং যুয়ান' বা আধা-বসন্ত তাঁর নামকরা লেখার অন্যতম। 'নুযা চুং যুয়ান'-এর নায়িকা যুবতী বধূটি আপনার শাশুড়ীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য বৃদ্ধা শাশুড়ীকে ফেলে চলে যায়। নহাৎ-লিন লেখকগোষ্ঠীর অপবাপর লেখকের মতো খাই-হুং নায়ক-নায়িকার আত্মহত্যা বা অপমৃত্যুর মধ্যে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটান নি। কাজেই দেখা যায়, এ উপন্যাসের নায়িকা বধূ শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করে বাপের বাড়ি গিয়ে নিল আশ্রয়। আর আপনার ছোট ভাই ও শিশুপুত্রটির রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে করলে আত্মনিয়োগ। খাই-হুং তাঁর নায়ক-নায়িকার কামগন্ধী প্রেমের বিনিময়ে প্রেমের

উদ্গতির চিত্র-অঙ্কনে ছিলেন সবিশেষ পটু। তাঁর 'প্রজাপতির অপরূপ স্বপ্নকথা'য় দেখতে পাই, নায়ক-নায়িকা নিজেদের মনস্কামনা পূর্ণ হবার উপায় না দেখে দু জনেই গেল এক বৌদ্ধ-মন্দিরে। আর, নায়িকা সেখানে গিয়ে শপথ নিলে বুদ্ধদেবের সেবিকা হয়ে আজীবন কাটিয়ে দেবার। খাই-হুং'-এর লেখায় ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব ততখানি দেখা যায় না নহাৎ-লিন-দলভুক্ত অন্যান্য লেখকদের মতো। কিন্তু তাঁর বিষয়বস্তু যেমন বাস্তবধর্মী, গল্প বলার ভঙ্গিটিও তেমনি হৃদয়গ্রাহী।

খাই-হুং-এর চাইতেও ভা ত্রং ফুং নগুয়েন হং এবং নগুয়েন তুয়ানের লেখা আরও বাস্তবধর্মী ও জোরাল। প্লট বা বিষয়বস্তুর জন্য এঁরা নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুয়ারে ধর্ণা দিতেন। সমাজের নীচের তলার বঞ্চিত আর উপেক্ষিতরাই ভাষা পেয়েছে তাঁদের সাহিত্যে। মানবিকতার যাদুস্পর্শ ছিল তাঁদের লেখনীর মধ্যে। নগুয়েন তুয়ানকে আধুনিক ভিয়েৎনাম সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গদ্য-লেখকও বলা যেতে পারে। তাঁর স্টাইল হলো সহজ ও সজীব। ভাষাটিও অনবদ্য। সামাজিক অসাম্য ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তিতে পঞ্চমুখ। তাঁর কোনো কোনো লেখায় ভারতীয় চার্বাক-দর্শনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ত্রাণ তিউ ও চুই হিয়েন-এর উপন্যাসে ভিয়েৎনাম কৃষক-সমাজের বিভিন্ন হালচাল রীতি-নীতি প্রতিফলিত হয়েছে যথাযথভাবে। ত্রাণ তিউ-র উপন্যাস "কন্ ত্রাউ"-এ (মহিষ) উত্তর ভিয়েৎনামের চাষীদের আচার-অনুষ্ঠান, তাদের খেলা-ধূলা, তাদের রেষা-রেষি—ঝগড়া-ঝাঁটির পুরোপুরি চিত্রের সন্ধান মেলে। তাঁর আর একখানি উপন্যাস—"চোং কন্" (স্বামী ও পুত্র-কন্যা)। ত্রাণ তিউ উত্তর ভিয়েৎনামের চাষী মেয়েদের পতিভক্তি ও অপত্যস্নেহের এক সুন্দর আলেখ্য অঙ্কিত করেছেন। স্বামীর সুখ-সুবিধার দিকে নজর রেখে চাষীবধূ আপনার সুখ-শান্তি সব দিল বিসর্জন। এই আদর্শ নারী-চরিত্রের পাশে এক

পুরুষ-চরিত্রও দেখা যায়, যে হলো জুয়ারী, অকর্মণ্য, নারী নির্যাতন-কারী ও নারী-শ্রমভোগী।

বুই হিয়েনও এমনি ধরনের আর একজন আঞ্চলিক ঔপন্যাসিক। তাঁর গল্প-সংগ্রহে "নাম ভা-য়" নঘি আন ও হা তিন প্রদেশের গ্রাম্য-জীবনের অদ্ভুত যত সব প্রথা ও সংস্কারের বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন ধরুনঃ কোনো অন্যায় অবিচার বা কোনো কিছুতে ব্যর্থকাম হয়ে হয়ত কোনো পল্লীবালা পথে বেরিয়ে প্রতিবেশীব দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে রইল দিনের পর দিন, তার প্রতি অবিচারের প্রতিকার উদ্দেশ্যে। এইভাবেই সে গ্রামবাসীদের দৃষ্টি করে আকর্ষণ; আদায় করে সুবিচার। এমনি আরও কত!

ঔপন্যাসিক হোয়াং দাও-এর নাম উল্লেখ করতে হয় এর পর। হোয়াং দাও প্রগতিশীল নতুন ভাবধারায় ছিলেন বিশ্বাসী। বৈজ্ঞানিক মননশীলতার সন্ধান মেলে তাঁর রচিত বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে —জয়ধ্বনি শোনা যায় জীবনের জয়যাত্রার। ঔপন্যাসিক লান খাই তাঁদের 'হযটি' এলাকার জীবন-চিত্র এঁকেছেন তাঁর বিভিন্ন রচনায়। লি ভন ক্রুয়ং-এর বহু উপন্যাসে তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভার স্বাক্ষর মেলে। নগুয়েন কং হোয়ান শিশু-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ছোটদের জন্য তিনি বহু অপরূপ গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। হো হুউ তুয়ং নারীত্বের মহিমা কীর্তন করেছেন তাঁর উপন্যাসে। হোয়াং কং খান-এর রচনাও একালের ভিয়েৎনাম পাঠক-পাঠিকাদের কাছে একান্ত প্রিয়।

নাটক

কবিতা ও উপন্যাসের মতো আধুনিক ভিয়েৎনাম নাট্যসাহিত্যেরও সম্প্রতি বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। ভিয়েৎনামের তথাকথিত ক্লাশিকাল নাটক 'হাত-বোই'-এর উৎস হলো চীনা নাটক। তার পাত্র-পাত্রী, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, প্লট বা মঞ্চের গঠন-প্রণালী সব কিছুই প্রায়

ধার-করা চীনা রঙ্গমঞ্চ থেকে। সেকালের থিয়েটার ছিল ভিয়েৎনামের প্রত্যেক নাট্যামোদীর কাছে আদরের বস্তু। মঞ্চের সাজসজ্জা খুব একটা ছিল না। নাট্যকার কি অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সেদিকে নজরও বড় দিত না। তাছাড়া মঞ্চসজ্জা ও অভিনয় ছিল মামুলী-ধরনের; কিন্তু, দর্শকরা তাতেই সন্তুষ্ট। সেকালের এই শ্রেণীর নাট্যাভিনয়ের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় যখন চীনা ভাষার কদর কমে আসে। হ্রাস পেতে থাকে নতুন ধরনের নাটকের অভিনয় যখন চালু হতে লাগল। হোয়াং কাও খাই, নগুয়েন হুউ তিয়েন, হোয়াং তাং বাই প্রভৃতি নাট্যকারগণ হলেন পুরাতন এই নাট্য-সাহিত্যের শেষের দিকের প্রতিনিধিস্থানীয়। তাঁদের রচিত অনেক নাটকই আজ বিলীন হতে বসেছে অনাদর আর উপেক্ষায়।

বছর ৩০।৩৫ আগে সুপ্রসিদ্ধ 'কাই লুওয়াং' রঙ্গমঞ্চই ক্লাশিকাল নাট্যসাহিত্যকে একপেশে করে রাখে। চীনা অপেরার হুবহু নকলই বলা চলে নতুন এ নাটককে। 'দৃশ্য', 'অঙ্ক' প্রভৃতি নতুন আমদানি হলো নতুন নাটকে। তবে প্রাচীন নাটকের গুরুগম্ভীর বাদ্যসঙ্গীত আর স্থান পেল না। পাশ্চাত্য যন্ত্রসঙ্গীত নিল তার আসন। চীনা-গানের পরিবর্তে ভিয়েৎনাম ভাষায় গান রচিত হলো বটে; কিন্তু তাদের সুর দেওয়া হলো চীনা-সঙ্গীতের। এসব আধুনিক নাটকের বেশীর ভাগই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। ফলে, বহু শক্তিশালী নাট্যকার ও তাঁদের রচিত নাটক-নাটিকার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আজ সম্ভব নয়। তবুও এঁদের মধ্যে নগুয়েন থান চাও-এর নাম উল্লেখ করতে হয় বিশেষ করে। নগুয়েন থান চাও নিজেও ছিলেন একজন বিখ্যাত অভিনেতা। সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত জনপ্রিয় বহু নাটক তিনি লিখে গেছেন।

উত্তর ভিয়েৎনামে এ সময় আর এক শ্রেণীর নাটকের প্রচলন হয়। ('কাই লুওয়াং' নাটকের জনপ্রিয়তা দক্ষিণ ভিয়েৎনামেই কেবল বেশী।) নতুন এই নাটকে গান-বাজনার বিশেষ বালাই নেই। সংলাপ হলো

আগাগোড়া গদ্য ও পদ্যে মিশ্রিত। এই নতুন নাটককে বলা হয় 'কিচ'। 'কিচ' নাটকের জনপ্রিয়তা এখনও ব্যাপক হয়ে ওঠে নি। কারণ অধিকাংশ পাঠক বা দর্শকই তার বিষয়বস্তু বা কলাকৌশল সম্পর্কে অনভ্যস্ত থেকে গেছে। ভু দিন লং, ভি. হুয়েন দাক্, দোয়েন ফু-তু প্রমুখ তরুণ নাট্যকাররা 'কিচ' নাট্য-সাহিত্যের প্রবর্তক। তাঁদের বহু নাটক বিভিন্ন থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় সাফল্যের সঙ্গে। ভি. হুয়েন দাকের প্রায় ডজনখানেক নাটক এব মধ্যে (১৯২৭ সাল থেকে) প্রকাশিত হয়েছে। 'কিম তিয়েন' (অর্থ) আর 'ওংহাই চোপ' তাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত নাটকে তিনি মেয়েদের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। চলতি ভাষাও তিনি ব্যবহার করেছেন নাটকের পাত্র-পাত্রীর মুখে। এই সংলাপ যেমন কাটা-কাটা, তেমনি বাস্তবধর্মী। দোয়েন ফু তু-র রচনায় ('ঘেন' বা ঈর্ষা প্রভৃতিতে) ফরাসী নাট্যকাব মুশে, তুর্ভাঁ বা সাকা গইতিব প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

প্রবন্ধ সাহিত্য

সাহিত্য সমালোচনা ও প্রবন্ধও কিছু কিছু লেখা শুরু হয়েছে হালে। তবে ভিয়েৎনামী পাঠকগোষ্ঠী এ শ্রেণীর সাহিত্যে এখনও তেমন অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন নি। ১৯৩৫ সালে থিউ সনের সাহিত্য প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলিতে অবশ্য টিঁকে থাকবার মতো উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নেই। তবু প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আধুনিক প্রবন্ধকার ও সমালোচকদের মধ্যে ক্রুয়ং চীন, নগুয়েন বাচ্ কাও, হো হউ তুয়ং, ডাং থাই মাই, নগুয়েন দিন থাই, হোযাং যুয়ান হান, নগুয়েন দাক্ কুইন প্রভৃতি চিন্তাশীল লেখকদের নাম করতে হয়। নগুয়েন দাক্ কুইন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় আর বহু পুস্তক-পুস্তিকায় আধুনিক ভিয়েৎনাম সাহিত্যের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেছেন। সম্ভাবনার পথ দিয়েছেন প্রশস্ত করে।

ভিয়েৎমিন প্রভাব

দীর্ঘদিনের আত্মবিস্মৃতি আর নিষ্ক্রিয়তার পর প্রাচ্যের 'রহস্যময় ব্যক্তি' ডঃ হো চি-মিনের নেতৃত্বে নবজাগ্রত ভিয়েৎনাম আজ নতুন করে সাহিত্য-সৃষ্টিতে ব্রতী।

১৯৪৫ সালের আগস্ট বিপ্লবের পর থেকে সত্যি-ভিয়েৎনামী সাহিত্যে সূচনা হলো নতুন যুগের। এতকাল যে সব কবি ও লেখক সাহিত্যের ললিত-নিকুঞ্জবনে লোকরঞ্জন রচনার স্বপ্নসৌধ নির্মাণ করছিলেন, তাঁরা এবার ধরলেন জাতীয়তার বিপ্লবী হাতিয়ার। জনসাহিত্য রচনায় করলেন আত্মনিয়োগ। নগো-তাং-তো, তো হোয়াই, নাম কাও নাওয়েন হ., নগুয়েন তুয়ান, নয়ং-কোয়াক-চান প্রভৃতি বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক হো চি-মিনের নেতৃত্বাধীন প্রতিরোধ সংগ্রামকে নিজেদের লেখনীর জ্বালাময় রচনা দ্বারা জোরদার করে তুলতে বদ্ধপরিকর হলেন। এ সব সংগ্রামী কবি ও লেখকের মসি রূপ নিল অসিতে। শুধু কা-দাও নয়, সার্থক কথা-সাহিত্যের অনুশীলনও হতে থাকে ভিয়েৎনামের কুশলী শিল্পীদের হাতে।

ভিয়েৎনামের সংগ্রামী কবিদের মধ্যে তে হুউ অধিকার করে আছেন এক বিশিষ্ট স্থান। ১৭ বছর বয়েস থেকে তিনি বিপ্লবী-কবিতা রচনা করে আসছেন। ফরাসী সরকারের শত নির্যাতন ও নিপীড়ন তাঁকে পর্যুদস্ত করতে পারে নি। ১৯৪৫ সালের আগস্ট বিপ্লবের সময় হুই অঞ্চলের বিদ্রোহীদের তিনি করেন পরিচালনা। বর্তমানে তিনি স্বাধীন ভিয়েৎনাম সরকারের সাংস্কৃতিক দপ্তরের উপমন্ত্রী। ভিয়েৎ-বাক তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতা সঙ্কলন। ভিয়েৎনামী কৃষক, সাধারণ মানুষ ও মেহনতী জনতার তিনি হলেন প্রিয় কবি। তাঁর কা-দাও-এর একটি কলি :

'জনগণ হলো সমুদ্র,
শিল্পকলা হলো জাহাজ।'

তে হুউর মতো আর একজন শক্তিশালী কবি তু-মো। কা-দাও

রচনায় তিনিও সিদ্ধহস্ত। চিরাচরিত প্রথায় লিখিত হলেও তাঁর কাব্যে সমকালীন বিষয়বস্তুকে ভিয়েৎনামের পুরাতন কব্যের ধাঁচে ঢালবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তা যেমন তীব্র কশাঘাতমুখর ও ব্যঙ্গাত্মক, তেমনি রসাত্মক ও জনপ্রিয়। ভিয়েৎনামী সাহিত্যের প্রাচীন ঐশ্বর্যকে তুলে ধরেছেন তিনি অপূর্ব মহিমায় তাঁর বিবিধ রচনায়। প্রসিদ্ধ সাহিত্য সমালোচক ভূ-নগক-পান (Vu-ngoc-Puan) এ সম্পর্কে লিখেছেন :

আমাদের পুরানো কবিতার সুমিষ্ট জলের কলকল প্রবাহধারা এখনও শুকিয়ে যায় নি। কেন না, ভিয়েৎনামীরা পুরাতনী ধারায় চির অভ্যস্ত। (সোভিয়েট লিটারেচার : ৭ম সংখ্যা, ১৯৫৭)

তু মোর লেখাই বুঝি তার প্রমাণ। কবিতা ছাড়া তিনি কিছু উপকথা ও কুয়ান-হো বা প্রশ্নোত্তরে ছড়া-গানও রচনা করেছেন। প্রাক্-বিপ্লব দিনের তাঁর ব্যঙ্গাত্মক কবিতা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের টনক দিয়েছিল নড়িয়ে। বুর্জোয়া সংস্কারকদের প্রগতিবাদী ডেমোক্রেসীর মুখোশ তিনি দিয়েছিলেন খসিয়ে। 'ধারা বহে উজান' নামে তাঁর এ-সব ব্যঙ্গ কবিতা তিন খণ্ডে সঙ্কলিত হয়েছে। তাঁর প্রতিরোধ যুদ্ধের হাস্য অথবা স্রেফ হাসির কবিতা-পুস্তক স্বাধীন ভিয়েৎনামে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

তো হোয়াই আর গুয়েন গক্-এর (Nguyen Ngoc) রচনায় ভিয়েৎনামী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবনধারা ও সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি বিশেষ করে প্রতিফলিত হয়েছে দেখা যায়। ভিয়েৎনামের পার্বত্য এলাকার লোকসঙ্গীত ও সংস্কৃতির অনুরণনও মেলে তাঁদের বিবিধ লেখায়। তো-হোয়াই-এর প্রথম দিককার গল্প—'পরভূমি' এবং 'দরিদ্র পরিবারে' ভিয়েৎনামের দুঃস্থ, অসহায়, ধ্বংসোন্মুখ তন্তুবায় সম্প্রদায়ের নিরানন্দময় দৈনন্দিন জীবনযাপনের বাস্তবচিত্রই ফুটে উঠেছে। বিদেশী যন্ত্রদানবের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভিয়েৎনামী কুটিরশিল্পের ক্রম-বিলুপ্তির কথা তিনি দরদের সঙ্গে বলে গেছেন তাঁর 'দরিদ্র

পরিবারে'। 'আর্ট ফর আর্ট সেকে'র তিনি নব পূজারী। পঞ্চাশের জাতীয় সংগ্রামেরও তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় যোদ্ধা। মসি ছেড়েই তিনি ধরেছেন অসি। প্রেসিডেন্ট হো চি-মিনের গণফৌজে যোগদান করে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর ভবিষ্যৎ গল্প-উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহ করেন ভিয়েৎনামের উত্তর-পশ্চিম পার্বত্য এলাকার সাধারণ লোকদের নিকট থেকে। তাঁর 'উত্তর-পশ্চিমের কাহিনী' অথবা 'এ ফুস্' সৃজনশীল রচনায় এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার সন্ধান পাওয়া যায়। তো হোয়াই-এর সৃষ্ট 'মি', 'ইহ্ন্' প্রভৃতি নারী-চরিত্র ভিয়েৎনামের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর প্রতীক। তাঁর প্রথম দিককার রচনায় রোমান্টিক ভাবালুতা ও নৈসর্গিক বর্ণনার বর্ণচ্ছটা পরিলক্ষিত হলেও, উত্তর জীবনে তিনি তাদের প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন বলা যায় বহুল পরিমাণে। ১৯৫৪ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে কথাশিল্পী তো হোয়াই স্বদেশের ভূমিসংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সম্প্রতি রচিত 'পূর্ব থেকে স্বতন্ত্র' কাহিনীতে স্বাক্ষর রয়েছে নতুন এই ভূমি-প্রথা সংস্কারের।

জনপ্রিয় তরুণ কথাশিল্পী গুয়েন গক্-এর লেখায় অসাধারণ সৃষ্টি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 'ভূমির উত্থান' তাঁর প্রথম প্রকাশিত পুস্তক। বইখানি ১৯৫৪-৫৫ সালের সাহিত্য পুরস্কার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করে। সমাদর ও অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে পাঠক-সাধারণ ও সুধী সমাজের। বীরপুরুষ-বিশেষকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের ছক কাটলেও, তিনি তাঁর সৃষ্টিকে নেহাত চরিতকথার মধ্যেই শুধু পর্যবসিত করে রাখেন নি। বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে দেশের ও দশের জীবন-আলেখ্যই প্রকটিত করবার চেষ্টা করেছেন নিপুণ হস্তে। বহু কিংবদন্তী, পৌরাণিক কাহিনী, লোকগাথা, লোক-সংস্কৃতির জারকরসেও রচনা তাঁর জারিত।

শুধু গুয়েন গক্ নন, প্রেসিডেন্ট হো চি-মিনের নেতৃত্বাধীন

গণতান্ত্রিক ভিয়েৎনামের বহু তরুণ কবি ও কথাশিল্পীই আজ এ-কালের ভিয়েৎনামের সার্থক সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী।

ডঃ হো চি-মিন্

আধুনিক ভিয়েৎমিন সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা হলেন তার রাষ্ট্রপতি ডঃ হো চি-মিন্। "হো চাচা" নামে তিনি আবালবৃদ্ধ ভিয়েৎ-নামের জনসাধারণের নিকট পরিচিত। হো চি-মিন্ ভিয়েৎনাম গণরাষ্ট্রের [ভিয়েৎনাম ডেমোক্রেটিক রিপাব্লিক] শুধু রাষ্ট্রগুরু নন, ভিয়েৎমিন গণ-সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃতও। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পদানত ভিয়েৎনাম জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে, ফরাসী উপ-নিবেশিকতা ছিন্ন করে উন্নত মস্তকে মাথা তুলে দাঁড়াবার সংগ্রামে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন একদা অভ্রান্ত এই মহাবিপ্লবী। আর তাঁর এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে মস্ত বড় হাতিয়ার ছিল জনগণের সহজ-বোধ্য বিপ্লবী সাহিত্য— এ-কালের ভিয়েৎমিন সাহিত্য।

সাহিত্যের জন্য সাহিত্য করতে তিনি আসেন নি। তাঁর সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য ছিল মনোরঞ্জন নয়,—গণচেতনা। সাম্রাজ্যবাদীর জাঁতা-কলে পিষ্ট পরাধীন দেশবাসীর দুঃখ দুর্দশার কথা বাহির-বিশ্বকে বিদিত করাবার উদ্দেশ্যে তিনি একদা লেখনী ধারণ করেছিলেন। দেশের মুক্তি-[illegible]নায় হো চি-মিন্ তখন ইউরোপের দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সাম্যবাদী নেতাদের যোগসাজশে ফরাসী উপনিবেশ ভিয়েৎনাম মেহনতি জনগণের মুক্তির উপায়-নির্ধারণে রত। ফ্রান্সের সুবিখ্যাত বামপন্থী পত্রিকা 'পপুল্যায়র' (Popular)-এর সম্পাদকের সঙ্গে প্যারিসে তাঁর তখন পরিচয় হয়। তিনি তখন হো চি-মিন্‌কে নিপীড়িত নির্যাতিত ভিয়েৎনাম জনগণের মর্মকথা তীব্র ভাষায় 'পপুল্যায়রে'র সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় ব্যক্ত করতে অনুরোধ করেন। হো তাতে রাজী হলেন। কিন্তু নিজের মনোভাব ব্যক্ত করবার মতো ফরাসী ভাষা তখনও তাঁর তেমন রপ্ত হয়ে ওঠে নি। প্রতি পদে পদে তিনি

তাই বাধা পেতে লাগলেন। তাছাড়া সাংবাদিকতার সূক্ষ্ম জারী-জুরিও তাঁর মোটেই জানা ছিল না। হো চি-মিন্ কিন্তু তাতেও দমলেন না। ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে নবোদ্যমে ব্রতী হলেন। দেশের শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের কথা বাহিরের সংগ্রামী জনগণের মধ্যে প্রচার করতে হবেই। হো চি-মিন্ করতেন কি,—ভাষা-বিভীষিকার কবল থেকে রেহাই পাবার জন্য তিনি তাঁর বক্তব্য এক ফরাসী আইনজীবীর নিকট ব্যক্ত করতেন। আর তা লিপিবদ্ধ হলে নিজে সংশোধন করে সম্পাদকীয় স্তম্ভে পাঠাতেন। সাম্যবাদী সুবিখ্যাত পত্রিকা "এল' হিউম্যানিৎ" (L'Humanite)-এর পৃষ্ঠায় তিনি এবার ছোট গল্প লিখতে শুরু করলেন। ভিয়েৎনামের সাধারণ মানুষ চাষী-মজুরের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার, তাদের প্রাচীন উপকথার ইতিবৃত্ত—তাঁর এইসব গল্প-কাহিনীর উপজীব্য। প্রতিটি গল্পের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পারিশ্রমিকও কম পেতেন না, একশ' ফ্রাঁ-র মতো। তাঁর এই সব গল্প সাম্রাজ্যবাদী ফরাসী শাসকদের নগ্নরূপ শুধু প্রকটিত করে নি, সাহিত্যরসও সঞ্জীবিত করেছে। বলিষ্ঠ লেখক হিসেবে তরুণ হো চি-মিন্ অতি শীঘ্র স্বীকৃতি লাভ করলেন। গদ্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে কবিতা লিখেও তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। আর 'বাঁশের ড্রাগন্' (Bamboo Dragon) তাঁর এক রূপকগীতি নাট্য। সূক্ষ্ম এই প্রহসনের মারফত তিনি ভিয়েৎনামে বা তখনকার ইন্দোচীনে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নগ্ন রূপ রূপায়িত করেন লোকপ্রিয় এই নাটিকায়। এই বইখানি কিন্তু ফরাসী সরকারের কোপানলে পতিত হলো। দক্ষ সমালোচক আর ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রগতিশীল ক্লাব বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হলেও সরকার বাহাদুর তাকে বাজেয়াপ্ত করে দেয়।

প্যারিসে অবস্থানকালে হো চি-মিন আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শ্রমিক নেতৃবর্গের সংস্পর্শে আসেন। এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠিত 'লীগ অব কলোনীয়াল কান্ট্রি স্'-এর মুখপাত্র 'পারিয়া' (Paria)-এর পরিচালনা

ও সম্পাদনার ভার এই তরুণ বিপ্লবীর উপরই ন্যস্ত হয়। ফরাসী উপনিবেশে এই পত্রিকার প্রচার যদিও নিষিদ্ধ ছিল, হো চি-মিন্ কিন্তু জাহাজের শ্রমিকদের সহযোগিতায় স্বদেশে এই পত্রিকা পাচার করতেন ফরাসী পুলিসেব সতর্ক চোখের উপর। সাংবাদিকতা, কথাসাহিত্য কিংবা কবিতা রচনা—সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপ্লবী হো চি-মিন্ তরুণ বয়সে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেন সহজ সাবলীল বচনভঙ্গি ও রচনা-নীতির জন্য।

তিনি বলতেন ঃ

"প্রবন্ধ লেখ আব যাই-ই লেখ, লেখকমাত্রকেই মনে-প্রাণে একনিষ্ঠ হতে হবে। নিজের লেখাব যদি উৎকর্ষ সাধন করতে চাও তবে সমালোচনা আর আত্ম-সমালোচনা করতে ভুল করো না।"

প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি বাক্যও তিনি বৃথা প্রয়োগ করতেন না। তাঁর কবিতা তাই গঞ্জনা-মুখর, চিত্রানুরূপ শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ। নিউজিল্যাণ্ডের কবি বেউইএ্যাল-কৃত ইংরেজী অনুবাদ হো চি-মিনের দু-একটি কবিতার বাংলা করা গেল ঃ

রূপালী রাত লুটিয়ে পড়েছে ঘরের মেঝেতে
জানালার ফাঁকে ফাঁকে

সাধ যায় কবিতা লিখিতে ;
কবিতা লিখিব হায়, সেই সময় বা কই
সৈনিকের কাছে ?
কান পেতে শোন ওই
ঢঙ্ ঢঙ্ বাজছে ঘণ্টা পর্বতের মন্দিরে মন্দিরে
আমাদের বিজয়বার্তা আনছে বহিয়া।
শারদ রাতে স্বপ্ন দেখার এই কী সময় ?

*

পাঠে যখন আমি মগ্ন ছিলাম,
পাখিটি উড়ে এসে বসল কার্নিসে

ফুলের ছায়াটি পড়েছে এসে দেয়ালে
আর ওই দেখ ক্লান্ত ঘোড়াটি বার বার
ছুটে এসে জানাতে লাগ্‌ল
আমাদের বিজয়বার্তা।
তোমার কথা স্মরণ করেই লিখলাম এই পঙ্‌তি কয়টি।

লড়াইয়ের পর এসেছে নেমে বিশ্রামের অবসর :
শরতের মৃদু হাওয়া
ঝির্‌ঝিরে বৃষ্টি
আর কন্‌কনে শীত
বাতাসে বাতাসে আস্‌ছে ভেসে
জয়োল্লাস গীত।
গেরিলা সৈনিক দল ফিরেছে বুঝি বিজয়গর্বে
পানীয় এবার যোগাতে হবে, সে কী হর্ষ !

কবিতা রচনা বা সাহিত্য-চর্চা ছিল রাষ্ট্রপতি হো চি-মিনের সংগ্রামের হাতিয়ার, আগেই তা বলা হয়েছে। উপরের কবিতাটিতেও তাই প্রতিফলিত হয়েছে। স্বদেশের প্রতি ধূলিকণা ছিল এই মহাবিপ্লবীর প্রিয় বস্তু। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিপর্যয় আর গেরিলা বাহিনীর বিজয়োল্লাসে তিনি তাই অভিভূত। সোনার এই মুহূর্তগুলি তাই বুঝি তিনি ধরে রেখেছেন কবিতায় স্বর্ণাক্ষরে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুর মতো দেশের অগণিত ছেলে-মেয়েদের তিনি একান্ত ভালোবাসতেন। উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের এক শিশু-সমাবেশে স্বরচিত এই বাণীটি তিনি লিখে পাঠান :

শারদোৎসবের মাঝা-মাঝি কাল :
পূর্ণ চাঁদ,
মৃদু হাওয়া,
নিস্তরঙ্গ হ্রদ,

আর শরৎকালের নীল আকাশ
বয়ে এনেছে তোমাদের জন্য আনন্দ আর
সন্তোষের বার্তা···

হাসি-উল্লাসে মুখরিত তোমরা আজ
'চাচা হো'ও আজ তোমাদের মতো আনন্দমুখর।
বলতে পার কেন ?
আমি যে তোমাদের ভালোবাসি তাই।
তারপর কেন জান,
আমরা স্বাধীন হলাম এ বছরে
ক্ষুদে কৃতদাস নও আর তোমরা সব—স্বাধীন দেশের
নওজোয়ান ;
স্বাধীন দেশের স্বাধীন প্রভু।

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

ভিয়েৎনাম : ত্রান ভন তুঙ্ (সর্দার পানিক্করের ভূমিকা সহ)
বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য : ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী
এ্যাওয়েকেনিং অব এশিয়া : ডঃ আব সাহ্যানি
ইণ্ডিয়া য়্যাণ্ড দি প্যাসিফিক : ডঃ কালিদাস নাগ
ইণ্ডিয়া য়্যাণ্ড জাভা : ডঃ বিজনরাজ চ্যাটার্জি
সোভিয়েট লিটারেচার : ৭ম সংখ্যা, ১৯৫৭
ইউনাইটেড এশিয়া : ১২শ খণ্ড ২য় সংখ্যা, ১৯৬০

থাই সাহিত্য

"কোন্ সে সুদূর মৈত্রী আপন প্রচ্ছন্ন অভিজ্ঞানে
আমাব গোপন ধ্যানে
চিহ্নিত করেছে তব নাম,
হে সিয়াম,
বহু পূর্বে যুগান্তরে মিলনের দিনে···

· চিরন্তন আত্মীয় জনারে
দেখিয়াছি বারে বাবে
তোমার ভাষায়,
তোমার ভক্তিতে, তব মুক্তিব আশায়,
সুন্দরের তপস্যাতে
যে অর্ঘ্য রচিলে তব সুনিপুণ হাতে
তাহারি শোভন রূপে—
পূজার প্রদীপে তব প্রজ্বলিত ধূপে।"

[সিয়াম (বিদায়কালে) ° "পরিশেষ"]

উনিশ শ' সাতাশ সালের জুলাই মাসে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ দ্বীপময় ভারত অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতনের শিল্পী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর প্রভৃতিদের সঙ্গে নিয়ে। জাভা, বালি প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে কবির দল সিয়াম বা থাইদেশে (থাই মানে স্বাধীন ; সিয়ামের অধিবাসীরা নিজেদের থাই বা স্বাধীন দেশের বসিন্দা বলে অভিহিত করে থাকেন) এসে উপস্থিত হন। কবি সেখানে ছিলেন সপ্তাহকাল।

সিয়ামের কাছ থেকে বিদায়কালে রচিত হয় ওপরের এই কবিতাটি। ভারতের 'ত্রিশরণ মহামন্ত্র' কোন্ সুদূর অতীতে এসে পৌঁছেছিল সিয়ামের কানে, কেউ তা আজ জানে না। কিন্তু সিয়াম তার ভাষায়, তার ভক্তিতে, তার 'সুন্দরের তপস্যা'তে ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতিধারার যে অর্ঘ্য রচনা করে গেছে, তাদের একান্ত আপনার বলে চিনে নিতে ভারতের বিলম্ব হয় না একটুও। সিয়াম বা থাই সাহিত্যে ও শিল্প-কলায় ভারতীয়—বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের—প্রত্যক্ষ প্রভাব অপরিসীম। সিয়ামের প্রাচীন পুঁথির অধিকাংশ কাহিনীই পৌরাণিক ও কিংবদন্তীমূলক আর তাদের বেশীর ভাগই হলো ভারতের মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত এবং বৌদ্ধ জাতক থেকে গৃহীত। 'রামকিউন' (রামায়ণ) গ্রন্থখানির গল্প অবশ্য রামায়ণের মলয় ও যবদ্বীপীয় নাটকের আশ্রয় করে রচিত। প্রাচীন থাই ধর্ম-শাস্ত্রের অধিকাংশও পালি ভাষায় লিখিত জাতক বা অনুরূপ ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ কিংবা তার পরিবর্তিত বৃত্তি মাত্র।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইউনান অঞ্চলে সিয়াম বা থাই জাতির বসবাস দু-তিন হাজার বছর পূর্বে। কিন্তু খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের আগে পর্যন্ত লিখিত কোনো থাই সাহিত্যের পরিচয় মিলে না। থাইরা এ সময় নিজেদের পূর্ব বাসস্থান ছেড়ে দক্ষিণ-পূর্ব অভিমুখে যাত্রা করে এবং বর্তমান থাই সীমারেখায় নতুন এক রাজ্য স্থাপন করে অযুথিয়া (অযুধ্যা) নগরে। রাজা কামহেনং নতুন এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং তার প্রথম সম্রাট। ইতিহাসে এটি সুখ-থাই বংশ নামে পরিচিত। রাজা কামহেনং-ই প্রথম থাই বর্ণমালার উদ্ভাবন করেন ভারতীয় ও কম্বোজের লিপিমালা অবলম্বনে। ভারতীয় বর্ণমালা এ দেশে প্রবেশলাভ করার পর নতুন ধরনের এক বর্ণসমষ্টির সৃষ্টি হতে থাকে এই সময় থাই সাহিত্যে। যেমন, ফাসা=ভাষা; নথোন= নগর; মখোত=মগধ প্রভৃতি কয়েকটি পদ থেকে স্থানীয় ভাষার উপর ভারতীয় পালি ও সংস্কৃতের প্রভাব কতখানি তার পরিচয় পাওয়া

যায়। রাজা রাম কামহেনং-এর যে শিলালিপি বেঙ্কক জাতীয় পাঠাগারে রক্ষিত আছে তার ভাষা এক-স্বরমাত্র। বাক্যগুলি হ্রস্ব এবং বচনভঙ্গি অমার্জিত হলেও তাহা সহজ ও সরল।

সেকালের থাই সাহিত্যকে মোটামুটি দু-ভাগে বিভক্ত করা চলে। এক হলো সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিককার অযুথিয়া (অযুধ্যা) যুগ। আর দ্বিতীয়টি হলো তার একশত বৎসর পরবর্তী রতনকোশীন্দ্র যুগ (আধুনিক কাল)। অযুধ্যা যুগে থাই সাহিত্যে যেন প্রেমের কবিতার বান বইতে থাকে। ক্লোভ্, ছন্‌তা, গাপয়া, ক্লন্ অথবা অমিত্রাক্ষয় রাই আও প্রভৃতি বিচিত্র ছন্দের অনুশীলন চলতে থাকে সারা দেশ জুড়ে। এমনকি, কথাবার্তা পর্যন্ত প্রচলিত ছিল কাব্য ও কবিতায়। 'ডগ্ সয়' ও 'সাগ্রভ' প্রভৃতি লোক-গীতিও এসময় জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পাল-পার্বণ বা কোনো উৎসবাদি উপলক্ষে নরনারীরা দুদলে বিভক্ত হয়ে এদেশের কবির গান বা লড়াইয়ের মতো কবিতা আউড়ে গান করতে শুরু করত। নৌকা-বাচ প্রতিযোগিতা কিংবা রাজাদের জলপথে বিহার উপলক্ষে আমাদের সারিগানের মতো অযুধ্যা যুগের থাই সাহিত্যেও এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত রচনার ধুম পড়ে যায়।

অযুধ্যা যুগের কাব্য

১৭৬৭ সালের দিকে বর্মী 'বর্গী'রা এসে হানা দেয় প্রাচীন অযুধ্যা নগরীব উপর। তারপর চলে কিছুদিন ধরে নৃশংস হত্যা, লুণ্ঠন আর ধ্বংসের অবাধ গতি! এই বর্বর ধ্বংসলীলার মুখে প্রাচীন থাই সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্য-নিদর্শনের অনেক কিছুই অবলুপ্ত হয়ে যায়। তবু যা রক্ষা পায় তা থেকে পরিচয় পাওয়া যায়, অযুধ্যা যুগে থাই কাব্য-ধারা কতখানি উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এ যুগের সাহিত্য-সৃষ্টির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, উচ্চবর্ণ অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকে। কবি বা গ্রন্থ রচয়িতারা কেউ হলেন রাজা, কেউ বা রাজপুত্র

অথবা রাজপরিবারভুক্ত কেউ। নতুবা, কেউ কোনো রাজজ্যোতিষী। তাতে অবশ্য অবাক হবার তেমন কারণ নেই। কেন না, তখনকার দিনে অভিজাত সম্প্রদায়ই ছিলেন সাহিত্যের একমাত্র সাধক, পাঠক ও গুণগ্রাহী। সাধারণ মানুষ ছিল নিরক্ষর। দরবারী সাহিত্য-চর্চার দ্বার ছিল তাদের নিকট অবরুদ্ধ।

অযুধ্যা যুগের প্রখ্যাত কবিদের মধ্যে প্রথমেই নাম উল্লেখ করতে হয় রাজা ত্রৈলকের (খৃঃ ১৪৪৮—৮৮)। তাঁর প্রধান সৃষ্টি রোমান্টিক কাব্য 'ফবা ল'। অমর এ কাব্যের বিষয়বস্তু অনেকটা মহাকবি সেক্সপীয়রের 'রোমিও ও জুলিয়েট' নাটকের অনুরূপ। 'রোমিও ও জুলিয়েট'-এর মতো রসঘন এ কাব্যের আখ্যায়িকাও এক প্রেমিক-প্রেমিকাযুগলের পরিবারের পুরাতন বিবাদ-বিসংবাদের করুণ পরিণতি নিয়ে। রাজা ত্রৈলকের অপূর্ব এই প্রেমগাথাটিকে আধুনিক নাট্যরূপ দিয়েছেন সমসাময়িক নাট্যকার প্রেম চাই। ইংলণ্ডে বহুবার পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে এর অভিনয়ও হয়ে গেছে। বিদেশী দর্শকবর্গের অকুণ্ঠ প্রশংসাও অর্জন করেছে। সুমধুর এই কাব্যগাথা মানব-হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি, আবেগ আর কাব্য-সুষমার দ্বারা সকল পাঠকেব মন আকৃষ্ট করবে।

রাজা দ্বিতীয় রাম-এর প্রধান কীর্তি অবশ্য থাই সেনাবাহিনী ভেঙে নতুন করে সংগঠন। কিন্তু সাহিত্য ক্ষেত্রেও দান তাঁর নেহাত কম নয়। কাব্যে সামরিক রণকৌশলের এক বিশদ-বিবরণী ছাড়া তিনি রাজা ত্রৈলকের সামরিক অভিযানকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র এক মহাকাব্যও রচনা করেন। এ মহাকাব্যের নাম 'যুয়ান পাই'। ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের অজস্র উপমার উল্লেখ দেখা যায় এই কাব্যের ছত্রে ছত্রে। কেবল কাব্য ও ঐতিহাসিক দিক থেকে নয়, ভাষা ও সংস্কৃতিগত তথ্যের এক অনবদ্য ভাণ্ডারও বলা চলে রাজা দ্বিতীয় রাম-এর এই মহাকাব্যখানিকে।

স্বর্ণ যুগ

রাজা নারায় (খৃঃ ১৬৫৬—৮৯) ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই-এর সমসাময়িক। তাঁর রাজত্বকালকে থাই সাহিত্যের স্বর্ণ-যুগ বলা যায়। তাঁর রাজত্বকালেই ফরাসীদের সঙ্গে অযুধ্যা রাজ্যের মৈত্রীসম্পর্ক প্রথম স্থাপিত হয়। এ দুটি রাজ্যের মধ্যে বৈদেশিক দূত বিনিময়ও চলে। এভাবে বিদেশীদের সহিত আনাগোনার ফলে থাইদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতির প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়। খৃষ্টান মিশনারীদের দৌলতে থাই ভাষায় বাইবেলও অনূদিত হতে থাকে। রাজা নারায় নিজেও ছিলেন একজন কবি ও গুণমুগ্ধ সাহিত্য-রসিক। তাঁর রাজ-দরবারের শোভাবর্ধন করতেন প্রতিষ্ঠাবান বহু কবি ও বিদগ্ধ পণ্ডিতবর্গ। কাব্য-আলোচনা ও রস-নিবেদন করাই ছিল তাঁদের পেশা। উদ্ভট শ্লোক ও মুখে মুখে পদ্য রচনা করা ছিল তাঁদের কাজ। রাজা হয়তো মুখে মুখে কোনো একটা পদ্যের প্রথম কলি বানিয়ে তাঁর প্রিয় কবিয়াল সভাসদকে বললেন পরবর্তী পংক্তি পূরণ করতে। এভাবে কবিয়ালদের কাব্যশক্তির সঙ্গে তাঁর বুদ্ধিবেত্তা ও উপস্থিত কাব্যশক্তির পরখও হয়ে যেত। রাজা নারায়-এর এসব সভাসদ কবিদলের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন কবি শ্রীপ্রাজ্। কবি শ্রীপ্রাজ্-এর পিতা কবি ফ্রা মহারাজ ক্রু-ও এ বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।

গীতধর্মী 'ক্লোং কামসুয়ান' ও রোমান্টিক কাব্য 'অনিরুদ্ধ' শ্রীপ্রাজ্-এর কাব্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বিখ্যাত এ দুটি গ্রন্থ ছাড়া মুখে মুখেও তিনি অসংখ্য ছড়া ও শ্লোক রচনা করে গেছেন। গভীর রসবোধ, কল্পনা ও ছন্দ-বৈচিত্র্যে আর তীক্ষ্ণ বাক্য-সৌষ্ঠবের গুণে তাঁর কাব্য সমুজ্জ্বল। শ্রীপ্রাজ্-এর 'ক্লোং কামসুয়ান' পরবর্তী কালে কবিদের কাব্য-রচনাকে বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত করেছে।

রাজা নারায় নিজেও একজন উচ্চদরের কবি ছিলেন তা আগে বলা হয়েছে। তিনি অনেকগুলি সুমধুর গীতিকাব্য রচনা করেন।

বিখ্যাত কাব্য 'সমুদ্রকোট'-এর অনেকখানিও তিনি 'শ্রীপ্রাজ্'-এর পিতার সঙ্গে রচনা করে যান। এটিকে সমাপ্ত করেন তাঁর যশস্বী পুত্র ও বেঙ্কক্ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি যুবরাজ পরমাণুচিৎ।

অযুধ্যা যুগের আর একজন প্রতিভাবান কবি হলেন যুবরাজ ধর্মাধিবেদ্। 'কেপ্-হোক্লং প্রপাৎ তানটংডং' নামে বর্ণনাত্মক এক গাথায় কবি তাঁর প্রিয়ার প্রশস্তি গেয়েছেন সুললিত ছন্দে।

অযুধ্যা কাব্যের বৈশিষ্ট্য

ফরাসী বা কেলটিক রোমান্সের মতো বীরত্বপূর্ণ এসব কবি-কল্পনার প্রায় সবগুলিই কি আঙ্গিক, কি বিষয়বস্তুর দিক থেকে এক পর্যায়ভুক্ত। তফাত খুব বড় একটা দেখা যায় না। এর প্রতিটি কাব্যের নায়ককে হতে হবে কোনো-না-কোনো রাজকুমার বা রাজবংশোদ্ভূত। কি সৌন্দর্যে, কি শক্তি-সামর্থ্যে তার তুলনা নেই। আর, নায়িকাও হবেন অসামান্যা রূপসী এবং সতীত্বপনায় সীতা-সাবিত্রীদের বাড়া। এক কাব্যের সঙ্গে অপর কাব্যের পার্থক্য কেবল নায়িকাকে নায়কের কাছ থেকে দূরে রেখে কে কতখানি চটকদার পাতার পর পাতা বাধাবিঘ্নের ঝড় তুলতে পারলো তারই। পরিশেষে নায়ক-নায়িকার মিলন দেখাতে হবেই হবে। অযুধ্যা যুগের অধিকাংশ থাই কাব্য যেমন— 'ই-হ্নাও', 'অনিরুদ্ধ', 'ফরা সামুয়ং' প্রভৃতিকে—এ শ্রেণীতে ফেলা যায়। 'ফরা ল' অবশ্য এদের মধ্যে একটু স্বাতন্ত্র্যের দাবি করে। এ যুগের বীরত্বপূর্ণ কাব্যগুলির মধ্যে 'ই-হ্নাও' সমধিক প্রসিদ্ধ। যবদ্বীপের ইতিহাসের একটি কাহিনী অবলম্বন করে এইটি রচিত হয় অষ্টাদশ শতকে। এ সময়কার আর একটি নামকরা কাব্য হলো 'কুনচং কুন্পন্'। অযুধ্যা যুগের শেষের দিকের বাস্তব কয়েকটি জীবন-চরিত নিয়ে এটি রচিত। এর নায়ক হলো কুন্পন্, নায়িকা পিম্ আর দুর্বৃত্ত হলো কুন্চং। রাজধানী অযুধ্যার অভিজাত সমাজের বাস্তব পটভূমিতে লেখা হলেও এই কাব্যে প্রথম সাধারণ মানুষের হদিশ

মেলে প্রাচীন থাই সাহিত্য-মুকুরে। প্রাচীন থাইবাসীদের দৈনন্দিন জীবনধারা ও রীতিনীতির চিত্রও লিপিবদ্ধ আছে সুন্দরভাবে এই গ্রন্থে। বাস্তবধর্মী 'কুন্‌চং কুন্‌পন্‌' থেকে থাই সাহিত্য নতুন বাঁক নেয় বলা চলে। সাহিত্য আর অভিজাত সম্প্রদায়ের একচেটিয়া বিষয়বস্তু হয়ে রইল না। সাধারণ মানুষও স্থান লাভ করল তার আসন-বেদীতলে।

রতনকোশীন্দ্র যুগ

এতকাল পর্যন্ত কেবল নাটক, কাব্য ও গীতি-কবিতাই ছিল থাই-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। গদ্যের প্রচলন তখনও চালু হয় নি। আত্মপ্রকাশে থাই লেখকরা ছিলেন কাব্যাশ্রয়ী। ১৭৮২ সালে ব্যাঙ্কক্‌ শহরের পত্তন হয়। তখন থেকে তর্ক, যুক্তি ও নানান বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপারে গদ্য তার আসন সুপ্রতিষ্ঠ করে নেয় থাই সাহিত্যে। চীন সাহিত্য ভাণ্ডারের সেরা সেরা বইগুলোও এ সময়ে অনূদিত হতে লাগল। সেকালের চীন সাহিত্যের অমূল্য সৃষ্টি 'সান্‌-কুওচি' বা তিন রাজ্যের রোমান্স আর 'লিয়াং কোক্‌'-এর থাই অনুবাদ পরম আগ্রহে গ্রহণ করে নেয় জনসাধারণ। চীন সাহিত্যের এ সব অনুবাদের মধ্যে একথা স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে গেল যে, কুশলী সাহিত্যিকের হাতে পড়লে থাই সাহিত্যও কম যায় না। প্রাঞ্জল, সুসমঞ্জস ও ভাবসমৃদ্ধ আত্ম-প্রকাশে থাই গদ্যও সার্থক সাহিত্য রচনার উপযোগী।

থাই সাহিত্যে গদ্যের প্রচলন শুরু হলো বটে, কিন্তু তাতে কবি ও গীতিনাট্যকারদের কদর কমল না এক চুলও। রাজা যোধফা চুলালোক্‌ ছিলেন একাধারে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ও প্রসিদ্ধ কবি। বাল্মীকি রামায়ণের থাই সংস্করণ "রামকিউন" সংশোধিত আকারে তিনি পরিবেশন করেন। থাই জনসাধারণের মধ্যে এই "রামকিউনে"র সমাদর এখনও অটুট রয়েছে। 'রামকিউন' অবলম্বনে রচিত ক্লাশিকাল মুখোশ নাট্য-লীলা 'ক্ষণ' লোকে আজও সাগ্রহে দেখে থাকে।

'রামকিউনে'র পরবর্তী সংকলনের মধ্যে রাজা লোয়েৎলার সংস্করণটিই ছেলেবুড়ো সকলের নিকট বিশেষ সমাদৃত। রাজা লোয়েৎলা নাট্যকার হিসেবেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। 'ক্রাইৎসঙ' ও 'কবি' নামে দুখানি গীতি-নাট্যও তিনি রচনা করেন।

সুনতোরন পু

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে রত্নকোশীন্দ্র যুগের থাই কাব্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দিকপাল হলেন অমর কবি সুনতোরন পু। সাধারণের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন 'মাতাল কবি' হিসেবে। বিচিত্র তাঁর জীবন-কাহিনী। প্রথম জীবনে তাঁকে দুঃসহ ক্লেশ, দারিদ্র্য, অর্থাভাব, এমন কি কারাবরণ পর্যন্ত ভোগ করতে হয়। পরবর্তী জীবনে অবশ্য সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপালাভে তিনি বঞ্চিত হন নি। দার্শনিক কবি সুনতোরন পু-র কাব্যে তাঁর বিচিত্র জীবনের প্রতিচ্ছায়া মেলে। স্বতোৎসারিত তাঁর অধিকাংশ কবিতাই গীতধর্মী। ভাবের গভীরতা ও মৌলিকতাবলে তাঁর কাব্য প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য-সম্পদের সমগোত্রীয়। বিষয়বস্তু ও ছন্দ-বৈচিত্র্যের দিক থেকেও তাঁর কবিতাগুলি রস-ঘন ও অভিনব। রবীন্দ্রকাব্যের মতো বিশ্বজনীন সুরের রেওয়াজ মেলে তাঁর অজস্র কবিতায়। "ফরা অপাই" তাঁর অমর-সৃষ্টি। নতুন নতুন ছন্দের প্রবর্তনও তিনি করে গেছেন।

সুনতোরন পু-র একটি কবিতা ঃ

আখ আর মিঠে তাল চিরকাল
থাকে না স্মরণে
মিঠে দুটো কথা শুধু
জুড়ে থাকে কানে।
হাজার ক্ষতের দাগ
যাবে গো শুকিয়ে ঃ
ভগ্নহৃদয়-ক্ষত সারে কি কখনও ?

সুরায় মাতাল নই,
আমি শুধু মাতাল প্রেমের ঃ
আপন হৃদয়বেগ রোধিব কেমনে ?
মদের মৌতাত জানি
টুটে যাবে একদিন সময়ের স্রোতে,
উদগ্র কামনা শুধু ছেয়ে আছে
দেহ মোর দিবস-শর্বরী।

সুনতোরন পু-র পরবর্তী রতনকোশীন্দ্র যুগের আর একজন কবি হলেন নরীন্দ্র। করুণ রসাত্মক প্রশস্তি গাথা লিখে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর এ গাথাগুলি আপনার দয়িতার উদ্দেশে রচিত। কবি আপন প্রিয়াকে ছেড়ে যুদ্ধব্যপদেশে দূর স্থানে যেতে বাধ্য হন। সৈনিক-কবি তাই আপন কবি-প্রিয়ার উদ্দেশে লিখেছেন ঃ

হে মোর বিশ্ব-মনোমোহিনী
সুন্দরী শ্রেষ্ঠা!
নীল আকাশের কোথাও যদি একফালি
কুঞ্জের লেশ থাকত,
আমি সেখানে তোমায় স্থাপন করতাম
কালো মেঘের আড়ালে,
হায়, কোথাও যে তেমন কোন ঠাঁই নেই
প্রেয়সীকে আমার আড়াল করে রাখবার।

রাজা লোয়েৎলা-র পরে রাজা নঙক্লাও সিংহাসন লাভ করেন। রাজবংশের ধারা মতো তিনিও থাই জাতীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করেন গীতি-নাট্যের সাহায্যে। কিন্তু রাজপুত্র পরমাণুচিৎ-এর রচিত 'তালেংপাই' ও 'সহোদরার প্রতি কৃষ্ণার আবেদন' কাব্যগ্রন্থই তাঁর সবিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা।

অপরাপর থাই রাজাদের মতো রাজা চুলালংকরনও একজন থাই-সাহিত্যের ধারক ও বাহক। বিদগ্ধ পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতিও ছিল

তাঁর। এ খ্যাতির পরিচয় মেলে ইউরোপ সফরকালে কন্যাদের নিকট লেখা তাঁর পত্রাবলীতে। 'নিত্রচকৃত' ও 'নগোপা' তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ। রাজা চুলালংকরন শক্তিশালী এক গদ্য-লেখকও ছিলেন। তাঁর লেখা ডায়েরী ও প্রবন্ধাবলী আধুনিক থাই গদ্য-সাহিত্যের গড়ার মুখে ভূমিকা গ্রহণ করে অনেকখানি।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আরও একজন শ্রেষ্ঠ কবির আবির্ভাব ঘটে। তিনি হলেন রাজা বিজ্রিরায়ুধ বা ৬ষ্ঠ রাম (রাজত্বকাল খৃঃ ১৯১১-২৫)। শিক্ষা-দীক্ষা তিনি লাভ করেন ইংলণ্ডে। ইংরেজী সাহিত্য—বিশেষ করে সেক্সপীয়রের তিনি ছিলেন পরম অনুরক্ত ভক্ত। 'রোমিও ও জুলিয়েট', 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট', 'মার্চেণ্ট অব্ ভেনিস' প্রভৃতি নাটকের তিনি সুষ্ঠু অনুবাদও কবেন। তিনি কেবল ইংরেজী সাহিত্যেই পারদর্শী ছিলেন না, পালি ও সংস্কৃত ভাষায়ও ছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিত। কালিদাসের মূল সংস্কৃত নাটক অবলম্বনে তিনি 'শকুন্তলা' এবং মহাভারতের নল-উপাখ্যান অবলম্বনে 'নল' নামে দুটি নাটকও রচনা করেন। বৌদ্ধ জাতক ও বহু ভাবতীয় কাহিনীর অনুবাদও তিনি করেন থাই ভাষায়। জাতীয় বীর রাজা রাম কামহেনং-এব জীবন-ইতিহাসকে বিষযবস্তু করে রচিত তাঁর নাটক "ফরা রুয়ানং" কিন্তু সমধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। নাট্যকার হিসেবেই প্রধানত তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সহজ, সরল ও বলিষ্ঠ প্রকাশ-ভঙ্গির গদ্য-লেখকরূপেও রাজা বিজিরায়ুধের দান থাই সাহিত্যে কম নয়। 'অশ্ববাহু'—এই ছদ্মনামে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখে গেছেন। এ সব প্রবন্ধে তাঁর গভীর দেশপ্রেম ও সমাজকল্যাণকর প্রচেষ্টার পরিচয় মেলে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে রাজা বিজিরায়ুধ অনেকগুলি গ্রন্থও রচনা করেন।

থাই উপন্যাস

আধুনিক থাই উপন্যাসও রাজা বিজিয়ায়ুধের হাতে বিশেষ পুষ্টি লাভ করে। তিনি যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন তিনি একদল তরুণ

রাজকর্মচারীকে নিয়ে এক সাহিত্য-সভা সংগঠন করেন। এ সব আমলাদের অনেকে যুবরাজের মতো বিলেত থেকে শিক্ষালাভ করে এসেছিলেন। সুতরাং ওঁরা নানান প্রবন্ধ, গল্প ও উপন্যাসের মারফত পাশ্চাত্যের সাহিত্য ও রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন। সমৃদ্ধ করে তুললেন থাই কথা-সাহিত্যকে। এ সাহিত্য-সভার বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন রাজপুত্র বিদ্যালংকরন। 'এন-এম-এস' এই ছদ্মনামে তিনি লিখতেন। চাও পিয়া তমসক মন্ত্রী (থাই সাহিত্যের যিনি 'ক্রুতেপ' নামে পরিচিত) ও পিয়া সুরীন্দ্র রাজা এ সভার অপর দুজন শক্তিশালী লেখক-সভ্য। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় দীক্ষিত এ সব তরুণ সাহিত্যিকরা থাই-সাহিত্যকে ঢেলে নতুন করে সাজাতে লেগে গেলেন। এঁদের মধ্যে রাজপুত্র বিদ্যালংকরন ছিলেন সর্বাগ্রণী। সার্থক কবি হিসেবেও তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন। ছন্দের উপর দখল ছিল তাঁর অসাধারণ। 'স্বর্ণপুরী' কাব্যে তিনি দুরূহ 'ক্লন হক' ছন্দ-চাতুর্যের চরম পরাকাষ্ঠার পরিচয় দেন। থাই কথা-সাহিত্যে হাস্য-রসের প্রথম পবিবেশকও ছিলেন তিনি। 'এন-এম-এস' ছদ্মনামে তিনি অসংখ্য হাস্য-রসাত্মক রচনা, গল্প ও প্রবন্ধ লিখে গেছেন। 'ইংলণ্ডে ছাত্র-জীবন' বইখানি তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্যসম্পদে সমৃদ্ধ। গ্রন্থখানি সুখপাঠ্যও। 'বেতান কাহিনী' তাঁর আর একখানি নামকরা বই।

'ক্রুতেপ' (চাও পিয়া তমসক মন্ত্রী) মূলত প্রাবন্ধিক ও সমালোচক। অর্থনীতি, শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার—নানা বিষয়ে তিনি সরস প্রবন্ধ লিখে থাকেন। প্রথম জীবনে তিনি কবিতা লিখেও হাত রপ্ত করেন। দু-চারটি কবিতা না লিখলে বুঝি কেউ আর থাই সাহিত্যিক হতে পারেন না।

'মেই ওয়ানই' (পিয়া সুরীন্দ্রর ছদ্মনাম) বুঝি সমকালীন থাই কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লেখক। প্রচুর মাত্রায় তিনি লেখেন নি, কিন্তু রচনাশৈলীর কষ্টিপাথরে তিনি আধুনিক থাই সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পী বলে সর্বজনস্বীকৃত।

রাজপুত্র দামরঙ্‌ও এমনি এক শক্তিধর আধুনিক লেখক। তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'থাইদেশে বৌদ্ধস্তূপ', 'বর্মার সহিত যুদ্ধ', 'ক্লাশিকাল নৃত্যের রীতিনীতি' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে রাজপুত্র দামরঙের গভীর রসবোধ, ঐতিহাসিক জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর মেলে। ভাষাও তাঁর খুব সহজ-সরল ও হৃদয়গ্রাহী। হবু থাই সাহিত্যিকদের— উপর তাঁর প্রভাব কম নয়।

আধুনিক থাই সাহিত্যের—বিশেষ করে তার কথা-সাহিত্যের —সমালোচকের দৃষ্টিতে পূর্ণাঙ্গীন বিচারের সময় এখনো আসে নি। তবে অদূর ভবিষ্যতে যে সে সম্ভাবনা রয়েছে, জোর করে তা বলা চলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের কদরও বাড়ছে। কিছুকাল পূর্বে, ঢাকায় আন্তর্জাতিক নৃত্য ও গীতানুষ্ঠানে যোগদানের পর দেশে ফিরবার পথে একদল থাই নৃত্য-শিল্পী এসেছিলেন কলকাতায় এবং রামায়ণের উপাখ্যান অবলম্বনে কয়েকটি নৃত্য প্রদর্শনও করেন তাঁরা কলকাতার কয়েকটি রঙ্গমঞ্চে। ভারতীয় নৃত্যকলার সঙ্গে সিয়াম বা থাইদেশের নৃত্যকলার কতখানি সামঞ্জস্য বিদ্যমান এ নৃত্য-কলা দেখলেই তা বুঝা যায়। প্রমাণ মেলে উভয় দেশের সাংস্কৃতিক ঐক্যের। সাংস্কৃতিক এ ঐক্য-ধারা কেবল থাই নৃত্যকলার বেলায় প্রযোজ্য নয়, থাই সাহিত্যের—বিশেষ করে সেকালের সাহিত্যের বেলায়ও খাটে হুবহু।

প্রাক্‌-আধুনিক কাল

আধুনিক থাইকাব্যের গণ্ডী ১৯৩২ সালের আগে পর্যন্ত থাই-রাজদরবারের আনাচে-কানাচে সীমাবদ্ধ ছিল তা আগেই বলা হয়েছে। স্মরণীয় ১৯৩২ সনে থাইদেশে নিয়মানু রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। তার পূর্বে কাব্য-গীতি-নাটিকা সবকিছুরই রচয়িতা রাজন্যবর্গ বা অমাত্যগোষ্ঠীর নামে চলে আসছিল। রাজা-ওমরাহরাই ছিলেন কবি বা গীতিকার। ব্যাঙ্কক-যুগের (খৃঃ ১৭৮২—১৮৫১) রাজা

দ্বিতীয় রাম আর রাজা বিজিরায়ুধ (ষষ্ঠ রাম) অসাধারণ কাব্য-প্রতিভা আর সাহিত্য-কীর্তির জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। থাই সাহিত্যের প্রসার ও পুষ্টি সাধনে দ্বিতীয় রাম ও ষষ্ঠ রামের দান অনস্বীকার্য। দরবারী রাজকবিদের সহযোগিতায় রাজন্যবর্গ সার্থক কাব্য-রচনায় প্রয়াসী হতেন। তাই 'রাজন্‌বুধ' বা রাজকীয় কাব্য-রীতি নামে থাই সাহিত্যে নতুন এক রীতির প্রচলন হয়েছিল, যাহার সাহায্যে রাজা অনেক ক্ষেত্রে নিজে লিখে অথবা অধীনস্থ রাজকবি বা পণ্ডিতবর্গের সাহায্যে নতুন নতুন রচনার দ্বারা জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টিবিধান করতেন। এই সময় 'ক্রম্ অলোক' বা রাজকীয় লেখক-দপ্তর নামে নতুন এক দপ্তরের ব্যবস্থা ছিল।

রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষক এই কবি-সমাজের অস্তিত্ব দেখা যায় চৌদ্দ শতক থেকে যখন থাইরাজ্যের রাজধানী প্রথম স্থাপিত হয় অযুধ্যা (Ayudhya) নগরে। তখন থেকেই থাই ভাষায় আনুষ্ঠানিক কবিতার সূচনা হয়। কম্বোডিয়া থেকে আগত দরবারী ব্রাহ্মণ সমাজ কর্তৃক এইসব শ্লোক প্রথম লিপিবদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সাহায্যপুষ্ট এই কাব্যধারা অযুধ্যা যুগের শেষ কাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে রাজা নারায়-এর রাজত্বকাল (খৃঃ ১৬৫৬—৮৯) হতে ব্যাঙ্কক যুগের প্রথম দু-তিনটি রাজত্বকাল পর্যন্ত। রাজ-প্রশস্তি আর রম্য গীতিকায় থাই সাহিত্য এই সময়ে বিশেষ করে সঞ্জীবিত ও পল্লবিত হয়ে ওঠে।

১৯৩২ সালে প্রাসাদ-বিপ্লবের পর সাহিত্যে রাজকীয় প্রভাব বেশ কিছুটা খর্ব হয়ে পড়েছিল। রাজপুরীর গণ্ডি এড়িয়ে সাহিত্যের পরিধি তখন বৃহত্তর জনসমাজে পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠল। এদিকে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বৃত্তিভুক্ কবিকুলও প্রশস্তিসূচক কাব্য-কবিতা রচনায় বিরত হন। ফলে বেশ কিছুকাল সাহিত্য-ক্ষেত্রে ভাটা দেখা দেয় সার্থক নব নব সৃষ্টির একান্ত অভাবে।

একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করবার। আঠেরো শতকের পূর্ব

পর্যন্ত থাই সাহিত্যে যা কিছু লিখিত হয়েছে সবই পদ্য বা কবিতায়। গদ্য-সাহিত্যের তখনও প্রচলন হয় নি। প্রথম রাম বা ফ্রা বুদ্ধযোদ ফ্রা চুলক (খৃঃ ১৭৮২—১৮০৯) আমলে প্রথম গদ্য-রচনা শুরু হয়। তাঁর রাজত্বকালেই চীনের সুবিখ্যাত রোমাঞ্চ-কাহিনী 'তিনরাজ্যে রোমাঞ্চ' থাইভাষায় প্রথম অনূদিত হয় 'সাম কোক' নামে। পরবর্তী রাজা পঞ্চম রাম বা চুলালংকরন-এর রাজত্বকালে রম্যকাহিনী, স্মৃতি-কথা, বিবিধ সম্বন্ধ প্রভৃতি নানাবিধ গদ্য-রচনায় থাই সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

'কবি রাজা' ষষ্ঠ রাম বা বিজিরায়ুধ-এর রাজত্বকালে (খৃঃ ১৯১০-২৫) নানা দিকে দিকে থাই সাহিত্যের প্রসার লাভ ঘটে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত তখন থেকেই থাই সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনা বলা চলে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা মারফত এই সময় পাশ্চাত্য সাহিত্যের মণি-মঞ্জুষা—তার নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতি অনূদিত হতে থাকে। ইউরোপীয় ভাবধারা আর শিক্ষা-দীক্ষায় রাজা ষষ্ঠ রাম নিজেই মৌলিক বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ইংরেজী ক্লাশিকাল সাহিত্য থেকে তিনি অনুবাদ করেন। তিনি যখন যুবরাজ ছিলেন তখনই বিদেশে শিক্ষারত বহু থাই যুবককে সঙ্গবদ্ধ করে এক 'সাহিত্যবাসর' গড়ে তোলেন। নিজের তত্ত্বাবধানে তাদের সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে নানাবিধ গ্রন্থ-রচনায় উদ্বুদ্ধ করেন। থাই সাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধারা অব্যাহত থাকে ১৯৩২ সালে প্রাসাদ অন্তর্বিপ্লব পর্যন্ত। তারপর থেকে থাই সাহিত্য যে নতুন আঙ্গিক ও পরিবেশ পরিগ্রহ করেছে তা আগেই একবার বলা হয়েছে।

যুদ্ধোত্তর যুগ

তাই যুদ্ধোত্তর কাল থেকে থাই সাহিত্যের প্রকৃতপক্ষে সমকালীন যুগের সূচনা। সাহিত্যের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি রাজকীয় পরিবেশ আঁর গণ্ডীর মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নয়। মধ্যবিত্ত বা শিক্ষিত জনসাধারণের

মধ্যে তা তখন ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করবার উদ্দেশ্যেই বুঝি নানান সংবাদপত্র, পত্র-পত্রিকা আর সুলভ-সংস্করণ বিবিধ গদ্য পুস্তক প্রকাশিত হতে লাগল। বিবিধ গদ্য-রচনার তুলনায় কাব্য-পাঠের কদর কমে গেলেও কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর তেমন সাহিত্য রচিত হলো না। বরং ক্লাশিকাল রচনার ধারা অব্যাহত থাকে। প্রতিভাবান নতুন এমন কোনো কবিরও আবির্ভাব হয় নি যাঁকে ব্যাঙ্কক যুগের প্রথম তিন রাজা বা ষষ্ঠ রাম বিজিরায়ুধ-এর সঙ্গে তুলনা করা যায়। সমসাময়িক থাইকাব্যলোকে আবার তুই শ্রেণীর কবিকুলের উদ্ভব ঘটল। এক শ্রেণী হলেন 'ফুয়াই' বা প্রবীণের দল আর অপর শ্রেণী হলেন 'দেক্' বা তরুণ সম্প্রদায়। কবি 'বিজিরায়ুধ'-এর পরিণত মননশীলতার দৌলতে 'ফুয়াই' কবিসম্প্রদায়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি খৃষ্টীয় বিশ ও ত্রিশ দশক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই 'ফুয়াই'-গোষ্ঠী অপর কবিদের মধ্যে প্রিন্স বিদ্যালংকরন, চিট্ বুড়াঠাট্, চাও ফায়া ধর্মশক্তি মন্ত্রী আর ফায়াউপাকিত্ শিল্পস্মরন সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

খৃষ্টীয় চতুর্থ দশক পর্যন্ত তাঁদের কাব্য রচনা অটুট ছিল। প্রিন্স বিদ্যালংকরন ও চিট্ বুড়াঠাট্-ই ক্লাশিকাল যুগের শেষ বিখ্যাত কবি যাঁদের হাতে ভারতীয় কাব্যের ছন্দবিজ্ঞান এক অভিনব রূপ গ্রহণ করে।

প্রিন্স বিদ্যালংকরন (খৃঃ ১৮৭৬-১৯৪৫) আধুনিক থাই সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, যদিও 'এন-এম-এস' ছদ্মনামেই ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রথম অবতীর্ণ হন এবং বিশেষ লোকপ্রিয়তা অর্জন করেন। 'কনক নখরন' (স্বর্ণপুরী) তাঁর বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ। সংস্কৃত গ্রন্থের এক ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে এই কাব্য রচিত। 'সাম ক্রুঙ্' (তিন রাজপুরী) তাঁর বৃহত্তম কাব্য—তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই কাব্যে তিনি থাই ইতিহাসের তিন বৃহৎ নগরীঃ অযুধ্যা, থোবুড়ি, ও ব্যাঙ্কক-এর উত্থান-পতনের বর্ণাঢ্য কাহিনী ছন্দ-মাধুর্যের সঙ্গে বর্ণন।

করেছেন। উনিশ শ' চুয়াল্লিশ সালে জাপানী অবরোধের শেষ অধ্যায়ে তাঁর সৃষ্টিরও অবসান ঘটে। যদিও দুরূহ ভাষা ও কঠিন কঠিন শব্দ প্রয়োগের ফলে কাব্য তাঁর বিদগ্ধ সমাজেই বিশেষ করে সমাদৃত ছিল; তবু থাই কাব্য-সাহিত্যে তাঁর স্থান অনস্বীকার্য।

চিট্ বুড়াঠাট্ও (খৃঃ ১৮৯২-১৯৪২) নানাবিধ রচনা-সম্ভারে থাই সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন যদিও 'সমাখীপেত' তাঁর সবিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ফায়া উপাকিত শিল্পস্মরন কবি ও বৈয়াকরণিক হিসেবে পরিচিত। তিনিই প্রথম থাইভাষায় আধুনিক ব্যাকরণ রচনা করেন। চাও ফাসা ধর্মশক্তি মন্ত্রী (খৃঃ ১৮৭৭—১৯৪৩) 'খ্রু দেব' এই ছদ্মনামেই সাধারণত লিখতেন। তাঁর কাছে কবিতা কেবল আকাশের চাঁদ, বনের পাখি আর মলয়ানিল সমীরণের মৃদু মন্দ হিন্দোল আর নর্ম-সহচরীর গুঞ্জরণ নয়।—কবিতা হলো রাজনীতি, অর্থনীতি বা সমাজনীতিমূলক মত প্রকাশের অন্যতম হাতিয়ার। 'গুপ্তধন', 'অন্ দি ব্রিয়াণ্ড্-কেলগ্ পোয়েট' প্রভৃতি তাঁর কবিতার বইয়ে থাইল্যাণ্ডের নানান সমস্যার রূপ প্রতিফলিত হয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে তরুণ সম্প্রদায় "দেক" কবি-গোষ্ঠী সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন কুমারী কুলশপ্যা রানগ্রুইদি (Miss Kulasapya Runguidi)—এঁর পুরো নাম কুলশপ্যা চিওনরুন্-গোজনা (Cheonroongrojna), ছায়াশ্রী সুস্থরন কি পিৎ, কুমারী নরী নন্দা ওৎনা, বিচিত্র পিন্‌চিন্‌দা, রতন যবোপ্রাপাস (Ratana Yawaprapas) আর স্বদেশী ধনশ্রী চারোয়ান প্রমুখ অনেকেই। এঁরা সকলেই বয়সে তরুণ—দুই-এর কোঠা কেউই অতিক্রম করেন নি যদিও প্রায় একযুগ ধরে এঁরা কাব্যচর্চা করে আসছেন। এঁদের নির্বাচিত কবিতা "চাওক্যায়া নদী"র গীতিকাব্য (লাম্‌নাম্ এবং চাও ফ্যায়া) সঙ্কলিত হয়েছে। এঁদের কাব্যে সমকালীন পরিবেশ, সামাজিক ও বিপর্যয়ের প্রচ্ছন্ন জের—হতাশা ও অতৃপ্তির সুর, বিশেষ করে অতীতের ফেলে-আসা গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির জন্য আকুলতার

সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী কিংবা অন্তরের অন্তর-গূঢ় মনবিকলনের হদিস রাখতে এঁরা পিছুপা নন। 'বাস্তব' সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে এই সব তরুণ লেখক সম্প্রদায় শুধু বাস্তবপন্থীর মুখোসটাই সাড়ম্বরে বরণ করে নিয়েছেন। তাঁদের 'পলায়নী' সাহিত্য-মুকুরে আসল মানুষের বা সমাজের প্রতিফলন খুব কিন্তু বেশী নেই।

কুমারী কুলশপ্যা রান্‌গ্রুইদি এঁদের মধ্যে বিশেষ প্রতিভাশালিনী। তাঁর কাব্যে একক নিঃসঙ্গ বিরহ-কাতরতার সকরুণ প্রতিচ্ছায়া পরিলক্ষিত হয়। তাঁর কবিতায় নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মধ্যেও যেন নিঃসঙ্গতার সুর অনুরণিত। "আমি ভালোবাসি এই স্থান" কবিতায় তাঁর কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবরূপ সুন্দরভাবে যেন ব্যাপ্ত। এই কবিতাটির কয়েকটি কলি বাংলা অনুবাদে প্রয়াস পেলাম:

আমি ভালোবাসি গ্রহ তারা চাঁদ
আর বন্ধুময় অসীম আকাশ
আমি ভালোবাসি মৃদু আন্দোলিত
ধানের সোনালি ক্ষেত
ভালোবাসি দূর হোতে ভেসে-আসা রাখালের বাঁশী।
ভালোবাসি সোনামাখা রোদ আর আকাশের আলো।

কিন্তু জীবন রহস্যময়—
তবু কেন বার বার লাভ করি ব্যথা ও বেদনা —
পুঞ্জীভূত অসন্তোষ।
অশরীরী কায়াহীন ছায়াদের গোপন সংগোপন
দীর্ঘশ্বাস ওই বুঝি কানে এসে লাগে
সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে চিত্ত মোর,
নিয়ে চলে মোরে বুঝি আর কোথা—
অন্য কোনো লোকে।

পূর্বজন্মার্জিত সুকৃতির কোনো ফল লাভ করে
থাকি যদি কভু
আমি যেন চিরকাল প্রিয় মোর এই রম্যস্থানে
করি বিচরণ।
নতুন প্রেরণা যেন করি লাভ অশরীরী
প্রেতছায়াদেব কাছে
যাহাদের ভয়ে আমি আজ ভীত শঙ্কাকুল।

'ক্ষীণ দৃষ্টি'র কবি প্রেম ছায়ার পুরো নাম হিজ হাইনেস প্রিন্স প্রেম পুরোচ্ছত্র। জন্ম ব্যাঙ্ককে ১৯১৫ সনে। শিক্ষা-দীক্ষা ইংলণ্ডে। ফিরে এসে কিছুকাল চুলালংকরন ও থম্মাসাত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তাঁর 'যাদুকরী পদ্ম' (ম্যাজিক লোটাস), 'বিশ্বপরিক্রমা (ওয়ার্লড টুব), 'খুন্‌চ্যাঙ্‌খুন্‌ পান' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রেম ছায়াব একটি কবিতা ঃ

ক্ষীণ দৃষ্টি ॥

আমার চোখের দৃষ্টি আজ ক্ষীণ
বিশ্ব আমার কাছে তাই
মনে হয় যেন দূর বহু দূর
দেখে তাই মনে হয় কৃত্রিমতা ময়।
পৃথিবী রয়েছে কী এখনো সবুজ,
নীলাকাশ ধূসর পাণ্ডুর
কত রঙ্, কতছায়া, বর্ণাঢোর রেখাময় রক্তরাগ
অস্পষ্ট রহস্যময়
আজ ঠেকে যেন চোখে।
অরূপ আমার চোখে পড়ে না ধরা
ধূসর আবরণে চোখ দুটি করেছে আচ্ছাদন
সব কিছু করেছে একাকার।

তাই বলি আমারে কর না করুণা,
আমার চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ বলে তাই
অজ্ঞাত অজানা এক বিশ্ব নিখিল
চোখে মোর দিয়েছে ধরা।

তরুণ মহিলা-কবি কুমারী নরী নন্দারত্না কবিতায়ও প্রকৃতি-প্রীতির অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতা 'সমুদ্রের প্রতি'। এই কবিতায় তিনি দেখিয়েছেন সব আশা-আকাঙ্ক্ষা—পার্থিব সম্পদাদি পরিত্যাগ করে "দাও ফিরে সে অরণ্য—" নীতি অনুসরণ করে যদি অনন্ত অপার প্রকৃতির স্নেহশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় করা যায়, তাহলে পরিণামে মানুষের আর বুঝি কোনো খেদোক্তি থাকে না।

বিচিত্র পিন্‌চিন্দর (ছদ্মনাম—'ছেসদ বিচিত্র' নামে তিনি লিখে থাকেন) কবিতায় এই ভাবালুতার মাত্রাধিক্যতা তেমন নেই। তিনি সাংবাদিক। সংবাদপত্রের সঙ্গেই জড়িত। সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে কবিতা লিখতে ভালো বাসতেন। 'পারিষদ নও তুমি' কবিতায় তিনি দেশের অতীত ও বর্তমান বিধি-ব্যবস্থার জ্বালাময়ী প্রতিবাদ করেন। রতন জব প্রপাস তাঁর অনেক কবিতায় থাই নারীদের শাশ্বতী মহিমা অকপটে কীর্তন করেছেন—বিশেষ করে তাঁর "ধর্মনিষ্ঠা"—কবিতাটিতে। শ্রীমতি প্রাকিল্ চুম্‌সাঈ (Mrs. Choomsai) অথবা ডঃ লোয়াঙ সুরিয়াবঙ্ (Dr. Laung Suriyabong) প্রমুখ অপেক্ষাকৃত তরুণ কবিরা তাঁদের বিবিধ কাব্য-গ্রন্থে থাই সাহিত্যের সাম্প্রতিক যুগকে সুন্দরভাবে প্রকটিত করেছেন।

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

দ্বীপময় ভারত : আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ভারত ও ইন্দোচীন : ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী।
জাভা ও বলির নৃত্যগীত : শ্রীশান্তিদেব ঘোষ
থাইল্যাণ্ড ইটস্ পিপল : সোসাইটি : কালচার :
সম্পাদক : ওয়েনডেল ব্লানচার্ড
"ইউনাইটেড এশিয়া" পত্রিকা : ১২খণ্ড ২য় সংখ্যা, ১৯৬০

ফিলিপাইন সাহিত্য

ছোট একখানি চিঠি। তারই দীর্ঘ কাহিনী :

গ্রাম্য এক যুবক রাজধানী ম্যানিলায় পৌঁছে লিখেছিল তার কৃষাণ বাপকে।

বাবা :

নিরাপদে আমি এসে পৌঁছেছি। আমাব জন্য তুমি একটুও ভেব না। ম্যানিলা শহর ভারি অদ্ভুত। এখানে এমন সব তাজ্জব জিনিস আছে যা আমাদের গাঁয়ে কোথাও পাবে না। দেখলে সত্যি অবাক বনে যেতে হয়। তোমারও ঠিক তাক্ লাগবে।......

রাজধানীর ডাকঘরের ছাপ নিয়ে দু'ছত্র এই চিঠিখানি এসে পৌঁছেছিল ফিলিপাইনের এক দূব পল্লীতে। অজ পাড়াগাঁ। অক্ষর-পরিচয় ছিল না কারও। চাষী বাপের তো নয়ই। কাজেই মাতৃ-ভাষায় লেখা পত্রখানি পড়ে শোনাবার একটিও লোক মিলল না সারা গাঁয়ে কিংবা আশেপাশে কোথাও। গাঁয়ের পাদ্রীসাহেব অবশ্য লেখাপড়া জানা লোক। কিন্তু তাঁর হদিস পাওয়া গেল না। ধর্ম প্রচারের কোনো কাজে নাকি গেছেন তিনি কোথাও। এখন আর সাক্ষাৎ মিলবে না। এদিকে বর্ষা নেবে এলো। চাষ-বাসের কাজ শুরু হলো। ছেলের চিঠি পড়িয়ে নেবার জন্য ধরনা দিয়ে বসে থাকলে কি চলে? তারপর ক্ষেতখামারের কাজকর্ম যখন সারা হলো, তখন শুরু হলো প্রবল বন্যা। নানান জায়গায় ঢু মেরেও সে বছর আর পড়া হলো না ছেলের চিঠিখানা। নতুন বছর ফিরে এলো। নানান ঝামেলার মধ্যে এবারও আর তা পড়ান হলো না চিঠিখানা। যখন তার পাঠোদ্ধার হলো তখন আর তার প্রয়োজন ছিল না। কেননা, তার আগে অন্য আর এক লোকে গিয়ে পৌঁছে গেছে

ছেলেটা! শহর থেকে খবর এলো, এক দুর্ঘটনায় মারা গেছে বৃদ্ধের ছেলেটি।

চার শ' বছরের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের এমনই শোচনীয় অভিশাপ! মাতৃভাষায় লেখা একখানি চিঠি পড়ে শোনাবার একটাও লোক জুটল না সারা গ্রাম উজাড় করে ফিলিপিনো এক বৃদ্ধ কৃষককে।

এটা অবশ্য নিছক একটি গল্প। লেখকের মনগড়া কাহিনী। (লেখকের নামঃ কার্লস বুলোসন [Carlos Buloson]। আধুনিক ফিলিপাইন সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী ও কবি। এ গল্পটি বাংলা সাহিত্যেও অনূদিত হয়েছে)। তা হলেও এ গল্পটির মধ্যে একালের ফিলিপাইন সাহিত্যের মসীময় একটা দিক ফুটে ওঠে। ফিলিপাইনের জাতীয় সাহিত্য ঔপনিবেশিক শাসক-শক্তির জাঁতাকলে পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে নি। স্পেনীয় 'হারমাদ্'দের দৌলতে তারা আপনার জাতীয় সত্ত্বা ভুলে গিয়ে স্পেনীয় ভাবধারায় দীক্ষিত হয়। তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ক্রমশ প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। বৃহত্তর বিশ্বের সঙ্গে পরিচয়ও ঘটে অবশ্য। কিন্তু মাতৃভাষা ভুলে ফিলিপিনোরা বিদেশী স্পেনীয় ভাষার অনুশীলনে মন দিল। সাহিত্য পেল তাতে নতুন রূপ। পূর্বে সাহিত্যের উপাদান ছিল কিছুটা গ্রাম্য-গীতি, গাথা, উপকথা; খানিকটা প্রবাদবাক্য ও ধাঁধা (যা তুক্তাক্ আর পূজা-অর্চনার সময় অগ্নিকুণ্ডলীর চারদিকে দলবদ্ধ হয়ে সার বেঁধে নেচে নেচে গীত হতো)। স্পেনীয়দের সংস্পর্শে ফিলিপিনোরা জাতীয় ভাষার কদর ভুলে গেলেও নতুন করে স্পেনীয় ভাষার সাহিত্য সৃষ্টি করতে লেগে গেল। জোস্ রিঝল, ফারনাণ্ডো গুয়েররেরো, সিসিলিও এপ্স্টল, রাফায়েল পালমা, থিওডোব এম. ক্যার্ল প্রমুখ লেখকরা স্পেনীয় ভাষায় সেরা ফিলিপাইন সাহিত্য রচনা করে গেছেন। ঔপন্যাসিক জোস্ রিঝল-এর 'নোলি মে টারগেরে' (Noli Me Targere) ও 'এল্

'ফিলিবুস্টারিস্মো' (El Filibusterismo) প্রসিদ্ধ উপন্যাসগুলি ফিলিপাইনের বিভিন্ন জাতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ইউরোপের অনেক ভাষাতেও উপন্যাস দুখানি ভাষান্তরিত হয়েছে। ফ্রান্সিস্কো বালাগ্তাসি বাল্তাঝার জাতীয় তাগালগ্ ভাষার কবিদের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন অধিকার করে আছেন। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে তিনি বহু কবিতা, গান ও নাটক রচনা করেন। তাঁর 'ফ্লোরেন্‌টি এ্যাট্ লরা' তাগালগ্ ভাষার অপূর্ব এক মহাকাব্য। তাঁর এই কাব্যখানি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের অবশ্য পাঠ্যপুস্তকও। ইংরেজীতে এটি অনূদিত হয়েছে। কবি ও নাট্যকার অপেক্ষা দার্শনিক বলেই তিনি সবিশেষ পরিচিত ফিলিপিনোদের নিকট। কাজেই দেখা যায়, স্পেনীয় আমলে জাতীয় ভাষা তাগালগে উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য যে কিছু সৃষ্টি হয় নি, একথা জোর করে বলা চলে না।

উনবিংশ শতকের শেষ পাদ পর্যন্ত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে স্পেনীয় শাসন কায়েম থাকে। ১৮৯৮ সালে প্যারিস চুক্তির পর, মার্কিন শাসন-ব্যবস্থা ফিলিপাইনে পুরোপুরি জেঁকে বসে। ইংরেজী চর্চা ও ইংরেজী ভাষার প্রসার শুরু হয় তখন থেকে। নারিকেল গাছ আর আমবাগানের সুশীতল ছায়ার মধ্যে মার্কিন সৈন্যরা ভাঙা ভাঙা স্থানীয় ভাষার মারফত যে ইংরেজীর প্রচলন শুরু করে, কালে তাই রপ্ত করে নেয় ফিলিপিনোরা। সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলে সাহিত্যও। এ সাহিত্যসৃষ্টি অবশ্য বেশী দিনকার নয়। এখনও নবীন। যাঁরা মনে করেন, বিদেশী ভাষায় প্রাণ খুলে সাহিত্য-রচনা করা চলে না, আধুনিক অ্যাংলো-ফিলিপিনো সাহিত্য বুঝি তার ব্যতিক্রম। কার্লস্ বুলোসন-এর সার্থক রচনা 'আমার পিতার হাসি', স্টীভেন জেবেল্লনার 'ভোরের আলো না দেখে' আর জোস্ গারসিয়া ভিলার কবিতা—প্রমাণ দেবে এই সম্ভাবনার। উপন্যাস বা নাটক অপেক্ষা গীতি-কবিতা ও ছোট গল্পেই নতুন এই সাহিত্য অধিকতর রস-সমৃদ্ধ। তখনকার রাজধানী ম্যানিলা ছিল এই সাহিত্যগোষ্ঠীর প্রধান ঘাঁটি। দক্ষিণ অঞ্চলে—

বিশেষ করে তুমাগুয়েতি, চেবু, আইলোইলো প্রভৃতি শহরে এর জনপ্রিয়তা ছিল বেশী। নতুন এই ইংরেজী সাহিত্যের পাঠকরা অনেকটা হয়ে পড়েছিল মার্কিন-ঘেঁষা। রুচি তাদের হলিউড-মার্কা। সমারসেট্ মম্, হেমিংওয়ে ও স্টেইনবেক প্রভৃতি লেখকদের লেখার সঙ্গে যতখানি তাদের পরিচয় ততখানি পরিচয় জাতীয় ভাষার সঙ্গে নয়। অবশ্য কারণ আছে! 'দি রেজর্স্ এড্জ', 'দি স্নোস অফ কিলিম্যানজেরো' ও 'গ্রেফস অফ্ রথ্' প্রভৃতি রসোত্তীর্ণ রচনার পাল্টা একখানি বই স্থানীয় ভাষায় কোথায়?

ফিলিপিনো পাঠকদের একটা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতো। ছাপার অক্ষরে হাতের কাছে যা কিছু পাবে গোগ্রাসে তা তারা পাঠ করে নিতে চায়। রহস্যপূর্ণ উপন্যাস কি কবিতার বাদবিচার বড় একটা করে না। সাহিত্য ও সাহিত্যিকের পক্ষে এটা অবশ্য সুলক্ষণ। যে দেশে অধিকাংশ লোকেরই ডাল-ভাত জোটে না, থাকতে হয় যাদের বাঁশ আর কাঠের খুঁটি পুঁতে মাচা বেঁধে, আর যাদের শহর-গুলো ঘিঞ্জি এবং দারিদ্র্যক্লিষ্ট, তাদের পক্ষে বই কিনে পড়া শুধু বিলাসিতা নয়, উপরন্তু গ্রন্থ-প্রীতির পরিচায়কও বটে। ছাপার হরফের কদর তাদের কাছে সত্যি অনেকখানি। তিন পুরুষ আগেকার স্পেনীয় ভাষায় কোনো বই হলে ত কথাই নেই, এমন কি হালের ইংরেজী ভাষার কোনো বই পেলে তাকেও দেবতুল্য জ্ঞান করে থাকে ফিলিপিনোরা। কবি জোস্ গারসিয়া ভিলার কাব্য যতখানি পাঠ করা হয় না, তাঁর সম্পর্কে হৈ-হল্লা করা হয় তারও বেশী। তাই হয়তো, ম্যানিলায় স্থানীয় কোনো কথাশিল্পীই মনে মনে এই ভরসা পোষণ করেন না যে, লিখেই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হবেন। সেকালের কবিদের দৈনন্দিন দুঃখ-দুর্দশার এমনি কত কাহিনী লেখা আছে ফিলিপিনো পাঠ্যপুস্তকের প্রতি ছত্রে ছত্রে। ফিলিপিনো পাঠকরা বই কেনেন ঠিকই। কিন্তু বেশীর ভাগ হলো তা পাঠ্যপুস্তক জাতীয়। নাটক-নভেলের ক্রেতা রীতিমত কম। বইএর দোকানেও,

বইগুলি সাজানো হয় পাঠ্যপুস্তক, বিদেশী সেরা কাট্‌তি বই, উপন্যাস ও বিবিধ শ্রেণীর পর্যায়ে। পাঠ্যপুস্তকের সামনে ভীড় যতখানি, নাটক-নভেলের কাছে ততখানি যদি হতো তবে কথাই ছিল না। বছর কয়েক আগে প্রগতিশীল জনৈক প্রকাশক আধুনিক এক গল্প-সঙ্কলন প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অপূর্ব সঙ্কলনখানি বের হবার পর এমনি তার কাটতি হয় যে, ভদ্রলোক ছাপাখানার বিল পর্যন্ত নাকি পরিশোধ করে উঠতে পারেন নি! এর কারণ হিসাবে অবশ্য বলা যায়, অধিকাংশ ফিলিপিনো পাঠকই খোঁজেন স্ট্যানলি গার্ডনার বা মিক্কে স্পিলেনের উপন্যাসের রহস্যঘন বিষয়বস্তু। স্থানীয় গুরুগম্ভীর সাহিত্যে তাঁদের অরুচি।

আধুনিক কাল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে থেকে আধুনিক ফিলিপাইন সাহিত্য-জগতে এক নতুন জোয়ার আসে। এই সময় বহু ভালো ভালো বই —যে বই বহুকাল পাঠকের মনে গভীর দাগ রাখবে, টিকে থাকবে ধোপে—প্রকাশিত হতে থাকে। 'ফিলিপাইন গ্রন্থ-সংস্থা' ও 'ফিলিপাইন লেখক-সঙ্ঘে'র উদ্যোগে কবি গারসিয়াভিলার এক কবিতা সঙ্কলন ও ম্যানুয়েল ই. আরগুইলা আর আরতুরো বি. রোতর-এর এক ছোটগল্প-সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। সরকারী কর্তৃপক্ষও নতুন সাহিত্য প্রকাশে উৎসাহ দিতে থাকেন। ১৯৪০ সালে 'প্রথম কমনওয়েলথ সাহিত্য প্রতিযোগিতা'র জন্য কর্তৃপক্ষ যে পাণ্ডুলিপি আহ্বান করেন তাতে বিজয়ী প্রতিযোগীদের চল্লিশ হাজার 'পাসে' (ফিলিপাইন রৌপ্যমুদ্রা—আমাদের প্রায় তিন টাকার সমান) পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ১৯৪১ সালেও এই প্রতিযোগিতা চালু থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি নষ্ট হয়ে যায় বিগত যুদ্ধে।

এই সময় হেমিংওয়ে ও এর্‌স্কিন্‌ কল্ডওয়েল বিশ্ব-ভ্রমণে বেরিয়ে ম্যানিলায় এসে উপস্থিত হন। আমেরিকার এই দুইজন সেরা

সাহিত্যিকের আগমনে স্থানীয় লেখকদের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। ফিলিপিনো লেখক ও শিল্পীরা কল্ডওয়েলের চাইতে হেমিংওয়ের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে বিশেষ করে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। 'সত্যি করে লেখাই হলো মূল কথা। দেশ কিংবা ভাষায় খুব একটা এসে যায় না'—হেমিংওয়ের এই বাণী ফিলিপাইন লেখক-সঙ্ঘের সভ্যদের নতুন করে প্রেরণা জোগাল। জাতীয় ভাষার লেখকরাও পেলেন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

জাপানী অবরোধকালে সরকারী সেন্সর বোর্ডের দৌরাত্ম্যে ইংরেজীতে আর তেমন কথা-সাহিত্য সৃষ্টি হয় নি। তবে জাতীয় তাগলগ্ ভাষার কদর তখন রীতিমত বেড়ে ওঠে। কিন্তু তা বেশীদিন বজায় থাকল না। 'বৃহত্তর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সহ-সমৃদ্ধি অঞ্চলের' পতনের পর ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ত্রি-ভাষা সাহিত্য রচনার অবসান ঘটে।

যুদ্ধ যতদিন চলতে থাকে ততদিন ইংরেজীতেই লেখাপড়া কাজ-কারবার সব চালু থাকে, যদিও ম্যানিলা থেকে তেমন কিছু প্রকাশিত হয় নি। যুদ্ধের সময় 'জাবেলনা'র 'ভোরের আলো না দেখে' রচনা করেন। জুয়ান ক্যেব্রেরস লামা (১৯৫৩ সালের এক মোটর দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান) তাগলগ্ ভাষায় লিখতেন, তবু ইংরাজীতে তিনি 'ট্রিলজি' এক উপন্যাস লিখবেন জানিয়েছিলেন। যুদ্ধোত্তর ফিলি-পাইনের পটভূমিকায় লেখা তাঁর উপন্যাস 'দিস্ বারানগে' যুদ্ধের কিছু পরে প্রকাশিত হয়। আমেরিকাতেও এ সময় কিছু কিছু অ্যাংলো-ফিলিপিনো সাহিত্য রচিত হতে থাকে। কার্লস বুলসন-এর 'আমার পিতার হাসি', গারসিয়া ভিলার 'এসেছো, আমি এখানে' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

পনেরো-ষোলো বছরের স্বাধীনতার পরও (৪ঠা জুলাই, ১৯৪৬ সালে, ফিলিপাইন স্বাধীনতা লাভ করে) জাতীয় ভাষা তাগলগ্ কিংবা প্রাচীন স্পেনীয় ভাষায় তেমন স্মরণীয় সাহিত্য সৃষ্টি

হয় নি বলা চলে। কিন্তু ইংরেজীতে সমানে বই বেরুচ্ছে। স্যালভেডর পি. লোপেঝ-এর প্রবন্ধ 'সাহিত্য ও সমাজ', এ. বি. রোতর-এর ছোটগল্প 'ক্ষত ও ক্ষতচিহ্ন' এবং ম্যানুয়েল ই. আরগুইলার গল্পের বই 'আমার ভাই লিও আনলো ঘরে এক বউ' ও অন্যান্য গল্প এই সময় আত্মপ্রকাশ করে। সাহিত্য-রসিক পাঠকসমাজেও তাদের সমাদর বেড়ে যায়। ১৯৪০-৪১ সালে জাতীয় সাহিত্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলি কিন্তু দীর্ঘকাল অপ্রকাশিত থেকে যায়, পাঠক কিংবা প্রকাশকের উৎসাহের একান্ত অভাবে।

বারোয়ারী উপন্যাসের মতো 'দাগতুংগান' নামে তাগলগ্ ভাষায় অভিনব এক উপন্যাস রচনার ধুমও এ সময় পড়ে যায়। পূর্ব-পরিকল্পিত কোনো এক কাহিনী অবলম্বন করে দুই বা ততোধিক লেখক লিখে চলেন এই উপন্যাস। প্লটের অভিনবত্বে ও ঘটনা-বিন্যাসের লিপিচাতুর্যে এই ধরনের হালকা বারোয়ারী উপন্যাস পাঠকমহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই শ্রেণীর উপন্যাসের কাটতি হু হু করে বেড়ে যায়। সৎ সাহিত্যের সমাদর কমতে থাকে। এ সময় তাগলগ্ ভাষায় সিনেমা ও হালকা ধরনের পত্রিকার সংখ্যাও ফেঁপে ওঠে। অধিক পারিশ্রমিকের লোভে অনেক লেখকই তখন এই শ্রেণীর সিনেমা ও হালকা ধরনের পত্র-পত্রিকার দলে ভিড়ে যান ও নিয়মিতভাবে তাতে লিখতে থাকেন। ভুলে যান একেবারে সৎ সাহিত্যসৃষ্টির কথা। আর যাঁরা ওঁদের দলে ভিড়তে পারলেন না বা চাইলেন না, তাঁরা আশ্রয় খুঁজলেন পরিশেষে স্কুল-কলেজের নির্ঝঞ্ঝাট অধ্যাপনা বৃত্তিতে। সাহিত্যসৃষ্টি বুঝি মাথায় উঠল চিরকালের মতো।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের গণ্ডি ডিঙিয়ে তার সাহিত্য—বিশেষ করে তার কবিতা এশিয়ার দেশ-দেশান্তরে আজ তেমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। তবু বিয়েনভেনিডো এন. সান্ত্রো (Bienvenido N. Santros)-র একটি কবিতার বাংলা তর্জমা করার চেষ্টা করা গেল। কবিতাটির নাম 'উত্তপ্ত ধাতব যন্ত্র' ঃ

রুটি রোজগারের পথ আমার
ছুটে চলেছে যেন শিখরের পানে
ঘাসের ডগাকে করে আহ্লাদ
চলেছে যেন
তীব্র বিদ্রূপ আর পচা নাড়িভূড়ির
পুতিগন্ধের মাঝখানে।

এ হলো শুধু আমারই পথ
হাত দুটি তাই জোড়া,
চোখ দুটির কালো উপান্তে
ঝিক্‌মিক্‌ করছে আগুনের চাঁদোয়া।

সোনালি মুহূর্তগুলি হৃদয়তলে রয়েছে সংগোপনে
আর হাত দুটি যদি চায় ধরতে মাঠের সবুজতা
আর মনটিও যদি চায় ধরতে শিখর চূড়াটি
জীবনের ক্ষণ উঠে যায় বুঝি সৌন্দর্যমূর্ছনায়।
কিন্তু কান্না—সে যে শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়
জ্বালাময় সুর।
সাগরের পার থেকে ভেসে-আসা সকরুণ
মর্মভেদি ঘণ্টাধ্বনি।

সময় বহিয়া চলে,
উৎসবের মন্দীভূত দিন
রূপ নেয় কঠোর রূঢ়তা
আর অবশেষে মহাশক্তি আসে নেমে ধুলির ধরণীতে
আর হয় অবসান সকল বিবাদ-বিসংবাদ।

এখানে ফিলিপাইন সাহিত্যের মোটামুটি কিছু আভাস দেবার প্রয়াস পেলাম। ফিলিপাইনের আজকের চেহারাটা অনেকটা স্পেনের ও মার্কিন ধাঁচে গড়া বটে কিন্তু তার প্রাচীন সংস্কৃতির সবটাই একদা

এসেছিল ভারতবর্ষ থেকে। সুমাত্রা এবং জাভার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ফিলিপাইনে গিয়ে পৌঁছেছিল এবং সমাজ-ধর্ম-রাজনীতি প্রভৃতি তার জীবনযাত্রার প্রত্যেকটি দিক নতুন করে গড়ে তুলেছিল। প্রাচীন ভারতের পুরাণের কাহিনী আর গল্প এবং আমাদের সাহিত্যের অনেকখানি অংশ ফিলিপিনোরা একদা আপনার করে নিয়েছিল। এদের ভাষায় সংস্কৃত শব্দ অনেক আছে। তাদের শিল্পকলার উপরে ভারতীয় প্রভাব খুব স্পষ্ট। শুধু তাই নয়, তাদের আইন ও কারু-শিল্পের উপরও ভারতীয় প্রভাব বিশেষ করে লক্ষণীয়। পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কারাদিতেও ভারতীয় রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। স্প্যানিয়ার্ডদের তিন শ' বছরের অধিককাল ধরে ফিলিপাইনে রাজত্ব করেছে। আর তাদের শাসন ও শোষণ নীতির ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি চিহ্ন আজ অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে।

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

দি ফিলিপাইনস পাস্ট য়্যাণ্ড প্রেজেন্ট : সি. ওরচেস্টর

'ইউনাইটেড এশিয়া' পত্রিকা : ১২শ খণ্ড : দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৬০

'বুকস্ এ্যব্রড' (কায়ার্টালি) : ১৯৫৪-৫৫

স্প্যান (SPAN) : সম্পাদক : লাওনেল উইগমোর

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা : ১৭শ খণ্ড

দি লাফ্‌ট।ব অফ মাই ফাদার : কার্লস বুলসন

ইণ্ডিয়া য়্যাণ্ড দি প্যাসিফিক : ডঃ কালিদাস নাগ

মালয়, ইন্দোনেশিয়া, বোর্নিও য়্যাণ্ড ফিলিপাইনস :

চার্লস রোবেকুইন (অনুঃ লার্বোডে)

ইরানী সাহিত্য

একই গোষ্ঠীরই দুটি পরিবার।

একদা পথ চলতে চলতে ছড়িয়ে পড়েছিল দুই জায়গায়। মধ্য-এশিয়ার দুস্তর বন্ধুর পথ অতিক্রম করে একদল এসে উপস্থিত হয়েছিল ইরানে। আর সেখান থেকে আর একদল পুবমুখো অগ্রসর হয়ে হিন্দুকুশ পর্বত ডিঙিয়ে আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে এসে উপনীত হয়েছিল সিন্ধু উপত্যকায়। যুগ যুগ ধরে এমনি করে প্রাচীন ইরানী আর বৈদিক আর্যদের মধ্যে বয়ে চলেছে একই রক্তস্রোত—একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ধর্মগ্রন্থ 'আবেস্তা'র ইরানীদের সঙ্গে বৈদিক আর্যদের ছিল জাতি-ধর্ম-ভাষাগত নিবিড় ঐক্য। একই দেব-দেবীর—বিশেষ করে অগ্নির—আরাধনা, সোমরস পান, হোমাদি যাগযজ্ঞের বিবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে মিল ছিল উভয়ের। সংস্কৃত 'সিন্ধু' শব্দ আবেস্তিক 'হিন্দু'তে, পুরনো ইরানী বা পারসীতে 'হিন্দু' আর আধুনিক পারসী বা ইরানীতে 'হিন্দ' শব্দে হয়েছে রূপায়িত। তেমনি সংস্কৃত 'ভূমি' আবেস্তিক 'বুমি', পুরনো পারসীতে 'বুমি' আর আধুনিক পারসীতে হয়েছে 'বুম'। সেকালের ইরানী ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের মূলগত ঐক্য কতখানি ছিল এখান থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়। সেকালের ইরানীদের কিছু বংশধর পশ্চিম ভারতেও এসে ছিটকে পড়েছিল এক সময়। সপ্তম শতকের প্রথমদিকে দুর্ধর্ষ আরবরা যখন পারস্য দেশ আক্রমণ করে তাকে কুক্ষিগত করে নেয়, আর সমগ্র জাতিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে তোলে, তখন কিছু পারসীক ধর্ম বাঁচিয়ে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তারাই এখন ভারতের বাসিন্দা পারসী নামে পরিচিত। প্রাচীন ইরানের সঙ্গে

ভারতের ঐতিহাসিক যোগাযোগ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রথম থেকে।

শুধু ঐতিহাসিক যোগসূত্র নয়, ভাষা ও ভাবগত সম্বন্ধও ছিল অতি কাছের। মোগল আমলে পারসী ভাষা রাজভাষা ছিল বলে, পারসীর অনুশীলন সাধারণ বিদ্যাচর্চার অঙ্গ ছিল। হিন্দুরাও পারসী ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। "বুলবুল-ই-হিন্দুস্তান" চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ ভারতের সুপ্রসিদ্ধ পারসী কবি। আমাদের বাংলা দেশেও একদা পারস্য সাহিত্যের বিশেষ কদর ছিল। হিন্দু-মুসলমান সকলকেই শিক্ষিত অভিজাত বলে পরিচয় দিতে গেলে পারসী ভাষায় পারদর্শী হতে হতো। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বহু বিদ্যোৎসাহী বাঙালীই পারস্য বা ইরানী সাহিত্যের মাধুর্য ও লালিত্যে আকৃষ্ট হয়ে পারসী গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। মোগল আমলে ভীম সেন, সুজন রায় ভাণ্ডারী ও ঈশ্বরদাস মৌলিক পারসী ভাষায় ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করে ইরানী ভাষা বা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করেছেন। আধুনিক কালের সুবিখ্যাত উর্দু কবি ও দার্শনিক ইক্‌বাল পারসী ভাষায় 'আসরার-ই-খুদী' (আত্মার গোপন রহস্য) ও 'পইয়াম-ই-মুশরিক' (প্রাচ্যের বাণী) রচনা করেন।

ইরান নামটি এসেছে আরিয়েন বা আর্যদের 'দেশ' শব্দ থেকে। দীর্ঘকাল ধরে গ্রীক বা পাশ্চাত্য জগতের নিকট ইরান পরিচিত ছিল 'পারস্য' নামে ঃ আর ভাষা তার 'পারসী'। পার্স (Persa—গ্রীক Persis) ছিল সেকালের ইরানের এক প্রদেশ। তা থেকে উৎপত্তি হয়েছে পারস্য নামের। ১৯২৭ সালে পারস্যেরই আবার নতুন নামকরণ হয়েছে ইরান বলে। প্রাচীন পারসীক ভাষা মধ্য যুগের পারসীক (পহলবী বা সামানীয়) আর আধুনিক পারসীক (ফারসী) ভাষার জনক।

সেকালের ইরানভূমি এখনকার পারস্য বা ইরান, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজিকিস্তান ও কিরঘিজ-

স্তানের অংশবিশেষ আর উত্তর-পশ্চিম কাস্পিয়াম থেকে আরব সাগরের তীরবর্তী বিস্তীর্ণ তৃণভূমি পর্যন্ত ছিল বিস্তৃত।

প্রাচীন ইরানীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার ধর্মগ্রন্থ 'জেন্দাবেস্তা'। এই গ্রন্থ ধর্ম-প্রবর্তক জোরাথুস্ত্রের লেখা বলে বলা হয়ে থাকে। জোরাথুস্ত্র ব্যাকট্রিয়ায় (পশ্চিম ইরান) জন্মগ্রহণ করেন বলে প্রকাশ। তিনি ছিলেন স্পিতম পরিবারভুক্ত। জোরাথুস্ত্রের জন্মকাল সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। তবে কারও কারও মতে খৃষ্টপূর্ব হাজার বছর আগে তিনি তাঁর ধর্মগ্রন্থ 'আবেস্তা' রচনা করেন। জেন্দ ও আবেস্তাকে আলাদা দুখানি গ্রন্থ বলা যায় না। জোরাথুস্ত্র রচিত 'আবেস্তা' ইরানীরা ঠিক বুঝে উঠতে না পারায় জোরাথুস্ত্র তাঁর একটি ভাষ্য রচনা করেন। এই ভাষ্যই হলো 'জেন্দ'। 'জেন্দ'-এরও আর একটি ভাষ্য রচিত হয়েছিল, এর নাম 'পাজন্দ'। জোরাথুস্ত্রের মৃত্যুর পর প্রাচীন ইরানীরা পাজন্দেরও নতুন এক ভাষ্য তৈরি করেছিলেন। এর নাম 'ইয়াজদহ্'। পহলবীতে জোরাথুস্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থের নাম 'আভিস্তক ভা জেন্দ' (Avistak Va Zand)। কাজেই দেখা যায় 'আবেস্তা' হলো জোরাথুস্ত্র ও তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের রচিত ধর্মগ্রন্থ; জেন্দ হলো আবেস্তার সহজ টীকা। আর এই টীকা-টিপ্পনীও সাধারণ লোকে বুঝে উঠতে না পারায়, 'শাসনীয়' যুগের পুরোহিতশ্রেণী পহলবী ভাষাতে তার এক সহজ অনুবাদ লিপিবদ্ধ করেন। সাধারণের কাছে এই গ্রন্থ 'জেন্দ' নামে পরিচিত।

প্রাচীন ইরানী কবি ও দার্শনিক ঋষি জোরাথুস্ত্র তাঁর অমর গ্রন্থ 'আবেস্তা'য় একমেবাদ্বিতীয়ম বা "লা আল্লা ইল্লাল্লহা"র মারফত তাঁর ধর্মমতের দর্শন রূপ-প্রচারে প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর প্রচারিত এই ধর্ম-মতই প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক কবি নীটশে-কে (Nietzche) তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'দাস্ স্প্যাক্ জোরাথুস্ত্র' (Thus Spake Zorathustra) রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ভাষার দিক

হতেও 'আবেস্তা'-র ভাষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেননা পণ্ডিতদের মতে 'আবেস্তা'-র ভাষা বৈদিক সংস্কৃতের সহোদরা-স্থানীয়।

জোরাথুস্ত্রই আমাদের প্রাচীন ইরানীয় কবি এবং গথিক সুর ও ছন্দের সঙ্গে যদিও আমরা অভ্যস্ত নই, কিন্তু এতেও বেশ তাল মাত্রা ছন্দ আছে বলে মনে হয়। নিম্নে গাথার প্রথম শ্লোকটি প্রদত্ত হল ঃ

"অহ্‌য় ইয়স নেমংঘহা—Ahye yasa nemangha
উস্‌ তানজস্‌তো রফেদ্রহয়া—Ustanazasto rafedrahya
মন্যেউশ্‌ মজ্‌দা পৌররীম্‌—Manyeush mazda pourvim
স্পেন্‌তহয় অশ রীসপেং শ্যওথনা—Spentahya asha vispeng shyaothna
বন্‌ঘেউশ্‌ খ্রতুম্‌ মনংহো—Vagheush khratum manangho
(ই)য় খ্‌শ্নেবীশ গেউশ্‌চ উর্‌বানেম্‌—Ya khshnevisha geushcha urvanem

["হে আমার প্রভু, অদৃশ্য দয়ালু পরমাত্মা! হস্ত প্রসারিত করিয়া বিনয়ের সহিত তোমার নিকট আমি প্রার্থনা করি; অনুগ্রহ করিয়া এই আনন্দের মুহূর্তে আমাকে কর্মে সততা (এবং) সৎ মনের জ্ঞান দান কর, যাহাতে জীবাত্মাতে আনন্দ বর্ধন করিতে পারি।"]
(Dinshah, J. 'Irani Poets of the Pahlavi Regime,' P.I.)

ডক্টর সুকুমার সেন লিখেছেন, "জরথুস্ত্র কর্তৃক প্রবর্তিত নীতিমূলক ধর্ম অবলম্বন করিবার পূর্বে ঈরানীয় আর্যেরা ভারতীয় আর্যদের মতই যজ্ঞপরায়ণ এবং দেবোপাসক ছিল। আবেস্তার মধ্যে এই প্রাচীন ধর্মের চিহ্ন কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। জরথুশ্‌ত্রীয় ধর্মগ্রহণের ফলে ঈরানীরা দেব-বিদ্বেষী হইয়া পড়িল, এবং দেব (বা দএব) শব্দের অর্থ দাঁড়াইল 'অপদেবতা'। ফলে আর্যদিগের অনেক প্রাচীন দেবতা (নসত্য, ইন্দ্র* ইত্যাদি) অপদেবতা হইয়া গেল। তবে দুই একটি দেবতা (যেমন মিত্র. অর্যমা এবং সোম) তাঁহাদের আসন অক্ষুণ্ণ

রাখিতে পারিয়াছিলেন। আবেস্তায় 'দের' শব্দের অর্থাবনতি ঘটিয়াছে, আশ্চর্যের বিষয় এই যে সংস্কৃত সাহিত্যেও ঠিক অনুরূপ ভাবে 'অসুর' শব্দের অর্থবিপর্যয় হইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশের আমরা অসুর শব্দ পাইতেছি বরুণ প্রভৃতি প্রধান দেবতার বিশেষণ হিসাবে। আবেস্তায়ও দেখি ঈশ্বরের নাম হইতেছে অহুর মজ্‌দা অর্থাৎ অসুর মেধাঃ 'মহৎ জ্ঞানস্বরূপ'। কিন্তু অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যে এবং সংস্কৃত সাহিত্যে 'অসুর' শব্দের অর্থ হইল 'দেব-বিরোধী, ব্রাহ্মণ্যদ্বেষী'। সম্ভবতঃ 'দেব' এবং 'অসুর' শব্দের এই অর্থবিপর্যয়ের মধ্যে ঈরানীয় এবং ভারতীয় আর্যদের মধ্যে প্রচণ্ড ধর্মবিরোধের ইতিহাস লুক্কায়িত রহিয়াছে।"

[ভাষার ইতিবৃত্ত' দ্বিতীয় সঙ্করণ, পৃঃ ৬৩]

আবেস্তার প্রাচীন যে অংশটুকু জোরাথুস্ত্রের নিজের রচনা বলে জানা যায়, তাঁর নাম 'গাথা'। আবেস্তার অনেক অংশ আলেকজান্দারের পারস্য আক্রমণের সময় নিঃশেষে ধ্বংস হয়ে যায় বলে প্রকাশ। নবম শতাব্দীর পহলবী ভাষায় ধর্ম-বিধান 'দিনকদ' থেকে জানা যায়, 'আবেস্তা'-'গাসাজিক' (প্রধানত ধর্ম-বিষয়ক), 'দণ্ডিক' (আইন-সংক্রান্ত), 'হাতকমান-শরিফ' (বৈজ্ঞানিক)—এই প্রধান তিন-ভাগে বিভক্ত। গাথাগুলি প্রার্থনা ও স্তোত্রাকারে বিভিন্ন ছন্দে লিপিবদ্ধ। বৈদিক সূক্তের মতো আবেস্তার প্রথম 'গাথা' অহুনাবৈতির ছন্দ গয়ত্রীব অনুরূপ। দ্বিতীয় গাথার ছন্দ বৈদিক ত্রিষ্টুপ ছন্দের মতো। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও আবেস্তার অংশবিশেষ "সাম" এবং যজুর্বেদের সঙ্গে তুলনীয়।

* বেদের 'নাসত্য'কে জোরাথুস্ত্র ধর্মাবলম্বীদের 'নওঙ্‌হৈম্য' এবং ইন্দ্রকে অহ্‌রিমনের (অঙ্‌গ্র মইন্যুশ্‌) সঙ্গে তুলনা করা হয়। ইন্দ্র দেবতাদের দেবতা, আর আহ্‌রিমন্‌ 'দ এবনাম্‌ দয়েব' (অপদেবতার অপদেবতা)। ইন্দ্রকে বেদের বৃত্রহা (বৃত্রহন্তা) ও আবেস্তার বৃথ্রঘ্ন (শত্রুদমনকারী)-র সহিতও তুলনা করা হয়, কিন্তু এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে।

শুধু সাহিত্য নয়, ধর্মবিশ্বাসেও বেদ আর আবেস্তার মধ্যে মিল আর অমিল দুই রয়েছে। ইন্দ্র, মিত্র, যম, অর্যমন, অরমতি, সোম, বায়ু, দেব-দেবীর উল্লেখ 'বেদ' আর 'আবেস্তা' দুই ধর্মগ্রন্থেই পাওয়া যায়। 'বেদে'র 'মিত্র' আবেস্তায় 'মিথ্র' আর জোরাথুস্ত্রের 'যিম' হয়েছে বেদের 'যম'। দেব-দানব, অসুর প্রভৃতি উভয় ধর্মগ্রন্থেই দেখা যায়। তবে ঋক্ বেদের অনেক দেব-দেবী আবেস্তায় দানব বা অপদেবতারূপে কল্পিত হয়েছে। 'ইন্দ্র' প্রভৃতি দেবতা জোরাথুস্ত্রের হাতে বনে গেছে 'দয়েব'—অপদেবতা। 'অহুর' বা অসুরই আবেস্তার প্রধান আরাধ্য দেবতা। জেন্দাবেস্তা থেকে কয়েকটা স্তোত্র উদ্ধৃত করা গেল এই প্রসঙ্গে :

১. "হে দেবগণ, হে অপদেবতা, তোমাদের নীচ মন, নীচ বাক্য, নীচ কার্যের দ্বারা অসৎ ব্যক্তিকে ক্ষমতা দান করিয়া মনুষ্যজাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অনিষ্ট সাধন করিয়াছে।

(Yas, XXXII, 5)

২. হে দেবগণ, (সোমপানে) প্রমত্ত হইতে তোমরা জন্মিয়াছ; মনুষ্যগণকে প্রবঞ্চিত ও বিনষ্ট করিবার বিবিধ ছলা-কলা তোমরা তাহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছ; এই সকলের জন্য তোমরা সর্বত্র পরিচিত। (Yas, XXX, 3)"

[প্রবাসী ; জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩]

আবেস্তা মূলত ধর্মগ্রন্থ। কাজেই বেদশাস্ত্রের মতো তার সাহিত্যিক উৎকর্ষতা যতখানি নেই, ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে ততোধিক।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের প্রথমার্ধে আলেকজান্দার কর্তৃক ইরান বিজিত হয়। আলেকজান্দারের পর ইরান শাসনীয়দের অধিকারে আসে। সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে আরবদের ইরান অভিযান পর্যন্ত চারশত বৎসর ধরে শাসনীয় বংশের অধীনে ছিল ইরান। এ সময় পহলবী সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ লাভ করে যদিও গুটিকয়েক মুদ্রা আর খানকয়েক অনুলিপি ছাড়া তেমন নিদর্শন আর কিছুই পাওয়া

যায় না। পহলবী ভাষা সরকারী ভাষারূপেও মর্যাদা লাভ করে। জেন্দ আবেস্তার মূলানুগ অনুবাদ ছিল পহলবী সাহিত্যের প্রাণ। জোরাথুস্ত্রীয় পুরোহিতশ্রেণী ছিলেন, পহলবী সাহিত্যের ধারক ও বাহক। আবেস্তার অনুবাদ ছাড়া মৌলিক দু-চারখানি ঐতিহাসিক আখ্যান-মূলক কেতাব যে তখন লেখা হয় নি তা নয়। 'খোসরব-ই-কাবাদান ও তার পাইকের কাহিনী', 'আরদাসির-ই-বাবকান', 'শাগিস্তানেব তাজ্জব' প্রভৃতি কিতাব উল্লেখযোগ্য। ফেরদৌসীর সুবিখ্যাত 'শাহনামা'র বহু ঐতিহাসিক উপাখ্যানের ছকও কাটা হয় এসময় পহলবী ভাষায়।

পারসী ভাষায় প্রথম কবিতা বা 'মসনবী' (পর পর দুই পংক্তি ছন্দযুক্ত এক প্রকার কবিতা কে কবে রচনা করেছিলেন এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও, রাজা বহ্‌রাম গুর (খৃঃ ৪২০—৩৮) ও তাঁর প্রিয়া দিলারাম প্রথম পদ্য রচনার সূত্রপাত করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার অনেকের মতে খোস্‌রু পারভিঝ্‌-এর সভাকবি 'বারবদ্'ই প্রথম কবিতা রচনা করেন। প্রকাশ, শাবদিজ্‌ নামে রাজার খুব প্রিয় এক ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটি রাজার এতই আদরের ছিল যে, তিনি তার কোনো অঘটনের কথা ভাবতেই পারতেন না। পাছে কেউ ঘোড়াটি সম্পর্কে কোনো দুঃসংবাদ জানায়, তাই তিনি ঘোষণা করলেন, যে এই সংবাদ জানাবে তাকে চরম দণ্ড পেতে হবে। অমর কেউ নয়। শাবদিজ্‌ও মরল একদিন। কিন্তু রাজার কানে এই দুঃসংবাদ পৌছে দেয় কে? মহা সমস্যা! চাকর-বাকর, অমাত্যবর্গ পরস্পর পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কাছেই ছিলেন সভাকবি বারবদ্। তিনি এক গান বাঁধলেন এই নিয়ে, প্রকারান্তরে ঘোড়াটির মৃত্যু-সংবাদ জানিয়ে। রাজা শুনে চীৎকার করে উঠলেন, 'এঁ্যা, শাবদিজ্‌ মরে গেছে!' পরমুহূর্তেই রাজা তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। ঘোড়ার মৃত্যু-সংবাদ তিনি প্রথম ঘোষণা করলেন। সুতরাং চরম দণ্ডই যদি হয় তবে সে তাঁরই প্রাপ্য। বারবদের আলোচ্য এই মসনবী বা ছড়া নিয়েই নাকি সেকালের পারসী কাব্যের যাত্রা শুরু।

প্রাচীন মনসবী

সেকালের কয়েকটি প্রাচীন ইরানী মসনবী বা কবিতার নমুনা এখানে উদ্ধৃত করা গেল। রাজদরবারী এসব কবিদের মধ্যে অবু বিন মহম্মদ রূদকী, অবু মনস্মুর মহম্মদ বিন তুসী আর অবুলহসন বল্‌খী ছিলেন সবিশেষ প্রসিদ্ধ। হিন্দু ও গ্রীক দার্শনিক পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁদের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। তাঁদের রচিত বহু মসনবীই আজ অনাদর উপেক্ষায় বিলীন হয়ে গেছে। তবু রূদকী (সমরকন্দের অন্তর্ভুক্ত রূদক নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় রূদকী। তিনি সামানী সম্রাট নস্বর বিন আহম্মদ-এর (খৃ৯১৩-৯৪২) সভাকবি ছিলেন। গভীর চিন্তাধারা ও অপূর্ব কবিত্বশক্তির তিনি ছিলেন আধার। তাঁর কাব্য শ্রুতিমধুরও ছিল। রূদকীর কয়েকটি কবিতা ঃ

"তা বদান্ জা রসীদ্ দানিশ্-ই-মন।
কি বদানাম্ হমী কি নদানম্॥"

অর্থাৎ —

"আমার জ্ঞান এমন স্তরে পৌঁছিয়াছে, যেখানে আমি বুঝিতেছি যে আমি (কিছুই) জানি না।"

[অনুঃ হরেন্দ্রচন্দ্র পাল ঃ 'পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস']

"খিরদ্‌মন্দ্ গোয়িদ্ খিরদ্ পাদ্‌শাহ্-অস্ত।
কি বর্ খ্বাস্ব র বর্ আম্ ফরমান্ বরা-অস্ত্॥
খিরাদ্‌রা তন্-ই-আদ্‌মী লশ্‌কর্-অস্ত্।
হম শহ্বৎ র আর্‌জ্ চাকর্-অস্ত॥"

অর্থাৎ—

'জ্ঞানী বলেন, জ্ঞান হইয়াছে, জ্ঞান হইয়াছে রাজা, সে ছোট-বড় সকলের সর্বময় কর্তা ; মানুষের দেহ জ্ঞানের সৈন্য ও সকল রিপু ও কামনা তাহার দাস।'

[অনুঃ হরেন্দ্রচন্দ্র পাল]

তাঁর আর একটি প্রজ্ঞাদীপ্ত কবিতার বাংলা অনুবাদ (অধ্যাপক হরেন্দ্রচন্দ্র পাল কৃত) উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা গেল না :

'অন্ধকারের আড়ালে ক্রন্দনরত হে দুঃখিত ও বিষণ্ণ হৃদয়, যাহা চলিয়া যাইবার তাহা চলিয়া গিয়াছে, এবং যাহা আসিবার তাহা সম্মুখে উপস্থিত। দুঃখ যাহা আসিবার তাহা আসিবেই, কেন তাহা হইলে আবার বিষণ্ণ হইতেছ? তুমি দুনিয়াতে সাম্যাবস্থার আকাঙ্ক্ষা করিতেছ,—দুনিয়া কবে আবার সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে? কিয়ামৎ বা শেষ বিচারের দিন পর্যন্তও যদি তুমি ক্রন্দন করিতে থাক (তথাপি) যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাকে (আবার) কান্না দ্বারা কি করিয়া ফিরাইয়া আনিবে?...দুঃখ ও কষ্টের মধ্যেই উৎকর্ষ, মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠতার বিকাশ হয়।"

অবুলহসন্ বল্খী-র একটি তত্ত্বমূলক কবিতা :

"অগর্ ঘম্ রা চুন আতিশ্ দুদ্ বুদী।
জহান তারীক্ বুদী জারীদান্॥
দরীন্ গীতী সরাসর্ গর্ বগর্দী।
খিরদ্ মন্দ্ ন-ইয়ারী শাদ্মান্॥"

অর্থাৎ—

'আগুনের ধোঁয়ার মত যদি দুঃখের পরিণাম হইত, তাহা হইলে জগৎ চিরঅন্ধকার থকিত। যদি সারা জগৎ ঘুরিয়া আইস, তাহা হইলেও দেখিতে পাইবে যে জ্ঞানী (অল্পতেই) সন্তুষ্ট নহে।'

অথবা আর একটি ঘজল বা প্রেম গান :

'নরগীস আর গোলাপ জ্ঞান ও বিমর্ষতার প্রতীক। ইহারা কখনও এক সঙ্গে প্রস্ফুটিত হয় না। যে জ্ঞানী সে কখনও বিমর্ষ হয় না, যাহার বিমর্ষতা আছে সে (প্রকৃত) জ্ঞানী নহে।'

['পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস']

রূদকী ছিলেন যেমন প্রাচীন ইরানী সাহিত্যের প্রথম শ্রেষ্ঠ কবি, তেমনি অবু অলি মহম্মদ বলমী ছিলেন সেকালের প্রথম শ্রেষ্ঠ গদ্য-

লেখক। তিনি উজীর অবদুল মালিক্ বিন্ নূহ্-র (খৃঃ ৯৫৪-৬১) নির্দেশে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'তারীখ-ই-ত্ববরীর' আরবী ভাষা হতে অনুবাদ করেন।

মহাকবি ফেরদৌসী

মহাকবিদের নামে এমনি অনেক কিংবদন্তী রটে থাকে। বাল্মীকি, কালিদাস আর হোমারের কাব্য-সৃষ্টির সূচনাতেও এমনি ধারা উপাখ্যান প্রচলিত আছে। পারস্যের জাতীয় মহাকবি ফেরদৌসী তুশীর জীবনেও এমনিতর কাহিনীর যে অভাব হবে না, আশ্চর্য কি?

রাজকবি আনসারী গজনীর রাজ-উদ্যানে একদিন নাকি বেড়াচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর দুই সহচর। কবির বন্ধু-কবি। ঠিক এমনি সময় দীন-হীন মলিন বেশে সেখানে এসে উপস্থিত এক পথিক। রাজকবির দল (আনসারী, আছজাদী, ফারুকী প্রভৃতি) নাক সিঁটকালেন ঘৃণা আর উপেক্ষায়। সঙ্গীদের একজন ফোঁড়ন কাটলেন: 'দাও লোকটাকে এখান থেকে ভাগিয়ে।' কিন্তু রাজকবি আপত্তি করলেন। বললেন: দাঁড়াও, এক ফঁন্দি আঁটা যাক। রাজকবি আনসারী এগিয়ে এসে বললেন: দেখ, আমরা তিনজনই হলাম কবি। আমাদের সঙ্গে মিশতে হলে, তোমাকেও কবি হতে হবে।

পথিক মাথা চুলকিয়ে জানালে, সে-ও কিছু কিছু কাব্যচর্চা করে থাকে। আনসারী তখন বললেন: বেশ, আমরা তিনজন তিনটি চরণ বলে যাব। চতুর্থ পদটি তোমাকে কিন্তু পূরণ করতে হবে মিল রেখে।

কবিতার চরণ ক'টি এমনি কৌশলে রচিত যে, তার চতুর্থ পংক্তির মিল একরূপ অসম্ভব। কিন্তু অসম্ভব সম্ভব করলেন দীন-হীন রাস্তার সেই পথিক। কবিতাটি হলো:

"আনসারী: চুঁ আরেজে তু মাহ না বাসাদ রওশন;
আছজাদী: মানান্দে রোখত্ গোল না বুয়াদ দর গোলসন

ফারুকী : মেঙ্গানাত হামী গোজার কোনাদ্ আজ জওশন্ ;
পথিক : মানান্দ সেনানে 'গেঁও' দরজঙ্গে পুশন।"

(অনুবাদ)

"আনসারী : চন্দ্রও সুন্দর নয় তব মুখ সম ;
আছজাদী : বাগানে গোলাপ নাহি হেন মনোরম ;
ফারুকী : তোমার চোখের ভুরু বর্ম ভেদ করে ;
পথিক : পুশনের যুদ্ধে যথা বর্শা 'গেঁও' করে।"

[অনু: মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্, 'পারস্য প্রতিভা']

মলিন বসন-পরা এই পথিকই উত্তরকালের ইরানের জাতীয় মহাকবি আবুল কাসেম (মৃত্যু : ১০২০ খৃঃ)। ফেরদৌসী নামেই তিনি সবিশেষ পরিচিত। আর এ নামকরণ করেন সুলতান মাহমুদ নিজে কবির অসাধারণ কাব্যশক্তিতে মুগ্ধ হয়ে সুলতান বলে উঠেছিলেন :

"আয় ফের্দোসী, তু দরবারে মারা ফেরদৌস করদী।"

(হে ফেরদৌসী, তুমি সত্যিই আমার সভাস্থল স্বর্গে পরিণত করেছ।)

আবুলকাসিম ফেরদৌসীর রচিত ইরানের জাতীয় মহাকাব্য 'শাহ্নামা'* পৃথিবী শ্রেষ্ঠ দশখানি গ্রন্থের অন্যতম বলা যায়। আমাদের রামায়ণ-মহাভারতের মতই তার স্থান ইরানের জাতীয় জীবনে। কিন্তু শাহনামার এই অমর কবির জীবন-বৃত্তান্ত, তাঁর জন্মের সন-তারিখ বিশেষ জানা যায় না। প্রকাশ ৯৪১ সালে তুশ শহরে তাঁর জন্ম এক কৃষকের ঘরে। প্রথম জীবনে তিনি চাষ-বাসই করতেন। পল্লীর চাষীদের সঙ্গে নাচ-গান, আমোদ-আহ্লাদ করে বেড়াতেন।

প্রাচ্য ভাষাবিদ মহাপণ্ডিত সার উইলিয়ম জোন্স-এর মতে : (Shahnama) "a glorious monument of Eastern genius and learning which if ever it should be generaly understood in its original language, will contest the merit of invention with Homer himself".

গান বেঁধে তাদের গেয়ে শোনাতেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি তাঁর অমর রচনা শাহনামা লিখতে শুরু করেন গজনীর সুলতান মামুদের নির্দেশে এবং দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বর্ষ কাল ধরে ইরানের এই জাতীয় কাব্য রচনা করতে থাকেন। ১০১০ সালে সাতখণ্ড এই মহাকাব্য শেষ হয়। কথিত আছে যে সুলতান মামুদ ফেরদৌসীর অপূর্ব কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে শাহনামার প্রতি শ্লোকের জন্য একটি করে দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত হন পরে সাত খণ্ডে যখন এই মহাকাব্য শেষ হল তখন তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি পালন করতে দ্বিধা বোধ করলেন। এবং স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে রৌপ্য মুদ্রা দিতে চাইলেন। কবি তাতে ক্ষুণ্ণ হন। এবং গজনী ত্যাগ করে বাগদাদের রাজদরবারে এসে উপস্থিত হলেন আর বাগদাদ সম্রাটেব পৃষ্ঠপোষকতায় 'ইউসুফ ও জুলেখা' অনবদ্য প্রেমকাহিনী লিপিবদ্ধ করেন কাব্যে।

অবশ্য সুলতান মামুদ ও ফেরদৌসীর এই ব্যাপারে কতখানি ঐতিহাসিক সত্য রয়েছে ঠিক বলা কঠিন। গজনীব অপরাপর রাজ-কবিদের ঈর্ষা-পরায়ণতা এইজন্য কতখানি দাযী বলা যায় না। কেননা শাহনামার শেষেব দিকের একটি বয়ৎ বা শ্লোকে স্পষ্টই লিখিত রয়েছে :

"পৃথিবীর সকল রাজার নিকট হইতে সম্মানপ্রাপ্ত এইরূপ জনপ্রিয় ও বদান্য সম্রাট, নিন্দুক ও হতভাগ্যদের প্ররোচনাব পাপে জড়িত হইয়া এই প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন না। নিন্দুক আমার কাছে হিংসাপরবশ হইল (এবং) রাজার নিকট আমার বাজার মন্দা হইয়া গেল।" —[অনুঃ হবেন্দ্রচন্দ্র পাল]

আত্মাভিমানী কবি সুলতানের বিরুদ্ধে তীব্র কটূক্তি করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। শাহনামায় রয়েছে :

"সম্রাটের যদি সম্রাটই (সত্যিকার) পিতা হইত, তাহা হইলে আমার মাথায় সোনার মুকুট ভূষিত হইত। আর যদি রাজার

অন্তঃপুরে রাজকন্যাই বিরাজ করিত (অর্থাৎ রাজা যদি মহৎ অন্তঃকরণ হইতেন) তাহা হইলে স্বর্ণ ও রৌপ্য আমার অঙ্গের ভূষণ হইত।" [অনুঃ ঐ]

এ-ও কথিত আছে, ভারত আক্রমণান্তে সুলতান মামুদ গজনীতে যখন ফিরে যান আর যখন উজীরের মুখে ফেরদৌসীর রচিত বয়ৎ শোনেন তখন তিনি নাকি তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য অনুতপ্ত হন আর কবির নিকট ষাট হাজার দীনার পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সুলতানের এই পুরস্কার যখন কবির বাড়ি এসে পৌঁছল তখন মহাকবি আর পুরস্কারের জন্য বসে নাই। ১০২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

শুধু যুদ্ধ বা বীরত্ব কাহিনীই ফেরদৌসী তাঁর অমর কাব্যে লিপিবদ্ধ করেন নি, তথ্যপূর্ণ বহু সুভাষিতাবলীও পরিবেশন করেছেন। যেমন—

"এস, আমারা পৃথিবীকে খারাপে পরিবর্তিত না করিয়া চেষ্টা দ্বারা ইহাকে ভালতে পরিণত করি। ভালমন্দ কিছুই স্থায়ী নয়, তথাপি ভালর স্মৃতি রাখিয়া যাওয়া দরকার। সঞ্চিত ধন ও সু-উচ্চ প্রাসাদ তোমার কোন উপকারেই আসিবে না। ফরীদূন কোন ভাগ্যবান দেবতা ছিলেন না, কিংবা মৃগনাভি বা অন্য কোন সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারাও গঠিত ছিলেন না, ন্যায়পরায়ণতা ও বদান্যতা দ্বারাই তিনি এই মহত্ত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন। তুমিও ন্যায়পরায়ণতা ও বদান্যতা অর্জন কর, তাহা হইলে (তুমিও ফরীদূন হইতে পারিবে।"

['পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস']

ফেরদৌসীর আরও কয়েকটি বাণী :

"সেই মহান আত্মা (অর্থাৎ বুজবগমহর) আরও বলিলেন, সংক্ষেপে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বলিবে।...জ্ঞানের অন্বেষণ কর ও দুঃখকে অবহেলা করিয়া যাও; কারণ এই পৃথিবী অতিথিশালা

বিশেষ এবং আমাদের ইহা ত্যাগ করিতেই হইবে। এই পৃথিবীতে মনুষ্যত্বই শ্রেষ্ঠ এবং এইজন্য জ্ঞান ব্যাতিরেকে আর কোন গত্যন্তর নাই। প্রত্যেকেই কামনার বশীভূত এবং এই কামনার জন্যই নানা রকম প্রকৃতির লোক বিরাজমান। এই পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকৃতির জন্যই মানুষে মানুষে প্রভেদ। সৎ প্রকৃতির দ্বারাই কেবল সকলের মধ্যে সাম্যাবস্থা আসিতে পারে। অকৃতকার্যতায় দুঃখিত হইও না। কারণ ইহা মন ও দেহকে কলুষিত করে ও পীড়া দেয়'...যদি জ্ঞানের পুঁজি তোমার না থাকে, মৌনতাই তোমার পক্ষে উৎকৃষ্ট পন্থা। সংসারকাজে যাহা খরচ করা দরকার তাহাই কর, অমিতব্যয়ী বা কৃপণ হওয়া উচিত নয়।"... [ঐ]

অথবা—

"মানুষ মাত্রই এক খোদার অংশ এবং তাঁহাদের পৃথক পৃথক ধর্ম প্রকৃতপক্ষে আল্লা, তাল্লা ও ইসলামের ন্যায় সত্যিকার এবং পরম ধর্মের অংশবিশেষ। জীবন ক্ষণস্থায়ী, ইহা সত্যের আশ্রয় ছাড়া কখনই সফলকাম হইতে পারে না। মানুষ স্বার্থচিন্তা ও ক্ষুদ্র বুদ্ধির জন্যই যুদ্ধাদি ব্যাপারে 'সংশ্লিষ্ট হয়।" [ঐ]

নিছক যুদ্ধের বর্ণনা, সৈন্য চলাচল, অস্ত্র-শস্ত্রাদির সঠিক নামও ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিফহাল থাকলেও যুদ্ধক্ষেত্রের নিষ্ঠুর ভয়াবহতা, আহতের অসহায় কাতর ক্রন্দন, মৃত্যু, পরাজয় ইত্যাদির বিশদ বিবরণ তিনি বর্ণিত করেছেন একান্ত দরদের সঙ্গে। দেশী-বিদেশী সকলের ব্যথা-বেদনায় তিনি যেন সমদুঃখী। চরিত্র চিত্রণেও তাঁর দক্ষ নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানেই বুঝি 'শাহনামা' মহাকাব্যের বিশ্বজনীন আবেদন। অধ্যাপক হরেন্দ্রচন্দ্র পালমহাশয়ের ভাষায়ঃ

"কবি দৃশ্যের পর দৃশ্যে প্রাচীন ঈরানের বীর রাজা বা বাদশা ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও নারীগণের কীর্তি ও তাঁহাদের চরিত্র আমাদের

সমক্ষে উদ্‌ঘাটন করিয়া গিয়াছেন। এমন অনেক ঘটনার অবতারণা তাঁহাকে করিতে হইয়াছে বিশ্বজনীনতা ও বিশ্বমানবের পথে যাহার আকর্ষণী শক্তি অসাধারণ। মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডবের বিভিন্ন চরিত্র, যুধিষ্ঠিরের দৃঢ়তা ও সত্যনিষ্ঠা ও সঙ্গে সঙ্গে কোমলতা, ভীমের সহজ সরল শৌর্য ও শক্তি, অর্জুনের ভ্রাতৃপ্রেম, ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শিতা ও নায়কোচিত নানাগুণ, দ্রৌপদীর চরিত্রের তেজ ও দৃঢ়তা, ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ-পুত্রবাৎসল্য, দুর্যোধনের লোভ ও দম্ভ ইত্যাদি যেমন সার্থকভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, তেমনি ইহাতেও জোহাকের নিষ্ঠুরতা, জাল ও রূদাবহ্‌র মনোহর প্রেমিক চরিত্র, রুস্তমের অসম সাহস ও প্রচণ্ড বীরত্ব, খস্‌রু ও শীরীনের চরিত্র-মাধুর্য প্রভৃতি বহু মহনীয় ও সুন্দর চরিত্রচিত্রণ বিদ্যমান। রুস্তমের পুত্র সোহ্‌রাবের অজ্ঞাত পিতার সহিত মিলিত হইবার আকুল আগ্রহ, এবং অজানিতভাবে বীর রুস্তমের হাতে একমাত্র পুত্র সোহ্‌রাবের বধ ও শেষ মুহূর্তে মুমূর্ষু পুত্রের সহিত পুত্রের যোদ্ধৃগুণে মুগ্ধ পিতাব পরিচয়—এইরূপ বহু বহু দৃশ্য দ্বারা 'শাহ্‌নামহ' বিশ্বসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।"

['পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস']

ফেরদৌসীর 'শাহনামা' সত্যিই বিশ্বসাহিত্যের এক অপূর্ব সম্পদ। ভাষার লালিত্য, শব্দালঙ্কার ও ছন্দ-নৈপুণ্যে ইরানের বীররসাত্মক এই জাতীয় মহাকাব্য যুগযুগ ধরে সাহিত্যানুরাগী গুণীজনের অকুণ্ঠ সমাদর ও শ্রদ্ধা অর্জন করে আসছে।

ফেবদৌসীর অপর কাব্যকাহিনী 'ইউসুফ ও জুলেখার' প্রেমগীতি কোরানের ইউসুফ ও ইহুদীদের কিংবদন্তী অবলম্বনে রচিত। এছাড়া তিনি বহু ঘজল, কসীদ, রুবাঈও রচনা করে গেছেন।

'শাহনামা' এককথায় কবি ফেরদৌসী বিরাট এই কাব্যগ্রন্থে 'আবেস্তার কাল থেকে শুরু করে' পারস্যের প্রাচীন রাজাদের ইতিবৃত্ত —তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহ, আচারব্যবহার, তাঁদের কীর্তিকলাপের কাহিনী

অপূর্ব কাব্য-সুষমামণ্ডিত হয়ে লিপিবদ্ধ করেন। সেকালে ইরানে রাজপুরুষদের শৌর্য-বীর্য, তাঁদের হাসি-কান্না—তখনকার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনযাত্রার নিখুঁত চিত্রের সন্ধান মেলে এই 'শাহনামা' মহাকাব্যে। সোরাব-রুস্তমের অশ্রু-সিক্ত কাহিনী বিশ্বসাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য সম্পদ রূপে বিরাজিত থাকবে।

মহাকবি ফেরদৌসীর কাব্য-প্রতিভার নিকট সেকালের ইরানী সাহিত্যের বহু কবি ও সাহিত্যিকের সৃষ্টিপ্রতিভা অনেকটা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল। নসর ইবন আমেদ-এর সভাকবি রূদকী (আনুঃ ৯৪০ খৃঃ) আর গজনীর রাজকবি আনসারীর (মৃত্যুঃ ১০৫০ খৃঃ) নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। রূদকী ছিলেন সুলতানদের 'প্রশস্তি' গাইতে সিদ্ধহস্ত। এই ধরনের 'প্রশস্তি' রচনা করতে সেকালে তাঁর জুড়ি ছিল না। রচনাশৈলীর উৎকর্ষে কবি আনসারী রূদকীকেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে হার মানান। সিস্তানের কবি ফারুকী এবং কবি আসজাদী ছন্দ-বৈচিত্র্যময় বহু সার্থক কাব্য সৃষ্টি করে গেছেন।

ফেরদৌসীর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন আনসারী, ফারুকী, আসজাদী, মনুচহরী প্রভৃতি কবিকুল। সুলতানী দরবারের এইসব কবিদের মধ্যে আনসারীর স্থান ফেরদৌসীর পরেই বলা যায়। ৯৬১ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় অবুল কাসিম আহম্মদ আনসারীর জন্ম বলে প্রকাশ। বল্‌খ-এ তাঁর বাসস্থান ছিল। আনসারী জনৈক বণিকের পুত্র ছিলেন। সুলতান মামুদের জৈষ্ঠ ভ্রাতা সবুক্তগীন আনসারীর কাব্যে মুগ্ধ হয়ে গজনীর রাজদরবারে তাঁকে প্রেরণ করেন। আনসারী সুলতান মামুদের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন এবং পরিশেষে রাজদরবারের প্রধান কবিরূপে বৃত হন এবং বিপুল ধনসম্পত্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করেন। আনসারী ঘজল, তশ্‌বীর বা বসন্তের বর্ণনামূলক বহু কবিতা লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু রুসীদই তাঁকে পৃথিবীজোড়া খ্যাতির আসনে অধিষ্ঠিত করে গেছে। ১০৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। আনসারীর একটি

ক্বসীদ উদ্ধৃত করা গেল। কবিতাটি অতি সুমধুর শব্দঝঙ্কার ও পদবিন্যাসাদিতে তিনি যথেষ্ট কেরামতি দেখিয়েছেন। কবিতাটি যেমন সরল তেমনি ছন্দলালিত্যময়। যেমন,—

"কার্ খ্বাহী কার্ বখ্‌শী কার্ বন্দী কার্ দিহ্।
কার্ বীনী কার্ জুয়ি কার্ সাজী কার্ দান্॥
শাদীর শাহী তু দারী শাদ্ বাশ্ শাহ্ বাশ্
জাম-ঈ-শাদী তূ পূশ্‌র নাম-ঈ-শাহী তূ খ্বান্॥"

অর্থাৎ—

"তুমি কর্মে উৎযোগী ও উৎসাহী, কর্মব্যস্ত, সুনিপুণ, কর্মক্ষম, সুকৌশলী ও (সর্বকর্ম) সিদ্ধহস্ত। আনন্দ ও অধিনায়কত্ব তোমার করায়ত্ত; সুখে থাক ও রাজত্ব কর। তুমি আনন্দের পোশাক পরিধান কর এবং রাজচরিত্র আলোচনা কর।"

['পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস']

ফারুকী ছিলেন আনসারীর সমসাময়িক। ক্বসীদ রচনা করতে তিনিও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি প্রথম জীবনে আবুল বিন মহম্মদ প্রশস্তিসূচক কবিতা লিখে বিস্তর পুরস্কার লাভ করেন। পরে গজনীর সুলতান মামুদের দরবারে এসে তাঁর উদ্দেশে অসংখ্য কবিতা রচনা করেন ও সুলতান তাঁকে বিশেষ সম্মান দেখাতেন। ফারুকী 'দিবান' (কাব্য-গ্রন্থ)-এ বয়ৎ ব' দুই পংক্তির শ্লোকসংখ্যায় প্রায় ন'হাজারের মতো। সমসাময়িক কবিদের তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাভাজন। ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের উপরও তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ লিখে গেছেন। ১০৩৭ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। ফারুকীর একটি ক্বসীদ-এর নমুনা:

"বর্ আমদ্ নীল্‌গূন্ আব্‌রী জব্দয় নীলগূন দরীয়া।
চু রায় 'অশিকান্ গর্দান্ চু ত্বর-ই-বীদিলান শয়দা॥"

অর্থাৎ—

"নীল সমুদ্র হইতে একটি নীলাভ মেঘ উত্থিত হইল—ইহা প্রেমিকের ন্যায় অস্থির বুদ্ধি এবং প্রেমিক স্বভাবের ন্যায় উন্মত্ত।"

আবুল আহম্মদ মনু চহরীও ছিলেন সুলতানদের দরবারে সভাকবি। পারসী ছাড়া আরবীতেও তিনি বহু কবিতা রচনা করেছেন। কাব্যশাস্ত্র ছাড়া দর্শন, পদার্থ বিজ্ঞান, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। ১০৪০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। মনু-চহরীর একটি কবিতা-কলির বাংলা:

> "আজি অতি আনন্দের দিন, ভোর হইতেই মদ্যপান করিতে থাক; খোদা তোমার ইচ্ছা পূরণ করিয়াছেন, এখন আর ওজর করিবার নাই।"

গদ্য-সাহিত্য

এই সময় ইরানী গদ্য সাহিত্যেরও সূচনা হতে থাকে। আরবীতে লেখা তাবরির সুবিখ্যাত ইতিহাসের এক সংক্ষিপ্তসার পারসীতে লেখা হয়। গজনীর সুলতান মাহমুদের রাজসভায় যে বহু জ্ঞানী ও গুণী অলঙ্কৃত করতেন, আগেই তা বলা হয়েছে। কাব্যচর্চা ছাড়া গদ্য-সাহিত্যেরও উন্নতি সাধিত হয় তাঁদের দৌলতে। সংস্কৃত ভাষাবিদ্ পণ্ডিত আল-বেরুনি, যদিও তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ আরবীতে রচনা করেন, পারসীতেও তিনি লেখেন নি, এমন নয়। আল-বেরুনির সমসাময়িক সুবিখ্যাত দার্শনিক ও চিকিৎসাবিশারদ আবুসিনা (মৃত্যুঃ ১০৩৭ খৃঃ), আরবী ভাষায় বেশীর ভাগ গ্রন্থ লিখেছেন। এবং পারসী ভাষাতেও তিনি এক বিরাট বিশ্বকোষ সঙ্কলন করেন। সেলজুক বংশের শাসনকালে ইরানী গদ্য-সাহিত্যের আরও উন্নতি সাধিত হয়। খোরসানের শাসনকর্তা আল্প্ আর্সালানের প্রধানমন্ত্রী নিজাম-উল-মুল্ক-এর দান এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর 'সিয়াসৎ-নামা' সেকালের ইরানী গদ্যের এক অমূল্য সম্পদ। 'সফর-নামা' ভ্রমণ-কাহিনীর লেখক নসিরী খুসরুও ছিলেন ইরানী গদ্য-সাহিত্যের আর একজন দিকপাল। 'সিয়াসৎ-নামা' ও 'সফর-নামা'র পাশে 'কে-কাউসে'র লেখা 'কোআবাস-নামা', গারদেবীর ঐতিহাসিক

গ্রন্থ 'যৈনল আকবর', ঘজালীর (মৃত্যুঃ ১১১১) তত্ত্ব-গ্রন্থ 'কিমিআয়ি-সাদদ' প্রভৃতি একাদশ-দ্বাদশ শতকের আরও বহু বইয়ের নাম উল্লেখ করা যায়। কোআবাস-নামায় সংস্কৃত 'হিতোপদেশে'র মতো বহু নীতিমূলক কাহিনী রয়েছে।

ওমর খইয়াম

গদ্যের চাইতে সেকালের (একালেরও) ইরানী সাহিত্যের অমর সম্পদ তার 'রুবাঈ' (বহু বচনে রুবাইয়্যাৎ)। মাত্র চার লাইনের কবিতা। এর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, চতুর্থ চরণে মিল একই। ইটালীয় সনেটেব মতো ইরানীয় কাব্য-সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তার 'রুবাঈগুলি'। আর এই 'রুবাঈ' রচনার শ্রেষ্ঠতম শিল্পী হলেন গিয়াসউদ্দীন আবুল ফাতাহ ওমর বিন ইব্রাহিম অল খইয়াম—ওরফে ওমর খইয়াম।

ওমর খইয়াম ছিলেন একাধারে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, জ্যোতির্বিদ, গণিতজ্ঞ ও কবি। আজ শুধু কবি বলেই তাঁর দুনিয়াজোড়া খ্যাতি। কিন্তু কবিতা না লিখলেও গণিত শাস্ত্রের পণ্ডিত বলে তিনি অমর হতে পারতেন। কবিত্বের অত্যধিক খ্যাতি তাঁর সে যশকে ঢেকে দিয়েছে। আরবী ও পারসী দু-ভাষাতেই তিনি কবিতা লিখে গেছেন। ছন্দেব লালিত্যে, ভাব-সম্পদ ও শব্দ-বিন্যাসের মাধুর্যে তাঁর রুবাঈগুলি সত্যি পাঠকদের দান করে অনাবিল আনন্দ—চিত্তে নিয়ে আসে অপূর্ব এক মাদকতা! চার্বাকের 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।' এবং গ্রীসের এপিকিউরাসের জীবন-দর্শনের সঙ্গে ওমর খইয়ামের কোথায় যেন মিল রয়েছে। তিনি নাস্তিক ছিলেন কি আস্তিক ছিলেন, সেটা আজ বড় কথা নয়। সত্য-শিব-আর-সুন্দরের ব্যক্তই যেন তাঁর কাব্যের মূল সুর। ওমর খইয়ামের রুবাইয়্যাতের কবি কান্তি ঘোষের দুটি পরিচিত বাংলা অনুবাদ উদ্ধৃত করা গেল কৌতূহলী পাঠকদের জন্য :

যেমন—

"অনুশোচনার সিত-পরিধান
ফাগুন আগুনে দহন কর
আয়ু-বিহঙ্গ উড়ি চলি যায়
হে সাকী, পেয়ালা অধরে ধর।"

"অস্তি-নাস্তি শেষ করেছি
দার্শনিকের গভীর জ্ঞান,
বীজগণিতের সূত্ররেখা
যৌবনে মোর ছিলই ধ্যান।
বিদ্যারসে যতই ডুবি
মনটা জানে মনে স্থির—
দ্রাক্ষারসের জ্ঞানটা ছাড়া
রস-জ্ঞানে নই গভীর ॥..."

অথবা—

"কোথায় ছিলাম, কেনই আসা—
এই কথাটা জানতে চাই,
জন্মকালে ইচ্ছাটা মোর
কেউ তো কেমন সুধায় নাই!
যাত্রা পুনঃ কোন্ লোকেতে ?
প্রশ্নটা মোর মাথায় থাক—
ভাগ্যদেবীর ক্রুর পরিহাস
পেয়ালা ভরে ভোলাই যাক।.."

ইরানী সাহিত্যের এই অমর কবি ও দার্শনিক আবুল ফাতাহ ওমর বিন ইব্রাহিম অল খইয়াম সলজুকীয় রাজত্বকালে নীশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ওমর খইয়ামের পিতা তাঁবুর ব্যবসা ('খইয়াম' মানে—তাবু প্রস্তুতকারক) করতেন। তিনি বাগদাদ ও খোরসানের বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শন করে নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। জ্যোতির্বিদ্যা,

চিকিৎসা শাস্ত্র, বীজগণিত ও রসায়ন শাস্ত্রেও তাঁর অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল। গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু ওমর খইয়ামের অমর কাব্য গ্রন্থই তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদানকে ম্রিয়মাণ ও একপেশে করে রাখে।

ওমর খইয়ামের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তাঁর কাব্যগ্রন্থ পাঠে এইটুকু জানা যায়, ধর্মে-কর্মে তাঁর তেমন পুরো আস্থা ছিল না। রীতি-নীতি, আচার-পদ্ধতিতে তিনি মোটেই বিশ্বাসী ছিলেন না। সূফী ভাবধারার প্রভাব তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হলেও, হাফিজ বা রূমী কবিতার নিগূঢ় তত্ত্বকথা তাঁর সৃষ্ট রচনায় বড় একটা পাওয়া যায় না।

তবু ওমর খইয়ামের চতুষ্পদী কবিতা-কলি রূবাঈগুলি (রুবাইয়্যাৎ) বিশ্বজনের চিত্তজয় করে নিয়েছিল সহজ, অনাবিল, অবেগময় ছন্দমুখর, সুষমামাধুর্যে। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-ভালবাসা অপূর্ব স্বাধীন প্রকাশ হল বুঝি তাঁর রুবাইয়্যাৎ-এ। মানুষের নীচতা, কপটতা ও ভণ্ডামীর প্রতি তিনি ছিলেন খড়্গহস্ত। ধর্মের মুখোশ-আটা দরবেশদের তিনি করতেন ঘৃণা; অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। ইংরেজ কবি ফিটজিরাল্ড—এর দৌলতে ওমরের রুবাঈগুলি আজ পৃথিবীব বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এখানে তাঁর আরো কয়েকটি মূল পারসী রুবাইয়্যাৎ-এর বাংলা অনুবাদ উদ্ধৃত করা গেল:

"যে সবুজ বৃক্ষ নদীর কিনারায় জন্মলাভ করিয়াছে, মনে হয় ইহা সুচরিত্রাব ওষ্ঠ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অবহেলার সহিত এই তৃণলতাকে আঘাত করিও না, কারণ ইহা প্রিয়বদনার ধুলিকণা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে।"...

"ইহা কোন উপমা নহে, একেবারে খাটি সত্য যে আমরা ক্রীড়নক মাত্র এবং প্রকৃতি ক্রীড়নক। এই সৃষ্টির ফাঁদের মধ্যে যে

ক্ষণস্থায়ী খেলাই করি না কেন—আমরা এ:ক একে অনস্তিত্বের বাক্সে প্রবেশ করিতেছি মাত্র।"···

এমনি অপর আর একটি কবিতা ও তাব বঙ্গানুবাদ ঃ

"বর্‌খীজ্‌ ব মখ্‌র্‌ ঘুম্‌-ই-জহান্‌ গুধরান্‌
খ্‌শ্‌বাশ্‌ বদমী বশাদমানী গুধরান্‌॥
দর্‌ ত্বব '-ই-জহান্‌ অগর উফায়ি-বুদী।
নৌবৎ বত্‌ খ্‌দ্‌ নিয়ামদী অজ্‌ দিগরান্‌॥"

অর্থাৎ—

"উঠ, এবং এই ক্ষণস্থায়ী দুঃখকষ্টের জন্য চিন্তা করিও না। সুখে থাক এবং প্রতিটি মুহূর্ত আনন্দে যাপন কর। যদি এই পৃথিবীর প্রকৃতিতে বিশ্বস্ততা থাকিত, তাহা হইলে তুমি যাহা পাইয়াছ তাহাও ভাগ্যে জুটিত না।"···

হাফিজ

চৌদ্দ শতকের প্রথম দিকে শীরাজ নগরে ইরানের শ্রেষ্ঠ গীতি কবি সূফী মরমী হাফিজ (শমসুদ্দীন মহম্মদ হাফিজ)-এর জন্ম। শৈশবে তিনি মসজিদে লেখাপড়া শেখেন এবং আগা-গোড়া কোরান মুখস্থ করে হাফিজ উপাধি লাভ করেন। শৈশব হইতেই তিনি আধ্যাত্মিক রচনায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং সুবিখ্যাত পণ্ডিত কারমুদ্দীন আবদুল্লার নিকট সূফী ধর্মে জ্ঞানলাভ করেন। হাফিজের যৌবন-কালে পারস্যে মোঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার শুরু হয়। ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ শহ-এর পুত্র অবু ইসহাক ইরানের শাসনাধিকার লাভ করেন। আবু ইসহাক নিজেও একজন কবি ছিলেন এবং কবিদের সমাদর করতেন। তিনি হাফিজকে সম্মান করতেন। তাঁর নামেও বহু প্রশস্তি কবিতা রচনা করেন। পরবর্তী বহু সম্রাটও হাফিজের কবিতার মুগ্ধভক্ত ছিলেন। দেশ-বিদেশের বহু সম্রাটও তাঁকে আপন আপন রাজদরবারে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কথিত আছে, আমাদের

দাক্ষিণাত্যে বাহমনী সম্রাট মহম্মদ বিন হসন (১৩৭৮-৯৬ খৃঃ) হাফিজকে ভারতে এসে তাঁর রাজদরবারে আতিথ্য গ্রহণ করতে সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কবি হাফিজ নাকি সম্রাটের সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন এবং পারস্য সাগর পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু পথের দুর্যোগময় পরিস্থিতির জন্য ভারতবর্ষে আসতে আর সাহসী হলেন না। তিনি পরে অবশ্য বাহমনী সম্রাটের উদ্দেশে অনবদ্য বহু ঘজল লিখে পাঠিয়েছিলেন।

কবি হাফিজ সম্পর্কে আরও জনশ্রুতিতে প্রকাশ, ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট তৈমুর যখন শীরাজনগর অধিকার করেন তখন হাফিজের কাব্য-খ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তিনি ডেকে পাঠান। আর হাফিজের একটি ঘজলে উল্লেখ করে নাকি কবিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন:

"আমি যে বোখারা ও সমরখন্দ লাভ করবার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত, সেই দুই প্রসিদ্ধ শহরকে তোমার মত সাধারণ এক ব্যক্তি হয়ে সামান্য এক তুর্কী মহিলার একটি কালো তিলের জন্য বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত আমি, এ কেমন ধারা কথা!"

কবি সবিনয়ে নিবেদন করলেন:

"হে মহাত্মা এই অমিতব্যয়িতার জন্যই ত' আমার আজ এই দুরবস্থা।"

সম্রাট তৈমুর কবির কথা শুনে তুষ্ট হোলেন এবং তাঁকে বিস্তর পুরস্কৃত করলেন। এখানে হাফিজে সেই বিখ্যাত ঘজলটির বাংলা মর্মানুবাদ দেওয়া গেল:

"যদি শীরাজের তুর্কী যুবতী আমাদের মনকে গ্রহণ করে তাঁহার সেই কালো তিলের জন্য সমরখন্দ এবং বোখাবাও বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি হে সাকি, এই চিরস্থায়ী মদ আমাদের পান করিতে দাও কারণ বেহেস্তে এই স্রোতস্বিনী রূকনাবাদের তীর ও মুসল্লার বাগান পাওয়া যাইবে না। হায় তুর্কীগণ যেমন লুণ্ঠন দ্রব্য হরণ করিয়া লইয়া যায়, সুপটু ও শহরময় চাঞ্চল্য উৎপাদনকারিণী

প্রেয়সীগণ তেমনই আমাদের মন হইতে ধৈর্য কাড়িয়া লইয়াছে, বন্ধুর সৌন্দর্য আমাদের অসম্পূর্ণ প্রেমের কোন ধার ধারে না, সুন্দর মুখের আবার (বাহিরে) আভা, বর্ণ, তিল বা গণ্ডদেশের টোলের কি দরকার করে? আমি ইউসুফের সেই ক্রমবর্ধমান সৌন্দর্য হইতে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, প্রেম নিশ্চয়ই জুলিমাকে সতীত্বের আবরণ হইতে বাহির করিয়া লইয়া আসিবে। তুমি আমাকে তিরস্কার করিয়াছ, আমি ইহাতে সন্তুষ্ট,—খোদা তোমায় ক্ষমা করুন, তুমি আমাকে ভালর জন্য বলিয়াছ,—চিনি মিশ্রিত ঠোঁটের পক্ষে, তিক্ত উত্তরই শোভা পায়। হে প্রাণপ্রিয়, উপদেশ শ্রবণ কর, কারণ ভাগ্যবান যুবকেরা এই বৃদ্ধ জ্ঞানীর উপদেশ প্রাণাপেক্ষাও পছন্দ করেন।—চরণ ও মদের কাহিনী আলোচনা কর। এই পৃথিবীর রহস্য অল্পই জানিতে ইচ্ছা কর, কারণ জ্ঞান দ্বারা কেহই এই রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন করিতে পারে নাই এবং পারিবেও না। এই হাফিজ, তুমি প্রেমগীতি গাহিয়াছ, মুক্তা ছড়াইয়া দিয়াছ—এস, সুললিত কণ্ঠে ইহার গান কর, কারণ বেহেস্ত্ হইতে তোমার কবিতার উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে।”

['পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস']

হাফিজ শুধু সুললিত ভাষায় ও মধুর ছন্দে গজল বা প্রেমগীতি গেয়েই ক্ষান্ত হন নি, মসনবী কসীদ, রুবাঈ প্রভৃতিও প্রচুর লিখেছেন। বসন্ত, গোলাপ, বুলবুল, মদ, যৌবন, সৌন্দর্য তাঁর কাব্যের প্রধান উপজীব্য ছিল। ভাষা ছন্দ অলঙ্কার ও শব্দপ্রয়োগ-মাধুর্যে তাঁর গীতি-কবিতা ছিল অনুপম। প্রেমিক-প্রেমিকা বা প্রেমাস্পদের রূপ বর্ণনার বাহ্যিক আবরণের মধ্যে নিহিত ছিল রূপক ব্যঞ্জনা। খোদার প্রতি প্রেমভক্তি বা “ইশপ ও ইবাদতে”র অপূর্ব বর্ণনা। আগেই বলা হয়েছে, হাফিজ ছিলেন সূফী মরমী কবি। তাঁর ধর্ম ছিল বিশ্বজনীন। মন ছিল উদার এবং পরের ব্যথায় সমব্যথী। জাতির বজ্জাতি বা সঙ্কীর্ণ গোড়ামীর অনেক উর্ধ্বে। হাফিজের একটি বয়েৎ ঃ

"আহা কিবা শোভাময় এ ভব ভবন,
যখন যে দিকে চাই জুড়ায় নয়ন।
যে করেছে কোনও দিন গিরি আরোহণ,
সে জানে ভূধরশোভা বিচিত্র কেমন।

*

এসব স্বভাব শোভা রচিত যাঁহার
হাফিজ মজ না কেন প্রেম-রসে তাঁর।"

*

"দয়া করে দিলা যিনি দুইটি নয়ন
উচিত কি নয় তাঁর রূপ দরশন?"

[কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার : 'সদ্ভাব শতক']

কিংবা—

"এই ৭২ জাতের সাম্প্রদায়িকতা উপেক্ষা কর, কারণ তাহারা সত্যকে জানিতে পারে নাই বলিয়াই মিথ্যা গল্পের সৃষ্টি করিয়াছে।"

ধর্মের নামে ভণ্ডামীর মুখোশ তিনি খসিয়ে দিয়েছেন অনেকক্ষেত্রে :

"ভণ্ডামী ও প্রতারণার আগুন ধর্মের গোলাঘরকে অবশ্যই পোড়াইয়া ফেলিবে। হাফিজ, এই দরবেশী পোশাক পরিত্যাগ কর ও অগ্রসর হও।"

হাফিজের আর একটি বিশ্বজনীন কবিতার বাংলা অনুবাদ :

"আর যাহাই কর, কাহাকেও কোন পীড়া বা কষ্ট দিও না, কারণ আমাদের ধর্মে ইহা ছাড়া আর কোন পাপ নাই।"

মহাকবি হাফিজ আজীবন জন্মভূমি শীরাজের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিকেতনে কাটিয়েছেন। ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে শীরাজ নগরে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর স্মৃতিসৌধ ফলকে যে কবিতা-কলি খোদিত রয়েছে, তাতে স্বীকৃত রয়েছে :

"কবি শ্রেষ্ঠ হাফিজ জ্ঞানীদের প্রদীপ ও আল্লার তজল্লীর একটি আলোক-বর্তিকা ছিলেন।"

কাযেই দেখা যায় ওমর খইয়ামের মতো তিনিও ছিলেন প্রথম দিকে "আনন্দ-বিলাসী"। তাঁর সমগ্র কাব্যের সুরটিও ছিল : "ওরে

মূঢ়। এমন ফুলের ফসলের দিন—আর তুই কিনা শরাব ত্যাগ করে বসে আছিস্!" সুরাই ছিল তাঁর কাব্যে প্রাণের আনন্দের প্রতীক।

শুনা যায়, হাফিজের অনেক কবিতা 'সাখেজাবাত্' নামে এক ইরানী সুন্দরীর স্তুতি-গানে রচিত। হাফিজ প্রথম জীবনে 'শরাব সাকীর' উপাসনা করলেও উত্তর জীবনে তিনি সুফী-সাধকে পরিণত হন। হাফিজ জীবিতকালে তাঁর 'দিউয়ান' (কবিতাবলী) সংগ্রহ করে যান নি। মৃতুর পর তাঁর এক বন্ধু কিছু কবিতা সঙ্কলিত করেন মাত্র। ওমর খইয়ামের মতো হাফিজের রুবাঈগুলি রসিক বাঙালী পাঠকদের নিকট অপরিচিত নয়। কাজী নজরুলের অনূদিত দুটি হাফিজের রুবাইয়্যাৎ উদ্ধৃত করে হাফিজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা গেল:

"বিশ্বে সবাই তীর্থ-পথিক
তোমার পথের কুঞ্জগলির।
ছুট্‌ছে নিখিল মক্ষী হয়ে
তোমার আনন আনার-কলির।
আজকে যদি তোমার থেকে
মুখ ফিরিয়ে রয় গো কেহ,
কোন্-চোখে কাল দেখবে তোমায়
হায়রে বে-দিল সেই মুসাফির!"

২.

"দুঃখ ছাড়া এ-জীবনে
হলো না আর কিছুই হাসিল,
বিষাদ হলো সাথের সাথী
তোমায় দিয়ে আমার এ দিল্।
গোপন মনের স্বপন-সাথী
পেলাম না গো বন্ধু কোনো,
ব্যথাই আমার ব্যথার ব্যথী,
তোমার মতোই নিঠুর নিখিল।"

জালালউদ্দীন রুমী

মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী (খৃঃ ১২০৭-৭৩) আর সেখ সাদী (খৃঃ ১১৮৪-১২৯১) দুজনেই ছিলেন সাধক কবি ও দার্শনিক। ইরানের অন্তর্গত বল্‌খ্‌ নগরে জালালউদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান রুম (এশিয়া মাইনর) বলে জালালউদ্দীন রুমী নামে পরিচিত। শৈশবকাল থেকে তিনি ছিলেন মহা ধর্মপ্রাণ। খুব ছোটবেলা থেকে কোরানের পদগুলি তিনি আবৃত্তি করতে পারতেন। সাধক কবি জালালউদ্দীন সম্পর্কে অনেক গল্প মুখে-মুখে প্রচলিত আছে।

একদিন শিষ্যদের নিয়ে জালালউদ্দীন বসে আছেন এমন সময় সামনের গলি দিয়ে এক তুর্কী ফিরিওয়ালা শিয়ালের চামড়া ফিরি করে যাচ্ছিল—'দিল্কু! দিল্কু'! হাঁক দিয়ে। তুর্কী ভাষায় 'দিল্কু' মানে শিয়াল। ফিরিওয়ালার হাঁক শুনে জালালউদ্দীনও অমনি আপন মনে চীৎকার করে উঠলেনঃ 'দিল্‌ কু' (দিল্‌ কোথায়)? ভাবাবেগে আত্মহারা হয়ে পাগলের মতো তিনিও তখন গেয়ে উঠলেনঃ 'দিল্‌ কোথা মোর, দিল্‌ কোথা!'

মৌলানা জালালউদ্দীন রুমীর সেরা রচনা 'মসনবীর'। জালাল-উদ্দীন তাঁর দীক্ষাগুরু শাম্‌সের তাব্রিজের নামেও কিছু কিছু কবিতা রচনা করেন। 'মসনবীর'-এর প্রথম সর্গে কবি বলেছেনঃ

> "তাঁহার আত্মা ছিল নলবনের একটি নল। সে স্বস্থান হইতে উৎপাটিত হইয়া এই মর্তধামে নিশিদিন কাঁদিয়া ফিরিতেছে ও আপনার বিরহের শোকোচ্ছ্বাস গাহিয়া বেড়াইতেছে। তাহারই সমবেদনায় আজ জগতের যত নরনারী ব্যথিত। দিল্‌ তাঁহার চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। সে চায় তাহার এই মর্ম-ব্যথা জগতের দ্বারে দ্বারে শুনাইতে; কিন্তু ভুক্তভোগী ভিন্ন তাহার এই মর্মবেদনা কে বুঝিবে? স্বগোত্র হইতে যে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে সে স্বতঃই চায় তাহার পূর্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে—আমি আমার স্বস্থানে স্বজনের নিকট কবে ফিরিয়া যাইব।" [মহম্মদ বরকতুল্লাহ: 'পারস্য প্রতিভা']

সেখ্ সাদী

সূফী কবিদের মধ্যে সেখ্ সাদীর (সেখ মোস-লেহ-উদ্দীন) স্থান অনেক উর্ধ্বে। সেখ সাদীরও জন্মস্থান শীরাজ। তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানই ছিল তাঁর জীবনের একটা আনন্দ। সমগ্র পশ্চিম এশিয়া, মিশর ও আবিসিনিয়া তিনি ভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন বলে জানা যায়। তাঁর কাব্যে দেশ-ভ্রমণের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে। ইংরেজ কবি লর্ড টেনিসনের বিখ্যাত কবিতা 'ইউলিসিস'-এর উপর সাদীর কাব্যের প্রভাব দেখা যায়। সাদী ছিলেন মধ্যপ্রাচ্যের শিক্ষাগুরু। নানা উপদেশ ও মৌলিক দৃষ্টান্তের মারফত লোক-শিক্ষা ও সমাজ-কল্যাণকর কার্য আর বিপন্নের উদ্ধার করাই ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য। পারসী, আরবী ও উর্দু এই তিন ভাষায় তিনি লিখে গেছেন এন্তার। তাঁর অমর কাব্য 'গোলেস্তাঁ' ও 'বোস্তান' ছাড়া আরও বাইশখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন বলে জানা যায়। সাদীর প্রতিটি লেখা সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত। তাঁর অমর গ্রন্থ 'গোলেস্তাঁ'য় একটি করে ছোট কাহিনী ও তাঁর নীচে নীতিমূলক একটি বয়াৎ থাকত। একে মধ্যপ্রাচ্যের আচার-ব্যবহার ও সমাজনীতির একটি নিখুঁত তসবীর বলা চলে। শুধু তাই নয়, তাঁর 'গোলেস্তাঁ'য় চেঙ্গিজ খাঁর পৌত্র হালাকু খাঁ অনুষ্ঠিত নিষ্ঠুর অত্যাচার আর বাগদাদের অগণিত নরনারীকে নির্বিচারে হত্যালীলা কাহিনীরও সন্ধান মেলে। অনেক স্থলে তার ফুটে উঠেছে অত্যাচারী শাসকবর্গের প্রতি কবির আন্তরিক ঘৃণা ও অবজ্ঞা। এককালে সাদীর 'গোলেস্তাঁ'কে নিয়েই পারসী-ভাষার বিদ্যার্থীদের বিদ্যা শুরু করতে হতো। তাঁর বয়াৎ ছাড়া মোল্লাদের ধর্মালোচনা করা চলত না একচুলও।

দিল্লীর রাজদরবারে কবি আমীর খসরু সাদীর প্রসঙ্গে বলেছেন,

"জিল্দ্-ই-সখুলম্ দারাদ শীরাজ-ই-শীরাজী।"

অর্থাৎ—

"আমার কবিতা গ্রন্থ শীরাজীর (অর্থাৎ সাদী শীরাজীর) চিন্তাধারায় গ্রথিত।"

বস্তুত সকল দেশের সকল সাহিত্যানুরাগীই সাদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর 'গোলেস্তাঁ' ও 'বোস্তান' পৃথিবীর এমন কোন ভাষা নেই যে সে ভাষায় অনূদিত হয় নি। গোলেস্তাঁ ও বোস্তান সরল ও সরস ফারসী ভাষায় লিখিত। জনসাধারণের নিকট তাই যথেষ্ট সমাদৃত। কিন্তু ঘজল জনসাধারণের নিকট ততটা পরিচিত নয়। কারণ, ঘজলের ভাষা কঠিনতর, চিন্তাধারাও অতি উচ্চ স্তরের এবং সূফী চিন্তাধারার সঙ্গে তার যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে। এখানে সাদীর ঘজলের একটি বাংলা উদ্ধৃত করা গেল।

"সেই প্রকৃত বন্ধু যে বন্ধুর অত্যাচার (সকল সময়ই) সহ্য করে; (এবং) তাহার বন্ধুর সন্তুষ্টির জন্য নিজের সন্তোষ পর্যন্ত বিসর্জন দেয়। যদি তাঁহার খাঁটি প্রেমের অস্তিত্বের উপর ধারাল ছুরিকা নিক্ষেপ করা হয় সে ইহার মধ্যে নিজেরই দোষ দেখে, বন্ধুর কোন দোষ দেখিতে পায় না। কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য বন্ধু গ্রহণ—ইহা ঠিক পথ নহে। আমরা বন্ধুর জন্য কামনা বাসনা পরিত্যাগ করিব। শুনিয়াছি, মানুষের তিরস্কার ও বন্ধুর অত্যাচারে অসহ্য হইয়া বন্ধুবর্গ বনে চলিয়া যায়। আমি এমন স্থানে যাইব না যেখানে বন্ধুর চিত্র নাই, (এবং) এমন স্থানে আমার লক্ষ্য নির্দেশ করিব না যেখানে বন্ধুর আসর নাই। তুমি বলিয়াছিলে, ফুলের সময় বাগানের হাওয়া বেশ মনোরম, কিন্তু আমার স্মরণ হইতে বন্ধুর চিন্তাই ছাড়াইতে পারি না। যদি বন্ধুর পরিবতে নানা ফুলে বাগান সজ্জিত থাকে, তথাপি বন্ধুর সঙ্গ ছাড়া বাগান পরিদর্শন একটা বাহুল্য মাত্র। হে বায়ু, যদি অশরীরীদের বাগানে যাও, তাহা হইলে আমার পুরাতন বন্ধুকে আমার দোয়া জানাইয়া বলিও, 'সকলই সংঘবদ্ধ রহিয়াছে কিন্তু

আমিই এক কোণে বসিয়া আছি—বন্ধুর প্রেমের সহিত পার্থিব জিনিসের কোন তুলনাই হয় না।”

গোলেস্তাঁ ও বোস্তান

সেখ্ সাদীর ‘গোলেস্তাঁ’কে পণ্ডিতরা ইরানী সাহিত্য-বাগানের জ্ঞানপুষ্পচয়ণ বলে অভিহিত করেছেন। গ্রন্থখানি আট অধ্যায়ে বিভক্তঃ ১. রাজচরিত; ২. সাধকচরিত; ৩. সন্তোষের মূল্য; ৪. নীরবতার উপকারিতা, ৫. প্রেম ও যৌবনত্ব; ৬. দুর্বলতা ও বার্ধক্য; ৭. শিক্ষার গুণ; এবং ৮. সামাজিক ভদ্রতা। এর প্রত্যেকটি অধ্যায়ই সুন্দর সুন্দর উপদেশপূর্ণ নীতিগল্পের দ্বারা সজ্জিত। নিম্নে হাজিফের ‘গোলেস্তাঁ’র দুইটি গল্পের নমুনা দেওয়া গেল। প্রথম কাহিনীটি সাধকচরিত অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত:

“এক রাজা একদল সাধুকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। তখন তাঁদের একজন রাজার সামনে এসে বললেন, সম্রাট, বাহ্যিক ঐশ্বর্যের দিক থেকে আমরা তো অনেক ছোট। কিন্তু আরাম বা আনন্দের দিক থেকে আমার তোমার থেকে বেশী সুখে আছি, মৃত্যুর সময় আমরা উভয়ই সমান, কিন্তু ক্বিয়ামৎ (বা শেষ-বিচারের দিন)-এর সময় তোমার থেকে আমরা আরও সম্মানিত। বাহ্যত সাধক একজন ছিন্ন বস্ত্র ও জটাধারী মাত্র; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর মন জীবিত ও কামমৃত। সাধকের পথ হল—খোদার নাম, তাঁর গুণগান, তাঁর বন্দগী ও নমাজ, দান, সন্তোষ ও খোদার ঐক্য চিন্তা, নির্ভরতা, আত্মোৎসর্গ ও সহনশীলতা। যে এ সকল গুণে গুণান্বিত, সে-ই প্রকৃত সাধক। কিন্তু যদি কেহ সাধকের পোশাক পরিধান করে এবং নমাজের প্রতি মনোনিবেশ না করে কেবল কামনা চরিতার্থতার জন্য রাতদিন সময় অতিবাহিত করে, ঘুমে অচেতন থাকে, যা পায় তাই খায় এবং যা মুখে আসে তাই বলে, সে একজন লম্পট, সে কখনও প্রকৃত সাধু নহে।”

দ্বিতীয় গল্পটি 'নীরবতা' শীর্ষক অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

"একজন বিজ্ঞলোক ন্যায়পরায়ণ নৌশীর খান্-এর দরবারে আলোচনা করছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নির্বাক রইলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কেন এই আলোচনায় আমাদের সঙ্গে যোগদান করছেন না? তিনি উত্তর করলেন, মন্ত্রিবর্গ চিকিৎসকের ন্যায়। চিকিৎসক রোগী ব্যতীত কাকেও ঔষধ প্রদান করেন না। যখন দেখছি যে আপনাদের মতামতই সঠিক আছে, তখন এই বিষয় নিয়ে আবার কিছু বলা বুদ্ধিমত্তার পবিচয় নয়।"

সাদীর নীতিগল্পগুলিও কেবল সুন্দর ও উপদেশপূর্ণ নয়, ভাষাও বেশ সরস। তাঁর 'গোলেস্তাঁ' এমন অনেক বাক্য আছে, যা শ্রুতি-মধুরতা ও অর্থের পূর্ণতাহেতু প্রবাদবাক্যের মতো লোকমুখে শুনা যায়। যেমন, পোশাকে যারা বড় তারা সব সময় গুণেও বড় নয় (নিহ্ হর্ কি ব-ক্বামৎ মিহ্ তর্ ব-কিমৎ বিহ্ তর্); মহত্ত্বই প্রকৃত সম্পদ, ধন নয় এবং জ্ঞানই শ্রেষ্ঠতার পরিচয়, বয়স নয় (তরান্‌গরী ব-হুনর্ অস্ত্ নিহ্ ব-মাল্ র বুজ.র্গী ব-'অকল অস্ত নিহ্. ব-সাল্'); এ অসম্ভব যে জ্ঞানীর স্থান কখনও অজ্ঞানী দখল করবে (মহাল অস্ত্ কি হুনর্‌মন্দান্ ব-মীরন্দ র বী-হুনরান্ জায় ঈশান্ শীরন্দ্); মুক্তা কাদাতে গড়াগড়ি গেলেও তার মূল্যের কোন লাঘব হয় না, এবং ধুলা আকাশে উড়লেও সে ধুলাই থাকে (গৌহর্ অগর্ দর্ খলাব্ উফ্ তদ্ হমচূনান্ নফীস্ অস্ত্ র ঘব্-বার অগর্ বর্ অসমান রুরদ হমচূনান্ খসীস্); কর্মবিহীন জ্ঞানী ও মধুহীন বোলতার ন্যায় (আলিম্-ই-বী-'অমল্ জ. নবূর্-ই-বী-'অসল অস্ত্), এবং বন্ধুরই সঙ্গ করবে, শত্রুর সংসর্গ কখনও করবে না (খ্বান-ই-দূস্তান্ বরূব র দর-ই-দুশ মনান্ মকূব) ইত্যাদি।

'গোলেস্তাঁ'-এ সংক্ষেপে কবির ছাত্রজীবন ও ভ্রমণ-কাহিনীর অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ রূপ আমাদের নিকট প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। ধর্ম সম্বন্ধেও তাঁর কোন সঙ্কীর্ণতা ছিল না। তিনি গোলেস্তাঁয় লিখেছেন:

"একজন ইহুদী ও একজন মুসলমান পরস্পর ধর্ম নিয়ে এরূপ তর্ক আরম্ভ করল যে তাই শুনে আমার বেজায় হাসি পেল। মুসলমানটি বলতে লাগল, 'যে ধর্মপথে আমি চলছি এ যদি সত্যই ঠিক না হয় তাহলে, হে খোদা, আমি ইহুদী হতে প্রস্তুত আছি।' ইহুদী বলল, 'আমি বাইবেল নিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, যদি আমার পথ ঠিক না হয়, তাহলে আমি তো মুসলমানের মতই'।—যদি এই পৃথিবী হতে জ্ঞান বিনষ্ট হয়ে যায় তথাপি কেউ একবারও ভাবতে পারে না যে 'আমিই' অজ্ঞান।"

"গর্ অজ্. বসীত্ব-ই-জ.মীন্ 'অক্ল্ মুন্'অদিম্ গর্দদ্।
বখুদ্ গমান্ নবুরদ্ হীচ্ কস্ কি নাদানম্॥"

'বোস্তান'ও 'গোলেস্তাঁ'র মতো কতকগুলি গল্পের সমাবেশ। বোস্তানে কবি অনেকটা আত্তারের অনুরণন করেছেন এবং তাঁর মস্নবী কাব্যে তিনি যথেষ্ট সফলতা লাভ করেছেন। বোস্তান 'বঃহর্-ই-তক্কারিব' ছন্দে লিখিত। তাঁর এই কবিতা দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা ঃ

১. ন্যায়পরায়ণতা, সংযম ও জ্ঞান; ২. সততা; ৩. প্রেম; ৪. বিনয়; ৫. রিজা বা সম্মতি; ৬. সন্তোষ; ৭. শিক্ষা; ৮. কৃতজ্ঞতা ও শান্তি; ৯. অনুতাপ ও সাধুতা; এবং ১০. নমাজ। কবি এইসকল নীতিমূলক চরিত্রের বিশ্লেষণ নানা রকম গল্পের সাহায্যে করে গেছেন। 'বিনয়'-শীর্ষক অধ্যায় থেকে একটি নমুনার অনুবাদ দেওয়া গেল ঃ

"মেঘ থেকে একটি জলকণা পতিত হল। তা সাগরের বিস্তৃতি দেখে লজ্জিত হল এই কারণে যে, সমুদ্রের অবস্থার তুলনায় আমি (অর্থাৎ জলকণা) কি? সমুদ্রের অস্তিত্বের মধ্যে আমার অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে বিলীন হয়ে গিয়েছে। ইহা নিজেকে ঘৃণার চক্ষে দেখেছিল বলেছিল বলে ঝিনুক তাকে প্রাণপণে নিজের কোলে প্রতিপালন করল। প্রকৃতি এরূপ ভাবেই কার্য সমাধা করল যে, প্রসিদ্ধ রাজোচিত মুক্তায় পরিণত হল। জ্ঞানী ব্যক্তি

নম্রতাই পছন্দ করে; ফলযুক্ত শাখাই মাটিতে তার মাথা নত করে।"

সাদীকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল: "আপনি দর্শন কার কাছে শিখেছেন?" সাদী উত্তরে বললেন: "এক অন্ধের কাছে।"

"অন্ধের কাছে।"

"হ্যাঁ। কেননা, অন্ধরা সামনের মাটি ভাল করে পরীক্ষা করে তবে পা বাড়ায়, আমিও তাই।"

এমনিতর বহু নীতিগল্প গোলেস্তাঁ ও বোস্তানে ছড়িয়ে আছে। এমন সহজ সরল নীতিকথা পরমহংসদেবের মুখেও আমরা শুনতে পেতাম। ১২৯১—৯৪ সালের মধ্যে ধর্মপ্রাণ এই সাধক-কবি লোকান্তরিত হন বলে জানা যায়। শীরাজেই সাদীর সমাধিস্থান অবস্থিত। কোন কোন পারসীক লেখক সাদীই প্রথম হিন্দুস্থানী ভাষায় কবিতা রচনা করেন বলে দাবি করেন। তবে এই বিষয়ে সঠিক প্রমাণাদির অভাব থাকলেও মুসলিম ও ইংরেজ আমলে ভারতে অনেক মাদ্রাসা ও মক্তবেই শিশুরা সাদীর বয়ৎ আওড়ে পারসী ভাষার পাঠ নিত:

"কারীমা বে-বখ্‌শায়ে বর্ হালে মা
কে হাস্তম্ আসীরে কামান্দে হাওয়া।
না দারেম গায়েরাজ তু ফরিয়াদ রাস্
তু-য়ী-আসীস্‌যারাঁ খাতা-বখ্‌শ্ ও বাস্।
নেগাহ্‌দার মা'রা যে রাহে খাতা
খাতা দার্: গোজারো সওয়াবম্ নমা।"

সূফী মতবাদ

সজ্‌কীয় সম্রাটদের আমলে ইরানে সূফী মতবাদ প্রাধান্য লাভ করে। এই সূফী ধর্মমত প্রাচীন ইরানের অল্পবিস্তর সব কবিকেই প্রভাবান্বিত করেছিল। সূফী মতবাদ বা তার তত্ত্বকথা কবে ইরানে

প্রথম প্রভাব বিস্তার করে, সে সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন সূফী ধর্মমত প্রাচীন পারস্যের নিজস্ব সম্পদ। আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করেন বেদান্ত ও উপনিষদের সঙ্গে সূফী ধর্মের অনেকখানি সমন্বয় রয়েছে। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি এই মতবাদে নিহিত আছে। আবার কোন কোন পণ্ডিতের মতে প্লেটো, এরিস্টটল প্রমুখ গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদ পারসী ও আরবী অনুবাদ মারফত ইরানে প্রসারতা লাভ করে আর সূফী মতবাদের সৃষ্টি করে। সূফ—অর্থাৎ পশম শব্দ থেকে এসেছে সূফী কথাটি। সূফীরা অনেক সময় পশমী কাপড় পরিধান করে পার্থিব ভোগ-বিলাস বাসনা-কামনা ছেড়েছুড়ে ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণায় আত্মনিয়োগ করতেন।

বাবা তাহির উরিয়ান হনদনীকে প্রথম সূফী কবি বলা হয়। তিনি পারসী ও আরবী উভয় ভাষায় কবিতা লিখে গেছেন। অধ্যাপক হরেন্দ্রচন্দ্র পাল মশায়ের কথায়ঃ

> "তাঁর কবিতায় পাই খোদা ও মানুষের মৌলিক ঐক্য ; এবং এর বিভিন্নতার জন্যই মানুষের আল্লার সান্নিধ্য থেকে বিচ্যুতি ও পৃথিবীতে নানা রকম দুঃখ-কষ্ট ও সাংসারিক অশান্তি। এই বিভিন্নতার মধ্যেই প্রেমবিস্তার দ্বারা মানুষ তাঁর সঙ্গে মিলিত হয় এবং যে পর্যন্ত না মানুষ সেই স্থানে পৌঁছে বিরহের ক্রন্দন তাঁর জীবনে সব সময় ধ্বনিত হতে থাকে।"

বাবা তাহির হনদনীর একটি সূফী রুবাঈর বাংলা অনুবাদঃ

> "আমি এমন মনের অধিকারী যাহা প্রেমের জন্য লালায়িত এবং এজন্যই প্রেমের হাট ভরপূর। আমার মনরূপ অঙ্গে পরিশ্রমের ওতস্যূত্র ও প্রেমের তার দ্বারা পোশাক বয়ন করিয়াছি।"

অবু সয়িদ বিন অবুল খঈর সূফী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। খোরসান-এ ৯৬৭ সনে তাঁর জন্ম। তিনি প্রসিদ্ধ সূফী মতবাদে অবু

অবত্তুর রহমান সলমীর শিষ্য ছিলেন। সূফী মতবাদের মর্মকথা তাঁর কবিতায় নিহিত রয়েছে। আর সেটা হল "মাথায় যা আছে তা পরিত্যাগ কর। হাতে যা আছে তা দাও বিলিয়ে। কোনরূপ দুঃখ-কষ্টে বিচলিত হয়ো না।" অর্থাৎ হৃদয়ের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে বিষয়-আশয় সব কিছু বিলিয়ে দেওয়াই আর মানুষের সব দুঃখ-কষ্টকে ঈশ্বরের দান বলে গ্রহণ করাই সূফী ধর্মের মূল কথা। গীতার তত্ত্বকথার সঙ্গে সূফী মতবাদের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করবার। তিনি আরও বলেন :

> "খোদা ও তাঁহার বান্দার মধ্যে পর্দা সৃষ্টির কারণ স্বর্গ ও মর্ত্য নহে, অথবা রাজসিংহাসন ও পাদপীঠ নহে; তোমার স্বার্থপরতা ও মোহই ইহার কারণ, এবং যখন তুমি এই সকল পরিত্যাগ করতে পারবে তুমিই খোদায়ি বা খোদাত্ব প্রাপ্ত হতে পার।"

তাঁর আর একটি রুবাঈর বঙ্গানুবাদ :

> "এই পৃথিবীতে ইহা (মৃত্যু) হইতে মহৎ আর কি হইতে পারে? বন্ধু বন্ধুর নিকট সখা সখার নিকট যাইতেছে। উহা (জীবন) ছিল দুঃখপূর্ণ এবং ইহা (মৃত্যু) আনন্দময়। উহা (জীবন) ছিল কথার কথা এবং ইহাই প্রকৃত কাজ।"

অবুল্ মজদ্ আদম্ সনায়ী গজনবী রাজদরবারে (একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কার) আর একজন সূফী কবি। শেখ মহম্মদ অত্তারও এমনি আর একজন সূফী মরমী কবি। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় তাঁর জন্ম। তিনি প্রায় একশ' বছর কাল জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি মিশর, দামাস্কাস, ভারতবর্ষ, তুর্কিস্তান প্রভৃতি নানা দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। সূফী কবি হকীম নাস্বির খসরু খৃষ্টীয় একাদশ শতকের গোড়ার দিকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গজনবীর ও সল্জূকীয় সম্রাটদের দবীর বা লেখক ছিলেন। নানা শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করবার

উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তান, আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে সফর করেন। তাঁর এই ভ্রমণ-কাহিনী 'সফরনামা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ১০৮৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। নাস্বির খসরু তাঁর সহজ সরল গদ্য রচনা, ভ্রমণকাহিনী ও আত্মচরিত ছাড়াও অসংখ্য তত্ত্বমূলক বয়ৎ ও অন্যান্য কবিতা রচনা করে গেছেন যাতে "ধর্মের গূঢ়তত্ত্বসমূহ, পার্থিব জীবনের অসাড়তা ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষতা"-র পরিচয় পাওয়া যায়। নাস্বির খসরুর দুটি কবিতার মর্মানুবাদ উদ্ধৃত করা গেল ঃ

> "শরীর প্রাণ দ্বারা আর প্রাণ জ্ঞান দ্বারা জীবন্ত হয় ; জ্ঞান প্রাণখনির মূল্যবান ধাতু। হে বিচক্ষণ, জ্ঞান তোমার প্রাণের প্রাণ ; প্রাণের প্রাণকেই তোমার অনুসন্ধান করা উচিত।"

জ্ঞানার্জন কর। ঈশ্বরকে জানতে হলে জ্ঞানমার্গের পথে অগ্রসর হতে হবে। ঈশ্বরকে জানবার এই সহজ তত্ত্বকথাই তাঁর কাব্যে পরিস্ফুট হয়েছে। এমনি গূঢ় কথায় তাঁর আর একটি বয়ৎ-এ অনুরণিত হয়েছে দেখা যায় ঃ

> "জ্ঞান লাভ না কবলে কোন ভাল কাজ করা যায় না ; রৌপ্য ছাড়া দির্‌হম ও স্বর্ণ ছাড়া দীনার তৈয়ার হয় না।"

নিজামী

সেকালের ইরানী সাহিত্যের ক্লাশিকাল স্বর্ণযুগের আর একজন প্রতিভূ হলেন নিজামী (খৃঃ ১১৪০-১২০৩)। পুরো নাম তাঁর আবু মহম্মদ ইলিয়াস্‌ নিজাম অল্‌-দীন। রোমান্সধর্মী মহাকাব্য রচনায় তাঁর স্থান ছিল ফেরদৌসীর পরে। তাঁর সুবিখ্যাত 'খামসা' রচিত হতে সময় লেগেছিল ৩০ বছর। 'খসরু ও সিরিন', 'লায়লা ও মজনু', 'মহান আলেকজান্দার' প্রভৃতি তাঁর পঞ্চরত্ন 'খামসা'র অন্তর্ভুক্ত। লায়লা-মজনু আর খসরু ও সিরিনের কাব্যাকারে অপরূপ প্রেমের কাহিনী প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের ঘরে ঘরে আজিও সমাদৃত।

ঘজনী সুলতানদের ভারত আক্রমণের পর দিল্লীর রাজদরবারে

ইরানী ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করতে থাকে। ফলে ভারতীয় ইরানী কবিদের মধ্যে আমীর খসরু (১২৫৩-১৩০৬ খৃঃ) ছিলেন অগ্রণী। পাতিয়ালাতেই তাঁর জন্ম। ছোটবেলা থেকেই তিনি গান ও কবিতা লিখতে পারদর্শী ছিলেন এবং স্ফী ধর্মমতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেন। তাঁর সহজ সরল কবিতাবলী ভাব-মাধুর্যে ও ছন্দবৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল ছিল। তাঁর দীবান বা কাব্যগ্রন্থ আজিও অনেকের মুখে শোনা যায়। দিল্লীতে তাঁর মৃত্যু হয়। পানিপথের প্রথম যুদ্ধের পর দিল্লীর মসনদে মোঘল সাম্রাজ্য কায়েমী হলে বহু ইরানী কবি ও কথাশিল্পী বুখারা, সমরখন্দ, হেরাত, তুর্কীস্তান প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভারতে ছুটে আসেন। দিল্লী ও দাক্ষিণাত্যের মুসলমান স্থলতানদের রাজ-দরবারে তাঁরা বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। এই সব কবিদের মধ্যে আবদুর রহমান খান-ই-খানান, উরফী, শীরাজী, ফৈজী, শকীবী, কাশানী প্রভৃতি বহু কবিদের নাম উল্লেখ করতে হয়। দিল্লীর মোঘল সম্রাটদের প্রায় সকলেই কেবল বিদ্বোৎসাহী ও সাহিত্যে অনুরাগী ছিলেন না, নিজেরাও কিছু কিছু সাহিত্য রচনা করে গেছেন। বাবর, হুমায়ুন, জাহাঙ্গীর প্রভৃতি অনেকেই কিছু-না-কিছু কাব্যচর্চা করে গেছেন। বাবরের রচিত দুইটি ঘজলের বঙ্গানুবাদ ঃ

"চাঁদবদনে হে অনুপমা, তোমার আমার
মিলনরাত্রি যেন সুখের প্রভাত। কিন্তু
বিচ্ছেদের দিনটি বুঝি বিষাদের সন্ধ্যা।

প্রিয়তম, আমার বুকে হান তুমি নিঠুর
আঘাত। তাতেই আমি পাব তৃপ্তি,
কেন না, তোমার দেওয়া আঘাত-চিহ্ন
আমার উদ্বেল চিত্তে আনবে শান্তির
সুশীতল বারি।"

সম্রাট আকবরও যে একজন পারসী কবি ছিলেন নীচের এই বয়ৎটির বাংলা অনুবাদ তার প্রমাণ :

"ক্লিষ্ট মজ্‌নূনের স্কন্ধ মত্ততার শিকল দ্বারা আবদ্ধ নহে ; প্রেমেই বন্ধুত্বের হস্তদ্বারা তাহার বন্ধুত্ব জড়াইয়া রহিয়াছে।"

সম্রাট জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের দাম্পত্য জীবনের একটি চিত্র নীচের কবিতা দুটিতে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত জাহাঙ্গীর একজন সুলেখকও ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর আত্মচরিত "জাহাঙ্গীরনামা"।

পরমাসুন্দরী পত্নীর উদ্দেশে সম্রাটের উক্তি :

"আমি বুলবুল নই যে আমার ক্রন্দন দ্বারা অন্যের মাথা-ব্যথার উদ্রেক করিব। পরওয়ানার ন্যায় আমি পুড়িয়া দগ্ধ হইব, তবু কোন অনুযোগ করিতে চাই না।"

নূরজাহান প্রত্যুত্তরে গেয়ে উঠলেন :

"আমি পরওয়ান বা তসরে পোকা নই যে এক ঝাঁপে আগুনে প্রাণত্যাগ করিব। আমি মোমবাতির ন্যায় দগ্ধ হইতে থাকিব, তবু একটি কথাও বলিতে চাই না"।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের দুহিতা জেবুন্নিসারও কবিখ্যাতি অপরিচিত নয়। তাঁর কবিনাম ছিল 'মকফী'। জনশ্রুতি, তিনি নাকি জনৈক হিন্দু কবির প্রেমে মুগ্ধ হন। তাঁর উদ্দেশ্যে সম্রাটজাদী যে পারসী বয়ৎটি রচনা করেন, তার বাংলা অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

"বুলবুল যদি বাগানে আমাকে দেখিতে পায় তাহা হইলে সেও বাগান হইতে চলিয়া যাইবে। যে ব্রাহ্মণ আমাকে দেখিতে চায়, সে তাহার আদর্শকে কেমন করিয়া পূজা করিবে? ফুলের গন্ধের ন্যায় আমি আমার কাব্যের মধ্যেই লুক্কায়িত রহিয়াছি। যে আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করে, সে আমার কাব্যের অনুসরণ করুক।"

এ ছাড়াও বহু ভারতীয় ও ইরানীয় কবি এ সময় বিবিধ কাব্য ও গ্রন্থ রচনা করে ইরানী ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। বহু হিন্দুও

এ সময় পারসী সাহিত্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে চন্দর্ ভন্ বর্হমন্ ছিলেন সবিশেষ খ্যাত। তিনি সম্রাট শাহজাহানের পুত্র দারাশিকোর অত্যন্ত প্রিয়। চন্দর্ ভন্ বর্হমন্-এব ঘজল ইত্যাদিতে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-জ্ঞানের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। রাজকুমার দারাশিকো কবিদের কেবল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না নিজেও একজন সুপণ্ডিত, শাস্ত্রবিদ, দার্শনিক ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর রচনায় হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম-সমন্বয়ের সুষ্ঠু পরিচয় বেখে গেছেন।

গদ্য-রচনা

সেকালের ইরানী সাহিত্যের সমৃদ্ধি আর মহত্বর অবদানের কথা খুব করে বলবার আব প্রয়োজন হবে না। শুধুমাত্র কাব্যে সে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নেয় নি, গদ্যেও সে বড় একটা কম যায় না। আবুসিনা আর আল্-বেরুনির সার্থক রচনা কিংবা সিয়াসৎনামা আব কুবাসৎনামা প্রভৃতি সেকালেব প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইরানী গদ্য-সাহিত্যের বিকাশ ও পুষ্টিসাধন করেছে অনেকখানি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তর ঐতিহাসিক ও জীবনী-সাহিত্যও রচিত হয় এ সময়। আতা মালিক যুবানি দিগ্‌বিজয়ী চেঙ্গিস্ খাঁর 'বিজয়-অভিযান' অবলম্বনে এক ঐতিহাসিক কেতাব রচনা করেন। রশিদ অল্ দিন তাঁর নানা লেখায় ('তারিক্ গুজেদা') সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে সমসাময়িককাল পর্যন্ত এক ঐতিহাসিক ধারা টানবার চেষ্টা করেছেন। 'জাফরনামা'য় তিনি ফেরদৌসীর 'শাহ্‌নামা'র জের টেনে গেছেন। তৈমুরলঙ্গের বিজয়-কাহিনী নিয়েও জাফরনামার অনুরূপ আর একখানি ঐতিহাসিক পুস্তক লিখিত হয় সাম-ই-গজনী কর্তৃক। পঞ্চদশ শতকেও এই জীবনী-সাহিত্যের ধারা অব্যাহত থাকে। কবি জামিরের সূফী-সন্তদের জীবনচরিত 'নাফাহৎ অল্-উনস্' এক স্মরণীয় সৃষ্টি। আমীর দৌলত শাহের

'তাজ্ কিরাত্ অল্-স্থরা' কবিদের স্মৃতিকথার এক অপূর্ব গ্রন্থ। দিল্লীর সম্রাট বাবরের আত্মচরিত 'বাবরনামা' তখনকার দিনের আচার-ব্যবহার ও প্রচলিত রীতি-নীতি বিষয়ক একখানি প্রমাণ্য গ্রন্থ। এই আত্মচরিতখানি আঞ্চলিক তুর্কী ভাষায় লেখা। ইরানী সাহিত্যের পরিধি কেবলমাত্র মধ্যপ্রাচ্যের ইরান-হিরাতের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি, দূরে দিল্লীর মস্নদেও তার কদর বেড়ে ওঠে। দিল্লীব আমীর খসরুও (খৃঃ ১২৫৩-১৩২৪) ছিলেন ইরানী সাহিত্যের অন্যতম একনিষ্ঠ সাধক। তিনি বিস্তর গান ও কবিতা রচনা করেন। ইরানী সাহিত্যে ইনি ছিলেন 'বুলবুলে হিন্দ' নামে স্থপরিচিত। ভারতীয় সঙ্গীতে আমীব খসরুর দানও অপরিসীম। তাঁর কাব্যখ্যাতি এতই প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য বৃদ্ধ বয়সে কবি সেখ সাদী নাকি ছুটে এসেছিলেন ইবান থেকে ভারতে।

সাফাবিদ্ যুগে (খৃঃ ১৪৯৯-১৭২২) এই গদ্য-সাহিত্যের আরও উন্নতি সাধিত হয় ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আসন কায়েম হবার ফলে মধ্যপ্রাচ্যে পারস্যের রাজনৈতিক গুরুত্ব বেড়ে ওঠে অনেকখানি। রাশিয়ার জারের হাতে পারস্য-সম্রাট শাহর সামরিক বিপর্যয় সচেতন করে তোলে নিজেদের অক্ষমতা সম্পর্কে ইরানীদের। 'আমির-ই-কবীর' মির্জা তাঘি খাঁ-ই প্রথম নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলেন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনগ্রসর ইরানীদের। মির্জা তাঘি খাঁ ছিলেন শাহ্ নসির-অন-দীনের (খৃঃ ১৮৪৮) প্রধানমন্ত্রী। তিনি দীর্ঘকাল ছিলেন রুশদেশে। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় আধুনিক ইরানী সাহিত্যের—বিশেষ করে তার গদ্য-সাহিত্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে ওঠে।

ভ্রমণ-কাহিনী মারফত এ আধুনিক গদ্য-সাহিত্যের হাতেখড়ি হয়। ইরানী পাঠকরাও তাঁকে নেয় সাদরে বরণ করে। জয়নল আবেদিনের লেখা 'সিয়াহৎনামা-ই-ইব্রাহিম্ বেক্' এমনি এক উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ-কাহিনীর কেতাব। আধুনিক ইরানী কথা-সাহিত্যের এক স্মরণীয়

গ্রন্থও তাকে বলা চলে। বইখানা তিন খণ্ডে বিভক্ত আর কায়রো, কলিকাতা আর ইস্তাম্বুল—এ তিন স্থান থেকে প্রকাশিত হয় (১৯০৭-০৯ সালে)। ইব্রাহিম বেকের বর্ণিত এই ভ্রমণ-কাহিনীতে ব্যঙ্গচ্ছলে লিপিবদ্ধ আছে এক যুবকের ইরান-যাত্রার কথা। কায়রো-প্রবাসী এক ইরানী বংশে জন্ম এ যুবকের। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দেশভক্ত। প্রবাসী পিতার মুখে তিনি তাঁর জন্মভূমি ইরানের যশোগাথার নানা অপরূপ কাহিনী শুনেছিলেন। কিন্তু পদার্পণ করে তিনি হতাশ হলেন। দেখলেন, স্বপ্নের সেই ইরান আর নেই। দুঃখ, দুর্দশা, শোষণ আর শোষিতের মর্মবেদনায় সারাটি দেশ ছেয়ে গেছে। অতীতের সেই পারস্যভূমির সঙ্গে এখনকার ইরানের অবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন তিনি এই ভ্রমণ কাহিনীতে। সমসাময়িক ইরানের বাস্তব একটা চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন পাঠকদের সামনে। যেহেতু এ ভ্রমণ-কাহিনীর নায়ক ইব্রাহিম বেক একজন কাল্পনিক পথচারী, তাই এই গ্রন্থকে পারস্যের প্রথম আধুনিক উপন্যাসও বলা চলে। ভুল-ত্রুটি যে নেই, তা নয়। তবু বইখানি সুখপাঠ্য। তাছাড়া, তখনকার পারস্যের সমাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ছাপার হরফে প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে বইখানার মূল্য নেহাত কম নয়। কথ্য ভাষা যে রসসমৃদ্ধ প্রকৃত সাহিত্যের অন্তরায় নয়, তার প্রমাণও মেলে জয়নল আবেদিনের এই 'সিয়াহৎনামা'য়। তালিবফ্-এর 'মাসালিক-অল্-মুহ্সিন'ও এমনি এক ভ্রমণ-কাহিনী। তবে বিষয়বস্তু তার স্বতন্ত্র। লেখক সহজভাবে তাঁর পাঠকের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এই পুস্তকে। তাঁর রচিত 'কেতাব-ই-আহমদ' শিশুপাঠ্য আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের এমনি একখানা বই।

১৯০৫ সালে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয় 'হাজিবাবা' নামে পারসী ভাষার এক অনবদ্য গ্রন্থ। বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ ইরানের আধুনিক সাহিত্যকে—বিশেষ করে তাঁর নাটককে শক্তিশালী করে তোলে।

চলতি ভাষা লিখিত ভাষা হিসাবে নতুন স্বীকৃতিও লাভ করে। বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ ইরানের আধুনিক সাহিত্যকে—বিশেষ করে তাঁর নাটককে শক্তিশালী করে তোলে। চলতি ভাষা লিখিত ভাষা হিসাবে নতুন স্বীকৃতিও লাভ করে। চলতি ভাষা দীর্ঘকাল ধরে সরকারী দলিল-দস্তাবেজ আর সাহিত্যের আসরে ছিল অপাংক্তেয়। তুর্কী ছিল তখনকার পারস্যের দরবারী ভাষা। বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ একালে ইরানী গদ্য-সাহিত্যে নিয়ে আসে নতুন নতুন ভাবধারা আর নতুন নতুন আঙ্গিক। দেশের সংবাদপত্রও নতুন এই সাহিত্যসৃষ্টিকে আরও জোরদার করে তোলে। মির্জা সালি শীরাজীর প্রতিষ্ঠিত 'কাগজ-ই-আকবর'-এর অবদান এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার যে প্রেস থেকে 'হাজিবাবা' কেতাব ছাপা হয়েছিল, সে প্রেস থেকেও একখানি পারসী ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো। ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত 'আখ্‌তার' পত্রের দানও কম নয়।

ছোটগল্প বা উপাখ্যান অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে ইরানী সাহিত্যে সত্যি, কিন্তু একালের ইরানী কথা-শিল্পীরা ইউরোপ আর আমেরিকার লেখকদের অনুকরণে গল্প লেখা চালু করেন। মোঁপাসা আর এড্‌গার এলেন পো প্রমুখ লেখকদের প্রভাব তাই দেখতে পাওয়া যায়। আধুনিক ইরানী লেখকরা এখনও কিন্তু আঙ্গিকের দিক থেকে মান্ধাতার আমলের 'হেকিয়া' বা উপাখ্যানের সেই মামুলি ধারা আঁকড়ে রয়েছেন। তবু কিন্তু নতুন নতুন প্লট আর বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের দিক থেকে তাঁরা আধুনিক ইরানী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে নি, বলা যায় না। জামালযাদের বিখ্যাত রচনা 'একি বাত্‌ একি না বাত্‌'-এর মুখবন্ধে সত্যিই লিখেছেন: ছোটগল্প আর উপন্যাস হলো জাতির জীবনধারা আর জাতীয় মানসের মুকুর।

এখনকার ইরানী গল্প-উপন্যাসে সমাজের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয়েছে। সাদিক্ হেদায়াৎ-এর স্থান একালের ইরানী কথাশিল্পীদের মধ্যে অনেক ঊর্ধ্বে। জামালযাদের মতো হেদায়াৎও পারসী সাহিত্যিকদের

প্রভাবে বিশেষ করে প্রভাবান্বিত। ছোটগল্প-লিখিয়ে হিসাবে তিনি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছেন বটে, কিন্তু একালের ইরানী সাহিত্যের তিনি 'শেক্সপীয়র' আর 'মার্লো', 'জনসন' আর 'লিলি' নামে পরিচিত। ১৯০৩ সালে তাঁর জন্ম। আর মাত্র ৪৮ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন প্যারিসে। কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যে তিনি তিনখানা নাটক (তাদের মধ্যে দুইখানি ঐতিহাসিক—আরব আর ইসলাম কর্তৃক পারস্য বিজয়ের আগেকার কাহিনী অবলম্বনে রচিত); দুটি ভ্রমণ-কাহিনী ('ইস্পাহান' তার মধ্যে প্রসিদ্ধ)। ইরানের প্রাচীন সাহিত্য ও লোকগাথা নিয়েও তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখে গেছেন, অনুবাদও করেছেন অনেক। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে তিনি পারস্য ভাষায় প্রায় ৫০টি সার্থক ছোটগল্প রচনা করেছেন। বিস্তর তিনি লিখেছেন সত্যি কিন্তু এটি তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। সার্থক লেখককের সকল গুণই তাঁর মধ্যে ছিল। আর তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভা কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি; তিনি ছিলেন সব রকমের সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে। ব্যক্তি হিসাবেও তিনি ছিলেন উদার ও সহৃদয়। সাদিক হেদায়াতের সাহিত্যিক অবদানের পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা এখনও হয় নি, তাই একালের ইরানী সাহিত্যে তাঁর অবদানের কথা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তাঁর শেষ পরিণতি আত্মহত্যায় পর্যবসিত হয়। (*Life and Letters*—Vol. 63, 1949)

১৯৩০ সালের দিকে ছোটগল্প আর উপন্যাস রচনার সাড়া পড়ে যায় সারা দেশে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইরানের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একালের লেখকরাও সচেতন হয়ে ওঠেন। তাঘিযাদের, কোয়াজাবিন, সৈয়দ নাফিসি, সাফাফ মিনোভি প্রভৃতি লেখকেরা ইরানের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সংরক্ষণ আর সাহিত্যিক উৎকর্ষতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর হন। রেজা শাহের আমলে আর একজন সেরা লেখক হলেন মহম্মদ আলি ফারগি। সুন্দর অনবদ্য গদ্যে তিনি

পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন। ফারগি আর তাঘিষাদের প্রমুখ পণ্ডিতরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভাষার সংস্কারের দিকে মনোযোগ দেন।

তিরিশ সালের অপর কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে মহম্মদ মাসুদ, বুর্জগ আলাভি-আলি দাস্তি আর সাদেক চুবাক-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহম্মদ মাসুদের 'তল্লাস-ই-মাস' (জীবিকার সন্ধানে) প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। এই উপন্যাসে তিনি সমাজের গলদের দিকটা তুলে ধরেছেন বলিষ্ঠ জোরালো ভাষায়। তাঁর রচনায় সামাজিক পরিবেশ আর বর্ণনা এমিল জোলার কথা মনে করিয়ে দেয়। আততায়ীর হাতে তাঁকেও প্রাণ হারাতে হয়। মৃত্যুর পর তাঁর একাধিক অপ্রকাশিত উপন্যাস প্রকাশিত হয়। মাসুদের উত্তরসূরী বুর্জগ আলাভি প্রথম গল্প-লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর প্রথম গল্প-সংগ্রহ গ্রন্থ: 'চামদান' (স্যুট্‌কেস) প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে। তাঁর গল্পে গভীর হৃদয়াবেগ আর মনোবিকলনের ছাপ রয়েছে। রাজনৈতিক কারণে দীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল তাঁকে কাটাতে হয় জেলে। জেল ও জেল-জীবন সম্পর্কে তাঁর 'বন্দীশালার দিনপঞ্জী' এক অপূর্ব রচনা। '৫৩ জন', 'নামেহ্‌' (চিঠি) কিংবা উপন্যাস 'মেয়েটির চোখ' প্রভৃতি লেখায় আলাভির সাহিত্য-প্রতিভার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর মেলে। তিনি জার্মান ও সোভিয়েত সাহিত্যের কিছু কিছু অনুবাদও করেছেন। তাঁর রচনা বামপন্থী হলেও লেখা আন্তরিকতা ও লিপিকুশলতার দৌলতে পাঠকমহলে সমাদৃত। আলাভির মতো আলি দাস্তিও একজন শক্তিশালী লেখক। হালফ্যাশনের তেহরান সমাজের সার্থক চিত্রাঙ্কনে ইনি হলেন সিদ্ধহস্ত। 'সোসাইটি গার্ল'দের চরিত্র কলমের মুখে ফুটিয়ে তুলতে তিনি সবিশেষ পটু। কথা-শিল্পী সাদেক চুবাকের স্থান একালের ইরানী সাহিত্যে নেহাত নগণ্য বলা চলে না। হেদজাজির প্রবন্ধও আধুনিক ইরানী সাহিত্যের আর এক সম্পদ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর পারস্য ভ্রমণকালে নতুন ইরান ও ইরানী

সাহিত্যের প্রতি যে অভিনন্দন বাণী জ্ঞাপন করেন তা এখানে উদ্ধৃত করে এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করা যাক।

১৯৩২-এর এপ্রিল আকাশপথে রবীন্দ্রনাথ পারস্য যাত্রা করলেন। তেহেরানে পারস্যরাজ রেজা শাহ পহলবীর সঙ্গে কবির দেখা হয়। এই উপলক্ষে কবি নিজের কয়েকটি বই উপহার দেন—সে সঙ্গে একটি বাংলা কবিতা এবং তার ইংরেজী অনুবাদও রচনা করেন। বাংলা কবিতাটি হলো ঃ

"আমার হৃদয়ে অতীত স্মৃতির
সোনার প্রদীপ এ যে,
মরিচা ধরানো কালের পরশ
বাঁচায়ে রেখেছি মেজে।
তোমরা জ্বেলেছ নূতন কালের
উদার প্রাণের আলো
এসেছি হে ভাই, আমার প্রদীপে
তোমার শিখাটি জ্বালো।"

কবির ৭১ বৎসরের জন্মদিবসের (৬ই মে ১৯৩২) উৎসব পারস্যেই অনুষ্ঠিত হয়। কবির জন্মদিনে অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন, তা এখানে তুলে দিলাম ঃ

"ইরান, তোমার যত বুলবুল,
তোমার কাননে আছে যত ফুল,
বিদেশী কবির জন্মদিনেরে মানি
শুনালো তাহার অভিনন্দন বাণী।
ইরান, তোমার বীর সন্তান
প্রণয়-অর্ঘ্য করিয়াছে দান
আজি এ বিদেশী কবির জন্মদিনে
আপনার বলি নিয়েছে তাহারে চিনে।

ইরান, তোমার সম্মান কালে
নব গৌরব বহি নিজ ভালে
সার্থক হলো কবির জন্মদিন।
চিবকাল তারি স্বীকার কবিয়া ঋণ
তোমার ললাটে পরানু এ মোর শ্লোক—
ইরানেব জয় হোক।"

।। গ্রন্থপঞ্জী ।।

এ লিটারারি হিস্ট্রি অফ পাবসিয়া : ই. জে. ব্রাউন
মডার্ন পাবসিয়ান পোয়েট্রি : এম্. ইশাক (কলিকাতা)
সুখন্ভরান-ই-ইরান : ঐ
পাবস্থ : ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পারস্থ সাহিত্যের ইতিহাস : হরেন্দ্রচন্দ্র পাল
পারস্থ-প্রতিভা : মোহম্মদ ববকতুল্লাহ
"বুকস এ্যব্রড" (ত্রৈমাসিক) : অষ্টম সংখ্যা, ১৯৫৯
মাস্টারপীস অফ ওয়ার্লড লিটাবেচার ইন ডাইজেস্ট ফ্রাঙ্ক এন. ম্যাগিল (সম্পাদিত)
এনসাইক্লোপিডিয়া অফ লিটাবেচাব (দ্বিতীয় খণ্ড) জোসেপ টি. শীপ্‌লে (সম্পাদিত)

হীবরু সাহিত্য

হীবরু ইহুদীদের জাতীয় ভাষা। ইহুদীদের সংখ্যা পৃথিবীতে প্রায় দেড় কোটির মতো। তুনিয়ার প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এই ইহুদী জাতি। কিছুদিন আগেও ইহুদীদের নিজেদের দেশ বলে কিছু ছিল না। 'পরম পিতার পুত্র' যীশুখৃষ্টের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিস্বরূপই বুঝি একদিন স্বদেশ ইস্রাইল থেকে তাঁদের হতে হয়েছিল বিতাড়িত। হন্য কুকুরের মতো তাঁদের ভবঘুরে জীবন যাপন করতে হয়েছে দেশ হতে দেশান্তরে। তু হাজার বছর পর ইহুদীরা আজ অবশ্য স্বদেশ ফিলিস্তিন বা প্যালেস্টাইনে ফিরে এসেছেন আবার। নয়া রাষ্ট্র ইস্রাইলের পত্তন করেছেন। হীবরু শুধু ইহুদীদের জাতীয় ভাষা নয়, সেকালের পশ্চিম এশিয়ার সেমেটিক বহু উপজাতির ভাষা ছিল বলেও পণ্ডিতদের বিশ্বাস। এই হীবরু ভাষাতেই পৃথিবীর সবচেয়ে বহুল প্রচারিত ও বহু-পঠিত গ্রন্থ হয়েছে রচিত।

হীবরু ভাষা প্রাচীন এবং সেকালের আর পাঁচটি প্রাচীন ভাষার মতো তার আদি রচনাগুলিও মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। 'বুক অব্ দি ওয়ারস্ অব্ লর্ড', 'বুক অব্ যাজেস' আর 'বিলাপ' কিংবা 'যুদা রাজাদের বৃত্তান্ত' আর 'ইস্রাইলের রাজাদের বিবরণ' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থের উল্লেখ বাইবেলে পাওয়া যায়, যদিও এই সব মূল গ্রন্থের অধিকাংশ আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সেকালের প্রাচীন হীবরু সাহিত্যের কিছু নমুনা উদ্ধৃত করা গেল :

"সূর্য, গিদিয়ন-এর উপর দাঁড়াও
স্থির হয়ে
আর চাঁদ তুমিও দাঁড়াও আজালন উপত্যকার
উপর স্তব্ধ হয়ে।

সূর্য দাঁড়ালেন স্থির হয়ে আর চাঁদ
হলেন স্তব্ধ
আর লোকেরা নিলে প্রতিশোধ তাদের
শত্রুদের উপর।”

সেকালের প্রাচীন হীবরু সাহিত্য মূলত ছিল ঐতিহাসিক ও ধর্মমূলক। বাইবেলের সর্বত্র তার এই নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। পৃথিবীর সৃষ্টি-রহস্য, সর্প ও আপেল ফলের কাহিনী, ক্যেইন ও আবেল, নোওয়ার ভেলা, ব্যাবেলের চূড়া, ইশাকের বলিদান, লোহিত সাগর অতিক্রম প্রভৃতি সেকালের অনবদ্য লোকগাথাগুলি হীবরু আর অপরাপর সেমেটিক বহু উপজাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। এমনিধারা কাহিনী, বীরত্বগাথা আর গান সেকালের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গেও ছিল বিজড়িত। দেবরার গান ‘বুক অব্ দি ওয়ারস্ অব লর্ড’-এর অঙ্গীভূত হয়ে এলেও বহু পূর্ব থেকে লোকমুখে তা ঘুরে বেড়াত। ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রাচীন পাঁচখানি গ্রন্থ ‘পেণ্টাটিউক’ (Pentateuch)-কে হীবরু ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ বলা হয়। এই গ্রন্থ মোজেস-এর রচিত বলে কথিত। যদিও তার শেষ কয়েক ছত্র—যেখানে তাঁর মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে, তা যশুয়ার রচনা বলে জানা যায়।

বাইবেল

বাইবেল খৃষ্টান জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। এর ‘পুরাতন নিয়ম’ বা প্রাচীন সংহিতা (ওল্ড টেস্টামেণ্ট) হীবরু ভাষাতেই লেখা। ম্যাথু আর্নল্ড বাইবেলের ভাষা সম্পর্কে বলেছেন: বাইবেলের ভাষা সচ্ছল, গতিশীল ও কাব্যময়। তাকে আড়ষ্ট, স্থির বলা চলে না। বাইবেলকে বুঝতে হলে একথা প্রথমে মনে রাখতে হবে, বাইবেল ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্মশাস্ত্র হলেও তার সাহিত্যিক মূল্য কম নয়।

বাইবেলের ‘পুরাতন নিয়ম’ বা প্রাচীন সংহিতাই হীবরু সাহিত্য আর ইহুদী ধর্মের মূল কথা। তাকে খৃষ্টীয় ধর্মের ভিত্তি-সোপানও

বলা হয়। প্রাচীন সংহিতা উনচল্লিশটি—কারও কারও মতে ছত্রিশটি গ্রন্থে সন্নিবেশিত। আর তাকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ফেলা চলে। 'বুক অব দি লর্ড', 'বুক অব প্রফেট' ও বিবিধ।

সাহিত্যিক মূল্যায়নে বাইবেলের যে দিকটা প্রথম চোখে পড়ে সেটা হলো তার বাক্যের মিতব্যয়িতা, সুষ্ঠু শব্দ-চয়ন আর তার কাব্য-ময় প্রকাশভঙ্গি। আদিগ্রন্থ 'জেনেসীস'-এর কথাই ধরা যাক। পঞ্চম অনুচ্ছেদের চতুর্থ কলির পব প্রথম মানব আদম-এর আর হদিস মেলে না। কিন্তু তার আগেই সমগ্র সৃষ্টি-কাহিনীটি, নন্দন-কাননের বিবরণ, আদম আর ইভ, ক্যেইন আর আবেল-এর কাহিনীর সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। জেনেসীসের বাকি অংশ আধুনিক যে কোনো উপন্যাসকেও হার মানিয়ে দেয়। আর তাতে আছে নোয়া আর তাঁর ভেলা, আব্রাহাম ও ইশাক, জেকব, যোশেপ আর তাঁর ভাইদের ঘটনাবহুল বিবরণের বিচিত্রময় কাহিনী। যোশেপের সজীব চরিত্রটি ঋষি টলস্টয়ের মতে বাইবেলের এক অপূর্ব সৃষ্টি।

প্রাচীন সংহিতার দ্বিতীয় পুস্তক 'এক্সোডাস' বা বাস্তত্যাগের প্রথম দিকটা মোজেসের আত্মচরিত-কথা বলেই মনে হবে। ইহুদী জাতি তাদের মহান নেতা মোজেসের নেতৃত্বে স্বদেশভূমি পরিত্যাগ করে নতুন দেশে এসে বসবাসের বীরত্ব কাহিনী এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু। বাইবেলের বিখ্যাত 'টেন কম্যাণ্ডমেণ্ট' বা দশ অনুজ্ঞা এই গ্রন্থেরই অংশবিশেষ।

মোজেসের পরবর্তী অংশ যশুয়া। যশুয়ার নেতৃত্বে ইস্রাইলের বাসিন্দারা জর্দন নদী অতিক্রম করে, ঢাক পিটিয়ে আর গলাবাজি করে যেরিকো শহর দখল করে নেয়। যোশেপের নির্দেশেই আকাশে চন্দ্র ও সূর্য স্থির হয়ে দাঁড়ায়। রানী রাহাব-এর রোমাঞ্চ কাহিনী—যিনি বিনাযুদ্ধে আপন রাজ্য যশুয়ার হাতে সমর্থন করেন—এমনিধারা কিংবদন্তী আর ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে নানা উপাদান নিহিত আছে আধুনিক নাট্যকারদের জন্য। পরবর্তী গ্রন্থ 'যাজেস'-এর (Judges) অন্যতম সৃষ্টি—দেবরা। মহীয়সী এই মহিলাকে 'জোয়ান

অব আর্কে'র অগ্রবর্তিনী বলা চলে। দেবরাই নেতা বারককে প্ররোচিত করে তার স্বদেশবাসীকে বিজয়ের পথে পরিচালিত করতে। বিজয়ের পর দেবরা আর বারকের দ্বৈত-সঙ্গীতটি প্রাচীনতম হীবরু সাহিত্যে এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 'যাজেস' গ্রন্থের আর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ স্যামসনের নাটকীয় কাহিনী। ভীম আর হারকিউলিসের সমগোত্রীয় পৌরাণিক এই শক্তিধর অতিকায়মানবকে নিয়ে মহাকবি মিল্টন তাঁর অমর কাব্য 'স্যাম্সন এ্যাগোনিস্টেস্' (Samson Agonistes) রচনা করেন।

এর পরেই আমরা পাই মাত্র চার অধ্যায়ের ছোট্ট গ্রন্থ 'রুথ'। মাত্র একশটি 'ভার্স' বা কাব্যকলির সাহায্যে এই গ্রন্থে সেকালের (রুথের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব আনুঃ ৫০০ শত বৎসর) ইহুদী সমাজে মেয়েদের অবস্থা, উত্তরাধিকারের আইন ইত্যাদি অনেক কিছুই, দেশ হতে দেশান্তরে বিতাড়িত এই পরাধীন ইহুদী জাতির ব্যথা ও বেদনার সকরুণ চিত্রটি রূপায়িত করে তুলেছেন দক্ষ শিল্পীর তুলি-কলমে। ইংরেজ কবি কীটস্ তাঁর সুবিখ্যাত 'ওড টু এ নাইটিঙ্গেল' কবিতায় বিরহকাতরা রুথের সকরুণ চিত্রটি তুলে ধরেছেন অনুপম ভাষায় :

> "Perhaps the self-same song that
> found a path
> Through the sad heart of Ruth,
> when, sick for home,
> She stood in tears amid the
> alien corn."

'রাজ-রাজড়াদের গ্রন্থে' (স্যামুয়েল প্রভৃতি) ইহুদী রাজাদের স্বর্ণযুগের কথা লিপিবদ্ধ আছে। ইহুদীরা এই সময় ক্যানন আর ফিলিস্তাইন সংস্কৃতি আর ধর্মের সংস্পর্শে আসে। রাজ-ঐশ্বর্যে মত্ত হয়ে আপন ধর্ম-কর্ম এবং ইস্রাইলের ঈশ্বর—যেহবার কথা একদম ভুলে যায়। এলিযা আর তাঁর শিষ্য এলিশা প্রভৃতি ধর্মযাজকদের সতর্কবাণী

উপেক্ষা করে পৌত্তলিকতার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পরিণামে নিজেদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করে তোলেন। রাজ-রাজড়াদের এই গ্রন্থে বহু অপূর্ব চরিত্র : যেমন ধর্ম-বিশ্বাসী বীর স্যামুয়েল, সউল, বীর যোদ্ধা জোনাথন, গলিয়াতের হন্তা রাখাল-বালক ডেভিড এবং ডেভিডের বিজ্ঞ পুত্র মহামতি সলোমন প্রভৃতির সন্ধান পাই। 'জব' গ্রন্থের (আনুঃ খৃঃ পূঃ ৪০০) মানুষ, শয়তান আর ভগবানকে কেন্দ্র করে এক গভীর দার্শনিক তত্ত্বালোচনার উত্থাপন করা হয়েছে। পণ্ডিতদের মতে 'জব' হলো এক বিদ্রোহী সৃষ্টি। শয়তান, লুসিফার অথবা প্রমেথিয়ুসের মতো তিনি হলেন স্বর্গের বিদ্রোহী। শত নির্যাতনেও তিনি স্বর্গের দেবতাদের নিকট নতি স্বীকার করতে রাজী হন নি।

সাম

'প্রাচীন সংহিতা'র যে অংশ আপামর জনসাধারণকে মুগ্ধ করে, সেটা হলো তার 'সাম' (Psalms)। 'সাম' রাজা ডেভিডের রচনা বলে প্রচারিত। তাহলেও এ গীতি-গাথার রচয়িতা নিশ্চয় ছিলেন আরও অনেকে। ব্যাবিলনের ইহুদীদের দীর্ঘ বন্দীদশায় 'সাম' রচিত হয়। কোমল ও সুমহান ভাবসমৃদ্ধ এই গীতিধর্মী কবিতাগুলি হীবরু ভাষার এক অপূর্ব সম্পদ। সাম গীত-সংহিতা থেকে দু-একটি নমুনা উদ্ধৃত করা গেল :

"ধন্য সেই ব্যক্তি, যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না,
পাপীদের পথে দাঁড়ায় না,
নিন্দুকদের সভায় বসে না।
কিন্তু সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় আমোদ করে,
তাঁহার ব্যবস্থা দিবারাত্র ধ্যান করে।
সে জলস্রোতের তীরে রোপিত বৃক্ষের সদৃশ হইবে,
যাহা যথাসময়ে ফল দেয়, যাহার পত্র ম্লান হয় না;
আর যে যাহা কিছু করে, তাহাতেই কৃতকার্য হয়।"

দায়ুদের একটি গান :

"সদাপ্রভু, আমি তোমারই শরণ লইয়াছি
আমাকে কখনও লজ্জিত হইতে দিও না ;
তোমার ধর্মশীলতায় আমাকে রক্ষা কর।
আমার দিকে কর্ণপাত কর ; সত্বর আমাকে উদ্ধার কর ;
আমার দৃঢ় শৈল হও, আমার ত্রাণার্থক দুর্গগৃহ হও।
কেননা, তুমিই আমার শৈল ও আমার দুর্গ ;
অতএব তোমার নামের অনুরোধে
আমাকে পথ দেখাইয়া গমন করাও।..."

'সামে'র একটি ইংরেজী কবিতা (Verse) উদ্ধৃত করা গেল। ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র গীতবিশেষ বলে ভ্রম হবার কথা!

"The heavens declare the glory of God :
And the firmament showeth his handiwork ;
Day unto day uttereth speech,
And night showeth knowledge."

[Psalm XLX 1-2]

'সাম' গীতিকার মতো বাইবেলের প্রাচীন সংহিতা বা ওল্ড টেস্টামেণ্ট-এর আর একটি অনুপম গ্রন্থ 'দি সং অব্ সন্স'। আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্ধে এই গ্রন্থ রচিত হয়। এই গীতি-কবিতাগুলি বিবাহ-উৎসবাদি উপলক্ষে লিপিবদ্ধ হয়েছিল এবং আদিরসাত্মক গ্রীক-কাব্যের প্রভাব পড়ে তাদের উপর।

'দি সং অব্ সন্স' সঙ্গীতের একটি কলি :

"চটপট সেরে নাও হে আমার প্রিয়, হও ওগো মাছের ডিমের মতো কিংবা সুগন্ধী মসলা-পাহাড়ের উপরকার কোনো তরুণ কুরঙ্গের মতো।"

কাব্য-সুষমামণ্ডিত এমনি আর একখানি গ্রন্থ 'ইসায়া' (Isaiah)। 'ইসায়া' আর 'দি সং অব্ সন্স'-এর মতো কাব্য-সম্পদে তেমন সমৃদ্ধ

না হলেও 'জেরেমীয়া'র (Jeremiah) সাহিত্যমূল্য কিছুতেই কম নয়। জেরেমীয়া গ্রন্থে ইহুদী জাতির ইতিহাসের অন্ধকারময় দিনগুলি— জেরুজালেমের পতনের পূর্বকথা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ আছে। প্রফেট্ জেরেমীয়া ছিলেন তখনকার ঘূণধরা রাষ্ট্র আর ইহুদী জাতির অন্তঃসারশূন্য ধর্মের বিরোধী। সত্যদ্রষ্টা ডানিয়েল শুধু 'দেয়ালের লিখন' পাঠ কিংবা ফেরাওদের স্বপ্নকথা ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি তাঁর গ্রন্থে নির্বাসিত ও নির্যাতিত হতমান ইহুদী জাতির সান্ত্বনা আর প্রেরণার বাণীও জুগিয়েছেন। ডানিয়েলের গ্রন্থ আনুমানিক ১৬৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দে লিখিত আব তার অংশবিশেষ আরামাইক ভাষায় লিপিবদ্ধ। বাইবেলের প্রাচীন সংহিতার অনেক গ্রন্থই এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যা শুধু পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত নয়, পরবর্তীকালে বহু কবি, লেখক আর শিল্পীকে উদ্বুদ্ধ করেছে নতুন সৃষ্টিতে। দান্তে তাঁর স্বর্গ ও নরকের বৈচিত্র্যপূর্ণ বর্ণনার প্রেরণা পেয়েছিলেন 'বুক অব্ এনক' (The Book of Enoch) গ্রন্থ থেকে।

ওল্ড টেস্টামেণ্ট বা প্রাচীন সংহিতার গ্রন্থগুলির হীবরু ভাষাতেই রচিত। আর নিউ টেস্টামেণ্ট লেখা হয় গ্রীক বা আরামাইক (Aramaic) ভাষাতে। আলেকজান্দ্রিয়ার ইহুদীদের জন্য ওল্ড টেস্টামেণ্টও গ্রীক ভাষায় অনূদিত হয় আনুমানিক খৃষ্ট পূর্ব দু শ' বছরে। আব সত্তর জন পণ্ডিত এই অনুবাদের কাজে লিপ্ত ছিলেন বলে এই অনুবাদকে বলা হয় 'সেপ্টুয়াজিণ্ট' (Septuagint)। পরবর্তীকালে গ্রীক থেকে অপরাপর বহু ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ-কার্য চলে এবং সপ্তদশ শতকে রাজা জেমসের আমলে 'সর্বসমথিত' বাইবেলের যে ইংরেজী অনুবাদ হয় তা 'অথরাইজড ভার্সন' (Authorised Version) নামে খ্যাত।

বাইবেল-পরবর্তী সেকালের প্রাচীন হীবরু সাহিত্যের অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে বাইবেল-উল্লিখিত তার নানান টীকাটিপ্পনী, নিয়ম-কানুন আর আচার-নিষ্ঠার ব্যাখ্যা বর্ণনায়। এই সব 'দাড়াস্' আর

'মিদ্রাস্'-এর সাহিত্যিক মূল্য অতিমাত্রায় পরিলক্ষিত না হলেও, প্রাচীন হীবরু সাহিত্য পর্যালোচনায় তাঁদের দান কম বলা চলে না।

'নেঝিকিন্' আর তার পরিশিষ্টের 'এব্বথ্' (পিতৃপুরুষ) এবং 'মিশ্না' এই সময়কার দুখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। মিশ্নার রচনা-রীতি বাইবেলের মতো কাব্যময় নয়। কিন্তু দুরূহ এই গ্রন্থখানি প্রাঞ্জল হীবরু ভাষার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পৌরাণিক কাহিনী 'জেমারা'য় (Gemara) গ্রীক, রোমান ও পারসী—এ তিন ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করবার। স্থানীয় কথ্যভাষাও ব্যবহৃত হয়েছে এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে। ব্যাকরণের যথারীতি প্রয়োগের ব্যতিক্রম দেখা যায় এই পুস্তকে। পরবর্তীকালে (খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে) 'সাম' গীতি-কবিতার মতো যে উপাসনা-স্তোত্র (Paitanim) রচিত হতে থাকে হীবরু সাহিত্যে, তার প্রধান কবি হলেন জোস্ বেন জোস্ আর জ্যানাই। কবি জ্যানাই প্রথম হীবরু কবিতায় ছন্দের প্রচলন করেন। সেকালের প্রাচীন হীবরু সাহিত্যের স্বর্ণ-যুগের সূচনা করে আ'ব-স্পেনীয় কাল। হীবরু স্তোত্রগুলিতে ইতিমধ্যে আরবী ছন্দ ও মাত্রার প্রভাব পড়তে থাকে। সাদিয়া গোয়ান (খৃঃ ৮৯২-৯৪২) এ-যুগের সাহিত্যের ছিলেন একজন সেরা দিকপাল। অধিকাংশ লেখাই তাঁর আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তার স্বল্প-পরিসর জীবনের মধ্যে হীবরু ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তিনি যা করে গেছেন, হীবরু সাহিত্যের ইতিহাসে তা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি তাঁর 'সিদ্দুর' (Siddur) গ্রন্থে নিজের ও অপরের বহু উপাসনা-সঙ্গীত সংগৃহীত করে গেছেন। আরবী ভাষায় তিনি বাইবেলের টীকাসহ অনুবাদও করেন। সাদিয়া গোয়ান কেবল কবি ও ভাষাবিদ ছিলেন না, দার্শনিক পণ্ডিতও ছিলেন। তাঁর দার্শনিক গ্রন্থ 'বিশ্বাস ও নীতি' মূলত আরবী ভাষায় রচিত হলেও, হীবরুতে তা অনূদিত হয়। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করবার, রেনেসাঁ যুগে সব পণ্ডিত আর দার্শনিকেরা যেমন বিদগ্ধ ল্যাটিনে গ্রন্থাদি রচনা

করতেন, মধ্যযুগেও তেমনি পণ্ডিতরা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলি লিপিবদ্ধ করতেন আরবী ভাষায়। হীবরু লেখকরাও প্রথা মতো কবিতা আর নীতিশাস্ত্র ছাড়া দার্শনিক তত্ত্বকথা রচনা কররার সময় মাতৃভাষা ছেড়ে আশ্রয় নিতেন আরবীর। আরবী ভাষায় রচিত এমনি কত মূল্যবান গ্রন্থই কালের গর্ভে আজ হয়তো হারিয়ে গেছে কিংবা দুষ্প্রাপ্য পুঁথিশালায় স্তূপীকৃত হয়ে পোকায় কাটছে। কিন্তু তাঁদের হীবরু অনুবাদ লোকসমাজে এখন প্রচলিত। এ সব গ্রন্থের মধ্যে যুদা হালেভি, মইমনিদেস, আইবন পাকুদা প্রভৃতি লেখকদের নাম সবিশেষ স্মরণীয়। আইবন পাকুদার 'হৃদয়ের কর্তব্য' দার্শনিক পুস্তকখানি এতই জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, পরবর্তীকালে তা বহু ভাষায় অনূদিত ও তার শত শত সংস্করণ হয়।

মধ্যযুগের হীবরু কবিদের মধ্যে সলোমন আইবন গ্যাবিরল (খৃঃ ১০২০-৫২) সমধিক প্রসিদ্ধ। ভগবানের উদ্দেশে রচিত তাঁর দার্শনিক কবিতাগুলিতে ভক্ত কবির অন্তরের আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। ভাবমধুর তাঁর কবিতার একটি ছত্র ঃ

> "তুমি আছ, চোখে তোমায় দেখি না—কানে যায় না শোনা। জানি না কোথায় তোমার সন্ধান আর কোথায় তোমার স্থিতি। কোন্ পথে গেলে পাব তোমার হদিস্।"

[ইস্র'ইল জ্যাংউইলের ইংরেজী অনুবাদ থেকে]

কবি গ্যাবিরলের এই কবিতা বাংলা সহজিয়া কবিদের অন্তরের আকুলতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কবি গ্যাবিরল লোকারণ্যের হাস্য আর লাস্যের কবি ছিলেন না। অধিকাংশ কবিতাই তাঁর ব্যথা-বেদনার মুক্ত প্রকাশ। দার্শনিক পণ্ডিত হিসাবেও তিনি ছিলেন সবিশেষ খ্যাত এবং সেকালের প্রথা মতো আরবী ভাষাতে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন, যদিও তাঁর 'জীবন-উৎস' গ্রন্থের মূল আরবী সংস্করণ আজ হারিয়ে গেছে।

সেকালের হীবরু সাহিত্যের আর একজন প্রতিভাবান কবি ও

পণ্ডিত হলেন মোজেস্ বেন জেকব আইবন ইজরা (খৃঃ ১০৭০-১১৫০)। প্রথম জীবনে তাঁর কবিতা ছিল হালকা সুরের—নাচ, গান, হল্লামুখর। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর কাব্যের সুর যায় বদলে আর এর মূলে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতার ছাপ। কবি মোজেস্ তাঁর এক তরুণী ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রেমে পড়েন এবং তাঁর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে চাইলেন। কিন্তু কবি-ভ্রাতা বাদ সাধলেন। অজাচার এই বিয়েতে সম্মত হলেন না। ব্যর্থ প্রেমিক মোজেস্ জীবনে আর বিয়েই করেন নি। ছন্নছাড়া ভবঘুরের জীবনযাপন করেন। তিনি দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এই ব্যর্থ প্রেম আর হতাশার ছাপ তাঁর সমগ্র কাব্যের মণিমুকুরেও প্রতিফলিত হয়। বহু রসঘন কবিতায় তিনি তাঁর হৃদয়ের বেদনাকে রূপায়িত করে গেছেন। শেষের দিকে তিনি বহু অনবদ্য আধ্যাত্মিক গীতিকাও রচনা করেছেন।

যুদা হালেভি

যুদা হালেভি (খৃঃ ১০৮০-১১৪০) প্রাচীন হীবক্র সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলে পরিগণিত। আইবন গ্যাবিরলের মতো তাঁর কবিতা আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদে তেমন উচ্চাঙ্গের না হলেও, ছন্দ-লালিত্যে ও কাব্য-সুষমায় অনবদ্য। শুধু তাই নয়, তাঁর কবিতায় স্বাজাত্য-বোধ ও দেশপ্রেমের জ্বলন্ত ছাপ বর্তমান। দেশ-দেশান্তে ছড়িয়ে-পড়া নির্যাতিত ইহুদী জাতিকে আবার আপন জন্মভূমিতে নিয়ে এসে পুনর্বসতি করার স্বপ্ন দেখতেন একদা কবি হালেভি। এ সম্পর্কে রচিত তাঁর কবিতাগুলি 'সুইট্ সিঙ্গার অব জিয়ন' (জিয়নের সুকণ্ঠ গায়ক), 'লঙিং ফর জেরুজালেম' (জেরুজালেমের জন্য আকুলতা) প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'জেরুজালেমের জন্য আকুলতা' কবিতাটির এক জায়গায় কবি লিখছেন ঃ

Had I an eagle's wings, straight would I fly to thee,
Moisten thy holy dust with wet cheeks streaming free.

Oh, how I long for thee ! albeit thy king has gone,
Albeit where balm once flowed, the serpent dwells alone,
Could I but kiss thy dust, so would I fein expire,
As sweet as honey then, my passion, my desire !

["*Longing for Jerusalem*" : Judah Halevi]

"ঈগল পাখীর ডানা থাকত যদি আমার,
সিধে আমি উড়ে যেতাম তোমার কাছে,
চোখের জলে ভিজিয়ে দিতাম তোমার পবিত্র ধূলিকণা।
ওগো, তোমার জন্য আজ আমি কত আকুল !
আমি জানি, নেই আজ তোমার রাজ্য—কোনো রাজা,
একদা যেখানে বিরাজিত ছিল শান্তি,
সেথায় সাপ আজ করে কিলবিল।
চুম্বন করতে তোমার ধূলিরেণু, মরতেও আমি প্রস্তুত,
আহা, কত মধুর, আমার কামনা, আমার বাসনা !"

[ইমা ল্যাজারাসের ইংরেজী অনুবাদ থেকে]

হালেভির কবিতায় যেমন ছিল দেশপ্রেম, তেমনই হীবরু সাহিত্যের এমন কোনো দিক ছিল না, যা তিনি কাব্যছন্দে রূপায়িত করেন নি। পবিত্র উপাসনা-স্তোত্র, নৈসর্গিক কবিতা থেকে শুরু করে বিবাহ উৎসবাদি উপলক্ষে রচিত আনুষ্ঠানিক কবিতা, ছড়া, গান ইত্যাদি সবকিছুই তিনি বিস্তর লিখে গেছেন। আরবীতে তিনি একখানি দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন। আর তাঁর 'হা-কুসারি'র হীবরু অনুবাদ আজও পরম সমাদরে পঠিত হয়।

আব্রাহাম আইবন ইজরা

আব্রাহাম আইবন ইজরা (খৃঃ ১০৯২-১১৬৭) ছিলেন একাধারে হীবরু ভাষা ও সাহিত্যের প্রগাঢ় পণ্ডিত, কবি, দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ, বৈয়াকরণিক ও ভূ-পর্যটক। কবি হিসাবে তিনি আইবন গ্যাবিরলের মতো নিরাশাবাদী ছিলেন না। তিনি তাঁর দারিদ্র্য আর দুর্দশা নিয়েও

ব্যঙ্গ করে গেছেন। আর যাদুকরের মতো ছন্দ আর শব্দ-লহরী নিয়ে আপন মর্জিমাফিক কবিতা লেখায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর এমনি এক বিখ্যাত কবিতা 'বৃক্ষ'। এ-কবিতাটির আকার ছিল অনেকটা শাখা-প্রশাখা-উদ্গত একটি গাছের গুড়ির মতো। বাইবেলের প্রথম বৈজ্ঞানিক সমালোচকও বলা হয় তাঁকে। তাঁর অসংখ্য লেখার মধ্যে গণিত আর জ্যোতিষ শাস্ত্রের রচনাগুলি প্রসিদ্ধ।

'অন্ধকার অধ্যায়'

পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদ থেকে—বলতে গেলে—মধ্যযুগীয় হীবরু সাহিত্যের 'অন্ধকার অধ্যায়ে'র শুরু হয়। স্পেন থেকে এ সময় বিতাড়িত হয় ইহুদীরা। ডন ইসাক আব্রাভনেল ও তাঁর পুত্র জুডা ইসাক প্রভৃতি বহু চিন্তাশীল ইহুদী লেখক তখন স্পেন ছাড়তে বাধ্য হন। দেশ হতে দেশান্তরে তাঁদের ভবঘুরে ছন্নছাড়া জীবন যাপন করতে হয়। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পুরো দু শ' তিন শ' বছর ধরে এমনিধারা জীবন কাটাতে হয় ইহুদী কবি, শিল্পী আর লেখকদের। অতএব উচ্চাঙ্গের কোনো মহৎ সৃষ্টি তাঁদের নিকট আশা করাও বৃথা। এ যুগের লেখা তাই অনেকটা স্থূল, কুরুচিপূর্ণ ও নিম্নশ্রেণীর আর তা র‍্যাব্বিনিক (rabbinic) সাহিত্য নামে পরিচিত। একমাত্র সূর্য-করোজ্জ্বল ইটালীতেই ইহুদীদের উপর নির্যাতনের যাঁতাকল কিছু পরিমাণে স্থগিত ছিল। বেঞ্জামিন আব্রাহাম আনাবি, মোজেস রিয়েতি (Moses Rieti), ইমানুয়েল (খৃঃ ১৬১৮-১৭০৩), মোজেস জাকুতো (ইনিই প্রথম নাটকের প্রবর্তন করেন হীবরু সাহিত্যে বলে প্রকাশ) প্রভৃতি ইটালীর শক্তিমান লেখকগোষ্ঠী হীবরু সাহিত্যের এই 'অন্ধকারময়' যুগে জন্মগ্রহণ করেন। হীবরু সাহিত্যের নবজাগৃতির সূত্রটকে তাঁরাই রাখেন দূর ইটালীতে উজ্জীবিত করে। সূচনা করেন একালের হীবরু সাহিত্যের।

কবি মোজেস হায়িম লুজ্জাত্তো-ই (খৃঃ ১৭০৭-৪৭) একালের প্রথম হীবরু কবিতাকে আরবী-স্পেনীয় কাব্যের কৃত্রিম আলঙ্কারিক কাঠামো

থেকে মুক্তি দেন। সতেরো বছর বয়সেই তিনি ছন্দ ও কাব্যালঙ্কার শাস্ত্রের উপর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থেই তিনি হীবরু কাব্যাদর্শটিকে তুলে ধরেন। ঘোষণা করেন যে, সত্য আর সুন্দরই হলো কাব্যের মূল উদ্দেশ্য। গতি তার সহজ, সরল আর অনাবিল। কষ্টকল্পিত হলে চলবে না। স্বরচিত বহু কবিতা দৃষ্টান্তের দ্বারা তিনি তাঁর বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করেন পাঠকদের নিকট। কবি লুজ্জাত্তো বহু কাব্য ছাড়া তিনখানি নাটকও রচনা করেন। স্যামসেন ও ডেলায়েলার প্রণয়-কাহিনী অবলম্বনে লেখা তাঁর নাটকখানি সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

হীবরু সাহিত্যের এই নব-জাগরণের ধারা কেবল ইটালীতে সীমাবদ্ধ রইল না। জার্মানীতেও 'মেসফিম' (সঙ্কলক) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে 'হাসকালা' নামে নতুন এক আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক মোজেস মেণ্ডেলসন ছিলেন তার অন্যতম উদ্যোক্তা। ইসাক স্যাতোনভ, জোসেফ ইফ্রাতি, ইফ্রাইম লুজ্জাত্তো এবং ন্যাফ্‌তালি হার্টউইগ ওয়েস্‌লি (খৃঃ ১৭২৫-১৮০৫) প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ইহুদী যুবক ছিলেন এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক। ওয়েসলি বহু নবীন কবিকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন, যদিও তাঁদেব অনেকে সাহিত্য-গুরুকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন পরবর্তী কালে।

জার্মানী থেকে 'হাসকালা' আন্দোলন অস্ট্রিয়া আর গ্যালিসিয়ায় (অস্ট্রিয়ার তখনকার অধিকৃত পোলাণ্ডে) ছড়িয়ে পড়ে। গ্যালিসিয়া আর রুশিয়ায় 'হাসিডিজম' নামে আর এক নতুন ইহুদী আন্দোলনও শুরু হয়। হাসিডিজম পন্থী ইহুদীরা ছিলেন নৃত্যগীতাদি আড়ম্বরপূর্ণ প্রভু-উপাসনার সমর্থক। সুতরাং এ সময় লোক-গীতি, উপাখ্যান, কাহিনী প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হতে থাকে হীবরু সাহিত্যে। গ্যালিসিয়াতে ইহুদীদের ইতিহাস ও সাহিত্যেব গবেষণার কাজও চলতে থাকে। সলোমন জুডা র‍্যাপার্পোর্ট, আব্রাহাম গেইজার, স্যামুয়েল ডেভিড লুজ্জাত্তো প্রভৃতি পণ্ডিতদের রচনা এই সাহিত্য আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

তথাপি উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রুশিয়ার 'হ্যাসাডজম' ইহুদা আন্দোলন প্রসারতা লাভ করেছিল বলে বলা চলে না। এ্যারন গিনজ-বার্গ, আব্রাহাম লেবেন্‌সন (খৃঃ ১৭৯৪-১৮৭৪) ও তাঁর পুত্র জোসেফ লেবেন্‌সন সাধারণের পাঠ্য-পুস্তক রচনার মারফত হীবরু সাহিত্য প্রচারে ব্রতী হন। জোসেফ লেবেন্‌সন শীলারের রচনাবলীর হীবরু অনুবাদও প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতাবলীর তিন খণ্ড (বিশেষ করে তাঁর প্রেমের কবিতাগুলি) হীবরু সাহিত্যের এক অপূর্ব সম্পদ।

জুডা লোয়েব জর্দন ও আব্রাহাম মপু

জুডা লোয়েব জর্দন (খৃঃ ১৮৩০-৯২) এ যুগের আর একজন শক্তি-শালী কবি। তিনি তাঁর কল্পনাশক্তি ও ভাবাচাতুর্যের দ্বারা তরুণ পাঠক-মহলে স্বীয় আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নেন। প্রথম জীবনে তিনি প্রয়াসী ছিলেন বাইবেলের কাহিনী অবলম্বনে মহাকাব্য সৃষ্টিতে। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি ইহুদীদের বাস্তব সমস্যা নিয়ে বহু কবিতা রচনা করেন। এ কবিতাগুলি ছিল বলিষ্ঠ জাতীয় সত্তায় সমৃদ্ধ। 'সাগরের অতল তলায়' ও 'কোজো সেলইয়ুদ'-ই জুডা জর্দনের সমধিক প্রসিদ্ধ কাব্য। 'সাগরের অতল তলায়' কাব্যে তিনি স্পেনীয় 'ইনকুইজিশন' বা বিধর্মী-পীড়নের নিষ্ঠুর পটভূমিকায় এক রূপসী ইহুদী তরুণীর আত্মোৎসর্গের সকরুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। স্পেন থেকে একদল ইহুদীকে নির্বাসনে পাঠানো হচ্ছিল জাহাজে করে। নির্বাসিত ইহুদীদের মধ্য থেকে এক অপরূপ রূপবতী কন্যা জাহাজের অধ্যক্ষের কাছে গিয়ে জানাল যে, যদি তিনি জাহাজের নির্বাসিত ইহুদীদের নিরাপদ স্থানে নামিয়ে দিয়ে মুক্তি দেন তবে সে অধ্যক্ষের নিকট দেহ সমর্পণ করবে। জাহাজের অধ্যক্ষ তার রূপে মজে গিয়েছিলেন। তাই, নির্বাসিত ইহুদীদের নিরাপদ স্থানে তিনি নামিয়ে দেন। এবার দেহ সমর্পণের পালা। ইহুদী কন্যা কিন্তু তার প্রতিশ্রুতি খেলাপ করল সাগরের অতল জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মা-ও মেয়ের পথ করল অনুসরণ।

আধুনিক হীবরু উপন্যাসের জনক হলেন আব্রাহাম মপু (খৃঃ ১৮০৮-৬৭)। 'আহবৎ জিয়ন' (জিয়ন-প্রীতি), 'আশমৎ শোমরন' (সামারিয়ার পাপ) প্রভৃতি তাঁর আগেকার উপন্যাসগুলিতে তিনি বাইবেল-যুগের মেষপালকদের জীবনধারার মামুলী কাহিনী বর্ণনা করে গেছেন। কিন্তু আব্রাহাম মপুও কবি জুডা জর্দন ও অপরাপর সমসাময়িক লেখকদের মতো রোমান্স-ধর্মী ঐতিহাসিক কাহিনী ছেড়ে বাস্তব পটভূমিকায় উপন্যাস রচনায় মনোযোগী হন। 'আইৎ ঝাবুয়া'য় তিনি সমাজের বক-ধার্মিকদের মুখোশ দেন খসিয়ে। লিথুয়ানিয়ার ছোট্ট ইহুদী-নগরীর ঘিঞ্জি একঘেঁয়ে, নিষ্প্রাণ দৈনন্দিন জীবনের নিখুঁত ছবি তিনি দক্ষ হস্তে ফুটিয়ে তুলেছেন এই উপন্যাসে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে হীবরু সাহিত্যে বান ডাকে নতুন নতুন সৃষ্টি-সম্পদের। এ সময় বহু পত্র-পত্রিকাও প্রকাশিত হতে থাকে নানা স্থান থেকে। ক্যালমন সলোমনের (খৃঃ ১৮১৯-৯৯) বিশ্বের ইতিহাস (৯ খণ্ড), বিশ্ব-ভূগোল (১০ খণ্ড), মধ্যযুগের হীবরু সাহিত্যের ইতিহাস এবং জোসেফ্‌স ও ইউজিন স্যুয়ের লেখায় 'প্যারী রহস্য'-এর অনুবাদ হীবরু লোক-সাহিত্য প্রসারে অনেকখানি সহায়তা করে। সলোমনের সহজ সুখপাঠ্য রচনারীতি ছাত্রমহলের খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আব্রাহাম কভনার (খৃঃ ১৮৪২-১৯০৯) ও জেকভ প্যার্পানা গুরুগম্ভীর সৎ-সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রয়াসী ছিলেন। এস. জে. আব্রামভিস্ (খৃঃ ৮৩৬-১৯১৮) সমালোচক ও ঐতিহাসিক হিসেবে লেখক-জীবন শুরু করলেও সমকালীন হীবরু সাহিত্যে তিনি কুশলী গল্পলেখক বলে সবিশেষ পরিচিত। স্টাইলটিও তাঁর অনবদ্য। উনিশ শতকের শেষার্ধে গোঁড়া ইহুদী ধর্ম ও সমাজের গলদ দেখিয়ে কিছু কিছু ব্যঙ্গ রচনাও লেখা হয়। এম. ডি. ব্র্যাণ্ডস্টাড্‌টার-এর (M. D Brandstadter : খৃঃ ১৮৪৪-১৯২৮) গল্প ও অনবদ্য নক্সাগুলি এক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। পেরেজ স্মোলেন্সকিন-ও (খৃঃ ১৮৪০-৮৫) ছিলেন এ ধারার সগোত্রীয় লেখক। তবে মন্দের হলো, ইহুদী ধর্মের গোঁড়ামীকে

ব্যঙ্গোক্তি করতে গিয়ে তিনি তার ভালো দিকটাকেও রেহাই দিতেন না।

স্মোলেন্সকিন 'হা-শাহার' নামে একখানি শক্তিশালী মাসিক পত্রিকাও প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পত্রিকার মারফত তিনি বহু তরুণ কবি ও লেখককে (জে. এল. লেভিন, সলোমন ম্যানডেলকারন, ডঃ রুবিন প্রমুখ) নতুন নতুন লেখায় উৎসাহিত করতেন। তাঁর লেখা ছয়খানি উপন্যাসের মধ্যে 'কেবুরাৎ হামর'ই সমধিক প্রসিদ্ধ। 'জীবন-পথের পথিক' উপন্যাসে তিনি অনাথ এক যুবকের দুঃসাহসিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। এ যুবক জারের কারাগার থেকে পলায়ন করে লণ্ডনে এসে আশ্রয় নেয়। এই উপন্যাসখানি যুবসমাজে সাদরে গৃহীত হয়, যদিও গোঁড়া ইহুদীরা তা পেলে আগুনে নিক্ষেপ করতে ইতস্তত করে নি। ব্র্যাণ্ডস্ট্যাড্টার প্রমুখ কুশলী লেখকদের মতো তাঁর লেখা রচনাশৈলীতে সমকক্ষ না হলেও বিচিত্র চরিত্র-চিত্রণে বা বর্ণনাগুণে তা কিন্তু কিছুতে কম বলা যায় না।

ইহুদী তরুণ কবির দল এ সময় নতুন আশা আর জাতীয়তাবাদের গান গাইতে শুরু করলেন। শুধু সাহিত্যের জন্য সাহিত্য সৃষ্টির পথে না গিয়ে তাঁরা অনেকেই পুরাতন প্যালেস্টাইনে ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। রুশিয়ায় অবস্থিত কে. এ. স্যাপিরো (খৃঃ ১৮৪১-১৯০০), এম. দোলিটজকি (খৃঃ ১৮৫৬-১৯৩১), গ্যালিসিয়ার এন. এইচ. ইম্বার (খৃঃ ১৮৫৬-১৯১০) এবং এম. জে. মানে প্রমুখ কবিরা নব-চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে বহু জাতীয়তাবোধক কবিতা রচনায় বদ্ধপরিকর হন। ইহুদী জাতীয় সঙ্গীতের কবি ইম্বারের "হাতিকভা" রচিত হয় এই সময়। জে. এল. কান্তর-এর সম্পাদনায় প্রথম হীবরু দৈনিক পত্রিকা 'হা-য়োম' প্রকাশিত হয়। সম্পাদক কান্তরের সহকারী ছিলেন ডেভিড ফ্রিশ্ম্যান (খৃঃ ১৮৬০-১৯২২)। গল্প-কবিতা তিনি অবশ্য তেমন বিস্তর লেখেন নি কিন্তু গুটিকয়েক যা রচনা করে গেছেন, সাহিত্যিক রস-গুণে তা সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ফ্রিশ্ম্যান বহু

বিদেশী সাহিত্য-মনীষীর রচনাও হীবরু ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁকেই প্রথম হীবরু সাহিত্যে ইউরোপীয় ভাবধারার অন্যতম প্রবর্তক বলা চলে।

ফ্রিশ্‌ম্যানের অনুরূপ অপর আর একজন যশস্বী কবি ও কথাশিল্পী হলেন ইসাক লোয়ের পেরেঝ (খৃঃ ১৮৫১-১৯১৫)। আধুনিক হীবরু গীতি-কবিতায় তিনিই প্রথম ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার সুর প্রতিধ্বনিত করেন তাঁর ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক 'হা-উগব' ('Ha-Ugob)-এ। কাব্যধর্মী তাঁর সার্থক ছোট গল্পগুলিতে তিনি ইহুদী জনসাধারণের রূপটি প্রতিফলিত করেছেন নিপুণ শিল্পীর তুলি-কলমে। য়িড্ডিশ (ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত প্রবাসী ইহুদীদের জাতীয় ভাষা) ভাষাভাষী জনসাধারণের জন্য তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। য়িড্ডিশ উপন্যাসের প্রবর্তকও বলা হয় তাঁকে।

বিয়ালিক ও চার্নিহাউস্কি

উনবিংশ শতকের শেষার্ধে রুবেন ব্রাইনিন (খৃঃ ১৮৬২-১৯৩৯), ঔপন্যাসিক বেন এ্যাডিগ্‌ডর, এন. স্যামুয়েল (যিনি সহানুভূতির সঙ্গে নীচের তলার ইহুদী সমাজের চিত্র অঙ্কিত করে গেছেন), এম. জে. বার্ডিচিউস্কি (খৃঃ ১৮৬৫-১৯২১), এ রবিনভিটজ, গোলদিন, কবি চার্নিহাউস্কি (Tchernihowski), আহাদ-হা এ্যাম (Ahad-Ha-Am : খৃঃ ১৮৫৬-১৯২৭) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, কবি, লেখক ও ঔপন্যাসিকের রচনাসম্ভারে একালের হীবরু সাহিত্য সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠে। হীবরু সাংবাদিকতা ক্ষেত্রেরও এ সময় বিপুল উন্নতি সাধিত হয়। প্রথিতযশা কবিদের মধ্যে হায়িম নহমন বিয়ালিক (Bialik)-এর (খৃঃ ১৮৭৩-১৯৩৪) স্থান সর্বোচ্চে। হীবরু সাহিত্যের গীতি-ধর্মী এই জাতীয় কবির আসন কবি হালেভির পরেই বলা চলে। বিয়ালিক-এর

ভাষা ও বচন-ভঙ্গী এত লালিত্যময় ও শ্রুতিমধুর যে তাকে বাইবেলের ভাষার সঙ্গে সমান তুলনা করা যায়। 'শীতের কবিতা', 'হামাথ্‌মিড্‌' (তালমাডের ছাত্র) অথবা 'হত্যালীলার নগরী', কিংবা 'মিথে মিদবার' প্রভৃতি কাব্যে তাঁর দেশপ্রেমের জ্বলন্ত নিদর্শন ফুটে উঠেছে। তিনি বন্ধু আই. এইচ. র‍্যাভিনিটস্কির যুগ্ম সম্পাদনায় ইহুদী পুরা কাহিনীর একটি সঙ্কলনও প্রকাশ করেন। হীবরু সাহিত্য ও জাতীয় ঐতিহ্যের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির প্রশংসায় তিনি ছিলেন পঞ্চমুখ। রুশদেশ এ জাতীয় কবির জন্ম।

আহাদ্‌-হা-এ্যাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাসিক পত্রিকা 'হা-শিলোয়া'কে কেন্দ্র করে আরও অনেক লেখকেরও সৃষ্টি হয়। তাঁদের মধ্যে জোসেফ ক্লয়স্‌নার (Joseph Klausner) ছিলেন সবিশেষ খ্যাত। তিনি পরে 'হা-শিলোয়া'র সম্পাদকও হন। তিনি 'আধুনিক হীবরু সাহিত্যের ইতিহাস', 'ইস্রাইলের ইতিহাস', 'যীশুর জীবনী' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কবি চার্নিহাউস্কির (খৃঃ ১৮৭৩-১৯৪৪) কবিতায় নিরানন্দময় বিগত দিনের জন্য হতাশার সুর নয়, আশার বাণীই অনুরণিত হয়েছে। তিনি হলেন বিশ্বজনীন কবি। কবি চার্নিহাউস্কি ও বিয়ালিক-এর প্রভাবাধীন জেকভ ফিচ্‌ম্যান, ডেভিড্‌ শিমোনোভিটজ, জেকভ স্টেইনবার্গ, জালম্যান স্নিয়োর (Zalman Shneor), ডেভিড্‌ নিউমার্ক, জে. এইচ. ব্রেনার, জেকভ ক্লাটজকিন, এ এ. কাবাক, এ. এন. জেসিন (A. N. Gnessin) প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক আধুনিক হীবরু সাহিত্যকে দিনের পর দিন সমৃদ্ধতর করে তুলেছিলেন—গল্প, উপন্যাস, নাটক আর প্রবন্ধ রচনার মারফত।

য়িড্ডিশ সাহিত্য

আজকের হীবরু সাহিত্য কেবল এশিয়াখণ্ড প্যালেস্টাইনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। 'পঞ্চশরে দগ্ধ' হয়ে বুঝি বিশ্বময় আজ ছড়িয়ে আছে। ইউরোপ আর আমেরিকার বিভিন্ন দেশে প্রবাসী

ইহুদীরা নতুন নতুন সাহিত্য-রচনায় ব্রতী আছেন। প্রবাসী ইহুদীদের এই রচিত সাহিত্যকৃতিই য়িড্ডিশ নামে খ্যাত।

য়িড্ডিশ (Yiddish) সত্যিই এক বিচিত্র সাহিত্য। য়িড্ডিশ ভাষা ও সাহিত্য কোনো বিশেষ ভৌগোলিক গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ নয়। য়িড্ডিশ ভ্রাম্যমাণ ইহুদীদেরই ভাষা; ভ্রাম্যমাণ এই ভাষায় সাহিত্য হয়েছে রচিত। যে দেশে ইহুদীরা বাস করে সে দেশের ভাষা তো শিখতেই হয়। তাই য়িড্ডিশ হচ্ছে তাঁদের জাতীয় ভাষা, মনের গভীর অনুভূতি প্রকাশের ভাষা। য়িড্ডিশ সাহিত্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইহুদীদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। বিচ্ছিন্ন ইহুদীদের মধ্যে এই ভাষা ও সাহিত্যই ঐক্যের একমাত্র বন্ধন। প্রায় নয় শ' বছর পূর্বে পূর্ব-ইউরোপের ইহুদীরা রাইন উপত্যকার জার্মান উপভাষা, বিভিন্ন স্ল্যাভনিক ভাষা এবং হীবরু ভাষা মিশিয়ে য়িড্ডিশ ভাষা সৃষ্টি করেন। অবশ্য কোনো পরিকল্পনা নিয়ে একদিনে এই ভাষার সৃষ্টি হয় নি। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নিয়মে এই নতুন ভাষার জন্ম হয়েছে। য়িড্ডিশ ভাষা লেখা হয়ে থাকে হীবরু অক্ষরে।

য়িড্ডিশ সাহিত্যের বয়স মোটামুটি দেড়শ' বছর হবে। এর পূর্ববর্তী সময়টা উপকথা, কিংবদন্তী ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ। দেড়শ' বছরের মধ্যে য়িড্ডিশ সাহিত্য উল্লেখযোগ্য উন্নতিলাভ করেছে। কিন্তু উপযুক্ত অনুবাদের অভাবে এই সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের তেমন পরিচয় নেই। সম্প্রতি আরভিং হো (Irving Howe) এবং এলিজার গ্রীনবার্গ (Elizer Greenberg)-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'এ ট্রেজারী অব্ য়িড্ডিশ স্টোরিজ' (A Treasury of Yiddish Stories)। এ বইটি একটি নতুন সাহিত্য-জগতের পরিচয় নিয়ে এসেছে। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ইহুদী সমাজের জীবন্ত ছবি পাওয়া যায় এ গল্পগুলির মধ্যে। সঙ্কলনের অনেকগুলি গল্পই রসোত্তীর্ণ; বাংলা ভাষায় অনূদিত হলে মন্দ হয় না। য়িড্ডিশ সাহিত্য সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ ভূমিকা সংযোজন করায় বইটির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

বইয়ের শেষে য়িড্ডিশ ভাষার কয়েকটি প্রবাদ দেওয়া হয়েছে। এই প্রবাদগুলি থেকে ইহুদীদের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। নমুনাস্বরূপ দুই একটি প্রবাদ উদ্ধৃত করা গেল এখানে :

"If God were living on earth, people,
would break His windows,
When a poor man eats chicken
one of them is sick.

*

If you can't bite, don't show you teeth,
God loves the poor and helps the rich.

*

Shrouds are made without pocket."

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

এ হিস্ট্রি অফ মডার্ণ হীবরু লিটারেচার : জে. ক্লাউস্‌নার (J. Klausner)

এ হিস্ট্রি অফ যুইশ লিটারেচার : জে. ক্লাউস্‌নার

রেঁনেসাস অফ হীবরু লিটারেচার : ফে. লা চোয়াব

এ ট্রেজারী অফ এশিয়ান লিটারেচার : জন্ ডি. ইয়োহানান (John D. Yohanan) সম্পাদিত,

'বুক্‌স এ্যব্রড' (কোয়ার্টার্লি) : ১৯৫৪—৫৫

চেম্বার্স এনসাইক্লোপিডিয়া (নব সংস্করণ) : ৬ষ্ঠ খণ্ড

দি ওয়ার্ল্ড বুক এনসাইক্লোপিডিয়া : ৮ম খণ্ড

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা : ২য় খণ্ড

আরবী সাহিত্য

"ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন্!
চরণতলে বিশাল-মরু দিগন্তে বিলীন।
ছুটছে ঘোড়া, উড়ছে বালি,
জীবন-স্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি চলেছে নিশিদিন ;......"

আরব জাতির দুর্বার স্বাধীনতা-স্পৃহা ও দুর্দম জীবনাবেগকে লক্ষ্য করেই বুঝি একদা গেয়েছিলেন কবি। এ শুধু আরবদের চরিত্রগত ধর্ম নয়, আরব সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যও বলা চলে। আরবী সাহিত্য আরবদের জাতীয় চরিত্রের মতো বন্ধনমুক্ত, বেপরোয়া আর প্রাণ-চাতুর্যে ভরপুর।

হীবরু যেমন বাইবেলের ভাষা, আরবী হলো তেমনি কোরানের। দুর্ধর্ষ আরবী ঘোড়া হাঁকিয়ে, ধূলি উড়িয়ে যেখানেই হয়েছে মুসলিম অভিযান—হয়েছে ঐস্লামিক ধর্মপ্রচার, সেখানেই ঘটেছে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের আত্মপ্রতিষ্ঠা। এক কালের উত্তর ও মধ্য আরবের ক্ষুদ্র আঞ্চলিক ভাষাটি কালে মুসলিম ধর্ম ও কৃষ্টির বাহনে পরিণত হয়। দেশ-বিদেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে আপন মহিমায়। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের এক-প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত—সুদূর স্পেন ও মরক্কো থেকে আরম্ভ করে মালয়, ইন্দোনেশিয়া আর মধ্য-এশিয়ার অনেক রাজ্যেই একদা আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। মিশর, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, লিবিয়া, টিউনেসিয়া, প্যালেস্টাইন, এডেন প্রভৃতি দেশে আরবী ভাষা এখনও চলতি ভাষারূপে স্বীকৃত। এমন কি আমাদের

অন্দরমহলেও—বাংলা ও হিন্দুস্থানীতেও আরবী শব্দের বহুল প্রচলন দেখা যায়।

আরবী সাহিত্য প্রধানত ঐস্লামিক কৃষ্টি ও সংস্কৃতিরই প্রতিফলন। বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতির অবদানেও এ সাহিত্য সবিশেষ পুষ্ট। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম থেকে আরবী সাহিত্যের ধারা অব্যাহত রয়েছে সমগ্র আরবজগতে। প্রাচীন আরবী সাহিত্য অশেষ সমৃদ্ধ ছিল তার বলিষ্ঠ সাবলীল ভঙ্গী, সুষ্ঠু শব্দচয়ন ও অনুপম বর্ণনা-রীতির উৎকর্ষে। সেকালের প্রাচীন-সাহিত্য কিছু পরিমাণ অপ্রচলিত শব্দপ্রয়োগ ও পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট হলেও তা কখনও আপন বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেয় নি।

সাহিত্যের রূপরেখা

সমগ্র আরবী সাহিত্যের রূপরেখাটি আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তুলে ধরেছেন তাঁর সুচিন্তিত এক প্রবন্ধে ('দেশ' শারদীয়া সংখ্যা):

"সমগ্র আরবী-সাহিত্যকে দুটি দিক বা বিভাগে ভাগ করা যায়ঃ জাতীয় আর আন্তর্জাতিক অথবা ইসলামী রূপ। মরু-বাসী বেদুইন বা বদ্দু আরব মুখ্যতঃ বা অল্প-স্বল্প উত্তর আরবের নগর-বাসী আরবগণ নবী মুহম্মদের পূর্ব হতেই নিজ মাতৃভাষা আরবীতে একটি জাতীয় সাহিত্য গড়ে তুলেছিল। এই সাহিত্য প্রধানতঃ কাব্যময়; এতে মরু-বাসী যাযাবর আরবদের সমাজের চিত্র— আরবদের জীবন-যাত্রা, তাদের শান্তির জীবন ও যুদ্ধ-বিগ্রহ, আশা ও আশঙ্কা, 'আদর্শ ও জুগুপ্সা', সুখ ও দুঃখ, প্রেম ও বিদ্বেষ, স্তুতি ও নিন্দা প্রভৃতি, বিশেষ সততা ও সারল্যের সঙ্গে সার্থক ও মনোহরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই জীবনের পরিধি অল্প, কিন্তু তা ছিল অত্যন্ত তীব্রভাবে উপলব্ধ জীবন। নবী মুহম্মদের পূর্বের, তাঁর সমসাময়িক, ও তাঁর পরের বহু কবির গাথা ও কবিতা অবলম্বন করে রচিত আরবদের এই জাতীয় সাহিত্য। বেশীর ভাগ, কবি ও চারণদের মুখে-মুখে এই সাহিত্য

ঘুরত। ইসলাম-ধর্মের প্রতিষ্ঠার পরে, কোরানের আরবী ভাল করে আলোচনার সুবিধার জন্য প্রাচীন ও বিশুদ্ধ আরবী-ভাষার নিদর্শন হিসেবে, ও পরে এই সব কাব্য ও কবিতার মধ্যে নিহিত ঐতিহাসিক উপাদানের দিকে লক্ষ্য রেখে, মুসলমান-ধর্ম স্বীকার করে নেবার পরে ইরানী পণ্ডিতদের চেষ্টাতেই প্রধানতঃ এই সকল কবিতা ও গাথার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ হয়, এগুলি কয়েকখানি পুস্তকে নিবদ্ধ হয়। এইরূপ প্রাচীন আরব-কাব্য-সংগ্রহ গ্রন্থের মধ্যে সব-চেয়ে পুরাতন হচ্ছে 'অল্‌-মু' অল্লক্কাৎ 'অল্‌-স্বব' (সাতটি টাঙানো কবিতার সংগ্রহ) ; নবী মুহম্মদের আগের যুগে আররদের প্রধান তীর্থ-স্থান মক্কার কাবা-মন্দির যখন প্রতিমা-পূজার কেন্দ্র ছিল, তখন কাব্য-সাহিত্য শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি বিশেষজ্ঞ দিয়ে নির্বাচিত হযে সোনার অক্ষরে লিখে সেগুলিকে ঐ মন্দিরের গায়ে টাঙ্গিয়ে রাখা হোত, 'অল্‌-মু' অল্লকাৎ এরূপ সাতটি দীর্ঘ কবিতার সংগ্রহ, ৭৬০ খৃষ্টাব্দের দিকে জনৈক ইরানী-বংশজ পণ্ডিতের সাহায্যে সংগৃহীত হয়। তার পরে 'অল্‌-মুফদ্দ্‌ দ্বালিয়াৎ', 'কিতাব-অল-ঃহমাসহ্‌', 'কিতাব অল্‌-অঘানী, 'অল্‌-অসমা ইয়াৎ' প্রভৃতি আরও কতকগুলি দীর্ঘতর সংগ্রহ-পুস্তক সঙ্কলিত হয়। এই সব কাব্য ও কবিতায়, আদিম অবিমিশ্র আরব-মরু-জীবনের চিত্র চিরতবে সংরক্ষিত হয়ে আছে"। এবং এগুলিই আরবদের সত্যকারের জাতীয় সাহিত্য বলে আখ্যা দিয়েছেন আচার্য সুনীতিকুমার। তিনি আরও বলেন ঃ

"হজরৎ মুহম্মদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আরব দিগ্বিজয় আরম্ভ হোল, আরবেরা তিন পুরুষের মধ্যে 'সিন্ধু হতে হিস্পানী শেষ' এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলল ; মুহম্মদ গোটা আরবদেশকে এক রাষ্ট্রে পরিণত করে যান, তাঁর উত্তরাধিকারীরা সিরিয়া, পারস্য, মিশর ও মধ্য-এশিয়ার কিয়দংশ, এবং ভারতবর্ষে সিন্ধু প্রদেশ জয় করেন, ওদিকে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে, মাল্টায় ও সিসিলি দ্বীপে আরব অধিকার বিস্তৃত হয়। ৭৫০ খৃষ্টাব্দের দিকে এই আরব সাম্রাজ্য ওম্‌ময়া-বংশীয় খলিফা বা রাজাদের হাত হতে 'আব্বাসী-বংশীয় খলিফাদের হাতে

যায়, এবং রাজপাট সিরিয়ার দমস্কস্ হতে ইরাকের বগ্‌দাদ নগরে স্থানান্তরিত হয়। এই ঘটনার পরে, আরব সংস্কৃতি ও আরব সাহিত্য কেবল আরবদেব এক্তিয়ার বা অধিকারে রইল না। এক 'বৃহত্তর আরব ভূমি' গঠিত হল, এর সংবক্ষণ ও পরিপোষণে আরবী-ভাষী সিরীয় ও মিসরী মগরেবী, ও হিস্পানী যেমন একদিকে ইরাকী ও হেজাযী; নজ্‌দী য়মনী, ওমনী ও হাদ্রামৌতীর সঙ্গে মিলে গেল, তেমনি, ভাষায় যারা মূলতঃ আরব ছিল না এরূপ জাতিসমূহের বহু ব্যক্তি, ইসলামের যোগ-সূত্রের বলে আরবদের সঙ্গে এই কাজে সম্মিলিত হলেন; ইরাকে উপনিবিষ্ট এবং স্বদেশে স্থিত বহু ইরানী পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক আরবী ভাষা শিখে তাতে নানা বিষয়ে বই লিখতে আরম্ভ করে দিলেন। এরূপে বগ্‌দাদকে কেন্দ্র ক'রে আরবী সাহিত্যেব প্রসার বাড়ল—এক বৃহত্তর ইসলামীয় জগতে আরবের প্রাথমিক নেতৃত্ব সত্ত্বেও সেই জগতের মধ্যেই আববেব বিশিষ্ট সত্তাকে লোপ করে দিল। মরু-বাসী অথবা নগর-বাসী 'জাত্‌' বা বিশুদ্ধ আরবেরা আগের মত বেদুইন বা মরু-বাসী আরবদের জীবন নিয়ে কাব্য রচনার ধারা প্রবহমান রাখবার চেষ্টা করতে থাকলেন বটে, কিন্তু এই ধরনের কবিতা ও তার আনুষঙ্গিক মনোভাব, ইসলামের পূর্ণতর জীবনের সমক্ষে, বৃহত্তর ও নবীনতর আরব সভ্যতার সমক্ষে, নিতান্ত সেকালে এবং অচল হয়ে গেল, ও যথাকালে নবীন যুগের পক্ষে অনেকটা নিরর্থক এবং অনুপযোগী বলে, ঐ জিনিসের লোপ ঘটল। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত (যে বৎসর মোঙ্গল জাতির আক্রমণের ফলে বগ্‌দাদ নগরী আক্রান্ত, বিজিত ও বিধ্বস্ত হয় এবং ইসলামী সভ্যতার ও মুসলমান দেশসমূহের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক ঐক্যের অবসান ঘটে), এই ভাবে বৃহত্তর আরব সংস্কৃতির ও আরব সাহিত্যের যুগ বেশ জোরের সঙ্গেই চলে। তার পরে ইরানীরা নিজ মাতৃভাষা ফারসী নিয়ে আরও উৎসাহের সঙ্গে সাহিত্য রচনায় লেগে যায়, এবং কয়েক শতক ধরে ইরানী পণ্ডিতেরা আরবীতে লেখার রীতি অক্ষুণ্ণ

রাখলেও ইরান ক্রমে বৃহত্তর আরবের গণ্ডীর বাইরে এসে পড়ে; ফলে, আরব সাহিত্য আগেকার মত সমগ্র মুসলমান জগতের—অন্ততঃ মুখ্যতঃ আজম ও আরব অর্থাৎ পারস্য ও আরবের—নিজস্ব বস্তু আর থাকতে পারে না।"

প্রাচীন আরবী সাহিত্যে বীররসাত্মক কবিতার অভাব ছিল না। কোরান-পূর্ব আরবী সাহিত্য ছিল কাব্যপ্রধান। সকল দেশের সকল জাতির সাহিত্যের প্রথম যুগটা অবশ্য গীতি-কবিতারই যুগ। বীরত্ব-পূর্ণ এই সব গাথা ছিল আবেগময় ও কাব্যসুষমায় ভরপুর। আকারে ছিল বেশ কিছুটা দীর্ঘ। একক বিষয়বস্তু নিয়ে ছোট ছোট কবিতাও লেখা হতো। আর তাদের প্রত্যেকটি পংক্তি হতো প্রায় একই মাত্রা ও ছন্দের। স্বয়ংসম্পূর্ণও। পরবর্তী লাইনের সঙ্গে তেমন সংস্রব বিশেষ থাকত না।

সেকালের প্রাচীন কবিতাকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়: ১. ক্বশীদ (Qasidah) বা গীতি-কবিতা আর ২. বিতা বা খণ্ড-কাব্য। এ সকল কবিতার মধ্যে কোনো কোনোটায় থাকত কোনো বংশের স্তুতিগান, শিকার-কাহিনী, যাযাবরা কোনো এক সম্প্রদায়ের এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে যাবার বিশদ-বিবরণ, খেজুরকুঞ্জ-শোভিত মরূদ্যানের বর্ণনা অথবা যুদ্ধবিষয়ক কিংবা প্রেমের কাহিনী। ক্বশীদ বা এই সব গীতি-কবিতা বংশপরম্পরায় মুখে মুখে গীত হয়ে আসত আমাদের দেশের চারণ-গানের মতো। সেকালের কবিদের মধ্যে হুজরী, আমরুদ, জহির, হাতেমতাই (হাতেমতাই-এর আশ্চর্য ঘোড়া ও তাঁর অপূর্ব দানশীলতার কাহিনী অপরিচিত নয় আমাদের কাছে), ওসর, হসন, হায়ম প্রভৃতি এঁদের অনেকের কবিতা গেয়ে বেড়াত আরবীরা। প্রাচীন আরবী কবিতা থেকে আরবদের রীতিনীতি, তাঁদের প্রাচীন পুরাতত্ত্ব ও পুরাতন রাজবংশের বহু পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব চারণ কবি ছিলেন এক এক সম্প্রদায়ভুক্ত। একাধারে এঁরা ছিলেন শিল্পী, দার্শনিক, প্রচারক এবং কথক।

এই সব কবিদের দৃষ্টিকোণ কতো বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল তা জানা যায় "মু-আল্লাকৎ" কবিতাবলী থেকে।

৬২২ সালে ঘটে ইসলামের অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থানের ফলে আরবের সামাজিক কাঠামো ও জাতিগত চরিত্রের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। কবি ও তাঁর কাব্যের উপরও এর প্রভাব পড়ে অনেকখানি। হজরত মহম্মদের শিষ্যদের মধ্যে হাসান ইবন্ তাবিৎ ছিলেন প্রসিদ্ধ। তাঁর কবিখ্যাতি কিন্তু তেমন ছিল না। ইসলামের ধর্মপ্রচারে ও মহম্মদের মাহমা-কীর্তনে তিনি ইসলাম-পূর্ব কবিদের চিরাচরিত পন্থাই অনুসরণ করেন। তাই তার কাব্যে ধম ও রাজনৈতিক বিবাদ ও ঝগড়াঝাটির প্রতিফলন প্রকট হয়ে ওঠে। 'ওমর ইবন্ অবি রাবিয়া' কাব্যে জোলো ভাবালুতা ও আদি রসাত্মক কবিতার পরিচয় পাওয়া যায়। একারণে বুঝি হজরত মহম্মদ পরবর্তীকালে কবিতার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন।

সেকালের আরবী সাহিত্যের আর একটি বিশেষত্ব হলো তার ছান্দিক গদ্য ('সাজ')। এই গদ্য ছিল আপ্তবাক্যের মতো সংক্ষিপ্ত ও নীতিমূলক। খৃষ্টান ধর্মের প্রভাবও দেখা যায় কোনো কোনো স্থলে।

কোরান শরিফ

কোরান শরিফ প্রাচীন (খৃঃ ৬১২-৩৪) সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বেদ, পুরাণ বা বাইবেলের মতো কোরান শরিফ মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ। হজরত মহম্মদ সূরাকারে আল্লার যে সকল বাণী আবৃত্তি করে যেতেন তাঁর শিষ্যগণ সে সকল চামড়া, হাড়, কিংবা পাথরের উপরে লিখে বা খোদাই করে রাখতেন। নমাজের সময় শিষ্যরা তাই আবৃত্তি করতেন। মহম্মদের জীবিতকালে কোরান গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। তাঁর মৃত্যুর পর আবু বকর যখন খলিফা হলেন, তিনি তখন প্রথমে কোরান সঙ্কলন করেন। কিন্তু তাঁর সঙ্কলনে কিছু ভুলচুক থাকাতে পরবর্তী খলিফা ওথমন নতুন করে সম্পাদনা

করেন কোরান শরিফের। পূর্বের সঙ্কলনটিও তিনি নষ্ট করেন বলে প্রকাশ। মহান গ্রন্থ একাধারে ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়। ধর্ম-উপদেশের ছলে হজরত মহম্মদের এই অনুজ্ঞাগুলিকে বলা চলে ছন্দবদ্ধ কবিতা। কোরান শরিফকে কেন্দ্র করে একাল ও সেকালের আরবী সাহিত্য পরিপূর্ণতা লাভ করে। লিখিত ভাষাকে দান করে সুষ্ঠুরূপ।

কোরান শরিফের কয়েকটি সূরা উদ্ধৃত করা গেল এখানে ঃ

"আমি ঈশ্বর, সমুদায় গুণের স্বামী, ক্ষমা ও কল্যাণের আকর।

"বিজ্ঞানময়ের গ্রন্থের এই নিদর্শন সফল হয়। (ইহা) হিতকারী লোকদিগের জন্য বিধি ও দয়াস্বরূপ। যাহারা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে ও জকাত দান করে ও যাহারা পরলোকে বিশ্বাস রাখে, এই ইহারই আপন প্রতিপালকের বিধিতে স্থিতি করে, এবং ইহারাই তাহারা যে মুক্ত হইবে। এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে কেহ আছে যে অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত রাখিতে আমোদজনক আখ্যায়িকা ক্রয় করে, এবং তাহাকে (ঈশ্বরের পথকে) উপহাস করিয়া থাকে; ইহারাই ইহাদের জন্য দুর্গতিজনক শাস্তি আছে এবং যখন তাহার নিকট আমার আয়তসকল পঠিত হয়, তখন সে অহঙ্কারপ্রযুক্ত বিমুখ হইয়া থাকে, যেন সে তাহা শ্রবণ করে নাই, যেন তাহার উভয় কর্ণে গুরুভার আছে; অতএব তুমি তাহাকে ক্লেশকর শাস্তির সংবাদ দান কর। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্মসকল করিয়াছে, তাহাদের জন্য সম্পদের স্বর্গলোকসকল আছে, তথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে; ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য এবং তিনি বিজেতা বিজ্ঞানময়। তোমরা যাহা দেখিতেছ, এই নভোমণ্ডলকে তিনি স্তম্ভ ব্যতিরেকে সৃজন করিয়াছেন, এবং তোমাদিগকে (বা) বিচালিত করে, এইজন্য তিনি পৃথিবীকে পর্বতসকল স্থাপন করিয়াছেন এবং সর্ববিধ পশু সঞ্চারিত রাখিয়াছেন; ও আমি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়াছি, পরে আমি তথায় (ভূমিতে) সকল

প্রকার উত্তম বস্তু (শস্যাদি) উৎপাদন করিয়াছি। এই ঈশ্বরের সৃষ্টি, অবশেষে তুমি আমাকে প্রদর্শন কর, তিনি ব্যতীত যাহারা, তাহারা কি বস্তু সৃজন করিয়াছে? বরং তাহারা স্পষ্ট পথভ্রান্তির মধ্যে অত্যাচারী।

তোমরা কি দেখ নাই যে, স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে পরমেশ্বর তাহা তোমাদের জন্য অধিকৃত করিয়াছেন, এবং আপন বাহ্যিক ও আন্তরিক সম্পদ তোমাদের সম্বন্ধে পূর্ণ করিয়াছেন; এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে কেহ আছে যে, জ্ঞান ব্যতিরেকে ও ধর্মলোক ও উজ্জ্বল গ্রন্থ ব্যতিরেকে ঈশ্বরের সম্বন্ধে বিরোধ করিয়া থাকে। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, "ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন, তোমরা তাহার অনুসরণ কর"; তাহারা বলে, "বরং আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে বিষয়ে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার অনুসরণ করিব।" শয়তান যদি তাহাদিগকে নরকদণ্ডের দিকে আহ্বান করে, তাহারা কি (অনুসরণ করিবে)? এবং যে ব্যক্তি আপন আননকে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করে, বস্তুত সে হিতকারী, অবশেষে নিশ্চয় সে দৃঢ় হস্তাবলম্বনকে ধারণ করে; এবং ঈশ্বরের দিকেই ক্রিয়া সকলের পরিণাম। এবং যে ব্যক্তি ধর্মদ্রোহী হইয়াছে, পরে তাহার ধর্মদ্রোহিতা তোমাকে, (হে মহম্মদ) বিষাদিত করিবে না; আমার দিকেই তাহাদিগের প্রত্যাবর্তন, তাহারা যাহা করিয়াছে, পরে আমি তাহাদিগকে তাহা জানাইব (শাস্তি দিব) নিশ্চয় ঈশ্বর হৃদয়ের তত্ত্বজ্ঞ। আমি তাহাদিগকে (পৃথিবীতে) অল্প ভোগ করিতে দিব, তৎপর কঠিন শাস্তিতে তাহাদিগকে নিপীড়িত করিব। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, "কে স্বর্গ ও মর্ত্য সৃজন করিয়াছে?" অবশ্য তাহারা বলিবে, ঈশ্বর; তুমি বলিও, "ঈশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা", বরং তাহাদের অধিকাংশই (তাহা) বুঝে না। দ্যুলোকে ও ভূলোকে যাহা কিছু আছে, তাহা ঈশ্বরেরই; নিশ্চয় ঈশ্বর নিষ্কাম ও

প্রশংসিত। এবং পৃথিবীতে যে সকল বৃক্ষ আছে, যদি তাহা লেখনী হয় ও সাগর তাহার মসী হয়, তাহার পরে (অন্য) সপ্ত সাগর হয়, তথাপি ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা সমাপ্ত হইবে না ; নিশ্চয় ঈশ্বর বিজেতা ও বিজ্ঞানময়। এক ব্যক্তির তুল্য ভিন্ন তোমাদিগকে সৃজন ও তোমাদিগের সমুত্থাপন নহে ; নিশ্চয় ঈশ্বর দ্রষ্টা ও শ্রোতা। তুমি কি দেখ নাই, (হে মহম্মদ) ঈশ্বর দিবাতে রাত্রি উপাস্থিত করেন, এবং রাত্রিতে দিবা আনয়ন করেন ? এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রমাকে অধিকৃত করিয়াছেন, প্রত্যেকে এক নির্দিষ্ট সময়ে চলিয়া থাকে ; এবং নিশ্চয় ঈশ্বর, তোমরা যাহা করিতেছ, তাহার জ্ঞাতা। ইহা এ কারণে যে, সেই ঈশ্বর সত্য এবং এ কারণে যে তাঁহাকে ছাড়িয়া তাহারা যাহাকে আহ্বান করে, তাহা অসত্য, এবং এ কারণে যে, সেই পরমেশ্বর উন্নত মহান।”

[কোর্-আন্ শরিফ : 'সূরা লোকমান' :
ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কর্তৃক অনূদিত]

আরবীয় সংস্কৃতির স্বর্ণ যুগ

খৃষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতাব্দীকে বলা চলে আরবীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের স্বর্ণ যুগ। এ সময় গ্রীক ও পারস্যের সাংস্কৃতিক প্রভাব আরবীয় সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করে তোলে। আরবীয় শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে আব্বাসী খলিফাদের অবদানও কম নয়। সাতশ' বাষট্টি খৃষ্টাব্দে আব্বাসী রাজবংশ বোগদাদে তাঁদের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। বোগদাদ তখন মুসলিম শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্যের মধ্যমণিরূপে পরিগণিত হয়েছে। দূরপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই যোগাযোগের ফলে যে আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ভাবধারা গড়ে ওঠে তার প্রভাব গিয়ে পড়ে আরবী সাহিত্যে। আব্বাসী রাজবংশের দ্বিতীয় খলিফা অল-মন্‌সুরের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রীক, পারসীক ও সিরিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের রচনাবলী আরবী সাহিত্যে অনূদিত হতে থাকে। ভারতীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের ঢেউও এই সময় এসে পড়ে আরব সাগরের উপকূলে। আল্‌-বেরুনিই (খৃঃ ১০৪৮) প্রথম

ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো বহন করে নিয়ে আসেন মধ্যপ্রাচ্যে। যদিও জাতিতে তিনি ছিলেন পারসীক, তাঁর সমতুল শক্তিশালী লেখক আরবীয় সাহিত্যে সে যুগে বড়ো একটা ছিল না। তাঁর অমর গ্রন্থ 'তাহ্‌কিক-ই-হিন্দ' সেকালের আরবীয় সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ।

ব্যাক্‌ত্রিয়া ও সাক্‌দিয়ানা থেকে বৌদ্ধ প্রভাবও আরবীয় মানসে নতুন দিকের সন্ধান দেয়। ৭৭২ সালে বাগদাদে আগমন হয় অজ্ঞাতনামা এক হিন্দু জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞের। তাঁরই দৌলতে ভারতীয় গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্র আরবের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

আবু নুয়াস

আবু নুয়াস (মৃত্যু: ৮১০ খৃঃ) ও আবু অল্ আতাহিয়া (আনুঃ ৭৪৮-৮২৮ খৃঃ) প্রাচীন আরবী সাহিত্যের বিশিষ্ট দুই দিকপাল। আবু নুয়াস ছিলেন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হারুন-অল-রসিদের রাজ-সভাসদ। 'আরব্য-রজনী'র বহু উপাখ্যানের তিনি ছিলেন স্রষ্টা। সমালোচকদের চোখে তিনি হলেন আরবী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। আল-বেরুনির মতো তিনিও ছিলেন জাতিতে পারসীক। লেখাপড়া শেখেন বসরাতে। দুস্তর মরুভূমির বেদুইন একদল আরবের সঙ্গে তিনি প্রথম আসেন বাগদাদে এবং সেখানেই বসবাস করেন। তাঁর কাব্য-সাহিত্যকে প্রশস্তি, ব্যঙ্গ, ধর্ম-সঙ্গীত, শোকগাথা ও শিকার-কাহিনী ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়। 'খামরিয়াৎ' বা সুরসঙ্গীত তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি।

> "ঈশ্বর পরম করুণাময়। মানুষকে তিনি দেখেন ক্ষমার চোখে। কৃপা তাঁর অসীম। সুতরাং এ সংসারে দুদিন নাও হেসে-খেলে। মজা লুটে নাও দুহাতে।"

—এই ছিল তাঁর কাব্যের অমৃত-বাণী।

আবু অল্ আতাহিয়ার কাব্য আবু নুয়াসের কবিতার পরিপন্থী। আরবের সমকালীন সাধারণ মানুষের নৈতিক চরিত্রের শিথিলতা দেখে তিনি উঠেছিলেন বুঝি ক্ষুব্ধ হয়ে। অল্-কুফারের এক গরীবের ঘরে তাঁর জন্ম। শৈশব কাটে তাঁর মাটির হাঁড়ি-কুড়ি বিক্রি করে। শোনা যায়, আশাহত প্রেমই নাকি পরিণামে তাঁকে প্রবুদ্ধ করে ধর্মের পথে। আরব সাহিত্যে তিনিই বোধহয় প্রথম সাধারণ মানুষের ভাষার মারফত মহৎ সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্রতী হন।

তাঁর কবিতা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ। ধর্ম-ঘেঁষা এক শ্রেণীর দার্শনিক তত্ত্বমূলক গদ্য-সাহিত্য এই সময় রচিত হতে থাকে। ইবন-ইশাক হজরত মহম্মদের এক সার্থক জীবন রচিত রচনা করেন।

স্পেনে আরব সভ্যতা

খলিফা অল্-মামুনের আমল থেকে (খৃঃ ৮১৩-৩৩) বাগদাদে আরব সাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের ভাটা পড়তে থাকে। আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতির নতুন সূর্য দেখা দেয় তখন স্পেনে। স্পেনের ছোটখাটো অনেক মুসলিম রাজবংশ উত্তর ও দক্ষিণ ইউরোপের অনেক রাজ্যে আরব সভ্যতা ও সাহিত্যের ধারা ছড়িয়ে দেয়। 'বীদপাই-এর উপাখ্যান' স্পেনীয় ভাষায়ও অনূদিত হয়। স্পেনীয় সাহিত্যের রসঘন সৃষ্টি প্রভাবান্বিত করে আরবী সাহিত্যকে। সার্ভোনটিসের অমর রচনা 'ডন্ কুইক্সোট' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আইবন যেইদুন (খৃঃ ১০০৩—৭১) মুসলিম-স্পেনীয় সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি ও লিপিকার। অল্-ওয়ালতাদা-কে (al-Waltadah) বলা চলে স্পেনের স্যাফো। আর আইবন-কোয়াজ্মন চারণকবি করডোভা-র সমকক্ষ। আরবী কবিতা স্পেনীয় কাব্যধারাকেও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। এই সময় স্পেনীয় ভাষায় কামগন্ধী বহু গীতি-কবিতা রচিত হতে থাকে। তার অনুবাদ-সাহিত্যও সবিশেষ

পুষ্টিলাভ করে। বিশেষ করে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনুবাদ। জ্যোতির্বিদ আবু-মাসার (মৃত্যু : ৮৮৬ খৃঃ) ইউরোপকে জোয়ার-ভাটার নিয়মাবলী সম্পর্কে প্রথম ওয়াকিফহাল করে তোলেন। লাটিন ভাষাতেও তাঁর রচনা অনূদিত হয়। এক ইস্তাম্বুলেই এই সময় ৮০টির উপর 'মসজিদ-গ্রন্থাগার' ছিল। আর তাতে ছিল হাজার হাজার জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাণ্ডুলিপি।

অনুবাদ-সাহিত্যের মারফত ইসলামীয় দর্শন-সাহিত্যের দ্বারও পশ্চিমের নিকট খুলে যায়। অল্-কিন্দি, অল্-ফারাবি, ইবন সিনা, ইবন বজ্জা, ইবন তুপাইল প্রভৃতির নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। এঁদের রচনায় তখনকার আরবজগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

সূফী মতবাদ

দ্বাদশ শতকের প্রারম্ভে আরবজগতে যে ধর্মের জোয়ার বইতে থাকে তাতে আবিভাব ঘটে মরমী সূফী মতবাদের। [আরবী ভাষায় সূফী শব্দের অর্থ হলো পশম। অনেকের বিশ্বাস সূফী মতাবলম্বী দরবেশরা পশমের পোশাক পরতেন বলে তাঁদের সূফী বলা হতো]। ঐশ্লামিক জীবনধারায় সূফী মতবাদ বিপুল পরিবর্তন নিয়ে আসে। অল্-মোহাসিবির (মৃত্যু : ৮৫৭ খৃঃ) 'ঈশ্বরের অধিকার পালন' (রাআয়া লি-অক্আল্লা) প্রথম দিকে মরমী সূফী সাহিত্যের এক প্রসিদ্ধ রচনা। আবু-তালিফ-অল্মার্কির (মৃত্যু : ৯৯৬ খৃঃ) রচনা—'হৃদয়ের খোরাক' এখনও সূফী সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পঠিত হয়ে আসছে। স্পেনের আইবন-আরাবি (খৃঃ ১১৬৫—১২৪০) সূফী দর্শনের ভিত গড়ে তোলেন মজবুত করে। আরবের রুক্ষ মাটির চাইতে পারস্যের উর্বর ভূমিতেই সূফী মতবাদ অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করেছিল। পারস্যের হাফিজ, জালালউদ্দীন রুমী, সাদী প্রভৃতি সাধক-কবিদের সমতুল দরদী কবি আরব সাহিত্যে বড় একটা নেই। আইবন-

অল্-ফারিদকে (খৃঃ ১১৮১—১২৩৫) অবশ্য ইরানে শ্রেষ্ঠ সূফী কবিদের সঙ্গে সমান আসন দেওয়া যেতে পারে।

পশ্চিম এশিয়ার দুর্ধর্ষ মোগল অভিযান শুরু হয় এই সময়। ১২৫৮ সালে লুণ্ঠিত হয় বাগদাদ। আরব ও মোগলদের বহুধা কর্মতৎপরতা সত্ত্বেও আরবী সাহিত্য বিশেষ করে সঞ্জীবিত হতে থাকে ১৫১৭ সালের ওটমন তুর্কীদের আগমন পর্যন্ত।

আইবন-হেমডিস এই সময়কার সিসিলির একজন প্রসিদ্ধ আরবী কবি। হুলাগু ও তাইমুরদের দুর্বার বিজয় অভিযান রোধ করে দাঁড়ায় মামলুকরা (খৃঃ ১২৫০—১৫১৭)। চতুর্দশ শতকে মামলুকদের রাজত্বকালেই বিশ্ব-সাহিত্যের অমর এক অবদান আরব্য উপন্যাস সংগৃহীত, সঙ্কলিত ও সুসম্পাদিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে অনেক দেশের অনেক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্ভার নিয়ে। অল্-জাসিয়ারি-র (al Jashiyary—মৃত্যু : ৯৪২ খৃঃ) ইরানী ভাষার লেখা 'হাজের এফসানে' (Hezar Efsaneh বা হাজার কাহিনী) অবলম্বনে রচিত হয় এই আরব্য উপন্যাস। আরবদের কাছে আরব্য-রজনী বা আল্ফ্ লয়্ল্হ্ ওঅ লয়ল্হ্ (Alif Lailah—এক হাজার একটি রজনী) প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেতাব। আরব্য-রজনীর যে মূল পাঠ পাওয়া যায় তা যেমন বহুজনের রচিত, পটভূমিও তার ঠিক তেমনি পাঁচ-মিশালী বহুধা। এই কেতাব গড়ে উঠতে প্রায় আটশ' বছর লেগেছিল। আর দুশ' বছরের অধিক কাল ধরে আরবেতর চিত্ত জয় করে। প্রাচ্য সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ এবং পশ্চিমের উপর তার প্রভাবের চমৎকার নিদর্শন মেলে বিপুল-আয়তন এই গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায়।

আরব্য-রজনী

'আরব্য-রজনী'র উপাখ্যানগুলিকে মোটামুটি এভাবে ভাগ করেছেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় :

[ক] আদি 'আরব্য-রজনী'র উপাখ্যানাবলী মুখ্যতঃ এগুলি, ভারতবর্ষ হতে পারস্যের মারফত প্রাপ্ত। কাঠামোর কাহিনী—সুলতান শহর্-য়ার ও তাঁর ভ্রাতা শাহ্. জ-মানের কাহিনী, শহর্-য়ারের সঙ্গে উজীর-পুত্রী শহর্-আজ.াদের বিবাহ, এবং কথা-প্রসঙ্গ ; এবং সর্বাপেক্ষা কাব্যময় ও রমন্যাস-পূর্ণ গল্পগুলি এই শ্রেণীতে পড়ে—যথা, ধীবর ও জিন, বসরা নিবাসী হসন্, রাজকুমার বদর ও রাজকুমারী জৌহর, কমর-অল্-জ. মান ও বুদ্র, অর্দ-শীর ও হয়াতু-ল্-নুফুস প্রভৃতি।

[খ] বগ্দাদের কাহিনী—ইরাকের শহরবাসী আরবদের গল্প—খলিফা হারুন-অল্-রসিদ-সংক্রান্ত কাহিনীগুলি। এগুলি বস্তুতন্ত্র উপাখ্যান, সমাজ-চিত্রের যথার্থ এগুলির বৈশিষ্ট্য।

[গ] মিশরের উপাখ্যান—এগুলিতে যাদু ও জিন্-পরীর সমাবেশ বেশী। 'আলাদীনের প্রদীপ' এই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত। এতদ্ভিন্ন, মধ্যযুগের মিশরেব মুসলমান রাজাদেব সময়ের উপাখ্যান।

[ঘ] যুদ্ধ শূর-বীরেব কথা, যেমন ওমর অল্-নু-মান-এব উপাখ্যান। মূলে আরব ও ইরানী। এগুলির মধ্যে খ্রীস্টান ইউরোপীয় প্রভাব লক্ষণীয়।

[ঙ] বিশিষ্ট-প্রকৃতিযুক্ত কতকগুলি গল্পসমষ্টি—যেমন, ১. সিন্দ্‌বাদ বা সিন্ধিবাদের ভ্রমণ-কাহিনী। এগুলির আধার, আরব বণিক্ ও নাবিকগণের সমুদ্র-যাত্রার গাল-গল্প। কোনও কোনও অংশে গ্রীক (যেমন হোমারের অডিসি মহাকাব্যের), এমন কি প্রাচীন মিশরীয় উপাখ্যানের ছায়াও পড়েছে। ২. রাজমন্ত্রীদের সদুপদেশমূলক কাহিনী। ভারতবর্ষের 'হিতোপদেশ' ও 'পঞ্চতন্ত্র' প্রভৃতি এই শ্রেণীর গল্পের মূলে। পশুপক্ষীর আখ্যানগুলিও এই পর্যায় পড়ে। ৩. জ্ঞানী হয়্‌কার-এর গল্প। ৪. প্রেমের উপন্যাস—আরব ও ইরান এই দুই দেশের। ৫. জ্ঞান ও বিদ্বত্তা প্রকাশক গল্প—যেমন ক্রীতদাসী তওঅদ্দুদের কথা। আন্তর্জাতিক ইস্‌লামী আরব।

এসব শ্রেণী-বিভাগ, বিশ্লেষণ ও উপাদান-বিচার, 'আরব্য-রজনী' জিনিসটিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বুঝতে সহায়তা করতে পারে বটে, কিন্তু তাহার উর্ধ্বে হইতেছে ইহার মধ্যে নিহিত রসবস্তু—অদ্ভুতরসে ও রোমান্সে, অসম-সাহসের কাহিনীতে ও জিন-পরীর বার্তায়; ফকীর কলন্দর এবং সুলতান-সুলতানা, হাবসী, বাঁদী, বণিক্ ও সিপাহী, মরুবাসী বেদুইন ও শহরবাসী আরব নাগরিক, হারেম বা অন্তঃপুরের রমণী এবং রাস্তা ও বাজারের নানা শ্রেণীর পুরুষ—তাদের ভীড় ও জটলার জমাট ছবিতে, সমুদ্র-মধ্যে প্রাপ্ত কূপীর ভিতর হতে বহির্গত মহাকায় দৈত্য; গ্রীক হকীমের কাটামুণ্ডের কথা কহা; বগ্‌দাদে হারুন-অল্-রসিদের নৈশ-ভ্রমণ, সঙ্গে মন্ত্রী জাফর ও জল্লাদ মসরূর কালো রঙের পক্ষিরাজ ঘোড়া, এবং তার লেজের আঘাতে কৌতূহলী রাজপুত্রের চক্ষু নষ্ট, সিন্দিবাদের সাগর-যাত্রা—রক পাখি, সাগরপারের বুড়া, জীবন্ত সমাধি, একচক্ষু রাক্ষস, হাতির দাঁতের পাহাড়, সরন্‌দীবের রাজা; কুব্জ ও দরজী; নাপিতের ছয় ভাই; নূরুদ্দীন ও সুন্দরী ফারসী বাঁদী; কমর অল্-জ. মান ও বদৌরার অদ্ভুত কাহিনী; সীদী নুমান, রাত্রে গোরস্থানে মৃতদেহ-খাদক পেচক; গগন-বিহারী কলের ঘোড়ায় চড়ে ইরানের রাজপুত্রের বাঙ্গালার সুলতানের কন্যার মহলে আগমন; আলাদীনের প্রদীপ; মন্ত্রপূত জলে পাথর হয়ে যাওয়া মানুষকে জিয়িয়ে তোলা, পর্বত-গুহায় দস্যুদের গুপ্ত রত্নভাণ্ডার; মর্জিয়ানার বুদ্ধি; গভীর রাত্রে নির্জন পুরীতে কোরান-পাঠের ধ্বনি; পাতালপুরী; মরুভূমির কাফিলা; আরব দস্যু; শহরের সরাইখানা ও মসজিদ; শহরের সওদাগর-পটি; ইহাদের কত না বিচিত্র 'আরব্য-রজনী'-র কাহিনী চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

আচার্য সুনীতিকুমারের ভাষার পুনরাবৃত্তি করে আবার বলতে হয়ঃ

"একটি সমগ্র সভ্যতা, তাহার সাত-আট শত বৎসরের প্রবহমান জীবন-স্রোত লইয়া, যেন 'আরব্য-রজনী' গ্রন্থের মধ্যে চিরকালের জন্য নিজ স্থান করিয়া লইয়াছে। সুসভ্য নাগরিক এবং বিশ্বজগতের

সঙ্গে পরিচিত ও সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান ধর্মে একান্ত আস্থাশীল আরব-জাতি, নিজেকে নিজের চোখে যেমনটি দেখিয়াছিল 'আরব্য-রজনী'-তে তাহার এক সত্য বিবরণ পাঠ করি··· ; সত্য বটে, এই বইয়ে গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের তেমন কিছু পাই না ; ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ পরিণতি সূফী মতবাদের ছায়ার বাহিরে, সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা দর্শন লইয়া যাহারা চিন্তা করিতে তেমন অভ্যস্ত নহে এমন সহজবুদ্ধির আরব জনসাধারণ এর মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া, 'আরব্য-রজনী'— হইতে আমরা পারস্যের সূফী কবি মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী প্রভৃতি কর্তৃক পরিবেশিত আধ্যাত্মিক অমৃত আস্বাদন করিবার আশা করিতে পারি না ; কিন্তু এই বই হইতে আমরা মধ্যযুগের নাগরিক মুসলমান আরবজীবনের উচ্চতম গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ হইতে গভীরতর খাদ, সবই পাই।"

['আরব্য-রজনী' : বৈদেশিকী]

'আরব্য রজনী'র কাহিনী

রাজা শেহরিয়া এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেহজামাকে কেন্দ্র করে বোনা আরব্য-রজনীর মনোরম কাহিনীগুলি। এঁরা দুভাই-ই আপন আপন পত্নীগণ কর্তৃক হয়েছিলেন প্রতারিত। ঘর ছেড়ে দুজনে তাই বেরোন দেশ-ভ্রমণে। পথে দেখা হয় এক জিন-এর সঙ্গে। জিনকে দুভাই-ই আপন আপন বিড়ম্বিত জীবনের কথা জানালেন। এদিকে জিনও আপন দয়িতা কর্তৃক প্রবঞ্চিত হয়েছিলেন। ওঁরা তখন সাব্যস্ত করলেন, মেয়েদের আর বিশ্বাস করা নয়। রাজ্যে ফিরে এসে রাজা শেহরিয়া তাই নারীমেধ যজ্ঞের এক অদ্ভুত আয়োজন করলেন ; প্রতিদিন রাজ্যের এক একটি কন্যাকে বিয়ে করে রাত্রিটা এক সঙ্গে কাটিয়ে ভোরবেলা তার শিরশ্ছেদ করতে শুরু করলেন। এভাবে রাজ্যের মেয়ে যখন প্রায় উজাড় হয়ে এলো, তখন নৃশংস এই বিধান রোধ করতে এগিয়ে এল উজির-কন্যা শেহরজাদি। ভগ্নি দীন-জাদির সঙ্গে এক ফন্দি এঁটে রাজা শেহরিয়াকে সেধে সে এলো বিয়ে

করতে নিশ্চিন্ত জেনে আপন ভাগ্যের কথা। বাসরঘরে নানা গল্প-গুজবের মধ্যে এক কেচ্ছা সে শুরু করে দিলে রাজাকে শোনাতে। রাত কাবার হয়ে এলো তবু কিন্তু গল্পের শেষ নেই। আর এমনি অপূর্ব সে কাহিনী যে রাজা শেহরিয়া বাকিটুকু শুনবার জন্য হয়ে রইলেন উদ্‌গ্রীব। উজির-কন্যার শিরশ্ছেদ করা হলো না সকালবেলা। মেয়াদ তার বাড়ল আর এক রাত্রি ; পরের দিনও তাই হলো। পরের দিনও। এক রাত্রি নয়, দুই রাত্রি নয়—এমনি করে হাজার এক রাত্রি কাটল উজির-কন্যাব গল্প শুনে। তবু আশা মেটে না রাজা শেহরিয়ার গল্প শোনার। খলিফা হারুন-অল্‌-রসিদের রাজ-পরিবেশের নানান কাহিনীর মধ্যে এমনি তিনি মশগুল হয়ে পড়লেন। শেহরজাদির আর প্রাণ নেওয়া হলো না। উজির-কন্যা এদিকে তিন রাজপুত্রের রাজমাতা হয়ে পড়েছে। রাজা অগত্যা আদেশ দিলেন, এবার থেকে রাজ্যে আর নারীমেধ যজ্ঞ চলবে না। কুশলী শিল্পী শেহবজাদির দৌলতে নিষ্ঠুর ওই প্রথা রদ হলো।

এক রাত্রির পর আর এক রাত্রি একটানা গল্প বলাব রেওয়াজ সংস্কৃত সাহিত্যে—'পঞ্চতন্ত্র' আর 'কথা-সরিৎসাগরে' রয়েছে। এই রীতিটি 'কথা-সরিৎসাগর' থেকে ধার করা বলা চলে। আরবী ভাষায় লেখা হলেও আরব্য-রজনীর মূল আরবী সাহিত্যের অঙ্গীভূত, তা ঠিক বলা যায় না। জিন আর পরীদের অলৌকিক আশ্চর্য কাহিনী, ব্যভিচাব, নারীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা—উপর-তলার সমাজের এমনিতরো বেপরোয়া জীবনযাপনের যে চিত্রের সন্ধান মেলে আরব্য-রজনীতে, তাতে হয়তো আজকালকার আরবজগতের রুচিবান অনেকেই নাক সিঁটকে উঠবেন। কিন্তু হারুন-অল্‌-রসিদের সমকালীন মধ্যপ্রাচ্যের শ্রেণীবিশেষের তাই ছিল বাস্তব সমাজচিত্র। তাই বাগদাদ, বেইরুট ও কায়রোর সরাইখানা আর মুসাফিরখানার আনাচে-কানাচে আরব্য-রজনীর অনুপম এই লোক-গাথাগুলি ঘুরে বেড়াত মুখে মুখে। মরক্কো থেকে মধ্য-এশিয়ার অনেক স্থানে ছোট,

কি বড় ; ধনী কি নির্ধন প্রায় সকলের ঘরে ঘরে এই উপাখ্যানগুলির কদর ছিল। পঠিত হতো, আলোচিত হতো সমাদরে। 'আলাউদ্দীন ও তার আশ্চর্য প্রদীপ', 'আলিবাবা ও চল্লিশজন দস্যু' (আলিবাবার সেই সুপরিচিত 'ওপেন্ সিসেম' বা 'চিচিং ফাঁক' জপমন্ত্রের সঙ্গে কার নেই পরিচয় ?) সিন্দ্‌বাদ নাবিকের বিচিত্র অভিযান-কাহিনী প্রভৃতি সকল দেশের সকল জাতির শিশু-চিত্ত জয় করে আজ বিশ্ব-সাহিত্যের শাশ্বত আসনে অধিষ্ঠিত।

আরবদের জাতীয় বীর-কথা

আরব সাহিত্যের যে দুটি বিভাগ বা যুগের কথা আচার্য সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর তথ্যবহুল প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ বৃহত্তর ও মুসলমান আরবজগতের, সর্বগ্রাহী আরব সাম্রাজ্য ও সংস্কৃতির বিভাগের বা যুগের উপাখ্যান-সংগ্রহ হচ্ছে 'আরব্য-রজনী'। তিনি আরও বলেন ঃ "এই বইয়ে যে আরবকে আমরা পাই সে যাযাবর মরুবাসী বেদুইন বা বদ্দু নহে, সে হচ্ছে বাস্‌রা বা বগ্‌দাদ অথবা দমস্কস্ বা কাইরো নিবাসী নাগরিক আরব ; সে কেবল লুঠেরা বা রাখাল মনু সন্তান নয় ; সে নগরবাসী বণিক্ বা বিদ্যাজীবী, সমগ্র জগতের খবর সে রাখতে চায় ও রাখে। তার মনের প্রসার হচ্ছে সুসভ্য নগরবাসীর। কিন্তু মরুবাসী আরব, যারা মরুতেই থেকে গেল, নগরে বৃহত্তর বিচিত্রতর জীবনের সঙ্গে যাদের যোগ তেমন ঘটল না, তাদের সঙ্কীর্ণ জীবনের অভ্যস্ত বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আগে তাদের সমাজের কবি যে কবিতা রচনা করত, এখন সে সকল কবিতার ভাবে অনুপ্রাণিত, খাঁটি মরুবাসী আরবের জীবনের পরিচায়ক গল্পের রচনায় মনোনিবেশ করল। ওদিকে যেমন স্বদেশী-বিদেশী নানা গল্প নিয়ে 'আরব্য-রজনী'র রূপদান চলল, এদিকে তেমনি আরবের প্রাচীন যুগে, নবী মহম্মদের পূর্বের কালের, একজন বিখ্যাত আরব যোদ্ধা ও কবির জীবন-কথার আঁধারে, 'আরব্য-রজনী'র-ই মতো গদ্য-

পদ্য মিশ্র এক বৃহৎ রোমান্টিক পুরাণ কথার উদ্ভাবনা হল। হজরৎ মহম্মদের পূর্বে আরবদের মধ্যে শদ্দাদ-পুত্র 'অন্তর্থুন্' ('Antarathun') বা 'অন্তর' ('Antar') নামে এক সুবিখ্যাত বীরপুরুষ ছিলেন। ইনি নামী কবিও ছিলেন, এঁর রচিত একটি কাব্য-কাহিনী 'অল্-মু-অল্লক্কাৎ' গ্রন্থেব সাতটি কাব্যের মধ্যে অন্যতম। শৌর্যে এবং মরুবাসী আরবদেব মনমত নানা গুণের জন্য, অন্তর এদের আদর্শ পুরুষ হয়ে দাঁড়ান। এঁর জীবনের মুখ্য কথাগুলি এই :

"এঁর পিতা 'অবস্ উপজাতীর নেতা বা কুলপতি ছিলেন, কিন্তু এঁর মাতা ছিলেন এক কাফরী ক্রীতদাসী; কিন্তু জন্মের অমর্যাদা এঁর অদ্ভুত বীরত্বময় কীর্তিকলাপে মুছিয়া যায়। এঁর পিতৃব্য-পুত্রী 'অব্লহ (Ablah) এঁর প্রণয়-পাত্রী ও পরে আরবসমাজের রীতি অনুসারে এঁর পত্নী হন, কিন্তু অব্লহকে লাভ করবার পূর্বে এঁর বীরত্বের বহু পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। শেষে এঁর কবিতা মক্কার কাবা মন্দিরে টাঙিয়ে দিয়ে প্রাচীন আরব জাতিব মধ্যে কবির সর্বোচ্চ সম্মান এঁকে দেওয়া হয়েছিল। অতি বৃদ্ধ বয়সে 'অন্তর্' যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 'অন্তবে'র জীবনের কাহিনার উপর কল্পনার বিচিত্র বর্ণসমাবেশ করে, মরুবাসী আরবের প্রাচীন জীবনের অনুরাগী—আরবগণ, খৃষ্টীয় অষ্টম শতক থেকেই একটি রমন্যাস-চক্র গড়তে আরম্ভ করেন। ক্রুসেড যুগের-যুদ্ধের সময়ে ইউরোপের (বিশেষ করে ইটালী ও ফরাসী দেশের) রমন্যাসাত্মক আখ্যানাবলীর প্রভাব 'অন্তর-কাহিনী'তে প্রবেশ করতে থাকে; এবং খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যে এই কাহিনী অনেকটা এর আধুনিক বিশিষ্টতা লাভ করেছিল। কথিত আছে যে, অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বগ্দাদের খলিফা হারুন্-অল্-রসিদের অন্যতম সভাপণ্ডিত, সাহিত্যিক ও বৈয়াকরণ অস্মা'ঈ, 'অন্তর্' সম্বন্ধে প্রচলিত আরব লোক-গাথা অবলম্বন করে প্রথম একখানি ক্ষুদ্রাকার 'সীরৎ অন্তর্' (Sirat Antar) রচনা করেন। এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে

তা হলো ; এর লোক-প্রিয়তার জন্য 'সীরৎ-অন্তর্', অর্থাৎ 'অন্তর্-কাহিনী' 'শা-'এর' বা কবি ও লেখকদের হাতে এবং 'রাওঈ' অর্থাৎ চারণ বা পাঠকদের মুখে ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকে, এবং অবশেষে উপস্থিতকালে এ একটা অতি বৃহৎ গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। এই বীর-কাহিনী দুটি বিভিন্ন সংস্করণে পাওয়া যায়—একটি বৃহত্তর 'হিজাজী' বা আরব সংস্করণ। এটি বত্রিশ খণ্ডে কাইরোতে মুদ্রিত হয়েছে এবং অন্যটি ক্ষুদ্রতর "শামী" বা সিরিয়া দেশের সংস্করণ, এটি দশ খণ্ডে বেরূৎ শহরে মুদ্রিত হয়েছে। 'সীরৎ-অন্তর্'-এ কেবল নায়ক 'অন্তর্' এবং নায়িকা 'অবলহ্'-এর কথা নেই, এতে এদের পূর্বপুরুষদের অনেক কাহিনী, এবং মূল আখ্যানের সঙ্গে বিশেষ যোগ নেই এমন বহু ব্যাপার, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি সবিস্তারে বর্ণিত আছে। মরুবাসী আরবের কাছে এই গ্রন্থ আমাদের মহাভারতের ন্যায় লোকপ্রিয় কাহিনী ; নগরবাসী আরবগণ কাইরোতে ও অন্যত্র "রাওঈ" অর্থাৎ গায়ক পাঠকদের মুখে এই কাহিনী সাগ্রহে শুনে থাকে ; শহরের বড় বড় কাফিখানায় 'সীরৎ-অন্তর্'-এর পাঠকেরা সুর করে ও গান গেয়ে এই গদ্য-পদ্যময় মহাকাব্য পাঠ করে থাকে। সঙ্গে পাঠকের একজন অনুচর রবাব বাজায়। 'অন্তর্' এখন আরব জাতির এবং বিশেষত মরুবাসী আরবদের জাতীয় বীর হয়ে দাঁড়িয়েছেন। প্রাচীন রাঢ় গৌড় বঙ্গের লাউসেন, মধ্যযুগের রাজস্থানের 'পৃথ্বীরাজ', রাঠোর পৃথ্বীরাজ, উত্তর ভারতের অল্‌হা ও উদল, তিব্বতের জাতীয় বীর রাজা কেসর বা গেসর, মধ্য যুগের ব্রিটেনের রাজা আর্থার (Arthur), ফ্রান্সের রোলান্দ (Rolland) এবং স্পেনের রুই দিয়াস্ সীদ্ এল্-কাম্পোয়াদোর (Ruy Diaz Cid el Campeador) রুশদেশের ইগোর (Igor) এবং যুগোশ্লাভিয়ার যুগোশ্লাব জাতির মার্কো ক্রাল্যেভিচ-এর (Marko Kraljevic) মত, অর্থাৎ বিভিন্ন জাতির প্রধান প্রধান জাতীয় বীর-পুরুষদের মত, সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে আরব বীর 'অন্তর্' বিন্-শদ্দাদ্-এর স্থান। মরুবাসী আরবেরা যে আদর্শকে জীবনে কাম্য বলে মনে করে, সেই

আদর্শ এবং যুদ্ধবিগ্রহ, অদ্ভুত বীরত্ব, অদ্ভুত কর্ম, অতিথি-সৎকার, নর-নারীর প্রেম, পূর্বপুরুষের ইতিহাস ইত্যাদি, মরুর আবহাওয়ার মধ্যে এ সমস্তই এ গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে মিলবে। চীন দেশের মধ্য-যুগীয় সান্-কুও-মিন্ (San Kuo Min) এবং জাপানের 'গেঞ্জি মোনোগাতারি' (Genji Monogatari) নামক অনুরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও প্রেমের রোমান্স কাহিনীর সঙ্গে 'সীরৎ-অন্তর্' তুলিত হতে পারে।"

জর্মান আরবী-ভাষাবিৎ ফন্-হামর (Von Hammer) ১৮১৯ সালে এক প্রবন্ধে 'সীরৎ-'অন্তর্'-কে ইউরোপীয় অনুসন্ধিৎসু-সমাজে প্রথম পরিচিত করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে টেরিক্ হামিল্টন (Terrick Hamilton)—ইনি ইস্তাম্বুলে তুর্কী সুলতানের সভায় প্রেরিত ব্রিটিশ রাজদূতের প্রাচ্য ভাষাবিৎ মুন্শী ছিলেন—ক্ষুদ্রতর বা শামী সংস্করণের 'সীরৎ-অন্তর্'-এর মাত্র এক-তৃতীয়াংশের একটা ইংরেজী অনুবাদ চার খণ্ডে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত করেন 'অন্তর্, এ বেদুইন রোমান্স, ১৮২০' (Antar, a Bedouin Romance, 1820) শিরোনামায়। সমগ্র বইখানার অনুবাদ এখনও হয় নি—মহাভারত অনুবাদের মতো এই গুরুতর কাজে কেউ হাত দেন নি, যদিও চীনা 'সান্-কুও-মিন্' ও জাপানী 'গেঞ্জি-মোনো-গাতারে' এখন পুরাপুরি সুন্দর ইংরেজী অনুবাদে পাঠ করতে পারা যায়। যাযাবর অর্ধ-বর্বর মরুবাসী আরবদের অদিম কালের উপযুক্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া এতে গভীর এবং শিক্ষিত মানব-সমাজের রুচিকর বিশেষ কিছু নেই বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন আচার্য সুনীতি-কুমার। টেরিক্ হামিল্টনের পরে আর কেউ এতে হাত দেন নি। সমাজ-তত্ত্বের আলোচনার জন্যই এর প্রধান উপযোগিতা। বিভিন্ন পণ্ডিত অবশ্য ফন্-হামরের পরে 'সীরৎ-অন্তর্'-এর বিচার করেছেন। টেরিক্ হামিল্টনের অনুবাদ থেকে দেখা যায়, এর বর্ণনাত্মক অংশগুলি মন্দ নয়, কিন্তু একই ধরনের যুদ্ধ, একই ধরনের জীবন, একই ভাবের বক্তৃতা ও কথোপকথন, খানিকটা পড়তে পড়তে একঘেয়ে লাগে ; তবে বেশ

স্ফূর্ত ও সাবলীল গতিতে কথাটি রচিত হয়েছে; প্রায় সমস্ত কাহিনীটির মধ্যে তাদের প্রিয় এবং পরিচিত জীবনের কথা শুনতে পাওয়া যায় বলে আরবদের এটা এত ভাল লাগে।

মরুবাসী আরবদের কথা নিয়ে গদ্য-পদ্যময় কাব্য কেবল এক 'সীরৎ-অন্তর্'-ই নাই, আরও অনেক আছে। এগুলিও 'রাওঈ' বা পাঠকগণ যথারীতি লোকসমাজে আবৃত্তি করে থাকে। বরকাৎ আবূ জ. য়্দ্ অল্-হিলাল-এর উপাখ্যান এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। তবে এতে রোমান্টিক বা অদ্ভুত-রসের অবতারণা একটু বেশী। আবূ জ. য়্দের কথা চার খণ্ডে বেরূৎ ও কাইরো থেকে প্রকাশিত হয়েছে; এর অনুবাদ হয় নি; তবে ই. ডবলু. লেন তাঁর সুবিখ্যাত 'মডার্ন ইজিপ্সিয়ান গ্রন্থে এর একটু সংক্ষিপ্ত-সার দিয়েছেন। 'সীরৎ-অল্-মুজাহিদীন' বা 'যোদ্ধাদের কাহিনী' অথবা এই কাহিনীর নায়িকা দল্হমহ্-র নাম অনুসারে 'সীরৎ-দল্হমহ্' আর একখানা লোকপ্রিয় আরব বীর-কাহিনী। মিশরের রাজা সুলতান অল্-ধ্বাহির বয়্বর্স (রাজ্যকাল খৃষ্টাব্দ ১২৬০-১২৭৭) প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন, মিশরের লোকেরা এখনও তাঁর স্মৃতি ভোলে নি; এঁকে আশ্রয় করে 'সীরৎ-অল্-ধ্বাহির' নামে আর একটা লোকপ্রিয় রোমান্স কথা মিশরে বিশেষ প্রচলিত। ইংরেজ আরবী-ভাষা-বেত্তা লেন (Lane) এই দুখানা বইয়ের সারাংশও লিপিবদ্ধ করেছেন।

দেখা যাচ্ছে যে, আদিম ও উদ্দাম জীবনের বেদুইন বা মরুবাসী আরবদের সম্বন্ধে আধুনিক নগরবাসী আমাদের মনে একটা রোমান্টিক আকর্ষণ থাকলেও প্রাচীনকালের বেদুইন গাথা নিজ বৈশিষ্ট্য আর সরল ভাবে মরু-জীবনের প্রতিফলনের জন্য সাহিত্য-রসিক শিক্ষিত জনের কাছে ভালো লাগলেও ('মু 'অল্লকাৎ' প্রভৃতি প্রাচীন আরব জাতীয় কবিতার ইংরেজীতে ও অন্য ইউরোপীয় ভাষায় একাধিক অনুবাদ এর প্রমাণ—বাঙালী কবি মোহিতলাল মজুমদার মশাইও 'মু 'অল্লকাৎ'-এর কাব্য, স্যর উইলিয়ম জোন্স্-এর ইংরেজী অনুবাদ

পাঠ করে তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলায় কতকগুলি কবিতা রচনা করেছেন), এবং কবি কাদের নওয়াজ তাঁর "মরাল" নামক কবিতা-গ্রন্থে (১৩৪১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত) 'মু অল্লকাৎ'-এর প্রথম কবিতাটির (ইমরুউ-ল্ কয়্স্ রচিত) মূল আরবীর সঙ্গে পদ্যময় ও ব্যাখ্যানমূলক ভাবানুবাদ প্রকাশিত করেছেন।), 'সীরৎ-অন্তর্'-এর মত এর কাহিনী বিশ্বমানবের গ্রহণযোগ্য হয় নি। এই দিক দিয়ে বিচার করলে, বিশ্ব-সাহিত্যের ভাণ্ডারে একমাত্র 'আরব্য-রজনী'-কেই আরব সাহিত্যের তরফ থেকে প্রাপ্ত সর্বপ্রধান দান বলতে পারা যায়।

[আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : বৈদেশিক]

আরবী সাহিত্যের অপূর্ব এই ঘুমপাড়ানী কাহিনীগুলির পাশে উচ্চ স্তরের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অনেক রচনা এই সময় রচিত হয়। আইবন-আবদ-অল্ হাকম-এর রচনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৪৫৩ সালে বসফরাসে ওটমন তুর্কীদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং তুর্কীদের হাতে ১৫১৭ সালে মামলুক শাসক-শক্তির ধ্বংসের পর থেকে আরব সভ্যতার ভাটা পড়তে থাকে। পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদকে আবিষ্কৃত হয় নতুন জগৎ আমেরিকা, ভাস্কো-ডা-গামা কর্তৃক উত্তমাশা অন্তরীপের সন্ধানও (১৪৯৭ খৃঃ) হদিস দিল নতুন দিগন্তের। মধ্যযুগীয় ইউরোপ তখন জাগরিত হতে থাকে। ক্ষীয়মাণ মুসলিম শাসকবর্গের এই সময় চরম বিপর্যয় ঘটে স্পেনে। মধ্যপ্রাচ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথও ক্রমশ রুদ্ধ হয়ে আসে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতক থেকে মধ্যপ্রাচ্যের আরবজগতে এক কালো যবনিকা নেমে আসে।

আধুনিক কাল

পুরো উনিশ শতক আর বিশ শতকের প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ওটমন তুর্কীরা সমগ্র আরবজগতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখেন। এই সময় নীল নদের উপত্যকায় আধুনিক আরবী সাহিত্যের

প্রথম সূর্যোদয় দেখা দেয় বলা যায়। আরবী সাহিত্যের এই যুগান্তরের পশ্চাতে রয়েছেন মহম্মদ আলি (খৃঃ ১৭৬৯—১৮৪৯) ও তাঁর পরবর্তী বংশধর অল্-জার্বাতি (খৃঃ ১৮২৫), ইব্রাহিম (খৃঃ ১৭৮৯—১৮৪৮) প্রমুখ চিন্তানায়ক ও নেতৃবৃন্দের অক্লান্ত সাধনা। আবদুল্লা ফিকোরি (খৃঃ ১৮৩৪—৯০), আলি অল্-লেথি (আনুঃ ১৮৩০—৯৬ খৃঃ), আবদুল্লা অল্-নাদিম (খৃঃ ১৮৪৪—৯৬) প্রমুখ লেখকরা গদ্য ও পদ্যে আধুনিক আরবী সাহিত্যের পথ প্রশস্ত করে দেন, যদিও এঁদের রচনায় ওটমন ঐতিহ্যের ছাপ রয়ে গেছে কিছু কিছু। কেননা, ক্ষয়িষ্ণু তুর্কী সুলতান তখনও মুস্লিম জগতের নামকোয়াস্তে গোছের অধিকর্তা—ইসলামের ধ্বজাধারী প্রতিভূ। আরবী কবিরা তখনও তাঁর স্তুতিগানে শতমুখ। জামাল-অল্-আফগানী (খৃঃ ১৮৯৭) ও তাঁর স্বনামধন্য শিষ্য মোহাম্মদ আবদুহ্ আরবজগতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনধারার নতুন স্রোত নিয়ে আসেন। আলি আবু-নসর, ইব্রাহিম অল্-মুআলিহি, মুস্তাফা কামিল, এবং পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ 'মিশর কবি' ও নাট্যকার আহম্মদ শওকী (খৃঃ ১৮৬৮—১৯৩২), হাফিজ ইব্রাহিম (খৃঃ ১৮৭১—১৯৩২), ইসমাইল সাবরি প্রমুখ প্রখ্যাত কবি ও মনীষীরা আধুনিক আরবী সাহিত্যের জয়যাত্রার পথ দেন প্রশস্ত করে। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত সিরিয়ার খৃষ্টান সাহিত্যিক আহম্মদ ফরিস অল্-সিদ্দিক, সুদূর মরোক্কোর সিহার অল্-দিন ও সিরিয়ার মিশরী কবি খলিল মতরুন (জন্ম ঃ ১৮৭২ খৃঃ) প্রভৃতি কবি লেখকরাও এ সময় আধুনিক আরবী সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে ব্রতী হন।

খেদিভ দ্বিতীয় আব্বাস হিল্‌মির (খৃঃ ১৮৯২—১৯১৪) আমলে মিশর সমগ্র আরব জাতীয়তাবাদীদের পীঠস্থানে পরিণত হয়। এই নতুন ভাবধারার অন্যতম হোতা 'ফরা অন্‌তুন্' আলেকজেন্দ্রিয়ায় 'অল্-জামিয়া অল্-উথ্‌মানিয়া' নামে এক জাতীয়তাবাদী পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। জার্জি যাদান (খৃঃ ১৮৬১—১৯১৪), আদিব ইশাক, কবি

উয়ালি অল্-দিন ইয়াকন প্রভৃতিদের ক্ষুরধার লেখনীর মুখে ওটমন সাম্রাজ্যের গলদ আর পশ্চিম এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় শক্তি-বর্গের প্রকৃত স্বরূপ প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। ১৮৭৮ সালে রুশ-তুর্কী যুদ্ধ, ১৮৯৭ সালে গ্রীক্ যুদ্ধ, ১৯১১ সালে ইটালী-তুর্কী যুদ্ধ ও ১৯১৩ সালের বলকান যুদ্ধ এবং ইউরোপীয় শক্তির নিকট তুরস্কের উপর্যুপরি বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়া জাতীয়তাবাদী আরবী সাহিত্যেও দেখা দেয়। কবি খলিল মতরুন বুয়র যুদ্ধের পটভূমিকায় দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের স্বপক্ষে বহু অনবদ্য 'কসীদ' রচনা করেন। ১৯০৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধে নব-জাগ্রত জাপানীদের হাতে সম্রাজ্‌শাহী জারের পরাজয়ের প্রতিক্রিয়াও আরব সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে আব্বাসী যুগের সাহিত্যধারা ও দার্শনিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার তখন প্রবল প্রচেষ্টা চলে আরবী সাহিত্যে। কিন্তু নেপোলিয়ন বোনাপার্টির মিশর অভিযানের (খৃঃ ১৭৯৮—১৮০১) পর আধুনিকতা ও নতুনত্বের স্রোতও বইতে থাকে আরবী সাহিত্যে। ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তার সভ্যতার প্রতি আরব জনসাধারণের দৃষ্টি তখন আকৃষ্ট হয়। সিরিয়া ও লেবাননের খৃস্টান পাদ্রীদের দান এই ক্ষেত্রে কতখানি ছিল বুত্‌রুছ অল্-বুস্তানির (মৃত্যু : ১৮৮৩) রচনাই তার প্রমাণ। রিফা অল্-তিহ্‌তাকা প্রথম মিশরীয় কবি যিনি প্যারিসে গিয়ে ফরাসী আঙ্গিকের অনুকরণে আধুনিক কবিতা লেখার রীতিটি আরবী সাহিত্যে প্রচলন করেন। ১৮৯৪ সালে কবি খলিল মতরুনই আধুনিক আববী কবিতার ভিত্ত প্রতিষ্ঠা করেন বলা যায। পরবর্তী-কালে প্রকাশিত তাঁর 'অল্-খলিল' বা 'বন্ধু' কবিতা গ্রন্থ এর প্রমাণ।

মিশরের ভুমিকা

মিশরের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই সময় আধুনিক আরবী সাহিত্য ও ভাষার প্রসারে এগিয়ে আসে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসাহ ও

আনুকূল্যে কবি খলিল মতরুন, আহম্মদ শওকী, হাফিজ ইব্রাহিম, ইসমাইল সাব্রি, জার্জি যাদান, শাকির আস্‌লান, আমিন রিহানি, জিব্রান খলিল, মেরী জিআদা, আনতুন অল্‌-জুম্মাইল, মহম্মদ লুতফী জুম্মা, আব্বাস মহম্মদ অল্‌-আকোয়াদ, মহম্মদ কুদ আলি প্রভৃতি বহু কবি ও সাহিত্যিকদের রচনা আধুনিক আরবী সাহিত্যকে নানাদিক দিয়ে সমৃদ্ধিতর করে তোলে। বিজ্ঞানসম্মত ও পাশ্চাত্য ধারায় প্রভাবিত নতুন এক সমালোচনা সাহিত্যও এই সময় সৃষ্টি হয়।

আহম্মদ শওকী ও হাফিজ ইব্রাহিমের কবিতার আলোচনা পরে আমরা করব। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে তাঁদের দুটি কবিতা উদ্ধৃত করা গেল। বসন্তের আগমনে উচ্ছ্বসিত হয়ে কবি শওকী গেয়েছেন ঃ

"আজারু আক্কাবালা কুম বেনা এয়া ছাহি,
হায়য়ির রবিআ হাদিকাতাল আরওয়াহি।
এজমা নাদামাজ জরফে তাহতা লেহয়ায়িহি
ওয়ানস্থর বে ছাহাতিহি বেছাতার্‌ রাহি।"

অর্থাৎ—

"(মার্চ) মধু মাস আসিয়াছে, হে বন্ধু এস এবং জীবনের আনন্দোত্থানে বসন্তের অভ্যর্থনা কর। আনন্দের সুরাসেবী সকলকে তাহার পতাকাতলে জমায়েত কর এবং তাহার শ্যামল প্রাঙ্গণে আনন্দ-শয্যা বিস্তৃত কর।"

[অনুবাদ—মোহাম্মদ সুলতানুল আলম চৌধুরী]

হাফিজ ইব্রাহিম তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা শেখ আবদুহুর শোক-গাথায় বলছেন ঃ

"বাকাশ্‌ শারকু ফার তাজ্জাত লাহুল আর দুরাজাতান
ওয়া ফাদাত্‌ উয়ুনুল কাওনে বিল আবারতি।
ফাফিল হিন্দে মাহজুনুন, ওয়াফিছ দীনে জাজেউন
ওয়াফিমিছরা বাকিন দায়েমুল হাছারাতি।

ওয়াফিশ্‌শামে মাফজুর্ডন ওয়াফিল ফুরছে নাদেবুন,
ওয়াফি তুনাদা মা শেয়তা মিন ঝাফারাতি।"

অর্থাৎ—

"প্রাচ্য আজ গভীর শোকে ক্রন্দন করিতেছে, তাহার শোকে সমস্ত জগৎ প্রকম্পিত এবং সমস্ত সৃষ্ট জগতের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত। ভারতেও শোকের ছায়াপাত হইয়াছে, চীনেও দুঃখের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে এবং মিশরের ঘরে ঘরে চিরন্তন দুঃখ গুমরিয়া কাঁদিতেছে। সিরিয়া আজ বেদনা-বিধুর, পারস্য আজ শোক-গাথায় মত্ত এবং তিউনিসের দিকে দিকে আজ করুণ হা-হুতাশ।"

[অনুবাদ—ঐ]

কবি আহম্মদ শওকী ও ইব্রাহিম হাফিজ সত্যিই মিশরীয় ঐতিহ্যের জয়গান গেয়ে আরবী সাহিত্যকে মহিমান্বিত করে গেছেন। আরবী সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের ধারায় এই এক স্মরণীয় যুগ। আধুনিক আরবী সাহিত্যের জয়যাত্রার পথে সংবাদপত্রের দানও অপরিসীম। 'অল্‌-ওয়াকয়েউল মিছারয়া', 'আছ ছিয়াছত', 'অল্‌-আহরম' প্রভৃতি মিশরের বিশিষ্ট সংবাদপত্রগুলি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে দেয়। 'আছ ছিয়াছত' পত্রিকায় 'হাদিসুল আরবাআ' বা বুধবারের সাময়িকী আলোচনায় ডক্টর তাহা হোসেন বহু প্রবন্ধে উসমিয়া ও আব্বাসীয় যুগের প্রাচীন কবি: আবু নওয়াছ, বশসার বিন বুরদ, মুতী বিন আয়াছ প্রমুখদের কবিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে সার্থক আলোচনা করেন। তিনি তাঁর (ইসলামিক যুগের) বিভিন্ন গ্রন্থে আরবী সাহিত্যকে সংস্কারমুক্ত করতে সহায়তা করেন। 'আছ ছিয়াছত' সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করে মোহাম্মদ মনসুর ফাহমী, অধ্যাপক আহমদ আমিন ও মোস্তাফা আবদুর রাজেক প্রমুখ পণ্ডিতেরা এক সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। যে ছান্দিক গদ্য এতদিন ধরে আরবী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহনরূপে চলে

আসছিল তা সংবাদপত্রের দৌলতে জনসাধারণের ভাষা হিসাবে সহজ, সরল, নিরাভরণ রূপ নিল। বিদেশী বহু শব্দ এবং স্থানীয় কথ্য ভাষাও আধুনিক আরবী সাহিত্যভাণ্ডারে আপনার স্থান করে নেয়। আরবের সংবাদপত্র আরবী ভাষাকে মুক্তি দেয় তার দুরূহ দুর্বোধ্যতার নাগপাশ থেকে।

আরবী ভাষার সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৯৩২ সালে মিশরে এক 'রয়েল ফিলোলজিক্যাল একাডেমি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই একাডেমিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়েছিল ঃ

১. আরবী ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করে যুগের চাহিদা অনুযায়ী আরবী ভাষাকে সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ প্রকাশক্ষম করে তোলা।

২. বিদেশী ও কথ্য পরিভাষাকে আরবী রূপদান করা যদি অনুসন্ধানের পরেও আরবী ভাষায় উপযুক্ত প্রতিশব্দ পাওয়া না যায়।

৩. সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-সংবলিত অভিধান সঙ্কলন।

আরবী ভাষার বিভিন্ন দিক ও পরিভাষা গ্রহণ সম্পর্কে গবেষণার উদ্দেশ্যে এই 'একাডেমি'র অধীনে অনেকগুলি সাবকমিটি গঠিত হয়। 'একাডেমি'র নিজস্ব মুখপত্রও প্রকাশিত বলিষ্ঠ গবেষণা ও তুলনামূলক আধুনিক আরবী সাহিত্যের প্রবর্তক হিসাবে ডক্টর তাহা হোসেনের নাম তাই স্মরণীয় হয়ে আছে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত আরবী সাহিত্যে নাটক বা নাট্যালয়ের প্রচলন হয় নি। বিদেশী বণিক্ বা পর্যটকদের দৌলতে যে দু-চারখানা নাটক আমদানি হতো, তাদের অভিনয়ও একরূপ নিষিদ্ধ ছিল রক্ষণশীল আরবসমাজে। কেননা, নাটক বা দৃশ্যকাব্যের অভিনয়ের বিধান ছিল না শাস্ত্রে। কোরানের মতে তা গুণাহ। সম্রাট নেপোলিয়নই প্রথম আধুনিক রঙ্গালয়ের সূচনা করেন। মিশর

অভিযানের পর সৈন্যদের চিত্তবিনোদনের জন্য মিশরে তিনি আমদানি করেন থিয়েটার বা রঙ্গালয়।

নাটক

তারপর প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল কেটে যায় আরবী সাহিত্যে সত্যিকারের নাটক রচিত হতে। কাশিম আমিনের নাটকগুলি—'নারীর মুক্তি ও নতুন নারী'—ভিত নড়িয়ে দেয় আরব সমাজের। রঙ্গমঞ্চের জন্য নতুন নতুন নাটক লিখতে প্রেরণাও যোগায় পরবর্তী-কালের লেখকদের। বেইরুটের খৃস্টান নাট্যকার মারুন নাকাস (খৃঃ ১৮১৭-৫৫) ফরাসী নাট্যকার মলিয়রের একখানি নাটক অনুবাদ করেন। তাঁর 'হারুন-অল্-রসিদ' নাটকখানি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীতও হয়। নাকাসের নাটকে ইটালীয় রঙ্গালয়ের প্রভাব দেখা যায়। শেক্সপীয়র, ভিক্টর হুগো বা কর্নেলির অনেক নাটকও এ সময় আরবী ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। বিভিন্ন ক্লাব আর প্রতিষ্ঠানে তাদের অভিনয়ও হয় সাফল্যের সঙ্গে। অল্-বুস্তানীর কাব্য-নাট্যগুলি আগ্রহের সঙ্গে সকলে বরণ করে নেন। কবি আহম্মদ শওকীর নাটকগুলি সত্যি যুগান্তরের সূচনা করে আরবী নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে। তাঁর 'ক্লিওপেত্রার মৃত্যু' (১৯২৯), 'মজনু-লায়লা' (১৯৩১), 'আলি-বে-অল্-কবির' (১৯৩২) আর 'আন-তারা' (১৯৩২) প্রভৃতি নাটকগুলি প্রাচীন মিশরের ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছবি। ফারাওদের আমল থেকে আরব সংস্কৃতির উজ্জ্বল দিকটা তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর সেরা নাটকগুলিতে। আঙ্গিক বিষয়বস্তু, দার্শনিক ভাবসম্পদ আর কলানৈপুণ্যে তাঁর রচনা একালের আরবী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। খলিল মতরুনের অনূদিত শেক্সপীয়রের 'ওথেলো', 'হ্যামলেট' আর 'মার্চেণ্ট অব্ ভেনিস', মিশরের সেরা অভিনেতা জর্জ আবিয়াতের সজীব অভিনয়গুণে মিশর ও সিরিয়ার অনেকের চিত্ত জয় করে। মতরুন 'মিশর জাতীয় নাট্যসম্প্রদায়

সমিতি'র সভাপতিও ছিলেন। তাওফিক্ অল্-হাকিমের 'গড্ডলিকার দল' (১৯৩৩) সমকালীন আরবী গদ্য-নাটকের পথ প্রদর্শন করে। নেগিব অল্-রিহানি ও আজিজ আবায়ীর নাটকগুলিও কায়রো ও অন্যান্য শহরের বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ও পঠিত হয়ে আসছে।

আধুনিক কবিতা

আধুনিক আরবী কবিতার এখন যুগসন্ধিক্ষণ বলা যায়। গত দুই বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমগ্র আরবজগতে রাজনৈতিক পরিবর্তন যেমন ঘটেছে, রূপপরিবর্তনও হয়েছে তেমনি তার কবিতার। কিন্তু এক ভাবধারা আর বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ছাড়া ছন্দ ও শব্দ-বিন্যাসের দিকে এখনও আধুনিক আরবী কবিতা সেকালের কাব্যধারাকে আঁকড়ে রয়েছে। পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে বুঝি অন্ধকারে। ইব্রাহিম হাফিজ আর আহম্মদ শওকী নানা দিক থেকে দেশ ও জাতিকে প্রবুদ্ধ ও সমৃদ্ধ করে তুললেও আধুনিক কোনো কোনো সমালোচকদের নিকট তাঁরা হলেন মধ্যযুগীয় কবিদের পর্যায়ভুক্ত।

প্রসিদ্ধ ইরাকী কবি 'অল্-রুসাফির কবিতায় আধুনিকত্বের সঠিক রূপটি ধরা পড়ে। এখনকার অধিকাংশ কবিতায় ধূসর মরুভূমি, দুর্ধর্ষ বেদুইন্, উটের ক্যারাভ্যান কিংবা সুশীতল মরূদ্যানের পরিবর্তে বর্তমান আরবজগতের বিভিন্ন সমস্যা আর জটিলতার প্রচ্ছন্ন দিকটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সমকালীন কবিরা কেবল কবিতার জন্য কবিতা লিখে ক্ষান্ত থাকেন নি। কয়েক বছর পূর্বে এ. জে. আরবেরী (A. J. Arberry) কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত 'আধুনিক আরবী কবিতা'র যে সঙ্কলনটি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আধুনিক আরবী কবিতার মোটামুটি তিনটি ধারার পরিচয় মেলে :

ক. বিদেশী প্রভাবপুষ্ট এক বিশ্বজনীনতা ; খ. প্রাচীন ঐতিহ্য-বাহী কবিতা আর গ. প্রাচীন ও নবীন ভাবাদর্শের মিলন ঘটেছে এমন সব কবিতা। ['ক্রান্তি'—৩য় বর্ষ : ১ম সংখ্যা]

আলোচ্য সঙ্কলনে কবি অল্‌-রুসাফি ইরাকের অতীত মহিমা-বন্দনায় পঞ্চমুখ। অল্ আহমদের 'সিরিয়ার সূর্যাস্ত' আর খলিল মতরুনের কবিতাগুলিও কাব্যামোদীদের নিশ্চয় আনন্দ দেবে। বঞ্চিত মানুষের অতৃপ্ত কামনা, ব্যথা-বেদনা আর হতাশার সুরের প্রতিধ্বনি তোলে তাঁদের সাম্প্রতিক বহু কবিতায়। ইলিয়াস আবু শবকাহ-এর 'মৃত্যু-স্বাদ' কবিতাটি আরবেরীর সঙ্কলনের সার্থক একটি সংযোজনা। 'সিরিয়ার সূর্যাস্ত' কবিতাটিব কয়েকটি কলি নীচে উদ্ধৃত করা গেল ঃ

"একটি খেজুর গাছ জেগে থাকে
প্রহরীর মত,
কত বর্ষ কত যুগ হয়েছে বিগত
পাতায় পাতায় ব্যাকুলতা—
চুপি চুপি বলে যায় প্রাচীনকালের রূপকথা।

*

নৌকোর মতো সাবলীল
মেঘ চলে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দিগন্তের নীল ;
হে নাবিক, পাল তোলো! ছলছলো
আকাশের নীল দ্বীপে চলো!"

[অনুবাদ ঃ দিনেশ দাস]

সিরিয়া ও লেবাননে

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত সিরিযা ও লেবাননে কাব্যচর্চার প্রবল ঢেউ বইতে থাকে। বেইরুট শহরের 'শিখা' পত্রিকার সম্পাদক বিশরা অল্‌-খুরি শিব্‌লি অল-মল্লত, পরলোকগত কবি আমিন তাকি অল্‌-দিন এবং ইলিয়াস ফুয়ার্দ তাঁদের কবিতার জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। বেইরুটের সাপ্তাহিক পত্র 'প্রদর্শনী' ও দামাস্কাসের 'সময়' পত্রিকায়ও আধুনিক আরবী সাহিত্যের অগ্রগতিতে সাহায্য

করে। শুধু কাব্য-সাহিত্যে নয়, কবিতার বিভিন্ন দিক আলোচনায় এই সময় বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচিত হতে থাকে। ফুয়াদ আফ্রাম অল্-বুস্তানির 'বিস্ময়', বেইরুটের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী সাহিত্যের অধ্যাপক আনিস অল্-মাক দিসি আর মিশরের সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর তাহা হোসেনের প্রচেষ্টায় আধুনিক আরবী সাহিত্যের —বিশেষ করে তাঁর কাব্য-আলোচনার বিভিন্ন দিক উদ্ঘাটিত হয়। যুদ্ধের পরে বিভিন্ন বেতার-কেন্দ্র ও চিত্রশিল্পের দৌলতে 'ঘজল' বা লোক-গাথার কদরও বেড়ে ওঠে। বেদুইন, ফালাহিন আর অশিক্ষিত পার্বত্য জাতিদের মুখে মুখে এই সব পুরাতন লোক-গাথা এক কালে ঘুরে বেড়াতো। যাযাবরী উপজাতিদের প্রেম, বিরহ বা তাদের দৈনন্দিন জীবনধারার বিভিন্ন দিক নিয়ে এই সব লোক-গাথা রচিত। আর তাদের রচনাকালও আজকের নয়। 'আরব্য-রজনী'রও আগে থেকে মুখে মুখে চলে আসছে।

ভীরু প্রেম আনে সংশয়। ভয় হয় পাছে বুঝি হারালাম আপন দয়িতাকে। বৃদ্ধ কবির মনে দানা বাধতে থাকে সন্দেহ। তাই আপন প্রিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলছেন ঃ

"আলা ডাল্ওনা, আলা ডাল্ওনা!
সায়িব ঝামানক্. হাউয়িল মিল হোনা!"

অর্থাৎ—

ডালনা প্রিয়া, ডালনা প্রিয়া!
লুব্ধ ওগো করছ কেন বৃদ্ধটিরে?
পঙ্গু আমি, মন দেয়া-দেয়ির
শক্তি কোথা?

প্রেমের ডোরে বন্ধ তবে করলে কেন;
সাদিব দুদিন পরেই যে গো তালাক দেবে
জানি জানি।

ধূ ধূ মরুভূমির দূর কান্তার কাঁপিয়ে ভেসে আসে প্রায় বিরহকাতর কোনো প্রেমিকের গানের রেশ ঃ

"নারি, য়্যা নারি, নারিয়া লেহিম,

তালাৎ অল্‌-গুর্‌বি ওয়াস্তেকা লেহিম।"

অর্থাৎ—

আগুন, আগুন, আগুন! রুদ্ধ কামনার তুষের আগুন জ্বলছে বুকে। ঘরের কোণে পড়ে রয়েছে যারা তাদের জন্য ছটফট করছে প্রাণটি। আর যে পারি না, ওগো, আর কতকাল এমনি করে ভুলে থাকব বল?

এমনি আর একটি লোক-সঙ্গীত ঃ

"ও মিজ্‌য়ানা! ও মিজ্‌য়ানা! ও মিজ্‌য়ানা! আমার সকরুণ গান শুনে ছুটে এসেছে ঘুঘু আর কাছিমগুলোও। রাজপ্রাসাদে বন্দিনী আমার বিশীর্ণ প্রিয়া। সুন্দর মুখখানি তার গেছে শুকিয়ে। কালি-পড়া দুটি আঁখির পাতে নেমে আসে যেন প্রভাতী সূর্যের প্রশান্ত আশীর্বাদ। বন্দিনী মেয়ে, প্রিয় আসবে তোমার ফিরে। এসে বলবে অনুনয় করে ঃ কেন তুমি আমায় ছিলে এতদিন ভুলে?"

বিবাহ ও শবযাত্রার নানা অনুষ্ঠানাদিতে অথবা উট চরাতে চরাতে এমনিধারা লোক-গাথা গীত হয়ে আসছে বহুদিন থেকে।

কথা-সাহিত্য

একালের আরবী কথা-সাহিত্য বল্গাহীন ঘোড়ার মতো জোর কদমে ছুটে চলেছে বলা চলে পরিপূর্ণতার দিকে। আরবী সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার উপন্যাস ও কথা-সাহিত্য। ইতিপূর্বে ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা ও বিদেশী উপন্যাসের অনুবাদ (বিশেষ করে ফরাসী উপন্যাস) আরবী সাহিত্যে কথাশিল্পের স্থান পূরণ করে আসছিল। সংবাদপত্রের প্রসার ও জনপ্রিয়তা উপন্যাসের চাহিদা বাড়িয়ে

তোলে। মন্‌ফলতীর 'অল্‌-আবরাত', 'আজ জাইরাতের রফা-ইল ও অল্‌-মাজিনীর 'ইবন্নুতাতবীয়াত' প্রভৃতি অনুবাদ-গ্রন্থ এক কালে বিপুল আগ্রহের সহিত পঠিত হতো। ডক্টর মোহাম্মদ হোসেন হায়কল (জন্ম : ১৮৮৮ খৃঃ), তাওকিক হাকিম ও অল্‌-মাজেনীর মতো শক্তিশালী লেখক ও অনুবাদকের প্রচেষ্টায় মৌলিক উপন্যাস রচনার অনুশীলন 'অল্‌-আতলাল', আবু হাদিদের 'ইবনতুল মামুলুক' ও সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডক্টর তাহা হোসেনের 'অল্‌-আযআম', কারাওয়নের 'ডাক', 'আদিব', 'দুর্দশা-বৃক্ষ' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য। তাহা হোসেন পয়গম্বরের জীবনী অবলম্বন করে চারখণ্ড গল্প-সঙ্কলনও প্রকাশিত করেন। কবি আহম্মদ শওকীর 'আধরা অল্‌-হিন্দ (ভারত-কুমারী) খানিকটা খাপছাড়া হলেও ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত একটি সুখপাঠ্য উপন্যাস। মোহাম্মদ ইব্রাহিম অল্‌-মুআলিহির 'ইসা-ইবন-হিসাম-কথা', হাফিজ ইব্রাহিমের 'লায়াল সতি' ও মোহাম্মদ লুৎফি জুমার 'লায়ালি অল্‌-বু-অল্‌ হোর' প্রভৃতি শক্তিশালী রচনার দ্বারা আধুনিক উপন্যাসের গোড়াপত্তন হয়। আবদুল কাদের, অল্‌-মাজেনী, আবদুল্লা ইনান, মোহাম্মদ তাইমুর প্রমুখ কথাশিল্পীদের লেখায় উপরতলার আরবসমাজের খুঁটিনাটি চিত্র, সমাজে নারীদের স্থান প্রভৃতি চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। তাইমুরের গল্প-সংগ্রহ 'অল্‌-সেখ-জুমা' কথ্যভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগের নমুনা। এই সেদিনও পর্যন্ত আধুনিক আরবী গদ্য-সাহিত্যে ক্লাশিক-ঘেঁষা রচনা-নীতির প্রভাব বজায় ছিল। অল্‌-মারেনীর 'লেখক ইব্রাহিম' (প্রকাশকাল ১৯৩১ খৃঃ) এর নিদর্শন। কিন্তু ডক্টর তাহা হোসেন, আহমদ্‌ আমিন্‌, ডক্টর হায়কল, আর তাত্তাফিক্‌ হাকিম প্রভৃতি শক্তিধর লেখক ও কথাশিল্পীরা একালের আরবী উপন্যাসের মোড় দিয়েছেন ঘুরিয়ে। যাত্রা তাঁদের শুরু সবে। তবে আশা করা যায় সে যাত্রা হবে সাফল্যমণ্ডিত। কেননা বৃটিশ ও ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের দৌলতে যে জাতির শতকরা ৬০ জন বাসিন্দারই বর্ণ-

পরিচয়ের সুযোগ ও সৌভাগ্য হয় নি একদা, তাদের পক্ষে এ সাহিত্য-প্রচেষ্টা শুভ বই কি !

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর কথা পুনরায় উদ্ধৃতি করে এ আলোচনা শেষ করা যাক ঃ

"সংস্কৃত, গ্রীক ও চীনা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্ব অবশ্য আরবী সাহিত্যে নাই ; আরবের মরু-জীবনের আধারের উপরে রচিত গীতি-কাব্য ও গাথা-কাব্য ভিন্ন, আরবী-সাহিত্যের প্রায় সমস্তটাই অন্য দেশের—বিশেষ করিয়া গ্রীসের ও প্রাচীন ইরানের—সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় গঠিত। কিন্তু তাহা হইলেও, মুসলমান ধর্মের প্রথম ও প্রধান বাহন বলিয়া, আরবী ভাষায় একটা অসাধারণ প্রতিষ্ঠা আছে, এবং সেই প্রতিষ্ঠার ফলে বিগত হাজার বারোশ' বৎসর ধরিয়া আরব ও আরব ভিন্ন অন্য জাতির চেষ্টায় ইহাতে একটি বিরাট্ সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং সে প্রতিষ্ঠা ইহার সাহিত্যকেও উন্নীত করিয়াছে। আরবী সাহিত্যের প্রসার সুবিশাল ; ইতিহাস বিশিষ্ট অর্থাৎ ইস্‌লামী ধর্ম-তত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, গদ্যে ও পদ্যে নিবদ্ধ সুকুমার সাহিত্য,—এ সমস্ত বিষয়েই আরবীতে অসংখ্য পুস্তক রচিত হইয়াছে ; এবং আরবীর সাহিত্য-ভাণ্ডারে বিশ্বজনের উপযোগী বহু অমূল্য রত্ন আছে।"

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

এ্যারবিক লিটারেচার : এইচ. এ. আর. গিব
এ লিটারারি হিস্ট্রি অফ দি আরবস্ : আর. এ. নিকল্‌সন্
মিস্টিকস্ অফ ইসলাম : আর. এ. নিকল্‌সন্
এনসাইক্লোপিডিয়া অফ লিটারেচার (প্রথম খণ্ড) :
জোসেপ টি. শীপ্‌লে
চেম্বার্স এনসাইক্লোপিডিয়া (নূতন সংস্করণ) : প্রথম খণ্ড
"হিন্দু ও আরবদের মধ্যে সাহিত্য সম্পদ" : সৈয়দ সামসুদ্দীন
অনুবাদ : 'প্রবাসী', চৈত্র ১৩৪৯
বৈদেশিকী : ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
"প্রি-ইস্‌লামিক পোয়েট্রি" : 'মোস্লেম ওয়ার্লড' (এপ্রিল, ১৯৪২)

তুর্কী সাহিত্য

তুর্কী ভাষা উরাল-আল্‌তাই ভাষা-গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত। তুর্কী ও মঙ্গোলীয় ভাষা এই একই অঞ্চল থেকে উদ্ভূত বলে পণ্ডিতদের অভিমত। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা, এমনকি আধুনিক তুর্কী ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করেন যে, হিয়াং-নু যাযাবরেরা ছিল তুর্কীদের নিকট-আত্মীয়। খৃষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতক থেকে চীনাদের সঙ্গেও হিয়াং-নু যাযাবরদের ছিল নিকট-সম্পর্ক। কিন্তু আনুমানিক খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকেই প্রথম তুর্ক বা তুর্কী শব্দের সন্ধান পাওয়া যায় চীনের প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজে হিয়াং-নু তুর্ক জাতির উল্লেখপ্রসঙ্গে। তারপর থেকে মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন জাতি-উপজাতির মধ্যে তুর্কী ভাষা ও শব্দ প্রচলিত হয়ে আসছে। পরবর্তীকালে এ ভাষাই তুর্কী জাতির রস-সমৃদ্ধ সাহিত্যে পরিণত হয়েছে।

মধ্য-এশিয়ায় প্রাচীন তুর্কী ভাষার যে নিদর্শন ১৮৯০ সালে আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে ছিল চীন সম্রাটের এক শিলালিপি। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে এই শিলালিপি খোদিত হয় বলে জানা যায়। খান্ বিলগা তখন ছিলেন তুরস্কের শাসনকর্তা। তাঁর ভ্রাতা কুল্‌তেগিন-এর স্মৃতিরক্ষার্থে এই শিলালিপি উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। এই প্রস্তরফলকের এক পাশে ছিল চীনা হরফ আর বাকী তিনদিকে উইঘুর হরফ। ওরখান নদীর কূলে এই শিলালিপি পাওয়া গিয়েছিল বলে 'ওরখান লিপি' নামে তা পরিচিত। য়েনিসি উপত্যকাতেও ইতিপূর্বে এমনিতর আর এক শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল। ভিলহেম, টমসেন ও র‍্যাডলফ প্রমুখ পণ্ডিতরা এই লিপির পাঠোদ্ধার করেন। এই সব শিলালিপিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেকালের তুর্কী

শাসন-কর্তাদের বিজয় অভিযান, আর তাঁদের নানা কীর্তি-কলাপের অভিনব কাহিনী।

মধ্য-এশিয়ার সেকালের তুর্কী সাহিত্যে স্মরণীয় গ্রন্থ মামুদ খাসঘরির অভিধান 'দিবান লুগাতি-ত্‌তুর্ক' (তুর্কী ভাষার 'ওমনিবুক')। ১০০৭ সালে এ গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল প্রথম আর তিনখণ্ডে। মুদ্রিত হয় ১৯১৪-১৬ সালে। অভিনব এই শব্দকোষে কেবল তুর্কী শব্দের তাৎপর্য ও টীকা-টীপ্পনী লিপিবদ্ধ ছিল না, তখনকার দিনের প্রচলিত বহু শব্দ, শব্দের অন্বয়, স্থানীয় কথা ও সাহিত্যের বিবরণও ছিল। "উইঘুর তুর্কী" ছিল সেকালের সাহিত্যিক ভাষার বাহন। ইউসুফ খাস্ হাদ্‌জিব-এর "খুদাত্‌কু বিলিক' শাসন-সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়ের এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এটি ১০৭০ সালে লিখিত, কলেবরেও নেহাত ছোট নয়। সাড়ে ছ' হাজার পংক্তির উপর আর তাও রূপক-কাব্যের আকারে রচিত। দেশের শাসনকর্তা, উজীর, উজীরপুত্র ও উজীরভ্রাতা এই চারিটি রূপক চরিত্রের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তরছলে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক, নীতি ও তত্ত্বের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই গ্রন্থে। এই বইখানিতে ইরানী সাহিত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ ভাষার আর একখানি স্মরণীয় গ্রন্থ 'বক্তিয়ারনামা।' 'বক্তিয়ারনামা' আবার 'দশ উজীরের কাহিনী' নামেও পরিচিত। আর তাতে ভারতীয় সাহিত্যের (ইরানী ভাষার মারফত) প্রভাব দেখা যায়! এসময়কার আর একখানি উল্লেখযোগ্য বই হলো 'মিরাজনামা'।

চাঘতাই কথ্য ভাষায় লিখিত স্মরণীয় পুস্তক হলো দিল্লীর সম্রাট বাবরের 'বাবরনামা' আর আবুল গাজি বাহাদুর খানের লেখা তুর্কীদের বংশনামা 'সেজরাইতুর্ক'। বাবরনামার উল্লেখ ইরানী সাহিত্য আলোচনার প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে করা হয়েছে। শ্রীএ. এস. বেভারিজ ইংরেজীতে বাবরের এই স্মৃতিকথা অনুবাদ করেছেন। আবুলগাজির 'সেজরাইতুর্কে' মধ্য-এশিয়ার তুর্কীদের পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 'বাবরনামা'ই রণকুশলী সম্রাট বাবরের সাহিত্য-

প্রতিভার একমাত্র পরিচয় নয়। তিনি তুর্কী ও পারসীক উভয় ভাষায় অনবদ্য বহু গীতি-কবিতাও রচনা করেছিলেন। ১৯১০ সালে ই. ডি. রস্ বাবরের 'দিওয়ান-ই-বাবর পদিশ' আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত করে প্রথম প্রকাশ করেন 'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল' জার্নালের ষষ্ঠ সংখ্যায়। ১৯১৭ সালে পেট্রোগ্রাদ থেকে এ. স্যামোলভিচ্ প্রকাশিত করেন বাবরের আর একখানি কাব্যগ্রন্থ 'মাজমুয়া-ই-আশব-ই-বাবর' নামে। অধ্যাপক ফুয়াদ্ কপ্‌বলু ইস্তাম্বুল থেকে তুর্কী ভাষায় রচিত বাবরের আর একখানি অপ্রকাশিত কবিতার বই প্রকাশিত করেন। এই বইখানির নাম 'মেল্লি তেতেবব্লার'। বাবরের লেখা এমনি অনেক গীতি-কবিতা আজিও হয়তো অনাবিষ্কৃত হয়ে পড়ে আছে। নীচে তার অপ্রকাশিত কয়েকটি কবিতার বাংলা অনুবাদ দেওয়া গেল :

"চন্দ্রমুখি হে মোর নিরুপমা, তোমার সাথে আমার মিলন-রাত্রি যেন সুখের প্রভাত! আর বিচ্ছেদের দিনটি যেন বিষাদের সন্ধ্যা।

*

ওগো আমার প্রিয়তমা, হানো তুমি আমার বুকে নিঠুর আঘাত।
তাতেই আমার পরম তৃপ্তি।
তোমার দেওয়া নিঠুর আঘাত আনবে আমি জানি,
শান্তির নীর বিরহ-উদ্বেল আমার চিত্তে।

*

আর কতকাল জ্বলতে থাকব আমি
ধূপের মতন তোমার বিচ্ছেদ-বিরহে?
স্পর্শ যদি নাই বা করল তোমায় প্রেমের
বিরহ-যাতনা, কিইবা তাতে এসে যায়?"

*

বাবরের দুটি রুবাইয়্যাৎ :

"আমার দুঃখের সাথী যেন হয় হানিফা—হয় যেন সে ক্ষত-বিক্ষত আমার হৃদয়ের সান্ত্বনার নির্যাস। খোদার

নিকট নতি জানাই, চিরসহচরী হয়ে থাকে যেন সে চিরকাল—থাকে যেন দিবারাত্রি আমার সাথে সাথে।"

*

নীচের এই কবিতা দুটিতে বাবরের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আত্মার সন্ধান পাওয়া যায়ঃ

"ওগো, যাঁর ইচ্ছায় স্বর্গ, মর্ত আর রসাতল ঘুরে বেড়ায় দিবানিশি আর যাঁর নির্দেশে করে তারা পরিক্রমা, তাঁর বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগই থাকবে না, যদি বিনীত এই দাসানুদাস নিরাময়-নির্বিঘ্ন জীবনযাপন করতে থাকে।

*

বৃথা আমি খুঁজে বেড়ালাম 'কিমিয়া' (এক গুপ্তবিদ্যা, যার সাহায্যে দেহ থেকে দেহান্তরে যাওয়া যায় বলে লোক-বিশ্বাস)। কিন্তু সন্ধান তার পেলাম কই? কিমিয়া-বিদ্যার মতো হয়তো এও এক দুর্লভ বস্তু—নাগালের বাইরে। দারিদ্র্যই আমার দিয়েছে সবকিছু স্মৃতিপথ থেকে মুছে। 'কিমিয়া'-শাস্ত্র কি দিতে পারে না রৌপ্যের কোনো হদিস?"

[*"Unpublished Verses of Babur"*—Islamic Cultural (Quarterly), January, 1956]

প্রথম জাতীয় কবি

তুরস্কের পশ্চিম অঞ্চলে যে সাহিত্য প্রচলিত ছিল পরবর্তীকালে তাই ওটমন (ওসমান্‌লি) সাহিত্য নামে আখ্যা লাভ করে উল্লিখিত হয়েছে। ১৯২৩ সালে তুরস্কে সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হবার পর তাই ওসমান্‌লি সাহিত্য বলে পরিগণিত হয়ে আসছে। চতুর্দশ শতকের শুরু থেকে পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধ কালের ওটমন তুর্কী সাহিত্যে পারসীক প্রভাব উৎকট হয়ে ওঠে। সেল্‌জুক্

যুগের অধিকাংশ কবি ও লেখকরাই তুর্কী ছেড়ে পারসীক ভাষায় সাহিত্য অনুশীলন করতে থাকেন। কবি জালালউদ্দীন রুমী পারসীক (ইরানী) ভাষায় তাঁর বিখ্যাত 'মসনবী' রচনা করেন। মাতৃভাষা তুর্কীতে যাঁরা সাহিত্যসৃষ্টি করতে ব্রতী ছিলেন তাঁদের মধ্যে কবি ইউনুস আম্‌রি (মৃত্যু: ১৩০৭) সবিশেষ প্রসিদ্ধ। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে তাঁর আধ্যাত্মিক কবিতাগুলি তুরস্কের জনসাধারণ সাদরে বরণ করে নেয়। তিনি তুরস্কের প্রথম জাতীয় কবি হিসাবে আজিও বরণীয়। জনগণের জন্য ক্লাশিকাল তুর্কী ছন্দে তিনি তাঁর বিখ্যাত মসনবীগুলি লিখেছেন। এ যুগের আর একখানি কেতাব সুলেমান চেলেবির লেখা 'মেভ্‌লিদি শরিফ'। হজরত মহম্মদের মহিমা কীর্তিত হয়েছে এই গ্রন্থে। দুরূহ তুর্কী ভাষায় রচিত হলেও জন-সাধারণ এই কেতাব আজিও পরম আগ্রহে পড়ে থাকে। তাঁর সূক্তিগুলি এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে উচ্চারিত হয়ে থাকে। গ্রন্থখানি ইংরেজীতেও অনূদিত হয়েছে 'উইস্‌ডম্ অব্ দি ইস্ট' গ্রন্থমালায়।

দ্বিতীয় মুরাদ (খৃঃ ১৪২১—৫১)-এর আমলে তুর্কী সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হয়েছিল অনেকখানি। কেননা, মুরাদের রাজসভায় বহু জ্ঞানী ও গুণীর সমাবেশ ঘটেছিল। পারসীক ও আরবী ভাষা থেকে বহু গ্রন্থ তুর্কীতে অনূদিত হয় দ্বিতীয় মুরাদের পৃষ্ঠপোষকতায়।

পরবর্তী প্রায় চারশ' বৎসরকাল পারসীক ও আরবী সাহিত্যের আওতায় থাকে বলা চলে সেকালের তুর্কী সাহিত্য। ১৪৫৩ সালে কন্‌স্টান্টিনোপল বিজিত হয় ফতে মামুদ (বিজয়ী মহম্মদ) কর্তৃক। সাম্রাজ্যবাদী এই অভিযানের ফলে তুর্কী সাহিত্যে বিদেশী প্রভাব ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি লাভ করে। প্রতিবেশী রাজ্যের—অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধতর পারসীক ও আরবী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব তুর্কী ভাষায় এসময় বিশেষ করে পরিলক্ষিত হয়। ভাব, ছন্দ ও অবয়বের

দিক থেকে পারসীক ও তুর্কী কবিতার সাদৃশ্য এমন হয়ে উঠেছিল যে, তা দেখে কে বলবে না শীরাজের কাব্য-কানন থেকে পারস্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার অমর 'রুবাইয়্যাৎ', 'ঘজল' আর 'কসীদ'গুলি চয়ন করে নিয়ে গিয়ে তুর্কী ভাষার অঙ্গরাগ সুশোভিত করা হয় নি? কাব্যই তখন তুরস্কের প্রধান সাহিত্য হয়ে উঠেছিল। আর পারসীক সাহিত্যের প্রভাবে সাহিত্য-ভাষা ও কথ্য-ভাষার মধ্যে ব্যবধান দেখা দেয় অনেকখানি। সাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠে অনেকখানি কৃত্রিম। তবু সেকালের দিকপাল চারজন প্রসিদ্ধ কবি হলেন ফজলি (মৃত্যু: আনুঃ ১৫৬২), বার্ক (খৃ. ১৫২৬—১৬০০), নোফ (মৃত্যু: আনুঃ .৬৩৪), আর নেদিম (মৃত্যু: ১৭৩০)।

মধ্যযুগের তুর্কী সাহিত্যের এই চারজন দিকপালের মধ্যে কবি ফজলির পুরো নাম মোহম্মদ বিন সুলেমন। তুর্কী, আরবী ও পারসীক—এই তিন ভাষাতে ইনি ছিলেন সমদক্ষ। কাব্যও রচনা করেছেন তিন ভাষাতে। তাঁর কবিতা ছিল আবেগধর্মী। 'হৃদয়ের কবি' নামে ইনি ছিলেন পরিচিত। তুর্কী ভাষায় তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা: 'লায়লা ও মজনু' আর 'দিওয়ান'গুলি সর্বত্র সমাদৃত। কবি বার্কের স্থান ওটমন ক্লাশিকাল সাহিত্যে ফজলির পরেই বলা চলে। তাঁর রচিত সুলতান সুলেমনের প্রশস্তি-গাথা তুর্কী কাব্যের এক বিখ্যাত গ্রন্থ। চিরন্তন প্রেম, ফুল, বসন্ত আর সুরাই ছিল তাঁর কাব্যের উপাদান; ছিল অনেকটা গতানুগতিক। নোফ বা এঝ্রাম সুলতান চতুর্থ মুরাদের (খৃঃ ১৬২৩—৪০) আমলে সেরা কবি। নোফের কবিতায় আরবী ও পারসীক সাহিত্য ও সংস্কৃতির ছাপ ছিল গভীর। সমসাময়িক তুর্কী সাহিত্যে যে কৃত্রিম রচনারীতির উদ্ভব হয়, নোফ ছিলেন তার প্রবর্তক। উজীর বৈরাম পাশার উদ্দেশে এক ব্যঙ্গ-রচনা লিখেছিলেন বলে নোফের শিরচ্ছেদ হয়। আর কবি আহমদ নেদিমকে ওটমন ক্লাশিকাল সাহিত্যের শেষ কবি বলা যায়।

ক্লাশিকাল যুগের শেষ কবি

কবি আহমৎ নেদিম ছিলেন বিখ্যাত 'তুলিপ যুগে'র কবি। তাঁর কবিতায় ছিল 'তাই যুগে'র ছাপ ঃ জাঁকজমক, ঐশ্বর্য আর সৌন্দর্যের জয়গান। ওটমন তুর্কী সাহিত্যের আর একটি শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ শেখ গালিবের (খৃঃ ১৭৫৭—৯৯) 'সুন্দর ও প্রেম' (হুসন্নু আশক)। শেখ গালিব ছিলেন মেভলেভী বা ভ্রাম্যমাণ দরবেশদের প্রধান। মাত্র একুশ বছর বয়সে এই কাব্য তিনি রচনা করেন। 'মসনবী' ধাঁচে এটি লেখা। রূপকের মারফত স্বর্গীয় প্রেম, সুন্দর আর প্রজ্ঞার মহিমা কীর্তিত হয়েছে এই কাব্যে। শেখ গালিবের এই অপূর্ব কাব্য জন বুনিয়ানের 'পিলগ্রীমস্ প্রগ্রেস'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ফিট্‌জিরাল্ড যদি ওমর খইয়ামের রুবাইয়াৎ-এর মতো এই মসনবীও ইংরেজীতে অনুবাদ করতেন, শেখ গালিবও বিশ্ব-সাহিত্যে আপনার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিতেন নিশ্চয়ই।

ঐতিহাসিক গ্রন্থ

কাব্যের মতো ঐতিহাসিক গ্রন্থও এই সময় লেখা হয় প্রভূত পরিমাণে। সাদেদীন্-এর 'ইতিহাসের মুকুট' গ্রন্থে ওটমন সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাঈমা আর জেবাদেৎ-এর লেখা 'তারিয়' (Tarih) বহু খণ্ডে বিভক্ত। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে তুরস্কের ইতিহাস বর্ণিত আছে এই দুই বিখ্যাত গ্রন্থে। এইসব ঐতিহাসিক গ্রন্থের ভাষাও সাহিত্যিক রসগুণে সমৃদ্ধ। ছন্দ-মুখর এই গদ্য-রীতিকে বলা হয় 'সেজ'। সাদেদীন্-এর 'ইতিহাসের মুকুট' এই সাহিত্যগুণে ধন্য। মিঃ ই. জে. জিব সাদেদীন-এর অপূর্ব এই 'ইতিহাসের মুকুট'-এর ইংরেজী অনুবাদ করেছেন।

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন তুর্কী সাম্রাজ্যের ভাঙন শুরু হতে থাকে, তখনও কিন্তু তুর্কী সাহিত্যে নতুন এক ভাবধারা দেখা দেয়। সুলতানের প্রশস্তি-গাঁথা

'কশিদ' আর ধর্মঘেঁষা আধ্যাত্মিক কবিতা নিয়ে আর তুষ্ট থাকলেন না তুর্কী লেখকরা। 'ধূলির ধরণী'তে তাঁরা যেন ফিরে এলেন। বাস্তব পরিবেশে জীবনের চিত্র আঁকতে সচেষ্ট হলেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা থেকে উনিশ শতকের প্রথম দিকে উদ্ভব হয় বিপ্লবী এক সাহিত্য-ধারার। এই ধারা প্রথম দিকে 'ন্যাচারালিস্ট স্কুল' এই নাম নেয়। যদিও তার লেখকরা ছিলেন সবাই মাঝারি শ্রেণীর, তবু তাঁদের রচনায় তুর্কী সমাজের বাস্তব চিত্রটি নিখুঁত ভাবে ধরা দিয়েছে। তুর্কী সাহিত্যের গণ্ডীও এঁরা দিয়েছেন অধিকতর বিস্তৃত করে।

'তান্‌জিমৎ যুগে' এই প্রচেষ্টা নতুন আর এক বাঁক পরিগ্রহ করে। চিরাচরিত প্রথা ছেড়ে এই যুগের লেখকরা প্রচারধর্মী সাহিত্য সৃষ্টিতেও অগ্রণী হন। শিনাসী এফেন্তী (খৃঃ ১৮২৬-৭১) ছিলেন এই ধারার প্রবর্তক। প্রতিখণ্ড হাজার পৃষ্ঠায় চতুর্দশ খণ্ডে তাঁর রচিত অভিধান তুর্কী ভাষায় এক স্মরণীয় দান। জিয়া পাশা আর নামিক কামাল (খৃঃ ১৮৪০-৮০) প্রমুখ শক্তিধর লেখকরাও ছিলেন এই নতুন সাহিত্য-ধারার বাহক। ডাক্তার এদ্‌নান্‌-এর মতে তানজিমৎ স্কুলের লেখকগোষ্ঠীই তুর্কী সাহিত্যকে মধ্যযুগীয় ভাবধারা থেকে মুক্ত করে আধুনিকতার পথে এগিয়ে দেন।*

নতুন যুগের নতুন লেখক

ফরাসী সাহিত্যের প্রভাবও এ যুগের সাহিত্যিকদের নতুন করে উজ্জীবিত করে তোলে—সঞ্জীবিত করে তোলে জাতীয়তা, স্বাদেশিকতা ও স্বাধীনতার মন্ত্রে। নামিক কামালই ছিলেন এই স্বাধীন ভাবধারার কর্ণধার। তিনি ছিলেন শিনাসীর গুণমুগ্ধ ও অনুগত। তাঁর সুবিখ্যাত নাটক 'বাতান' (পিতৃভূমি)

---

*Halide Edib: *Conflict of East & West in Turkey*—Jamia Millia Extension Lectures, 1935.

কিংবা তাঁর 'কশিদ-ই-হাবিয়েৎ' (স্বাধীনতা স্মরণে) তুর্কী জনমানসে নবচেতনার জোয়ার নিয়ে আসে। ইস্তাম্বুল শহরের গাদিক পাশা থিয়েটারে তাঁর 'বাতান' বা পিতৃভূমির অভিনয় দেখে দর্শকরা এমনই অনুপ্রাণিত হয়ে উঠত যে শাসকশক্তি ভয় পেয়ে নাটকের অভিনয় দেয় বন্ধ করে। আর নিবাসিত করলে নাট্যকারকে। কিন্তু নামিক কামাল তাতে একটুও দমলেন না। নতি স্বীকার করলেন না। সুলতানের শত নিপীড়ন, নির্যাতন আর নির্বাসন দণ্ড সত্ত্বেও তাঁর নিষিদ্ধ বিদ্রোহী কবিতা গোপনে পাঠ করত জনসাধারণ। তুরস্কের তখনকার যুবশক্তির তিনি ছিলেন অবিসংবাদিত নেতা। নামিক কামালের জীবনদর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রতীক তার রচনা 'স্বাধীনতা স্মরণে'। পিতৃভূমি থেকে বহুদূর দেশে নির্বাসনে তাঁকে মৃত্যু বরণ করতে হয়।

বিদ্রোহী কবি নামিক কামালের ঠিক বিপরীতধর্মী লেখক ছিলেন আমেদ মিধাৎ। তিনি ছিলেন সাহিত্যিক জীবনে তোষামোদপন্থী। বিপ্লবের বিপদসঙ্কুল পথ না মাড়িয়ে ইনি তোষামোদের পথ নেন বেছে এবং সুলতানের পক্ষপুটের আশ্রয়ে উঠে-পড়ে লাগেন এক নির্ঝঞ্ঝাট সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। কিন্তু শিনাসী এফেণ্ডী আর নামিক কামাল যে বিপ্লবী সাহিত্যের প্রবর্তন করে যান, তার ধারা থাকে অব্যাহত। কবি টওফিক ফিক্‌রেদ (খৃঃ ১৮৬৭-১৯১৫)-এর উদ্যোগে 'নয়া সাহিত্য' (এডিবিয়াতি জেডিডি) খুব সমাদর লাভ করে। কবি টওফিক ছিলেন কিছুকাল রবার্ট কলেজের তুর্কী ভাষার প্রধান অধ্যাপক আর 'সারভেতি ফুনান' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ দেশভক্ত আর আদর্শবাদী। তুর্কী কবিতার নতুন ছন্দ ও আঙ্গিকের প্রবর্তন করেন ইনি। তুর্কী ভাষায় চতুর্দশপদী সনেটও চালু করেন। 'ভগ্নবীণা' হলো তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তাঁর কাব্যে দুরূহ পারসীক ও আরবী শব্দের বহুল প্রচলন ছিল বলে আধুনিক পাঠকমহলে তা তেমন সমাদর লাভ করে নি। তবুও

আধুনিক তুর্কী জাতীয়তাবাদী কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। রবার্ট লুই স্টিভেন্‌সনের মতো তিনি শিশুদের জন্য কিছু কিছু কবিতা লিখে গেছেন 'শারমিন' কাব্যগ্রন্থে।

নয়া সাহিত্যগোষ্ঠীর আর একজন সেরা কবি হলেন আবদুল হক হামিদ। কোনো কোনো সমালোচকের মতে তিনি আধুনিক তুর্কী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলে অভিহিত। তাঁর শক্তিশালী লেখনীর মুখে আধুনিক তুর্কী সাহিত্যের মান উন্নীত হয়েছে অনেকখানি। পরলোকগত পত্নীর স্মৃতি-স্মরণে রচিত তাঁর 'মাকবে'র (সমাধি) কবিতাটি তুর্কী কাব্য-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা চলে। তাঁর সব রচনার বিদেশী অনুবাদ এখনও হয় নি। হলে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা নিশ্চয় তিনি অর্জন করতেন।

সমকালীন যুগ

ওটমান (ওস্‌মানলি) সাম্রাজ্যের শেষের দিকে নব জাতীয়তাবাদের যে জোয়ার দেখা দেয়, তার ফলে একালের তুর্কী সাহিত্যে ইউরোপীয় ধরনের সত্যিকারের উপন্যাস আর আধুনিক নাটকের সূচনা হয়। আধুনিক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার প্রসারও ঘটে ঐ সময়। এসব পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'কাদ্রো' (Kadro) ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ। এই সাময়িক পত্রিকাখানিকে কেন্দ্র করে বাংলার তিরিশের 'কল্লোল যুগে'র মতো শক্তিশালী এক সাহিত্য আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। নিছক সাহিত্য-সৃষ্টিই 'কাদ্রো'র একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। তার লেখকগোষ্ঠীর সবাই ছিলেন জাতীয়তাবাদী আর পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় দীক্ষিত। সুপ্রসিদ্ধ সমাজবাদী নেতা জিয়া গোক্ আল্প ছিলেন এই অন্দোলনের কর্ণধার। জাতীয়সত্তা সম্পর্কেও তুর্কী জনসাধারণ আত্মসচেতন হয়ে ওঠে ক্রমশ এ সময়। যে 'তুর্কী' শব্দ ছিল এতকাল অপাঙ্‌ক্তেয় ও ইতরজনের পরিপূরক এবং যা এতকাল অশিক্ষিত যাযাবর সম্প্রদায়ের ভাষা বলে পরিগণিত হয়ে আসছিল,

সে পেল এখন নতুন মর্যাদা। ব্যবহৃত হতে লাগল এখন থেকে ওটমান বা ওস্‌মানলি শব্দের পরিবর্তে। তুর্কী নব-জাগৃতির এই ধারা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে ১৯২৩ সালে--তুর্কী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে। এবং তুর্কী গণতন্ত্রের প্রথম সভাপতি মুস্তাফা কামাল আতাতুর্কের সুযোগ্য নেতৃত্বাধীনে তা নতুন রূপ লাভ করে শিক্ষা-সংস্কৃতি আর সাহিত্যে। ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ও তুর্কী সাহিত্য ও সংস্কৃতির গবেষণা ও অনুশীলনের ব্যবস্থা করেন অধ্যাপক মহমদ ফাউদ্ কোপ্রুলুর তত্ত্বাবধানে। তুর্কী লোক-গাথা ও লোক-সাহিত্যের প্রতি বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয়। 'হল্‌ক্ বিলগিসি' (লোক-গাথা) নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও আত্মপ্রকাশ করে ইস্তাম্বুল থেকে। এই পত্রিকার মারফত লুপ্তপ্রায় বহু তুর্কী পল্লীগীতি ও প্রাচীন সাহিত্যের পুনরুদ্ধার লাভ ঘটে আনাতোলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের যাযাবরী বেদুইনদের মুখ থেকে সংগৃহীত হয়ে।

আধুনিক এই তুর্কী কথা-সাহিত্যকে সুষ্ঠু রূপদান করেছিল ইউরোপীয় সাহিত্য আর তার সার্থক অনুবাদ। গ্রীক. ল্যাটিন, ফরাসী, জার্মান, রুশ, ইংরেজ এবং এমন কি হালের সোভিয়েত রুশিয়ার গল্প-উপন্যাস আর প্রবন্ধ-কবিতা তুর্কী ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। তুর্কী পাঠক-সমাজও তাদের বরণ করে নেয় সমাদরের সঙ্গেই। বিদেশী সাহিত্যেব প্রভাব বুঝি সবিশেষ পরিলক্ষিত হয় আধুনিক তুর্কী উপন্যাসের মধ্যে। আর হালিদ্ এদিভ্-এর উপন্যাসগুলিই ('বিদুষক ও তার কন্যা', লণ্ডন—১৯৩৫) ইত্যাদি যেন তার প্রত্যক্ষ পরিচয়। হালিদ্ এদিভ্-এর অনেকগুলি উপন্যাস ইংবেজীতে অনূদিত হয়েছে। লেখিকা 'জামিয়া উলেমা' বক্তৃতা করতে কয়েক বছর পূর্বে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলিতে মডার্ন তুরস্কের রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে নিখুঁতভাবে।

নাজিম হিক্‌মত্

একালের তুর্কী-সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনা বুঝি অসম্পূর্ণ ই থেকে যাবে যদি না আশ্চর্য শক্তিধর, বিপ্লবী এক কবির নাম উল্লেখ করা হয়। নাম তাঁর নাজিম হিক্‌মত্ (জন্ম: ১৯০২ খৃঃ)। নাজিম হিক্‌মতের কবিতা ইতিমধ্যেই রুশ, পোলিশ, ফরাসী, ইংরেজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। পুস্তকাকারে তাঁর কবিতা বাংলা ভাষাতেও রূপান্তরিত হয়েছে। ['নাজিম হিক্‌মতের কবিতা'— সুভাষ মুখোপাধ্যায়।] এবং তা পাঠক-সমাজে সর্বত্র সমাদৃত। ধর্ম, অন্যায়-অবিচার আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কশাঘাতে তিনি কবি তওফিক্ ফিক্‌রেদকেও ছাড়িয়ে গেছেন।

বয়স যখন তাঁর চৌদ্দ, তখনই তাঁর কবিতা লেখার হাতেখড়ি হয়। প্রথম প্রথম মামুলী ধারায় কবিতা লিখলেও, এর প্রভাব তিনি কাটিয়ে ওঠেন শীগ্‌গীর। রুশ বিপ্লবের ডাক তাঁকে নব প্রেরণায় দীক্ষিত করে তোলে। ১৯১৯ সালে নৌ-যুদ্ধ-শিক্ষানবিসী কালেই তিনি প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন এবং 'চলরে নওজোয়ান' নামে অগ্নিবর্ষী এক কবিতা রচনা করেন। 'চল্লিশজন দস্যুর বন্দী' ব্যঙ্গ কবিতাযুদ্ধে পরাজিত আর হীনবল তুরস্ককে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের কুটিল চক্রান্তের মুখোশটি খসিয়ে দেন কবি হিক্‌মত্। সাম্রাজ্যবাদীদের এ অপচেষ্টা ব্যর্থ করতে তিনি আবেদনও জানান দেশবাসীর নিকট এই কবিতায়। 'আনাতোলিয়া' কবিতাটিতে সামন্ততান্ত্রিক জাঁতাকলে পিষ্ট তুর্কী জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার কথা ব্যক্ত হয়েছে। সহজ, অনাড়ম্বর ও বলিষ্ঠ আবেগময়ী তাঁর কবিতা-গুলিকে তুর্কী পাঠকগোষ্ঠী সাগ্রহে বরণ করে নেয়। মস্কোয় শিক্ষা এবং মায়াকভস্কির প্রত্যক্ষ প্রভাব হিক্‌মতের কবিতায় দেখা দিলেও, তিনি কিন্তু তাঁর স্বকীয়তা হারান নি। হিক্‌মতের কবিতার এই হলো বৈশিষ্ট্য। ভারতে তিনি কোনো দিন আসেন নি। শুধু কেতাবে পড়ে আর মস্কোপ্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের মুখে ভারতের কথা শুনে

দূর ভারতবর্ষ সম্পর্কে কি দরদী চিত্রটিই না এঁকেছেন 'ব্যানার্জি নিজেকে হত্যা করলে কেন'—তাঁর সুবিখ্যাত রচনায়। এই রচনার প্রতিটি ছত্রে কবির গভীর দেশপ্রেম আর বিদেশী ভারতভূমির প্রতি মমতা যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি তিনি সমানে আক্রমণ করেছেন ভারত আর তুরস্কের বুকে জেঁকে-বসা সাম্রাজ্যবাদী শাসকশক্তিকে।

কলকাতার এক জনতার দৃশ্য। হিক্‌মতের বিখ্যাত নাটকের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি ঃ

"উন্মুক্ত জনতা, ওরে, উন্মুক্ত জনতা রে ভাই! ঝড়ের মুখে বনভূমির মতো গুমরে উঠছে। কি ভযানক জনারণ্য!

"কলকাতার মজদুররা, কাশ্মীর থেকে এসেছে শ্রমিকরা, নাবিকরা এসেছে বোম্বাই থেকে। যেন 'সাতাত্তর সাগরের বালি' জড়ো হয়েছে এক জায়গায়—খালি মাথার পর মাথা।

"ন্যাংটা ছেলেগুলো গাছের ডালের উপর চড়ে ঝুলছে থোকা থোকা; বৃদ্ধারা গিয়ে বসেছে সিঁড়ির গোড়ায়। এক চুল ঠাঁই নেই কোথাও। একগাছা দাঁড়ি মুখ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যদি ফেলতে চাও মাটিতে, তা ফেলবার জায়গা পাবে না। এমনি ভয়ানক জনতা রে ভাই, এমনি ভয়ানক জনতা!"

যে সব পাশ্চাত্য লেখকদের মতে প্রাচ্য হলো কেবল কিমাশ্চর্য, অতিশয়োক্তির দেশ—সব কিছুতেই তার বাড়াবাড়ি, তাঁদের লেখা বই পড়ে আমাদের আলোচ্য তরুণ কবিও যে কিছুটা তাঁদের মতো অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট নন, একথা বলা চলে না। কিন্তু সমালোচকদের মতে ভারত-সংক্রান্ত কবিতাগুলিই তাঁর সেরা রচনা বলে স্বীকৃত। তখনকার পরাধীন ভারতের মায়া-মুকুরের মধ্যে বিপ্লবী কবি হিক্‌মত্ স্বদেশের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন বুঝি।

নাজিম হিক্‌মতের একটি কবিতা ঃ

কলকাতার বাঁড়ুজ্যে ॥

চোখে আমার সোনার ফোঁটার মত
আলো-ফেলা এই নক্ষত্র
যখন প্রথম বিদীর্ণ করেছিল
শূন্যতার এই অন্ধকার
এই পৃথিবীতে তখন আকাশের দিকে
উন্মুখ এইটি চোখও ছিল না।…
নক্ষত্রেরা তখন প্রাচীন,
পৃথিবী নেহাত শিশু।

নক্ষত্রেরা দূরে
আমাদের কাছ থেকে
অনেক, অনেক দূরে।…
আর তাদের মাঝখানে কী ক্ষুদ্র
আমাদের এই পৃথিবী
একটি কণিকা মাত্র
ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি বিন্দু।

পৃথিবীকে পাঁচ টুকরো ক'রলে
তার এক টুকরোয় এশিয়া,
এশিয়াব অনেক দেশের
একটি দেশ ভারতবর্ষ,
ভারতবর্ষের অনেক শহবের
একটি শহর কলকাতা,
সেই কলকাতার একটি
মানুষ বাঁড়ুজ্যে।

আমার কাছে তোমরা শোনো খবর ;
ভারতবর্ষ ভূখণ্ডে
শহর কলকাতায়
একটি মানুষের গতিবিধি আজ রুদ্ধ
ওরা শিকল পরিয়েছে এক অভিযাত্রী মানুষের পায়ে ।

উজ্জ্বল আকাশের দিকে
আর আমার মুখ তোলবার বাসনা নেই ।
নক্ষত্রেরা যদি দূরে থাকে থাকুক
পৃথিবী যদি ক্ষুদ্র হয় হোক
ও সব তুচ্ছ
কি তাতে যায় আসে ...
আমি তোমাদের জানাতে চাই

আমার কাছে
ওর চেয়েও বিস্ময়কর
তার চেয়েও শক্তিমান
তার চেয়েও রহস্যময়
গতিরুদ্ধ
শৃঙ্খলিত
সেই মানুষ ।

['নাজিম হিকমতের কবিতা' : অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

নাজিম হিক্‌মতের এমনি আর একটি কবিতা :

আমি কবি তাদের—
যারা জীবন গড়ে ;
আমি কবি পৃথিবীর
আর আগুনের
আর লোহা-লক্কড়ের ..
আমি সৈনিক লক্ষজনের...

কবি হিক্‌মতের এই কবিতাটি প্রেমেন্দ্র মিত্রের অতি পরিচিত একটি কবিতার ['প্রথমা' গ্রন্থের] কথা মনে করিয়ে দেয়।

হিক্‌মতের আর একটি রুবাঈ ঃ

"কুনমিঙে" আছে পাথরে তৈরী নৌকো এক
সারা চীনে আর সমস্ত পালে পুরোদমে
লাগে যখন হাওয়া
পড়ে থাকে শান-বাঁধানো মাটিতে
শুধু সেই এক নৌকো
ম্লান মুখ, সারা অঙ্গ বিষাদে ছাওয়া।

অনুঃ—সুভাষ মুখোপাধ্যায়
['পরিচয়'—আশ্বিন-কার্তিক, ১৩৬২]।

কবি নাজিম হিক্‌মত্‌কে প্রতিক্রিয়াশীল তুর্কী সামরিক ট্রাইব্যুনেল ১৯৩৮ সালে দীর্ঘ ২৮ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন দেশদ্রোহিতার অপরাধে। হিক্‌মত্‌ অবশ্য বলেন ঃ

'আমার অপরাধ, আমি আমার স্বদেশ আর দেশের জনসাধারণকে গভীরভাবে ভালোবাসি।'

কবি হিক্‌মত্‌ প্রমুখ বামপন্থী প্রগতিশীল কবি ও লেখক কিংবা 'কাদ্রো' আন্দোলনের শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী ছাড়াও একালের তুর্কী সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত লেখকদের মধ্যে জিয়া-হিলমি হলেন সুপ্রসিদ্ধ। বয়সে তিনি প্রবীণ নন। কিন্তু পাণ্ডিত্যে ও বৈদগ্ধে তিনি বহু প্রবীণকেও ছাড়িয়ে যান। আধুনিক তুর্কী লেখকদের মধ্যে জিয়া-তিসমিই বোধহয় একমাত্র ব্যতিক্রম যিনি পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষিত ও দীক্ষিত হয়েও পুরোপুরি ইউরোপের ধাঁচে নবীন তুর্কীকে ঢালাই করার পক্ষে নন। প্রাচ্যের সাংস্কৃতিক আদর্শেরই তিনি স্বপক্ষে। তিনি তাঁর অসংখ্য রচনায় তুরস্কের প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যের মধ্যে আবার ফিরে যেতে চেয়েছেন। 'প্রেমের নীতি' জিয়া-

হিলমির শ্রেষ্ঠ রচনা। এই গ্রন্থে দার্শনিক প্লেটোর প্রভাব লক্ষ্য করবার। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শসজ্ঘাতের এই অনুপম পুস্তকখানি এদেশের অনেক ভাষায় অনূদিত হওয়া উচিত।

রস-রচনা তুর্কী সাহিত্যের আর এক অপূর্ব সম্পদ। এই রচনাগুলিকে স্থূল ভাঁড়ামির পর্যায়ে ফেললে ভুল করা হবে। অধিকাংশ এসব রচনায় লেখকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর সাহিত্যবেত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। নসরুদ্দীন খোজা-র (আমাদের 'গোপাল ভাঁড়ে'র মতো) নামেই অনেকগুলি কাহিনী প্রচলিত আছে। ফ্রান্সিস্ ম্যাক্‌কাল্ল আর এলেন র‍্যামজের সংকলিত 'টেলস্ ফ্রম তুর্কী' কিংবা এ্যাডলার আর র‍্যামজে কর্তৃক লিখিত 'কফি হাউজে কথিত' গ্রন্থে এমনধারা বহু রস-রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। এইচ্. ডি. বার্নহাম কর্তৃক অনূদিত নসরুদ্দীন খোজার কাহিনীই তাদের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। শুধু রস-রচনা নয়, আধুনিক নাট্য-সম্পদেও একালের তুর্কী সাহিত্য পিছিয়ে পড়ে নেই।

পিছিয়ে যে পড়ে নেই তার প্রমাণ 'আন্‌কারার কন্‌জারভেটরি', মিউনিসিপাল ইস্তাম্বুলের 'মিউনিসিপ্যাল থিয়েটার' এবং দেশের বিবিধ 'হল্‌ক এভিজ' (Halk Evis) বা গণনাট্য প্রতিষ্ঠান ও রঙ্গালয়। এই সকল নাট্য-প্রতিষ্ঠান অবশ্য আধুনিক ইউরোপীয় রঙ্গালয়ের অনুকরণে গঠিত। শেক্সপীয়র, মলিয়র প্রমুখ ইউরোপীয় নাট্যকারদের নাটক তুর্কী ভাষায় অনূদিত হয়েছে গত শতকে এবং আজও তুর্কী পাঠক-পাঠিকাদের নিকট ইউরোপীয় সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ নাটক-নাটিকার অনুবাদ সাদরে সমাদৃত। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনয়ও হয়ে থাকে রজনীর পর রজনী।

এ ধরনের পাশ্চাত্য নাটকের অভিনয় এবং সমাদরের এক কুফল হল এই যে, তুরস্কের জাতীয় নাটক ও প্রাচীন নাট্যকলা তাতে অনেকটা অনাদৃত হয়ে পড়ল। 'মেদ্দাহ্' (Meddah) বা কফি-খানা কথকতা, 'অরতা ওউনু' ('Orta Oyunu') বা মধ্যস্থায়ী

নাট্যাভিনয়, 'কারা গোঝ' ('Kara Goz') বা ছায়া চিত্রাভিনয় প্রভৃতি নিজস্ব শিল্পকলা একরূপ প্রায় অবলুপ্ত হতে বসল। মেদ্দাহ্ বা কফিখানার কথক তাঁর বাম স্কন্ধে একখানি গামছা রাখতেন। তারপর তিনি তাঁকে ঘিরে-ধরে-বসা সমবেত দর্শকদের সম্মুখে অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে দক্ষ মূক অভিনয় করতেন। চিত্তবিনোদন করতেন দর্শকদের এই সকল লোক-কলা অনুষ্ঠিত হতো রমজান মাসেব সময় যখন উপবাসব্রতী মুসলমান জনসাধারণ সায়াহ্নে কফিখানায় এসে সমবেত হতো পানাহারেব নিমিত্ত। কারাগোঝ বা বিচিত্র উটচর্মের তৈবী ক্ষুদ্রাকার পুতুলের সাহায্যে (অনেকটা আমাদের পুতুলনাচের অনুরূপ) এই ছায়ানৃত্য প্রদর্শিত হতো। তার সঙ্গে বিচিত্র সুবের গান-বাজনাও থাকত। 'কাবা গোঝ' ছায়াচিত্রাভিনযে সাধারণত নৌকার মাঝি, রাস্তার লিপিকর, পাঠশালার শিক্ষক বা এমনই ধরনের প্রচলিত চরিত্রেব ভূমিকার অবতারণা করতে হতো শিল্পীকে। দোহাকার 'হাজিবৎ'-ও থাকত তার পার্শ্বচর হিসেবে। কখন অকপট সবল, কখন বা জটিলতার মুখোশ নিতে হলো তাকে—বিশেষ করে অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদেব তুষ্টিবিধানেব উদ্দেশ্যে। আবাল বৃদ্ধ জনসাধারণেব সহজ অনাবিল আনন্দের উৎস এই সকল লোক-সাহিত্য আজ পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় দীক্ষিত জনসাধাবণের নিকট অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়েছে।

ত্রয়োদশ শতকে পশ্চিম এশিয়ায় দুর্ধর্ষ মঙ্গোল আক্রমণের মুখে প্রাচীন তুর্কী সাহিত্যেব অতি স্বল্পই আজ বক্ষা পেয়েছে। তাছাড়া শেলযুগবংশীয় তুর্কী সম্রাটবা পারস্য দেশকে পর্যুদস্ত করে পারস্যের রাজ-সিংহাসনে যখন অধিরোহণ করেন তখন তাঁরা পারস্যের সুসমৃদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে আপনার করে নেন। মাতৃভাষা তুর্কীর কথা একরূপ বিস্মৃত হয়ে যান। ধর্মানুষ্ঠানে তখন থেকে প্রচলিত হতে থাকে আরবী ভাষা। পারস্য বা ইরানী ভাষার প্রচলন শুরু হয় আইন-আদালত আর রাজদরবারে। জনসাধারণের কথ্য ভাষা তুর্কী

তখন কেবল সীমাবদ্ধ হয়ে রইল সমাজের নীচের তলার সাধারণ মানুষের মধ্যে আপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে। ফলে বেশির ভাগ কবি ও সাহিত্যিক ইরানী আর আরবী ভাষায় সাহিত্য লিখে গেছেন মাতৃ-ভাষার কথা একরূপ ভুলে গিয়েই। তবু কিন্তু আধুনিক কথাশিল্পী ম্যাদাম হালিদ এদিভ, ফালী রিফকি এতয়, সাবাহত্তিম আলি, সয়িদ ফয়িক আর্বাসয়ানিক প্রমুখ যশস্বী কথা-শিল্পীদের দান অনস্বীকার্য।

তায়ুর্কিক

[TYURKIC]

চার কোটি ষাট লক্ষ তুর্কী ভাষা-ভাষী জনসাধারণের মধ্যে (১৯৫৪-র গণনা মতে) প্রায় দু কোটি লোকের অধিবাস তুর্কী প্রজাতন্ত্রে। আর অবশিষ্ট এক কোটি নব্বই লক্ষ ছড়িয়ে আছে সোভিয়েত রুশিয়ার বিভিন্ন গণরাষ্ট্রে। আজারবাইজান, কাজাক-স্তান, উজবেকিস্তান, তাজাকস্তান রিপাবলিক থেকে শুরু করে চীন তুর্কীস্তান প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যে সকল তুর্কী জনসাধারণের বসবাস রুশভাষায় তাঁদেরই বলা হয়ে থাকে তাইয়ুর্ক (Tyurk)—ওসমানলি বা ওটমান তুর্কী থেকে স্বতন্ত্র করে বোঝাবার জন্যে। সুতরাং তুর্কী বা তায়ুর্কদের মধ্যে তেমন বিশেষ কোন জাতিগত পার্থক্য নেই। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে মঙ্গোলিয়া ও উত্তর চীন থেকে কৃষ্ণ সাগব পর্যন্ত যে সকল মরুচারি যাযাবর জাতির বসবাস ছিল এবং চীন দেশের পণ্ডিতরা যাদের তু-কিউ (Tu-kiu) নামে অভিহিত করতেন, ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে এদেরই (তায়ুর্কিকদেরই) বলা চলে তাদের বংশধর। পূর্ব পাশ্চাত্য দুই বৃহৎ ভাগে এই সকল জাতিগোষ্ঠীকে ভাগ করা যায়। এরা প্রায় সকলেই মুসলমান ধর্মী। পারসী, মোঙ্গল, তুর্কী প্রভৃতি সুলতানদের কর্তৃত্বাধীনে যুগের পর যুগ অতিবাহিত করে এসেছে। সমরখন্দ, বোখারা, বাকু প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জনপদগুলি এই যাযাবর গোষ্ঠীর

স্মৃতি বিজড়িত। লোক-কথা আর লোক-গাথাই তাদের সাহিত্য-সম্পদ। মুখে মুখেই এই সাহিত্য ছিল প্রচলিত। লিখিত সাহিত্য রচিত হতো পারসীতে। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে কাজু-বোর্খানেদ্দিম তাঁর 'দিওয়ান' লিপিবদ্ধ করেন ইরানী কাব্যের অনুকরণে। তাসান-অল্লু ও তাঁর গ্রন্থাবলীতে ইরানী কবিদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে সাফেবিদ সুলতানদের আমলে দেশের জনসাধারণের সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। সাহিত্য ও শিল্প-কলায় তার প্রতিফলনও দেখা দেয়। রস-ঘন সুললিত প্রেমগীতি ও মরমী কবিতা এই যুগে রচিত হতে থাকে প্রভূত পরিমাণে। কাব্য ছন্দে রচিত ফাজু'লির 'লুইদি-বি-মেদঝুন' (Luidi-be-medzhnun) তখনকার একটি স্মরণীয় আখ্যায়িকা। কবি খানন-নেসি'ম এ যুগের কবিদের মধ্যে বিশিষ্ট আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

উনবিংশ শতকে যখন তায়ুর্করা জার সাম্রাজ্যের অধীনে এল তখনই তাদের পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটে। বিজাতীয় শাসকবর্গের বিরুদ্ধে মধ্যযুগীয় আভিজাতিক মহলের অসন্তোষ এবং প্রাচীন ভাবধারার সঙ্গে তখন ঘটল তাদের সংঘর্ষ। বনেদী অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা ছিলেন অধিকতর উদার ও প্রগতিশীল তাঁরা ক্রমশ রুশ শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। রুশ ভাবধারা প্রচারে উন্মুখ হয়ে উঠলেন। বাকিখানভ ছিলেন এই নতুন ভাবধারার প্রবর্তক। শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার সব কিছুতে (বাকিখানভের নামের প্রান্ত ভাগ—রুশীকরণ এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করবার!) নতুন এই ভাবধারার ছাপ তায়ুর্কিক সাহিত্যেও প্রতিফলিত হলো। আজারবাইজানের যশস্বী কথাশিল্পী মির্জা ফামালি আখুন্দভ-ই বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পটভূমিকায় প্রথম উপন্যাস রচনা করেন। ১৯১৮ সালে বলশেভিক বিপ্লবের পর তিনি শোষিত জনগণের প্রতিভূ হয়ে আজারবাইজানকে স্বাধীন করতে ব্যর্থ চেষ্টা

করেছিলেন। এন. নরিমানভ্-এর রচনায় মির্জা আখুন্দভের চাইতেও অধিকতর বিপ্লবী মতবাদের স্বাক্ষর রয়েছে। মোল্লা-বিরোধী ধর্মবিমুখ আন্দোলনের জন্য তিনি ছিলেন সুবিখ্যাত।

১৯০৫ সালের রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের পর কিয়ুজাত অভিধেয় রোমান্স-ধর্মী বুর্জোয়া ভাবাদর্শী এক নতুন মতবাদের স্রোত দেশময় বইতে শুরু করে। আলা-বেক, গুসেন-জাদে ও খাদি ঝাভিদ (Kadi Dzhavid) এই নতুন দলের ছিলেন হোতা। মোল্লা নসরুদ্দীনের বুদ্ধিজীবী রচনায় অধিকতর প্রগতিশীলতার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। নিপীড়িত ও নির্যাতিত জনগণের মর্মবেদনা তাঁর সাহিত্যে মুখরিত হয়ে উঠেছে। সবির, গামকিউ'দির (Gamkyudir), আলু-নেজমি (Alu-Nezmi) প্রমুখ শক্তিশালী কবি ও কথাশিল্পী ভবঘুরে এক জনপ্রিয় শিল্পী মোল্লা নসরুদ্দীনের অনুপ্রেরণায় নতুন সাহিত্য রচনায় ব্রতী হলেন। নেদঝেফ বেক ভেঝিরভ (Nedzhef bek Vezirov) রুশ নাট্যকার অস্ট্রোভস্কির নাটক মাতৃভাষায় অনুবাদ করে নতুন এক শিল্প-প্রেরণার প্রবর্তন করেন। বলশেভিক বিপ্লবের পর আজার-বাইজান, কাজাকস্তান, উজবেকিস্তান, তাজাকস্তান প্রভৃতি সমগ্র তাইয়ুর্ক ভাষাভাষী অঞ্চলে যে নতুন প্রাণবন্যার স্রোত প্রবাহিত হয়েছে তাতে সঞ্জীবিত ও পল্লবিত হয়ে উঠেছে এক নতুন সার্থক সাহিত্যধারা কর্তৃপক্ষের একান্ত প্রচেষ্টায়। শুধু সাহিত্যে নয়, ১৯২৩ সালে আরবী বর্ণলিপি পর্যন্ত বর্জন করে তাঁরা আজ এগিয়ে চলেছেন কালের যাত্রার ধাপে সমান তালে পা ফেলে নতুন সাহিত্য সৃষ্টির সন্ধানে।

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

টার্কিস্ লিটারেচার : এন্সাইক্লোপিডিয়া অব্ লিটারেচার (দ্বিতীয় খণ্ড)—শীপলে সম্পাদিত

দি টার্কস অব্ সেণ্ট্রাল্ এশিয়া : মেরী ঝাপলিকা

কনফ্লিক্ট্ অব্ ইস্ট য্যাণ্ড্ ওয়েস্ট ইন্ টার্কী : হালিদ এদিব্

মার্কসিজম য্যাণ্ড্ দি ন্যাশনাল য্যাণ্ড্ কলোনীয়াল কোয়েসশন : জে. ভি. স্ট্যালিন

হিস্ট্রি অব্ ওটম্যান্ পোয়েট্রি : ই. জে. ডব্লিউ. জিব

সোভিয়েটস ইন সেণ্ট্রাল এশিয়া : ডব্লিউ. পি. কোট্স্ য্যাণ্ড ঝেলদা কোটস্

এনসাইক্লোপিডিয়া অব্ ব্রিটানিকা (২২ খণ্ড)

টার্কিক্ ল্যাংগুয়েজেজ অব সেণ্ট্রাল এশিয়া : "সেণ্ট্রাল এশিয়ান রিসার্চ সেণ্টার" (লণ্ডন)

নেপালী সাহিত্য

নেপালের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থে লেখা আছে ঃ

হিমালয় পর্বতের তটদেশে যে পার্বতীয় অংশে গোর্খাজাতির বাস, তাকে তিব্বতীয় ও হিমালয়ের উপরিস্থিত পার্বত্য জাতির ভাষায় 'পাল' দেশ বলে। (তিব্বতীয় ভাষায় 'পাল' শব্দের অর্থ পশম। হিমালয়ের এই অংশে পশম অর্থাৎ, লোম-বহুল ছাগ অনেক পাওয়া যায় বলে এই স্থানকে পালদেশ বলা হতো।) বর্তমানে নেপাল রাজ্যের পূর্বাংশ ও সিকিম প্রদেশ তথাকার আদিম লেপচা জাতি কর্তৃক 'নে' নামে অভিহিত ছিল। লেপচা, নেবার ও অপরাপর কয়েকটি পরস্পর সংলগ্ন জাতীয়দের ভাষায় 'নে' শব্দের অর্থ 'পবিত্র গুহা বা দেবতার উদ্দেশ্যে রক্ষিত পীঠস্থান।' এ থেকে সহজে অনুমেয় যে গোর্খাজাতির বাসভূমি হিমালয় তটস্থ পাল দেশে যেখানে কাষার স্তূপ ও স্বয়ম্ভুনাথ প্রভৃতির 'নে' অর্থাৎ পবিত্র তীর্থস্থান আছে, তারই সমষ্টিকে নেপাল (অর্থাৎ পালরাজ্যের অন্তর্গত পবিত্র তীর্থ বা বাসভূমি) বলা হতো। আবার অনেকে বলেন যে, এই পাল দেশের যে ভাগে নেবার জাতির বাস ছিল, তা আগে 'নে' নামে কথিত হতো। 'নে' নামক স্থানে বাস করত বলেই এই জাতির নাম 'নেবার' হয়েছে। এই নেবার জাতীয় লামারা প্রথমে বৌদ্ধ মত গ্রহণ করে নিজেদের দেশে বৌদ্ধ কীর্তিসমূহ স্থাপন করেন এবং তাঁদেরই নাম-সংকেতে এই স্থানের নাম হয়েছিল বলেও অনেকের বিশ্বাস।

নেপালে রক্ষিত 'বংশাবলী' থেকে জানা যায়, সত্য যুগের প্রথম দিকে হিমালয় পর্বতের এই সানুদেশ বিপুল জলরাশিতে আবৃত ছিল। ত্রেতা ও দ্বাপর যুগেও হিমালয় পর্বতের সানুদেশস্থ বিস্তীর্ণ এই অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়। নানা কিংবদন্তী ও পৌরাণিক কাহিনীও তার সঙ্গে বিজড়িত রয়েছে। কলিযুগের সূচনায় নে-মুনি নামে এক রাজবংশের নাম অনুসারে নেপালের নামানুকরণ হয়েছিল বলেও জনশ্রুতি আছে। তারপর নেপালের প্রাচীন রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত বহু রাজবংশেরও

উল্লেখ দেখা যায় প্রাচীন পুঁথি-পত্র ও বংশাবলীতে। এই রাজবংশাবলীর মধ্যে গুপ্ত, আহীর, কিরাতি, সোমবংশী, সূর্যবংশী, ঠাকুরী বা প্রথম রাজপুত—বৈশ্য ঠাকুরী, দ্বিতীয় রাজপুত ও কর্ণাটকী রাজবংশ সবিশেষ প্রসিদ্ধ। নে-মুনির দেশ তারপর মুকুন্দসেনা এবং তারও পরে বহু ঠাকুরীয় রাজন্যবর্গ কর্তৃক অধ্যুষিত হয়। এবং দু'শ পাঁচ বৎসর কাল যাবৎ তাঁরা নেপালের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলে জানা যায়।

প্রাচীন 'বংশাবলী'তে তারপর যে রাজা-মহারাজাদের উল্লেখ রয়েছে তা পুরোপুরি সত্য নয় বলে পণ্ডিতদের বিশ্বাস। ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে সিম্ রাউলু-রাজ হরিসিং দেব কর্তৃক নেপাল আক্রান্ত ও বিজিত হয়েছিল বলে ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। হরিসিং দেব দিল্লীর সুলতান তুঘলক শা কর্তৃক নিজ রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে নেপালে এসে উপস্থিত হন এবং সহজেই নেপাল দখল করেন। এই বংশের চারজন রাজা নেপালে রাজত্ব করেছিলেন। তারপর রাজপুত বংশোদ্ভব জয়ভদ্র-মল্ল তাঁদের বিতাড়িত করেন। এবং খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত নেপালের রাজতক্তে সমাসীন ছিলেন। এই বংশেরই সপ্তম রাজা জয়স্থিতি মল্ল দীর্ঘকাল (১৩৮৬-১৪২৯ খৃঃ) নেপালের রাজত্ব করেন এবং দেশের আইন-কানুন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে ব্রতী থাকেন। বাংলায় যেমন লক্ষণ সেন কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন, নেবারীদের মধ্যে তিনিও তেমনি জাতিভেদ প্রথা প্রথম প্রচলন করেছিলেন। অষ্টমরাজ যক্ষ মল্ল-এর আমলেই মল্ল রাজবংশ চার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বহুধাবিভক্ত ক্ষীয়মাণ রাজশক্তি ১৭৬৮ সালে গোর্খাদের হাতে পর্যুদস্ত হয়। বিজিত গোর্খারা অবশ্য অমিতবিক্রম মুস্লিম আক্রমণের মুখে বিপর্যস্ত হয়ে কুমায়ুনের তুষারধৌলি পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। দুর্ধর্ষ মুস্লিম আক্রমণের তোড় কিছুটা মন্দীভূত হয়ে এলে পর গোর্খারা লামজুং থেকে ক্রমশ পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে এবং রাজা পৃথিনারায়ণের নেতৃত্বে নেপাল উপত্যকা অধিকার করে নেয়। এই তুমুল যুদ্ধে কাটমণ্ডুর রাজা জয়প্রকাশ নিহত হন এবং ভাতগাওয়ানের বৃদ্ধ রাজা রণজিৎ মল্ল বারাণসীতে এসে আশ্রয় নেন। গোর্খাদের নেপালের তরাই অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করবার জন্য ক্যাপ্টেন কিন্‌লকের নেতৃত্বে একদল বৃটিশ সৈন্য প্রেরিত

হয়েছিল ১৭৬৫ সালে। গোর্খারা এই বৃটিশ বাহিনীকে পরাজিত করে। ১৭৯০ সালে গোর্খারা তিব্বত আক্রমণ করে এবং প্রথমে কিছুটা সাফল্য অর্জন করলেও বিপুল সংখ্যক তিব্বতীয় বাহিনীর মুখে তারা পশ্চাৎ অপসরণ করতে বাধ্য হয়। তিব্বতীয় বাহিনী খাস নেপালভূমি পর্যন্ত ধাওয়া করে আসে এবং মর্জি-মাফিক শর্তে নেপালীদের সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য করে। তিব্বতীয়দের হাতে এমনি ধারা মার-খাওয়ার পর থেকেই বুঝি দুর্ধর্ষ গোর্খাদের চৈতন্যোদয় হতে থাকে। ভারতের ইংরাজদের সঙ্গে সৌহৃদ্যপূর্ণ বাণিজ্যগত সন্ধি স্থাপনে উদ্যোগী হয়।

১৮০১ সালে নতুন করে আর একটি নেপাল-বৃটিশ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই সন্ধিপত্র অনুসারে নেপালী রাজদরবারে এক বৃটিশ রেসিডেন্ট প্রেরিত হন; কিন্তু ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকায় অনধিকার অনুপ্রবেশ ও ছোটখাটো সংঘর্ষের প্রতিবাদে—তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয় এবং ইংলণ্ড ও নেপালের মধ্যে আবার যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হল। খৃঃ ১৮১৬ নেপাল ও ভারত সরকারের মধ্যে যে সন্ধি স্থাপিত হয় তাতে নেপালরাজ ভারত সরকারকে তাঁদের নতুন অধিকৃত অনেকখানি স্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য হন এবং কাটমণ্ডুতে 'বৃটিশ রেসিডেন্সি' স্থাপনে স্বীকৃত হন। তারপর ১৮৫৭-র ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় নানাসাহেবপ্রমুখ ভারতের প্রথম মুক্তি যোদ্ধারা যখন নেপালের তরাই অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন, তখন নেপালরাজ জং বাহাদুর বিস্তর সৈন্যসামন্ত নিয়ে ইংরেজদের সাহায্যে ছুটে আসেন এবং 'সিপাই বিদ্রোহ' দমনে ইংরেজদের প্রভূত সহায়তা করেন।

এ গেল সেকালের নেপালের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা। সমুদ্রতট থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার ফিট্ উঁচু ভারতের লাগোয়া হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত—আয়তনে ৫৫ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যায় ৮৫ লক্ষর উপর—বিস্তীর্ণ এইপার্বত্য এলাকাটি এশিয়ার রাজনীতি ক্ষেত্রে কখনও উপেক্ষণীয় ছিল না এবং এখনও নয়।

শুধু রাজনীতি জগতে নয়, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নেপালের সঙ্গে আমাদের যোগসাজঁশ রয়েছে অন্তরঙ্গ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনলস তথ্যানুশীলনের ফলে আজ জানা গেছে, এই নেপালেই

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি উৎস—তার চর্যাপদগুলি—'হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহাগুলি'—একদা নেপালেই সংরক্ষিত ছিল। এই গানগুলির ভাষা ছিল প্রাচীন বাংলা আর তার বিষয়-বস্তু ছিল বৌদ্ধ সহজিয়া মতের অনুষ্ঠান ও সাধন। কিন্তু অনেকটা হেয়ালী আকারে তা লিপিবদ্ধ ছিল বলে অর্থ তার সহজে উদ্ধার করা যায় না। এমনি একটি দোহা :

কিং তো দীবে কিং তো নিবেজ্জঁ
কিং তো কিজ্জুই মন্তহ সেব্বঁ।
কিং তো তিথ তপোবন জাই
মোক্‌খ কি লব্‌তই পানী হাই ॥

অর্থাৎ—

[কি (হবে) তোর দীপে, কি (হবে) তোর নৈবদ্যে, কি তোর করা হবে মন্ত্রের সেবায়, কি তোর (হবে) তীর্থ-তপোবনে যেয়ে। জলে স্নান করলে কি মোক্ষলাভ হয়?]

['দোহাকোষ'—ডক্টর প্রবোধ চন্দ্র বাগচী]

নেপালী বা নেবারী পূর্বী পাহাড়ী ভাষাসমূহের অন্তর্ভুক্ত নেপালের এই ভাষার অপর নাম—আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, খস্‌-খুড়া বা খস্‌ ভাষা গোর্খালী, এবং পর্বতিয়া। এ ভাষা হিন্দু নেপালের রাজ-ভাষা আর তা মঙ্গোল ভোট-ব্রহ্ম শ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রসারিত। দেবনাগরী হরফে লেখা নেপালী ভাষা অনেকটা হিন্দীরই অনুরূপ।

[ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। 'লোকশিক্ষা' গ্রন্থমালা।]

চর্যাগীতিকার সমধর্মী গানের সন্ধান

নেপালে চর্যাগীতিকার সমধর্মী সম্প্রতি প্রায় দুই শত গানের খোঁজ পেয়েছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। ডঃ দাশগুপ্ত নেপালে তিন সপ্তাহকাল অবস্থান করে সম্প্রতি (মে-জুন, ১৯৬২) কলিকাতায় ফিরেছেন। ইতিপূর্বে লণ্ডনে 'রবীন্দ্র বক্তৃতা' উপলক্ষে তিনি ভারতীয় সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ

অধ্যাপক ডঃ বাকের নিকটও অনুরূপ ধরনের বিশটি গানের সন্ধান পান। তিনি ঐ সব গানের টেপ রেকর্ড করে সঙ্গে নিয়ে আসেন। পরে তিনি এই ব্যাপারে সরেজমিনে অনুসন্ধান এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য নেপালে গমন করেন। তিনি কাটমণ্ডুর আশেপাশের বজ্রাচার্যদের কাছ থেকে আরও দুই শত গানের খোঁজ পান।

ডঃ দাশগুপ্ত আরও জানান, বজ্রাচার্যদের ধর্মাচার সংক্রান্ত অনেক পুঁথির তিনি পাঠান্তর সহ গানগুলি টুকে নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, নেপাল হতে কোন পুঁথি নিয়া আসা সম্ভব নয়। এমন কি নির্দিষ্ট সময় ছাড়া পুঁথি টুকতেও দেওয়া হয় না। তিনি কতকগুলি গানের টেপ রেকর্ড করিয়ে নিয়ে আসেন। ডঃ দাশগুপ্ত দার্জিলিং-এও অনুরূপ ধরনের গান সম্বলিত পুঁথির খোঁজ পেয়েছেন।

নেপালে চর্যাগীতিকার অনুরূপ গানগুলির খোঁজ পাওয়ার দরুন পণ্ডিত মহলে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। ডঃ দাশগুপ্ত একশতটি গান বাছাই করেছেন। তন্মধ্যে ১৮টি গান তাঁর নিকট অত্যন্ত পুরনো বলে মনে হয়। অর্থাৎ, এই গানগুলি নবম শতাব্দী হতে দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত হয়েছে বলে অনুমিত হয়। আরও ৪৫টি গান ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে লিখিত বলে তিনি বিবেচনা করেন। অবশিষ্ট গানগুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের বলে অনুমিত হয়।

ডঃ দাশগুপ্তর মতে, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে কয়েকটি চর্যাগীতিকা সংগ্রহ করেন তন্মধ্যে "তিয়ড্ডি চাপি" গানটিও তিনি নেপালে গীত হতে শুনেছেন। এই সব দেখে শুনে তাঁর মনে হয়েছে, বিপুল প্রক্ষেপ, অবোধ্য শব্দ এবং পাঠান্তরের কাঁটা মাড়িয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ মহাযান ধর্মাবলম্বী সহজ সাধনার প্রাচীন ধারাটি এখনও নেপালী বজ্রাচার্যদের নিত্যকৃত্যের মধ্যে বজায় রয়েছে।

ব্রজবুলি

এই সব গানের মধ্যে ব্রজবুলির মত শব্দশৈলী ব্যবহারেরও নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। কারও কারও ধারণা, চর্যাগীতিকার এবং অন্যান্য অনুরূপ ধরনের গানগুলির ভাষা ব্রজবুলির মতই 'সৃষ্ট' ভাষা, যা সমগ্র পূর্ব-ভারতে ব্যবহৃত হত। গবেষণার দ্বারা যদি এ প্রমাণ হয় যে

বিদ্যাপতির আগেও ব্রজবুলির ব্যবহার ছিল তা হলে এই ক্ষেত্রে মিথিলার দাবি নস্যাৎ হয়ে যায়। যা হোক, ডঃ দাশগুপ্তর সংগৃহীত গানগুলি তৎকালে পূর্ব-ভারতীয় ভাষাগুলির ক্রমবিকাশ সম্পর্কেও গভীর ইঙ্গিত বহন করবে। ফলে ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন হতে পারে।

হিমাচলীয় ভাষাসমূহের মধ্যে নেপাল উপত্যকায় নেবারী সুসভ্য ও সাহিত্যামোদী জাতির ভাষা। মৈথিলী বাংলা ও দেবনাগরীর সংসৃষ্ট বিশেষ বর্ণমালার সাহায্যে এই নেবারী ভাষা লেখা হয়ে থাকে। নেবারী ভাষায় সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

নেপালে বাংলার অনুশীলন

নেপালে বাংলা ভাষার রীতিমত অনুশীলনও চোখে পড়ে পরবর্তী কালে। শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত 'নেপালে বাংলা নাটক' দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থখানি থেকে স্থানবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা গেল, নেপালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যানুশীলনের নমুনা স্বরূপ :

১৩২২ সালে এই পুঁথিগুলি (১. কাশীনাথকৃত বিদ্যাবিলাপ, ২. কৃষ্ণদেবকৃত মহাভারত, ৩. গণেশকৃত রামচরিত্র, ৪. ধনপতিকৃত মাধবানল-কামকন্দলা) নেপালে পাওয়া যায়। পুঁথিগুলি নেবারী অক্ষরে লেখা, কিন্তু ভাষা বাংলা। প্রথম তিনখানি (কাশীনাথের বিদ্যাবিলাপ, কৃষ্ণদেবের মহাভারত ও গণেশের রামচরিত্র) এক হাতের লেখা। ধনপতির মাধবানল-কামকন্দলা আর এক হাতের লেখা। বিদ্যাবিলাপের ২২খানি পাতা, মহাভারতের ৮০ ও রামায়ণের ৪২টি পাতা—রামায়ণের ১৯নং পাতাটি কিন্তু নেই।

পুঁথি কয়খানি 'কিউরোসিটিজ অফ্ লিটারেচার' হিসেবে ছাপা হয়েছে বলে সম্পাদক শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন। ননীগোপাল-বাবুর কথায় : "বাঙালী ব্রাহ্মণেরা কিরূপে নেপালে গিয়ে আপন ধর্ম ও সাহিত্য প্রচার করেন, তার একমাত্র নিদর্শন বলেই, পুঁথিগুলির এত সমাদর। যে উন্নত পর্বতশ্রেণী (হিমালয়, কারাকোরাম, হিন্দুকুশ) আসামের পূর্বপ্রান্ত হতে আরম্ভ করে বুখারার উত্তরদিক পর্যন্ত, এই ২০০০ মাইল ব্যাপী স্থান, একখানি ধনুকের মতো বেঁকে রয়েছে, তারই পূর্বভাগে অবস্থিত

নেপাল অত্যন্ত দুর্গম স্থান। ব্রাহ্মণগণের জ্ঞান, ধর্ম ও সাহিত্যে এ দেশ বহুকাল বুঝি বঞ্চিত ছিল। বাঙালী-ব্রাহ্মণ বা তাঁদের অনুচরেরাই প্রথম এই দেশে সনাতন ধর্মের জয়পতাকা উড়িয়েছিলেন। তাঁরা আপন ভাষা পর্যন্তও এখানে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। নেপালীরা এই পুঁথিগুলি লিখেছিলেন নাটক অভিনয় করবার জন্য, গানের সুর দিয়েছেন, আপন ভাষায় স্টেজ ডিরেকসন করেছেন।

ভাতগাও-এর শেষ নেবার রাজা ভুপতীন্দ্র ও তাঁর পুত্র রণজিৎ মল্লের সময় এই পুঁথিগুলি রচিত হয়। রণজিৎমল্লের হাত হতেই গোরখালীরা নেপাল রাজ্য জয় করে নেয়। গোরখাদের নেপাল জয়ের তারিখ খৃঃ ১৭৬৮। ভূপতীন্দ্র মল্ল ও তাঁর পুত্র রণজিৎ ৬৮ বৎসর কাল নেপালে রাজত্ব করেন। মল্ল রাজারা লেখাপড়ায় খুব উৎসাহ দিতেন। দেশী, বিদেশী অনেক পণ্ডিত প্রতিপালন করতেন। তাঁদের দরবারে বাঙালী ও মৈথিলীদের খুব প্রতিপত্তি ছিল। তাঁরা গান-বাজনা ভালবাসতেন।

এই বইগুলি নাটকের আকারে লেখা। কিন্তু আমরা যাকে নাটক বলি, এ তেমন নাটক নয়। একটি দুটি পাত্র প্রবেশ করে এক-একটি গান করেই চলে যায়। একখানিতে বিদ্যাসুন্দরের গল্প, একখানিতে মহাভারতের ও আর একখানিতে মাধবানল-কামকন্দলার গল্প নিয়ে নাটক হয়েছে। সকল গানের ভণিতাতেই রাজার নাম—হয় ভূপতীন্দ্র মল্ল নয় রণজিৎমল্ল বলে উল্লেখিত দেখা যায়।

এসব গানের মধ্যে প্রথম তিনখানি যে বাঙালীর লেখা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাদের ভাষা কৃষ্ণরাম কবি, বনমালী দাস, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের ভাষারই মত; তবে একটু যেন পুরানো ছাঁদের। দুই-একটা বিদেশী কথাও আছে, বিশেষ করে বিদ্যাবিলাপ ও মহাভারতের মধ্যে।

বিদ্যাবিলাপ ও মহাভারতে ষষ্ঠী বিভক্তি 'ক', পঞ্চমী বিভক্তি 'তহ' ও সপ্তমী বিভক্তি 'হি' দিয়ে করা হয়েছে; আমি=হমে; আমাকে=হমরাকে; তুমি বা তুই=তোহে; তোমার বা তোর=তোহর।

যেমন,

বিদ্যা। বিভূতিভূষিত তনু নরশির হায়।
শিরহি বিরাজিত গাঙ্গ সুধার॥ (পৃ°২)

সুরপুর তচ্ছ ভল তুহিনগিরিক লগ।
অচ্ছ ভগতা পুরি নাম (পৃ°৩)
সাগর তুল গুণ গুণক নিধান (পৃ°৩)
পরকটভয় হমে পুরাওব কামে (পৃ°৪)
উজয়নি নরপতি তহ্নিক তনয়া।
বিদিত বিদ্যা নাম হমারি॥ (পৃ°৭)

মহা। সুযোধন নরপতি হমরাকে মান।
ভূপতীন্দ্র নৃপবয় ভান॥
নরপতিশেখর ভূরিশ্রবা নামে।
প্রবেশ করব হমে নটবর ধামে॥ (১১২)
অধম ভীষম সহহ তোহে বাণ।
মোর লগ কে করত তোহর তরাণ॥ (১১৬)
বাহিনি সহিত ত্বরিত চলহ পিতৃ ব্যূহক ঠামে। (১২০)
মোহি তেজি আর গেল দুখু অপযানে॥ (১২১)
ব্যাধ জনম মোর বনহি নিবাসে।
খগ মৃগ মারব মনক উল্লাসে॥ (১২২)

রামায়ণটি কিন্তু খাঁটি বাঙলায় লেখা; বড় বেশী পার্থক্য চোখে পড়ে না। যথা,

রামায়ণ। দশমুখ বীর আমি ললিত সুবেশ।
আমার সমান বীর আর কেবা আছে॥ (পৃ°১৫৬)
খংজন লোচনি গুণের নিধান।
শ্রীজয় রণজিত করেন বখান। (পৃ°১৬০)
হৈলো রাবণ বধ লংকাতে জাইবো।
বিভীষণ রাজা করিবো॥ (পৃ°২০১)

এখানে তিনজন কবির ভাষার পরিচয় দেয়া গেল। কিন্তু আর একজন কবির ভাষা একটু বেশী মাত্রায় হিন্দী ছাঁদে বা মৈথিলী ছাঁদে বলে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন। সব কথার অর্থবোধও হয় না। নেপালীদের হাতে পড়ে বহু বাংলা শব্দই অনেক সময় চেনা কঠিন হয়ে উঠে। নেপালীরা ত-বর্গ স্থানে ট-বর্গ যেমন,—'মোটি মানিক মণি মোর ঘর থীর'—মোতি 'মোটি' হয়েছে, 'ক' স্থানে 'গ' ও 'ল' স্থানে 'র' লিখে

থাকে। মহাভারতের ৫৭ পৃঃ 'কি দহু বহুত নৃপ বুঝব সগরে'; নেপালীদের হাতে 'সকলে' 'সগরে' হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'চক্ষুশ্রবা জায়ব আর্যেক ত্বরিতে', এখানে 'আজিকে' 'আর্যেক' হয়েছে। তাঁরা একলা লিখতে 'হকরাঁ' লিখে বসে। শুধু 'ছ' তারা লিখবে না, সর্বত্র 'ছ'-র জায়গায় 'চ্ছ' লিখবে (যেমন আছে—আচ্ছে)। এমনি তারা আপন উচ্চারণমত করে বাংলা লিখে বুঝি মহা বিভ্রাট বাধিয়েছে বিশেষ করে 'মাধববানল-কামকন্দলা'য়। কারণ হিসেবে বলা যায়, বহু দিন দেশ ছাড়া হয়ে বিদেশীদের মধ্যে বাস করায়, গ্রন্থকর্তাদের ভাষাও হয়ত অল্প-বিস্তর বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। কবিরা দুই-একজন পাত্রের মুখে অন্য অন্য ভাষাও দিয়েছেন, যেমন, মুসলমানের মুখে উর্দু, মারোয়াড়ীর মুখে রাজস্থানী ভাষা।

যা হোক, দু' শ' বৎসর পূর্বেও বাঙালীরা নেপালে গিয়ে বাংলায় নাটক করত, গান লিখত, এটি বাঙালীর গৌরবের বিষয়, সন্দেহ নেই। তারা আপনাদের গৌরব, আপনার ভাষার গৌরব কখন ছাড়ে নি। বরং নেপাল দরবারকে তারা অনেকটা বাঙালীর মতো করে গড়ে তুলেছিল।

মল্লরাজাদের গুরুরা বাঙালী ছিলেন। মল্লরাজাদের প্রথম হরিসিংও বাঙালীর শিষ্য ছিলেন। সেই গুরুরই বংশধরেরা শেষ পর্যন্ত মল্লরাজাদের গুরু ছিলেন। মল্লরাজাদের প্রধান রাজধানী ভাতগাঁ। কাটমণ্ডু ও ললিতপত্তনে আরও দুটি মল্লরাজ্য ছিল। ভাতগাঁর গুরু সকল রাজাদেরই গুরু ছিলেন। পুরোহিত বা গুরুঠাকুরদের যথেষ্ট প্রতিপত্তিও ছিল। রাজবাড়ির দক্ষিণ দিকে রাস্তা; রাস্তার ওপারে কতকগুলি মন্দির ও গুরুর বাড়ি। গুরুর নামে দোহাই চলত। গুরুর বাড়ি ঢুকলে, রাজা মহা অপরাধীকেও ধরে নিয়ে যেতে পারতেন না। তাঁদের যথেষ্ট ভূসম্পত্তিও ছিল। তাঁরা বাংলায় এসে বাঙালীর মেয়ে মহাসমারোহে বিবাহ করে নিয়ে যেতেন এবং আপন বংশের বিশুদ্ধি রক্ষা করতেন।

গোর্খালীরা এসে তাঁদের অনেক ভূ-সম্পত্তি কেড়ে নেয়, কেবল ভরণ-পোষণের মতো কিছু সম্পত্তি তাঁদের থাকে। সে অর্থের বলে তাঁরা আর বাংলায় এসে বিবাহ করতে পারেন না। নেবারী উপাধ্যায়দিগের কন্যা বিবাহ করে তাঁরাও এখন নেবারীই বনে গিয়েছেন। এখন তাঁদের পূর্ব গৌরব 'রাজোপাধ্যায়' উপাধিতেই শেষ হয়েছে।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তারপর লিখেছেন: যত দিন তাঁদের প্রতিপত্তি ছিল, তত দিন ভাতগাঁ দরবারে বাঙালীদেরও খুব প্রতিপত্তি ছিল। অনেক বাঙালীর লেখা সংস্কৃত পুঁথি নেপালে পাওয়া যায়। আমাদের কবিরা বোধ হয় রাজ-গুরুদের কুটুম্ব বা আশ্রিত ছিলেন। গোর্খালীরা পশ্চিম হতে আসে। তারা কুর্মাঞ্চলীদের বা কুমায়ুণের ব্রাহ্মণদের শিষ্য। কুর্মাঞ্চলীদের প্রাদুর্ভাব হওয়ায়, নেপালে বাঙালীর প্রভুত্ব কমে গিয়েছিল। মৈথিলীদের সংখ্যাও অনেক ছিল। তাদের এখনও কিছু কিছু পসার আছে; কিন্তু বাঙালীরা সব হারিয়েছে।

পাঁচটি ব্রাহ্মণ কোন্ দূর দেশ হতে এসে এই বাংলার মতো প্রকাণ্ড দেশে ব্রাহ্মণের জয়-জয়কার ঘোষণা করেছিলেন। যে দেশে নিত্য বীভৎস ব্যাপার ঘটত, নিয়ত ব্যাভিচার-স্রোত বয়ে যেত, অন্ধকারাচ্ছন্ন যে দেশ কত কাল আর্য-চক্ষুর অন্তরালে থেকে ভূত-প্রেত রাক্ষসের স্থান বলে পরিগণিত হতো, সেই দেশে এসে যে পাঁচটি ব্রাহ্মণ শক্তিস্থাপন করলেন, অনার্যের নামগন্ধ, তাদের ভাষা পর্যন্ত, লোপ করে দিয়ে আর্যভাবে—আর্যধর্মে সমগ্র দেশ দীক্ষিত করে নতুন করে গড়ে তুললেন; তাঁদেরই বংশধর বাঙালী ব্রাহ্মণ নেপাল দেশেও আপনাদের ভাব ও ভাষা চালাতে গিয়েছিলেন, তাতে তার বিচিত্র কি? তাঁদের "আত্মবিস্মৃত" মুমূর্ষু সন্তানদিগের মধ্যে, আবার দেখা যায়, ধীরে ধীরে চৈতন্য সঞ্চার হয়েছে; নতুন নতুন জগতের নতুন নতুন আলোক তাঁদের মধ্যে এসে পড়েছে; তাঁদের সাহিত্যের আবার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই কয়খানি পুঁথি তাঁদের পূর্ব-গৌরব, পূর্বকৃতিত্ব স্মরণ করিয়ে দেবে সন্দেহ নেই।

['নেপালে বাংলা নাটক': শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়:
সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী সং ৬১]

জাতীয় কবি ভানুভক্ত

বস্তুত, সতের শতকের পূর্বে নেপালী সাহিত্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু সৃষ্টি হয় নি। কবি ভানুভক্ত আচার্যের পূর্বসূরীদের মধ্যে প্রেমনিধি, গুমানী কবি বীরশালীপন্থ, ইন্দিরাজ, বিদ্যারণ্য কেশরী ও রঘুনাথ প্রমুখ অনেকেই নেপালী কাব্যজগতে উড্ডীন ছিলেন। নেপালী ভাষা তখন হিন্দি, উর্দু, সংস্কৃতবহুল বৈদেশিক শব্দমালায় সংমিশ্রিত ছিল।

পাঁচমেশালি ভেজাল ভাষায় তখনকার নেপালী কাব্য বিশেষ করে রচিত হতো। কবি রঘুনাথ ছিলেন বুঝি কিছুটা তার ব্যতিক্রম। তিনি অনেকটা মার্জিত বিশুদ্ধ ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন এবং প্রাচীন ও নবীনপন্থীদের মধ্যে ঐক্যসূত্র বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। নেপালী কাব্যজগতে তাঁর স্থান ছিল অনেকটা ইংরেজ কবি গ্রে বা গোল্ডস্মিথের মতো।

ভানুভক্ত যে সমকালীন প্রভাব ও প্রতিপত্তি থেকে মুক্ত ছিলেন তা নয়। তিনি সাধারণ মানুষের সহজবোধ্য ভাষাকে আশ্রয় করে কাব্য রচনার প্রয়াসী হন। তাঁর কাব্যের গঠন ও বাচনভঙ্গী ছিল সাধারণের জন্য ; বুঝতে কোন বেগ পেতে হতো না।

পশ্চিম নেপালের তানাহুন এলাকার এক বর্ধিষ্ণু শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পরিবারে কবি ভানুভক্তের জন্ম। শিক্ষা-দীক্ষা ও বৈষয়িক সম্পদে তিনি কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। বাল্যে ও কৈশোরে তিনি উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেছিলেন। উত্তরকালে তিনি যে নেপালের জাতীয় কবির শীর্ষ আসনে অধিষ্ঠিত হবেন তার সূচনা কিন্তু তাঁর প্রথম জীবনে পরিলক্ষিত হয় নি। তাঁর কাব্যজীবনের শুরু অনেকটা বুঝি কবিগুরু বাল্মীকি কিংবা ভক্তকবি তুলসীদাসের অনুরূপ। নিষাদের নিষ্ঠুর শরাঘাতে নিহত ক্রৌঞ্চ-মিথুনের শোকবিমূঢ় বাল্মীকির মতো তাঁর কবিপ্রতিভাও বুঝি অতর্কিত এক অলস মুহূর্তে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছিল। কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য ঃ

ভানুভক্ত তখন বাইশ-তেইশ বছরের এক উদ্ধত বেপরোয়া যুবক। একদা তিনি পাহাড়ী অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন কিসের যেন খোঁজে। সারা দিনের পথক্লান্তিতে তিনি শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠলেন। পরিশেষে এক পার্বত্য স্রোতস্বিনীর নিকট গিয়ে আকণ্ঠ জলপান করলেন ও পাশের এক উপলখণ্ডের উপর নিজের ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দেন গাছের সুশীতল ছায়ায়। তিনি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। ঘুম ভাঙতেই তিনি দেখলেন এক ঘাসুড়ে তার শানিত কাস্তে দিয়ে ঘাস কেটে চলেছে আপন মনে। সময় কাটাবার উদ্দেশ্যেই তখন ভানুভক্ত ঘাসুড়ের সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিয়েছিলেন। ঘাসুড়েকে ভানুভক্ত শুধালেন এই ঘাস কেটে কি ভাবে দিন যাপন করে সে। ঘাসুড়ে তখন তাঁকে জানাল ঃ

'বাবুমশাই, আমি হলাম একজন ঘাস্থড়ে। ঘাস কেটে ক'পয়সাই বা আর কামাই করতে পারি বলুন? স্থতরাং আমার কাছ থেকে এর বেশী কি-ই বা আপনি আর আশা করতে পারেন?'

ঘাস্থড়ে আপন কথার খেই ধরে তখন বলে চলল: 'তাইতো, মানুষ হয়ে জন্মেছি যখন, তখন কিছু একটা তো করতে হবে। মরবার আগে কিছু একটা করে যাওয়াই তো বিধেয়। এই যেমন বাবুমশাই, আমি তো একজন তুচ্ছ মানুষ, তবু আমার যা কিছু সহায়-সম্বল ছিল তা দিয়ে একটা কুয়ো খুঁড়ে রেখেছি। পাড়াপড়শী লোকজনের তো তা কাজে লাগবে? জল খেয়ে ওরা প্রাণটা ঠাণ্ডা করবে, আমার মরার পরেও হয়তো কেউ কেউ আমার নাম করবে।'

সাদা-মাঠা এই মানুষটির কথাগুলি ভানুভক্তের চিত্তে তুলল প্রচণ্ড আলোড়ন। গরীব এই ঘাস্থড়েটি যদি তার শেষ সম্বল ব্যয় করে সমাজ-সেবার জন্য পাতকুয়ো করে রেখে যেতে পারে, তিনি তবে শিক্ষা-দীক্ষা ও বিপুল বিত্তের উত্তরাধিকারী হয়ে কি করলেন এতদিনে দেশ ও দশের জন্য—জন-কল্যাণের জন্য? আত্মতুষ্টির জন্য কি বা করলেন? তাঁর হৃদপিণ্ডটি বুঝি উঠল মুচড়ে। আত্মধিক্কারের প্রথম বেদনানুভূতিতে মুখ থেকে তাঁর অতর্কিতে আট পংক্তি ছন্দবদ্ধ শ্লোক নির্গত হলো। ইংরেজী হরফে শ্লোকটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল:

Tyas ghansile Kasari aaja
Liechhg arti.
Dhikkar ho makana banchnu
narakhi kirti.

অর্থাৎ—

[ঘাস্থড়ের কাছ থেকে কি মহান শিক্ষাটাই না আজ লাভ করলাম; নাম নেই, যশ নেই যে জীবন তার উপর উঠে গেল ধিক্কার।]

তারপর যুবক ভানুভক্তের জীবনের স্থর গেল সম্পূর্ণ পালটে। সারাদিন সারাক্ষণ তাঁর শুধু এক চিন্তা—এক ধারণা, কি করে শাশ্বত কিছু রেখে যাওয়া যায় নশ্বর এই পৃথিবীতে। পদ্য রচনায় তিনি আত্মমগ্ন হলেন। বিভোর হয়ে রইলেন স্থষ্টির আনন্দে; জনগণের সহজলভ্য ভাষায় কাব্য চয়নে। কাব্য পাঠের জন্য কাব্য রচনা করেই তিনি কেবল

ক্ষান্ত হন নি। তাঁর কবিতা কেবল 'সোনালী জলের লিখন' নয়, তা হলো 'দেওয়ালে লিখন'। কবি ভানুভক্তের কাব্যের জাতীয় সত্তা বুঝতে হলে সমকালীন নেপালের ঐতিহাসিক পটভূমিকা পর্যালোচনার প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

কবি ভানুভক্ত যখন কৈশোরে পদার্পণ করেন নি তখনই (খৃঃ ১৮.৪-১৮১৬) ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অসীম শৌর্য-বীর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নেপালী সৈন্যেরা প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করলে। তবু কিন্তু নেপালরাজ প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজ সরকারের নিকট পরাজয় বরণ করে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হন। দুর্ধর্ষ গোর্খারা কিন্তু এই পরাজয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা সুগলির এই সন্ধি-পত্রকে জাতীয় সত্তার অবমাননাকর বলে গণ্য করলেন। কিন্তু তার প্রতিবাদের অর্থ হলো কঠোর নির্যাতন আর ফাঁসিকাষ্ঠকে বরণ করে নেওয়া। মুখ ফুটে কিছু বলার সাহস না থাকলেও এই জাতীয় অবমাননার বিরুদ্ধে শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে প্রতিবাদের বহ্নি ধিকধিক করে জ্বলতে থাকে। কবি ভানুভক্ত কাব্য ও গানে তাকে প্রতিধ্বনিত ও মুখরিত করে তোলেন। নেপালী ইতিহাসের গৌরবময় প্রাচীন ঐতিহ্যকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে তিনি তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষায় নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন। তাঁর রচিত 'রামায়ণ' (বাল্মীকি-রামায়ণের নতুন রূপায়ণ), 'বধু-শিক্ষা', 'প্রশ্নোত্তরী', 'রামগীত' ও 'ভক্তিমাল' ইত্যাদি গ্রন্থমালা আজও তাঁর স্বাক্ষর বহন করে আছে। সত্যিই, বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ করেই তিনি কেবল ক্ষান্ত হন নি, 'আধ্যাত্ম রামায়ণ' রূপান্তরে নেপালের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রানুগ গুণাবলী আরোপ করতেও ভোলেন নি তিনি। সংস্কৃত ছন্দ ও মাত্রাকে তিনি নেপালী পাঠকদের সুবিধার্থে নতুন রূপদানে পিছু-পা হন নি। কবি রঘুনাথ প্রমুখ অনেকে সুললিত ছন্দে নেপালী ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন নি তা নয়। কিন্তু ভানুভক্তের রামায়ণ আজও শিক্ষিত-অশিক্ষিত আপামর নেপালী জনসাধারণের মধ্যে সমাদৃত। তাঁর শ্লোকগাথাগুলি আজও কি পাঠশালা, কি গোচারণের মাঠে মাঠে অনুরণিত হয়ে থাকে।

পরিণত বয়সে তিনি আধ্যাত্মিকতা, গোড়ামি ও রক্ষণশীলতার সমর্থনে

অনেক কাব্য রচনা করেন। 'রক্ষণশীল' আখ্যা লাভ করলেও তাঁর কাব্যে কোন দিন রোমান্টিক ভাবালুতা, সরসতা কিংবা বুদ্ধিদীপ্তির অভাব ঘটে নি। 'বালাযুগ' প্রথম সন্দর্শন করে তিনি তার যে নৈসর্গিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন তার ইংরেজী অনুবাদ ওমর খইয়ামের বিখ্যাত রুবাঈগুলির কথা মনে করিয়ে দেয় ('Here with a loaf of bread beneath the bough') ইত্যাদি। যেমন,

"Ah, be it mine the writing delight
A verse for a maiden fair and bright—
To dance in its rhythm, and else
Would what I wish when
Paradise I create !"

নেপালের জাতীয় কবি ভানুভক্তকে কারাজীবনও বরণ করে নিতে হয়েছিল। তখনকার দিনে নেপাল সরকারের কারাগার (এবং আজও কি ?) ছিল এক বিভীষিকাময় স্থান। আলো-বাতাস বিসর্জিত অন্ধকারময় এই প্রকোষ্ঠগুলি ছিল মাছি, মশা, ছারপোকায় পরিপূর্ণ। কিন্তু এই চরম নির্যাতনেও কবি ভানুভক্ত তাঁর সহজাত হাস্যবোধ ও প্রাণের সরসতা হারান নি। কারাজীবনের এই অভিজ্ঞতাকে সহজ করে নেবার উদ্দেশ্যেই বুঝি তিনি শ্লেষময় নীচের এই লাইন ক'টি রচনা করেছিলেন ছন্দবদ্ধ আকারে :

দিনের পর দিন কারাধ্যক্ষের একই ধাঁচে গড়া মুখখানি পড়ে নজরে ; সুখের নেই লেশ, মশা, ছারপোকা আর পোকা-মাকড়েরা হলো আমার নিত্য সঙ্গী। পোকা-মাকড়গুলি কেমন নাচতে থাকে, মশাগুলি গায় গান। নিঃসংগ জীবনে আনে তৃপ্তির সুর। দিন আর রাত তাদের নাচ-গানের জন্য খরচ তো আর লাগে না কিছু !

প্রতিভাশালী এই নেপালী জাতীয় কবির জন্ম হয় তানাহুনে ১৮১৪ সালে। চুয়ান্ন বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর পিতা ধনঞ্জয় নেপাল সরকারের অধীনে উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৪২ সালে বনের এক ঘাসুড়ের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েই বুঝি তিনি কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর রামায়ণের 'বালকাণ্ড' সমাপ্ত করেন।

পিতার মত তিনিও নেপালের রাজসরকারে দায়িত্বশীল পদ গ্রহণ করেন এবং পশ্চিম নেপালে রাজকার্যে নিযুক্ত থাকেন। ১৮৫২ সালে রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পাঁচ মাস তাঁকে কারাগারে বাস করতে হয়। এই নিঃসঙ্গ কারাবাস জীবন কিন্তু তাঁর পক্ষে ভালই হলো। কেন না, তিনি তাঁর রামায়ণের বাকী চারটি অধ্যায় জেলের নির্জন প্রকোষ্ঠে বসে লিখে গ্রন্থখানি পর বৎসরই সমাপ্ত করেন।

কয়েক বছর পরেই কবি ভানুভক্ত এক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন। এই রোগশয্যা থেকে তিনি আর আরোগ্যলাভ করেন নি। রোগশয্যায় শুয়েও কিন্তু তিনি তাঁর অসম্পূর্ণ রচনা 'রামগীত-'এর অনুবাদের কথা ভোলেন নি। বরং রোগ-যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে তিনি 'রামগীত'-এর শ্লোকগুলি মুখে মুখে বলে যেতেন আর কবি-পুত্র রামনাথ পিতার মুখের ছন্দবদ্ধ কথাগুলি লিখে নিতেন। তুহিন-শীতল মৃত্যুর ক্রোড়ে এমনি করে অকালে পতিত না হলে নেপালের জাতীয় কবি ভানুভক্তের কাছ থেকে বুঝি আরও অনেক কিছু আশা করা যেত। সুপণ্ডিত মতিরাম ভট্টের অনলস চেষ্টায় আজ ভানুভক্তের অনেক রচনা বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

সমসাময়িক কবিতা

নেপালী সাহিত্য কাব্যপ্রাণগত। গীতি-কবিতা ও কাব্য তার অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে। কিন্তু অপরাপর সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির সমপর্যায়ে তাকে ফেলা যায় না। ইংরেজী-জানা দুনিয়া আর রসোত্তীর্ণ ভারতীয় সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে নেপালী সাহিত্য সুন্দর রূপও পরিগ্রহ করেছে। তাই বলে নেপালী কাব্য তার জাতীয় সত্তা, স্বকীয় পরিবেশ আর মৌলিক আদর্শ হারিয়েছে বলা যায় না। বরং বিদেশী ভাবধারার সংস্পর্শে এসে সে তার আপন বৈশিষ্ট্যকে অধিকতর সমুজ্জ্বল করে তুলেছে। অপরাপর দেশের মতো সেকালের নেপালী কাব্যও পৌরাণিক উপাখ্যান ও মধ্যযুগীয় বর্ণনামূলক বীরত্বগাথাকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছিল। শব্দ চয়ন, উপমা বা ছন্দের দিক থেকেও তা ছিল অনেকটা মধ্যযুগীয় ভাবধারার প্রতীক। বালকৃষ্ণ শ্যাম, লক্ষ্মীপ্রসাদ দেবকোটি, সিদ্ধিচরণ প্রমুখ কবিরা নেপালী কাব্যের এই মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যের গণ্ডী

ভগ্ন করে তাকে নতুন বৈশিষ্ট্য দান করেন। মধ্যযুগীয় কবিদের মধ্যে শ্রীলেখনাথ ও শ্রীধরণীধর ছিলেন সবিশেষ খ্যাত। বালকৃষ্ণ শ্যামই প্রথমে নেপালী কাব্যক্ষেত্রে আধুনিকতার সূচনা করেন। কবি দেবকোট ও কবি সিদ্ধিচরণ শ্রেষ্ঠীর হাতে বুঝি তা ভরা গাঙে খরবেগে বইতে থাকে। এই আধুনিকতার যুগে কিন্তু রোমান্টিক ভাবালুকতাই তখনকার নেপালী কবিদের বিশেষ করে পেয়ে বসেছিল ; তা তবুও পাঠকদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে নানা ক্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও। এ সমর্থনের অর্থ এ নয় যে জনসাধারণের হাসি-কান্না আনন্দের স্বতস্ফূর্ত বিকাশ মর্মরিত হয়েছে তখনকার নেপালী কবিতায়। আধুনিক নেপালী কবিতা বরং ব্যক্তি-কেন্দ্রিক নয় ; অনেকটা আত্মকেন্দ্রিক। ব্যক্তিগত ভাবানুবেগ ও অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে তা রচিত। আর এ ধারা বুঝি বিংশ শতকের প্রথমার্ধকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

ভাবপ্রবণ কবি লক্ষ্মীপ্রসাদ দেবকোট প্রমুখ অনেকেই এই গড্ডালিকা স্রোতে গা এলিয়ে দেন। আধুনিক কবিতাকে আত্মকেন্দ্রিক ভাবালুতার মোহপাশ থেকে উদ্ধার করবার কোন চেষ্টা তঁরা করেন নি। সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে জীবনকে তলিয়ে দেখবার প্রয়াস পান নি। কাজেই দেখা যায়, আদর্শগত ভাবে তিনি সুর-সংযোগ বজায় রাখতে পারেন নি। কবি সিদ্ধিচরণ শ্রেষ্ঠী, কবি ভিচ্ছু (Bhicchu) ও বায়াথিত প্রমুখ অনেকেই এই প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পান নি। কবি ভিচ্ছুর অনেক কবিতাই এবং বায়াথিতের পূর্বেকার অধিকাংশ কবিতাতেই হতাশার এই সুর অনুরণিত। কবি প্রেমরাজেশ্বরী ও ধ্রুবর কোন কোন কবিতাতে এই বিষণ্ণ দুঃখ-বাদের প্রতিধ্বনি দেখা যায়। একে মর্শী আত্ম-নিগ্রহতার মূর্ত প্রকাশ বলা যায়। কবি দেবকোট তাঁর কাব্যে দার্শনিক-প্রবর নীৎসের বাণীর অনুকরণে বুঝি এক স্থলে শুধিয়েছিলেন : 'বনের বাঘ তার শাবকদের ধরে ধরে কেনই বা খেয়ে ফেলে ?' এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে, তাঁর কবিতার প্রতিক্রিয়াশীল রানা-শাসনশক্তি প্রজাদের উপর নির্যাতন ও শোষণের সমর্থন বুঝি খুঁজে পেয়েছিল।

কেবল হতাশার সুরই আধুনিক নেপালী কাব্যে প্রতিধ্বনিত হয় নি। মনমরা এই হতাশার মধ্যেও সুস্থ সবল ভবিষ্যতের রঙিন প্রতীক ছবিও অনেক কবি তুলে ধরেছেন। অনুরণন তুলেছেন 'উদয়ের পথে শুনি কার

বাণী !' যে কবি-দেবকুট তাঁর কাব্যে রানা-শাসকশক্তির অত্যাচারের সমর্থন যুগিয়েছিলেন, তিনিই আবার সুর হারিয়ে বুঝি 'তিমির রাত্রির অবসানে উদায়াচলের সুপ্রভাতের রাগিণী'র বন্দনা গান গেয়েছেন সমন্বয়ে। আধুনিক নেপালী কাব্যে এই সময় বহু লোকগীতি রচিত হতে থাকে নানা ছন্দে। আর এইসব লোককবিতার মধ্যে যোরী সবিশেষ খ্যাত। তাঁর লোকগীতি নেপালের সর্বত্র সবিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

উনিশ শ' পঞ্চাশের 'মহাবিদ্রোহ' জঙ্গী রানাশাসন ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে নেপালের গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা শুধু কায়েম করে নি, সাধারণ মানুষের মনে ও প্রাণে নতুন আশা ও আকাঙ্ক্ষার জোয়ারও ডেকে এনেছে। তার প্রতিক্রিয়া নেপালের নতুন কাব্যে ও সাহিত্য-জীবনে দেখা দেয়। শুধু ভাবের ক্ষেত্রে নয়, আঙ্গিকের দিক থেকেও নতুন সৃষ্টির আনন্দে নেপালী কবি ও সাহিত্যকরা মেতে ওঠেন। প্রগতিশীল মার্কসপন্থী নতুন ভাবধারাও কিছু কিছু এ সময়ে নেপালী সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করে। নতুন এই সাহিত্য সৃষ্টির সঠিক মূল্যায়ন যদিও এখনও হয় নি, তবে তা যে কেবল 'শ্লোগানসর্বস্ব' নয় সে কথা নিশ্চিত বলা যায়। নতুন এই কাব্য-স্রোতে ও ভাবাবেগে যে কেবল তরুণপন্থীর দলই গা ভাসিয়ে দিয়েছেন তা নয়, অনেক প্রাচীনপন্থী কবিও কালের হাওয়ায় ভেসে চলেছেন এবং নতুন যুগোপযোগী রচনাসৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেন। এখানে আধুনিক একটি নেপালী কবিতার নমুনা দেওয়া গেল।

॥ জ্যামিতিক প্রেম ॥

সম্মুখীন হতে হলো এক সমস্যার
চাই এখানে কোন ভাগের অভিনয়—নিয়তির খেল,
বিভিন্ন মুহূর্তগুলি নেই মিল কেহ কারো সঙ্গে
পরিবর্তনশীল এই বিশ্ব নিখিলে,
লক্ষ্য বিন্দুর কোথায় বা ঠিকানা ?

জীবনের রেখা সমান্তরাল, দেখ চেয়ে,
'ক' আর 'খ' দুই বিন্দু হতে রেখা তার হয়েছে টানা
আর 'গ' বিন্দুতে এসে ঘটেছে মিলন

দৃষ্টির কোণ এক হয়েছে গঠিত
আর তার ডিগ্রীর নেই কোন মাপজোখ্
হলোই বা তা ক্ষুদ্র আকার অথবা আকৃতি।

তারপর :

যদি আমরা তলিয়ে দেখি বিষয়টি
ভাবি যদি সেদিনের নিছক প্রেমের কথা,
পাতার পর পাতা যাই যদি জ্যামিতির রেখা টেনে
*শূন্যস্থান থাকে শুধু অবশিষ্ট।

কুমার

[* শূন্য অর্থে এখানে নিরাকার ব্রহ্মা ও শূন্য দুই।]

এ ছাড়াও নেপালী কাব্যে নিরীক্ষা-পরীক্ষা চলেছে নতুন আঙ্গিক নিয়ে। মিস্টিক বা অতীন্দ্রিয়বাদী এক শ্রেণী কবির কিছু কিছু রচনা বিদগ্ধ পাঠকসমাজে কৌতূহলও সৃষ্টি করে। অডেন, টি, এস, ইলিয়ট কিংবা ফ্রয়েডের মনোবিকলনের প্রভাবে তাঁরা কমবেশী প্রভাবান্বিত। তাঁদের এই সব কবিতা যতখানি বুদ্ধিদীপ্ত, ততখানি আবার অন্তঃসারশূন্য।

অতি হালের তরুণতম কবিদের মধ্যে বিজয় মল্ল, বি, ডি, রোক্কক, কুলমানী দেবকেটে, ডেনিয়েল, খালিং জনার্দন সোমা, শ্যামদাস বৈষ্ণব প্রমুখ অনেকেই নতুন নতুন কবিতা রচনা করে চলেছেন। মাধব প্রসাদ থিমায়ার কিংবা বি, কে, সোমা বয়সে তরুণ না হলেও তাঁদের কবিতায় প্রগতিশীল মননশীলতার সার্থক পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। কবি বায়াসির কাব্যেও নেপালী গ্রাম্য জীবনের সুন্দর প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। টেক-বাহাদুর নবীন, মোহন কৈরলা, মোহন হিমাংশু, পোষণ পাণ্ডে কিংবা বসু শশী প্রমুখ কবিরা অপেক্ষাকৃত নবাগত। তাঁদের কবিতার সঠিক মূল্য নিরূপণ এখনও হয় নি। আধুনিকতা ও অতি-আধুনিকতার জারকরসে আধুনিক নেপালী কাব্য জারিত। যে সকল প্রাচীনপন্থী কবি সনাতন রীতিতে পদ্য রচনা করতে একদা ভালবাসতেন তাঁরাও আজ এই অতি-আধুনিকতার মোহপাশে আকৃষ্ট হয়ে আধুনিক কাব্য সৃষ্টিতে বিভোর।

পরিশেষে, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সিং প্রধানের কথা উদ্ধৃত করে বলতে হয় : 'নেপালী কাব্য এখনও তার নিরীক্ষা-পরীক্ষার আওতা কাটিয়ে পরিপূর্ণ

সার্থকসৃষ্টির শীর্ষদেশে পৌঁছতে সক্ষম হয় নি। এখনও সে অনুশীলন পর্যায়ে গণ্ডিবদ্ধ। নতুন নতুন আঙ্গিকের পশ্চাতে শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছে, সার্থক সফলতা কোথাও ধূলিসাৎ করে নি। এর কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, প্রথমত নেপালী সাহিত্য এখনও তার পশ্চাৎপদ গণ্ডির সীমারেখা উত্তীর্ণ হতে পারে নি।

দ্বিতীয়ত, সাহিত্যসাধনা বা কাব্যচর্চা নেপালে এখনও চিত্ত বিনোদনের উপচার বলেই গণিত হয়ে থাকে। রুজি-রোজগারের পথ দেয় নি সে এখনও বাতলিয়ে। লেখাটা নেপালে পেশা বা নেশা নয়, শুধু ফ্যাসান মাত্র। সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির পথে এটা কম অন্তরায় নয়।' তবে আশা করা যায়, এ অন্তরায় কাটিয়ে উঠতে বেশী দিন লাগবে না। দিন আগত ঐ!

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

উইদিন নেপাল : ডি, আর, বেগমি
হিস্ট্রী অফ নেপাল : ডেনিয়েল রাইট
এসেস অন দি ল্যাঙ্গোয়েজেস অফ নেপাল এণ্ড টিবেট : ডি, এইচ্, হফসন্
গাইড টু নেপাল : জে, এইচ, ইলিয়ট্
এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা : ১৬শ খণ্ড
'ইউনাইটেড এশিয়া'—(২য় সংখ্যা, ১৯৬০)

আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলির কথাই মনে করিয়ে দেয়।...

নানা পণ্যদ্রব্যে সপ্ত ডিঙা সাজিয়ে দূর দেশে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল বণিক-সওদাগর। নাম কোবালন। সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে ডিঙা তার এক সময় এসে ঠেকল সুসমৃদ্ধ এক বন্দরে। এ বন্দরেই সুন্দরী নর্তকী মা দেবী বা মাধবীর সঙ্গে হোল তার সাক্ষাৎ। তারপর চলল খানাপিনা ও আনন্দোৎসবের হৈ-হুল্লোড়। আর তার জের কেটে উঠতে না উঠতেই দেখা গেল বণিকের অর্থভাণ্ডারে পড়েছে টান। নর্তকীর প্রেমেও পড়ল ভাঁটা। সব সম্পদ খুইয়ে কোবালন তখন ফিরে এল আপন পরিণীতা পত্নীর নিকট। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মিলন ঘটল কোবালন ও কন্নকীর মধ্যে। এই সহজ কাহিনীটিই এক অজ্ঞাত কবির নিপুণ লেখনীর মুখে অপূর্ব কাব্য-সুষমায় মণ্ডিত হয়ে রূপায়িত হয়েছে 'বয়ন্তীমালা' লোক-কাব্যে। 'বয়ন্তীমালা'য় দেবী পত্তিনীর মাহাত্ম্যকথা বর্ণিত আছে। নর্তকী মাধবীর অপরূপ নৃত্যকলার বিশদ বিবরণ, কোবালনের জন্য তার ব্যথাতুর হৃদয়ের কাতর আকুলতা অথবা পতিব্রতা কন্নকীর নীরব কান্না—সব কিছু মিলে ক্ষুদ্র এই কাব্যখানিকে সিংহলীয় সাহিত্যে বিশিষ্ট এক আসন দান করেছে। চোলরাজদের আমলের নগর-সভ্যতার ইংগিতও মেলে এই গাথায়।

প্রবাসী স্বামীর জন্য কন্নকীর কাতর খেদোক্তি অনেক ক্ষেত্রে আমাদের 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কাভেরী নদীকে উদ্দেশ্য করে কন্নকীর কাতর নিবেদন :

"মহাসাগর তো তোমার স্বামী। সে কিন্তু তোমায় ছেড়ে কোথাও গমন করে না। তার প্রতি তুমি থাক চির অনুরক্তা। মহাসাগরও তোমায় ভালবাসে। আর আমার—?'

অথবা

বিপথগামী স্বামী যখন দীর্ঘ দিন পর আবার গৃহে ফিরে আসে, কন্নকী তখন ফেটে পড়ে সরব অনুযোগে :

'গৃহলক্ষ্মী বৌকে পায়ে ঠেলে তুমি কিনা গিয়েছিলে বারঘাটের বারবনিতাদের নিকট। যেন হাতের কাছে সুমিষ্ট আম ফল ফেলে খেতে চায় বিষাক্ত ফল! যা হোক, তুমি যে সশরীরে ফিরে এসেছ তাতেই আমি তুষ্ট।'

'পত্তিনীহল্ল' বা পত্তিনী কাহিনীর মত আর একখানি লোকপ্রিয় কাব্য হোল 'পালঙ্গ সহল্ল'। পালঙ্গ ঠাকুর পত্তিনীদেবীর স্বামী। এ গাথায় প্রথমোক্ত কাব্যের অনুরূপ কাব্য-সুষমা তেমন চোখে পড়ে না। কাহিনীটিও সাদাসিধে বৈচিত্র্যহীন। বারবনিতাদের ছলা-কলা দ্বারা মানুষের টাকা-কড়ি অপহরণের চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এ কাব্যে। কোবালন যখন সুন্দরী নর্তকীর জন্য যথাসর্বস্ব হারালো, মাধবী তখন তাকে করতে শুরু করল রীতিমত নিগ্রহ। কোবালনের দুঃখে পত্তিনীর হৃদয় কেঁদে উঠল। তিনি কোবালনকে তাঁর একখানি মহামূল্য মল উপহার দিলেন। বললেন, মলখানি বিক্রয় করে পুনরায় যেন সে ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করে। ঐ মলখানি নিয়ে পালঙ্গ গেলেন পাণ্ডীয় রাজাদের রাজধানীতে বিক্রয় করতে। আর রাজ-রাণীর মল চুরি করার সন্দেহে ধরা পড়লেন। বিচারে হোল শিরচ্ছেদের আদেশ। পত্তনী তখন পাণ্ডীয়রাজকে করলেন অভিসম্পাত। স্বর্গ থেকে আগুন নিয়ে এসে সমগ্র নগরীকে করলেন পুড়ে ছারখার। পরিশেষে স্বর্গের রথে চেপে চলে গেলেন স্বর্গরাজ্যে। এই লোক-গাথায় পত্তিনীদেবীর দুঃস্বপ্নের কথা, স্বামীর দুর্দশা ও অন্বেষণ ইত্যাদি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। সিংহলের এক পূর্ণাঙ্গিন চিত্রও এ কাব্যে ফুটে উঠেছে।

আমাদের মনসা দেবীর মত পত্তিনী দেবীর মাহাত্ম্য-কথা সিংহলের বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলে বিশেষ করে প্রচারিত। ব্যাপকভাবে পূজাও হয়ে থাকে। এই ধর্ম-বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে যে লোক-সাহিত্য গড়ে ওঠে তার বেশীর ভাগের মূল হোল তামিল ধর্মগ্রন্থ। 'শিলাপ্পাদিকরণ' ও 'মণিমেখলাই' এই দুই প্রাচীন তামিল গ্রন্থেও বর্ণিত আছে— কোবালন ও কন্নকীর বিরহ-মিলন কথা। ওরাই সিংহলে প্রচারিত হয়ে সিংহলীয় লোক-সাহিত্যে নাম পরিগ্রহ করেছে পত্তিনী আর পালঙ্গ ঠাকুর নামে। অবশ্য কোন কোন পত্তিনী কাহিনীর মূল যে সিংহলের

মাটিতে ইতিপূর্বে উপ্ত ছিল না, তা জোর করে বলা যায় না। বৌদ্ধঠাকুর 'সক্‌রা'র উল্লেখও কোন কোন ক্ষেত্রে পাওয়া যায়।

'গজবকথা' (গজবাহুর কথা) বা 'অম্‌কোতা হাতানি' (খাটো-সিঙ মহিষের কথা) প্রভৃতি লোকগাথা থেকে জানা যায় খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে গজবাহু নামে কোন রাজা চোল রাজ্যে অভিযান করেন। সিংহলে তখন থেকে (?) পত্তিনী দেবীর পূজা নাকি প্রচলিত হয়ে আসছে। 'অমকেলিয়পত' কাব্যেও পত্তিনী পূজার উল্লেখ রয়েছে। রোগ-ব্যাধির হাত থেকে নিরাময় হবার আশায় পত্তিনী ও তাঁর স্বামী পালঙ্গ ঠাকুরের পূজা অনুষ্ঠান করতো। 'নানুমূরাহল্লা', 'পত্তিনী পতিমা', 'ব্যাধি-পূজবা' প্রভৃতি বহু লোকগাথায় এমনিতরো দেব-দেবীর কাহিনী ছড়িয়ে আছে। পত্তিনী ছাড়া অপর দেব-দেবীর পূজাও প্রচলিত ছিল। কাতু দিসনায়কের 'বল্লিমাতকথব', 'গণদেবীহল্লা', 'রণতুনুপরালয়' (স্বর্ণধনুর কাহিনী যার নায়ক বিষ্ণু অবতার রামচন্দ্র বা উপলবান), 'বন্দন-কবিপোতা' (গণদেবীর বন্দনা), 'ঈশ্বরমালয়' (শিব ও উমার স্তোত্রকথা) প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। উৎসবানুষ্ঠানে এসব গাথা-কাব্যের অধিকাংশই গীত হয়ে থাকে। কোন কোনটার পালা হিসেবে অভিনয় করা হোত।

এমনিতর দেব-দেবীর মাহাত্ম্যমূলক পালাগান, পাঁচালী বা কাব্য-গাথার পাশাপাশি আর এক শ্রেণীর লোকগীতি বা ছড়াও সেকালের সিংহলী সাহিত্যের অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। পল্লী অঞ্চলেই তার প্রচলন অধিক। কাজের ফাঁকে ফাঁকে পল্লীর বাসিন্দারাই সাধারণতঃ মুখে মুখে তাদের চর্চা করত। ধান রোপণ করতে করতে চাষীরা গেয়ে উঠত 'গোয়াম্মালে'র গান। ক্ষেতে আগাছা বাছতে বাছতে চাষী-মেয়েরা সমস্বরে তান ধরত 'নেলাম্মালে'র গীতিকার। অথবা, ধান মাড়াতে মাড়াতে কৃষকেরা তুলত 'কামাতমালের' ধুয়ো। মাদুর বুনতে বুনতে অথবা ঝুরি বা ব্যাগ তৈয়েরী করতে করতেও ছেলে-মেয়ে মিলে কৃষকেরা সবাই করত লোক-সাহিত্যের অনুশীলন। সীবন-রতা দুই বধূ শাশুড়ী ও পুত্রবধূর বাদ-প্রতিবাদের পুনরাবৃত্তি করত 'পান্নামকাতুরা' বা 'পাদুরুমালে'র ছড়া কেটে কেটে! খেলার সময়ও অনেক সময় গাইত গান। নববর্ষের দিন গাগরি-ভরণ নৃত্য করতে করতে মেয়েরা বেরুত

দল বেঁধে। মুখে চটুল হাসি। আনন্দোজ্জ্বল কল-কণ্ঠ। নৃত্যরতা পাশের মেয়েকে উদ্দেশ করে কেউ হয়ত বলে উঠল :

'নবীন স্তনজোড়াটি মুখ ঢেকেছে ওর চিকণ শাড়ীর আবডালে। হাতের চুড়ি তুলেছে রিনিঝিনি মিঠা আওয়াজ। গল দেশে তার আলো করে আছে সোনার হার। কাঁকের কলসি তুলেছে স্বচ্ছন্দ নৃত্য।'

লোক গাথা

সিংহলী লোক-সাহিত্যের আর এক সেরা সম্পদ হল তার জাতক কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'সহল্ল' বা 'হল্ল' লোক গাথাগুলি। কবিতার অনুকরণেই এই গাথা সাহিত্য রচিত হত অশিক্ষিত জনসাধারণের মনোস্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। 'বেসান্তর হল্ল' এই শ্রেণীর রচনার সেরা উদাহরণ বলা যায়। তাঁর শ্লোক সংখ্যা হল মাত্র ৯৫টি। বর্ণনাও তার কৌতুকজনক। প্রধান চরিত্র হল এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাজক। এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অর্থ ও ক্রীতদাস সংগ্রহের কাহিনী তার মূল উপপাদ্য বিষয়। এক হাতে ছাতা ও লাঠি এবং অপর হাতে পুঁথিপত্রের ঝোলাটি নিয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একদা অর্থ সন্ধানে বাড়ির বার হল। বেরুবার আগে বৃদ্ধ তার পুঁথিপত্রগুলি খুলে একবার নাড়াচাড়া করে নিল। ব্রাহ্মণীকে ডেকে এনে বুঝি পূজো করল। তারপর যাত্রা করল আপন কার্য সিদ্ধির উদ্দেশে। এমনি ধারা কৌতুকময় উদ্ভট কাহিনী নিয়েই এসব লোক সাহিত্য রচিত হত।

'সদ্দান্তহল্ল' এমনি আর একখানি কাব্যছন্দে লেখা জন সাহিত্য গ্রন্থ। 'সদ্দান্তজাতক' অনুকরণেই এটি রচিত। তথাগত তাঁর পূর্ব জন্মকার বনের পশু জীবনেও কতখানি উদার মহানুভব ছিলেন তারি নিদর্শন পাওয়া যায় এই লোক গাথায়। বোধিসত্ত্ব সেবার বুঝি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বনের ঐরাবত হয়ে। একদা এক শিকারী তাঁকে নিহত করে গজদন্ত দুটি কেটে বারাণসীর রাজমহিষীকে উপহার দেবার জন্য ধনুকে শর যোজনা করল।

শিকারীর নিক্ষিপ্ত তীরে শিকার কিন্তু ঘায়েল হল শুধু। আহত বন্য পশুটি তখন শিকারীকে রৌপ্যনিভ গজদন্ত দুটি বিস্তৃত করে আক্রমণে উদ্যোগী হল। কিন্তু পরমুহূর্তেই গর্তের মধ্যে লুক্কায়িত ব্যাধের অসহায় সকরুণ অবস্থার কথা চিন্তা করে তাকে মায়ের মত শুঁড় দিয়ে সযত্নে

তুলে নিল। সস্নেহে শুধাল : এই বনভূমি চতুষ্পদ জীবজন্তুর বিচরণ স্থান। অকারণ আমাকে তুমি এখানে এসে শরাঘাত করলে কেন ?

এমনিধারা জাতক কাহিনী অবলম্বনে বহু লোক ছড়া ও গাথা সিংহলী জন-সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করেছে। 'ধর্মস্কন্ধ সহল্ল' ; 'পিরিনিভনসহল্ল', 'দেবদত কথভ', 'অলভুকথভ', 'যশোধারাভত' প্রভৃতি গাথা এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। তথাগত বুদ্ধের পূর্বেকার অলৌকিক জীবন কাহিনী এসব গাথা সাহিত্যের মূল উৎস। জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে এবং জনসাধারণের অনাবিল হাস্যকৌতুক পরিবেশন কল্পে বুঝি তার বেশীর ভাগই লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

লোক কাব্য

লোক গাথার মত লোক কাব্যও সিংহলী সাহিত্যের প্রাণ-গঙ্গা। প্রাচীনকাল থেকে সাগর-মেখলা দ্বীপময় সিংহলী জনসাধারণের কাব্যময় স্বতোচ্ছ্বাস কাব্য ধারায় মূর্ত হয়ে এসেছে। এই কাব্যই সিংহলের শিক্ষা সংস্কৃতির পুরোধায় এখনও বিদ্যমান। সিংহলী মাত্রই মজ্জাগতভাবে বুঝি কবি। কাব্যিক ভাষা ও ভাবালুকতা মিশিয়েই বুঝি সাধারণত কথাবার্তা বলে থাকে ওরা। নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও জল-বায়ুর অনাবিলতা বুঝি সিংহলীদের স্বভাবসিদ্ধ কবিপ্রাণ করে তুলেছে।

খৃষ্টজন্মের শত বৎসর পূর্বেই সেকালের সিংহলী কাব্যের প্রাচীনতম নমুনার কথা জানা যায়। সিংহলে যে সব ব্রাহ্মী শিলানুলেখ পাওয়া গেছে তাদের অন্ততঃ একটি কাব্যাকারে রচিত। বৌদ্ধের মহিমা কীর্তিত হয়েছে এই শিলালিপিতে। পালিভাষায় লিখিত তার অন্বয় থেকে জানা যায়, সিংহলের মেয়েরা ক্ষেতে-খামারে কাজ করতে করতে বুদ্ধের প্রশস্তি গাথা গাইত। রাজা কিৎসিরিমেভনের (আনুমানিক খৃঃ ৩৬২-৩৯০) রাজত্বকালে সিংহলে যখন বুদ্ধদেবের পবিত্র দন্ত নিয়ে আসা হয়, তখন তাঁর গুণকীর্তন করে সিংহলীতে এক কবিতা রচিত হয়েছিল। 'দালদা-সিরিতা'র কোন কোন অপ্রচলিত শ্লোক এ সময়কার রচনা বলে জানা যায়। প্রাচীন কুলপঞ্জী থেকে আরও জানা যায় যে দ্বিতীয় মোগ্‌গলান (খৃঃ ৫ম শতক) একজন সুনিপুণ কবি ছিলেন। তবে তিনি সিংহলী, সংস্কৃত বা পালি কোন্ ভাষায় কাব্য রচনা করেন তা সঠিক জানা যায় নি।

কিন্তু পঞ্চম কাস্যপ (খৃঃ ৯১৩-২৩) যে মাতৃভাষায় বুদ্ধের গুণকীর্তন করে গেছেন তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাঁরও পূর্বে প্রথম অগ্‌গবোধির (৫৬৮-৬০১) রাজত্বকাল কাব্যানুশীলনের জন্য সবিশেষ খ্যাত ছিল। তাঁর আমলেই সক্‌দমল, অসক্‌দমল, দামি কবিরি; অনুরুত, পুরবঠ্ঠু, কিৎসিরি প্রমুখ দ্বাদশ কবির কাব্যরচনার কথা জানা যায়। এঁদের অনেকেই রাজ-পরিবারভুক্ত ছিলেন। যদিও তাঁদের কোনও কাব্যরচনা আজকালের ধোপে টিঁকে নেই, তবে প্রাচীন বিবিধ গ্রন্থে তাঁদের উল্লেখ ও উদ্ধৃতি রয়েছে। এমনি দুটি উদ্ধৃতির উদাহরণ :

'রাজা কুশ রাজকন্যার কথা আজ ভুলে গেলেন একেবারে। কেননা, রাজকন্যা আজ তাঁর বশীভূত। অবনতশিরে এসে দাঁড়িয়েছে সে তাঁর সামনে। মাথায় কালচুল রাজকন্যার পদ্ম-রাঙা চরণ দুটি বুঝি ছুঁয়ো ছুঁয়ো।।'

'কুশ-প্রভাবতী'র কাহিনীর অবলম্বনে এমনি আর একটি প্রাচীন 'ইলু' কাব্যের উদাহরণ :

'জলক্রীড়া করতে রাজকন্যা প্রভাবতী জলে নামল। নামতেই সরোবরের জলে প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের সৌন্দর্যকে বুঝি রাজকন্যার সুন্দর মুখশ্রী হার মানিয়ে দিল।'

কুশ-জাতকের এমনিধারা কাব্যসুষমাময় উপমার নমুনা বুঝি অজস্র ছড়িয়ে আছে সেকালের বহু কাব্য গ্রন্থে।

এ সময়কার আর এক সাহিত্য-কীর্তি হল সন্দেশ কাব্যের অনুসরণে রচিত কবিতা। কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে এই সন্দেশ বা দূতি কাব্যগুলি সৃষ্ট। 'ময়ূর সন্দেশ' বা ময়ূরের বার্তাই বুঝি তার সেরা নিদর্শন। বেলাশেষে সূর্য যখন পাটে বসে, সন্ধ্যার অন্ধকার তখন নেমে আসে বন বনান্তে। শালগাছের উঁচু ডালে ময়ূর তখন উড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় রাত্রির জন্য। এমনিতর বর্ণনাত্মক পদ্যের মারফত সিংহলের অষ্টম থেকে একাদশ শতকের কাব্য ধারার সন্ধান পাওয়া যায়।

তখনকার সিংহলী কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সংস্কৃত ও পালি কাব্যের অনুবাদ। কালিদাসের মেঘদূত যে সিংহলের কবিদের নিকট অপরিচিত ছিল না তা 'ময়ূর সন্দেশ' দূতিকাব্যেই প্রমাণিত হয়েছে।

মেঘদূতের অন্তত একটি শ্লোক মহাবোধিবংশগতপাদয়ঃ (Mahabodhi-vamsagatapadaya) গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে দেখা যায়। দ্বাদশ শতকের রচনা 'মেঘদূত সন্নয়' অপূর্ব গ্রন্থে। সংস্কৃত বা পালি কাব্যের সিংহলী টীকা ও অন্বয় লিপিবদ্ধ আছে তাতে অনূদিত হয়ে। এ সব সিংহলী টীকা টিপ্পনি সংস্কৃতের প্রসিদ্ধ টীকাকার বল্লভদেব বা মল্লিনাথের ঠিক অনুরূপ নয়। সিংহলী ভাষ্যকাররা আপন বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা রক্ষা করেছিলেন পূর্ণ মাত্রায়। যেমন বলা যায়, সিংহলী টীকাকারের মতে কবি কালিদাস একদা সম্রাটের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। এজন্য শাস্তি-স্বরূপ তিনি আপন গৃহ ও পত্নীর নিকট হতে নির্বাসিত হয়েছিলেন দূর বিদেশে সম্রাটের নির্দেশে। প্রিয়-বিরহকাতর কবি কালিদাস তখন প্রিয়তমার তুষ্টি বিধান উদ্দেশ্যে তাঁর রূপক কাব্য 'মেঘদূত' রচনা করেছিলেন 'অন্যোক্তি' রীতিতে। সিংহলী ভাষ্যকার আরও বলেন, কালিদাস নিজেই যক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রামগিরি পর্বতে মুনির তপোবনে বৎসরকাল যাপন করেছিলেন। কবি-পত্নীকে যক্ষ জায়ার অনুরূপ বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। এ জন্যই বুঝি কালিদাস তাঁর কাব্যে 'কান্তা' শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন। 'নারী' শব্দ ব্যবহার করেন নি। তাই মেঘদূতের প্রথম ছত্রেই 'কশ্চিৎ কান্তা' দিয়ে শুরু করেছেন। অর্থাৎ, কোন যক্ষ বিশেষনয়। এমনিতর মৌলিক অর্থ আরোপ করতে সিংহলী টীকাকাররা বুঝি পশ্চাৎপদ হন নি।

সিংহলী কবি কুমারদেশ 'জানকীহরণ' নামে একখানি সংস্কৃত মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। এই কাব্যের প্রভাব সিংহলী কবিদের উপর পড়েছিল ব্যাপকভাবে। এ ছাড়াও অনুরুদ্ধশতকসন্নয়, সূর্যশতকসন্নয়, ভক্তিশতকসন্নয় প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থও এই সিংহলী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। পালি কাব্যের অনুবাদও সিংহলী সাহিত্যকে ও অলংকার শাস্ত্রকে সমৃদ্ধতর করে তোলে। বানরতনমেধাঙ্কর রচিত জীনচরিত কিংবা দাতবংশসন্নয় অথবা সধম্মোপায়সন্নয় (Saddhammopayana sannaya) প্রভৃতি পালি কাব্যের অনুবাদ এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। দাতবংশসন্নয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। সারিপুত্তর শিষ্য ধম্মকীত্তিথেরা এই সন্নয় কাব্যের রচয়িতা। পাজ্জমধুসন্নয় এমনি আর এক সেকালের পালি কবিতার সিংহলী অনুবাদ। শশদাভতসন্নয়ও

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্লাশিক এ গ্রন্থে সেকালের সিংহলী বহু ঐতিহাসিক তথ্য ও বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে যা 'কুলবংশ'-এ নেই। পালিকাব্যে উল্লিখিত সেনাপতি কীত্তির কথাপ্রসংগে সিংহলী টীকাকার এ ঐতিহাসিক বিবরণও জানান যে সেনাপতি কীত্তি বার বার দু'বার দক্ষিণ ভারত থেকে আগত চোল রাজদের সিংহল আক্রমণ প্রতিহত করেন।

প্রাচীন সিংহলী কবিরা সংস্কৃত কাব্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে গ্রন্থ রচনায় যে অনেকক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তার নমুনা আগেই দেখান হয়েছে। পালি জাতক কাহিনী অবলম্বনে বহু কাব্য মহাকাব্য রচিত হয়েছিল। বোধিসত্ত্ব এইসব প্রাচীন গাথা কাব্যের নায়ক। 'মুভদেভদাভত' (Muvadevdavata) মুখদেভজাতকে ভিত্তি করে সংস্কৃত খণ্ড-কাব্যের রীতিতে রচিত মহাকাব্যের কিছু কিছু লক্ষণ দৃষ্ট হয়। কবির এ কাব্যে বোধিসত্ত্বের জীবনবৃত্তান্ত জাতক কাহিনীর চিরাচরিত প্রথামত গ্রন্থিত নয়। তিনি শুধু বোধিসত্ত্বের ঠিক আগেকার জীবনকথাটি বেছে নেন আর ১৬৭টি ছন্দবদ্ধ শ্লোকে সহজ অনাবিল কাহিনীটি কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ করে যান। বোধিসত্ত্ব এই জন্মে অবতীর্ণ হন এক ধর্মপ্রাণ ন্যায়নিষ্ঠ রাজার ভূমিকায়। রাজা তাঁর মাথায় প্রৌঢ়ত্বের চিহ্ন পক্বকেশ দেখে পুত্র-কন্যা, রাজত্ব সব ত্যাগ করে বনে গমন করেন এবং ধর্মে-কর্মে অতঃপর আত্মনিয়োগ করেন। কবি এই কাব্যের প্রথম অংশ 'গজগামী' ছন্দে এবং পরবর্তী অংশ 'যাগি' ছন্দে রচনা করেন। উপমা ও কাব্যালঙ্কারে সমৃদ্ধ এই মুভদেভদাভত অনেক স্থলে কালি-দাসের কাব্য মহিমার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

তেমনি শশজাতক কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্যতিলক 'শশদাভত' এ সময় লিখিত হয়। এই কাব্যতিলকের শ্লোক সংখ্যা ২৯৩টি এবং তা 'জি' ছন্দে রচিত। কবি (কাব্যে তাঁর নামের উল্লেখ নেই) তাঁর রচনার গৌরচন্দ্রিকায় রাণী লীলাবতী ও তাঁর প্রধানমন্ত্রী কীর্তির গুণ কীর্তন করেন অটুট সাহায্য ও রাজকীয় দাক্ষিণ্যের জন্য। মুভদেভদাভত-র অনুরূপ শশদাভত-র কবিও তাঁর কাব্যের কাহিনীসূত্রটি প্রথম শ্লোকে বিবৃত করেন। এবং বলেন: প্রভু তথাগত যখন শশকরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন তখন হয়েছিল কি, একদা এক ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ খাদ্যান্বেষণে বনে ঘুরতে ঘুরতে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হন। শশকরূপী

বোধিসত্ত্ব তখন অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর সিদ্ধ মাংসখণ্ডে রূপায়িত হয়ে আত্মোৎসর্গ করে ব্রাহ্মণের ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। এই শশককেই আজ আমরা দেখি আকাশের চাঁদ হিসাবে। এই কাহিনী কবি তাঁর কাব্যে রূপগন্ধময় ছন্দবদ্ধ কাব্য সুষমায় বিবৃত করে গেছেন। মুভদেভদাভতের অপেক্ষাও শশদাভত কাব্যবৈশিষ্ট্যে ও নৈসর্গিক বর্ণনায় ন্যূন নয়। কেবল পালিশাস্ত্রে নয়, সংস্কৃত কাব্যাদর্শেও কবির পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় এ কাব্যতিলকে।

'কভসিলুমিন'ই বুঝি প্রাচীন সিংহলী কাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সত্যি অপূর্ব কীর্তি এ সিংহলী কাব্যগ্রন্থের 'মুকুট-মণি'। রচয়িতা কবি রাজা দ্বিতীয় পরাক্রমবাহু। 'মুভদেভদাভত'র মত জাতক-কাহিনী অবলম্বনে তাঁর শ্রেষ্ঠকাব্যে বোধিসত্ত্বের পূর্বেকার জন্ম—রাজা কুশের রোমাঞ্চকর জীবন কথাই তিনি নিপুণ হস্তে বিবৃত করেছেন। তবু কোথাও তিনি তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেন নি। এই কাব্যের গোড়ার শ্লোকগুলি আর পাওয়া যায় না, শশদাভত-র মত রাজা পরাক্রমবাহুও তাঁর কাব্যের প্রথম শ্লোকটিতে মূল কাব্য-কাহিনী সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন এবং লিখেছেন :

'বোধিসত্ত্ব একবার যখন রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি তখন পরাক্রান্ত সাতজন রাজা-মহারাজার গর্ব চূর্ণ করেছিলেন : অসামান্যা রূপবতী এক রাজকন্যাকে আপন বশে এনেছিলেন : তিনি তাঁর রাজত্ব-কালে দশপ্রস্থ রাজকীয় ধর্মাচরণ সমাধান করেন।'

প্রথম শ্লোকোক্ত কথা-মুখে তিনি তাঁর 'মহাকাব্যে'র যা কিছু পূর্বাভাষে বলতে পারেন নি, তা রোমান্টিক এক উপমার মারফৎ তুলনা করে বলেন যে, এ যেন অপরিণত কোন কুমারী কন্যার বক্ষদেশ মাত্র। যৌবন উচ্ছল পরিণত তার পীনোদ্ধত স্তনযুগলের পূর্ণবিবরণ কাব্য পাঠে পাওয়া যাবে। তিনি অতঃপর কুশবৎ নগরীর রাজা কুশের দোর্দণ্ড প্রতাপ ও রাজ্যের সুখ সমৃদ্ধির কথা বিবৃত করেন এবং রাণী প্রভাবতীর রূপলাবণ্য বর্ণনা করেন। জাতকের কাহিনী অবলম্বন করলেও তিনি যে তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেননি তা আগেই বলা হয়েছে। জাতকের গল্পে যুদ্ধের কথার উল্লেখ নেই। কিন্তু রাজা পরাক্রমবাহু তাঁর মহাকাব্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। রাজা কুশ ও

প্রভাবতী যে পূর্বজন্মে এক মুনি কর্তৃক শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন তারও উল্লেখ নেই। কবি রাজা দ্বিতীয় পরাক্রমবাহু তাঁর এই 'মহাকাব্যে'র উৎকর্ষ সাধন মানসে স্বেচ্ছাবিহারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর মহাকাব্যকে সুষমা মণ্ডিত করতে কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর দুটি সুভাষিতবলী এখানে উদ্ধৃত করা গেল : যারা মহান, অধীনস্থদের পরিরক্ষণ যাঁদের করতে হয় তাঁদের অপরের আচরণের প্রতি তেমন কর্ণপাত করলে চলে না। যেমন বৃক্ষ : তাকে জড়িয়ে-ওঠা-লতা-বল্লরীকে গাছ আপনবক্ষে আশ্রয় দিয়ে থাকে। তার শাখা প্রশাখাকে পিষে ফেললেও কি সে কর্ণপাত করে ?

অথবা—

যাঁরা মহৎ তাঁরা তাঁদের প্রতিঘাতককেও প্রত্যাঘাত করেন না। এই যেমন চন্দন কাঠ, নিজে পিষ্ট হয়েও সুবাস বিতরণ করতে কার্পণ্য করে না।

'কপসিলুমিনা' কাব্যের কবি রাজা দ্বিতীয় পরাক্রমবাহুর মত আর এক রাজকুলোদ্ভব কবিও কাব্য রচনায় প্রভূত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন সেকালের সিংহলী কাব্যে। তাঁর নাম তোতাগামুভ অঞ্চলের শ্রীরাহুল। বুদ্ধদেবের পূর্বতন জীবন কাহিনী অবলম্বনে তিনি কাব্য রচনা করেন। 'কাব্যশেখর'ই তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি। জাতক-কাহিনীকে পরবর্তী কালের বহু কবিও কাব্যে রূপ রূপায়িত করেছেন। সহজ অনাবিল এসব কাব্যসুধা পান করেছেন সিংহলের জনসাধারণ। রাজা কর্তিশ্রী রাজসিংহ আর রাজাধিরাজসিংহের আমলেও এমনি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচিত হয়েছিল। কাণ্ডির রাজা রাজাধিসিংহ নিজেও লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ছিলেন। বৌদ্ধ জাতকের এই পুরাকাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনার ধারা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। 'মহাকাব্য' বা দীর্ঘাকৃতি কবিতার পরিবর্তে ক্ষুদ্রাকার কাব্য চালু হয়।

ধর্মমূলক কাব্য

জাতক কাহিনী ছাড়াও বুদ্ধদেবের জীবন আলেখ্যকে আশ্রয় করে সিংহলী কবিরা বহু পদ্য রচনা করেন। বিদেহ-র 'রসবাহিনী' কিংবা ধর্মকীর্তির 'সধর্ম অলঙ্কারায়' বিশেষ করে এই সব কবিদের ছিল উৎস। রসবাহিনীর প্রথম কাহিনী রাজা ধর্মস্কন্ধ উপখ্যান এই সব কাব্য কাহিনীর

অন্যতম অংগ। রাজা ধর্মস্কন্ধের কাহিনী—গৌতম বুদ্ধের পূর্বতন কোন জন্মবৃত্তান্তের প্রচলিত কাহিনীতে দেখা যায় না।

কবি অলগিয়ভন্ন তাঁর 'ধর্মস্কন্ধ কাব্য'-এ বারাণসীর রাজা ধর্মস্কন্ধের ধর্মকথা শ্রবণবৃত্তান্ত কাব্যাকারে বিবৃত করেছেন। বুদ্ধকাশপ ও গৌতম-বুদ্ধের সাক্ষাৎকারের বৃত্তান্তটি শুনবার জন্য তাঁর একদা প্রবল বাসনা জাগে। রাজ্যময় তিনি এই পুণ্যকাহিনী শুনাবার জন্য প্রচারকের সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও তাঁকে খুঁজে পেলেন না। মনের দুঃখে তিনি তখন রাজ্য ছেড়ে বনে গমন করলেন এই আশায় যে যদি সেখানে কোন ধর্মপ্রচারকের সন্ধান পান। এখন হয়েছে কি, কাশপ এক রাক্ষসের মূর্তি ধরে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। জানালেন, তিনি ধর্মস্কন্ধকে ধর্মকথা শোনাতে রাজী আছেন। কিন্তু তার বিনিময়ে তাঁকে আপন দেহ থেকে এক খণ্ড মাংস দিতে হবে। রাজা ধর্মস্কন্ধ তাতে রাজী হলেন। তিনি তখন এক উঁচু ঢিপির উপর গিয়ে বসলেন আর রাক্ষস নিচে বসে ধর্মবৃত্তান্ত বলে যেতে লাগল। কাহিনী শেষ হতেই রাজা ধর্মস্কন্ধ রাক্ষসের বিরাট মুখগহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং আপন প্রতিজ্ঞা পূরণ করলেন। রাক্ষসবেশী কাশপ তখন স্বমূর্তি ধারণ করলেন আর বোধিসত্ত্বকে নিয়ে স্বর্গাভিমুখে যাত্রা করলেন। রাক্ষসের বর্ণনা কিংবা বোধিসত্ত্বকে নিয়ে কাশপের স্বর্গযাত্রার বর্ণনা কবি অলগিয়ভন্নর অপূর্ব কাব্যশক্তির পরিচয় বহন করে। পুষ্পকরথে করে গুটিলর ভ্রমণ কাহিনীর কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে অজ্ঞাত-নামা জনৈক কবির অলভকদমনয় কাব্য ভাষা ছন্দ ও কাব্যালঙ্কারে সমুজ্জ্বল। এই কাব্যে বুদ্ধদেব কর্তৃক যক্ষরাজের দমনের কথা সহজ অনাবিল ভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

কবি কিরামধর্মানন্দ তাঁর 'কভমুতুহার' কাব্যে কাঞ্চনদেবী বাস্তুভর উপাখ্যান কাহিনী ছন্দায়িত করেছেন সুন্দরভাবে। কবি ধর্মানন্দের কাহিনীটি হল : একদা ভারতের কোন এক দেবপুত্র নগরে একটি মহাধর্ম উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এই ধর্মযজ্ঞে সুন্দরী একটি কন্যাও এসে যোগদান করেছিল। এক নাগ-রাজও এই ধর্মানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কন্যাটির অপূর্ব রূপলাবণ্য দেখে মুগ্ধ হলেন এবং তার হৃদয় জয় করতে কৃতসংকল্প হলেন। কিন্তু ধর্মপ্রাণ কন্যাটি ধর্মের অসীম ক্ষমতাবলে

নাগরাজের প্রেম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। তেজদীপ্ত এই কন্যা পরজন্মে দেবপুত্র-রাজার ঘরে জন্মগ্রহণ করে। রাজকন্যার রূপলাবণ্যের কথা চারিদিকে এমনই ছড়িয়ে পড়ে যে, অচিরেই সে কাঞ্চনদেবী নামে পরিচিত হল। এ জাতকে রাজকন্যা অতীব ধর্মনিষ্ঠ ও চিত্তশুচিতার জন্য খ্যাত হয়। কত রাজা কত যুবরাজ তার পাণিগ্রহণ করতে এল। কিন্তু রাজকন্যা সবাইকে বিমুখ করে ধর্মযাজিকার কঠোর জীবন যাপনে ব্রতী হল। এজন্য রাজকন্যা কাঞ্চন-মেহেনী নামেও পরিজ্ঞাত হয়। এমনি কাব্যকাহিনীর মারফৎ তখনকার সিংহলীয় ধর্মমানস ও আধ্যাত্মিক জীবন-যাত্রার বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতীয় সাংস্কৃতিক ধারা আর ধর্ম-কর্মের আলোক সাগরদ্বীপ সিংহলে গিয়ে যে পড়েছিল তার স্পষ্ট স্বাক্ষর সিংহলী কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে দেখা যায়। রামায়ণ মহাভারতের বহু কাহিনী সিংহলী কবিদের প্রভাবান্বিত করেছিল। সিংহলী বেশ-ভূষাও যে রূপান্তরিত হয়েছিল তার নিদর্শন বুঝি 'মহাপদরঙ্গজাতকয়', রাবণ-নাটক-কবি, বেতালনকথব প্রভৃতি গ্রন্থ।

রাজা মহারাজাদের গুণকীর্তন করে যে বহু প্রশস্তি লিখিত হয়েছিল ইতিপূর্বেই তা বলা হয়েছে। এই রীতি দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। পরকুম্ভসিরিত (পরকুম্ভবাসরের ইতিহাস) বুঝি এই স্তুতিকাব্যের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জয়বর্ধনপুরের রাজা চতুর্থ পরাক্রমবাহুকে (খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতক) অবলম্বন করে এ কাব্য গাথার সৃষ্টি। শুধু বিষয় বর্ণন নয়, ছন্দ লালিত্য ও কবিত্ব বলে এ কাব্য অনুপম। এ কাব্যের খানিকটা অংশবিশেষঃ চন্দ্র ও সমুদ্রের কথোপকথন [৯২ সর্গ] কৌতূহলী পাঠকবর্গের নিকট উত্থাপিত করা গেল ইংরাজী অনুবাদ থেকে ;

'সমুদ্র ॥ হে চন্দ্র।

চন্দ্র ॥ হে সমুদ্র, কেন কি হয়েছে ?

সমুদ্র ॥ সমুদ্রের তটদেশে এসে তুমি মুখ লুকিয়েছ কেন ?

চন্দ্র ॥ কৃতবিদ্য রাজা পরাক্রমবাহু যে হস্তী বিতরণ করে বেড়াচ্ছেন তাঁদের যাঁরা হস্তী আর অশ্বের খোঁজে বেরিয়েছেন।

সমুদ্র ॥ না, তা নয়। রজত শুভ্র চন্দ্রের অজস্র জ্যোৎস্নাধারা দেখে রাজ-অন্তঃকরণ হয়ে উঠেছে উদ্বেলিত। উপহার বিতরণে তিনি হয়েছেন তাই বিরত।'

পরবর্তী সর্গের অংশ বিশেষ—জনৈক ব্রাহ্মণ আর এক পথচারীর কথোপকথন :

'ব্রাহ্মণ ॥ বন্ধু, বলুনত শুনি কোত্থেকে আপনি আসছেন ?

পথচারী ॥ ব্রাহ্মণ, সামন্তকূট থেকে সম্প্রতি আসছি।

ব্রাহ্মণ ॥ তা হলে একটু দাঁড়িয়ে বলুন ত, কি বার্তা আপনি নিয়ে আসছেন ?

পথচারী ॥ ভগবান সুমন আমায় বল্লেন আড়াই হাজার বৎসর পর এই ধরাধামে এক বিশ্ব রাজার আবির্ভাব হবে (বুদ্ধের তিরোভাবের পর)।

ব্রাহ্মণ ॥ বন্ধু, বলুন দেখি রাজার কি নাম ?

পথচারী ॥ সসাগরা পৃথিবীর একছত্র সম্রাট রাজা পরাক্রম॥'

এই কাব্যের রচয়িতা কে জানা যায় নি। তবে শ্রীরাহুল এই কাব্যের কবি বলে প্রচলিত। প্রথম ও দ্বিতীয় রাজা রাজসিংহের জীবন আলেখ্য অবলম্বনে এমনি বহু স্তুতিকাব্য রচিত হয়েছিল। সিংহল যে তখন পর্তুগীজ হার্মাদদের আক্রমণে বারবার বিপর্যস্ত হয়েছিল তার কথা এ সব কাব্যে উল্লিখিত রয়েছে। মহা হাতনা মহাযুদ্ধ) কাব্যে পর্তুগীজ সেনাপতি কনস্ট্যান্টিন দ্য সা ও তার পুত্রের কাণ্ডীর রাজা দ্বিতীয় রাজসিংহের হস্তে পরাজয় বরণের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। গোয়া বন্দর থেকে এসে এসব হার্মাদের দল অতর্কিতে সিংহল আক্রমণ করে ছলে বলে সিংহলের রাজাকে পরাভূত করে দেশময় কেল্লা তৈরী করে নিত। তারপর সিংহলের রাজক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করতেও কুণ্ঠিত হত না। রাজা সেনারথের রাজত্বকালে পর্তুগীজ দস্যুরা অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে কাণ্ডী অবরোধ করে বসে। রাজা সেনারথ রাজ্য ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হন। অরক্ষিত নগরী তখন বিদেশী দস্যুদের নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলার মুখে পতিত হয়। পর্তুগীজরা তথাগত বুদ্ধদেবের পবিত্র দন্ত-মন্দির পত্তিনী দেবীর পীঠস্থান কিংবা গণেশ্বর মন্দির কলুষিত করতে ইতস্তত করেনি। রাজ্যের ফলন্ত গাছপালা, গবাদি পশুদের উপরও অবলীলাক্রমে হত্যাকার্য চালায়। রাজসিংহ ওলন্দাজ বণিকদের সাহায্যপুষ্টে পর্তুগীজদের এ অবরোধ প্রতিহত করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অপূর্ব শৌর্য বীর্যের চরম পরাকাষ্ঠা নিদর্শন করেন। ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে

রচিত আর একখানি অপরূপ কাব্যকথা হল পরমগিহতন (পর্তুগীজদের সঙ্গে যুদ্ধ)। 'শ্রীনামে'-ও (রাজপ্রশস্তি) এ সব স্তুতিকাব্য পরিচিত। নরেন্দ্র সিংহ রাজস্তুতি এ প্রসংগে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রেমের কাব্য

মন-দেয়া-নেয়া বিরহ-মিলন-কথা সিংহলীকাব্যে অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। 'কপসিলুমিনা'য় রাজকন্যা প্রভাবতীর প্রতি রাজা কুশের প্রেম-নিবেদন ও আকুলতার কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। প্রভাবতী ও রাজা কুশের প্রেমকথা আরও অনেকে কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। শ্রীবাহুল তাঁর 'কাব্যশেখরায়' এমনি ধারা বিচিত্র প্রেম-নিবেদনের কথা বিবৃত করেছেন। এমন কি নিষিদ্ধ প্রেম নিবেদনও বাদ পড়েনি। সোমরজীব পট্টয়ামি রচিত 'বিরহকাব্যমঞ্জুষা' কিংবা 'রতবতী'র কাহিনী (রতভতিকতভ) মদনের পুষ্পশরে জর্জরিত নায়ক ও নায়িকার প্রেমাকুল হৃদয়ের মর্মকথা তুলে ধরেছে ছন্দলালিত্যে। রতভতিকথভ মাত্র ষোলটি শ্লোকের ক্ষুদ্র কবিতা। 'উম্মাগ্‌গ জাতকের' একটি কাহিনী অবলম্বনে এ কবিতা রচিত। সিংহলের রতি-কাব্যের এটি বুঝি এক সেরা নিদর্শন।

হিমালয় পর্বতের গভীর বনে গুহার মধ্যে বাস করত এক কিন্নর দল। গুহার মুখে কোথা থেকে এক ভয়ংকর মাকড়সা এসে তাঁর উর্ণনাভ বিস্তার করে বসে আর প্রতিদিন কিন্নরের দল গুহা থেকে বেরুবার সময় একটিকে ধরে অমনি খেয়ে ফেলত। নিরুপায় হয়ে কিন্নরের দল তখন গিয়ে ধর্ণা দিল গুহার অনতিদূরে ধ্যানরত সৌম্যদর্শন এক তপস্বীর নিকট। অনুরোধ জানালে মৃত্যুদূত ঐ ভয়ংকর মাকড়সাটিকে বধ করে তাদের প্রাণ রক্ষা করতে। সন্ন্যাসী কিন্তু প্রথম রাজী হলেন না। কিন্তু এর প্রতিদানে ওরা যেই কিন্নর-অপ্সরী রতবতীকে সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিবাহ দিতে প্রস্তাব করলে, যোগীপুরুষ তখন সম্মত হলেন। তিনি কিন্নরকন্যার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে ধ্যান ধারণার কথা একরূপ ভুলে গেলেন এবং রতবতীর সঙ্গে মধুযামিনী যাপনে রত হলেন মাকড়সাটিকে যথারীতি বধ করে। এমনি করে মুনিবর তাঁর ব্রহ্মচর্য ও তপঃসাধনা যখন জলাঞ্জলি দিলেন কিন্নরকন্যার রূপলাবণ্যের নিকট

তখন সবিস্ময়ে জানতে পারলেন, ঐ কিন্নরকন্যা আর কেউ নয়, স্বর্গের এক শাপভ্রষ্টা দেবী।

সমরজীবের সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বী কাতুবানিরদিশনায়ক রচিত 'মকরধ্বজয়' (মদন-ধ্বজা) এমনি আর একখানি উল্লেখযোগ্য অপূর্ব প্রেমকাব্য। এ কাব্যও চিরন্তনী সেই শাপগ্রস্ত বিরহ আকুলতার ছন্দোময় কাব্যরূপ। 'কাভুলসক'ও (কোকিল-চক্র) এমনি আর একখানি দীর্ঘকাব্য। এই কাব্যের একটি শ্লোকের বাংলা অনুবাদ উদ্ধৃত করা গেল :

> 'বসন্তের ঋতু সমাগমে চাঁদের আলো এমনি সাদা ধবধবে তীব্র যে নিদাঘের সূর্য কিরণের মত মনে হয় অনেকটা। কোকিলের স্বর দৈত্যের ভয়ংকর কর্কশকণ্ঠের মত শোনা যায় দূর থেকে। মদনদেব তাঁর মৎস-পতাকা উড়িয়ে রণক্ষেত্রে সমাগত। ওগো সুনয়নী, তবে দ্বিধা কেন? তুমি তোমার সুধাভাণ্ড উজাড় করে অমৃতসুধা দাও আমায় পান করতে।'

'কলিঙ্গবধিজাতক' গ্রন্থ-রচয়িতা ডুনভিল গজনায়ক নিলাসি কবি হিসাবেও খ্যাত ছিলেন। তাঁর আদিরসাত্মক 'রতিরত্ন অলংকারায়' (কাম-রত্ন-অলঙ্কার) বুঝি তামিল ভাষায় অনূদিত সংস্কৃত কামশাস্ত্রের ভাষান্তরিতকাব্য। 'বিয়োগরত্নমালয়' কাব্যের অনেকটা অনুকরণে এই গ্রন্থ রচিত। প্রেমিকযুগলের বিরহ-বেদনার কথা এই কাব্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। নায়িকার সবিশেষ রূপ লাবণ্যের বর্ণনা দিয়ে নায়ক তার মধুযামিনী যাপনের কথা বয়স্যদের নিকট সবিস্তারে বর্ণনা করছে লজ্জা-সরম, শালীনতার মুখোস খসিয়ে। এ অনুযোগও বুঝি করল বন্ধুদের কাছে গিয়ে, রতিসুখ উপভোগ করে বধূ তার বুকে মুখ গুঁজে বলেছিল : তাকে ছেড়ে আর কোথাও যাবে না কখনও। কিন্তু হায়, সে তার কথায় করেছে অপলাপ। পিতৃগৃহে সে আজ চলে গেছে। আমি আজ একা, সঙ্গীহারা, নিঃসঙ্গ। ব্যথাতুর যুবক তারপর দুঃসহ যন্ত্রণার কথা বন্ধুদের জানিয়ে অনুযোগ করে বলছে: আমার কি দোষ বলত? বধূই আমাকে ছেড়ে গেল নিষ্ঠুর নৃশংসের মত। নিশান্তে মোরগের ডাক কিংবা স্তব্ধ দুপুরে কোকিলের কুহু ধ্বনি আমাকে শুধু ব্যথাতুর করে তোলে—স্মরণ করিয়ে দেয় পুরোনো কথা। যুবক বন্ধুর দুঃখের কাহিনী

শুনে ইয়ারের দল তখন বধূকে গিয়ে নিয়ে এল তার বাপের বাড়ী থেকে। তাপিত, বেদনাভারাক্রান্ত যুবক যুবতীর ঘটল মিলন। কবি তুনভিলা গজনায়ক নিলামি হৃদয়ের একান্ত অনুভূতি দিয়ে এ কামাত্মক কাব্যটি রচনা করেছেন। 'রতিরত্ন অলংকারায়'র রচনাকাল ১৮১১ খৃষ্টাব্দ।

কবি তুনভিলা নিলামির আর একখানি কাব্য 'তুনভিলা পরিবারের কাহিনী'তে কবির পারিবারিক জীবন—আর্থিক অসচ্ছলতার কথা রূপক আকারে বর্ণিত হয়েছে দেখা যায়। বকেয়া খাজনার দায়ে তাঁর ভিটামাটি রাজা কেমন করে ক্রোক করে নেন এবং প্রধানমন্ত্রী পিলিমাতলভের সাহায্যানুকূল্যে তা কি করে আবার ফিরিয়ে পান, এ তারই কাহিনী। পঞ্চান্নটি চার-পংক্তি শ্লোকে কবি তুনভিলা নিলামি তাঁর এই প্রতীক কাব্যের অবতারণা করেছেন মা ও মেয়ের কথোপকথনের মাধ্যমে। কুমারী কন্যাকে রাত্রির কাল যবনিকার অন্তরালে তার শয্যা থেকে অপহরণ করে নেয় তার প্রিয়তম এসে। প্রিয়সংগ ভোগ করে নিশান্তে কন্যা যখন চুপি চুপি তার আপন শয্যায় ফিরে আসে মা তা টের পেলেন। মেয়ের গোপন অভিসারের কথা জানতে চাইলেন। মেয়ে কিন্তু নিরুত্তর। বলবে না কিছুতেই কোথায় গিয়েছিল সে কাল রাত্রে এবং কার সঙ্গে। শেষে মার পীড়াপীড়িতে বললে এক সময় যে পিলিমাতলভর যুবক প্রধানমন্ত্রী বিজয়সুন্দর সেনারথ অবয়বনই কাল রাত্রে এসে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। সে অনেক কাকুতি মিনতি করাতে আবার তাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। মা তা শুনে আর মেয়ের উপর বিরূপ হলেন না। বরং খুশি হয়েই বল্লেন: বড় ঘরের রাজা রাজড়াদের রীতিই হল এই।

মা তখন তার কন্যাকে বল্লেন: সে তার প্রেমিক রাজকুমারকে বলে তাদের বসতবাটী, জমিজমা, অর্থ যা কিছু সব দেনার দায়ে রাজা কেড়ে নিয়ে গেছেন তা যেন ফিরিয়ে দেয়। মেয়ে তাই করল। সে তার প্রেমিকবর প্রধানমন্ত্রীকে মার কথা জানাল। যুবক প্রধানমন্ত্রী তার প্রিয়তমার এ আবেদন রাজসমীপে পেশ করল। রাজা সব শুনে কবি তুনভিলা নিলামির বসতবাটী, জায়গা জমি, সব কিছু আবার ফিরিয়ে দিলেন। কবির বিষয় সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের এই কাহিনীটি রূপকমাত্র। কাব্যোল্লেখিত তরুণী কন্যাটি হল তাঁর কাব্য, আর প্রধানমন্ত্রী

বিজয়সুন্দর সেনারথ হলেন দেশের প্রভু। তিনি কবির কাব্য পাঠে তুষ্ট হয়ে কবিকে তাঁর হৃত বিষয় আশয় সব কিছু আবার ফিরিয়ে দেন।

কবি মিদেল্লভ কোরলের কাব্যেও এমনিধারা আদি-রসাত্মক কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়।

মহিলা কবি

গ্যাসকন অধিকর্ম ও কাণ্ডীরাজ মহিষী রাজসিংহ-সহধর্মিনীও প্রেমধর্মী কাব্য রচনা করে সিংহলী সাহিত্যকে রসসমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। কবি গ্যাসকন ছিলেন বাঙলার এ্যান্টুনি ফিরিঙ্গীর মত পর্তুগীজ কুলোদ্ভব। তিনি প্রথমে কাণ্ডীরাজার সৈন্যবাহিনীতে সেনানী হিসাবে যোগদান করেন। কিন্তু আপনার কাব্যপ্রতিভা বলে তিনি রাজা রাজসিংহ ও রাজমহিষীর বিশেষ কৃপাপ্রার্থী হয়ে ওঠেন। কাণ্ডীর রাজমহিষীর সঙ্গে তাঁর মন-দেয়া-নেয়ার গোপন পালাও নাকি চলেছিল কিছু কাল। কাণ্ডীরাজ তা জানতে পারেন। সৈনিক কবি গ্যাসকনের প্রতি তিনি তখন প্রাণদণ্ডের নির্দেশ দেন। জল্লাদ যখন কবি গ্যাসকনকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যায় তখন রাণীর কাছ থেকে ছন্দোবদ্ধ এই কাব্যকলিটুকু তিনি প্রাপ্ত হন দূতী মারফত :

'টুন কলটুমুল বনায়ি মালরস নোবিন্দ
কস্তুল গাজন কোপুলঙ বিন্দু রোণত বদ
কস্তুল-পাহর বনি নিরিন্দুত অশুভ ইন্দ
পিন কল হিতাসুবাণি ওন টাবনু কুমাতদ ॥'

অর্থাৎ—

মধুসন্ধানী মৌমাছি যেমন মধুর খোঁজে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, বনের শত বিকশিত ফুলদল তাকে যেমন হাতছানি দিয়ে আহ্বান জানায় ফুলের সৌরভ ছড়িয়ে আর মধুপেয়ী মক্ষিকাটি যেমন বেপরোয়া দিশাহারার মত ভিন-দেশী কুসুমের গন্ধে মুগ্ধ হয়ে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিভোর আত্মহারা হয়ে আর যেমন আকণ্ঠ মধুপান করতে থাকে,। আমিও তেমনি সৈনিক কবি, তোমার প্রেমে মুগ্ধ মাতোয়ারা হয়েছিলাম। রাজার হস্তে আজ তুমি বন্দী। ওগো প্রিয়, ললাটের ঘর্মরেখার মত দুঃখকে তুমি ফেল মুছে। কাতর অনুরোধ, দয়িত আমার।

কবি প্রত্যুত্তরে মুগ্ধা রাজমহিষীর নিকট লিখে পাঠালেন :

লঙ্কাধিরাজ যাঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে উদ্যান থেকে যাঁকে তুলে এনেছেন আর যাঁর পায়ে আপনার দশ শির নত করে দিয়েছেন ; আর যাঁর অমৃত সন্ধানে প্রেমোৎসবে স্বর্গের দেবতারা পর্যন্ত ধেয়ে আসেন কোন এক মত্ত প্রেমিক চপলতাবশে যদি সেই প্রেমবহ্নিশিখায় ঝাঁপিয়ে পড়ে থাকে তাতে অনুতাপের কি আছে ? এক মস্তকের বিনিময়ে মুহূর্তেই যে দুর্লভ সুখ সম্পদ আমি পেয়েছি আমার দয়িতার কাছে, জাগরূহ হয়ে থাকবে তা চিরকাল।

কাণ্ডীর রাজমহিষীর মত আরও অনেক সিংহলী মহিলা কবি কাব্য-জগতে যশস্বী হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রাজা বিমল ধর্ম সূর্যর পত্নীর নাম উল্লেখযোগ্য। নিশান্তে প্রসাধনরতা রাজমহিষীকে কৌতূহলবশে দয়িত শুধালেন :

'কাল মধুযামিনীতে তুমি যে বড় ঈষৎ উষ্ণ গোলাপ নির্ঝরে অবগাহন করে সর্বাংগে চন্দন ও সুবাসিত কর্পূর লেপন করে প্রসাধনপর্ব সমাধা করেছিলে, তুমি কি মদন-অভিসারে গিয়েছিলে কাল ?'

রাণী তাঁর উত্তরে স্মিত হাস্যে জবাব দিলেন :

'আমি যে রাজা বিমল ধর্ম সূর্যর আগমন প্রতীক্ষায় ষোড়শোপচারে এ দেশীয় মঙ্গলঘট সাজিয়ে ব'সে আছি। রাজাধিরাজ আমার গিয়েছেন যুদ্ধ জয়ে। অপরাপর রাজন্যবর্গকে ভূলুণ্ঠিত করে তিনি আজ ফিরে আসছেন জয়রথে চ'ড়ে।'

বালভত্তল মহাত্মায়ু এমনি অপর এক কাণ্ডীর মহিলা কবি। তাঁর 'অনুরাগমালা' কাব্যে বহু প্রেমগীতি লিপিবদ্ধ আছে। সিংহলী সাহিত্যের মহিলা কবিদের মধ্যে যিনি সবিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন তাঁর নাম গজামন নোনা। গজমন নোনা অবশ্য তাঁর ছদ্ম নাম। কবির পুরো নাম দোলহ ইসাবেলা পেরুমল। সিংহলের দক্ষিণ অঞ্চলে তাঁর জন্ম। কবি গজমন নোনাকে কেন্দ্র করে বহু প্রেম-কাহিনী রচিত হয়েছিল। সিংহলী সাহিত্যে প্রেমমূলক বহু কবিতা ও গান তাঁরই রচনা বলে জানা যায়। তাঁর নিকট প্রেম নিবেদনের বহু জনশ্রুতির কথাও প্রচলিত আছে। অলপত মুদালি ছিলেন কবির মুগ্ধ এক ভক্ত। কার্যব্যাপদেশে দূর দেশে যাবার আগে ভক্ত তার কবি-প্রিয়াকে ছন্দাকারে লিখে পাঠালেন :

'কার্য উপলক্ষে যদিও আজ আমাকে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে দীর্ঘ দিনের জন্য, ওগো প্রিয়া, আশা করি তুমি অপর কোন যুবকের প্রতি কামাতুর হৃদয়ে তাকাবে না। সোহাগ বিনিময় করবে না কারও প্রতি। তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যদি কেউ এগিয়ে আসে, প্রত্যাখ্যান কর তুমি তাকে। আমার কথাগুলি যেন তুমি স্মরণ রেখো, ওগো মেয়ে!'

ঈর্ষাতুর মুগ্ধ যুবকের এই উপদেশাবলীর প্রত্যুত্তরে কবি গজমন নোনা লিখে পাঠালেন:

'গাঁয়ের যে পথ দিয়ে যাবে, হে প্রভু, সে গাঁয়ের যদি কোন মেয়ে পড়ে যায় তোমার সুনজরে, মজে যেও না যেন তুমি তার প্রেমে। শীঘ্র তুমি ফিরে এস। তোমার কথা—তোমার উপদেশ সদাসর্বদা রাখব আমি মনে, কিন্তু হায়—কিন্তু হায়, পঞ্চশরে দগ্ধ হয়ে কতকাল আর থাকব, ওগো বল?'

সিংহলী মহিলারা যে স্ত্রী-স্বাধীনতায় পুরুষের সমকক্ষ এবং বুদ্ধিচর্চায় যে পুরুষের চেয়ে ন্যূন নন তারই পরিচয় বুঝি গজমন নোনার এ প্রত্যুত্তরে নিহিত রয়েছে। শুধু গীতিকবিতা নয়, আবেদনমূলক কাব্য রচনাতেও তিনি প্রথিতযশা ছিলেন। তিলোকরত্ন মুদালি কিংবা জন ডি'ওলির নিকট লেখা তাঁর কাব্যাকারে আবেদনাবলী এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। 'কবি' ও 'এলুমিল' পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ তাঁর তিলকরত্ন মুদালির নিকট লিখিত আবেদনটির শ্লোকসংখ্যা আটান্ন। প্রথমাংশে তিনি পৌরশাসক মুদালির গুণকীর্তন করে শেষাংশে তাঁর নিজস্ব আবেদন পেশ করেন—আপন দুঃখ দুর্দশার কথা এবং সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে অর্থাভাবের কথা জানিয়ে কর্তৃপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করেন। পরের আবেদনেও ইংরেজ শাসক জন ডি'ওলির প্রশস্তি গেয়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান:

'শিশু সন্তানগুলি ক্ষিদের জ্বালায় করছে হাহাকার। মাগছে ওরা এক মুঠো অন্ন। মা হয়ে আমি কচি কচি ছেলেপিলেদের মুখে এক মুঠো ভাত দিতে পাচ্ছি না।' এ দৈন্য দুঃসহ, কবি তাই ইংরেজ শাসকের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করে আবেদন করেছেন কাব্যাকারে এবং পরিশেষে জানিয়েছেন, এ সাহায্যের জন্য মঙ্গলময় তাঁর মঙ্গল সাধন করবেন।

ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব

পালি ও সংস্কৃতের সঙ্গে সিংহলী ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। ভারতের এ দুই প্রাচীন ভাষায় লিখিত বহু গ্রন্থের প্রভাব ও তাদের অনুকরণে বিবিধ গ্রন্থ সিংহলে রচিত হয়েছিল পূর্বেই বলা হয়েছে। সিংহলে আর্য সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে—খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে—রাজা দেবানন পিও-পিশার সপারিষদ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবার পরেই সাগরদ্বীপ সিংহলে লিখন পঠন অনুশীলনের চর্চার সূচনা হয়। ভারত থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সিংহলে ধর্মপ্রচারে আসবার সময় সঙ্গে করে মূল পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ 'পিটক' (প্রভুর মুখানঃসৃত বাণী) ও অপরাপর ধর্মগ্রন্থ সঙ্গে করে আনেন। এ ধর্মগ্রন্থগুলি পালি বা মাগধী ভাষায় রচিত। তাঁরা কিন্তু সিংহলী শিষ্য-শিষ্যাদের বুঝবার সুবিধার জন্য তাদের টীকা টিপ্পনীগুলি স্থানীয় সিংহলী ভাষায় লিপিবদ্ধ করে যান। এ ছাড়া ধর্মবিষয়ক, ঐতিহাসিক বিবরণ আর 'অথথকতা' শ্রেণীর কিছু কিছু নীতি কথাও সিংহলী ভাষায় তখন লিপিবদ্ধ হয়। এ অথথকতাগুলি মূল 'পিটকে'র অনুরূপ নয়। বরং লোককথার ছলে ধর্ম-ব্যাখ্যা বলা যায়।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে মহানামের রাজত্বকালে মহাপণ্ডিত বুদ্ধঘোষ সিংহলে আগমন করেন ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশে। অনুরাধাপুরে অবস্থান কালে তিনি থেরাবাদ বুদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠ এবং বৃহত্তম সংক্ষিপ্তসার 'বিশুদ্ধিমাগ্‌গ' পালি ভাষায় রচনা করেন। পালি ত্রিপিটকে কিছু কিছু টীকা টিপ্পনীও সিংহলী ভাষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে রচনা করেন। মহানাম, ধর্মপাল, উপসেন প্রমুখ অনেক বৌদ্ধপণ্ডিতই বুদ্ধঘোষের আরব্ধকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। খৃষ্টীয় দশম শতক পর্যন্ত এ সব পালি ভাষ্যের চর্চা চলে। কিন্তু তারপর থেকে সিংহলী পণ্ডিতের নিকট তাদের কদর অনেকটা কমে আসে।

বুদ্ধঘোষের অর্ধশত বৎসর পর রাজা ধাতুসেনের আমলে পণ্ডিত মহানামথেরা বিশুদ্ধ পালি ভাষায় মহাবীরের কুলপঞ্জী 'মহাবংশ' রচনা করেন সংস্কৃত মহাকাব্যের অনুকরণে। সিংহলী পণ্ডিতেরা সংস্কৃত কাব্য ও ছন্দকে এ সময় বিশেষ করে রপ্ত করে নেন। সংস্কৃত 'মহাকাব্য' 'জানকী হরণ' রচনা করেন সিংহলী কবি কুমারদাস। তাঁকে ষষ্ঠ শতকের রাজাকুমার ধাতুসেনের সঙ্গে অনেকে একই ব্যক্তি বলে অনুমান

করে থাকেন। ভারত থেকে আগত বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা যে সব পালি ব্যাকরণাদি রচনা করেছিলেন তাদের কদরও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে এর পর। আর তার পরিবর্তে সংস্কৃত কাতন্ত্র ব্যাকরণের ভিত্তিতে নতুন করে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হতে থাকে। এ সময় বুদ্ধদত্ত থেরা 'বিনয়ভিনিক', 'উত্তর ভিনিচ্চ' ও 'অভিধর্মাবতার' নামে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 'ক্ষুদ্রশিখা' গ্রন্থের রচয়িতা 'ধম্ম'শরি' কিংবা 'মূলশিকা' প্রণেতা মহাস্বামীর জন্মকাল সম্পর্কে সঠিক কোন প্রমাণ জানা যায় না। তবে পরবর্তীকালের সিংহলী ভাষ্যকারদের মতে তাঁরা দশম শতকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে প্রকাশ। এ শতকেই উত্তরমূলা অনুরুদ্ধ থেরা 'অভিধম্মাত্তসংগহ' নামে একখানি গ্রন্থ এবং অনুরুদ্ধ শতক নামে একটি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন। অভয়াগিরির আনন্দ থেরা পালি কাব্যগুলিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পালি কাব্য 'জিনালংকার' কখন রচিত হয়েছিল সম্পূর্ণ জানা যায় না। তবে এ কাব্যখানি বুদ্ধরক্ষিত থেরার রচনা বলে পণ্ডিতদের বিশ্বাস।

রাজা প্রথম পরাক্রমবাহুর (১১৫৩—১১৮৬) রাজত্বকালে বনচারী দিম্বুলগল সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতেরা বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাদের মধ্যে মহাকাশপ থেরার রচিত 'বাল ভো বোধন' (সংস্কৃত চন্দ্র ব্যাকরণের সংক্ষিপ্তসার), তাঁর শিষ্য (মোগ্গলন থেরা লিখিত পালি মোগ্ অভিধান দীপিকা, এবং তাঁর আর এক শিষ্য কর্তৃক লিখিত 'সারওদীপানি' সারওমঞ্জুষা প্রভৃতি পালি টীকা গ্রন্থগুলি সিংহলের প্রাচীন সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদ। মহাকাশপ থেরার সমসাময়িক আর এক সিংহলী ভিক্ষু রত্নামতী চন্দ্রব্যাকরণের এক পঞ্চিকা বা ভাষ্য রচনা করেন। সারিপুত্ত এই ভাষ্যের এক টীকা সংযোজন করেন। মোগ্গলনের শিষ্য পিওদশী থেরা এবং সারিপুত্তের অপরাপর বহু শিষ্যের রচনাও এ সাহিত্য সম্পদকে অধিকতর সমৃদ্ধতর করে তোলে। কবি সংগরক্ষিত, ও কবি ধম্মকীত্তি প্রমুখ অনেকের অবদানও তুচ্ছ নয়। কবি ধম্মকীত্তি রাণী লীলাবতীর (খৃষ্টীয় ১২১১) রাজত্বকালে এ কাব্য রচনা করেন।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এ সাহিত্য-কর্মের অনাবিল ধারা অব্যাহত থাকে। এ সময় সিংহলী কাব্য রচনার প্রথম কাল বলা যায়। রাণী লীলাবতী ও তাঁর মন্ত্রী কীর্তির পৃষ্ঠপোশকতায়

'শশদাভত মুভদেভদাভত' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ ঐ সময় রচিত হয়। 'অমত্তুবহ' কাব্য রচয়িতা কবি বিদ্যাচক্রবর্তীও এ সময়কার বলে পণ্ডিতদের বিশ্বাস। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে পোলোন্নরুভ মগধ-সম্রাটের রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল নতুন রাজধানী ধম্বদেনিয়তে স্থানান্তরিত হয়। রাজা দ্বিতীয় পরাক্রমবাহু (১২৩৬—৭১) এ নতুন সংস্কৃতি-পীঠের পুরোধা ছিলেন। কবিখ্যাতির জন্য তিনি নিজেও প্রসিদ্ধ ছিলেন, ইতপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 'বিশুদ্ধিমাগ্গ' প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ সন্নয় গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। রাজা ও তাঁর প্রধান মন্ত্রী দেবপতিরাজের এই পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বহু মননশীল গ্রন্থ তখন আত্মপ্রকাশ করে। ধম্মকীত্তি থেরা প্রথম পরাক্রমবাহুর রাজত্বকাল পর্যন্ত 'কুলবংশে'র জের টেনে চলেন। বুদ্ধপিও থেরা এ সময় কাক্কয়ন ব্যাকরণ অবলম্বনে 'রূপসিদ্ধি' ও এক পালি কাব্য রচনা করেন। গৌতম থেরা, বিদেহ থেরা, ময়ূরপদ থেরা, ধম্মসেন, বানরত্ন মেধাংকর প্রমুখ বহু পণ্ডিত ঐ সময় জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভাষালংকার বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। পালি ও সিংহলের ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। চতুর্থ পরাক্রমবাহুও এ সাহিত্যানুশীলনের পুরোধায় ছিলেন। তিনি সিংহলী ভাষায় জাতক কাহিনীর অনুবাদে ব্রতী হন। মহাবোধি বংশ, অনাগতবংশ, মূর্খশতক প্রভৃতি বহু পালি পুস্তক তখন সিংহলী ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। সিংহলী ভাষায় এখনকার প্রাচীনতম সন্দেশকাব্য ছন্দাকারে এ কালে অনূদিত হয়।

তথাগত বুদ্ধের জন্মবৃত্তান্ত ও মহিমা কীর্তন করে সেকালের সিংহলের কাব্য সাহিত্যের অনেকখানি স্থান জুড়ে ছিল তা পূর্বেই বলা হয়েছে। শুধু কাব্য সাহিত্য নয়, সিংহলী গদ্যের সূচনাতেও এমন বহু বৌদ্ধ কাহিনী ও ধর্মানুশীলন গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তাদের অনেকগুলি আজ অনাদর উপেক্ষায় লুপ্ত হয়ে গেছে। যে কয়টির সন্ধান আজ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে গুরুলুগমির বৌদ্ধ-নীতি পরিকথা 'অমরাবাতুরা' (সুধারস বন্যা) বুঝি সবিশেষ খ্যাত। গুরুলুগমি তাঁর গ্রন্থ প্রদীপিকায় বৌদ্ধ-জীবন চরিতের কয়েকটি ঘটনা—বিশেষ করে জটিলাকে বশীভূত করার কাহিনী এবং ব্রাহ্মণ দ্রোণর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের কথা সবিস্তারে উল্লেখ করে

গেছেন সহজ কথায়। এ ধর্মগ্রন্থের অধ্যায় সংখ্যা আঠারো। প্রথম অধ্যায়ে নানা সূত্রের টীকা-টীপ্পনি সহ গুরুলুগমি প্রায় দুই শতাধিক জাতক কাহিনীর সারমর্ম লিপিবদ্ধ করেছেন। গুরুলুগমির এ গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য কেবল বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা নয়। তিনি নানা কথা ও কাহিনীর ছলে 'কর্মের প'রিণামও ব্যাখ্যা করে গেছেন বিশেষ করে অংগুলিমালা কাহিনীতে।

অমরাবাতুরার মত আর একখানি বৃহৎ গ্রন্থ 'পূজাবলিয়' বা পূজা-আর্চার ইতিহাস। ময়ুরপদ থেরা এ সুবৃহৎ গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি নিজেকে বৌদ্ধপুত্র বলে পরিচয় দিতেন। এই গ্রন্থে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিবিধ আচার অনুষ্ঠানের কথাও জানা যায়। পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি যে 'শাসন' ধর্ম-ক্রমে প্রবেশ করেছিলেন এবং নিজেও যে একজন ধর্মপ্রচারক ও সুচিকিৎসক ছিলেন তার উল্লেখও রয়েছে। ধর্ম-ব্যাখ্যাই এ পূজাবলী গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য।

'পূজাবলিয়' গ্রন্থাকারে প্রকাশের চার শত বৎসরের মধ্যে 'সারার্থ-সংগ্রহ' গ্রন্থ সংকলিত হয় খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে। বলিভিতার শরাননকার সংগরাজ ছিলেন এর প্রণেতা। শুধু বৌদ্ধনীতিশাস্ত্র নয়, সিংহলের সাংস্কৃতিক জীবনের এক অভিব্যক্তি প্রতিফলিত হয়েছে সুবৃহৎ এ গ্রন্থে। সংস্কৃত ও পালির মূল সূত্র উদ্ধৃত করে টীকা টিপ্পনী সহ বুদ্ধ-ঘোষের 'বিশুদ্ধিমাগগ', বৌদ্ধশিষ্য সারিপুত্ত প্রমুখ অনেকের সাহিত্য কীর্তির সারাংশ সংগৃহীত হয়েছে এ অপূর্ব পুঁথিতে। সিদ্ধার্থ বুদ্ধরক্ষিত কর্তৃক রচিত শ্রী-সধর্মভাব-সংগ্রহভ (Sri-Saddharmāvavā-sangrahava)—সুনীতিসংগ্রহমালা এবং 'সর্বজ্ঞানগুণালঙ্কারায়' প্রভৃতি গ্রন্থ এ প্রসংগে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'অমৃতবাহ' বা অমৃতপ্রবাহ কিংবা 'তুংশরণ', 'বুদ্ধশরণ' (বুদ্ধের শরণ), 'ধর্ম শরণ' এবং 'সঙ্ঘশরণ' প্রভৃতি ধর্মমূলক গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের মর্মকথা সংক্ষেপে বিবৃত রয়েছে।

লোক কথা ও কাহিনী

'সধর্মরত্নাবলীভ' গ্রন্থই বৌদ্ধজন্মকাহিনী অবলম্বনে লিখিত গদ্য রচনাবলীর মধ্যে বুঝি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। থেরা ধর্মসেন এ সুপ্রসিদ্ধ

রত্নাবলী গ্রন্থের লেখক ও সংগ্রহকার। পালি ধম্মপাদ কাব্যগ্রন্থের টীকা ও অন্বয় অবলম্বনে এ সুবৃহৎ রত্নমালার কাহিনীগুলি সংযোজিত ও সংকলিত হয়েছে। সিংহলী গদ্যে এ পৌরাণিক কাহিনীগুলি বহু পঠিত ও প্রসারিত। সিংহলের ধর্ম-কর্মে ও বিবিধ পূজা অনুষ্ঠান উপলক্ষে এ কাহিনীগুলি সচরাচর আলোচিত হত। এ গ্রন্থের প্রারম্ভে ধর্মসেন উল্লেখ করেছেন যে সিংহলী ভাষায় ধম্মপাদ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে তিনি পালিগ্রন্থের অনুবাদের আশ্রয় নেবেন না। সিংহলী ভাষাতেই কাহিনীগুলি জনসাধারণের সহজ উপলব্ধির জন্য লিপিবদ্ধ করে যাবেন। থেরা ধর্মসেন তাই পূর্বসূরী গুরুলুগমীর মত পালি ধর্মশাস্ত্র থেকে সরস কাহিনীগুলি এমন লিপিকুশলতার সঙ্গে বিবৃত করে গেছেন যা বারবার পাঠ করলেও কখনও ক্লান্তি বোধ হয় না। পুরাতন বলে ঠেকে না। শুধু তাই নয়, কাহিনীগুলিও পর পর এমন করে সাজান যে মনে হয় তারা যেন একই সূত্রে গাঁথা। ধর্মসেনের এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে দেখা যায় "মিলিন্দ-পাল্হ"-র উপক্রমণিকার অংশবিশেষ থেকে সংগৃহীত নাগসেনের কাহিনী। 'দীঘানিকায়', 'সুত্তনিপাত', 'বুদ্ধবংশ', প্রভৃতি রচনাবলী থেকেও ধর্মসেন তাঁর আখ্যায়িকার উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এ গ্রন্থে উপাখ্যান সংখ্যা প্রায় তিনশতাধিক। চক্ষুপাল-থেরা উপাখ্যান দিয়েই এ অপূর্ব গাথার প্রারম্ভ। প্রতিটি গাথাই নীতিকথা দিয়ে শুরু এবং নীতিকথাতেই তার শেষ।

ধর্মসেন রচনার নিদর্শন স্বরূপ একটি উপাখ্যান বিবৃত করা যাক এখানে সংক্ষেপে। উপাখ্যানটি সুপরিচিত বৌদ্ধ পালি জাতক কাহিনী: 'মত্তকুণ্ডলী'। কাহিনীটি হল: অদানপূর্বক ছিলেন অতি কৃপণ এক ব্রাহ্মণ। তাঁর হাতের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে জীবনে বুঝি কখনও এক ফোঁটা জল গড়ায় নি। তাঁর ছিল এক ছেলে। ছেলেকে তিনি আন্তরিক ভাবে ভালবাসলেও ছেলের জন্য পাই কপর্দকও তিনি কখনও খরচ করেন নি। এমনি ছিলেন তিনি জাতকৃপণ। এক বার হয়েছে কি, ছোট ছেলেটিকে একটি কর্ণ কুণ্ডল তৈরী করে দিতে তাঁর খুব ইচ্ছা হল। কিন্তু কুণ্ডল তৈরী করতে গিয়ে স্যাকরা পাছে কিছু বকরা চেয়ে বসে, এই ভয়ে কৃপণ ব্রাহ্মণ করলেন কি, নিজেই সেই কর্ণকুণ্ডল বানাতে বসে গেলেন। স্যাকরার হাতের কাজ বামুন ঠাকুর পেরে উঠবেন

কি করে? ফলে ছেলের কর্ণকুণ্ডলীর যে শ্রী দাঁড়াল তা দেখে লোকে ত হেসে বাঁচে না। ঐ কিম্ভূতকিমাকার শ্রীহীন কুণ্ডলী-পরা ছেলের নাম দিলে সবাই মত্তকুণ্ডলী। দিন যায়। ছেলে একদিন বড় রকমের অসুখে পড়ল। কিন্তু ছেলেকে সারিয়ে তুলতে হলে কবিরাজ মশায়কে ওষুধপত্রের জন্য শুধু শুধু এক কাঁড়ি পয়সা দিতে হয়। কৃপণ ব্রাহ্মণ তাই করলেন কি, রুগ্ন অসুস্থ ছেলেকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে রাস্তার চৌমাথায় দিলেন শুইয়ে। দয়া করে কেউ যদি ওষুধ-পত্র খাইয়ে বাঁচিয়ে তুলে ভালই। আর যদি মারাই যায়, তাহলে শবযাত্রা ও তার আনুষঙ্গিক খরচ পত্র থেকে অন্ততঃ রেহাই পাওয়া যাবে। হলই বা—ছেলেটি তাঁর একমাত্র সন্তান, আর তাঁর নিজের বিপুল অর্থের অভাব নেই। এখন হয়েছে কি, সেদিন সে রাস্তা দিয়ে তথাগত বুদ্ধদেব যাচ্ছিলেন যেন কোথায়। তিনি রোগযন্ত্রণা কাতর বালকের আর্ত গোঙানির শব্দ শুনে দয়াপরবশ হয়ে এগিয়ে গেলেন ছেলেটির কাছে। ছেলেটি তখন তার রোগ যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে চোখ মেলে তাকাল ভগবান তথাগতের দিকে। তারপর সে যখন তার চোখ বুজল, ভগবানের কৃপায় সে তখন সব রোগ শোকের হাত থেকে মুক্তি পেল। আর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে জন্ম নিল স্বর্গের নন্দন কাননে। ধম্মপাদ ভাষ্যের এ কাহিনীতে দেখান হয়েছে যে, ভগবান তথাগতকে যারা একবার মানস চক্ষে অবলোকন করে তারাও পার পেয়ে যায় জরা-মৃত্যু-শোক-হাহাকারময় এ মর পৃথিবী থেকে। ধর্মসেন ভারতীয় পালি গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত এ উপখ্যানে স্থানীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে গিয়ে সময়ের অসংগতির পরিচয় দিয়েছেন স্থানে স্থানে। যেমন, বিশাখার 'ববাহ উৎসব খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকেই ভারতে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ধর্মসেন তাঁর সিংহলী ভাষ্যে এক স্থলে উল্লেখ করেছেন যে কোশল রাজ যুবরাজ, সেনা বিরাগ (প্রধান সেনাপতি), লংকাধিকার, দেমাল অধিকার, মুদালপাত (খারাঞ্জি) সহ এ বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করতে এসেছিলেন। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে লংকাধিকার দেমাল-অধিকার প্রভৃতি রাজ-অমাত্যদের সৃষ্টি সিংহলের রাজবংশ তালিকায় খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে হয়েছিল। সুতরাং ধর্মসেনের 'রত্নাবলী' এ্যানাক্রনিজ্‌ম্ দোষে দুষ্ট। তবুও কিন্তু তাঁর রত্নাবলী গ্রন্থখানি সিংহলী গদ্যের এক স্মরণীয় সাহিত্য-কীর্তি।

দেবরক্ষিত জয়বাহু ধর্মকীর্তির সধর্ম অলংকারায়, জয়বাহু ধর্মকীর্তির শিষ্য বিমলকীর্তি রচিত 'সধর্মরত্নকারয়' (সভ নীতির রত্নাকর) প্রভৃতি রচনাতেও পালিজাতক কাহিনী অবলম্বনে বৌদ্ধনীতিশাস্ত্রকে লোকপ্রিয় উপখ্যানের মারফত তুলে ধরা হয়েছে। বিমলকীর্তির এ রত্ন অলংকারায় ৩৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। অলংকারায় গ্রন্থের মত প্রতি অধ্যায়ের শেষে নীতিমূলক একটি করে পালি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বৌদ্ধের অঙ্গচতুষ্টয়-রূপকায় ধর্মকায়, নিমিত্তকায় ও শুন্যকায়—বিবিধ বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। 'চতুর্থসত্য' বিষয়ক আলোচনাও সংযোজিত হয়েছে। তা ছাড়া জম্বুদ্বীপের বর্ণনা পিটক গ্রন্থ ও তাদের ভাষ্যের উল্লেখও দেখা যায়। এ গ্রন্থেরই সপ্তম অধ্যায়ে রাজা মিলিন্দ ও নাগসেনের পূর্ব-জন্মকার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এ কাহিনী মিলিন্দ-পন্হ্ উপাখ্যানের অংশ বিশেষের সিংহলী ভাষান্তর মাত্র। লেখক বিমল কীর্তির এ গ্রন্থে ধর্মসেনের 'রত্নাবলীর'ও অনেক কাহিনী আর উপখ্যানের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। অষ্টম অধ্যায়ে নন্দ-কাহিনীটি সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। নন্দ ধর্মপ্রচারকার্যে স্বয়ং বুদ্ধদেবের কাছ থেকে যে সপ্রশংস অভিনন্দন অর্জন করেছিলেন তারও উল্লেখ আছে। শেষ অধ্যায়ে দেখা যায় দান ধর্মের সুকৃতির ফলাফল সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। কাঠবিড়ালী রূপে বোধিসত্ত্বের পূর্বজন্মের বৃত্তান্তটির পুনরুল্লেখ করে এ গ্রন্থের আলোচনা এখানেই শেষ করা যাক।

পূর্বজন্মে বোধিসত্ত্ব একবার কাঠবিড়ালীরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কাঠবিড়ালীটি বনের এক ঝোপে বাসা বেঁধে তার বাচ্চ-বাচ্চা নিয়ে সুখে কালাতিপাত করছিল। একদিন হয়েছে কি, মুষলধারে ঝড় বৃষ্টির পর জলের তোড়ে তার ছোট্ট বাসাটি ভেসে চলল সমুদ্রের দিকে। কাঠবিড়ালীরূপে বোধিসত্ত্ব তখন তাঁর শাবকদের প্রাণরক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন। এবং করলেন কি, তিনি তাঁর ছোট্ট পুচ্ছটি সমুদ্রের জলে বার বার চুবিয়ে সমুদ্রের জল নিঃশেষিত করতে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। দেবাদিদেব শকার তাই দেখে ছদ্মবেশে কাঠবিড়ালীর নিকট এসে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন এভাবে সমুদ্রের জল শুষিয়ে নেবার অর্থ কি? শোকাতুর কাঠবিড়ালী তখন ছদ্মবেশী দেবাদিদেবকে তার দুঃখের কথা জানালে। এবং জানালে, নিজের ল্যাজ দিয়ে সমুদ্রের

জল শুষ্ক করে বন্যার জলে ভেসে আসা তার সন্তান সন্ততিদের উদ্ধার সাধন করার সংকল্পও। দেবাদিদেব শকার তখন কাঠবিড়ালীকে তার এই পণ্ডশ্রমের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং বললেন, এভাবে সমুদ্রের জল শোষণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু কাঠবিড়ালীরূপী বোধিসত্ত্ব আগন্তুকের কথায় কর্ণপাত করলেন না এবং আপন সংকল্পে অটুট থেকে নিজের ক্ষুদ্র ল্যাজ বার বার চুবিয়ে সমুদ্রের জল কমাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ছদ্মবেশী দেবাদিদেবও কাঠবিড়ালীরূপী বোধিসত্ত্বের এ অটুট সংকল্পে তুষ্ট হলেন এবং সমুদ্রের তলদেশ থেকে কাঠবিড়ালীটির শাবকদের উদ্ধার করে শোকাতুর পিতার হস্তে অর্পণ করলেন।

শ্রাবক-যান (Sravaka-yana) বা হীনযান বৌদ্ধধর্মই সিংহলে প্রচলিত হয়েছিল। বৌদ্ধত্ব-প্রাপ্তি বুঝি তার আদর্শ নয়। নির্বাণ লাভই একমাত্র লক্ষ্য। কাজেই সিংহলী বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বোধিসত্ত্ব-আদর্শবাদ প্রত্যাশা করা অনুচিত, অন্তত তার গোড়ার দিকে। মহাবংশ বৌদ্ধধর্মের প্রধান পুরোহিত। রাজা দত্তগামিনি বোধিসত্ত্বরূপে পরিগণিত ছিলেন না। সিংহলের বংশতালিকানুক্রমে তিনি কেবল অনাগত বুদ্ধ—মৈত্রেয় রূপে পরিচিত ছিলেন। সিংহলীরা বৌদ্ধধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান ভাবাবাদ ব্যাতিরেকে বুঝি আর কিছুতেই তুষ্ট ছিলেন না। তাই মহাজন বৌদ্ধবাদের শেষ লক্ষ্য বোধিসত্ত্ববাদের আদর্শ সিংহলী বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচারিত হয়। অবলোকিতেশ্বরনাথ হিসেবে বোধিসত্ত্ব পূজিত হতেন। রাজা-মহারাজারা বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাশ্রয়ী রূপে বিবেচিত হতেন। চতুর্থ শতকে প্রাচীন নৃপতি শীরি সজ্ঘবোধি বোধিসত্ত্বের সর্বগুণালঙ্কারে ভূষিত হয়েছিলেন বলে কথিত আছে। তাঁর জীবন চরিতকে কেন্দ্র করে বহু ধর্মমূলক কাহিনী প্রচলিত আছে। বুদ্ধের প্রতিনিধিরূপে বহু রাজাকে আদর্শান্বিত করা হয়েছে; তার নিদর্শন বুঝি সিংহলী সাহিত্যে বিস্তর পাওয়া যায়। কাণ্ডীর জনৈক নৃপতিকে বুদ্ধ-ভগবানরূপে যে সংবর্ধনা করা হয়েছিল তার উল্লেখও অনেকস্থলে দেখা যায়। শুধু রাজা মহারাজাদের প্রশস্তি আর বোধিসত্ত্ব-ভাবাবাদকে আশ্রয় করে জাতক কাহিনীগুলি দানা বেঁধে ওঠে নি, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার জারক রসে তারা জারিত। নাটক-নভেল্স বা কাহিনী-উপাখ্যান যে সময় লিখিত হয় নি তখন এ জাতক-উপাখ্যানগুলি সিংহলের আপামর

জনসাধারণের মনে শিকর গেঁড়ে বসে। তাদের দৈনন্দিন জীবন-ধারায় সুখ দুঃখ হাসি কান্নার যে খোরাক জুগিয়েছিল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সিংহলী সাহিত্যে তাই জাতক কাহিনীগুলি আপন মহিমাগুণে মহিমান্বিত।

পালি জাতকের টীকা ও ভাষ্যের অনুবাদ থেকে প্রমাণিত হয়, জাতক কথাগুলি পাঠ্যপুস্তক হিসাবেও একদা অধীত হত। পালি ভাষার প্রাচীনতম কবিতা কিংবা প্রাপ্ত গদ্য রচনাও এ জাতক কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল বলে দেখা যায়। সিংহলী ভাষায় জাতক-কাহিনীগুলি অনূদিত হবার পূর্বেই কোন কোন জাতক কথার উল্লেখ দেখা যায়। গুরুলুগমিনী তাঁর 'অমাবতুর' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে এমনি প্রায় ২০৮টি জাতক কথার নামাকরণ করেছেন যে সব ক্ষেত্রে বুদ্ধকে দেখা যায় 'অপরের হৃদয়কে তিনি অভিভূত করেছেন'। পরাক্রম-পণ্ডিত তাঁর 'থুপবংশয়' গ্রন্থে পরামিতা জাতকের উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন। বিদ্যাচক্রবর্তীর 'বুৎশরণ' ও 'ধর্মশরণে'ও কোন কোন জাতক কাহিনীর অস্তিত্বের কথা জানতে পাওয়া যায়। ধর্মসেন তাঁর 'রত্নাবলী'তে জাতকের উল্লেখ করেছেন—এমন কি তাঁর 'উপমাবলী'তেও। এ ছাড়া অনেক জাতক পাণ্ডুলিপি আকারেও সিংহলী ভাষায় ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল। তাদের ভাষা ও বচনভঙ্গী ছিল অনেকটা প্রাচীন ও অপ্রচলিত। 'উম্মাগগজ্জাতক'ই তার নিদর্শন।

কুরুনাগলের চতুর্থ পরাক্রমবাহুর রাজত্বকালে (খৃষ্টীয় ১৩০৩-৩৩) সিংহলী ভাষায় সর্বপ্রথম সমগ্র জাতকের অনুবাদ কার্য সম্পন্ন হয়। কথিত আছে পালি থেকে জাতক কথাগুলি অনূদিত হলে রাজা পরাক্রম-বাহু সে রচনাগুলি রাজ্যের জ্ঞানবৃদ্ধ জ্যেষ্ঠদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন এবং পড়ে শুনান। থেরা মেধাঙ্করকে তিনি এ অনুবাদগুলির রক্ষণাবেক্ষণের কার্যে নিযুক্ত করেন। তাঁর শিষ্যবর্গদের মধ্যে তাদের প্রচার ও ঐতিহ্যধারা অব্যাহত রাখতে নির্দেশ দেন। জাতক কাহিনীগুলি রাজাকে এমনি বিমোহিত করে তুলেছিল যে সারা রাত্রি ধরে তিনি এ ধর্মকাহিনীগুলির পাঠ শুনতেন। এ 'জাতক-পোতা'র অনুবাদ ও প্রচারে দুজন রাজমন্ত্রীর দানও নগণ্য ছিল না। এ রাজমন্ত্রিদ্বয় হলেন বীরসিংহ-প্রতিরাজ এবং পরাক্রম। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের এক

শিলা লিখনে তাঁদের এই অমর কীর্তির কথা স্বাক্ষর দিচ্ছে প্রস্তর খণ্ডে খোদিত হয়ে।

সমগ্র জাতককথা সংগ্রহের পূর্ণ বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। উইনটারনিম্, চ্যালমারস, ফ্রান্সিস, নীল ও রুস (Rouse) প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের রচনায় এ অমর কাহিনীগুলি লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এ জাতক কথাগুলি যুগ যুগ ধরে সিংহলের সাহিত্যকে শুধু আবরণ ও আভরণ দান করেনি, তারা ছিল সিংহলী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণসত্তা—তার পূর্ণ অবয়বের ফল্গুধারা। সিংহলী ধ্যান-ধারণা ও ধর্ম-কর্মের মূর্ত প্রকাশ।

তথ্য-সাহিত্য

ডঃ সি, ই. গোদাকুম্বর (Dr. C. E. Godakumbura) তাঁর সুবিখ্যাত সাহিত্য-কীর্তি 'সিংহলীজ লিটারেচার' গ্রন্থের এক স্থলে যথার্থই মন্তব্য করেছেন, ভারতীয় সাহিত্যে ঐতিহাসিক তথ্যমূলক রচনার অভাব যে দেখা যায় তার মূল কারণ, ভারতীয় লেখকেরা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃত সাহিত্য মূল্যায়নে পরাঙ্মুখ। ইতিহাস আর কিংবদন্তীর মধ্যবর্তী বিপুলায়তন পার্থক্যকে যাচাই করতেও তাঁরা বুঝি অপারগ ছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের এই অপূরণীয় অভাব কিন্তু সেকালের সিংহলী লেখকদের রচনায় বড় দেখা যায় না। বৌদ্ধ ধর্মের ধারক ও বাহকরা অল্পবিস্তর সকলেই প্রায় 'স্বাস্থ্যবিশারদ' ছিলেন। কাজেই সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের গোড়া থেকেই বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুরা তথাগত বুদ্ধ-সম্পর্কীয় যাবতীয় আলোচনা ও গ্রন্থাদি ঐতিহাসিক কালানুপাতের কষ্টিপাথরে সংকলিত করে গেছেন। পূজা করেও আসছেন। সিংহলের বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের জীবনকথা কিংবা সিংহলের বৌদ্ধ শিষ্যদের আগমনের বিবরণ ইত্যাদি বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্য কালানুক পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন সিংহলী সাহিত্যে তাই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

এ সকল ঐতিহাসিক তথ্য ও বংশতালিকামূলক দলিল গ্রন্থের মধ্যে অনুরাধাপুরের মহাবিহারের ঐতিহাসিক বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে সিংহলী বৌদ্ধধর্মের অন্যতম ধারক রাজা দত্তগামিনীর কার্যাবলী

অনেকখানি স্থান জুড়ে আলোচিত হয়েছে। সিংহলী ভাষাতেই মূলতঃ এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। পরে পালি ভাষায় এই 'মহাবিহার' ঐতিহাসিক গ্রন্থ ভাষান্তরিত হয়। 'মহাবিহার' শুধু অনুরাধাপুরের ঐতিহাসিক বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থ নয়, বুদ্ধের দন্ত-স্মারক (Tooth-Relic), বুদ্ধদেব ও বুদ্ধ-শিষ্যদের বহু স্মৃতিচিহ্নের ঐতিহাসিক উপকরণও সংগৃহীত হয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে পরাক্রম-পণ্ডিতের 'থুপবংশয়' (মহাথুপের ইতিহাস),'দম্বদেনি-অসন' (দম্বদেনীয় কাহিনী), 'কন্দভুরু সিরীত' এবং 'বুদ্ধদন্ত স্মারক' গ্রন্থে 'দলদসিরাত' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরাক্রম-পণ্ডিতের 'থুপবংশয়', বশীশ্বরের (Vaciswara) ঐ নামের পালিগ্রন্থের সিংহলী অনুবাদ যদিও ঠিক নয়, তবে উভয় পুস্তকেই বুদ্ধের ২৪টি 'স্তূপের' এবং তাদের 'বিবরণের' ইতিহাস বর্ণিত আছে। 'কুলমনিথুপ' ও 'দশথুপের' কাহিনীও উৎকলিত হয়েছে। বশীশ্বরের পালিগ্রন্থে বোধিসত্ত্বের জন্ম থেকে তাঁর জ্ঞানালোকের কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পরাক্রম-পণ্ডিত তাঁর গ্রন্থে বুদ্ধের কঠোর তপস্যা ও মার কর্তৃক প্রলোভনের কথা সুন্দর কাব্যময় ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। শুধু তাই নয় 'পারমিতারা' যোদ্ধার বেশ ধারণ করে বুদ্ধদেবকে যে বিপদমুক্ত করেছিলেন, তারও উল্লেখ দেখা যায়। অশোক স্তূপ নির্মাণের কথা, মহেন্দ্রর সিংহল আগমন, দ্যুৎ-উগামনুর কথা, মহাথুপের নির্মাণ বিবরণ প্রভৃতি উভয় গ্রন্থেই দেখা যায়। সাহিত্য সম্পদেও পরাক্রম-পণ্ডিতের থুপবংশয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যুবরাজ তেনিয়ার বিবরণ প্রভৃতি অনেক কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে মহাকাব্যের লক্ষণ পরিপ্রেক্ষিতে। ধ্যানরত যুবরাজ সিদ্ধার্থের তপস্যা ভঙ্গ করতে মার-কন্যাদের প্রচেষ্টার কাব্যময় বিবরণ উৎসরণের সমতুল্য বলা যায় অনেক ক্ষেত্রে।

দম্বদেনীয় রাজা পরাক্রমবাহুর রাজত্বকালে লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'দম্বদেনি-অসন্'-য় দম্বদেনি রাজার রাজ্যাভিষেক, চন্দ্র বানুর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ-বিগ্রহ, যাভাবাসীদের আক্রমণ ও পরাজয় বরণ এবং বুদ্ধদেবের পবিত্র দন্তমন্দিরে বিজয়ী রাজার অর্ঘ্য নিবেদন, প্রচলিত বিবিধ বাদ্যযন্ত্র, অঙ্গাবরণ, আয়ুধ ইত্যাদি অনেক কিছুরই উল্লেখ দেখা যায় নাতিবৃহৎ তথ্যমূলক এ ঐতিহাসিক পুস্তকে। এ ছাড়া, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, শিল্প-কলা অনেক কিছুরই পরিচয় ওতপ্রোতভাবে ছড়িয়ে আছে

এ গ্রন্থে। এমনি আর একখানি তথ্যমূলক গ্রন্থ 'কন্দভুরুসিরীত।' এ পুস্তকে রাজন্যবর্গের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের কথা লিপিবদ্ধ আছে। 'মনুস্মৃতি'র প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এ পুস্তকে। বৌদ্ধ রাজদরবারে যে বহু ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োজিত ছিলেন এবং তাঁরা নিজেদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুযায়ী পূজা আর্চা অনুষ্ঠান করতেন তার স্বাক্ষরও পাওয়া যায়। রাজা নিজে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তবু তিনি কখনও পরধর্মে হস্তক্ষেপ করতেন না। সিংহল ও ভারতীয় সভ্যতার মূল সুরটি বুঝি অনুরণিত হয়েছে এখানে।

দন্ত স্মারক গ্রন্থ

সিংহলী বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্যতম স্মরণীয় গ্রন্থ বুদ্ধের দন্ত-স্মারক দলদসিরীত—দেবরাধদম্পসিঞ্জীনাভন' এ উপাধি ছিল দলদসিরীতের রচয়িতার। পরাকুণ্ডপিরীবেন মঠের প্রধান অধ্যক্ষের শিষ্যরূপে তিনি বুঝি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১২৪৭ শকাব্দে বা ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে এই সুবৃহৎ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

দলদসিরীত গ্রন্থের অধ্যায় সংখ্যা সাত। প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে স্মারক কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে। এ অধ্যায়গুলিতে সিংহলে 'দন্ত'-র আগমন বৃত্তান্ত, রাজা কীর্তিশ্রী মেঘবর্ণ কর্তৃক অর্ঘ্য নিবেদন, দীপঙ্কর বুদ্ধের সময় রাজপুত্র সুমেধরূপে বোধিসত্ত্বর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা, বোধিসত্ত্বর বুদ্ধত্বলাভের কাহিনী এবং তাঁর পরিনির্বাণের কথা প্রভৃতি আলোচ্য গ্রন্থের গোড়ার দিককার বিষয়বস্তু। তারপরেই দন্ত স্মারকের ইতিবৃত্ত শুরু হয়েছে। বুদ্ধদেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর যখন তাঁর দেহাবশেষ সংগৃহীত হয় তখন বুদ্ধের একটি দন্ত কি করে বৌদ্ধ শ্রমণ খেমার হস্তগত হয়। খেমা সে দন্তটি নিয়ে কলিঙ্গ রাজ্যের 'দন্তপুর' নগরে চলে যান। কলিঙ্গ রাজ সেই দন্তটিকে বিশেষ সম্মান সহকারে বরণ করে নেন এবং পূজা আর্চার ব্যবস্থা করেন। তারপর রাজা পান্দুকের হাতে কি করে দন্ত স্মারকটি পতিত হয় এবং 'নিগন্থ' পন্থিগণ (niganthas) কর্তৃক তা বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা এবং পবিত্র স্মারকের অলৌকিক শক্তির প্রদর্শন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। পান্দুকরাজ ক্ষীরধারা নামে জনৈক রাজাকে পরাজিত করে স্মারকটি গুহশিবের

নিকট অর্পণ করেন এবং তাঁকে কলিঙ্গরাজ্যে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে গুহশিব পরাজিত হলে তিনি তাঁর কন্যা হেমমালা ও জামাতা উজ্জয়নীর রাজকুমার দন্তককে তখন সিংহলে পাঠিয়ে দেন যেন পবিত্র স্মারকটি শত্রুর হস্তে পতিত না হয়। সিংহলরাজ কীর্তিশ্রী মেঘবর্ণ পবিত্র স্মারকটিকে পরম শ্রদ্ধাসহকারে বরণ করে নিয়ে অনুরাধাপুরে স্থাপন করেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সিংহলের রাজা জ্যেষ্ঠকিষা থেকে তৃতীয় পরাক্রম-বাহু পর্যন্ত পবিত্র স্মারকটি রক্ষণাবেক্ষণের পূর্ণ বিবরণ কথা বিবৃত হয়েছে। সপ্তম ও শেষ অধ্যায়ে রাজা চতুর্থ পরাক্রমবাহু কর্তৃক করুণাগলে দন্তস্মারক মন্দির নির্মাণের কথা রয়েছে। এ অধ্যায়ে আনুষ্ঠানিক আচারের নিয়মাবলীও লিপিবদ্ধ হয়েছে।

পবিত্র দন্তস্মারক বিষয়ে সিংহলী ভাষায় পূজাবলিও, দম্বদেনি-অসন্ ও পালি হওবনগল্লবিহারবংশ প্রভৃতি বহু গ্রন্থও লিখিত হয়েছে। কিন্তু দলদসিরীত তাদের থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এজন্য যে দলদসিরীতের ভাষা ও বচনরীতি অনেকটা তাদের থেকে স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। খাঁটি 'ইলু' আঙ্গিকে কাব্যময় ভাষায় এই গ্রন্থ রচিত। সংস্কৃত শব্দ ও সমাসবদ্ধ দীর্ঘ বাক্যের ব্যবহার এ গ্রন্থে দেখা যায়।

দলদসিরীত গ্রন্থে যেমন দন্তস্মারকের ইতিহাস এবং শেষ অধ্যায়ে তার আচার অনুষ্ঠান পালনের কথা বিবৃত হয়েছে, 'দলদাপূজাবলিও' গ্রন্থে রাজা চতুর্থ পরাক্রমবাহুর আমলে পূজা পদ্ধতির কথা এমনি লিপিবদ্ধ আছে। 'দলদাপূজাবলিও' গ্রন্থে অনেক স্থলে 'দাতাবংশ' ও মহাবংশ থেকে পালি শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে দেখা যায়। বুদ্ধের জীবন কথা বিবৃতি প্রসঙ্গেও 'জীন চরিত' ও 'জীনালঙ্কারে'র প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই দন্তস্মারকের ইতিহাস রাজা কীর্তিশ্রী রাজসিংহর রাজত্বকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

বুদ্ধের দন্তস্মারকের মত তাঁর 'ললাটধাতু' বা ললাটের হার নিয়েও একাধিক গ্রন্থ সিংহলীর ভাষায় রচিত হয়েছে। তাদের মধ্যে ললাট-ধাতুবংশয় অন্যতম। কাকুসন্ধ নামে জনৈক থেরা বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তার রচয়িতা। এই গ্রন্থে বুদ্ধের ললাটধাতুর কথাই শুধু সংকলিত হয়নি, বহু ঐতিহাসিক তথ্য ও কুলপঞ্জীও সংযোজিত হয়েছে তার সঙ্গে। তাই বুঝি গ্রন্থখানি শুধু 'দাতুবংশয়' নামে পরিচিত। এ শ্রেণীর

অপরাপর গ্রন্থের মত মথুরাপুর এবং দন্তস্মারকের ইতিবৃত্ত ও বুদ্ধের আগেকার জীবনকথাকে কেন্দ্র করে 'দাতুবংশয়' শুরু হয়। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হয়েই থেরা কাকুসন্ধ সিংহলের রখুন জেলার স্মৃতি সৌধের উপর বিশেষ করে গুরুত্ব আরোপ করেন। শুধু তাই নয়, রখুন এলাকার শাসনকর্তা, নগর অধ্যক্ষ আর প্রধান পুরোহিতের বিবরণও বিবৃত করেছেন তিনি, যা মহাবংশ প্রভৃতি বংশানুক্রমিক তথ্য পুস্তকে পাওয়া যায় না। 'দাতুবংশয়' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে কথিত আছে, বুদ্ধদেব সিংহলে তিন তিন বার আগমন করেছিলেন। 'বৌদ্ধস্মারক' ও মঠাদির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি বহু দেবতা ও স্বর্গীয় মহাত্মন সৃষ্টি করেছিলেন বলে বিশেষ করে উল্লেখ রয়েছে এ গ্রন্থে। যেমন, 'সুমন' নামে জনৈক নাগ নৃপতি বুদ্ধদেবের সঙ্গে নাকি সিংহলে এসেছিলেন। বুদ্ধদেবের ললাটের হার সেরুভিলা যে স্তূপে রাখা হয়েছিল তার পাহারার জন্য তিনি কিছু সংখ্যক নাগ অনুচর ও প্রহরীকে সিংহলে রেখে যান। রাজা সুমনর সঙ্গে তাঁর মাতা এসেও মিলিত হন বলে এ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। বস্তুতঃ 'দাতুবংশয়'কে সেরুভিলা দাগব ইতিহাস বলেই আখ্যায়িত করা যায়।

বোধিদ্রুম ইতিবৃত্ত

বৌদ্ধধর্ম স্থাপনের এবং তার ইতিহাস রচনার অব্যবহিত পরেই অনুরাধাপুরে পবিত্র বোধিদ্রুম বৃক্ষ আরোপণ অনুষ্ঠিত হয়। এ বৃক্ষারোপণ পর্ব অবলম্বনে উপতিসা খৃষ্টীয় দশম শতকে 'মহাবোধিবংশ' রচনা করেন। মহাবোধিবংশ পালি ক্লাসিক সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টি। উপতিসার এ পালি মহাগ্রন্থকেই অবলম্বন করে গুরুলুগোমিনী তাঁর সুবিখ্যাত 'ধর্মপ্রদীপিকাভ' রচনা করেন। করুনাগলের চতুর্থ পরাক্রম-বাহুর রাজত্বকালে ভিল্লমূল সংগরাজ সিংহলী ভাষায় এ পবিত্র বোধিবংশ তালিকা প্রণয়ন করেন সিংহল বোধিবংশয় নামে। তিনি সিংহলী 'সন্নি' (Sanne) 'সূর্যশতক' ও সিংহলী 'অনাগতবংশয়' গ্রন্থেরও রচয়িতা। এ গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে লেখকের নাম-ধামের পরিচয় পাওয়া যায়। জানা যায়, খৃষ্টীয় ১৩৩৩ সালে কালনীয় কিৎশিরি-মেভন-বিহারের তিনি ছিলেন প্রধান মঠাধ্যক্ষ। এ বিহার তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। পণ্ডিত বিজ্ঞমূল উপতিশার অনুকরণেই তিনি তাঁর 'সিংহল

বোধিবংশয়' রচনা করেন নি। সিংহলী পাঠক ও শিষ্যদের আদর্শ সম্মুখে রেখেই তিনি বুঝি প্রাচীন সিংহলী সাহিত্যের এ সুবিখ্যাত গ্রন্থ উৎকলন করেন। বোধিদ্রুমের ইতিহাস কীর্তি-শ্রী রাজসিংহের আমলেও অনুলিখিত হয় 'কুল বোধিবংশয়' নামে। এই গ্রন্থে অনুরাধাপুরস্থ বোধিবৃক্ষের শাখা-প্রশাখাগুলি কোন্ কোন্ দেশের কোন্ কোন্ স্থানে রোপিত হয়েছিল তার বিবরণ পাওয়া যায়।

অণ্ডনগল্ল বিহারের ইতিহাস, খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষ পাদে রচিত অণ্ডনগল্লবংশয়-সন্নি কিংবা বুদ্ধসংঘের ইতিহাস 'নিকায়সংগ্রহায়', কিংবা 'সুলুপূজাবলিও' (পূজা অর্ঘ্যের ক্ষুদ্র ইতিহাস) অথবা 'শ্যামসন্দেশ-বর্ণনাভ' (শ্যামদেশস্থ সংবাদ বিবরণ) প্রভৃতি বিবিধ তথ্যমূলক গ্রন্থে সিংহলের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক বিবরণ, তার ধর্ম-কর্মের কাহিনী এবং তার সাংস্কৃতিক ধারা উৎকীর্ণ রয়েছে।

'রাজবলিও' ও 'রাজরত্নাকরয়'

সিংহলী লেখক ও পণ্ডিতেরা কেবল বৌদ্ধধর্মানুশীলন, চৈত্য আর বিহারের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করে ক্ষান্ত হন নি, রাজকুলপঞ্জী ও রাজন্যবর্গের ইতিহাস রচনাতেও তাঁরা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'রাজরত্নাকরয়' ও 'রাজবলিও' তাদের মধ্যে নিশ্চয় শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। 'রাজরত্না-করয়' ২০৮৫ বুদ্ধ শতকে রচিত হয়। কাণ্ডীর রাজা বীরবিক্রমের রাজত্ব-কালে অভয়রাজ পীরিভেন বিহারের অধ্যক্ষ ভল-গমপায় মহাথেরা এই ঐতিহাসিক গ্রন্থের রচয়িতা। রাজকুলবংশের কাহিনী বিবৃত করাই এ গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। রাজবংশের মূল উৎপত্তি সম্পর্কে কিংবদন্তি মারফত বলা হয়েছে যে রাজমাতা ময়ূরাবতী এক ময়ূরীর গর্ভজাত সন্তান। এ গ্রন্থের শুরু রাজা বিজয়ের সিংহল অভিযান থেকে কোট্টির রাজা ভুবনকেতবাহুর রাজত্বকাল পর্যন্ত প্রধান প্রধান রাজন্য-বর্গের কীর্তিকাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণে পর্যবসিত হয়েছে। ইতি-বৃত্তকার মহাথেরা দত্তবংশ, মহাবোধিবংশ, রসবাহিনী, ধর্মপ্রদীপিকাভ মহাবংশ প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ থেকে তিনি তাঁর ঐতিহাসিক উপচার সংগ্রহ করেছিলেন। মহাথেরা ভলগমপায় তাঁর 'রাজরত্নাকরয়' গ্রন্থে সিংহলের ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাস প্রণয়নেও প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী রাজা দ্বিতীয় বিমল ধর্মসূর্যের

রাজ্যাভিষেকেই সমাপ্ত হয়। বন্নরাজবলিও প্রভৃতি গ্রন্থে রাজবলিওর ভাষান্তর লক্ষ্য করবার।

বিশ্বসৃষ্টির আদি থেকে সূচনা করে জম্বুদ্বীপের বর্ণনা-বিবৃতি-মাধ্যমে 'রাজবলিও' গ্রন্থ শুরু হয়। তারপর লঙ্কাদ্বীপে রাবণের রাজত্বকাল, বুদ্ধের আগমন প্রভৃতি সংক্ষিপ্তাকারে বলা হয়েছে এই গ্রন্থে। কিন্তু সিংহবাহু ও সিংহবল্লীর কাহিনী, বিজয় ও কুবেনীর কথা, বিশদভাবে উল্লেখ দেখা যায়। মহেন্দ্রর আগমন ইত্যাদির কথাও সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। এ গ্রন্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অধ্যায় বুঝি পর্তুগীজ আগমন। পর্তুগীজদের আগমন, দম্বদেনীয়র রাজা পরাক্রমবাহু ও কোট্টির রাজকুমার সপুমল কর্তৃক দক্ষিণ ভারতীয় আক্রমণকারীদের পরাজয়। যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনায় লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট ছাপ ছড়িয়ে আছে অনেকস্থলে। এই গ্রন্থে বৌদ্ধ সম্বন্ধ, শকাব্দ এবং এমন কি খ্রীষ্টাব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ভাষা ও বচন বিন্যাসেও বিভিন্ন রীতির প্রয়োগ দেখা যায়। সিংহল দ্বীপে পর্তুগীজদের প্রথম আগমনের কথা ঐতিহাসিক ভাষ্যকারের ভাষায়ঃ

"আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের তিরোধানের ১৫২২ বর্ষে—এ সময় জম্বুদ্বীপস্থ পর্তুগীজ ঔপনিবেশ থেকে কলম্বো বন্দরে এসে উপস্থিত হল একটি পর্তুগীজ জাহাজ ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্রের কবল থেকে আশ্রয়ার্থে।"

"আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট" ইত্যাদি সামঞ্জস্যহীন বিবৃতি থেকে এ কথাই বুঝি প্রমাণিত হয় যে রাজবলিও গ্রন্থখানি সমসাময়িক বিবিধ ঐতিহাসিক উপাদানে লিখিত হয়েছিল। ভাষাটিও তার ব্যাকরণ বিশুদ্ধ শাস্ত্রমান্য নয়। তবু সিংহলের বৃটিশ রাজত্বকাল শুরু হবার আগেকার বহু ঐতিহাসিক তথ্য এই রাজবলিও গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে যা মহাবংশের চেয়েও অনেকক্ষেত্রে কার্যকরী। এমনি আর একখানি গ্রন্থ 'শুলরাজবলিও' (রাজন্যবর্গের সংক্ষিপ্ত কুলপরিচয়)। এই গ্রন্থে সিংহলের প্রথম রাজা বিজয় থেকে শুরু করে শেষ রাজা শ্রীবিক্রম সিংহের বিবরণ সংকলিত হয়েছে। ছোটখাট অনেক রাজার খবরাখবরও এই পুস্তকে উল্লেখ দেখা যায়। নিকায়সংগ্রহর অনুকরণে শুলরাজবলিওর তথ্য অনেকটা বুঝি পরিবেশিত হয়েছে। রাজা দুত্যগমনুর যুদ্ধ জয়যাত্রার কথা উদ্ধৃতি করা হোল এখানে নমুনা হিসাবেঃ

"রাজা কাডন্তীকার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহাবিক্রম রাজা দূত্যগমনু সিংহল দ্বীপে বিপুলাকার তামিল সৈন্যবাহিনীকে ৩২টি সুরক্ষিত তাঁবু খাটিয়ে বসে দেশের সব বৌদ্ধ-বিহার, চৈত্য ও ধর্মানুষ্ঠান বিধ্বংস করতে দেখে মহা অনুতাপে শপথ গ্রহণ করলেন, 'যেদিন পর্যন্ত না বিদেশী শত্রুদের পরাভূত করে বৌদ্ধস্তূপে আলোক শিখা প্রজ্বলিত করতে পারব ততদিন আমি নিদ্রা ত্যাগ করলাম।' এই সংকল্প করে তিনি তাঁর রাজহস্তী কণ্ডোলের পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন এবং ১১ হাজার ১ শত ১০ জন যোদ্ধা নিয়ে রুহুন ত্যাগ করে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন অমিত বিক্রমে। এবং ১০ লক্ষ ২৪ হাজার তামিল শত্রুকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত করেন। তামিলদের ৩২টি শিবিরই তিনি ধ্বংস করেন। প্রতি শিবিরে ৩২ হাজার করে তামিল সৈন্যসংখ্যা ছিল। পরিশেষে তিনি রাজা ইলালকেও যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত করেন। অনুরাধাপুর দখল করে তিনি ২৪ বৎসরকাল সসম্মানে রাজত্ব করেন এবং রাজকর্তব্য পালন করেন। তিনি ৯৯ হাজার বিহার নির্মাণ করেন এবং বহু দানাদি কর্মও সম্পন্ন করেন। মৈত্রেয় বুদ্ধের প্রধান শিষ্যরূপে তিনি যাতে আবার জন্মগ্রহণ করতে পারেন এই ইচ্ছা তিনি পোষণ করেন। তাই তিনি তুষিপুরায় জন্মগ্রহণ করেন।"

'সুলরাজবলিও' রাজা কীর্তি-শ্রীরাজসিংহর রাজত্বকালে লিখিত হয়। সংগরাজ শরনংকারর জনৈক শিষ্য কর্তৃক গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়। আগাগোড়া পুস্তকের প্রায় অর্ধেকটা রাজা কীর্তি-শ্রী-রাজসিংহর রাজত্বকালের স্মরণীয় ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। রাজা শ্রীবিক্রমরাজসিংহর শাসনকালের কথা এবং বৃটিশ সেনাপতির নিকট তাঁর পরাজয় ও বন্দী হবার কথা লিপিবদ্ধ আছে। রাজা শ্রীবিক্রমরাজসিংহ ধূমকেতুর মত সহসা রাজসিংহাসনে আরোহণের কথা, রাজধর্ম বিসর্জন দিয়ে শরণাগতদের নির্বিচারে হত্যা—বিশেষ করে তাঁর নিকট আত্ম-সমর্পণকারী বৃটিশ সৈন্যদের নিষ্ঠুর হত্যালীলা, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুদের উপর অকথ্য নির্যাতন, তাঁদের উপাসনা মন্দির ও চৈত্য বিহার ধ্বংসের বিবরণ সুলরাজবলিও গ্রন্থে পাওয়া যায়। রাজার এই অকথ্য অত্যাচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণামেই বুঝি রাজলক্ষ্মী তাঁর প্রতি বিমুখ হলেন! ইংরেজ বণিক শক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে

তিনি বাধ্য হন। ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে সিংহলেও দেখা দেয় এভাবে। 'সুলরাজবলিও'র রচনাকাল ১৭৪৩ শকাব্দে বা ১৮২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে।

সুলরাজবলিওর অনুরূপ সিংহলী রাজকুলবংশের আর একখানি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসধর্মী কুলপঞ্জী অসগিরি বিহারের যতনবল মহাথেরা রচিত 'নরেন্দ্রচরিতাবলোকনপ্রদীপিকাভ' (রাজ-ইতিহাস অবলোকন করার প্রদীপ)। এই গ্রন্থখানি সিংহলের বৃটিশ শাসনকর্তা লেফ্‌টেন্যান্ট জেনারেল এডওয়ার্ড বার্নেস-এর নির্দেশক্রমে বৃটিশের নিকট কাণ্ডার বশ্যতা স্বীকারের ১৯ বৎসর পর (১৮৩২ খ্রীঃ) রচিত হয়। মহাবংশ ও সুলরাজবলিওর অনুকরণে এই গ্রন্থের উপাদান সংগৃহীত এবং বৃটিশ গঠনমূলক শাসনাবলীর প্রলেপ হস্তে স্বাক্ষর রয়েছে।

এ ছাড়াও ছোটখাট অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ বিবিধ গাথা বা 'ভিত্তি-পটে' আকীর্ণ হয়ে আছে। রাজবলিওর ঢঙে এগুলি বেশীর ভাগ লিখিত এবং তাদের রচনাকালও ঐ সময়কার। 'বহ্মোপত্তিয়' (ব্রহ্মার জন্ম), 'জনবংশয়' (মানবজাতির ইতিহাস), 'বুদ্ধরাজবলিও' (বুদ্ধধর্মাবলম্বী রাজাদের বংশ তালিকা ইত্যাদি) এ ঐতিহাসিক গাথা সাহিত্যের স্মরণীয় রচনা। 'করুনাগল বিস্তারায়' (করুনাগলের বর্ণনা) কিংবা 'যপহুভর বিস্তারায়' (যপহুব নগরের বর্ণনা) প্রভৃতি নগর উপাখ্যানমূলক বিবিধ গ্রন্থে বহু প্রাচীন বিস্মৃতপ্রায় জনপদের কথা উল্লেখিত আছে।

পরিশিষ্ট

সিংহলী সাহিত্যের যে ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে উত্থাপিত করতে সচেষ্ট হয়েছি, তা ইউরোপের সঙ্গে সিংহলের যোগ সংযোগ স্থাপনের আগেকার যুগের। প্রথমে পর্তুগীজ, তারপর ডাচ এবং পরে ইংরেজেরা বণিকের বেশে সিংহল দ্বীপে পর পর আগমন করে স্থাপন করে উপনিবেশ। তারপর একদিন রাত পোহালে 'বণিকের সে মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে' দেখা দেয়। ইউরোপের সঙ্গে এই যোগ স্থাপনের ফলে পশ্চিম তখন তার দ্বার খুলে দেয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা তার শিক্ষাদীক্ষার পণ্যসম্ভার নিয়ে সাতসাগর পার হয়ে সিংহল দ্বীপের উপকূলে এসে ভিড়াল তাদের তরণী। ফলে সিংহলের রাজনৈতিক পটভূমিকারই কেবল পরিবর্তন

সাধিত হয় নি, সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনধারারও পরিবর্তন ঘটে। বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত হয় রোমান মিশনারীদের দৌলতে। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের বাহন হিসাবে সিংহলী ভাষার মুদ্রণে তাঁরা ব্রতী হন। ১৬৫৮ সালে পর্তুগীজদের পর যখন ডাচগণ সিংহলে কায়েমী হয়ে বসেন তখন তাঁরা সিংহলী স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে রোমান ধর্মযাজকদেরই নিয়োগ করেন। মিশনারীদের প্রচেষ্টায় তাই সিংহলী স্কুল-পাঠশালায় স্থানীয় ভাষায় নতুন করে পাঠ্যপুস্তক ও ব্যাকরণাদি রচিত হতে থাকে। বাইবেলের অংশবিশেষও সিংহলী ভাষায় অনূদিত হয়ে স্কুলের পাঠ্য-ক্রমে রূপায়িত হয়। সিংহলী ভাষার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক ডাচ শাসনকর্তা ভন ইন্‌হফের (১৭৩৬—৩৯) নির্দেশেই প্রকাশিত হয়। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় রবার্ট নবস প্রথম সিংহলী ভোকাবুলারী বা শব্দপুস্তক লেখেন। ডাচ শাসকবর্গ সিংহলী ভাষায় খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় যে সকল পুস্তক অনুবাদকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন ইংরেজ আগমনের পর ডাচদের সে কার্য অব্যাহত রাখেন। ফলে ঊনবিংশ শতকে সিংহলী ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার সঙ্গে সঙ্গে বহু খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থও প্রকাশিত হয়। তাঁদের মধ্যে সিংহলী ক্যাথলিক সাহিত্যের জনক ফাদার জেকম্ গনক্যালভেঝ (Father Jacome Goncalvez ১৬৭৬—১৭৪২) পবিত্র বাইবেল ও ক্যাথলিক ধর্মগ্রন্থ সারসংগ্রহ 'দেববেদপুরানয়' তাঁর অপূর্ব গদ্যগ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি পূর্বে গোয়ার এক কন্‌কানি ব্রাহ্মণ ছিলেন। পর্তুগীজ ধর্মযাজক ফাদার ভ্যাঝের সঙ্গে তিনি প্রথম সিংহলে আসেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গদ্যগ্রন্থ 'দেববেদপুরানয়' ছাড়াও তিনি 'বেদকাব্যয়' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই কাব্যের শ্লোকসংখ্যা ৫৩৭টি। বিষয়বস্তু তার পুরানর অনুরূপ। ভাষা তাঁর সংস্কৃতবহুল এবং সাহিত্যরীতি কাণ্ডীর সিংহলী ভাষার সংমিশ্রণ। তাঁর গদ্যরীতি ও বচনভঙ্গী ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের মতে 'প্রাচীনপন্থী' হলেও তিনি সিংহলী ভাষার মারফত বিদেশী ক্লাসিকধর্মী গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর গদ্যরীতি বহু রোমান ক্যাথলিক লেখক অনুকরণ করেন।

খ্রীষ্টধর্ম ও সাহিত্য প্রচারের ফলে কিন্তু সিংহলের বৌদ্ধ ধর্মের

প্রভাব প্রতিপত্তি ম্রিয়মান হয় নি। বরং উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে পালি গ্রন্থের সিংহলী অনুবাদগুলি সংশোধিত ও সম্পাদিত হয়ে নতুন করে মুদ্রিত হতে থাকে। বৌদ্ধ জাতক 'পেতবত্তুর' সিংহলী রূপান্তর কিংবা মহাভাবে প্রিয়রতন কর্তৃক রচিত বৌদ্ধশিষ্যদের জীবন আলেখ্য কতকগুলি প্রকাশিত হয়ে এ সময় মুদ্রাযন্ত্রের দৌলতে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হতে থাকে। সিংহলী মহাবংশের মুদ্রণ কার্যও এ সময়কার আর এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি। জন পেরিরা কর্তৃক লিখিত হেলাদিভরাজনীয় (Heladivrajaniya) আর একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এইটি প্রকাশিত হয়। ভাষা তার প্রাঞ্জল, সাবলীল এবং লালিত্যময়। সাইমন ডি শীল্ডবার লঙ্কাকথভ পুস্তক কাহিনী জন্ পেরিরার গ্রন্থের মত বৈশিষ্ট্যময়।

শুধু খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থের অনুবাদেই মিশনারীদের সিংহলী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিবিধান ও সাহিত্য সৃষ্টির কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ থাকে নি, ইংরেজী এ্যারেবিয়ান নাইটের সিংহলী অনুবাদ 'আরবিনীসোল্লসায়' (Arābiniŝōllāsaya,) কিংবা বুনিয়ানের পিলগ্রীমস্ প্রোগ্রেসর অমর কাব্যগ্রন্থের সংগ্রহের সিংহলী অনুবাদ Kristiyānivandanākārayāgē gamana (1886), ইত্যাদি ইংরেজী সাহিত্য কীর্তিগুলি অনূদিত করে সিংহলী ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ডন বাস্তিয়ান সংস্কৃত রামায়ণের দুইটি কাণ্ডের সিংহলী অনুবাদ প্রকাশিত করেন। এই রামায়ণের অনুবাদ সংস্কৃত থেকে নয় তামিল কম্বো রামায়ণ থেকে।

ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষার দৌলতে নাট্যশাস্ত্রেরও বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে 'নাদ অগম' নাট্যের প্রবর্তন হয়।* জে. এম.

* বহু সংখ্যক গীতি ও নাট্যের মারফত এই 'নাদ্ অগম্' নাট্যানুষ্ঠান প্রদর্শিত হত। দক্ষিণ ভারতীয় লোকনাট্য এই সিংহলী 'নাদ্অগম্'কে বিশেষ করে প্রভাবান্বিত করেছিল। রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকেরা তাঁদের ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রথম প্রথম এই গীতিনাট্যের অনুষ্ঠান করতেন। সংলাপী নাটকের প্রচলন হয় পাশ্চাত্য নাটকের অনুকরণে ও অনুবাদে! ডঃ ই. আর. শরৎচন্দ্র প্রমুখ নাট্যকার ও নাট্য সমালোচক ছাড়া সিংহলী ভাষায় প্রকৃত নাট্য সৃষ্টির অভাব একান্তভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

পি. পিয়ারীজের 'কুশ নাদগম্' প্রকাশিত হয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে। জন্ ডি সিলভা কুশলী নাট্যকারের হস্তে এই 'নাদ্ অগম্' নাট্য আন্দোলনের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। উনিশ শতকে প্রথম সিংহলী ভাষায় প্রকৃত উপন্যাস সৃষ্ট হয়। আর এই ধারা সিংহলের আধুনিক নিপুণ কথা-শিল্পীদের হাতে শাখা-উপশাখায় পল্লবিত ও সঞ্জীবিত হয়ে সার্থক রূপ লাভ করেছে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. সিংহলীজ লিটারেচার : সি. ই. গোদাকুম্বর
(The Colombo Apothecaries' Co. Ltd.
Colombo--1955)
২. এ হিস্টিরি অফ্ পালি লিটারেচার, ১ম ও ২য় খণ্ড : বি. সি. ল.
৩. দি স্টোরি অফ দি কাল্চারাল এ্যামপায়ার অফ ইণ্ডিয়া : পি. টমাস
৪. কালচারাল নিউজ ফ্রম এশিয়া (কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডম) :
নবম সংখ্যা ; নয়া দিল্লী

বর্মা সাহিত্য

ভারত আর চীন এ দুই মহাদেশের উপান্তে গিরিসঙ্কুল ব্রহ্মদেশ। বর্মার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা ইরাবতী। সাগর মেখলা এই উপদ্বীপের উল্লেখ খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতক থেকে পাওয়া যায়। নিম্ন বর্মার রাজধানী প্রোম-এর শৌর্য-বীর্যের কথা নানা দেশে তখন ছড়িয়ে পড়ে। তারও কয়েক শতক আগে অবশ্য আপার বর্মার তাগুয়াং-এ প্রতিষ্ঠিত হয় বর্মার প্রথম রাজ্য। ভারতের এক রাজা বর্মায় গিয়ে এ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানা যায়। ভারতের এই রাজা বর্মী জনগণকে নিয়ে সুসমৃদ্ধ এক রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু এই রাজ্য বেশী দিন টেকে নি। ভারতের আর এক রাজন্য এসে বর্মার প্রথম রাজশক্তি পুনরুদ্ধার করেন বলে কথিত, বুদ্ধদেবের জীবিত কালে। কিন্তু তাও অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং তোয়াঙ-এর এক যুবরাজ প্রোম-এ নতুন করে রাজধানী স্থাপন করেন। প্রোম-এর এ রাজ্যের সীমানা অনেক দূর ছড়িয়ে পড়ে এবং ভারত আর ইন্দোচীনের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের লেনদেন তার চলতো বলে জানা যায়।

তখন থেকেই বর্মায় নাচ গান ও আদি গীতিকবিতার প্রথম জাতীয় সত্তা লাভ করে। সেকালের এই গীতিকবিতা মুখে মুখে প্রচলিত ছিল ঃ লিখিত ভাষার প্রচলন তখনও হয়নি। ভারত থেকে যে সব রাজন্যবর্গ বর্মা দেশে এসে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন তাঁদের অনেকেই লিখতে পড়তে জানতেন। কিন্তু তাঁদের জ্ঞান-গরিমা ছিল সীমাবদ্ধ। বিজিত জনসাধারণের মধ্যে তার প্রসার ছিল না। বৌদ্ধ ধর্ম ভিক্ষুদের মারফত লিখিত ভাবে প্রচারিত হয়নি। হয়েছিল বৌদ্ধ সওদাগরদের দৌলতে। সুতরাং ভারতীয় এই ধর্ম-কর্মের ক্ষীণ প্রভাব বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে প্রোমের এই রাজ্যটির অবসান ঘটে।

এর পর উত্তর বর্মায় আর এক নতুন রাজ্য স্থাপিত হয়। নতুন এই রাজধানী প্যাগান (Pagan) অচিরেই ব্যবসা বাণিজ্যে ও ধন

সম্পদে উত্তর বর্মায় সুসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। খৃষ্টীয় একাদশ শতকে অন্বরথ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুপণ্ডিত বৌদ্ধ ভিক্ষু সীন আরাহনের (Shin Arahan) প্রচেষ্টায় অন্বরথের রাজ্যে নতুন করে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তখন লিখন প্রণালীরও প্রবর্তন করেন। চৌকস পালি ভাষার বর্ণ লিপি এবং ধর্ম গ্রন্থ ত্রিপিটক-এর প্রচলন ঘটে তাঁদের দৌলতে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে বর্মার বর্ণ-লিপি ও সাহিত্যের প্রসার ঘটে থাটনের তেলাইন (Talaing) রাজ্যের আনুকূল্যে। তেলাইনরা বর্মা জাতিরই এক অংশ বলে সুপণ্ডিত মঙ-তিন-অং (Maung-Htin-Aung) তাঁর সুবিখ্যাত 'বার্মিজ ড্রামা' গ্রন্থে (ভূমিকা দ্রষ্টব্য) উল্লেখ করেছেন।

অনেকের মতে তেলাইনরা দক্ষিণ ভারতীয়। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই বর্মা মুলুকে এসে উপস্থিত হন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। তাঁরাই পরে থাটনে তেলাইন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। খৃষ্টীয় তৃতীয় চতুর্থ শতকে যাভা সুমাত্রায় হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হলে থাটনের গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে ওঠে ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকে। দক্ষিণ ভারতে কঞ্জিভরমে বৌদ্ধ-শিল্প ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ ঘটলে তার ঢেউ থাটন উপকূলেও এসে আছড়ে পড়ে বঙ্গোপসাগরের দুস্তর পারাবার পার হয়ে। তেলাইন সওদাগরদের দৌলতে কিছু কিছু পালি ধর্ম-গ্রন্থ থাটনেও আনা হয় এবং তেলাইন সাহিত্য কিছুটা গড়ে ওঠে। অন্বরথ যখন থাটন রাজ্য আক্রমণ করে ধ্বংস করেন তখন তিনি কিন্তু এই পালি পুঁথিপত্র ও সাহিত্যকীর্তিকে সযত্নে রক্ষা করার চেষ্টায় ছিলেন।

ভারতীয় পালি ভাষার পাহাড়ী খোদাই করা শিলালিপির প্রাচীন বর্ণমালা থেকে বর্মার বর্ণমালার উদ্ভব। কাজেই দেখা যায় কি বর্ণমালায়, কি তার ধ্যান ধারণায়, বর্মার শিক্ষা সংস্কৃতির অনেক কিছুই ভারতের কাছ থেকে নেওয়া। (এ্যানসাইক্লোপীডিয়া ব্রীটানিকা, চতুর্থ খণ্ড)।

বর্মা ভাষা এক স্বরাত্মক। ভারতীয় ভাষাবলীর চেয়ে চৈনিক ভাষার সঙ্গে অধিকতর সংশ্লিষ্ট। স্বরাঘাতের মাত্রাভেদে (Syllable) এক ধ্বনিমূলক শব্দের বিভিন্ন অর্থ হয়। বর্মী ভাষাভুক্ত অনেক কথ্য ভাষা সান, কাচিন, কারেন ও অপরাপর বহু পাহাড়ী উপজাতিরাও বলে থাকে।

রাজা অম্বরথের পৃষ্ঠপোষকতায় প্যাগান রাজ্যে শিল্প-সাহিত্যের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বর্মা ভাষা তিব্বত-বর্মী (টিবেটো-বার্মিজ) শাখা থেকে উদ্ভূত আর তেলাইন হলো মঙ-খামার (Mong-khamar) শাখার গোষ্ঠীভুক্ত। রাজা অম্বরথের প্রচেষ্টাতে প্যাগান রাজ্যের সর্বত্র বিশেষ করে নব নির্মিত বৌদ্ধ বিহারগুলিতে পালি ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন চলতে থাকে। সংস্কৃত বহু গ্রন্থ ও নাটকের অনুবাদ হয়। খৃষ্টীয় ১০৪৪ শতাব্দ থেকে পালি বর্মার ক্ল্যাসিকাল ভাষায় পরিগণিত হয়।

প্যাগান রাজারা বর্মার 'মন্দির নির্মাতা' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের নির্মিত প্যাগোদাগুলো ঐতিহাসিক জি. ই. হার্‌ভের ভাষায়, 'বর্মী ভাষার শোক গীতিময় শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্যতম এবং বর্মার বর্তমান সাহিত্যে ধর্মনিরপেক্ষ রচনার প্রাচীনতম নিদর্শন'। এ-সব নিদর্শনগুলি যে সব সময় শ্লোকময় ছিল, তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে অলঙ্কারপূর্ণ বড় বড় সমাসবদ্ধ গদ্য রীতিতেও রচিত। সূক্ষ্ম শিল্পকলা ও সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক হিসাবে প্যাগোদার এই মর্মবাণী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিন জাগরূক হয়ে থাকবে। এই প্যাগোদাগুলি বৌদ্ধ জ্ঞানভিক্ষুদের ইষ্টকময় কাব্যগাথা। শুধু কাব্যগাথা নয়, পাথরে গাথা অক্ষরে তাঁদের ধ্যান-ধারণা ধর্ম-কর্মের মর্মবাণী—বিশ্ব ইতিহাসে যার স্থান আজও অম্লান রয়েছে।

বর্মার 'রাজ-তরঙ্গিণী'—মহারাজ 'ওয়েঙ' বা রাজাদের ইতিহাস থেকে জানা যায়, রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্মের বহু পূর্বে শাক্য বংশীয় রাজাদের সঙ্গে আশপাশের রাজা-মহারাজাদের যুদ্ধবিগ্রহ অনেকদিন ধরে চলেছিল। রাজ কাহিনী থেকে আরও জানা যায় কপিলাবস্তুর জনৈক অভি রাজা বিতাড়িত হয়ে দলবল সৈন্যসামন্ত নিয়ে মধ্যইরাবতী নদীর তীরভূমিতে এসে উপস্থিত হন এবং তাওয়াঙ নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এ রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আজও তাঁর কীর্তিকলার সাক্ষ্য বহন করে আছে। মৃত্যুকালে তাঁর দুই পুত্র কান রাজগ্যী ও কান রাজনগী সিংহাসন অধিকার করবার জন্য পরস্পর আত্মকলহে মগ্ন হন। শেষে ঠিক হয় যে, প্রথমে যিনি কোন এক ধর্ম মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন, তিনিই রাজ্য পাবেন। ছোট ভাই বিশেষ এক ফন্দি এঁটে রাতারাতি সেই

মন্দিরটি তৈরী করে ফেললেন। সুতরাং ছোট ভাই পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করলেন। বড় ভাই নিরুপায় হয়ে ইরাবতী নদী ধরে অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে ম্যায়েঙ দ্বয়েং নদীর মুখে উপস্থিত হয়ে কুপোত্যকায় নতুন এক রাজ্য স্থাপন করলেন। পিউ, কান রান প্রভৃতি উপজাতিদের নিয়ে তাঁর এই নতুন রাজ্য গড়ে ওঠে। তাঁর রাজ্যের সীমা এখনকার আরাকান পার্বত্য এলাকার উত্তর ভাগ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। আরাকানে রাজকাহিনী কুলপঞ্জীতে ভাগ্যবিতাড়িত এ রাজকুমার ও তাঁর সহচরদের কথার উল্লেখ রয়েছে। এ কান রাজগ্যী-র রাজকথা খৃঃ পূঃ ৮২৫ পূর্বের কাহিনী বলে অনুমান করা হয়, অবশ্য বর্মী ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে সঠিক কোন মন্তব্য করেন নি।

এদিকে ছোট ভাই কান রাজন্গী পিতৃরাজ্য তাওয়াঙ-এ সুখ-শান্তিতে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন এবং তাঁর বংশধরের রাজত্ব কালে ইউনান অঞ্চলের পার্বত্য উপজাতিরা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে। এই সিং উপজাতি আক্রমণকারীদের 'তারুক' আর 'তারেক' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। চীন বা মাংচু নামেও তারা পরিচিত ছিল। Tagaung-এর শেষ রাজা ভীমনক ইরাবতীর পশ্চিম তীরে মালে শহরে পালিয়ে যান। সেখানে রাজা ভীমনকের মৃত্যু ঘটে। তাঁর রানী নাগাসিং তখন স্বামীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর অনুচরবর্গ তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক দল রানীর পার্শ্বছায়ায় অবস্থান করে মৃত রাজার প্রতি শেষ আনুগত্য প্রদর্শন করে। আর এক দল কালে অঞ্চলে চলে গিয়ে মুদ্ধু সিও রাজবংশধরদের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করে। তৃতীয় দল পূবমুখো চলে গিয়ে সান দেশে আশ্রয় নেয়।

যখন 'গোয়াদামা বুদ্ধ' জীবিত ছিলেন তখন গাঙ্গেয় ভারত থেকে দ্বিতীয় ক্ষত্রিয় ঔপনিবেশিক দল এসে উপস্থিত হয় বর্মী উপত্যকার সমভূমিতে। এ দলের কর্ণধার ছিলেন দাজা। তাঁরা ইরাবতীর কূলবর্তী এক গ্রামে, এখনকার নাম যার মুইয়েন, গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। রাজা দাজা পরবর্তী কালে মালের দিকে অগ্রসর হন এবং রাজা ভীমনকের রানী নাগাসিংকে পুনরায় বিবাহ করেন। রাজা ও রানী নিজেদের দলবল ও অনুচরবর্গ নিয়ে উত্তর দেশে চলে যান এবং প্রাচীন রাজধানী তাগাউং নিকট নতুন নগর স্থাপন করেন। প্রাচীন

পুগান নামে আজও তা পরিচিত। বর্মী কুলপঞ্জীতে অবশ্য পূর্বাঞ্চল থেকে আগত কোন আক্রমণকারীর উল্লেখ নেই এই প্রসঙ্গে। এ প্রাচীন রাজধানী পুনরায় আক্রান্ত হয়েছিল বলে প্রকাশ। এ দ্বিতীয় রাজবংশের ষোড়শতম রাজার আমলে। শেষ রাজা থাদো মহারাজার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। রাজরানী-ভ্রাতাই 'আইনসেমেং' নিযুক্ত হন এবং তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষিত হন। এই সময় পূর্বদেশ থেকে আগত হানাদারগণ কর্তৃক রাজ্য আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণের ফলে দেশের রাজা রাজ্য হারালেন। রাজ্য হারিয়ে আইনসেমেং বনে পালিয়ে যান এবং তাঁর রাজরানী দুটি জমজ সন্তান প্রসব করেন। জমজ রাজকুমার দুজনে কিন্তু ছিলেন জন্মান্ধ। কিংবদন্তী থেকে জানা যায়, রাজ্যচ্যুত আইনসেমেং একদিন বনে শিকার করতে গিয়ে এক বন্য শূকরের পেছন পেছন ধাওয়া করে এতো দূর ছুটে যান যে, গভীর বনে তিনি তাঁর পথ হারিয়ে ফেলেন। নিবিড় বনে পথ হারিয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণায় তিনি ভীষণ কাবু হয়ে পড়লেন। অনেকটা সংসারের মোহ মায়ায় বীতস্পৃহ হয়ে সংসার ধর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করেন। নদী পথ ধরে তাঁর রাজ্য থেকে অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে এক পার্বত্য গুহায় (এখনকার প্রোম শহরের কিছু দূরে) আশ্রয় নেয়।

এদিকে তাগড়িং সিংহাসনচ্যুত আইনসেমেং-এর দুই জমজ পুত্র দিন দিন বড় হতে লাগলো। কিন্তু রাজকুমার দুজন জন্মান্ধ ছিলেন বলে তাঁদের মৃত্যুদণ্ডের হুকুম দেওয়া হয়। কেন না, অন্ধ রাজকুমার রাজ্য চালনার অনুপযুক্ত বলে এই মৃত্যুদণ্ডের প্রথা ছিল। রানী তাই তাঁর দুই জমজ ছেলেকে লুকিয়ে রাখেন অন্যত্র কোথাও। রাজকুমার দুজন যখন বড় হয়ে উঠলো তখন তিনি তাঁদের এক নৌকোয় করে ইরাবতীর জলে ভাসিয়ে দেন। ইরাবতীর নদীর মাঝ পথ দিয়ে যেতে যেতে অন্ধ রাজকুমারদ্বয় তাঁদের দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরে পেলো। অবশেষে তাঁরা প্রোমে গিয়ে পৌঁছলো। নদীর ঘাটে দেখে খুব সুন্দরী এক কন্যা নদী থেকে জল নিয়ে চলেছে। এই মেয়েটির সঙ্গে রাজকুমারদের পরিচয় হলো। জানতে পারলো এই মেয়েটির বাবা আর কেউ নয় তাঁদেরই আপন মাতুল। কালক্রমে বড় রাজকুমার মহাথাম্বওয়ার সঙ্গে এই মেয়েটির বিয়ে হয়। মহাথামবওয়া খৃঃ পূঃ আনুমানিক পঞ্চম

শতকে প্রোম নগরীর আশে পাশে তাঁর প্রথম রাজবংশ স্থাপন করেন, বর্মার প্রাচীন কুলপঞ্জী মহারাজা 'ওয়েঙ' অনুসারে। এই রাজবংশ থেকে বর্মা বিবিধ রাজকুলের উদ্ভব হয়েছে বলে জানা যায়। অবশ্য জাতীয় কুলপঞ্জীতে তাগড়িং রাজ্যের কোন বিবরণের পরবর্তী অনেক শতাব্দী ধরে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

মহাথোমবওয়া ছয় বৎসরকাল রাজত্ব করেন। তার পর তাঁর ছোট ভাই রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল ধরে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠান করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র দত্তবঙ তার পর রাজা হন। বর্মার জনসাধারণ এখনও তাঁর নাম সসম্ভ্রমে স্মরণ করে থাকে। কেন না, জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে তিনি বহু কূপ খনন, পান্থশালা নির্মাণ, বহু জনহিতকর কার্য করেন। যার কিছু কিছু নিদর্শন ভগ্নপ্রায় প্রোম শহরের আশে পাশে এখনও রয়েছে বলে বিদেশী পর্যটকদের বলা হয়ে থাকে। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য বিবিধ জনহিতকর কার্য করে থাকলেও তিনি নাকি জনৈক মঠাধ্যক্ষের কাছ থেকে জোর করে ভূমি কেড়ে নেন। ধর্মের বিরুদ্ধ এ কাজের পরিণামস্বরূপ উত্তর-জীবনে তাঁর নানা দুঃখ-কষ্ট ও বিপর্যয় ঘটে। নানা ধনরত্ন বোঝাই তাঁর জাহাজখানি মাঝ দরিয়ায় মহাবিপদে পতিত হয়। বিক্ষুব্ধ সমুদ্র থেকে ড্রাগন এসে তাঁর জাহাজখানি নাকি নিয়ে যায় সমুদ্রের তলদেশে।

মহারাজা 'ওয়েঙ' কুলপঞ্জীতে অভিরাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাওয়াঙ-এর প্রথম রাজবংশ তারুক ও তারেক আক্রমণকারীদের হাতে ধ্বংস হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তারুক ও তারেক এ দুই জাতি এখনকার চীনা ও মাঙচু জাতির পূর্বপুরুষ বলে জানা যায়। কিন্তু প্রথম রাজবংশের বিপর্যয় ঐতিহাসিক দিক থেকে আরও পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল বলে বর্ণিত আছে। ভাষাগত ইতিবৃত্ত অনুসরণ করে প্রফেসর ম্যাক্সমুলার এ সিদ্ধান্তে আসেন যে, তাই জাতির পূর্ব পুরুষরা মধ্য এশিয়ায় তাদের আদি বাসস্থান পরিত্যাগ করে দক্ষিণ-মুখো অগ্রসর হয় এবং পরিশেষে মেকঙ, মেনাম, ইরাবতী ও ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে এসে বসবাস করতে থাকে। এখন অবশ্য উল্লেখিত ঐ সকল স্থানে আদি 'তাই' শাখার আদিবাসীর কোন সন্ধান মেলে না, যেমন ইরাবতীর উপত্যকা বরাবর মঙ্গল জাতিগোষ্ঠীর অবস্থিতি বিদ্যমান।

তাগাউং-এ বর্তমান ধ্বংসস্তূপে এ পর্যন্ত যা খনন কার্য সমাধান হয়েছে তা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন ভারতই বর্মা রাজবংশের সূত্র। শান জাতিরা অবশ্য এই প্রাচীন ঐতিহ্যের কোন দাবি করেন না। তথাপি বৌদ্ধ মূর্তি, পিঠের ওপর বৌদ্ধের খোদাই চিহ্ন আর প্রাচীন দেবনাগরিক হরফে পালি বর্ণমালার অবস্থিতি—এই সব ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তা থেকে আরও জানা যায়, ভারত ও বর্মার এই সংযোগ ঘটে খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে— গুপ্ত আমলে। বিহারের গয়াতে প্রাপ্ত প্রাচীন ইটের স্তূপের সঙ্গে বর্মার ইষ্টকমালার অনেকখানি সাদৃশ্য রয়েছে। উত্তর বর্মার সঙ্গে গঙ্গা বিধৌত ভারতের যে প্রাচীন অচ্ছেদ্য যোগসূত্র বিদ্যমান ছিল তারও স্বাক্ষর পাওয়া যায়। এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে তাগাউং-এর মঠ বা রাজ-প্রাসাদের দক্ষ কারিগরগণকে ভারতবর্ষ থেকেই হয়তো নিয়ে আসা হয়েছিল। পরবর্তীকালে 'নয়াপুগাং'-এর প্যাগোদার ইষ্টকমালাতেও অনুরূপ সাদৃশ্য বিদ্যমান। আর প্রাচীন ও বর্তমান শহরে বিবিধ নামানুকরণের মধ্যেও বর্মার তাগাউং-এর সঙ্গে গঙ্গোত্তরীয় ভারতের ঐতিহ্যের যোগসূত্রের ধারা অব্যাহত রয়েছে থাটুন বা পেগুর মারফত। বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থান কিংবা বর্মী বর্ণমালার নব প্রবর্তন সত্ত্বেও এ সিদ্ধান্তে অবশ্য উপনীত হওয়া যায় না যে উত্তর বর্মার ইরাবতী নদীর মধ্যবর্তী মঙ্গল শাখাগোষ্ঠীর আদিবাসীদের মধ্যে পূর্ববাংলা দিয়ে আগত ভারতীয় বাসিন্দাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না।

[বর্মার 'ইতিহাস' : আর্থার পি. ফাইরী ; পৃঃ ১০—১৫]

নাটকের সূচনা

খৃষ্টীয় চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে বর্মার গদ্য বা কাব্য সাহিত্য সুস্পষ্ট রূপ নিলেও বর্মা নাটক প্রথম রচিত হয় আরও অনেক পরে অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে—অবশ্য, পরবর্তী শতকে তার বহুধা বিকাশ ঘটে শিল্পকলায়।

বর্মার নাট্য সাহিত্যকে প্রধানত ছ'টি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। তার প্রথম যুগ হলো নিভাতখিম (Nibhatkhim)। সতেরো শ' বাহান্ন খৃষ্টাব্দ নাগাদ এ যুগের অবসান ঘটে। ইংরেজী অলৌকিক নাট্যকলার

সঙ্গে তার একমাত্র উপমা চলে বলে মন্তব্য করেছেন ডঃ মঙ তিন-অঙ। দ্বিতীয় যুগের সূচনা সতেরো শ' বাহান্ন থেকে আঠেরো শ' উনিশ, যার সঙ্গে তুলনা করা চলে ইংরেজী নীতি-নাটকের আর সভা-নাটকের। তৃতীয় যুগের সূচনা আঠেরো শ' উনিশ থেকে আঠেরো শ' তিপ্পান্ন। আর এই যুগের পুরধায় ছিলেন নাট্যকার উ-কিন-উ। চতুর্থ যুগ হলো আঠেরো শ' তিপ্পান্ন থেকে আঠেরো শ' আটাত্তর পর্যন্ত,। এ যুগের কবি ও নাট্যকার উপন নিয়া। পঞ্চম যুগের শুরু আঠেরো শ' আটাত্তর থেকে আঠেরো শ' ছিয়াশি। এই সময় বর্মার নাট্য-সাহিত্যের ক্ষয়িষ্ণু যুগ। পরবর্তী যুগের শুরু আঠেরো শ' ছিয়াশি থেকে। এই কাল আধুনিক নাট্য-সাহিত্যের নব জাগরণ।

সতেরো শ' বাহান্ন খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্তকে বর্মার নাট্য সাহিত্যের অন্ধকারময় যুগ বলা হয়। কেন না, এ সময় নানা বিপর্যয় ঘটে দেশব্যাপী। রাজধানী প্যাগানের পতন ঘটলো। শুরু হলো তারপর অন্তর্দ্বন্দ্ব—যুদ্ধবিগ্রহ (১২৮৭ থেকে ১৫৩১ খৃঃ)। এ সময় অবশ্য বর্মার নিজস্ব সাহিত্যধারার উদ্ভব ঘটে। আর পরবর্তী রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠ-পোষকতায় তার বিকাশ। এই স্থানীয় সাহিত্যানুশীলনের মারফত নতুন নাট্যকলা 'নিভাতখিন'-এর সৃষ্টি। 'নিভাতখিন'-এর প্রচলন ঠিক কবে থেকে শুরু সঠিক জানা যায় না বটে, তবে জাঁকজমক সহকারে ধর্মানুষ্ঠানের রীতি সতেরো শ' বাহান্নর আগে থেকে দেশে প্রচলন ছিল। এ সময় থেকে 'হসা' (Hawsa) বা ছন্দবদ্ধ আকারে উপাখ্যানের আবৃত্তিপ্রথা দেশে চালু হয়।

এখানে অবশ্য উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বারো শ' সাতাশি খৃষ্টাব্দের পর বর্মায় যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজশক্তি দেখা দেয় তার মধ্যে থেকে ভঙ্গুর রাজ আভা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন এবং সমগ্র বর্মা দেশ পনেরো শ' একত্রিশ খৃষ্টাব্দে জয় করেন। বেনিন্ননের শাসনকালে সমগ্র ইন্দোচীন, চীন ভূখণ্ডের কোন কোন বহিরাংশ আর মণিপুর রাজ্য বর্মার রাজার আনুগত্য স্বীকার করে। বেনিন্নন-এর শাসনকালে তাঁর দূরপ্রসারিত রাজশক্তি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। পেগু রাজা নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করে বর্মীদের পরাজিত করেন এবং বর্মাকে তেলাই সাম্রাজ্যের এক্তিয়ার-ভুক্ত করেন সতেরো শ' বাহান্ন খৃষ্টাব্দে। তাঁর এই রাজ্যকাল বেশীদিন

স্থায়ী হয় নি। কেন না, আলঙপায়া এ সময় বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন এবং বর্মার শেষ রাজবংশ স্থাপন করেন। তেলাইঙদের জোর করে বর্মী বানিয়ে নেন। আলঙপায়া ও তাঁর বংশধররা সমগ্র বর্মাকে এক রাজ্যে পরিণত করেন। সান রাজ্য, সিয়াম, আর আসাম নিয়ে নতুন করে বর্মা সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। সতেরো শ' বাহান্ন থেকে আঠেরো শ' উনিশ সত্যি বর্মার ইতিহাসে বিজয় বৈজয়ন্তীর ধ্বজা বহন করে আনে। তারপর বণিকের যে মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে ভারতের বুকে দেখা দিল তার ফলে আসাম, মণিপুর, আরাকান ও টেনাসিরিন প্রভৃতি বর্মার জনপদগুলি আঠেরো শ' চব্বিশ সাল নাগাদ একে একে বর্মার হাতছাড়া হয়ে গেলো। আঠেরো শ' বাহান্ন সালে নিম্ন বর্মার অবশিষ্ট অংশও ইংরেজরা দখল করে নিলো। তারপর ১৮৮৬-র ১লা জানুয়ারি বর্মার শেষ রাজা থীবকে পদচ্যুত ও বন্দী করে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সমগ্র বর্মা মুলুককে ভারত সাম্রাজ্যের পক্ষপুটে আনয়ন করে।

নৃত্যগীত

অষ্টাদশ শতকের পূর্বে বর্মা নাটকের সূত্রপাত হয় নি, একথা আগে বলা হয়েছে। কিন্তু নানা ধর্মানুষ্ঠানে নৃত্যগীতের প্রচলন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অষ্টম শতকের বর্মা, হিন্দু ও চৈনিকগণ বিদেশীদের সংস্পর্শে আসে। সমগ্র ইন্দোচীন বৃহত্তর ভারতের উপনিবেশে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। তখন যে বর্মার নিজস্ব নাচ গানের অস্তিত্ব ছিল তার প্রমাণ রয়েছে। উত্তর বর্মার নানচাও (এখনকার ইউনান) রাজ্যের দুজন বর্মী প্রতিনিধি চীন সম্রাটের রাজসভায় গিয়ে বর্মী গান শুনিয়ে আসে ("নানচাও-এর পবিত্র সঙ্গীত")। নানচাও-এর পবিত্র সঙ্গীতে সংস্কৃত শব্দঝংকার মিশ্রিত ছিল বলাই বাহুল্য। নানচাও-এর সেই পবিত্র সঙ্গীত সম্পর্কে চীন সম্রাটের রাজদপ্তরে এখনও উল্লেখ পাওয়া যায়: "পিয়াও (বর্মার চীনা নাম। দশম শতক পর্যন্ত এই নামে বর্মা পরিচিত ছিল) দেশের সঙ্গীত মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে বুঝি আজ আসছে ভেসে, আঙচিয়াঙ-এর পুত্র সুনন্ত দক্ষিণ দেশের এ সঙ্গীতাঞ্জলি নববর্ষে এনেছে সঙ্গে করে।"

[জি. ই. হার্বে: বর্মার ইতিহাস]

মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের এ সঙ্গীতাঞ্জলি ও নানা মণিমুক্তা অলঙ্কৃত বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর ধ্বনি সে দিন চীন সম্রাট তাঁর রাজসভায় বসে কান আকীর্ণ করে শ্রবণ করেছিলেন। বর্মার এই নৃত্যগীত প্যাগান রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। প্যাগান রাজ অলঙসিতু (একাদশ শতক) নিজেও একজন সঙ্গীত বিশারদ ছিলেন। তাঁর পিতামহ বাঙলা দেশ পর্যন্ত যখন তাঁর সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন তিনি তখন তাঁর এই বিজয়ী কীর্তিকথা শুধু প্রস্তরফলক দ্বারা চিহ্নিত করে যান নি, তাঁর রাজ্যের সেরা বর্মী সঙ্গীতজ্ঞদের মূর্তিও স্থাপন করে আসেন বলে জানা যায়। যাভা ও সুমাত্রার নৃত্যগীতে বৃহত্তর ভারতের সংস্কৃতিধারা বিশেষ করে রামায়ণ-মহাভারতের পৌরাণিক যুদ্ধ কাহিনীর যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, আশ্চর্যের বিষয়, তখনকার বর্মার গীতিনাট্যে তার প্রতিচ্ছায়া নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় বর্মা তার শিল্পকলায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল তখনই বুঝি।

গ্রাম্য উৎসব

কিংবদন্তী থেকে আরও জানা যায়, সুদূর অতীতে জনগণ যখন দুঃখ দুর্দশায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল তখন তাদের উজ্জীবিত করে তোলবার জন্য সংস্কৃত নাটকের সৃষ্টির। জাপানী নাটকের উৎপত্তির মূলেও নাকি সূর্যদেব-এর পত্নীর মনস্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দেবতাদের সক্রিয় আবেদন নিবেদনের অভিনয়। আর চীনে নাটকের মূলেও নাকি রয়েছে সম্রাট ইউয়েন সান খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে একদল বালক-বালিকাকে এমন করে গান বাজনা শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছিলেন যে তারা যেন তাঁর প্রিয় পত্নীর নিকট চীনের জাতীয় বীরপুরুষদের কীর্তিকলাপের কথা পুনরাভিনয় করে তার তুষ্টি বিধান করে। বর্মা নাটকের মূলে অবশ্য এমন ধারা কীর্তিকলাপ কিংবা কিংবদন্তী নেই। তার উৎস হলো ধর্মানুষ্ঠানিক 'নিভাতকিন'। বর্মার এই অলৌকিক রহস্য-নাটকের পূর্বে স্থানীয় বাসিন্দাদের লোক উৎসব আর 'অশরীরী নৃত্য'-র কিছুটা পরিচয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না আশা করি। কেন না, এ সব লোকনৃত্যে নাটকীয় বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়।

এ সব লোককলাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ এক হোল যেগুলি বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আর বাকীগুলি যার সঙ্গে ধর্মের কোন যোগাযোগ নেই। বৌদ্ধ উৎসবগুলি বিশেষ করে নির্দিষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত হতো। তাদের মধ্যে বৌদ্ধ পূর্ণিমায় কিংবা 'নববর্ষের' উৎসব বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য।

নিভাত্‌কিন হলো ইংরেজী অলৌকিক ও রহস্য নাটকের বর্মীয় প্রতিরূপ। অতি জনপ্রিয় এই নাট্যকলা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ও বিবিধ ধর্মানুষ্ঠানে অভিনীত হতো। লোকচিত্ত জয়ের উদ্দেশ্যে 'লু-বিয়েৎ' বা ভাঁড়ের প্রবর্তন এই লোকনাট্যের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। বুদ্ধ বা দেবদূতের জন্মকাহিনী বিশেষ করে এই সব লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু। মূলতঃ ধর্মকর্ম ও লোকশিক্ষা এই সবের লক্ষ্য হলেও তারা পল্লীর সহজ মানুষগুলোর চিত্তকে জয় করে নিয়েছিল। বিচিত্র মুখোশ পরিহিত নিভাত্‌কিনের 'নট' বা নটীদের নর্তনকুর্দন তাদের মনে বিপুল আনন্দের জোয়ার বইয়ে দেয়। নিভাত্‌কিনের মতো 'হস'ও লোকচিত্ত জয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। কাব্যাকারে জাতক কাহিনীর সংলাপগুলো সুর করে আবৃত্তির মারফত এই নাটকীয় পরিবেশের সৃষ্টি করা হতো। 'হস' মূলতঃ কাব্যধর্মী ছন্দবদ্ধ সাহিত্য-কীর্তি। বাংলার কথক বা কবি-গানের মতো ছিল অনেকটা। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত যখন সিয়াম বিজিত হয় তখনও এ লোককলা বিশেষ সমাদৃত ছিল।

"রাম নাটক"

পূর্বেই বলা হয়েছে, ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে সিয়াম বিজয় বর্মার সাংস্কৃতিক জীবনে এক নব দিগন্তের উন্মেষ ঘটায়। বর্মার রাজসভা 'আভা'র তখন বিজয়বৈজয়ন্তী। সিন বি-উসিন-এর রাজত্বকালে সিয়ামের সাংস্কৃতিক বহুবিধ আচার অনুষ্ঠান ও ধারা বর্মা গ্রহণ করে। সিয়ামের 'রাম নাটক' বা 'রামজাত'-এর অন্যতম নিদর্শন। 'জাত' বৌদ্ধ জাতক কাহিনীর বর্মী নামকরণ। সিন বিউসিন-এর আমলে রাজসভায় এই 'রামজাত' নাটক অভিনীত হয়। পরবর্তী রাজা সিঙ্গু যেমন বিদ্যোৎসাহী ছিলেন তেমনি নিজেও সুন্দর গীতিকাব্য রচনা করতে পারতেন। সিয়ামের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের যিনি সর্বাপেক্ষা ধারক ও বাহক ছিলেন তিনি

হলেন রাজমন্ত্রী মায়াবদ্রী। সিয়ামের রাজসভায় জঁাকজমক বজায় রাখার তিনি পক্ষপাতী হলেও তাকে হুবহু নকল করার তিনি বিরোধী ছিলেন। তাই তিনি Aindarwunsha নাটকের অনুবাদ করবার সময় তার নামকরণ করেন 'ঈনান'। এই 'ঈনান' নাটকে মন্ত্রী মায়াবদ্রী যতদূর সম্ভব বীররসাত্মক কাহিনী বাতিল করে নায়ক নায়িকার রোমান্টিক কাহিনী সন্নিবেশিত করেন। 'ঈনান', 'রামজাত'-এর চেয়ে দীর্ঘতর। এই দীর্ঘ নাটকে বিবিধ পাত্র-মিত্র, বিবিধ দৃশ্য ও ঘটনাবলীর এমনি অসংলগ্ন সমাবেশ যে পূর্ণাঙ্গ অভিনয় সম্ভবপর নয়। এতে নাটকীয় সংঘাতের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। তবুও সিয়ামীয় নানা বাদ্যযন্ত্র আর গানে নাটকখানি আগাগোড়া ঠাসা। নৃত্য বা জঁাকজমকপূর্ণ পোশাক-আশাকের অনুপস্থিতিও তাতে বিশেষ করে লক্ষ্যণীয়। এ নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তার প্রাঞ্জল ভাষা, নাটকীয় সংলাপ আর চরিত্র লিপিকুশলতা। মায়াবদ্রীর এ নাটকের আর এক বৈশিষ্ট্য হলো চটুল, প্রাণবন্ত আর নিপুণ হাতে গড়া তাঁর নারী চরিত্র-গুলো। মায়াবদ্রীর এই নাটক সেকালের বর্মার নাট্য সাহিত্যে সত্যিই শীর্ষ স্থান অধিকার করেছিল। পরবর্তী যুগের নাট্যকার উ-কিন-উ আর উ-পঙ নায়ারের তিনি পূর্বসূরী। মায়াবদ্রীর 'ঈনান'-এর অনুপ্রেরণায় উত্তরকালে বহু নাটক লিখিত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে মহিলা নাট্যকার মিন-স্থানের সাহিত্যকীর্তি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল সবিশেষ।

এই সময় রাম নাটক এতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, নাটকীয় শিল্পকলা রক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য এক নতুন রাজকীয় দপ্তরের সৃষ্টি করা হয়। কবি উ-তো এ সময়কার শ্রেষ্ঠ গীতি-নাট্যকার। 'হস'র অনুরূপ 'জাগন' রচনা করেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তার 'রাম-জাগন'এর নাটকীয় বিষয়বস্তুর অপেক্ষা নৈসর্গিক বর্ণনা ও কাব্যানুশীলন বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। তিনি তাঁর 'রাম জাগনে' বর্মার জন-মানুষের জীবনালেক্ষ্য তুলে ধরেছেন। তাঁর 'লনমা গানে' বা ছোট্ট মেয়ে সীতা যেন জনক-তনয়া নন, ব্রহ্মদেশের এক সাধারণ কৃষক কন্যার প্রতীক। কবি উ-তো গীতিনাট্য এককালে দেশের সর্বত্র সমাদৃত ও গীত হতো।

উ-কিন-উ ও উ-অ-বা-থর রচনায় বর্মার নাটকীয় ধারা অব্যাহত

থাকে। উ-অ-বা-থ ছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু। সংস্কৃত ও পালী ভাষায় ছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিত। বর্মার গদ্য ভাষাও তাঁর হাতে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। কেন না, ইতিপূর্বে পণ্ডিত সমাজ গদ্য রচনার চেয়ে শ্লোক বা ছন্দবদ্ধ কবিতার রচনার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট ছিলেন। সুতরাং অবহেলিত গদ্য ছিল তাই অনেকটা দুরূহ ও কষ্টসাধ্য। তাঁর লিপিকুশলতায় বর্মার গদ্য অনেকাংশে প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে, বিশেষ করে জাতক কাহিনীগুলো। বর্মার নাটকও তাঁর কুশলী হস্তে শব্দালংকারপূর্ণ ভাষার মোহ কাটিয়ে সহজ প্রাঞ্জল রূপ পরিগ্রহণ করে। উ-কিন-উ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি উনবিংশ শতকের বর্মার রাজা বগাইদ (১৮১৯-৩৭), থারাবদ্দি (১৮৩৭-৪৬) আর প্যাগান-এর (১৮৪৬-৫৩) পক্ষছায়ায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠেন। পালি আর সিয়ামী ভাষায়ও বুঝি তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি সিন বংউই শহরের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়েছিল। তিনি গীতিকাররূপেও প্রথম জীবনে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর ছ'খানি নাটক ছাড়াও তিনি বহু গান রচনা করে গেছেন। বৌদ্ধ জাতক কাহিনী অবলম্বনে রচিত তাঁর নাটকগুলি সেকালের বর্মা সাহিত্যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল স্বকীয় বলে। নাটকের চরিত্র সৃষ্টিতেও তিনি ছিলেন জীবধর্মী ও বাস্তবানুগ। নাটকীয় সংলাপ ও ঘাত-প্রতিঘাত অঙ্কনেও তিনি ছিলেন কুশলী শিল্পী। 'পারপাহেইন' (Parpahain) নাটকই বুঝি উ-কিন-উ-র শ্রেষ্ঠ রচনা। 'মাহ' ও 'ওয়েথানদয়া' তাঁর প্রথম জীবনের রচনা। কিন্তু জনপ্রিয়তায় এরাও কম যায় না। 'উ-অ-বা-থ' মাহ-তাভা জাতক অবলম্বনে নাট্যকার উ-কিন-উ তাঁর রচনা লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু উ-কিন-উ তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারান নি। রাজায় রাজায় যুদ্ধ বিগ্রহের বিশদ বিবরণের আশ্রয় না নিয়ে উ-কিন-উ চরিত্র চিত্রণের প্রতি সবিশেষ প্রয়াসী ছিলেন। 'মাহ'-এর প্রতিদ্বন্দ্বী কাউত-এর চরিত্র মাধ্যমে তিনি তাঁর জীবন আদর্শ প্রতিফলিত করেছেন। দেখিয়েছেন ভাল আর মন্দের সংগ্রাম জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি নয়। ভাল আর মন্দ-র সংগ্রামে নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস নিহিত। 'মাহ' কোন দৃশ্য বা অঙ্কে বিভক্ত নয়। উপন্যাসের অনুরূপ এ দৃশ্য-কাব্যে কোন বিরতির অবকাশ নেই।

তাঁর প্রথম জীবনের রচনা 'দেওয়াগনবন'। এ নাটকে তাঁর কুশলী হস্তের কোন ছাপ নেই বলে বর্মার সমালোচকরা মন্তব্য করেছেন। নাটকীয় পরিসমাপ্তি বলে তাঁরা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উ-কিন-উর দার্শনিকতার পূর্ণ ইঙ্গিত এই নাটকেও রয়েছে। আড়ম্বরপূর্ণ মহত্তর জীবনের শেষ অবলম্বন কিন্তু মঠের শান্তিপূর্ণ আশ্রয়। পারপাহেইন তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে পূর্বে বলা হয়েছে। এই নাটকের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায়, বৃদ্ধ রাজা তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করে মঠে গিয়ে ধর্ম-কর্মে মনোনিবেশ করবেন বলে সংকল্প করেছেন।

উ-পন-ন্য

'বিজয়' নাটক উ-পন-ন্যর এক অপূর্ব সাহিত্য কীর্তি। বিজয় নাটকের কাহিনী সিংহলের বৌদ্ধ কিংবদন্তী আর ঐতিহাসিক উপাদান থেকে সমুৎসারিত। শুধু সিংহলের ইতিহাস নয়, সিংহলের ভারতীয় উপনিবেশের প্রতিষ্ঠার কাহিনীর ইতিহাসের সঙ্গেও অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে। নাট্যকার উ-পন-ন্য আধা ধর্ম ও আধা ইতিহাস এমনি ঔপনিবেশিক কাহিনী অবলম্বন করে তাঁর নাটক রচনা করতেন। প্রথম অঙ্কের যবনিকা উঠলে দেখা যায়, রাজ-সিংহাসনে রাজা রানীসহ স্ব-পারিষদ বসে আছেন। এই সময় সহসা সমবেত দূরাগত কণ্ঠস্বর শোনা গেল: "আমাদের সাহায্য করুন, হে রাজা বাহাদুর! আপনার পুত্র বিজয় আপনার প্রজাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করছে। তাকে সাজা দিন, বধ করুন, হে প্রভু! আপনি আপনার মন্ত্রী বাহাদুরদের জিজ্ঞেস করে দেখুন, আমাদের এই অভিযোগ ঠিক কি না। আপনার গরীব প্রজাদের রক্ষা করতে তারা বিনীত আবেদন জানাচ্ছে। সাহায্য করুন, হে রাজন্!"

প্রজাদের আর্ত চিৎকার শ্রবণ করে রাজা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয়কে তলব করে পাঠালেন। অনুসন্ধান করে জানলেন, সত্যি সত্যি রাজকুমার তার বিপুল সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে নিরীহ প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার, নিপীড়ন ও নির্যাতন চালিয়ে আসছেন বহুদিন থেকে। মন্ত্রীরা সব জেনেও রাজকুমারের এ অত্যাচারের কথা রাজার কর্ণগোচর করেন নি ভয়ে। রাজা রাজকুমারকে ডেকে পাঠিয়ে প্রজাদের এই অভিযোগ

সত্য কিনা জিজ্ঞেস করলেন। রাজকুমার অকপটে এই অভিযোগ স্বীকার করে নিলেন এবং পাল্‌টা অভিযোগ করলেন, যেহেতু তাঁর অভিযোগের কথা মন্ত্রীরা রাজাকে জানান নি, তাঁরাও সমান অপরাধী। তাঁদের শাস্তি দেওয়া হ'ক। রাজা সব শ্রবণ করে রাজকুমারকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। রানী রাজকুমারের প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে কাতর আবেদন নিবেদন করতে লাগলেন। রাজকুমার বিজয় আপন জননীকে নিরস্ত হতে অনুরোধ করলেন এবং বললেন রাজার মৃত্যুদণ্ড শিরোধার্য করতে তিনি প্রস্তুত। রাজকুমারের এ নির্ভীকতা ও ন্যায়পরায়ণতা দেখে রাজা অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। তাই মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে রাজকুমারকে নির্বাসন দিলেন। রাজকুমার বিজয় তখন তাঁর সাতশত অনুচর নিয়ে ডিঙি ভাসিয়ে দুস্তর সাগর পার হয়ে সিংহল দ্বীপে এসে উপনীত হলেন। স্বর্গের দেবতাগণ দেখলেন, রাজকুমার বিজয়ই সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন করবেন। আর সিংহলই হবে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের অন্যতম কেন্দ্রস্থল। সুতরাং রাজকুমারকে সকল আপদ-বিপদে সহায়তা করা দরকার। বিশেষ করে যখন সিংহল দ্বীপটি দৈত্য দানব রাক্ষসে পরিপূর্ণ। দেবরাজ তাঁর প্রধান মন্ত্রীকে ডেকে রাজকুমারের সাহায্যার্থে পাঠালেন। দেবমন্ত্রী তখন তপস্বীর বেশে রাজকুমারের সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং দ্বীপটির সম্পর্কে নানান তথ্য জানিয়ে তাঁকে সজাগ করে দিলেন। সিংহলের বাসিন্দাদের বশীভূত করবার জন্য ধর্মমন্ত্র দিলেন।

এদিকে হয়েছে কি, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সিংহলের রক্ষরাজের এক রূপসী ভগ্নিকন্যা ছিল। সে খালি সমুদ্রের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াত আর ঝড়ে বিধ্বস্ত নাবিকেরা কূলে এসে ঠেকলে, তাদের ধরে খেয়ে ফেলতো। রাজকুমার বিজয় ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের দেখে, রাক্ষসীটি তখন করল কি, নিজে এক তপস্বিনীর বেশ ধারণ করলে। আর তার দাসীকে মায়াবলে বানিয়ে দিল এক কুকুর। সমুদ্রের তীরে এক পুকুরের পাড়ে বসে মায়াবিনী রাক্ষসী তখন তার কুকুরটিকে তৃষ্ণার্ত নাবিকদের কাছে প্রেরণ করল। সমুদ্রের তীরে পুকুর দেখতে পেয়ে নাবিকেরা ভাবলো, আশেপাশে কোন জনমানবের বসতি রয়েছে। সুতরাং ওরা কুকুরটি অনুসরণ করে মায়াবিনী যে পুকুরের ধারে তপস্যা করছিল, সেখানে উপস্থিত হ'ল। জলাশয় দেখে তৃষ্ণার্ত নাবিকেরা যেই জল পান করতে

যাবে, অমনি মায়াবিনী তার নিজের আসল মূর্তি ধারণ করে ওদের পেছন থেকে আক্রমণ করে বসলো। এদিকে বিজয় তাঁর অনুচরদের ফিরতে বিলম্ব দেখে মহা চিন্তাকুল হয়ে উঠলেন। নতুন বিদেশ বিভূঁয়ে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের আর কাউকে না পাঠিয়ে তিনি নিজেই চললেন তাদের সন্ধানে। খুঁজতে খুঁজতে তিনি মায়াবিনীর নিকট এসে উপস্থিত হলেন। মায়াবিনী বিদেশী রাজকুমারকে প্রথমে ছলে বলে বশীভূত করতে চেষ্টা করলে। কিন্তু বিদেশী রাজকুমারের বলিষ্ঠ দেহ আর শৌর্যবীর্য দেখে নিজে বশীভূত হয়ে তাকে আত্মনিবেদন করলে। ছদ্ম তপস্বিনীর মুখে প্রেম নিবেদনের চটুল আকুলতা দেখে রাজকুমারের মনে সন্দেহ হলো। বিজয় তাকে হত্যা করার ভয় দেখাতে তপস্বিনী তখন সব কথা স্বীকার করলো এবং আর জানালো যে সে রাক্ষসী, মায়া বলে বিজয়ের অনুচরদের সবাইকে বন্দী করে রেখেছে। বিদেশী রাজকুমার বিজয়কে তখন রাক্ষসী তাঁর অনুচরদের কাছে নিয়ে যায় এবং তাদের সবাইকে মুক্তি দেয়।

নাট্যকার উ-পন-ন্য এখানে প্রচলিত কাহিনীর মামুলী পথ না মাড়িয়ে স্বীয় নাট্য-রীতি বজায় রেখেছেন। তিনি বিদেশী রাজকুমারের সঙ্গে রক্ষ-কন্যার মিলন ঘটাতে পশ্চাদপদ হননি। তবে এ স্থলে নর-রাক্ষসের সহ অবস্থিতি সম্ভব নয়। নর-রাক্ষসের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং বিজয় রক্ষকুলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যোগী হলেন। রক্ষ-দুহিতা তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হলো। রক্ষ কন্যা বললো—সে অশরীরী আত্মা হয়ে যেখানে শূন্যের উপর তার মামা সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে খানাপিনা করছে, সেখানে উঠে গিয়ে চিৎকার করে উঠবে অদৃশ্য থেকে। সেই চিৎকার শুনে বিজয় যেন শব্দভেদী বাণ ছোঁড়ে। বিজয় তাই করলেন এবং এই শব্দভেদী বাণের দারুণ আঘাতে সিংহলের রক্ষ-রাজ ভূতলে পতিত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

[রক্ষ-রাজের মৃত্যুকাতর চিৎকার মঞ্চের পশ্চাদভাগ থেকে ক্ষীয়-মাণ শোনা যাবে নাটকে।]

অতঃপর সুন্দর বেশ-ভূষা করে পুনরায় রক্ষ-কন্যার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব। বিদেশী রাজকুমারকে মৃত রাজার বর্মাস্ত্র পরিধান করতে অনুরোধ করলো। এই বর্ম যে পরবে, সে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা

পাবে। বিজয় তাই করলেন। এবং সব শত্রুদের পরাস্ত করে, রক্ষ-কন্যাকে বিয়ে করলেন এবং সুখে-শান্তিতে সিংহল দ্বীপে বাস করতে লাগলেন। কালক্রমে তাঁদের একটি পুত্র ও একটি কন্যা হয়।

নিপুণ নাট্য-শিল্পীর হাতে এখানেই নাটকের অবসান নয়। নাটকীয় সংঘাতের জন্য নায়ক-নায়িকার বিরহ-মিলন ঘটানো বুঝি এবার প্রয়োজন। রাক্ষসী রাজমাতার উপস্থিতিতে এতদিন পর নতুন করে আবার সমস্যার উদ্ভব হলো। আশেপাশে অপরাপর রাজন্যবর্গ বিজয়কে ব্যঙ্গ কটূক্তি করতে ছাড়লো না। অগত্যা তিনি রাক্ষসী রাজ-মাতাকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হলেন। তারপর নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে উ-পন-ন্য-র এ অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টির যবনিকা ঘটে। এ নাটকের ঘটনা-বলীর সঙ্গে বাংলার একটি অর্ধ ঐতিহাসিক কাহিনীর প্রভাব আছে কিনা পাঠক-পাঠিকারা তা বিচার করে দেখবেন। 'বিজয়' নাটক উ-পন-ন্যকে অমরতা দান করেছে। 'বিজয়' নাটক বর্মা নাট্য-ইতিহাসে নতুন আঙ্গিক ও কলাকুশলতার শুধু অবতারণা করেনি, উ-কিন-উ-র প্রবর্তিত নাট্যধারা থেকে পৃথক পথও প্রদর্শন করেছে।

'কথলা' নাটক উ-পন-ন্য-র নিজস্ব কাহিনী অবলম্বনে রচিত। তাঁর আগেকার রচনা 'পদুমা' কিংবা 'ভেস্তিওয়ালা' বা 'ওয়েথানদয়া' প্রভৃতি নাটকেও তাঁর কুশলী শিল্পকলার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন প্রধানতঃ রাজ-সভার নাট্যকার; পারিষদের মনস্তুষ্টির জন্যই নাটক রচনা করেছিলেন। তবু কিন্তু তিনি প্রাচীন সভা-নাটক—'রামনাটকের' পুনরুজ্জীবনের জন্য সচেষ্ট হননি, যা উ-কিন-উর জনপ্রিয় নাটকগুলিতে পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে উ-পন-ন্য ছিলেন বাস্তবপন্থী; প্রাচীনপন্থী সভা-নাটকের পৌরাণিক যুগে ফিরে যেতে তিনি ছিলেন পরাঙ্মুখ।

উ-কিন-উর মতো উ-পন-ন্যও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও তাদের নিয়ামকদের প্রতি তীক্ষ্ণ কটূক্তি করতে পশ্চাদপদ হননি। তিনি বরং আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে তাঁর নাটকে জাতীয় কলঙ্ক—এসব অনাসৃষ্টি রাজনৈতিক আয়ুধ হিসেবে ব্যবহার করতেন। 'পদুমা' নাটকে তিনি অনাচার ও বিলাস-ব্যসনে ভাসমান রাজঅন্তঃপুর-

চারিণীদের মুখোশ খসিয়ে দিয়েছেন। এই একখানি নাটক রচনার পরই তিনি বর্মী রাজন্যবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'ভেস্তিওয়ালা' নাটকেও তিনি দেশের অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে জনগণের ধূমায়িত অসন্তোষ ও বিক্ষোভের চিত্রটি রূপক আকারে উত্থাপিত করেন। রাজভ্রাতাদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের জন্য গোপন চক্রান্তের ইঙ্গিত দিতেও তিনি পিছ্‌পা হননি। 'ভেস্তিওয়ালা' নাটকের এক স্থলে তিনি বয়স্ক এক রাজকুমারের মুখ মারফত সিংহাসনাসীন রাজার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়ে বলছেন ঃ

"নীচ বংশজাত কোন এক রাজকুমারকে যদি পিতা যুবরাজ করতে চান, তিনি তা করতে পারেন। কিন্তু এটা ভাবলে ভুল হবে যে, সে-ই পরে রাজা হবে। 'ভেস্তিওয়ালা' নাটকে তার নজির রয়েছে।"

নাটকে উল্লিখিত এ সংলাপ বর্মার পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাসে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা রাজা থারাওয়াদ্দী (১৮৩৭-৪৭) ও তাঁর উত্তরাধিকারী প্যাগানের (১৮৪৭-৫৩ খৃঃ) অক্ষম রাজত্বকালে আর ভ্রাতৃ-বিরোধের কুটিল দ্বন্দ্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর হস্তে স্বাধীন বর্মার পুনঃ পুনঃ বিপর্যয় ও অঙ্গচ্ছেদের ফলে যে অসন্তোষ আর বিক্ষোভ তারই প্রতিচ্ছবি বুঝি 'উ-পন-ন্য'র 'ভেস্তিওয়ালা' নাটক। কেন না, ১৮৫৩ সালে রাজা প্যাগানের রাজ-ভ্রাতা মিণ্ডন বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন ও মান্দালয়ে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সুনজরে পতিত হয়েছিলেন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে সুখসমৃদ্ধি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মিণ্ডন ছিলেন নাট্যকার উ-পন-ন্যর বিশেষ অনুরক্ত ও পৃষ্ঠপোষক। এর মূল্য তাঁকে কিন্তু দিতে হয়েছিল। কেন না, মাইণ্ডন বিদ্রোহের সময় দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ আর বিদ্যোৎসাহীকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে সমর্থন জানাতে গিয়ে তাঁকেও বেঘোরে প্রাণ হারাতে হয়।

উ-পন-ন্য একজন সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। তিনি বহু সংখ্যক গীতি কবিতা রচনা করে গেছেন। কিন্তু কোন সঙ্গীত তিনি তাঁর নাটকে সংযোজিত করেন নি। রাম-নাটকের উদ্যোক্তা পরিপোষক উ-কিন-উ তাঁর একটি মাত্র নাটক (দেওয়া-গন-বন) ছাড়া—যেখানে তপস্বী লব আর কুশ

দুই রাজকুমারকে রামায়ণ গান শিক্ষা দিচ্ছেন, সে দৃশ্য ছাড়া—কোথাও সঙ্গীতাংশের অবতারণা করেন নি। নৃত্য-গীতকেও তিনি পূর্ণমাত্রায় বর্জন করেছিলেন।

উ-পন-ন্যর মৃত্যুর পর বর্মা নাট্য-সাহিত্যে একরূপ কোন সার্থক সৃষ্টির সন্ধান মেলে না। অভিনেতারাই পুরোনো নাটকগুলিকে এদিক ওদিক অদলবদল করে লোকরঞ্জনের জন্য উত্থাপিত করতেন। বর্মা নাটকের আদি পীঠস্থান আপার বর্মা থেকে নাট্যকলা একরূপ মুছে যায়। মঠ বা বিহারে ধর্মকৃত্যের মহিমা বর্ণনা করে নাটক সৃষ্টি যে হয় নি এমন নয়। তবে সাধারণ প্রেক্ষাগৃহে সেগুলো অভিনীত হয়নি। বর্মার জাতীয় রাজধানী মান্দালয়ের গৌরবও অস্তমিত হতে থাকে।

ক্ষয়িষ্ণু যুগ—১৮৬৬-৭৭

তার পরিবর্তে বৃটিশ বর্মার নয়া রাজধানী রেঙ্গুনের পত্তন হয় (১৮৮৬ সালে সমগ্র ব্রহ্মদেশ বৃটেন কর্তৃক কবলিত হয়)। ইংরেজ শাসনের ফলে বহির্জগতের সঙ্গে বর্মার যোগসূত্র আরও গভীর হয়ে উঠলো। সুলভ মুদ্রাযন্ত্রের দৌলতে দেশে পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশের সুযোগ বেড়ে গেলো। ফলে নতুন করে নাটক-নাটিকা রচিত হতে থাকে। শুধু তাই নয়, তাদের প্রচার সংখ্যা দেশের মধ্যে অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। সায়াইর নাটক থাটনের ইতিহাস ১৮৭৭ সালে প্রকাশের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ১৫ হাজার কপি বিক্রয় হয়েছিল বলে জানা যায়।

সায়াইর-র এ নাটকখানি বর্মার নাট্য-সাহিত্যে 'ক্ষয়িষ্ণু যুগের' (১৮৬৭—৭৭) উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। থাটনের ইতিহাস তাঁর মৌলিক রচনা এবং একমাত্র রচনা। তিনি একখানি মাত্র নাটক লিখে বর্মার নাট্য-ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় একাদশ শতকে থাটনের ইতিহাসের অবতারণা করা হলেও সায়াইর-র রচনায় আর যাই থাক, ইতিহাস ছিল না। নাটকীয় উপাদানের মধ্যে কোনরূপ সংহতি ছিল না। কাহিনীও অনেকটা অসংলগ্ন ও অনধিগম্য ছিল। তবু চটুল নাট্য-গীতে ব্যাপক সমারোহের ফলেই বুঝি নাটকখানির জনপ্রিয়তা জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইউ-কু-র রচিত "বানর ভাইবোন" এই যুগের আর একখানি জনপ্রিয় নাটক।

ইউ-কু ছিলেন গীতিকার ও সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁর এই প্রথম নাটক রচনার পূর্বে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন বহুবিধ নাট্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে উপদেষ্টা ও শিল্পনির্দেশক হিসেবে। উ-কিন-উ ও উ-পন-ঞ্যর নাট্য-সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন বলে ইউ-কু আর অবান্তর বানর নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হননি তাঁদের জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও। তিনি তাঁর পরবর্তী নাটক ওয়েথান-দেয়া (১৮৭৮), ভুয়িদাত (১৮৮০), কারকুন্নায় (১৮৮১) প্রভৃতি নাটকে জাতক কাহিনীরও আশ্রয় নেন। এই 'ক্ষয়িষ্ণু যুগে' 'স-ফয় স-মে' কিংবা 'লঙ্কালাফ' এর ইতিহাস কিংবা মিরান্দ (১৮৮৩) ইত্যাদি খ্যাতি লাভ করে। স্থূল রুচি ও অভিব্যক্তিতে এই নাটকগুলিও কম জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি। যদিও তাদের নাট্যকার সায়া-সুর নাম আজ কেবল পণ্ডিতদের মুখে শ্রুত হয়ে থাকে, জনসাধারণের নিকট বিস্মৃতপ্রায়।

ক্ষয়িষ্ণু যুগের নাট্যকার ও নাট্যকলার সঙ্গে পূর্বসূরীদের বৈশিষ্ট্য এই যে, নাটকীয় কলা-নৈপুণ্য অপেক্ষা তাঁরা জমজমাট উপাখ্যান পরিবেশনের দিকে বেশী নজর দিতেন। জাঁকজমক পোশাক পরিচ্ছদের প্রতি তাঁদের বেশী আকর্ষণ ছিল। অভিনেতাদের স্বভাবজাত, মরমী অভিনয়-কলা অপেক্ষা অতিনাটকীয় ভাবভঙ্গি প্রদর্শনের প্রতি বিশেষ স্বকীয় হতো। 'বানর' নাটকের ভাবালুতা বুঝি এরই অশ্রুজল, মৃত্যু বা দর্শকের মনে করুণার উদ্রেক, দৃশ্যপটের অবতারণা ইত্যাদি এই শ্রেণীর নাটকের সাধারণ অঙ্গ। অবশ্য ঠাট্টা ও ভাঁড়ামিতে এগুলি কম যায় না এবং অনেক ক্ষেত্রে শালীনতার মুখোশ খসিয়েও ফেলতো। চরিত্র-চিত্রণ যে নাট্যকলার একটি প্রধান অঙ্গ, তা এ যুগের নাট্যকারেরা বুঝি বিস্মৃত হয়েছিলেন। হয়েছিলেন তেমনি চিরন্তন মানুষের হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখ, বিরহ ও মিলনের কথা প্রতিফলিত করতে।

জানুয়ারি ১৮৮৬ খৃঃ সমগ্র বর্মা বৃটিশ করায়ত্ত হয়। বর্মার নাট্য-সাহিত্য ও শিল্পকলার ওপর প্রভাব তার উপর গভীরভাবে দেখা দেয়। কেন না, রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নতুন রচনা আর রচিত হলো না। শুধু রচিত হয়নি—তাই না দেশের অরাজকতার ফলে শিল্পকলা ও সাহিত্যের উপর প্রভাব পড়ে অনেকখানি। পরিণামে প্রাচীন নাট্য-শিল্প একরূপ বিস্মৃত, অনাদৃত হয়ে পড়ে। ডঃ মউঙ্‌ তিন-অউঙ্‌ তাঁর সুবিখ্যাত বর্মা নাটকের ইতিহাস গ্রন্থে এ ক্ষয়িষ্ণু যুগকে তুলনা করেছেন

ক্রমওয়েল-এর সঙ্গে। ক্রমওয়েল যেমন ইংল্যাণ্ডের রঙ্গালয়গুলি বন্ধ করে দিয়ে প্রাচীন নাট্য-সাহিত্যের মূলে কুঠারাঘাত হেনেছিলেন, উনিশ শতকের শেষার্ধে বর্মার বৃটিশ শাসন তেমনি বর্মার প্রাচীন নাট্যকলার ওপর চরম আঘাত হানে। ইংরেজী নাটকের মতো বর্মার নাট্য-সাহিত্য আর পুনরুজ্জীবন লাভের সুযোগ পায়নি। বৃটিশ শাসনের ফলে নতুন আঙ্গিকের লোক-কলার পথ খুঁজে পায় বিংশ শতকে।

'বৃটিশ প্রভাব'

বর্মার রাজনৈতিক অরাজকতার কালো মেঘ দূর হলে দেশে শান্তি, সুখ-সমৃদ্ধি আবার ফিরে এলো। সাহিত্য, নৃত্য-গীত আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠলো। সাধারণের মধ্যে প্রাচীন নাট্যাবলীর প্রতি সমাদর আর রইলো না। এমন কি, উ-কিন-উ, উ-পন-ন্যর নাটকও কেউ আর আগ্রহ সহকারে পাঠ বা দর্শন করতে ভুলে গেল। তার পরিবর্তে বর্মায় প্রবর্তিত হলো—শ্যামদেশীয় নাটক আর শ্যামের দরবারী রোমান্স কাহিনী। বর্মা ভাষায়ও তাদের অনুকরণে নতুন নতুন দরবারী রোমান্স কাহিনী সৃষ্ট হতে শুরু করলো।

এভাবে বর্মা সাহিত্যে উপন্যাসের সূচনা হয়। 'উ-অ-বথা' জন্ম কাহিনী লোকে পরম আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করলো। আপার বর্মা ব্রহ্মদেশের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির পর মিশনারীদের দৌলতে বহুবিধ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পত্তন হয়। ইংরেজী শিক্ষা ও দীক্ষার প্রভাব সবত্র বৃদ্ধি পেতে থাকে। সরস ইংরেজী কাহিনী স্থানীয় ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। আলেকজাণ্ডার ডুমারের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'দি কাউণ্ট অব মণ্টেক্রীস্ট,'-এর ভাবানুবাদ মঙ-ইন-মঙ ও মা-মেই-মা বর্মায় প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়। উ-সুয়ি-কিউ কর্তৃক যখন এটা ধারাবাহিক ভাবে অনূদিত হতে থাকে, কিছু কিছু ইংরেজী উপন্যাসও তখন অনূদিত হতে থাকে। আর পাঠক সাধারণ তা' গ্রহণ করে সমাদরের সঙ্গে। শেক্সপীয়ারের 'রোমিও-জুলিয়েট' ও 'ওথেলো' যখন বর্মা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, তখন অবশ্য কেউ তা অভিনীত করার কল্পনা করেনি বটে, কিন্তু পরম আগ্রহসহকারে তা পাঠকসমাজ গ্রহণ করে। শুধু শেক্সপীয়ারের নাটক নয়, কালিদাস বা অপরাপর সংস্কৃত

নাটকও বর্মা ভাষায় রূপান্তরিত হতে থাকে। তেমনি অনূদিত হয় ফরাসী নাট্যকার মোলিয়র বা রুশ নাট্যকার চেকো। উ-কিন-উ-র পুরাতন নাটকগুলি ইস্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকে শুধু আজ অধীত ও আলোচিত নয়, সাধারণ মঞ্চ ও শৌখিন রঙ্গালয়ে তারা নতুন সাজে অভিনীত হতে শুরু করেছে। আর নতুন ও পুরাতনের এই ধারা অব্যাহত রেখেছেন বর্মার নতুন যুগের নতুন কর্ণধারগণ। বর্মার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ও দেশবরেণ্য নেতা থাকিন নু নিজেও একজন বর্মা সাহিত্যে দিকপাল। এর নিদর্শনস্বরূপ ইংরেজী ভাষায় অনূদিত তাঁর রচনার অংশ বিশেষ বাংলা পাঠক পাঠিকাদের কাছে পরিবেশিত করে বর্মা সাহিত্যের গোড়ার কথা—এবারে শেষ করলাম।

বর্মা সাহিত্য

একটি উপন্যাস

এশিয়ার অপরাপর রাষ্ট্রের কর্ণধারের মত বর্মার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উ নু বা থাকিন নু-ও একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক। বর্মার আধুনিক কথা-শিল্পক্ষেত্রে তাঁর দান অনস্বীকার্য। তাঁর সুবিখ্যাত উপন্যাস 'য়েৎ-সেৎ-পার-বে-কেউই'র (Yet-set-par-be-kwe) ইংরেজী অনুবাদ ধারা-বাহিকভাবে রেঙ্গুনের সুবিখ্যাত মাসিকপত্র 'দি গার্ডিয়ানে' প্রকাশিত হয়েছে 'ম্যান, দি উলফ্ অফ্ ম্যান্' বা নর শার্দুল শিরোনামায়। থাকিন নু ব্রিটিশ ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট বর্মার জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এই উপন্যাসে বর্মার কৃষক অভ্যুত্থানের কথা—শোষিত জনগণের মর্মবেদনা,—সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধের নিখুঁত চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। থাকিন নুর এই সুবিখ্যাত উপন্যাসটির ইংরেজী অনুবাদ করেছেন বর্মা সরকারের তখনকার বেতার বিভাগের অধিকর্তা ও রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক "কে" (K)। 'নর শার্দুল' উপন্যাসখানির একটি অধ্যায় (৪র্থ অধ্যায়টি) বাঙালী পাঠকদের কৌতূহল চরিতার্থে এখানে অনূদিত করা গেল :

উপন্যাসখানির পটভূমিকা ইরাবতীনদীর তীরবর্তী শান্ত সুশীতল সান্জু পল্লী। ইয়ান সিন এ উপন্যাসের নায়ক। তিনি সান্জু গ্রামেরই

এক বাসিন্দা। মাটির খাঁটি মানুষ। তাঁর স্ত্রী নবুই খিনও খাঁটি মেয়ে। স্বামী-অনুরক্তা। মঙ্ ইনসয়েঙ উ হলেন জমিদার সন্তান। খাজনা আদায় আর উৎপন্ন ধান সংগ্রহ করতেই কালেভদ্রে তাঁর গ্রামে আগমন হয়ে থাকে। সারা বছরেই তিনি গ্রামমুখো হন না। শহরেই পড়ে থাকেন। উচ্ছৃঙ্খলতা আর পানাহারে মত্ত থাকেন। মঙ্ সিইন তাই খাজনা আদায় করতেই সান্‌জু গ্রামে এসেছিলেন। গ্রামের মোড়ল জমিদারবাবুকে খানাপিনা ও আনুষঙ্গিক সবকিছুই সরবরাহ করছিল। তরুণ জমিদারবাবুর আর একজন ইয়ার হল কো বা উইন। কো বা উইন অবশ্য পেশায় উকিল। ইয়ান সিন ও তার নববিবাহিতা পত্নী নবুই খিনের সুখের সংসারে এবার বুঝি ব্যতিক্রম ঘটল। ছেদ পড়ল মধুচ্ছন্দা তাদের পরিণত জীবনের। ঘটনার আবর্তে এর পরেই শুরু হল অন্যায় অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে গাঁয়ের মেহনতি মাটির মানুষগুলোর বিদ্রোহ। আর এই কৃষক বিদ্রোহের মূলে ছিলেন থাকিন তেজা উন্তা (সংক্ষেপে থাকিন-তে)। থাকিন তে ছিলেন রাজনীতিসচেতন বৌদ্ধ শ্রমণ। অনুপস্থিত জমিদারদের নিরীহ কৃষকদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়ালেন। পল্লীর 'ম্লান, মূঢ়, মূক মুখে' তিনি ভাষা যুগিয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করে তুললেন—এইসব অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে। বললেন, হাতিয়ার যদি তাদের নাই বা থাকে, কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ একতাই হবে সংগ্রামী জনতার অমোঘ আয়ুধ। স্ট্রাইক আর পিকেটিং-ই তাদের একমাত্র হাতিয়ার।

এ হোল উপন্যাসখানির কথামুখ।···

চতুর্থ অধ্যায়

নির্ধারিত দিন এসে গেল। গাঁয়ের মোড়লের কানেও কথাটি গেল। উ পান মিগ ধানমাড়াই খামারে ধর্মঘট করা হবে। গাঁয়ের মোড়ল অবশ্য খুব বিচলিত হল না কথাটা শুনে। কেন না, মোড়ল সেকেলি আমলের লোক। নতুন ভাবধারার সঙ্গে—মেহনতি জনতার নতুন সংগ্রামী কায়দা-কানুনের সঙ্গে তার তেমন পরিচয় নেই। কাজেই মোড়ল থাকিন তে সান্‌জু গাঁয়ের শোষিত চাষাদের সঙ্ঘবদ্ধ এই ধর্মঘটকে খাটো করে দেখল। তার অমোঘ শক্তির সম্যক উপলব্ধি করে উঠতে

পারল না। শুধু তাই নয়, এই নতুন উদ্বুদ্ধ শক্তির যথাযথ প্রতিকার করার চেষ্টা না করে তাকে প্রাচীন পদ্ধতিতে দাবিয়ে রাখতে গেল। মোড়ল এখনও তার গাঁয়ের মধ্যে আপন প্রভাব প্রতিপত্তি ও মোড়লিপনার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তাই এই সব ধর্মঘটী কাণ্ডকারখানাকে মোড়লী ঢঙ্ বা ভড়ঙ্ বলে উড়িয়ে দিল। সান্‌জু গাঁয়ের আর পাঁচজন সেকেলি প্রতিক্রিয়াশীল বুড়ও ব্যাপারটাকে হাসিয়ে উড়িয়ে দিল। সকাল ৭টা বাজতে না বাজতেই উ-পান মঙ্-এর ধানমাড়াই খামার থেকে ধান বোঝাই করতে এক ধনী যুবক তার ধানের গাড়ী নিয়ে হাজির হল—হাজির চালান দিতে ধান। গাঁয়ের ভলান্টিয়ারের দল তখন উ থ বিটার মঠপ্রাঙ্গণে এসে জড় হয়েছিল। দিনটা যাতে ভালয় ভালয় যায়, সৌভাগ্যের লক্ষণ স্বরূপ দ তোক বুঝি ভলান্টিয়ারদের প্রত্যেককেই একটি করে 'ইউজেনিয়া'র (Eugenia) পল্লব বিতরণ করছিলেন। এ নিয়ে ভলান্টিয়ার যুবকদের মধ্যে হাসি ঠাট্টা তামাশার রোলও কম ওঠে নি। বর্মাকে হাসি ঠাট্টার দেশ বলে বিদেশী লেখকেরা এজন্যই বুঝি অভিহিত করে থাকেন। কথাটা বুঝি অতিরঞ্জিত নয়। প্রত্যেকটি উপলক্ষ্যে বুঝি এমনি ধারা হাসিঠাট্টার ফোয়ারা ছোটে—হলই বা তা বিবাহ-বাসর, শবযাত্রা কিংবা এমনিধারা কোন শোভাযাত্রা। শবযাত্রা উপলক্ষ্যে ঠাট্টা মস্করারই বা কি সার্থকতা থাকতে পারে? থাকিন-তে আর ইয়ান সিঙ্ অবশ্য তাদের এই ধর্মঘট ডাকার ঝুঁকির কথা উপেক্ষা করেন নি। এক ঘণ্টার মধ্যেই যে শান্ত সুশীতল সান্‌জু গাঁয়ের শান্তি টুটে খান খান হয়ে যাবে, তা তাঁরা উপলব্ধি করেন নি, এমন নয়। গাঁয়ের সাদামাঠা মানুষগুলোর মুখের হাসি তখন হতেই মিলিয়ে যাবে। মস্ত এক তামাশাই বটে!

বৃদ্ধ মঠাধ্যক্ষ উ থ বিটার কাছ থেকে পঞ্চ-নীতির আশীর্বাদ পর্ব সমাধান ক'রে ভলান্টিয়ারের দল দু'জন করে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। সারির পুরোভাগে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা ওরা তুলে ধরল মাথার উপর। কুচকাওয়াজ করে ওরা তখন রওনা হল গাঁয়ের দিকে। সমবেত কণ্ঠে ওরা তুলল আওয়াজ—দোবামা প্রতিষ্ঠানের।

"নিপাত হোক ধনতন্ত্রবাদ"

"ভিক্ষার ঝুলি ছুঁড়ে ফেল—ছুঁড়ে ফেল"

"আগুন দাও, আগুন দাও"—"পুড়িয়ে ফেল, পুড়িয়ে ফেল"
"মালিক কারা—আমরা, দোবামারা"
"আমাদের ধান কেড়ে নেয় কারা ?—বাইরে থেকে এল যারা"
"অতি মুনাফাই আমাদের দারিদ্র্যের মূল"
"সংগ্রাম দীর্ঘজীবী হউক"

ছোট্ট গ্রাম সানজুর আকাশবাতাস মুখরিত হয়ে উঠল এমনি দোবামা প্রতিষ্ঠানের শ্লোগানে। এতদিন ধরে যে অন্যায় অবিচার তারা সহ্য ক'রে আসছিল, আজ বুঝি তা মূর্ত হয়ে উঠল। মূঢ় মূক গ্রামবাসীরা আজ বুঝি তাদের দারিদ্র্য আর অভাব-অনটনের স্বরূপ বুঝতে পেরে স্ফুলিঙ্গের মত প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। আবাল বৃদ্ধ সকলেই দলে দলে এসে সমবেত হল তেরাঙা ঝাণ্ডার নীচে। ছেলে কাঁকে নিয়ে মা'রা এল ছুটে। শিশুরাও বাদ গেল না। পিছু পিছু ছুটে এল। কিন্তু 'উপাজিনে'র নির্দেশে পিকেটার-দের অগ্রণী দল থেকে তাদের তফাতে গিয়ে দাঁড়াতে হল। মনমরা হল বুঝি ওরা কিছুটা সংগ্রামী ধর্মঘটীদের সঙ্গে হাত মিলাতে পারল না বলে। তবুও ওরা, ওদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে প্রাণভরে জের তুলল শ্লোগানের।

কো থা ওয়া তার 'ব্লাকি' আর 'স্ট্রাইপনেক' বলদ দুটিকে নিয়ে মাঠে যাচ্ছিল চরাতে। ধর্মঘটীদের দেখে সে পথে থমকে দাঁড়াল। ঠিক করলে গরু চরাতে না গিয়ে আজ এদের সঙ্গে সে মিশে যাবে। ঘাসের চাইতে বলদ দুটো অন্ততঃ আজ পেটভরে ধান আর বিচালি খেয়ে বাঁচবে। এমনি করে দেখতে দেখতে পিকেটারদের সংখ্যা একশ থেকে তিনশ'তে—তিনশ থেকে পাঁচশতে গিয়ে দাঁড়াল। এমন-ধারা কাণ্ড কারখানা গাঁয়ের মোড়ল কস্মিনকালেও বুঝি দেখেনি। এবার তার সত্যি সত্যি টনক নড়ল। কিন্তু তবু মোড়ল ধৈর্য হারাল না। সাহসে বুক বেঁধে আর একজন সঙ্গী নিয়ে মোড়ল এগিয়ে গেল বিক্ষোভকারীদের নিকট।

বানর দেখলে গাঁয়ের ছেলেরা যেমন ঢিল ছোড়ার লোভ সামলাতে পারে না, তেমনি গাঁয়ের মোড়লকে দেখে বিক্ষোভকারীর দল শ্লেষ ও বিদ্রূপের বাণ ছুঁড়তে ভুলল না। কে বুঝি ভিড় থেকে বলে উঠল :

কথায় বলে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। ইয়াং সিং ধমকিয়ে বুঝি চ্যাংড়া বিক্ষোভকারীদের থামিয়ে দিল। মোড়ল বুঝি এবার হালে

একটু পানি পেল। থাকিন তে ঝাণ্ডার পাশে বিক্ষোভকারীদের পুরোধায় ছিলেন। গাঁয়ের মোড়ল সাহসে বুক বেঁধে থাকিন তেকে শুধাল :

আপনি আপনার চেলা চামুণ্ডাদের নিয়ে এসব কি শুরু করলেন ?

থাকিন তে তাকে থামিয়ে দিলেন। জানিয়ে দিলেন, মোড়লের সঙ্গে গালগল্প করার মত তাঁর সময় নেই। যদি তার কিছু বলবার থাকে, তবে উ পান মঙের ধানমাড়াই খামারে গেলেই তিনি পারেন। গাঁয়ের মোড়ল তখন খামারের দিকে গুঁটিসুটি পা বাড়াল। পিকেটারের দল খামারের পথ আগলে সত্যাগ্রহ শুরু করেছে যাতে ক্ষেতের ধান গাঁয়ের বাইরে কারবারীদের হাতে গিয়ে না পড়ে।

এসব কি হচ্ছে বলুন তো ? মোড়লের কণ্ঠে প্রকাশ পেল উষ্ণতা।

থাকিন তে : দেখতেই তো পাচ্ছেন, কি হচ্ছে। আমরা সত্যাগ্রহ করছি।

মোড়ল : সত্যাগ্রহ কেন ?

থাকিন তে : ধান রক্ষা করতে। জমিদার সিণ্টন উ'র লোকজনদের বাধা দিতে যেন তারা ধান পাচার করতে না পারে।

মোড়ল : সিণ্টন উ'র লোকদের বাধা দিতে চাইছেন কেন আপনারা ? জমিদার তাঁর জমিদারির ধান নেবে না ? বুদ্ধ যা অনুমোদন করেন না, আপনি এমন কাজ করতে চাইছেন ?"

থাকিন তে : বুদ্ধদেব দস্যু-তস্করের কাজ কখনও অনুমোদন করেন না।

মোড়ল : দস্যু ? তস্কর ?

থাকিন তে : হ্যাঁ, আমি আপনার মুনিব জমিদারদের কথাই বলছি। আপনি তো তাদেরই একজন ফড়ে।

মোড়ল : জমিদারবাবুরা আবার কোথায় কখন আপনার ডাকাতি করতে গেলেন ?

থাকিন তে : হায়রে বুদ্ধ ! মঠে একদিন আসুন না ? আমি আপনাকে সব বুঝিয়ে বলব।

মোড়ল : দোহাই উপাজিন, এই ক্ষেপামি বন্ধ করুন। সত্যাগ্রহীদের ডেকে নিয়ে যান। মিক সিয়েন-উ লোকজনদের কাজ করতে দিন।

থাকিন তে : কিছুতেই না।

মোড়ল : তাহ'লে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করবো শান্তিভঙ্গের দায়ে।

থাকিন তে : তাই করুন।

ইয়াঙ্‌সি : ব্যাপারটা হ'ল, যদি এঁরা আমাদের আইন মত ধান মাপবার অনুমতি দেন, তাহলে আমরা আর সত্যাগ্রহ করতে যাবো কেন? কিন্তু তা তো নয়। এঁরা আমাদের কাছ থেকে বেশী করে ধান মেপে নিয়ে যাচ্ছেন আর আর বারের মত। তাই তো আমর পিকেটিং করে চলেছি।

মোড়ল : এ হ'ল জমিদার আর প্রজাদের ঘরোয়া ব্যাপার। প্রজারা যদি তাতে রাজী হয়, তাহলে উ-পান-মঙ ফপরদালালি করতে আসে কেন?

মোড়ল এবার উ-পান-মঙ এর দিকে ফিরে তাকালো। উ-পান-মঙ তখন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। মোড়ল তার কাছে এগিয়ে গিয়ে গলা খাটো করে বললো : উ-পান-মঙ, তুমি আবার এসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে মাথা ঘামাতে এসেছো কেন?

উ-পান-মঙ কোন জবাব দিল না। মাথাটা তার বুকের ওপর ঝুঁকে পড়লো। সত্যাগ্রহের দল এ সময়ে আবার তারস্বরে স্লোগান তুললো। থাকিন তে হাত তুলে তাদের নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেন। মোড়লের দিকে তিনি এবার ফিরে তাকালেন : "দেখুন, আপনি কি সিয়েঙ-উর প্রতিনিধিত্ব করছেন? যদি না করে থাকেন, তবে তাকে নিয়ে আসুন কিংবা তার প্রতিনিধিকে। আমরা আর কারুর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাই না।"

মোড়ল : ভাল কথা। কিন্তু আমি হলাম শান্তি-শৃঙ্খলার রক্ষক।

থাকিন তে: ওঃ, ভারি তো মোড়ল! তা'হলে এখানে যারা আইন ও শৃঙ্খলা অমান্য করছে, তাদের সবাইকে আপনি গ্রেপ্তার করুন। আর, কাউকে যদি গ্রেপ্তার করতে হয় তা'হলে আপনাকে প্রথম গ্রেপ্তার করা উচিত; কেন না, উড়ো পাখীর মত আপনি শহর থেকে গ্রামে এসেই এখানকার শৃঙ্খলার বাধা সৃষ্টি করছেন।

সমবেত জনতা থেকে উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো থাকিন তে'র সমর্থনে।

শাবাশ, থাকিন তে, শাবাশ! মুখের ওপর ঠিক জবাব দিয়েছেন।

মোড়ল: আমরা ওকে কিছুতেই চাই না।

জনতা থেকে কেউ বেড়ালের মত ডেকে উঠলো। সকাল বেলায় সুশীতল আবহাওয়ার মধ্যেও ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা গেল মোড়লের কপালে। কি বিপদেই না পড়া গেল, ভাবলে মোড়ল। এখন কোন রকমে নিষ্কৃতি পেলে বাঁচা যায়। এই অপ্রত্যাশিত পরিবেশ হতে রক্ষা পাবার জন্য মোড়ল তার দলবল নিয়ে পিছু হটতে শুরু করলেন। একটু পরে খবর রটে গেল, মোড়ল শহরে রওনা হয়েছেন।

দুপুর বেলার খাবার সময় হয়ে গেল। গ্রামবাসীরা ধর্মঘটীদের জন্য কলাপাতার ঠোঙায় মোড়া এক রাশ খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিল। খাবার-গুলো এক পাশে গাদা হয়ে পড়েছিল। ঠোঙার মধ্যে খাবারের পরিমাণ দেখে শহরের বাবুগুলোর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। যে পরিমাণ ভাত গাঁয়ের এ লোকগুলোর জন্য পাঠানো হয়েছে, তার অর্ধেকও বুঝি শহরের বাবুগুলো খেয়ে শেষ করে উঠতে পারবে না। খাবারের ঠোঙাগুলো হাতে হাতে ধর্মঘটীদের মধ্যে বিতরণ করা হলো। অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নিলো। বাদবাকীরা খাবারটা তুলে রাখলো পরে খাবে বলে।

বেলা বারোটা নাগাদ মোটর বোট 'জংসনে' করে গাঁয়ের মোড়ল আর জমিদার সিয়েঙ-উ শান্‌জু গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। জমিদার সিয়েঙ-উ'র টাকা পয়সা বিস্তর থাকতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত চরিত্রগুণ মোটেই ছিল না। ধর্মঘটী কৃষকদের নেতা উ-পাঙ-মঙ-এর সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ না করে তিনি গাঁয়ের মোড়লের বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন। মোড়লের বাড়ী পৌঁছে তিনি উ-পাঙ-মঙকে ডেকে পাঠালেন। থাকিন তে, ইয়াঙ সিঙ আর দ-তোকে উ-পাঙ-মঙকে নানা সলাপরামর্শ দিলেন যাবার আগে। কিন্তু উ-পাঙ-মঙ ভীষণ ঘাবড়ে গেল জমিদার বাবু তাকে তলব করে পাঠিয়েছেন দেখে।

উ-পাঙ-মঙ, এই সব কি হচ্ছে, বল তো?

উ-পাঙ-মঙ: আমি তো কিছু জানি না হুজুর?

সিয়েঙ-উ ঃ ন্যাকা, জান না মানে ? আমি বুঝতে পারছি, তুমি আমাকে বিপদে ফেলবার জন্য এই সব ফন্দি করেছো। আমিও তোমাকে সহজে রেহাই দেবো না কিন্তু।

মোড়ল ঃ আচ্ছা, উ-পাঙ-মঙ বলতো দেখি, এই সব ধর্মঘটের কাণ্ডকারখানা কার নির্দেশে হচ্ছে ? তোমার না থাকিন উপাজিনের ?

উ-পাঙ-মঙ ঃ দোহাই হুজুর, আমাকে মাপ করুন। আমি এ সবের বিন্দু বিসর্গের মধ্যে নেই। আমি কাউকে ধর্মঘট করতে বলিনি। আমি আপনাদের বিপদে ফেলতে যাব কেন ?

সিয়েঙ-উ ঃ তা'হলে তুমি বল মোড়ল, ওদের সবাইকে কি ফৌজদারিতে সোপর্দ করা ঠিক হবে না ?

মোড়ল ঃ নিশ্চয়। গাঁয়ের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্ন করার প্রতিকার নিশ্চয় করতে হবে। উকিল বাবু, ব্যাপারটা ঠিক সাজিয়ে গুছিয়ে নেবেন।

সিয়েঙ-উ ঃ আচ্ছা, এদের পাণ্ডা কে বলতো ?

উ-পাঙ-মঙ ও মোড়ল একে অপরের দিকে চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো।

সিয়েঙ উ ঃ তোমাকেই তো জিজ্ঞেস করছি উ-পাঙ-মঙ।

উ-পাঙ-মঙ ঃ থাকিন তে আর ইয়াঙ-সীন্

সিয়েঙ-উ ঃ মোড়ল, ওদের বরং ডেকে পাঠানো হোক

মোড়ল ঃ আমার মনে হয়, শুধু ইয়াঙ-সীনকে ডেকে পাঠানো উচিত হবে।

ইয়াঙ-সীন যেমন এসে উপস্থিত হলো মোড়ল তখন তাকে ভয় দেখাতে শুরু করলো। জোর গলায় জানিয়ে দিলো গ্রামের শান্তি-ভঙ্গের জন্য আর অপরের সম্পত্তি অনধিকারভাবে দখল করার জন্য তাকে ফৌজদারিতে সোপর্দ করা হবে। ইয়াঙ সীন কিন্তু মোড়লকে প্রশ্ন করে বসলো—সে যে অনধিকার ভাবে পরের দ্রব্যে হস্তক্ষেপ করেছে তার প্রমাণ কি

সিয়েঙ-উ ঃ উনি প্রমাণ চাইছেন ? তুমি আমার এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করেছো। আমার ধান জোর করে কেড়ে নিয়েছো। আমার আইনতঃ অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছো। কি কর নি?

ইয়াঙ-সীন নম্র ভদ্র যুবক। সিয়েঙ-উ তার চাইতে কয়েক বছরের ছোট। সিয়েঙ-উ'র অপমানজনক কথাগুলো তাকে বেশ চটিয়ে দিলো। বয়সে ছোট হলে কি হবে, সিয়েঙ-উ'র নিজের আভিজাত্যবোধ প্রবল ছিলো। গাঁয়ের এই সব ছোট লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতে অপমান বোধ করতো। ইয়াঙ-সীন তাই কড়া মেজাজে জবাব দিলো :

সব ধান যে আপনার, কে বললো আপনাকে ?

সিয়েঙ-উ নিজের ঔদ্ধত্যের সম্যক পরিমাপ করে উঠতে না পারলেও অপরের চড়া গলায় কিন্তু তার মেজাজ যায় আরও বিগড়ে। আশেপাশে জো-হুজুরের খোশামোদী দলের সামনে ইয়াঙ-সীনের কাছ থেকে এমন ধারা ব্যবহার বুঝি জমিদার-নন্দন প্রত্যাশা করেন নি। গলা চড়িয়ে তাই সে জবাব দিলো :

সব ধান ওঁর! এ কথা কে বললে তোমাকে ? মশাইয়ের আর সাঙ্গোপাঙ্গ পরিবেষ্টিত সিয়েঙ-উ'র সাহস গেল আরো বেড়ে। একা পেয়ে ইয়াঙ-সীনকে সে তখন তর্জন গর্জন করে বলে উঠলো :

গেঁয়ো ভূতটার সাহস দেখো কতখানি, মুখের ওপর কথা !

ইয়াঙ-সীন : গেঁয়ো ভূতের সাহস শহরের ভূতের মত। তফাত বড় কিছু নেই।

মোড়ল : এই ইয়াঙ সীন, মুখ সামলে কথা বলো। তোমার দল বল নিয়ে তুমি জমিদার বাবুর এলাকায় ধর্মঘট করা বন্ধ করবে কি না আমি জানতে চাই।

ইয়াঙ-সীন : সেটা নির্ভর করছে জমিদার বাবুর মর্জির ওপর। জমিদার বাবু যদি ধান মাপার ন্যায্য ওজন মেনে নেন্, তা'হলে আমরা এখান থেকে চলে যাবো বইকি।

মোড়ল : আরে ভাইয়া, জমি হলো জমিদার বাবুর। তাঁর প্রজারাও রয়েছে এখানে উপস্থিত। ওরা যদি তাই মেনে নেয়, তা'হলে তোমার আর আমার ফাপরদালালি করার কি মানে হয় ? উ-পাঙ-মঙ তো রয়েছে ওখানে। তাকে গিয়ে বরং শুধাও না ?

ইয়াঙ-সীন : উ-পাঙ-মঙ ভীতু সাদা খাঁটি লোক। নিজের দোষ গোপন করতে গিয়ে কি না কি বলে ফেলবে। যে লোক আপনার রক্ত

জল করা জিনিস অপরে ভোগ করছে দেখেও দেখে না, তাকে ভীতু বা বাতুল ছাড়া কি বলা যাবে ?

মোড়ল : বেশ, তাহলে আমাকে আর দোষারোপ কোরো না। নিজেদের ভালমন্দ নিজেরা এবার বুঝে সুঝে নাও।

ইয়াঙ-সীন ধর্মঘটীদের কাছে এবার ফিরে গেল। বেলা দু'টো নাগাদ সরকারী এক মোটর স্টীমার করে জন দশেক ব্যাটন ও রাইফেল-ধারী পুলিস কনস্টেবল, একজন পুলিস সাব্ ইনস্পেক্টর আর থানার একজন সহ-কর্মচারী উপস্থিত হলেন। সিয়েঙ-উ'র ইয়ার স্থানীয় উকিল উ-বা-উইনও তাদের সঙ্গে এসে উপস্থিত হলেন। পুলিস আসার খবর গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে গেল তাড়াতাড়ি। ধর্মঘটীর দল হাজার হোক, গেঁয়োর দল। পুলিস সম্পর্কে তাদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং খানিকটা ওরা ঘাবড়ে গেল বই কি। এদিকে সিয়েঙ-উ পুলিসের দলবল নিয়ে উ-পাঙ-মঙ এর খামারে গিয়ে উপস্থিত হলো। থাকিন তে আর ইয়াঙ সীন তখন ধর্মঘটীদের আশ্বস্ত করে তুলতে লাগলো। জোর গলায় স্লোগান দিয়ে তাদের উদ্দীপিত করে তুললো। থানাদার পীতবসন পরা থাকিন তে'কে দেখে চিনে নিলো। এগিয়ে গিয়ে বললে :

উপাজীন, আপনি যদি এভাবে শান্তি ভঙ্গ করেন, তাহলে আপনাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবো।

থাকিন তে : ওর কথা শোন। সরকারী আমলাদের এ দিকে ডেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। কিন্তু ওদিকে তো খুব গ্রেপ্তার করতে পটু। খালি গ্রেপ্তার, গ্রেপ্তার, গ্রেপ্তার,—আর যেন কোন কথা নেই।

থানাদার : আপনার মতো প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী উপাজীনরা গাঁয়ের এই সব অশিক্ষিত লোকজনদের ক্ষেপিয়ে তুলে গাঁয়ের শান্তি ভঙ্গ করলে আমিও তা'হলে উপাজীন, আমার কর্তব্য করতে বাধ্য হবো।

থাকিন তে : বেশ তো, তাই করুন। গাঁয়ের শান্তি যারা ভঙ্গ করেছে, ঐ মোড়ল, বড়লোক ঐ জমিদার আর ঐ উকিল বাবুটিকে নিয়ে আমাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করুন না ?

থানাদার : ওদের গ্রেপ্তার করবো কোন্ অভিযোগে ?

থাকিন তে : ওদের জন্যই তো আজ আমাদের মরিয়া হয়ে এই প্রতিবাদ করতে হচ্ছে।

থানাদার : আপনি বলতে চাইছেন, ওরাই এই জন্য দায়ী ?

থাকিন তে : বলতে গেলে তাই। মূলতঃ ওরাই সব গণ্ডগোলের জন্য দায়ী। ছোকরা জমিদার সিয়েঙ-উ আর তার সাঙ্গাত উ-বা-উইন নির্বিবাদে এই গ্রামটাকে বছরের পর বছর ধরে জ্বালিয়ে খাচ্ছে তাঁদের খুশি মত। হঠাৎ গ্রামে এসে ওরা খানাপিনা আমোদ আহ্লাদে মেতে উঠে। গাঁয়ের লোকগুলোর ওপর চালায় জুলুম আর অত্যাচার। মেয়েদেরও রেহাই দেয় না। নিজেদের কামনার ইন্ধন জোগাবার জন্য ধরে নিয়ে আসে রাতবিরেতে। আর ঐ যে গাঁয়ের মোড়লটিকে দেখছেন, তাঁর কাজ হলো পল্লীবাসীদের রক্ষণাবেক্ষণ করা। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। কিন্তু তা না করে মোড়ল তখন জমিদার বাবুর অন্যায় জুলুম আর অত্যাচারের সহায়তাই করে। এই অবস্থায় নিরীহ গ্রামবাসীদের মাথা তুলে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোন পথ নেই। আপনারা গ্রেপ্তার করতে এসেছেন মেষশাবককে। কিন্তু নেকড়ে বাঘকে নয়।

থানাদার : সে অনেক দীর্ঘ ব্যাপার, উপাজীন।

থাকিন তে : এক মিনিট অপেক্ষা করুন। ব্যাপারটা আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। তা'হলে আপনি নিজেই দোষ কার, বুঝতে পারবেন। ব্যাপারটা কি জানেন, জমিদারের অন্যায় শোষণের কবল থেকে চাষীদের রক্ষা করবার জন্য সরকার বাহাদুর জমিদারের প্রাপ্য ধান-মাপার পরিমাণ বেঁধে দেন। এই পরিমাণ হলো একশো আঠাশ একক। কিন্তু ফসল তোলার সময় জমিদারের লোকজন চাষীদের কাছ থেকে ঐ এককে ধান নেবে না। জমিদারকে ধান মেপে দিতে হবে একশ আটচল্লিশ এককে। কি অন্যায় বলুন তো ? এটাই সব হাঙ্গামার মূল। দূর এক পল্লীতে যা যা ঘটছে, তাই শুধু আমরা তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনি তো এক সরকারী আমলা। আপনিই বলুন, সব দেখে শুনে আপনি কি গাঁয়ের এই মেষগুলোকে গ্রেপ্তার করবেন, নেকড়ে বাঘগুলোকে ছেড়ে ?

থানাদার আমলা এবার সিয়েঙ-উ'র দিকে ফিরে তাকালেন। ইংরেজীতে বললেন, থাকিন তে'র যুক্তি অগ্রাহ্য নয়। উ-বা-উইন এবার ফোড়ন কাটলেন।

বললেন: প্রজারা যদি তাতে রাজী হয়, তবে বাইরের লোকের আপত্তি করার কি থাকতে পারে?

থাকিন তে: রাজী হয় বটে! চাষীদের প্রত্যেককে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখুন, যাদের ধান শোষণ করে নেওয়া হচ্ছে, তারা এতে রাজী কি না। ভয়ে কিছু মুখ ফুটে বলতে পারে না, তাই?

উ-বা-উইন: ওদের যে আপত্তি আছে, আপনি কি করে জানলেন?

থাকিন তে: কি করে জানলাম? জানলাম, জমিদার তাঁর জমি প্রজাদের কাছে বিলি করবার সময় আপন লোক বুঝে প্রথম যাচাই করে নেয়। যে প্রজাকে দেখবে জমিদারের অন্যায় জুলুমে রাটি করবে না, তাকে কেবল জমি বিলি করা হয়। উ-পাঙ-মঙকে ধরুন, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে অনেক লোকের সংসার তার। জমিদারের হাজার অত্যাচার, উৎখাতের ভয়ে বাধ্য হয়ে বলতে হয় তাকে রাজী আছে সে।

থানাদার: ভাল কথা উপাজীন, এ ব্যাপারে তো শান্তভাবে মিটমাট করাও যায়। চলুন না, আমরা মোড়লের বাড়ী গিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করে আসি। আপনি বরং আপনার দলের দু'একজনকে সঙ্গে নিন। * * *

থানাদারের করিতকর্মতায় অপ্রীতিকর পরিস্থিতির হাত থেকে ব্যাপারটা রক্ষা পেলো। কার্যসিদ্ধি হওয়ায় থাকিন তে আর ইয়াঙ সীন তখন ধর্মঘটীদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে জমিদার সিয়েঙ-উ'র লোকজনকে ন্যায্য মাপে ধান ওজনে সম্মত করালো। ধর্মঘটীদের তখন আনন্দ দেখে কে? ভীতু বেচারী উ-পাঙ-মঙকে কেউ কেউ ঠাট্টা মস্করা করতে ছাড়লো না। এই হাসি ঠাট্টার মধ্যে কিন্তু একজন মুখ গোম্‌রা করে রইলেন। তিনি হলেন যুবক জমিদার-নন্দন সিয়েঙ-উ। থানাদার এক রকম তাঁকে মুখের ওপর জানিয়ে দিলেন যে, গ্রামবাসীদের ওপর এতদিন অন্যায় অবিচারই করা হয়েছে। এই ধারা আর চল্‌লে যে কঠোর ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন, সেটা আর যাই হোক, জমিদারের সপক্ষে যাবে না।

থানাদার অবশ্য সিয়েঙ-উ'র মান বাঁচিয়ে ইংরেজীতে কথাবার্তা বলছিলেন। তবু কিন্তু উষ্ণ প্রতিক্রিয়ার জের প্রশমিত হয় নি। তিনি আশা করেছিলেন, থানাদার আর পুলিস তাঁর খাতিরে তাঁর হয়ে সায় দেবেন। কিন্তু এখন ঘটলো বিপরীত। এর চেয়ে কি অপমান হতে পারে? বিশেষ করে থাকিন তে আর ইয়াঙ-সীনের নেতৃত্বে পরিচালিত এতগুলো ধর্মঘটীর সামনে? তিনি তবু হাল ছাড়লেন না। এবার থেকে তাঁকে ছুরি শাণিয়ে চলতে হবে এই দু'জনের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে ইয়াঙ-সীনের।

রাত্রি হয়ে এলো। ধর্মঘটীদের আনন্দ তখন দেখে কে! জটলা পাকিয়ে বসে বসে ওরা তখন দিনের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করতে লাগলো। সর্বত্র সকলের মুখে এক কথা: খালি ধর্মঘট আর ধর্মঘট। কেউ কেউ আবার উ-পাঙ-মঙের কুটীরের কাছে গিয়ে জটলা করলো। বুড়ো ধড়িবাজ লোক। কি বোকাটাই না আজ বনতে হলো বেচারীকে! কোন কোন রগ্-চটা চ্যাংড়া রেগে মেগে গিয়ে তার চালের মাচা ধরে টানাটানি শুরু করে দিলো। ইয়াঙ-সীন ছুটে এসে তাদের কোন রকমে শান্ত করলো। যাই করুক, ধর্মঘটীরা কিন্তু তার অজ্ঞাতসারে মহা উপকারই করে গেছে। ওদের কাছে তার কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। কেন না, ন্যায্য মাপে ধান ওজনের ব্যবস্থা করে দিয়ে ধর্মঘটীরা তার ক্ষেতের অনেক ধান বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে। এ বছরে তাকে আর ধানের জন্য কোন অভাব ভোগ করতে হবে না। উ-পাঙ-মঙ ভাই যখন ভাবছে, সিয়েঙ্-উ তখন তার ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে মোড়লের বাড়ীতে পানাহারে মত্ত হয়ে আজকের অপ্রত্যাশিত ঘটনাকে বুঝি স্মৃতির দ্বার থেকে মুছে দেবার চেষ্টা করছিলেন।

['দি গার্ডিয়ান', আগস্ট, ১৯৫৪]

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

বার্মিজ ড্রামা: মঙ্ তিন অউঙ্
বার্মিজ ফোক-টেল্স্: মঙ্ তিন অউঙ্
হিস্ট্রি অব বর্মা: জি. ই. হারভে
এ্যানসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা (২য় খণ্ড):

জিপসী সাহিত্য

কবে কোন্ অখ্যাত অজ্ঞাত দিবসে দেশছাড়া হয়ে ওরা বিদেশ বিভুঁইয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপ আর আমেরিকার পথপ্রান্তরে, সে কথা কোন কুলপঞ্জীতে বা ইতিহাসের পাতায় লিখিত হয় নি।

জিপসীদের ইউরোপে বলা হয় 'রোম' (Rom)—যা থেকে এসেছে রোমানী-চেল শব্দ; আর্মেনিয়ায় বলা হয় লোম; ইরানে ডোম; আর ডোম বা ডাম সিরিয়ায়। ওয়েল্‌স-এও ও নামে ডাকা হয় জিপসীদের। ডোম বা ডাম মানে 'স্বামী'—অর্থাৎ মানুষ। জার্মানীতে 'মানুষ' বলতে জিপসীকেই বোঝায়। আর এ 'মানুষ' বাক্যটি জিপসী শব্দ। সংস্কৃতই তার মূল। তবু অনুমিত হয়, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার যখন বিজয় কেতন উড়িয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতের পঞ্চ-নদীর তীরে এসে উপস্থিত হন, তখন থেকে নাকি ভারতের এই ছিন্নমূল লোকগুলো ছিটকে পড়েছিল বাইরে। গ্রীক বাহিনীর হাতে ওরা বন্দী হয়েছিল কিনা জানা নেই। স্বেচ্ছায় হয়ত ওদের সঙ্গ নিয়ে থাকবে।

গিয়ারসন ও অপরাপর ব্রিটিশ পণ্ডিতরা অনুমান করেন, গজনীর মহম্মদ ঘোরী যখন তাঁর সতেরো বার ভারত আক্রমণে উদ্যোগী হন, তখন পঞ্জাব, গুজরাট, সিন্ধু প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার জাঠ ও রাজপুত সৈন্য আর বেসামরিক নরনারীকে তিনি ক্রীতদাসে পরিণত করে সঙ্গে নিয়ে যান।

ইরান ও মধ্য এশিয়ায় উপনীত হয়ে ওখানকার আরও কয়েক সহস্র ইরানীকেও তিনি ক্রীতদাসে পরিণত করেন। বিপুল এ ক্রীতদাস-বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা নাকি মহম্মদ ঘোরীকে বিচলিত করে তোলে। তাই তিনি অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ ভারতীয় ক্রীতদাসদের মুক্তির নির্দেশ দেন। ওরা তখন প্রথমে ইরাক ও সিরিয়ায় এবং পরে মিশর ও গ্রীসে কিংবা উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের মারফত ইউরোপের উত্তর ও দক্ষিণ পথ ধরে ছড়িয়ে পড়ে দূর-দূরান্তে।

ফিরদৌসীর অমর কীর্তি শাহনামায় এমনিতর আরেকটি কিংবদন্তি লিপিবদ্ধ আছে। ইরানের শাহ বহরাম গুড় উত্তর ভারতের জনৈক

নৃপতি সংখলকে অনুরোধ করে পাঠান যে তিনি যেন ইরানের জাতীয় উৎসবে যোগদান করবার জন্য বিশ সহস্র নর্তক নর্তকী ও গায়কদল প্রেরণ করেন। শাহ ভারতীয় নৃত্যবিদদের ও গায়ক গায়িকাদের সঙ্গীত-কলায় এত মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে, তিনি ওদের সবাইকে তাঁর রাজ্যে বসবাস করতে অনুরোধ জানালেন। তিনি তখন ওদের বিস্তর নিষ্কর জমি, গবাদি পশু ও বীজধান দান করলেন। বাদ্যকররা কেউ চাষবাস জানত না। শুধু গানবাজনাই জানত। ওরা চাষ আবাদ না করে বীজধানটাই বসে বসে খেয়ে ফেলল। হালের বলদগুলিকেও জবাই করে সাবাড় করে ফেলল। ইরানের শা তাই দেখে মহা খাপ্পা হয়ে উঠলেন। এবং বেহদ্দ বাদ্যকরদের দলকে দিলেন নিজ রাজ্য থেকে তাড়িয়ে। ওই গীতকাররাই মিশর বা ইরাকের পথ ধরে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে তারপর ছড়িয়ে পড়ে। এমনি আর একটি কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে। জিপসী ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে :

আমরা তখন গঙ্গাতীরে বাস করতাম। আমাদের দলপতি প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। তিনি যখন কথা বলতেন গ্রামের প্রান্ত থেকে তা প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠত। তাঁর বিচারও ছিল চূড়ান্ত। সর্দারের ছিল একমাত্র পুত্র। নাম চেন। হিন্দুস্থানেও তখন আর এক শক্তিমান রাজা রাজত্ব করতেন। রাজার প্রিয়তম পত্নী একটি কন্যা প্রসব করলেন। কন্যাটির নাম জ্ঞান। সর্দারের মৃত্যুর পর পুত্র চেন জ্ঞানকে বিবাহ করবার সংকল্প করল। জ্ঞান কিন্তু চেনের ভগ্নীরূপেই এতদিন প্রতিপালিত হয়েছিল। চেন জ্ঞানকে বিবাহ করবার সংকল্প করাতে দেশের লোকজন তখন এই বিবাহকে কেন্দ্র করে দুইদলে বিভক্ত হয়ে পড়ল।

এক ভবিষ্যদ্‌বক্তা ভবিষ্যদ্‌বাণী করল যে, দেশ তাদের শীঘ্রই আক্রান্ত হবে। দেশের দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। সত্যি সত্যি দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের এক সেনাপতি ঝড়ের মত একদিন এসে অতর্কিত আক্রমণ করল তাদের। হিন্দের রাজাকে যুদ্ধে নিহত করল। লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চলল অবলীলাক্রমে। জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্‌বাণী ফলল।

তখন ওদেরই একজন বিজয়ী সেনাপতির নিকট গিয়ে বিচার চাইল অবিচারের—ভাই বোনকে বিয়ে করার। বিদেশী সেনাপতি তখন রেগে গিয়ে আঘাত করে বসল ওর মাথায় আর সেই মুহূর্তে বিদেশী

সেনাপতি আর তার অশ্ব খান খান হয়ে গেল পাথরের বুকে ছুঁড়ে মারা পোড়া মাটির এক পাত্রের মত, আর এ সময় দমকা একটা হাওয়ায় ওর দেহখণ্ডবিশেষকে উড়িয়ে নিয়ে গেল অদূর মরুপ্রান্তরে। অধিবাসীরা দুদলে পূর্বেই বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। যারা চেনের বিরোধী ছিল, তখন ওকে দেশ থেকে দিল তাড়িয়ে। জ্যোতিষী চেনের নামে শপথ করল:

'পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে তুই চিরকাল ঘুরে ঘুরে বেড়াবি, এক জায়গায় কখনও মাথা রেখে ঘুমোতে পারবি না। এক কুয়োতে দুবার কখন জল তুলে পান করা তোর হবে না।'

ভবিষ্যদ্‌বক্তার এ ভবিষ্যদ্‌ বাণী অনুসারে ইউরোপ, আমেরিকায় ওরা কবে ছড়িয়ে পড়েছিল সঠিক জানা যায় নি। মার্টিন ব্লক তাঁর Gipsies—Their Life and Customs গ্রন্থে ওদের ইউরোপ আগমনের কথা প্রথম চতুর্দশ শতকে বলে উল্লেখ করেছেন। জিপসীদের ক্রীটে, করফিউ প্রভৃতি অঞ্চলে উপস্থিতির কথা তাঁর গ্রন্থ থেকে জানা যায়। কার্পেথিয়ান পর্বতমালার পাদদেশের এক তিরানা মঠে কোন এক জিপসী ক্রীতদাস পরিবারকে জনৈক সার্বিয়ার রাজকুমার পাঠিয়েছিলেন বলে কথিত আছে। পঞ্চদশ শতকের মোল্‌দাভিয়া, হাঙ্গেরী, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে ওদের উপস্থিতির কথাও লিপিবদ্ধ আছে। প্যারিসের রাজপথে ওরা লোকের হাত দেখে সৌভাগ্য গণনা করত বলেও মার্টিন ব্লক উল্লেখ করেছেন। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে ওরা ইউরোপের অনেক স্থলে ছড়িয়ে পড়েছিল তাও জানা যায়। পিরানীজ পর্বতমালার উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করে ওরা যে স্পেনে প্রবেশ করেছিল এবং উত্তর আফ্রিকার পথ ধরে তাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল বলে লিখিত আছে এ গ্রন্থে।

চার্লস লিল্যান একজন জিপসী তত্ত্ববিশারদ। তাঁর মতে, উত্তর ভারতের জাঠেরাই মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণের সময় হাজারে হাজারে ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে পশ্চিম এশিয়ায় নীত হয়েছিল। তাঁর মতে, হিন্দীই এই সব দেশহারা ভবঘুরে বোহেমিয়ানদের আদি ভাষা।

চার্লস লিল্যান লিখেছেন, রোমানীর (Romani) উৎপত্তি প্রসঙ্গে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসর ই. এইচ. পামার (তার সংকলিত) প্রায় চার হাজার ইংরেজী জিপসী শব্দ পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে

উপনীত হয়েছেন যে ঐ শব্দগুলির বেশীর ভাগই হিন্দী বা পারসিক মূল শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তাদের বেশীর ভাগই হিন্দী। গ্রীক বা ইউরোপীয় শব্দ থেকে উদ্ভূত নয়।

তিনি কয়েকটি বিশেষ রোমানী শব্দের উদাহরণ নিদর্শনস্বরূপ উদ্ধৃত করেন। যেমন, 'তত্তপানি' (ব্র্যাণ্ডি); 'বর রানি'; 'সারি রাতি' (সারা রাত্রি)।

জিপসীদের নিত্য ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের দৃষ্টান্ত এখানে উৎকলন করা গেল। 'ছুরি': 'আঁখ'; 'কান'; 'নাক'; 'বালো'; 'ভালো; 'বড়'; 'তুদ' (দুধ); 'থান' (সংস্কৃত স্থান); 'চিব' (জিভ); 'পুরো' (বুড়ো); 'চোরি' (চুরি) ইত্যাদি।

'গৃহহারা পাখী'

স্যামুয়েল রবার্টসের মতে জিপসীরা হল অনেকটা ভগবানের গৃহহারা পাখীর দল। ঈশ্বরই তাদের খাওয়ান, ঈশ্বরই তাদের যত্ন নেন। খাওয়া পরার জন্য জিপসীদের মত আর কোন সৃষ্ট জীবই এমন ভগবানের মুখাপেক্ষী নয়। ঈশ্বর সম্পর্কে ওরা অবশ্য ততখানি তত্ত্বজ্ঞানী নয় ঠিক আমাদের মত। তবে ওরা ঈশ্বরকে তার সৃষ্টির মধ্যে পেতে ভালবাসে। ঘটা করে ওরা যদি ভগবানকে ভালবাসা জ্ঞাপন না করে তবে ওরা ঠিক পাপ কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

নিজেদের অনুশাসন, বিশ্বাস আর সংস্কার তাদের রক্তমাংসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের আশেপাশে ওরা ঘোরাঘুরি করে, আমরা ওদের সঙ্গে মিশি না কিন্তু ওরা আমাদের গোপন কথার হদিস রাখে; হস্ত বিচার করে। আমরা নিজেদের সম্পর্কে যা জানি সে সম্পর্কে ওরা বেশী খোঁজ খবর রাখে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ওরা হল সংযোগ···স্পেনবাসীদের চাইতেও ওরা নাচগানে বেশী পটু, হাঙ্গারীয়ানদের চাইতেও ওরা অধিকতর ভালো গীতবাদ্যে। আত্ম-বিশ্বাসী। খুব কম কাজই ওরা করে কিন্তু যা করে তা অপরাপর অনেকের চাইতেই করে নিপুণতার সঙ্গে। সৃষ্টি হয়ত ওরা করেনি তেমন কিছু, কিন্তু সংরক্ষণ করেছে অনেক কিছু। যা কিছু ওদের প্রয়োজনীয় —ব্যবহারে প্রয়োজন—তা সবটাই ওরা গ্রহণ করে; বাদ দেয় যা

ধাতে সয়নি শুধু তা। সর্বত্রই এ জাত হয়েছে নিপীড়িত, নির্যাতিত। তবু কিন্তু আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে বাতাসের মত ওরা অতর্কিতে সটকে পড়েছে সর্বত্র।

আমাদের প্রেরণার উৎস হল জিপসীরা। তবে আমরা তা জানি না বলে আক্ষেপ করেছেন স্যামুয়েল রবার্টস। স্বাধীনতার ইচ্ছা, স্বাধীনতার উদগ্র বাসনা, বন্ধনহীন প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধুত্ব, উন্মুক্ত আকাশের তলে বিচরণ, দেশ দেশান্তরে পরিভ্রমণ প্রভৃতি। প্রকৃতির প্রতীক হল জিপসীরা—সভ্যতা বিকাশের আগেই প্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব করছে জিপসীরা। আমরা যা স্বপ্ন দেখি জিপসীরা করে তা কাজে। পৃথিবীর অবশিষ্ট শেষ রোমান্স-এর মূর্তিমতী প্রকাশই বুঝি ওরা। নির্ভীক স্বাধীন শির নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল ওরা। আইন-শৃঙ্খলা, অত্যাচার আর অগ্রগতির নির্যাতন সেই স্বাধীনতাকে করেছে পঙ্গু। সভ্যতার অভিশাপ হল এই। নির্যাতন আর নিপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে জিপসীরা চিরকাল।

তুচ্ছ আধুনিক অনেক শব্দের পরমার্থ সম্পর্কে ওরা অজ্ঞ—যা নিত্য আমাদের সভ্যভব্য ভাষায় ব্যবহার করে থাকি : 'আধখানা আমাকে দাও, আধখানা তুমি নাও'—যা আমরা সংক্ষেপে বলে থাকি, ভাগাভাগি।

মহাপণ্ডিত চার্লস লেল্যাণ্ড তাঁর গ্রন্থে এ উপসংহারে এসেছেন :

'রোমানী ও ভারতবর্ষের উপর লিখিত বহু গ্রন্থ অনুশীলন করে আমি এ সিদ্ধান্তে এসেছি যে : জিপসীদের আদি পুরুষ হিন্দুরাই। ঐ দেশ থেকে ওরা হয় বিতাড়িত হয়েছে, কিংবা প্রবাসী হয়েছে।...ভাষা, প্রথা, রীতিনীতি, দেশাচারের প্রমাণ বাদ দিলেও, পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা জিপসীদের সঙ্গে ভারতীয়দের দেহাবয়বের সাদৃশ্য কিছুতেই উপেক্ষণীয় নয়। এমন কি মিশরের বাসিন্দা জিপসীরাও আকৃতিতে মিশরীয় নয়, হিন্দুই।'

তাই বুঝি যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া প্রভৃতি পশ্চিম ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের শিক্ষিত জিপসীরা আজ ভারতীয়দের দেখলে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বলে উঠেন :

'তু ম্যাই এক রক্ত!'—

তোমার আর আমার মধ্যে এক রক্তধারা প্রবাহিত—আমরা সব ভাই-ভাই!

বন্ধনহীন প্রাণী স্বাধীন প্রকৃতির প্রতীক জিপসীরা সত্যই সভ্যতারই অভিসম্পাত!

দারিদ্র্য ও কুসংস্কার জিপসীদের মধ্যে এমনই বদ্ধমূল যে প্রাপ্ত বয়স্ক জিপসীদের এক তৃতীয়াংশই শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হয়নি। বাদ বাকি অবশিষ্টাংশের হাতেখড়িও হয়নি। লিখতে পড়তে পারে না বেশির ভাগই। তবু কিন্তু জিপসী গায়ক, কবি, লেখক, সাংবাদিক, ডাক্তার আর আইনজীবীর সংখ্যা নেহাত নগণ্য নয়। তাদের অনেকেই ইয়োরোপের বিভিন্ন শহরে বসবাস করে আধুনিক ফ্ল্যাটে। রেডিও, পিয়ানো, গাড়িও আছে অনেকের।

জিপসীদের অবদান

এক ইংলণ্ডেই জিপসীদের সংখ্যা ত্রিশ হাজার জন।

ইংরেজী ভাষার বহু প্রচলিত শব্দের মূল কিন্তু জিপসী ভাষা। এ শব্দগুলি ইংরেজী অভিধানে 'স্ল্যাং' (slang) নামেই পরিচিত। এমন কি ইংরেজী 'স্ল্যাং' কথাটিও জিপসী শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার হিন্দী মূল হোল 'স্বঙ্' বা কৃত্রিম/নকল। অভিনেতাকে বলা হয় 'স্বং' বা 'স্ল্যাং'।

জিপসী শব্দোদ্ভব কয়েকটি ইংরেজী 'স্ল্যাং'। যথা: 'জকি'—জিপসী শব্দ 'চাকনি' বা চাবুক। ব্লোক>হিন্দুস্থানী শব্দ 'লোক'; 'নিগ্‌গ্‌লিং' (niggling), 'জোমার'>হিন্দী শব্দ 'চুমী'; 'ড্রাম/জোম' (drum), জিপসী কথা 'রাস্তা'।

'দিক' (dick)>খাঁটি হিন্দী শব্দ 'দেখ'। 'চিভি' (chivy) >জিপসী 'চিভ'>হিন্দী 'জিব'—জিভ। 'পঞ্চ' (punch)>হিন্দী পঞ্চ।

'টিনি' বা টিনী (Tiny)>জিপসী 'টানো' বা ছোট। 'টোফার' (Toffer)—জিপসী 'ধোই' বা ধোয়া। 'মাগ' (mug)—হিন্দী 'মুখ'।

'পর্নী' (Parni) বা বৃষ্টি>জিপসী>হিন্দী শব্দ পানি বা জল।

নাম ও উৎপত্তি

গত পাঁচ শতাধিক বছর ধরে জিপসীরা পূর্ব ও মধ্য ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছে। এখানে ওখানে ডেরা পেতে বাস

করেছে। কিন্তু ইয়োরোপে দীর্ঘ এত শত বছরকাল বাস করেও, অনেকে আজও জানে না কোথায় তাদের আদি বাসস্থান। নিজেদের ওরা যে নামে অভিহিত করে থাকে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে তা খুব উপেক্ষণীয় নয়।

ইউরোপে জিপসীদের আবির্ভাবের পর থেকে তাদের উৎপত্তি ও আদি বাসস্থান সম্পর্কে নানা মতবাদ দেখা যায়।

হাঙ্গেরীর প্রসিদ্ধ কুলপঞ্জীকার গ্রে মনে করেন যে প্রাক্তন সেলজুক সাম্রাজ্যের 'রুমই' তাদের আদি বাসভূমি। জিপসীদের দেখে অনেকে তাই মিশরীয় বলে অনুমান করে থাকেন। এ ভুল ধারণা পোষণ করেন যে, অত্যাচারী হেরডের রক্তচক্ষু থেকে শিশু যিশুকে নিয়ে যখন তাঁর পিতা-মাতা দেশ-দেশান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য, তখন এখনকার জিপসীদের আদি পুরুষ মিশরে তাঁদের আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে। ফলে তারই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ওরা আজ এমনি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাঙ্গেরী আর বলকান অঞ্চলের জিপসী বাসিন্দারা তাই বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে তাদের মিশরীয় বলে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ভাষা পর্যালোচনা করে জিপসী বিশারদ সুপণ্ডিত এ. এফ. পট (Pott) ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রমাণিত করেন যে, জিপসীদের আদি বাসস্থান মিশর নয়। ভারতের সন্নিকটবর্তী উত্তর পশ্চিমে কোথায় হয়ত হবে। কেন না তাদের প্রচলিত ভাষার মূল হোল ভারতেরই সংস্কৃত ভাষা। পরবর্তী অনুসন্ধানের ফলে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, জিপসী ভাষায় কাফেরিস্থান, দার্দিস্থান, কাশ্মীর আর ছোট তিব্বতের কথ্য ভাষার সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান রয়েছে।

রুশ গবেষক এম. জে. কৌনভিন লিপিবদ্ধ করে গেছেন যে, রুশ দেশে যে সকল জিপসীর বাস তাদের অনেকেই ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও পৃথিবী প্রভৃতি বিভিন্ন হিন্দু দেব-দেবীর উপাখ্যান সংরক্ষণ করে আসছে। শেষোক্ত দেবী পৃথিবীকে ওরা মাতা বা মা বলে অভিহিত করে। কৌনভিন পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। ১৮২০ খৃঃ তাঁর জন্ম। কিন্তু তিনি দীর্ঘ ৩৫ বৎসর কাল একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে জিপসীদের আদি উৎস সম্পর্কে গবেষণা করে গিয়েছেন। ভারতেও দু-দু বার পরিভ্রমণে এসেছিলেন। তিনি ১২৩টি জিপসী কাহিনী, ৮০টি পৌরাণিক কিংবদন্তী

ও ৬১টি লোকগীতি সংগ্রহ করেন। পাঁচ বছর ধরে তিনি জিপসী ভাষাও শিক্ষা করেন। ইয়োরোপ ও এশিয়ার নানা স্থানে জিপসীদের সঙ্গে অবস্থান করে জিপসী সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংগ্রহ কার্যে লিপ্ত ছিলেন।

তিনি লক্ষ্য করেছেন যে হিন্দু পৌরাণিক দেব-দেবীর সঙ্গে জিপসী পুরাকাহিনীর ঠাকুর দেবতার হুবহু মিল রয়েছে। যথা :

বরামী (ব্রহ্মা), জ্যান্দ্র (ইন্দ্র), লাকি (লক্ষ্মী), মাতা (পৃথিবী, মাতা বসুমতী) ইত্যাদি।

কাজ-কর্মেও ওরা সমান পটু। কুকুর,-ঘোড়ার লেন-দেন ব্যবসাও ওদের আর এক প্রধান উপজীবিকা। চির-স্বাধীনচেতা এই উচ্ছৃঙ্খল যাযাবরের দল পরভৃতিকার বৃত্তিকে নেয়নি কখন মাথা পেতে। ফলে অভাব-অনটন, দারিদ্র্য, রোগ-শোক প্রায় হামেশা লেগেই থাকে জিপসী সমাজে। কর্ম-বিমুখতা ও রাজশক্তির প্রতি নিস্পৃহ উপেক্ষা তাদের এই দুর্দশাকে অধিকতর চরম পর্যায়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

তার উপর রয়েছে রাষ্ট্রীয় নির্যাতন—দেশের কড়া আইন। রক্ষণশীল এই সংখ্যালঘু অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতি সংখ্যাগুরু রাজন্যবর্গের অমোঘ বিধান। রাজ্য থেকে বিতাড়িত করার ঢালাও নির্দেশ, পুলিশী নিপীড়ন আর লঘু পাপে গুরু দণ্ড—মৃত্যু পঞ্চদশ শতক থেকে জার্মানী, ফ্রান্স, স্পেন, ইংলণ্ড প্রভৃতি ইয়োরোপের বিভিন্ন রাজন্যবর্গ সমষ্টিগতভাবে জিপসীদের উপর চালিয়েছেন অকথ্য অত্যাচার, নির্যাতন আর নিপীড়ন। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে পার্লামেণ্ট কর্তৃক ওদের নির্মূল করার আইন বলবৎ করা হয়েছে। ডাল কুকুর লেলিয়ে দিয়ে ওদের নৃশংসভাবে হত্যা করার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। আর গত বিশ্ব যুদ্ধের সময় হিটলারই কেবল নাৎসী জার্মানী থেকে ২৮ হাজার জিপসী নরনারী শিশুকে গ্যাস চেম্বারে পুরে নিশ্চিহ্ন করেছে। নুরেনবার্গ বিচারে তার নজির রয়েছে।

মুশলিম দেশে হয়েছে ওরা ইসলাম-ধর্মে দীক্ষিত। গ্রীক দেশে হয়েছে খৃষ্টধর্মের অনুরাগী আর ক্যাথলিক দেশে ক্যাথলিক মতবাদে বিশ্বাসী। ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি নিষ্ঠা নেই বটে কিন্তু নিজেদের গোষ্ঠীগত অনুশাসন আর সংস্কারের প্রতি আনুগত্য তাদের সুগভীর। এক কথায়, অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কারের মূর্ত প্রতীক বলা যায় জিপসীদের। অদৃষ্টবাদী—নিয়তির ক্রীড়নক। জীবনকে ওরা গ্রহণ করেছে সহজ,

সাবলীল, অনাবিলভাবে। নীতিশাস্ত্রের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নয়। বিবাহ ও যৌন-ব্যাপারেও স্বেচ্ছাচারী না হলেও ওরা স্বাধীন, উদ্দাম, বেপরোয়া। ভয়ঙ্কর ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

ক্যারাভানের চলমান তাদের জীবনপ্রবাহ—যাযাবরী জীবন-বেদ। এক স্থলে স্থিতি বেশী দিন হয়ে ওঠে না। অতএব, চাষ-বাস কৃষিকাজের আবাদী পেশা তাদের নয়। নেশা তাদের নাচ-গান, বাদ্যগীত, হাত-দেখা, ভাগ্য গণনা, ইত্যাদি লোকরঞ্জনের পরগাছা বৃত্তি। অবশ্য, সুক্ষ্ম কারু-কার্যময় সোনা-রূপোর কাজ, হাতীর দাঁতের কারিগরী শিল্পেও সমান পটু।

সমগ্র জিপসী সাহিত্য যেন তারই প্রতিফলন। নির্বাক প্রতিবাদ, অশিক্ষা, কুসংস্কারময়, দারিদ্র্য, অদৃষ্টবাদী, কূপমণ্ডূক নির্যাতিত জীবন আলেখ্যের।

জিপসী শব্দ

সংস্কৃত ভাষা ও ভারতের অন্যান্য ভাষার সহিত জীপসীদের ভাষার সাদৃশ্য কত নিবিড় তার দৃষ্টান্তস্বরূপ জীপসী ভাষার কতকগুলি শব্দ (রোমান অক্ষরে লিখিত) তাদের ইংরেজী অর্থ এবং ভারতীয় ভাষায় তাদের সমার্থক শব্দ সন্নিবেশ করে দেখান হল। জিপসী ভাষার আদি উৎস কোথায় এ তালিকা থেকে সুস্পষ্ট হবে আশা করি:

জিপসী	ইংরেজী	সংস্কৃত	বাংলা	হিন্দী
1. Ake	There is	অস্তি	আছে	—
2. Akha	Eye	অক্ষি	আঁখি	আঁখ
3. Akhor	Walnut	—	আখরোট	আখরোট
4. Andre	Inside	অন্তর	অন্তর, অন্দর	অন্দর
5. Angar	Coal	অঙ্গার	অঙ্গার, আঙ্গার	আঙ্গার
6. Boro	Big	—	বড়	বড়া
7. Boro divas	Great day (Feast or Wedding)	—	বড় দিবস	
8. Boro-rani	Big Lady	—	বড় রাণী	বড়া রাণী
9. Bouri	Hedge	—	বেড়া	বেড়া
10. Charar (Charah)		চৌর	চোর	চোর
	Steal	—	চুরি	চোরি

জিপসী	ইংরেজী	সংস্কৃত	বাংলা	হিন্দী
11. Dik	See	দৃক, দৃষ্টি	দৃষ্টি, দেখা	—
12. Dariar	Sea	—	দরিয়া	দরিয়া
13. Duval	God	দেব	দেব	দেও
14. Habben	Food	হবন	হবন	—
15. Kash	Wood	কাষ্ঠ	কাষ্ঠ, কাঠ	কাঠ
16. Kil	Play	খেল	খেলা	খেল
17. Kooshti	Good	কুষ্টি	কুষ্টি	—
		উৎকৃষ্ট	উৎকৃষ্ট	
18. Maung	Beg		মাঙন	মাঙ
19. Nam	Name	নাম	নাম	নাম
20. Opre	Up	উপরি	উপরে	উপর
21. Parni	Rain, Water	পর্জ্জন্য	পর্জ্জন্য	পানি
		পানীয়	পানীয়, পানি	
22. Patrin	Leaf	পত্র	পত্র	পত্র
23. Phral	Brother	ভ্রাতা	ভ্রাতা	ভ্রাতা
24. Rat	Night	রাত্রি	রাত্রি, রাত	রাত
25. Rikkoni	Beautiful	চিক্কণ	চিক্কণ	—
26. Sasto	Well	স্বস্থ, সুস্থ	স্বস্থ, সুস্থ	—
27. Tadivas	Today	এতদ দিবস	এতদ দিবস	
28. Tarun	Young	তরুণ	তরুণ	তরুণ
29. Tatcho	Genuine, True	স্বচ্ছ	স্বচ্ছ, সাচ্চা	সাচ্
30. Tele	Down	তলে	তলে	—
31. Trin	Three	ত্রি	ত্রি, তিন	তিন
32. Vag	Fire	অগ্নি	অগ্নি, আগুন	—
		যাগ	যাগ	—
33. Kaut	Word	কথা	কথা	—
34. Tel	Oil	তৈলম	তেল	তেল

কাজেই প্রচলিত রোমানী ভাষা অনুশীলন করলে দেখা যায় তার মূল সংস্কৃতই। সংস্কৃত ব্যাকরণের মূল কাঠামো রোমানী ভাষায়ও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। এমন কি সংস্কৃত ভাষার তিন "শ"—তালব্য-শ, মূর্ধন্য-ষ ও দন্ত্য-সর ধ্বনিগত পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য জিপসীদের ভাষায়ও পরিলক্ষিত হয়।

ব্যঞ্জনান্ত র-ফলা রোমানীতেও দেখা যায়। গণনার সংখ্যাগুলির বেশির ভাগও নিয়েছে ওরা ভারতীয় অঙ্কশাস্ত্র থেকে। তবে সাত, আট, নয় প্রভৃতি অপরাপর সংখ্যাগুলি গ্রহণ করেছে অপর সূত্র থেকে—পারসিক বা গ্রীকদের কাছ থেকে। ইউরোপের দূর প্রান্তিকে ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে ওরা যে পারস্য ও গ্রীসের কাছাকাছি অঞ্চলে দীর্ঘকাল বসবাস করেছিল, এ থেকে তা প্রমাণিত হয়। বোহিমিয়ান জিপসীরা যখনই যে দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে তখন সেখানকার অনেক কিছুই নিজেদের সুবিধামত আহরণ করেছে বটে তবে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারায় নি। যস্মিন দেশে যদাচার নীতি অনুসরণ করে খাপ খাইয়ে নিয়েছে নিজেদের।

জিপসী কবিতা

কাজেই দেখা যায়, ভাষা, দেশাচার, রীতি-নীতির কথা বাদ দিলেও পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা বিচিত্র বেশ-ভূষা পরা জিপসীদের সঙ্গে ভারতীয়দের আকৃতিগত সামঞ্জস্য রয়েছে অনেকখানি। সংখ্যাও তাদের নেহাত কম নয়—৯০ লক্ষের মত।

চাষাবাদ তাদের পেশা নয়। নেশা নাচ-গান, বাদ্য-গীতি, হাত-দেখা, ভাগ্য-গণনা ইত্যাদি পরগাছা-বৃত্তির। দুঃখ-দারিদ্র্য, অন্ধবিশ্বাস আর অদৃষ্টবাদ তাই নিত্য সহচর। শিক্ষার আলোক এক-তৃতীয়াংশও পায় নি, তবু কিন্তু জিপসী গায়ক, কবি, লেখক, সাংবাদিক আর আইনজীবীদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। একদা এসব বোহিমিয়ানদের নিয়ে ইয়োরোপে রোমান্টিক সাহিত্যের অবতারণা হয়েছিল। ভিক্টর হুগো, পুশকিন, জোলা, মলিয়র, স্কট, হেনরী ওয়ালপোল, ই. মার্সিন ('জিপসী সিক্স পেন্স') প্রমুখ অনেকেই সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। অমর গীতিকার গ্যাসিয়া লরকা প্রমুখ শিল্পীদের কথা বাদ দিলেও, জর্জ বারো, ম্যাট্রো ম্যাক্সিমফ, বারবু, কনস্ট্যানটিনেস্কো, আলেকজাণ্ডার পেট্রোভিক, রাদে উইস্লিক প্রমুখ আধুনিক জিপসী লেখক-লেখিকাদের সাহিত্যকীর্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক জিপসী লেখকদের মধ্যে ম্যাট্রো ম্যাক্সিমফ ১৯৪৯ সালে জিপসী জীবন অবলম্বনে 'দি উরসিটরী' নামে একটি উপন্যাস

রচনা করেন। মূল ফরাসীতেই তিনি তা লেখেন। রাদে উহলিক (Rade Uhlike) ও যুগোশ্লাভিয়ার আলেকজাণ্ডার পেট্রোভিক্ক এবং রুমানিয়ার বারবু কন্‌স্টানটিনেস্কো আধুনিক জিপসী লেখকদের মধ্যে অগ্রণী। জর্জ বারোর আত্মচরিতমূলক গ্রন্থ 'ল্যাভেনগ্রো' ও 'রোমানি-তেই' জিপসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন—গাসিয়া লরকার অমর গীতি কবিদের কথা বাদ দিলেও।

ত্নিয়ার আর কোন জাতিই বুঝি হতভাগ্য এ যাযাবরদের মত এমন নির্যাতিত হয়নি। জার্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড সর্বত্রই হয়েছে ওরা বিতাড়িত, নিপীড়িত, এমনঃকি, স্পেনে জিপসীদের নিজস্ব ভাষা 'রোমানী'তে কথা বলা পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল এককালে। আর হিটলারী আমলে জিপসীদের হাজারে হাজারে, লক্ষে লক্ষে হত্যা করা হয়েছে গ্যাস চেম্বারে পুরে।

হাজার নির্যাতনেও কিন্তু পঙ্গু হয়নি স্বাধীন প্রকৃতির মূর্ত প্রতীক বন্ধনহীন এ যাযাবরের দল।

পৃথিবীর অবশিষ্ট রোমান্সের শেষ মূর্তিময় প্রকাশই বুঝি সত্যি জিপসী কবিতা। কয়েকটি জিপসী কবিতার অনুবাদ। কবি জেনেট টাকটির :

॥ ফাঁসি কাষ্ঠ ॥

ইপিং বনের ধারে মদ্যশালার পাশে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একদিন সকালবেলা
গল্প করছিলাম রোসা জিপসীর সঙ্গে
আর আর দিনের মত।
হঠাৎ দেখি রোসা ফিস ফিস করে বলে উঠল :
'খবরদার,
রোমানী ভাষায় কথা কয়ো না আর,
ওই দেখো, এদিক আসছে পুলিশ
শুনতে পাবে ও,
দেখবেও।'
'শুনলই বা সে,'
বললাম আমি, 'ও কি আর পারবে কিছু বুঝতে?'

'না, না, না,
জানো না তুমি আমাদের কর্তাকে,
এ যে দেশের আইনের বিরোধী।'
'বাবার মুখে আমি যে শুনেছি নিজে
ও ভাষায় কখ্খনো কথা কইতে নেই
কিংবা লিখতে নেই কখ্খনো।
রোমানীতে কথা কইতে গিয়ে
কত জনাকেই না ঝুলতে হয়েছে ফাঁসিকাঠে
লটকাতে হয়েছে মিছিমিছি
একবার শুধু কথা কইতে গিয়ে।
এখনো তা আছে লেখা আইনের খাতায়,
বদলায় নি এক বর্ণও
জেনে রেখো।'
রোমানীতে আর লিখতে হবে না কিতাব,
শুধু কথা কইতে দেখলেই হোল
করবে ওরা তোমায় পাকড়াও
আর ঝুলিয়ে দেবে ফাঁসিকাঠে।
হলেও বা খাঁটি ভদ্রলোক।
খামাকা কেন ঝুলতে যাবে ফাঁসিকাষ্ঠে ?
রোমানীতে কথা কওয়ার অর্থ হোল
ফাঁসির দড়িটা আপনার গলায় পরে নেওয়া।

॥ জিপসী প্রেম ॥

মা আমার আজ ঘরে নেই
দূর শহরে গেছে কোথাও ;
বাবাও গেছে শুঁড়িখানায়
সেখানে আছে মশগুল হয়ে ;
কানাকানি করবে এমন নেই মেয়ে
ঘরেও নেই তাকিয়ে কোন ছেলে-ছোকরা,
একলা ঘরে রয়েছি আমি তোমার পথ চেয়ে।

তাই বলছিলাম প্রিয়, চলে এসো !
আচ্ছা বলো তো, আগুনের ধারে বসে আমি করছি কী ?
সবই তোমার জন্য প্রিয়, সবই তোমার জন্য,
বরাতটাকে দেখছি যাচাই করে, দেখছি !
ওখানকার ওই বড় বাড়িটার একটি মেয়ের
সেদিন দেখছিলাম হাত,
বললাম ঃ
সাদি হবে তোমার মস্ত এক ধনী পুরুষের সঙ্গে
ধন-দৌলতের থাকবে না লেখা-জোখা।
বুদ্ধি করে অমন কথা জিপসী মেয়ে বলেছে নাকি কেউ ?
মেয়েটি তাই টাকা-কড়ি বিস্তর—
দিলে গুঁজে দু হাতে আমার।
সে পেয়েই তো ফুরফুর করে বেড়াচ্ছি আজ-কাল।
সবই তোমার জন্য প্রিয়, সবি তোমার জন্য,
বরাতটাকে দেখছি যাচাই করে, দেখছি !

কাল সন্ধ্যায় কিনলাম কিছুটা ময়দা।
কিনলাম লুকিয়ে।
এসে দেখে যাও, কেমন হোল পিঠে,
দেখে যাও একবার না হয় লুকিয়ে।
টাকার মত সাদা ধবধবে রুটি-পিঠে
বানালাম ঘরেই,
সবই তোমার জন্য প্রিয়, সবি তোমার জন্য,
বরাতটাকে দেখছি যাচাই করে, দেখছি !

ঝোপের পাশে অপেক্ষা করো একটু
অপেক্ষা করো বুঝলে ?
আসছি আমি তোমার কাছে ছুটে।
জিপসীদেরই প্রথা মত রুটির পুঁটলিটাকে
মারবো না হয় ছুঁড়ে
ঝোপ ডিঙিয়ে উঁচু।

ওগো, এবার কাছে এসো, কাছে এসো প্রিয়,
পান করে নাও খানিকটা সুরা,
নিঃশেষ করে নাও পাত্রটি।
কি, চুমু খেতে চাও? চুমু খাবে একবার?
খাও। ভয় কি?
সবই তোমার জন্য প্রিয়, সবি তোমার জন্য
বরাতটাকে দেখছি যাচাই করে, দেখছি!

আর একটি কবিতা:

॥ অনশনের গান ॥

এক দানা খাবার পেটে পড়েনি ছেলে-পিলেগুলোর
খিদের জ্বালায় করছে ওরা ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ,
কাঁপছে ঠাণ্ডায় ঠক্ ঠক্ ঠক্।
ঘরেতে খাবার নেই এক কণা
চোঁ চোঁ করছে খালি পেট;
মরছি শুধু অভাব অনটনে।
তাঁবুটার উপরটাও গেছে টুটে
খান খান শত ছিদ্র মেলে,
পত্ পত্ লট্পট্ করছে এখন হাওয়ায়
ঠাণ্ডা বাতাস যাচ্ছে বয়ে শন্ শন্ শন্
কন্ কন্ করছে হাড়গুলো,
আর কাঁদছি সবাই চাপড়ে খালি বুক।
শক্ত কালো একটুখানি রুটি পাই কোথায়?
মা-ও যে নেই কোলের ছেলেটার,
নেই বুঝি মা-বাপ কেউ!
মরতে আমি পাই না ভয় ঠিক
কিন্তু রেহাই কই?

তবু হাজার নির্যাতনেও পঙ্গু হয়নি স্বাধীন প্রকৃতির মূর্ত প্রতীক এ বন্ধনহীন যাযাবরের দল। পৃথিবীর অবশিষ্ট শেষ রোমান্সের মূর্তিমন্ত প্রকাশই বুঝি জিপসী কবিতা। এমনি আরও দুটি কবিতা:

।। মাতৃহারা ।।

সাজ সন্ধ্যায় ভেড়ার ছোট্ট বাচ্চাটি ফিরে আসে খোঁয়াড়ে,
পাখিগুলি ফেরে নিজ নিজ কুলায়।
কিন্তু হাই, আমি যে অভাগী,
যাই আমি কোন চুলোয়?
পথ চেয়ে চেয়ে আমি বসেই আছি
ফিরবে তুমি কবে, মাগো?
মৃতরা যায় যে দেশে সে দেশ থেকে!

জিপসী কবি জেনেট টাক্কির আরো একটি কবিতা—প্রেমিক-প্রেমিকার কথোপকথনের ঢঙে লেখা:

।। সৌভাগ্য ।।

রাত কাবার করেই যে ফিরলে বড়ো, কোথায় ছিলে এতক্ষণ
বলো না প্রিয়?

কোথায় বা থাকতে পারি তুমিই বলো?
ট্যাকর থলেটিও যে দেখছি হয়ে গেছে ঢিলে?
আমি যে বনে গিয়েছিলাম ওগো প্রিয়া?

কাঠঠোকরানো পাখীদের কত গান শুনলাম। ছুটাছুটি করলাম বনে বনে। কাঠবিড়ালিগুলি করছিল হুটোপুটি। শীতকালের জন্য সংগ্রহ করছিল বাদাম আর বনপরীরা নৃত্য করছিল চক্রাকারে। বন থেকে এমন সময় বেরিয়ে এল এক জিপসী মেয়ে। বৃদ্ধা, খাঁজকাটা মুখ। কটা বাদামী রঙ্। ও এসে হাতখানা আমার নিল টেনে। পরীক্ষা করল আমার হাত। গণনা করে বলল:

শীঘ্রই হচ্ছে আমার সাদী। সাদী হবে কটা চুল এক কন্যার সঙ্গে। কটা চুল, নীল চোখ; জংলী গোলাপের মত একটি মেয়ে।

ঝকঝকে সোনালী রোদের মত চুল আমার পীতাভ; চোখ দুটি পীতাভ কপিশ; পয়সা খরচা করেই বাপু জানলাম ভবিষ্যৎ।

তোমার আমার হবে সাদী।

জিপসীদের কৃষ্টি, সংস্কার, ধর্ম, কর্ম দৈনন্দিন জীবনের প্রতিফলন

তাদের কাব্য-সাহিত্য। কবি চার্লস লেল্যাণ্ড-এর এমনি একটি কবিতার অনুবাদ :

ছোট্ট এক দানি চাঁদি সোনা গরীব বুড়ী জিপসীর হাতে গুঁজে দিন দিদিমণি ; জানবেন, আপনার ভাগ্য-লক্ষ্মী খুব পয়মন্ত। আপনার হস্ত রেখার গ্রহ সন্নিবেশ দেখেই বলছি জানবেন দিদিমণি। খুব সুন্দর এক যুবক প্রেমে পড়েছে আপনার। হাবুডুবু খাচ্ছে, দিদিমণি। আপনিও মজে গেছেন দিদিমণি। সাদী হবে আপনাদের।

বিয়ের পর আপনি হয়ে পড়বেন পয়লা নম্বরের গিন্নী। দু-দু ছেলের মা-ও হবেন শীগগীর। আজীবন সুখে শান্তিতে কাটাবেন দিন। আমার হাত দেখা সত্যি কিনা, প্রমাণ তার আজই পাবেন হাতে-নাতে। আজকেই দেখা হবে আপনার মনের মানুষের সঙ্গে এখানে।

ওই দেখুন কে আসছে একবার চোখ তুলে দেখুন, আমার কথা ফলল কিনা দেখুন, দিদিমণি!

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

১. জিপসীজ : ফরগটেন সানস্ অব ইণ্ডিয়া : ভিক্ষু চমনলাল
(সার সি. পি. রামস্বামী আয়ারের মুখবন্ধ সহ)
২. এ্যাকাউন্টস্ অব দি জিপসীজ অব ইণ্ডিয়া : ডেভিড ম্যাক্রিটচিল
(Macritchil)
৩. দি জিপসীজ : জাঁ পল ক্লেবার্ট (ইংরাজী অনুবাদ : চার্লস ডাফ)
৪. জিপসীজ : দি সিক্রেট পিপল : গডফ্রে ই. চার্লস্ ওয়েভ
৫. এ হিস্ট্রি অব দি জিপসীজ : ওয়াল্টার সিমসন
৬. জিপসী ফোক টেলস্ : গ্রোম ফ্যান্সিস হিণ্ডেস
৭. জিপসীজ—দেয়ার লাইফ্ য়্যাণ্ড কাস্টমস্ : মার্টিন ব্লক :

পুশতো সাহিত্য

পুশতো ভাষা পাঠানদের ভাষা। পাঠানরা আর্যদেরই এক শাখা। কাজেই পুশতো ভাষা আর্য ভাষা থেকে উদ্ভূত। পুশতো সাহিত্য পাঠ করলে সীমান্ত প্রদেশ ও তথাকার উপজাতীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রার ছবি পাঠকের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কঠিন পর্বত-মালা ও পাথরকুচি পূর্ণ পথ-ঘাট, উপত্যকা এবং রুক্ষ পাহাড়ী অঞ্চল মূর্ত হয়ে ওঠে পাঠকের সামনে।

আর্যজাতির এই শাখা খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বৎসর পূর্বে আমু দরিয়ার চারিদিকে বসবাস করত। পুশতো ভাষা তাই অতি প্রাচীন; তবু কিন্তু প্রাচীন পুশতো সাহিত্যের বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায় না।

কাবুল থেকে কান্দাহার আর ব্রিটিশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকার গিরিসংকুল পার্বত্য অঞ্চলে আর সমভূমি বাসিন্দাদেরই কথ্য ভাষা পুশতো। আফগানিস্থানের প্রধান ভাষারূপেও পুশতো আজ স্বীকৃত। ঝিন্দ আবেস্তাই পুশতো ভাষার উৎস। আরবী, ফারসী আর প্রাকৃতের বহু শব্দ পুশতো ভাষাকে করেছে সুসমৃদ্ধ।

পুশতো ভাষা সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীনতম কথ্য ভাষারূপে প্রচলিত হয়ে এলেও, তার লিখিত ভাষার নিদর্শন খুব বেশী দিনকার নয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রুশিয়ার খারকভ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বার্নহার্ড ডরন-ই প্রথম পুশতো ভাষার ইংরেজী ব্যাকরণ সংকলিত করে প্রকাশিত করেন। পেশোয়ার আফগানদের শিক্ষা-সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্রস্থল হলেও পুশতো ভাষার অধিকাংশ হস্তলিখিত পুঁথিপত্র ও ধর্মগ্রন্থ নানা মস্‌জিদ ও দরগায় রক্ষিত ছিল পাণ্ডুলিপিতে। দিল্লীর বাদ্‌শা আকবরের রাজত্বকালে বায়াজিদ আনসারী তাঁর সুবিখ্যাত পীর-ই-রোশান বা মহাপ্রাজ্ঞ রচনা করেন। পুশতো ভাষায় বিবিধ ধর্মগ্রন্থও রচিত হয়। তাঁর সমসাময়িক আকুন্দ দরবেজও অনুরূপ নানা ধর্মগ্রন্থ বিরচিত করেন। খাটক্‌দের খুশল-খানও ফারসী থেকে পুশতো ভাষায়

শতাধিক লোকগীতি অনূদিত করেন। উচ্চ ভাবসম্পদে দেওয়ানও তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আহম্মদ শাহ (বর্তমান আফগান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা), আবতুর রহমান প্রভৃতি অনেকেই সেকালে পুশতো ভাষায় গীতিকাব্য রচনা করে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। এখনকার পেশোয়ার থেকে মাত্র তু' মাইল দূরে হাজারখানায় মরমী ও দরদী কবি আবতুর রহমানের সমাধিস্থল আজও বিদ্যমান আছে। শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনারী (বিশেষ করে উইলিয়াম ক্যারীর) দৌলতে পুশতো ভাষা ছাপার হরফে প্রচারিত হয়। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারই ছিল মিশনারীদের উদ্দেশ্য। মার্কিন প্রেসবিট্যারীয়ান মিশনারীরাও পুশতো ভাষায় পুস্তক প্রচারে কম সহায়তা করে নি।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বাসিন্দা পাঠানদের বাঁচার সংগ্রামেই জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হয়ে থাকে। সাহিত্য-মূলক সূক্ষ্ম হৃদয়বেত্তার স্থান তাতে বড় একটা নেই। তবুও প্রাচীনতম পুশতো কবিতায় যে সকল নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে কবিতায় পাঠানদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও শৌর্যবীর্যের প্রতিফলন সুস্পষ্ট। যেমন:

'তীরের ফলার মত আমার দৃঢ় সংকল্প তুশমনের মাথার উপরে ঝক্‌মক্ করে উঠে; আমি পলাতক তুশমনের পশ্চাদ্ধাবন করি এবং আঘাত করি; আঘাত করি রণজয়ী বীর্য নিয়ে—তুশমনের সম্মুখীন হতে আমার চাইতে শক্তিশালী যোদ্ধা কেউ নেই।'

পুশতো সাহিত্যকে তিন যুগে ভাগ করা হয়েছে। প্রাচীন যুগ: হিজরী দ্বিতীয় শতক থেকে আরম্ভ করে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতক, অর্থাৎ বাবরের ভারত আক্রমণ কাল পর্যন্ত। মধ্য যুগ: খৃষ্টীয় ষোড়শ শতক থেকে শুরু করে ইংরেজ শাসনের সূচনাকাল পর্যন্ত। আর তৃতীয় বা একালের সাহিত্যের আরম্ভ ১৮৪০ সাল থেকে বলা চলে।

আমীর কেরোর পহলাভির গীতি-কাব্য পুশতো সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন মওলানা মোহাম্মদ সারওয়ার উর্দুতে লেখা তাঁর 'পশ্চিম পাকিস্তানের সাহিত্য' পুস্তিকায়। হিজরী ১৩৯ সালে তিনি ছিলেন ঘোর অঞ্চলের বাদশাহ্। তিনি ছিলেন খুব সাহসী ও বীর। তাঁর রচিত একটি কবিতায় সুস্পষ্টভাবে তা ফুটে উঠেছে:

'আমি আমার যুগের বীর কেশরী—আমি অদ্বিতীয়। হিন্দুস্তান,

সিন্ধু, বোখারা এবং কাবুলে আমার সমতুল্য কেউ নেই। সমগ্র কাবুলে আমার দ্বিতীয় কেউ নেই।'

[অনুঃ—মওলানা মুস্তাফীজুর রহমান]

আর একটি কাব্য-কণাতেও এই বীরত্বব্যঞ্জক মনোভাব সুন্দরভাবে পরিস্ফুট দেখা যায় :

'আমার লৌহ-কঠিন সংকল্প তীরের সমতুল্য, শত্রুর মাথায় যা পতিত হয়ে থাকে। আমি পলায়নকারীদের পশ্চাদ্ধাবন করি এবং তাদের বারবার আক্রমণ করে থাকি, সমরক্ষেত্রে আমার সমতুল্য বীর পুরুষ কেউ নেই।'

[অনুঃ—মওলানা মুস্তাফীজুর রহমান]

বস্তুতঃ, বীরত্ব-গাথা বা বীরত্বসূচক রচনাই পুশ্‌তো সাহিত্যের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। এই দিক থেকে আমীর কেরোরের কবিতাগুলি পাঠান জাতির দুঃসাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক।

সেকালের পুশতো সাহিত্যের প্রকৃত তথ্য খুব বিশেষ জানা যায় না। কিন্তু 'টপ্‌পা খাজানা' গ্রন্থে অনেক প্রাচীন তথ্যের হদিস পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক এই পুশতো গ্রন্থখানি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। পুশতো সাহিত্যের গোড়ার দিকের অনেক খবরাখবর এ মূল্যবান কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে তা থেকে জানা যায় : সেকালের পুশ্‌তো সাহিত্য ছিল খুব সহজ ও স্বাভাবিক। তখনকার দিনের (হিজরী ১৩৯—৭৫০) কাব্য ছিল একান্ত নিজস্ব। বাইরের কোন প্রভাব ছিল না তার উপর। তখনকার প্রসিদ্ধ কবিদের মধ্যে আবু হাশেম, শায়খ মালকিয়ার, আস্‌আদ সূরী প্রভৃতি সবিশেষ খ্যাত। এঁরা প্রত্যেকেই আপন আপন ছন্দে নিজ নিজ কবিতা লিপিবদ্ধ করতেন। আরবী বা ফারসী ছন্দের কোন প্রভাব ছিল না।

অবশ্য ৭৫০ হিজরী সনের পর থেকে তার ব্যতিক্রম দেখা দিয়েছে। ফারসী গজলের অনুকরণ হতে শুরু করেছে এবং চিন্তায়, ছন্দে, পরিভাষায় ও কাব্যালঙ্কারেও তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে পুশতো সাহিত্য যে তার স্বকীয়তা হারিয়েছিল তা ঠিক বলা যায় না। কেননা, কেবল গজলেই তার অনুকরণ দৃষ্ট হয়। পুশতো সাহিত্যেও ফারসী সাহিত্যের অনুরূপ রূপ ও প্রেমের স্থান

বিদ্যমান। বীর কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে সুরা, জুল্‌ফ আর গণ্ডের প্রাচুর্যও দেখা যায়। এক কথায়, সে যুগের পুশতো সাহিত্যে রূপ ও রসের স্থান যেমন রয়েছে, তেমন রয়েছে শক্তিমত্তার বর্ণনা।

গজল ছাড়া 'টপ্পা' পুশ্‌তো সাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন সম্পদ। টপ্পা পুশতো কাব্যের স্বাভাবিক স্বতোৎসারিত সাহিত্য। টপ্পাকে 'লণ্ডি' বা 'মেসরা' বলা হয়। 'টপ্পা' পুশতো সাহিত্যের লোক-গীতির একটি প্রধান অঙ্গ। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং সর্বজনপ্রিয়। কেননা আজও দেখা যায় আপামর বৃদ্ধ সকল প্রধানই একাধিক টপ্পা কণ্ঠস্থ করে রেখেছে। এ অনেকটা পাঞ্জাবী বা মুলতানী ভাষার 'দোহার' অনুরূপ। টপ্পা ছাড়া পুশ্‌তো লোকসাহিত্যের অপর শাখা হোল 'চারবীতা', 'নিমকাই' ও 'বেগতাই'। এ সকল একতারার সাহায্যে গান করাও যায়।

সলমান কাকুর 'তাজকিরাতুল আওলিয়া' পুশ্‌তো গদ্য সাহিত্যের এক প্রাচীনতম গ্রন্থ। হিজরী ১২০০ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হয়। এ গ্রন্থের যে কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে দেখা যায়, গীতিকাব্যখানি সহজ ও চিত্তাকর্ষক এবং আরবী রচনাপদ্ধতির অনুকরণে এখানি রচিত।

সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন আকবর জমিন্দারু। আকবর জমিন্দারু তৈমুরলঙ্গের সমসাময়িক। তৈমুরের ভারত অভিযানের সময় ইনি জীবিত ছিলেন। তবে তাঁর লিখিত রচনা বড় একটা আজ চোখে পড়ে না। ঘোর ও গজনভীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে তাঁর বাস। সেকালের পুশতো কবিদের মধ্যে মোল্লা মস্ত জমান্দরও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর লেখা 'মুলুফুল গোজোয়াত' একখানি উল্লেখযোগ্য কিতাব। প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে তাঁর রচিত বহু রুবাঈ, কাসিদা ও গজলের সন্ধান পাওয়া যায়। এমনি একটি গীতিকা :

> 'হে মস্ত! তুমি যখন সন্তোষের সম্পদ লাভ করেছ, তখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না; কেননা উভয় লোকের স্বাচ্ছন্দ্যই তুমি লাভ করেছো।'

বিবি যবুনা ও বিবি রাবেয়া সেকালের মহিলা কবিদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন।

মধ্যযুগ

মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ আলেম ও সাধক কবি বায়েজিদ আনসারীর জন্ম হয় ওয়াজিরিস্তানে। পাঠানেরা তাঁকে 'পীর-ই-রওশন' বা উজ্জ্বল পীর বলে অভিহিত করতেন। আনুমানিক ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে আনসারী ইস্‌লামী জীবনধারা বিষয়ক একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। নাম 'খারুল-বয়ান'। বইখানি আরবী ব্যাকরণের অনুকরণে লিখিত হলেও গ্রন্থখানি ছন্দময়। 'খারুল-বয়ান' সে যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনা। মীর্জাখান আনসারী কেবল প্রবন্ধকার ছিলেন না, কবিও ছিলেন। পুশতো কবিদের মধ্যে তাঁর কাব্যই সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। মীর্জাখান আনসারী পীর রওশন আনসারীর উত্তর-সাধক ছিলেন। সিদ্ধ সুফীও ছিলেন তিনি। খৃষ্টীয় ১৬২০ সাল নাগাদ দাক্ষিণাত্যের এক যুদ্ধে তিনি নিহত হন। তাঁর একটি গীতিকণা :

'কি বলি, আমি কি ? আমার জীবন-মৃত্যু তাঁরই প্রতিচ্ছবি।'

খোশহাল খান খটক পেশওয়ারের অন্তর্গত আকোড়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায় তাঁর প্রতিভাদীপ্তিতে পুশতো সাহিত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সকল দিক থেকে। তাঁরই একান্ত প্রচেষ্টায় পুশতো সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার সাধিত হয় চতুর্দিকে। তাঁকে পুশতো ভাষার জাতীয় কবিরূপে আখ্যা দেওয়া হয়। খোশহাল খান কমবেশী ৩৬০ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর 'দিওয়ানে' সর্বসমেত ১৪ হাজার বয়াত আছে। এবং দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, নীতিকথা, দেশাত্মমূলক কবিতা, বিরহ-মিলন-প্রেম গাথা প্রভৃতি শিল্পকলার কোন দিকই বাদ পড়েনি। খোশহাল খান পুশতো গদ্যকেও নতুনভাবে সঞ্জীবিত করে গিয়েছেন পদ্যসাহিত্যের মত। সাধারণ মানুষের হাসি-কান্নার কথা অলংকারাতিশয্যের আওতা থেকে মুক্ত করে রূপদানের রেওয়াজ তিনি প্রথম প্রবর্তন করেন সহজবোধ্য পুশতো সাহিত্যে। সহজবোধ্য পুশতো ভাষার নমুনা হিসেবে তাঁর 'আয়ার-ই-দানেশ' উল্লেখ্য যোগ্য অনুবাদ। 'দাস্তার নামা' খানসাহেবের শ্রেষ্ঠ রচনা। স্বাধীনতা-প্রিয় বীর পাঠানদের জাতীয় মর্যাদা-দ্যোতক কাহিনীই তিনি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। গ্রন্থখানির সূচনার একটি পঙ্‌ক্তি :

'সাধারণতঃ অনেকেই শিরস্ত্রাণ পরে থাকে তবে মর্যাদার বিস্তার খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে।'

কবি খোশহাল খানকে তাঁর জীবনের শেষের দিকে দিল্লীর বাদশাহ গ্রেফতার করে রাজধানীতে নিয়ে আসেন এবং অন্তরীণ করে রাখেন। তিনি তাঁর কারা-জীবন সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

'প্রথমতঃ এখানে বাদশাহের দরবারে হাজিরী দিতে হয়। এখানে কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই। এখানে আমি কারও প্রতি কৃপা করতে পারি না। এখানে কারও উপর আমার কর্তৃত্ব চলে না। তা ছাড়া এখানকার প্রত্যেক ব্যক্তিই অপর সম্পর্কে মিশ্র মনোভাব পোষণ করে থাকে।'

খোশহাল খানের পুত্র পৌত্রগণও অনেকে সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর ছয় পুত্র ও এক কন্যাকে পুশতো সাহিত্যে প্রথম সারির কবিদের মধ্যে আসন দান করতে হয়। তাঁর এক পুত্র শেখ সাদীর 'গুলিস্তান-এর পুশতো অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদ পিতার রচনার চাইতে সহজ ও হৃদয়গ্রাহী।

আবদুর রহমান বাবা পুশতো সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সুফী কবি। তিনি খোশহাল খানের সমসাময়িক। তিনি তাঁর সুরের মাধ্যমে পাঠানদের অন্তরে ঈশ্বরের প্রেমের আগুন প্রজ্বলিত করেন। সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিতে দর্শন ও তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা তাঁর কাব্যের প্রধান বিশেষত্ব। আবদুর রহমান বাবার রচনায় রুমী, সাদী ও হাফিজ প্রমুখ ইরানী মহাকবির প্রভাব বিদ্যমান। পাঠানদের জাতীয় সত্তা তাঁর কাব্যে তাঁর প্রতিটি দিওয়ানে, রুবাঈ ও গজলে অনুরণিত। আবদুর রহমান বাবার শত শত কাব্য মঞ্জুষা আফগানদের দৈনিন্দন জীবন-যাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এমন কোন পুশতো ভাষা-ভাষী শিক্ষিতের অস্তিত্ব মিলবে না যিনি আবদুর রহমান বাবার কিছু না কিছু কবিতা কণ্ঠস্থ করতে পারেন না।

পেশোয়ারের অনতিদূরে বাহাদুর কুলি নামক স্থানে ১০৪২ হিজরী সনে আবদুর রহমান বাবা জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপন করে তিনি আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য সাধনা করেন এবং সাংসারিক জীবনে একরূপ বীতস্পৃহ থাকেন। নির্জন নদীর তীর বা গাছের তলায় বসে ঈশ্বরের আরাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। তখন তাঁর মুখের কথামৃত শুনবার জন্য ভক্তের দল তাঁকে ঘিরে থাকত। রহমান বাবা তখন যা উপদেশ

দিতেন তাই ভক্তের দল কণ্ঠস্থ করে রাখত। আবছুর রহমান বাবার সেই সহজ, সরল সুভাষিত বাণীর একটি কলি এখানে উদ্ধৃত হোল:

'রহমানের ফ্যাকাশে ভাব ও নিরুৎসাহিতা লক্ষ্য করো। সে সব সময় তোমার বিচ্ছেদে ক্রন্দন করতে থাকে। শ্রেষ্ঠ বাদশাহ ও শাহান-শাহবৃন্দ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। তাতে কি হয়েছে? তাঁদের বিয়োগে এখানে কোনো তফাত দেখা দেয় নি। যদিও মুহূর্তে সহস্র সহস্র মানুষ মৃত্যু বরণ করে, আবার পর মুহূর্তেই অমন হাজারে হাজারে মানুষ জন্ম গ্রহণ করে। দিনের এ যাওয়া আসার কোন হিসেব নেই। এটা একটা অন্তহীন সমুদ্র—প্রবাহিত হয়ে চলেছে এ। এ পৃথিবীতে কেউ কারো জন্য ভাবে না—যার অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসে, সেই কেবল জানে।'

এমনি কত দার্শনিক তত্ত্ব-কথামৃত সহজ সুললিত কণ্ঠে প্রতিদিন বলে যেতেন সাধক কবি আবছুর রহমান বাবা পুশ্‌তো ভাষায়।

পেশওয়ারের আবছুল হামিদ বাবাও সেকালের অপর এক মরমী সাধক কবি। তাঁর দিওয়ানগুলি মানব মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিরই আত্ম-প্রকাশ। রূপ ও রস তাঁর সাহিত্য-সাধনার প্রধান অঙ্গ। আবছুর রহমান বাবা ও আবছুল হামিদ বাবার প্রভাব পরবর্তী কালের সকল পুশতো ভাষা-ভাষী কবির মধ্যে দেখা যায়।

আধুনিক কাল

এর পর যে যুগের সূচনা হয় তাতে আরবী, ফারসী ও ইস্‌লামী চিন্তা-ধারার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিদেশী ভাষার দৌলতেই পুশতো ভাষায় রোমান্স-ধর্মী উপাখ্যানের সূত্রপাত। তবে এসব রচনার বেশীর ভাগই মৌলিক নয়। কোনটা বা অনূদিত; কোনটা বা অবলম্বনে রচিত।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজেরা অটক নদী পার হয়ে পাক্‌তুনিস্থান অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে। বৃটিশ আগমনের পর থেকে বৈদেশিক প্রভাব পুশতো গদ্য ও পদ্যের উপর পতিত হয় বিশেষ করে এবং এর নব সূচনার সৃষ্টি করে।

বিদেশীদের ভাবে বিভিন্ন বিষয়ে তখন সাহিত্য সৃষ্টি হতে আরম্ভ করে। উর্দু কবিতা ছাড়া ইংরেজী কাব্যের অনুকরণেও পুশতো ভাষায়

নতুন নতুন বিষয়বস্তুর নিরীক্ষা-পরীক্ষা হতে থাকে। রাজনৈতিক চেতনা ও তার প্রতিক্রিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রেও দেখা দিল। ফলে পুশতো গদ্য-সাহিত্যে আধুনিক রীতির প্রচলন হোল। পূর্বেকার অলংকার বাহুল্য ও দুর্বোধ্যতার হোল অবসান। উনিশ শতকের পুশতো সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখকদের মধ্যে মওলবী আহমদ উল্লাহ্, কাজী আহ্মদ শাহ্ রেজওয়ানী, কাজী রহিমুল্লাহ, মুনশী আহমদ জান এবং সৈয়দ রাহাতুল্লাহ রাহাতের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই কথাশিল্পীরা পুশ্তো ভাষায় সাধারণের সুখ-দুঃখের কথা সহজভাবে রূপায়িত করে তোলেন।

পুশতো সাহিত্যে আধুনিক কালের সূচনা বস্তুতঃ ১৯২০ সাল থেকে। পেশোয়ারের ইস্লামিয়া কলেজ ও এড্ওয়ার্ড কলেজের অবদান এই ক্ষেত্রে অপরিসীম। ইংরাজী শিক্ষিত এ দুই কলেজের ছাত্রবৃন্দ পুশতো সাহিত্যকে নতুন ভাবে ঢেলে সাজিয়েছেন। নতুন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে পাশ্চাত্য আঙ্গিকের প্রবর্তন করেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় পুশতো কাব্যে জাতীয়, সামাজিক ও সংস্কারমূলক বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। আজাদ্, আলী, ইসমাইল, ইকবাল প্রমুখ শক্তিশালী কবি ও গীতিকারের কল্যাণে ১৮৫৭ আটার শ' সাতান্নর পর উর্দু সাহিত্যে যে যুগান্তর দেখা দেয়, তার প্রায় সত্তর বৎসর পর সৈয়দ রসুল খান রেসা, মুহাম্মদ আশরাফ্ মফতুল, ফজলে হক শায়দা, সমন্দর খান বদরশুরী, হামজা খান শেন্ওয়ারী, আজম খান খটক এবং আরবাব হেদায়েতুল্লাহ্ খান প্রভৃতির সাধনার ফলে পুশতো সাহিত্যও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

সৈয়দ রসুল খান রেসার 'দীপডিয়া' গ্রন্থখানি আধুনিক যুগে পথিকৃৎ হিসাবে পরিগণিত হয় পুশতোতে। সমন্দর খান বদরশুরীর চিন্তাধারায় ইসলামী ও ধর্মীয় ভাবধারার সঙ্গে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটেছে। কবি সমন্দর খান আবদুর রহমান বাবার অনুসারে আর কবি সৈয়দ রসুল খান রেসা আবদুল হামিদ বাবা কাব্যপাঠশালার শিষ্য। রেসার কাব্যে ব্যঙ্গ ধারাল নখরও পরিলক্ষিত হয়। ইনি সামাজিক গলদ নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন শিক্ষিত সমাজের কাছে। মহম্মদ আশ্রাফ্ মফ্তুলের রচনায় পাশ্চাত্যের কাব্যধারার ছাপ সুস্পষ্ট। আরবাব হেদায়েতুল্লাহ্ খান সর্বপ্রথম পুশতো কাব্যে ছান্দিক রচনার সূচনা করেন। সমন্দর খান বদরশুরীর কবিতায় অসাধারণ

শক্তিমত্তা ও আত্মপ্রত্যয়ের উৎস মেলে। পাঠানদের জাতীয় সত্তা তাঁর কাব্যদর্শনে বুঝি হুবহু প্রতিফলিত হয়েছে। হামজা খান শেনওয়ারী পুশতো গজলের প্রবর্তক। সেকাল ও একালের চিন্তা জগতে সমন্বয় তিনি করে গেছেন। আজম্ খান খটক কৃষক-শ্রমিক মেহনতি জনতার দরদী কবি। তাঁর লেখনীতে পাঠানদের জাগরণের বাণী ঘোষিত হয়েছে। তাঁর দেশাত্মবোধক একটি কবিতার অনুবাদ উদ্ধৃত হল :

'আমি এই পৃথিবীর পরিধি দেখছি। আমার চক্ষু তুমি বন্ধ করছ। আমি আকাশের বিশাল উচ্চতার দিকে আরোহণ করছি। তুমি আমার ডানা ও পালক উভয়ই বাঁধছ—এবং আমার মধ্যে পিঞ্জর ভাঙ্গার এক দুঃসাহস জাগছে। আর তুমি রজ্জু দিয়া সেই খাঁচার দুয়ার বন্ধ করছ।

'আমি এই অসীম বিস্তৃত অরণ্যে শিকার করিতে ইচ্ছুক। আর তুমি আমাকে অভুক্ত রেখে কসাইয়ের কাছে সোপর্দ করছ।' মনে হচ্ছে পাঠান জেগেছে। প্রবঞ্চিত তাকে এখন আর কেউ করতে পারবে কি?'

[অনুবাদ : মওলানা মুস্তাফীজুর রহমান]

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে স্বাধীন পাঠানদের পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হল। স্বাধীন পাকতুনিস্থানের স্বপ্ন আপাততঃ বিলীন হয়ে গেল বটে, স্বাধীনতাকামী পাঠানরা কিন্তু তাঁদের সাহিত্যটিকে মনে প্রাণে বজায় রাখছেন।

প্রেম সংগীত

পুশতো সাহিত্যে প্রেম সংগীতের অভাব নেই। পুশতো গীতিকবিদের মধ্যে আবদুল কাদীর খান, আলী খান ও আবদুল হামিদ উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। তাঁদের লেখা মাটির কাছাকাছি ঘেঁষা। সাধারণ মানুষের হাসি কান্না দৈনন্দিন জীবনের কথা প্রতিফলিত হয়েছে। কবি আবদুল কাদীরের একটি গীতি কবিতা উদ্ধৃত করা হল এখানে :

'ওগো প্রিয়ে! আমি সারারাত তোমার সৌন্দর্যের প্রতি তাকিয়ে থাকি, যখন তুমি লাজনম্রভাবে তোমার পায়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর। আমার যে অশ্রুবিন্দুগুলি তোমার গণ্ডের উপর পড়ে, তারা শিশির-কণার মতো আবার সেই মুকুলগুলোকে জাগিয়ে তোলে।

তুমি রুমাল দিয়ে আমার অশ্রুভরা চোখ মুছিয়ে দাও ও আমার গভীর ক্রন্দনের সময় সান্ত্বনা দাও। আমার হৃদয়ের খাতিরে তুমি তোমার অশ্রু সংবরণ করো ; কিন্তু যখন ভাবাবেগ খুব ভীষণ হয় তখন তুমিও ফুঁপিয়ে কাঁদ। আমাদের একে অপরের সামনে মরতে চাই, এমনি ভাবে প্রত্যেকে অপরের আয়ুর জন্য প্রার্থনা করি।'

[অনুবাদ : আজহারুল ইস্‌লাম]

মরমী কবি দৌলত লাভানীর একটি কবিতার অংশ বিশেষও উৎকলন করা হল। মানুষের বিশ্বজনীন আত্মা ও জীবনের উৎসের ঐক্যসূত্র তিনি সহজে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। সুফীবাদের মূর্ত প্রকাশ পুশতো এ গীতি-কবিতাটি :

'ভিতর ও বাইরে চেয়ে দেখ, আল্লাহ্‌ এক এবং সর্বত্র বিরাজমান। এসব রূপের পর্দার পেছনে আছেন একই প্রিয়তম। ঝিনুকের ভেতরে মুক্তা এবং সাপের ভেতরে বিষ। একই বর্ষার মেঘ সব জায়গায় বৃষ্টি বর্ষণ করে। যার ভিতরে ভালো ও মন্দ মাছ থাকে, সেই অকূল বিরাট সমুদ্র সর্বত্রই এক।'

[অনুবাদ : আজহারুল ইস্‌লাম]

লোকগীতি

কথিত আছে পাঠানরা সংগীত ভালবাসে কিন্তু যারা সংগীত চর্চা করে তাদের অর্থাৎ গানবাজনায় ,মাতোয়ারা গাইয়েদের অবজ্ঞা করে। কথাটি পাঠনদের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রযোজ্য। বস্তুতঃ পাঠানদের মত পৃথিবীর আর কোন জাতি অমন সংগীতপ্রিয় কিনা জানা নেই। জীবন-যাত্রার প্রতি পদে পদে—বিবাহ বা জলসা এমন কি, 'হুজ্‌রা' বা গ্রামীণ গোষ্ঠীদের বৈঠক সর্বত্র ওরা বাদ্যযন্ত্রাদিসহ (রবাবে, ঢোল ও ঘড়া) সম্পন্ন করে থাকে। তবে সামাজিক ভাবে ললিতকলার অনুশীলন বড় একটা হোত না। তাকে মনে করা হোত ইতরজনোচিত কাজ। পেশাদারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

হুজ্‌রা পাঠান পল্লী-জীবনের অন্যতম অঙ্গ। গ্রামের সকল যুবা ও বৃদ্ধরা এ বৈঠকে সমবেত হোত। হাসি-গল্প-ঠাট্টা গান বাজনায় মশগুল

হোত। আড্ডা জমাত। ছোট চিনামাটির পেয়ালায় দুধ ছাড়া সবুজ চায়ে চুমুক দিত। আর সঙ্গে সঙ্গে রবাবের আওয়াজ তুলত। ঘড়ার টুং টাং তালের সঙ্গে 'চার বইতা'র সুর তুলত।

পাঠান সংগীত পুশতো ভাষায় রচিত পাঠান কাব্যেরই রূপান্তর। হাজারা থেকে ওয়াজিরিস্তান এবং সোয়াত থেকে বান্নু পর্যন্ত সমগ্র পাঠান অঞ্চলেই ভৈরবী, পাহাড়ী, ঝিলা ও ভীমপলশ্রী শাস্ত্রীয় সংগীতের পাশা-পাশি প্রচলিত রয়েছে লোকগীতি (যথা, টপ্পা, চার বাইতা, লোভা, বাদালায় গজল, রুবাই প্রভৃতি)। পাঠানদের বেশীর ভাগ গানের মত টপ্পা গীত হয় ভৈরবী রাগে। দেড় পঙ্‌ক্তির গীতি-কলিতে বিরহ-মিলন কথা, অন্তরের অন্তর্দাহ, শত্রুর প্রতি ঘৃণার অভিব্যক্তি, শ্লেষ, হাস্য-কৌতুক প্রভৃতি সব কিছুরই সন্ধান পাওয়া যায়। পুশতো টপ্পা বা অপরাপর লোক-গীতি শুরু হয় 'ইয়া কুরবান' (ও গো আমার প্রিয়) দীর্ঘ লয়ের এই গৌরচন্দ্রিকা দিয়ে। এ বাক্যাংশ দিয়ে এবং উচ্চারণের সহজ-দীর্ঘ বিভিন্ন কলা কৌশল দেখিয়ে গায়ক শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গানের আবহাওয়া সৃষ্টি করেন। নীচে মুঘলাই তালের দুটো টপ্পার নমুনা উৎকলন করা গেল:

'ইয়া কুরবান
খুদায়া! মা গুল্ দা গুলাব কা
চে দা জানা পা ঘাইগ্‌কে পন্‌রে পন্‌রে শামা।'

অর্থাৎ—

হে খোদা! আমাকে একটি গোলাপ ফুলে পরিণত কর যাতে আমি আমার প্রিয়ার কোলের ওপর পাপড়ি হয়ে ঝরে পড়তে পারি।

আর একটি পুশতো টপ্পা:

'ইয়া কুরবান
দা কাল খোয়ারী মে ওবো য়ো রা
বিয়া বা দা সীনা পা ঘেরা না করম পুল্‌না।'

অর্থাৎ—

আমার সকল প্রচেষ্টার স্রোতের জলে ভেসে গেল। আর কখনও আমি বেলাভূমিতে ফুলের চাষ করব না।

বাদালা পুশতো সাহিত্যের গাথা বিশেষ। বিষয়বস্তু তার কোন না

কোন কিংবদন্তি বা প্রেম উপাখ্যান। সহজ সুরে অনেকটা আবৃত্তির ঢঙে বাদালা গীত হয়ে থাকে। পেশওয়ারের পথের ধারে চাদর পেতে গ্রাম্য চারণ কবিরা মুগ্ধ শ্রোতাদের লোক-কাহিনী আবৃত্তি করে শুনাতো গানের সুরে রাতভোর; শ্রোতার দল তার চাদরের উপর পয়সা সিকি ছুড়ে দিয়ে তাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করত। নওশেরার মোল্লা নিয়ামতুল্লাহর 'নিম্বোলা-টিম্বোলা'র অবলম্বনে রচিত গীতির কয়েকটি কলি উদ্ধৃত করা গেল এখানে:

'যখন আসমানে তারাগুলি মিটমিট করছিলো, নিম্বোলা তখন বিরহের অনলে জ্বলছিলো। কখনো সে উচ্চস্বরে বিলাপ করছিল, কখনো নিরালা গৃহের একাকিত্বে নিজেকে হারিয়ে ফেলছিল। কখনো ঘর ছেড়ে ছটফট করে বেরিয়ে আসছিলো। তার অন্তরের শান্তি বিলুপ্ত।

কী তার ব্যথা—কেউ জিজ্ঞাসা করলে সে তার বিমর্ষ মুখ তুলে বলতো, যন্ত্রণায় আমার পাকস্থলী জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। এ রোগ আমাকে মেরে ফেললো, এ যে সর্বক্ষণ আমাকে আঁকড়ে রয়েছে।'

ঘুম-জাগরণে তার শান্তি ছিল না। তার চিন্তা নিরন্তর তাকে দুঃখ-সাগরে ডুবিয়ে রাখতো। কেউ যখন প্রেম সিন্ধুতে ডুবে মরে, প্রেমিক-গোষ্ঠীর মধ্যে তখন ঢেউ-এর দোলা লাগে। প্রেমের ঘোড়-সওয়ার যখন কোন গ্রহের অভিমুখে ধাবিত হোল, তখন সে গ্রহের ধ্বংস অনিবার্য।'

[অনু: সুলতানা কামাল]

পুশতো গজল উর্দুর মতোই ফারসী থেকে গৃহীত। কবিতা হিসেবে এর গড়ন দু-দু লাইনে এক একটি শ্লোক। গজলের বিষয়বস্তু সাধারণতঃ প্রেম। কিন্তু এর কথন-ভঙ্গি, উপমা, রূপবর্ণনা ইত্যাদি এত বেশী চর্চিত হয়ে গেছে যে, এর কারুকার্যটাই এখন সর্বস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রেষ্ঠ পুশতো কবি খুশ্‌হাল খান খটকের একটি গজল গানের অনুবাদ আহরিত হোল:

'তোমার—আনন যেন একটি পাপড়ি।
তোমার—কেশগুচ্ছ যেন কুঞ্জলতিকার ঝাড়;
তোমার—পদযুগল যেন কপোতের।
তোমার—গ্রীবা যেন মরালের।
তোমার—অধর-সুধা জীবনদায়িনী,
তোমার—চক্ষুযুগল যেন হন্তার শূল।

তোমার—বাক্য সুধা-নিষ্যন্দী,
তোমার—হৃদয় প্রস্তরোপম।
তোমার—হৃদয় তোমার কেশদামের মতোই প্রেমবর্জিত।
হে নিষ্ঠুরা। তুমি কি তুর্কী—না পাঠান কন্যা ?
যখন তুমি তোমার কোমল বিছানায় দেহ বিছিয়ে দাও।
আমি বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে ভাবি, এ কি তুমি—না একরাশ ফুল !'
[অনুবাদ : সুলতানা কামাল]

পুশতো রুবাইয়াৎ ফারসী বা উর্দু রুবায়ীর (রুবাইয়তের বহুবচন) মত নয়। রুবায়ী এত বেশী জনপ্রিয় যে কোনো সংগীতের আসরই রুবাইয়াৎ ছাড়া শুরু হতে পারে না। ভক্তিমূলক বা সুফীভাবাপন্ন জলসায় রুবায়ীর বিশেষ কদর। খুশ্‌হাল খান্ খটকের রুবায়ী পাঠানদের দেশে মুখে মুখে বিরাজিত। একটি চয়ন :

'জীবন একটি অতি সংক্ষিপ্ত কুসুমিত বসন্তের মতো,
একটি তরঙ্গ-চঞ্চল আনন্দমেলার মতো,
আসমানের বিজলি-চমকের মতো দ্রুত অপসৃয়মান,
জীবনের পক্ষদ্বয় তেমনই দ্রুত অভিসারী।
শ্রেষ্ঠতম ঘোড়-সওয়ারও কি পতন থেকে বাঁচতে পারে।
যদি তার দ্রুতগামী ঘোড়ার না থাকে লাগাম ?
—তেমনই হলো জীবন।
মৃত্যুর ক্ষুরধারে যখন কাটা পড়ে যাবে
তখন জীবন-সূত্র আর কেউ জোড়া লাগাতে পারবে না।'
[অনু : সুলতানা কামাল]

ঘুমপাড়ানি গান

বীর পাঠানদের চরিত্র যত কঠোরই হোক না কেন, ঘুমপাড়ানি গা রচনায় ও গাইবার সময় তা অতি কোমল ও মধুর শোনায়। অপরাপর পুশতো গানের মত তীব্র ও উচ্চ মার্গের নয়, বরং কোমল ও আনত। একটি পুশতো ঘুমপাড়ানি গানের বাঙলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন সুলতানা কামাল :

'আল্লাহ-হু সে আল্লাহ-হু
পালিয়ে যা বিল্লি

পালিয়ে যা কুত্তাটি
নিনিমা! এস গো এস
আমার ছোট্ট খাঁ-র চোখের পাতায়।

জনারের রুটি তেতো
ময়দার পিঠে মিঠা
আমার খাঁ কোনটি নেয়?

ফিরিআলা এলো পাড়াতে
কেনা হবে কি—না
শাদা মুক্তোর হার
আমার খাঁ-র ছোট্ট বউয়ের জন্যে।

উঠোনের দোলনা দোলে
সোনার রশি দিয়ে ঝোলানো
আমার ছোট্ট খাঁ এতে ঘুমোয়
বাগানের ফুলের মেলায়
হারিয়ে যাওয়া গোলাব কলিটির মতো।'*

*['মাহে নাও', আশ্বিন, ১৩৭১ ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা থেকে]

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

১. পাকিস্তানের সাহিত্য : মওলানা মোহাম্মদ সারওয়ার
[মওলানা মুস্তাফীজুর রহমান কর্তৃক উর্দু থেকে অনুবাদ]
২. পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার : সম্পাদক, শেখ মোহাম্মদ ইকরাম
৩. 'মাহে নাও' : সম্পাদক : তালিম হোসেন
পাকিস্তান সেক্রেটারিয়েট, ব্লক-২ ; ঢাকা-২
৪. মাহে নাও সংকলন : পাকিস্তান পাবলিকেসান (ঢাকা)
৫. ফাইভ থাউজেণ্ড ইয়ারস্ অব পাকিস্তান : ডঃ মর্টিমার হুইলার
৬. সিলেক্সনস্ ফ্রম দ্য পোয়েট্রি অব আফগানস্ : র‍্যাভার্টি (H. G. Raverty)
৭. পাকিস্তান কোয়ার্টালি : করাচী
৮. পাকিস্তান টাইমস : করাচী
৯. এ্যানসাইক্লোপীডা ব্রিটানিকা
১০. লিঙ্গুইস্টিক সারভে অব ইণ্ডিয়া—১০ম খণ্ড

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য

বেদ

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূল উৎস হোল বেদ। বেদ হিন্দুদের প্রাচীনতম গ্রন্থ। আর্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দর্পণ। প্রাচীন ভারতের ধ্যানধারণা, ধর্ম-কর্ম, যাগ-যজ্ঞ, আচার-ব্যবহার আর রীতিনীতির প্রতিচ্ছবি মেলে বৈদিক সাহিত্যে। ভারতীয় মানস ও আধ্যাত্মিক জগৎ তখনকার দিনে কোন্ সুউচ্চ মার্গে গিয়ে পৌছেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় বেদের মণি-মুকুরে। তাই তো শুক্লা শ্রীপঞ্চমীতে পরম আরাধ্যা বাক্‌দেবী সরস্বতীর নিকট আমরা প্রার্থনা জানাই: বেদ-বেদাঙ্গ বিদ্যা-স্থানেভ্য এব চ—যদিও আমাদের পরিচিত বাক্‌দেবী সরস্বতী আর বেদে উল্লেখিত 'মহো অর্ণঃ' সরস্বতী এক নয়।

'বিদ্' ধাতু থেকে এসেছে বেদ। বিদ্ মানে জানা, অবস্থান করা, লাভ করা আর বিচার করা। যা পাঠে সত্য বিদ্যা জানা যায়, স্থিত হতে পারে জ্ঞানে, সুখলাভ ও সত্যাসত্য বিচার করতে পারে লোকে—তাই হোল বেদ। এ অবশ্য বেদের ব্যাপক অর্থ। প্রাচীন যুগে আর্য ঋষিরা আধ্যাত্মিক অনুভূতির দ্বারা দেবতার উদ্দেশে যে সব মন্ত্র বা ঋক্ উচ্চারণ করতেন, সেগুলি গুরু-শিষ্য পরম্পরায় কণ্ঠস্থ করে রাখতেন। তাই বেদকে শ্রুতিও বলা হয়। বেদের আর এক নাম সংহিতা বা সংগ্রহ। ঋক্, যজুঃ, সাম আর অথর্ব—এ চার বেদের কথা আমরা সকলে জানি। কিন্তু পূর্বে বেদ-সংহিতা ছিল এক। কেননা, ঋগ্বেদের অনেক ঋক্ বা শ্লোক যজুর্বেদ ও সামবেদে পাওয়া যায়। বেদ কার বা কাদের রচনা এ নিয়ে গোঁড়া বেদপন্থীদের মধ্যে মতদ্বৈধ রয়েছে। তবে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এই বেদ-সংহিতাকে চার ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করে গেছেন। তাই তাঁকে বলা হয় বেদব্যাস—অর্থাৎ বেদকে যিনি বিভক্ত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কথায়, 'যখন বলি, ঋক্ একটি বেদ, যজুঃ একটি বেদ, তখন এমন বুঝিতে হইবে না যে, ঋগ্বেদ একখানি বই বা যজুর্বেদ একখানি বই।

ফলতঃ একখানি বেদ লইয়া এক একটি ক্ষুদ্র লাইব্রেরী সাজান যায়। এক একখানি বেদের ভিতর অনেকগুলি গ্রন্থ আছে।'

বেদ কবে রচিত বা সঙ্কলিত হয়েছিল এ নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বেদ খ্রীস্টপূর্ব সাড়ে চার হাজার বছর থেকে আড়াই হাজার বছরের মধ্যে রচিত হয়। আবার বিণ্টারনিজ্‌ ও তাঁর অনুবর্তীদের ধারণা, খ্রীস্টপূর্ব ২৫০০ বা ২০০০ অব্দে প্রথম বেদ রচিত হয় এবং খৃঃ পূঃ ৭৫০—৫০০ অব্দে বৈদিক সাহিত্যের শেষ স্তর রচনা সম্পূর্ণ হয়। বেদের কাল নিয়ে যত বিরোধই থাক না কেন, এটা বলা চলে যে, খ্রীস্ট-পূর্ব সহস্র বৎসরের মধ্যে বেদ-সংহিতার শ্রেষ্ঠতম অংশ সৃষ্ট বা 'দৃষ্ট' হয়েছিল ভারতীয় আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য-সম্পদের নিদর্শন হিসেবে। তা ছাড়া, বেদ-সংহিতা যে দেব-ভাষায় বিরচিত অনেকস্থলে তা 'কালচার্ড ল্যাংগুয়েজ' সংস্কৃত থেকেও বহু প্রাচীন। সামবেদ আর অথর্ববেদের বহু ঋক্, ঋগ্বেদের চাইতেও প্রাচীন বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করে থাকেন।

বৈদিক-সাহিত্যকে বিরাট সমুদ্রের সঙ্গে উপমিত করা যায়। এক-একখানি বেদে তিনটি করে আবার অংশ—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ আর উপনিষদ্। মন্ত্রগুলির (যা দিয়ে দেবতাকে 'মনন' বা হৃদয়ঙ্গম বা চিন্তা করা যায়) সংগ্রহকে বলা হয় সংহিতা। যেমন, ঋগ্বেদ-সংহিতা, সামবেদ-সংহিতা, যজুর্বেদ-সংহিতা, অথর্ববেদ-সংহিতা। তার মানে প্রত্যেক বেদে সংহিতার সংখ্যা হোল এক কিন্তু ব্রাহ্মণ আর উপনিষদের সংখ্যা বহু। ব্রাহ্মণগুলি গদ্যে রচিত। যাগ-যজ্ঞের বিধি-বিধানের কথা গদ্যে লেখা আছে ব্রাহ্মণগুলিতে। ব্রাহ্মণে তখনকার আমলের বহু আখ্যায়িকার সন্ধানও পাওয়া যায়, পরবর্তীকালে যার মধ্যে সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের সুষ্ঠুরূপ প্রকটিত হয়েছে। যেমন, কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' নাটক প্রভৃতি। আর বেদের দার্শনিক বা ব্রহ্ম-প্রতিপাদক অংশের নাম উপনিষদ্ বা আরণ্যক। এ ছাড়া বিপুল বৈদিক সাহিত্যে রয়েছে চার উপবেদ : যথা—আয়ুর্বেদ, অর্থবেদ, গান্ধর্ববেদ ও ধনুর্বেদ ; ছয় বেদাঙ্গ : যথা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ ; এবং ছয় উপাঙ্গ —ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ, সাংখ্য, পূর্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত।

বেদের যা 'মন্ত্রকাণ্ড' তা আবার তিন প্রকার : গদ্য, পদ্য ও গান। গদ্যে রচিত মন্ত্রগুলিকে বলা হয় যজুস্ (যজু-শব্দের অর্থ উপাসনা বা পূজা করা। যে সকল বাক্যে প্রধানতঃ উপাসনা বা পূজা সম্পন্ন হয়, তারই নাম যজুস্)। পদ্য সকলকে ঋক্ আর গানকে বলা হয় সামন্। আর এক একজন ঋষি দেবতার উদ্দেশে যেসব স্তুতি-মন্ত্র রচনা করেন তাদের বলা হয় সূক্ত। কতকগুলি সূক্তে হয় এক অনুবাক। কতক-গুলি অনুবাকে হয় এক মণ্ডল। ঋগ্বেদ-সংহিতায় রয়েছে এমনি দশটি মণ্ডল।

এ-তো গেল বিপুলায়তন বৈদিক সাহিত্যের বহির্বিন্যাসের দিক। সুললিত ছন্দোবদ্ধ বৈদিক-সূক্তগুলির অন্তর্গূঢ় কাব্যসুষমা আর আধ্যাত্মিক রসসমৃদ্ধির কথা ভাবলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। সংশয় থাকে না, রসপিপাসু আর্য ঋষিরা ছিলেন কতখানি সৌন্দর্যের উপাসক। পূর্ব-দিগন্তের কোলে সিন্দূরের-টিপ পরা উষা দেবীর আবির্ভাবে তাঁদের কবি-চিত্তকে করত মুগ্ধ-পুলকিত। বিরাট বিশ্ব-প্রকৃতির সুমহান অভিব্যক্তি তাঁদের হৃদয়ে তুলত আলোড়ন। বিপুল এই ধরিত্রী তাঁদের নিকট ছিল দেবতাদের অধিষ্ঠান। জড়-প্রকৃতির সর্বত্রই তাঁরা করতেন দেবতাদের মাহাত্ম্য অনুভব। এই সকল দেবতাদের নিকট তাই তাঁরা প্রার্থনা করতেন অন্ন, জল, পুত্র, ধন, সৌভাগ্য আর সম্পদের। বিপদ থেকে ত্রাণ করতে কিম্বা শত্রুপক্ষের পরাভবের জন্য করতেন যাচ্ঞা। বৈদিক যুগের অগণিত দেব-দেবীর মধ্যে অগ্নির অধিদেবতার স্তুতি-বন্দনায় আর্য ঋষিরা ছিলেন অধিকতর মুখর। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল, প্রথম সূত্রে তাই দেখতে পাই বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি অগ্নির আরাধনা করছেন :

১। অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান; অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্ এবং প্রভূতরত্নধারী ; আমি অগ্নির স্তুতি করি।

২। অগ্নি পূর্ব ঋষিদিগের স্তুতিভাজন ছিলেন, নূতন ঋষিদিগেরও স্তুতিভাজন ; তিনি দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।

৩। অগ্নিদ্বারা যজমান ধনলাভ করেন, সে ধন দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও যশোযুক্ত হয় ও তদ্দ্বারা অনেক বীরপুরুষ নিযুক্ত করা যায়।

৪। হে অগ্নি! তুমি যে যজ্ঞ চারিদিকে বেষ্টন করিয়া থাক, সে যজ্ঞ

কেহ হিংসা করিতে পারে না এবং সে যজ্ঞ নিঃসন্দেহই দেবগণের নিকট গমন করেন।............

৮। তুমি দীপ্যমান, তুমি যজ্ঞের রক্ষক, যজ্ঞের অতিশয় দীপ্তিকারক এবং যজ্ঞশালায় বর্ধনশীল।

৯। পুত্রের নিকট পিতা যেরূপ অনায়াসে অধিগম্য, হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের নিকট সেইরূপ হও, মঙ্গলার্থ আমাদিগের নিকটে বাস কর।...... [অনু-ঃ রমেশচন্দ্র দত্ত।]

তারপর বায়ু প্রভৃতি দেবতার আরাধনা—'হে দর্শনীয় বায়ু! আইস, এই সোমরসসমূহ অভিষিক্ত হইয়াছে; ইহা পান কর, আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর।' [২য় সূক্ত।]

বিশ্বামিত্র ঋষি কর্তৃক উষা দেবতার বন্দনার কিছু নমুনা ঃ

১। হে অন্নবতী ধনবতী উষা! আমি স্তব করিতেছি, তুমি প্রকৃষ্ট জ্ঞানবতী হইয়া আমার স্তোত্র গ্রহণ কর। হে সকলের বরণীয়া, পুরাতনী যুবতীর ন্যায় শোভমানা ও বহু স্তোত্রাবতী উষা! তুমি যজ্ঞকর্মাভি-মুখে আগমন কর।

২। হে মরণরহিতা চন্দ্রবথা সূনৃতবাক্যোচ্চারণশীলা উষা! তুমি শোভমানা হও। যে সকল প্রভূত বলযুক্ত হিরণ্যবর্ণ অশ্ব আছে, তাহা-দিগকে সুখে রথে যোজিত করিতে পারা যায়। তাহারা তোমাকে আহ্বান করুক।

৩। হে উষা! তুমি মরণধর্মরহিত সূর্যের কেতুস্বরূপ। তুমি ত্রিভুবনাভিমুখে আগমনশীলা। তুমি আকাশে উন্নতা হইয়া রহিয়াছ। হে নবতরা উষা! তুমি এক-পথে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া চক্রের ন্যায় পুনরাবৃত্ত হও।

৪। যে উষা বস্ত্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ অন্ধকার ক্ষয়িত করতঃ সূর্যের পত্নী হইয়া গমন করেন, সেই সৌভাগ্যবতী সৎকার্যশালিনী উষা দ্যুলোক ও পৃথিবীর অন্তঃ হইতে প্রকাশিত হইতেছেন।

৫। হে স্তোতৃগণ! উষাদেবী তোমাদের অভিমুখে শোভা পাইতেছেন। তোমরা নমস্কারকরতঃ উত্তমরূপে তাঁহার স্তুতি কর। মধুধা উষা আকাশে ঊর্ধ্বাভিমুখে তেজের আশ্রয় করিতেছেন। দীপ্তিমতী

রমণীয় দর্শনা উষা অতিশয় দীপ্তি পাইতেছেন।··· [৬১ সূক্ত, ৩ মণ্ডল। অনুঃ—রমেশচন্দ্র দত্ত]

বৈদিক সাহিত্যের প্রথমযুগ তাই কাব্যের যুগ। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নৈসর্গিক বস্তুর অনুভূতিগুলি সুন্দর কাব্যময় ভাষায় ছন্দোবদ্ধ করে গেছেন বৈদিক-যুগের এই সব মুনি-ঋষিরা। ঋগ্বেদের কবি তাই ছিলেন খুবই 'মিস্টিক'—আধ্যাত্মিক কবি। তাঁর দৃষ্টিতে সমস্ত প্রকৃতি ছিল অস্থূল অশরীরী সত্তার বিগ্রহ। তিনি ডুব দিয়েছিলেন অরূপের অতলস্পর্শে। স্থূল-বস্তুকে স্থূল ঘটনায় দেখেছিলেন 'একটা সূক্ষ্ম বিরাট-শক্তির বা চেতনার লীলা।'

ঋগ্বেদের সময়কার ভারতে নবাগত আর্যদের নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়েই বুঝি ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। শান্তি ফিরে এলে তাঁরা যাগ-যজ্ঞ আর জ্ঞানানুশীলনের দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করেন। বেদের পরবর্তী স্তর তাই ব্রাহ্মণ আর আরণ্যক বা উপনিষদের স্তর। ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের ভিত্তি হোল এই উপনিষদগুলি। উপনিষদের আর এক নাম বেদান্ত (বেদ+অন্ত)। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন ধর্মের মূলেও রয়েছে এই উপনিষদের আলো।

মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ ছাড়া আরও কয়েকটি গ্রন্থ বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত—তাদের বলা হয় কল্পসূত্র।

সমুদ্রের-মত বিরাট, ব্যাপক বৈদিক সাহিত্যের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় কয়েকটি পাতায় সাধারণ পাঠকদের কাছে। কেননা বৈদিক-সাহিত্য শুধু আমাদের ধ্যান-ধারণা কি জ্ঞান-গরিমার প্রতিচ্ছবি নয়, আমাদের সামাজিক জীবনেও প্রভাব তার কম নয়। এই বৈদিক-সাহিত্যের মণি-কোঠাতে আমরা পেয়েছি 'সোহহম্' মন্ত্রের অমোঘ বাণী। জেনেছি আত্মাই ঈশ্বর। আত্মাকে জানতে পারলে এবং আত্মার একত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারলে মানুষ শোক ও মোহের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে। জেনেছি আত্মাই পরমবস্তু! 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'—অমরত্বেই তোমার পরিণতি। তুমি অমৃত থেকে জন্মেছ—ভারতীয় সাধনার এই বাণীর সন্ধান মেলে কোথায়? 'আত্মায় আত্মায় অভেদ। বিশ্বব্যাপী এক বিরাট আত্মা বিরাজমান, তোমরা তারই এক-একটি

স্ফুলিঙ্গ। তোমাতে আমাতে প্রভেদ নেই।'—সাম্য-মৈত্রীর এই বাণী প্রাচীন বৈদিক ভারতের ছিল আদর্শ।

স্বাধীন ভারতের 'পঞ্চশীল' নীতির মত বৈদিক ভারতও সেদিন ঘোষণা করেছিল জগৎ-সভায়ঃ 'বসুধৈব কুটুম্বকং—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকলেই তোমার আত্মীয়; কেহই তোমার পর বা শত্রু নহে। জগৎকে আপনার করে নাও, সকলেই তোমার মিত্র।'—এই হোল প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মকথা যা বৈদিক-সাহিত্যের দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে।

বেদাঙ্গ

আচার্য আপন শিষ্যকে ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব—এ চার বেদে শিক্ষা দান সমাপ্ত করে বললেনঃ

'সত্য কহিবে। ধর্ম পালন করিবে। জ্ঞানোপার্জন হইতে কখনও বিরত হইবে না। আচার্যকে সমুচিত ধনদান করিয়া সন্তানাদি দ্বারা বংশ রক্ষা করিবে। সত্য হইতে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না। ধর্ম পালন হইতে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না। কুশল হইতে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না। ভূতি হইতে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না। বেদের অধ্যয়ন ও প্রবচন হইতে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না।'

'দেব ও পিতৃপুরুষদের সন্তোষকর কার্য হইতে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না। মাতাকে উপাস্য দেবতা জ্ঞান করিবে। পিতাকে উপাস্য দেবতা জ্ঞান করিবে। আচার্যকে উপাস্য দেবতা জ্ঞান করিবে। অতিথিকে উপাস্য দেবতা জ্ঞান করিবে। যে সকল কাজ নিন্দনীয় নহে, তাহাই করিবে। অন্য কিছু করিবে না। আমাদের যাহা সুচরিত তাহাই করিবে; বিপরীত (ইতর) অনুষ্ঠান করিবে না।···এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্।—এই আদেশ। এই উপদেশ। এই বেদের উপনিষদ্। এই অনুশাসন। এইরূপ অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপ আচরণ করিবে।···

[তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ঃ কৃষ্ণ-যজুর্বেদঃ—

অনুঃ—রমেশচন্দ্র দত্ত।]

সেকালে গুরুগৃহে বেদ-বেদান্ত অধ্যয়ন করতে গিয়ে শিষ্যদের আচার্যদের নিকট উত্তরকালে নিজেদের আচরণীয় এমনি ধারা কল্প বা

ক্রিয়াকর্ম ও ধর্মানুষ্ঠানাদি নানা শাস্ত্র, ব্যাকরণ, ছন্দ প্রভৃতি বিদ্যাতেও পাঠ নিতে হোত। আশ্রয় নিতে হোত বেদ সংহিতার গূঢ় অর্থ করতে নানা টীকাটিপ্পনী আর অন্বয় সম্বলিত অভিধান—নিরুক্তের। ক্রিয়া-কর্মের তিথি নক্ষত্র নিরূপণ করতে গিয়ে চর্চা করতে হোত জ্যোতিষশাস্ত্রের। নইলে বেদপাঠ সুসম্পূর্ণ হোত না। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ আর জ্যোতিষ—তাই এ ছয় শাস্ত্রকে বলা হয় বেদাঙ্গ। বেদের অঙ্গ। হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখ ছাড়া যেমন জীবদেহ অসম্ভব, তেমনি শিক্ষাকল্পাদি ষড়ঙ্গকে বাদ দিয়ে বেদশরীরকে জানা যায় না। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই ষড়ঙ্গের গুরুত্ব অনুভূত হচ্ছিল বলে অনুমান হয়। সাম বেদের ষড়বিংশ এবং অথর্ববেদের গোপথ ব্রাহ্মণে ষড়ঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। মুণ্ডকোপনিষদে এক সঙ্গে ছয়টি বেদাঙ্গের পৃথক পৃথক নামের উল্লেখ আছে।

এসব সূত্রের মধ্যে সেকালের হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠান, তাদের দৈনন্দিন জীবন-ধারা, তাদের সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিচয় রয়েছে। ভাব-সমৃদ্ধ বেদ সংহিতার বিশালতা বা আধ্যাত্মিকতা বেদাঙ্গের মধ্যে না থাকলেও, এ সকল সূত্র-সাহিত্যকে প্রাচীন ভারতের 'ফোক্‌লোর জার্নাল' বলে অভিহিত করেছেন পণ্ডিত বিন্‌টারনিজস তাঁর বিখ্যাত 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে'।

বেদাঙ্গের এ সূত্রগুলি বেদের পরবর্তী কালে সংকলিত ও সংযোজিত হয়েছিল। বেদাঙ্গগুলি খৃষ্ট-পূর্ব হাজার বৎসর থেকে খৃষ্টীয় চার শ' বছরের মধ্যে রচিত বলে পণ্ডিতরা মনে করেন।

কল্পসূত্র

ষড়বেদাঙ্গের সূত্রগুলির মধ্যে কল্পসূত্র রয়েছে অনেকখানি স্থান জুড়ে। কল্পশাস্ত্রে যাগপ্রয়োগ সমর্থিত হয়েছে—কল্প্যতে সমর্থ্যতে যাগ-প্রয়োগোধৃত। অর্থাৎ যাগাদিকর্মে বেদমন্ত্রের বিনিয়োগ কল্পনাতেই এই শাস্ত্রের উদ্ভব। এদিক থেকে কল্পশাস্ত্রের সঙ্গে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের কিছু মিল আছে, কারণ ব্রাহ্মণের মধ্যেই এমন অনেক অংশ আছে, যা বলতে গেলে সূত্রাকারেই রচিত। ছোট-খাটো নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে মনকে ধর্মকর্মে রত রাখা, জীবনকে ধর্ম-নিয়মে নিয়মিত করা, সমাজে ধর্ম-বিধি

প্রবর্তিত করাই এ কল্পসূত্রের মূল উদ্দেশ্য। কল্পসূত্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে: শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম।

শ্রুতি অর্থাৎ বেদবিহিত যাগ-যজ্ঞের বিধান ও বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে শ্রৌতসূত্রগুলিতে। গৃহ্যসূত্রে রয়েছে গৃহস্থের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার প্রত্যেক কর্তব্যানুষ্ঠানের বর্ণনা। আর ধর্মসূত্রে সংকলিত হয়েছে বিভিন্ন আশ্রমের বিবরণ, বিভিন্ন জাতির কর্তব্যাদি, বিবাহ, উত্তরাধিকার ও রাজকীয় আইন-কানুন, বিধি-ব্যবস্থা ইত্যাদি।

ঋগ্‌বেদের দুখানি শ্রৌতসূত্র—একখানি আশ্বলায়নের, অন্যটি শাঙ্খায়নের—হোতার অর্থাৎ যজ্ঞের দেবতা-আহ্বায়ক ঋত্বিকের কর্তব্য কর্মের বিবরণে গঠিত। লাট্যায়ন ও দ্রাহ্যায়নের শ্রৌত সূত্রদ্বয় সামবেদ সংশ্লিষ্ট। আপস্তম্ব, সত্যাষাঢ়, মানব, ভরদ্বাজ এবং বৌধায়নের শ্রৌতসূত্রগুলি কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় বিভিন্ন শাখার সঙ্গে এবং কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র শুক্ল-যজুর্বেদের সঙ্গে সংযুক্ত। অথর্ববেদের শ্রৌতসূত্রের নাম বৈতানসূত্র—'বৈতান' বা 'বিতানবিষয়ক'-এর অর্থ 'যজ্ঞীয়'। শ্রৌতসূত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত 'শুল্বসূত্র' যজ্ঞবেদি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় নিখুঁত মাপজোখের বিবরণে এই সূত্রের উৎপত্তি এবং জ্যামিতিবিদ্যার প্রথম সূত্রপাতও এই সব সূত্রে নিহিত। ঋগ্বেদীয় গৃহ্যসূত্রগুলির মধ্যে আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্র বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এই সূত্র চার অধ্যায়ে শ্রেণীবদ্ধ। প্রথম অধ্যায়ে বিবাহ, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় পার্বণ, পশু-যজ্ঞ, গর্ভাধান, পুংসবন, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, গো-দান-কর্ম, উপনয়ন ও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বিবরণ প্রভৃতি সংকলিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গৃহ-নির্মাণ ও গৃহ-প্রবেশ প্রভৃতির বিবরণ, তৃতীয় অধ্যায়ে দেব-যজ্ঞ, ভূত-যজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ ইত্যাদি নিত্য সম্পাদনীয় পঞ্চ-যজ্ঞের কথা আছে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধের বিবরণ বিবৃত হয়েছে। স্বভাবতঃই গৃহ্যসূত্রগুলি প্রাচীন ভারতের সামাজিক অবস্থার অন্যতম বিশিষ্ট দর্পণ। ঋগ্বেদীয় ধর্মসূত্রের মধ্যে ৩০ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ বশিষ্ঠের ধর্মসূত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ তো গেল ঋগ্বেদীয় কল্পসূত্রের কথা। সাম এবং যজুর্বেদীয় (কৃষ্ণ ও শুক্ল) কল্পসূত্রেও এমনি ধারা প্রাচীন হিন্দুদের প্রাত্যহিক কর্ম ও অনুষ্ঠানের বিশদ-বিবরণ সংগৃহীত রয়েছে—যা থেকে সুষ্ঠু পরিচয় পাওয়া যায় সেকালের ভারতীয়দের, যাঁরা বালককে উপনয়নানন্তর গুরুগৃহে প্রেরণ

করতেন, প্রতিদিন অতিথিসেবা করতেন, স্বাধ্যায়-পাঠ প্রভৃতি পঞ্চ-যজ্ঞ সম্পাদন করতেন ও পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্বক যজ্ঞ করতেন।

কেবল নিয়মানুষ্ঠানের পূর্ণ-বিবরণ নয়, প্রাচীন ভারতের আদর্শ রাজ-ধর্মের কথাও গৌতমীয় ধর্মসূত্রের একাদশ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে:

'রাজা ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর সকলের অধিপতি।

তিনি সাধুকারী ও সাধুবাদী হইবেন।

তিনি ত্রয়ীবেদে এবং আন্বীক্ষিকীতে শিক্ষিত হইবেন।

তিনি শুচি, জিতেন্দ্রিয়, গুণবান সভাসদ্ দ্বারা বেষ্টিত এবং উপায়-সম্পন্ন হইবেন।

তিনি সকল প্রজার প্রতি সমদর্শন হইবেন।

তিনি প্রজাদিগের হিতসাধন করিবেন।

তিনি উচ্চ আসনে বসিবেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য সকলে নিম্নে থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে।

তিনিও উহাদিগের সম্মান করিবেন।

তিনি বর্ণ-ধর্ম সকল ও আশ্রম-ধর্ম সকল যথান্যায়ে রক্ষা করিবেন।

তিনি স্বধর্ম হইতে স্খলিত লোকদের পুনরায় স্বধর্মে স্থাপন করিবেন।

যেহেতু বেদে জানা যায় যে, তিনি প্রজার ধর্মের অংশভাগী।...

রাজার বিচার বিধি,—বেদ, ধর্মশাস্ত্র, অঙ্গ (সাময়িক আচার) ও পুরাণ (নজীর) সঙ্গত হইবে।

বেদবিরুদ্ধ দেশধর্ম, জাতিধর্ম ও কুলধর্মও প্রমাণ হইবে।

কৃষকগণ, বণিকগণ, পশুপালকগণ, কুসীদিগণ এবং শিল্পজীবিগণ নিজ নিজ দলের মধ্যেও বিচার স্থান (পঞ্চায়ত) নির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

তাহারা স্ব স্ব অধিকার অনুসারে বিচারের অবস্থা জানাইলে পর রাজা ধর্মতঃ ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

ন্যায় বিচারার্থ তর্কই সদুপায়।

তর্ক দ্বারা প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ করিয়া তিনি বিচার সিদ্ধান্ত করিবেন।

প্রমাণ পরস্পর বিরোধী হইলে তিনি ত্রিবিদ্যা পারদর্শী বৃদ্ধদিগের নিকট কর্তব্য অবগত হইয়া বিচার-সিদ্ধান্ত করিবেন।

এইরূপ আচরণ করিলে রাজা ইষ্ট-লাভে সমর্থ হইবেন।...'

বাঙলা দেশে এখন প্রচলিত বহু পাল-পার্বণের—(যেমন আশ্বিন মাসের কোজাগরী লক্ষ্মী পূজায়, নবান্ন প্রভৃতি) মূল উৎসও বেদাঙ্গযুগের এসব সূত্রে উল্লেখ রয়েছে বলে মনে করেন পণ্ডিতরা।

উদ্বাহ উৎসব উপলক্ষে সুন্দর কাব্যময় এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে দেখা যায় গৃহ্যসূত্রের পবিত্র মন্ত্রগুলির মধ্যে। উদ্বাহ অনুষ্ঠানকালে নব পরিণীতা পত্নী পতিকে শেষরাত্রের ধ্রুব-তারা দেখিয়ে মন্ত্রপাঠ করে বলছে :

'হে নক্ষত্র, তুমি স্থির প্রকৃতি, এই জন্যই ধ্রুব নামে বিখ্যাত, আমিই যেন পতিকুলে স্থির-প্রকৃতি হই! আমি অমুক নাম্নী অমুক ব্যক্তির পত্নী।'

পতি বধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্রটিকে দেখায়। এই অরুন্ধতী তারা দেখে নব-বধূ মন্ত্রোচ্চারণ করে ওঠে: 'অমুক নাম্নী আমি অমুক পতির আদেশাবদ্ধা হচ্ছি।'

তারপর পতি 'ধ্রুবা দ্যৌঃ'—এ মন্ত্রটি পাঠ করে নব-বধূকে অনুমন্ত্রণ করবে। অনুমন্ত্রিতা ঐ বধূ 'অমুক গোত্রা অমুক নাম্নী আমি তোমাকে অভিবাদন করছি' বলে পতির পদধূলি গ্রহণ করবে। কন্যা গ্রহণকালে একটি গাভী প্রদানের—গো-দক্ষিণার প্রথাও প্রচলিত ছিল তখনকার প্রাচীন হিন্দু সমাজে।

কল্পসূত্রগুলি নিয়ে প্রথমে আলোচনা করলেও শিক্ষাই হোল ষড় বেদাঙ্গের প্রথম অঙ্গ : 'শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষাং গণঃ।' স্বর ও মাত্রা ঠিকমত নিরূপণ করে কঠিন বেদমন্ত্রগুলি উচ্চারিত না হলে তাদের মানে রপ্ত করা এক দুরূহ ব্যাপার। বেদ পাঠের প্রথম সোপান তাই শিক্ষা। স্বরবর্ণোচ্চারণ শাস্ত্রং শিক্ষা—স্বর ও বর্ণের বিশুদ্ধ উচ্চারণের উপদেশ দান করে শিক্ষা-শাস্ত্র। অর্থাৎ স্বর, মাত্রা (হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত), বল (বর্ণের উচ্চারণে জিহ্বা কোন্ স্থান কতখানি স্পর্শ করে), সাম (সাম্য—অতিদ্রুত বা অতি বিলম্বিত নয়), সন্তান (সন্ধিপূর্বক পাঠ) প্রভৃতি বিষয় অধিগত করার জন্য শিক্ষাশাস্ত্রের প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, বেশির ভাগ শিক্ষাশাস্ত্রই আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নারদ, যাজ্ঞবল্ক্য, পাণিনি প্রমুখের নামে প্রচলিত শিক্ষাগ্রন্থের অধিকাংশ বলতে গেলে তেমন প্রাচীন নয়।

'ব্যাকরণ'

শিক্ষার পর ব্যাকরণ। ব্যাকরণ তাই বেদাঙ্গের অন্যতম অংশ। পাণিনিই হলেন প্রধান ব্যাকরণ রচয়িতা। 'ব্যাকরণ' শব্দের মূল অর্থ— বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যান। পদের বিশ্লেষণ চেষ্টার ফলেই ব্যাকরণ শাস্ত্রের জন্ম। গো-পথ ব্রাহ্মণে ধাতু, প্রত্যয়, প্রাতিপদিক, লিঙ্গ, বচন ইত্যাদি নানা ব্যাকরণ-পরিভাষার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের সমৃদ্ধিহেতু ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রয়োজন হয়েছিল এবং এই শাস্ত্রের প্রাচীনত্বের আভাস সর্বপ্রধান ব্যাকরণরচয়িতা পাণিনি (আ—খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতক) বর্ণিত 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থে পাওয়া যায়; পাণিনি তাঁর গ্রন্থে শাকটায়ন, সেনক, গালব প্রমুখ কয়েকজন পূর্বাচার্যের নাম করেছেন। 'অষ্টাধ্যায়ী' আটটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রতি অধ্যায়ে ৪টি করে পদ এবং সমগ্র গ্রন্থে সব শুদ্ধ প্রায় চার হাজার সূত্র আছে। পাণিনি মুনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে সংজ্ঞা, সন্ধি, ধাতু, সমাস, কৃৎ, তদ্ধিত প্রভৃতি ব্যাকরণোক্ত বিষয় পরিবেশিত হয়েছে। বলা হয়ে থাকে, যে ব্যক্তি ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়নে অসমর্থ হয়ে খালি তার ব্যাকরণ শাস্ত্রটুকুই অধ্যয়ন করেছেন, তা হলেও তিনি ষড়ঙ্গ বেদাধ্যয়নের প্রকৃত ফল প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন নি।

নিরুক্ত শব্দের অর্থ নির্বচন বা শব্দার্থের নিঃশেষে বচন। সংহিতা ব্রাহ্মণের গ্রন্থগুলিতেই পদ-নিরুক্তির বা পদনির্বচনের উদাহরণ পাওয়া যায়। বর্তমানে যাস্কের নিরুক্ত ছাড়া অন্য কোন নিরুক্ত পাওয়া যায় না। তবে তাঁর আগেও যে অনেক নিরুক্তকার ছিলেন, সে কথা তিনি বলে গেছেন। যাস্কের নিরুক্ত আসলে নিঘণ্টু নামক এক বৈদিক শব্দকোষের ভাষ্য, বারোটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ যাস্কের নিরুক্ত খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে রচিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতদের অভিমত। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানসম্মত অনেক তথ্য আলোচনার জন্য গ্রন্থখানি বিবুধমহলে সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের বস্তু।

ছন্দঃ

ছন্দঃ বেদাঙ্গের পঞ্চম অংশ। নিয়তসংখ্যক অক্ষরপ্রয়োগে পাদবদ্ধ রচনাই বৈদিক ছন্দের সংজ্ঞার্থ—'যদক্ষর পরিমাণং তচ্ছন্দঃ'। বেদ-সংহিতার বেশির ভাগই পদ্যে রচিত। ছন্দোজ্ঞান ব্যতিরেকে ছন্দোবদ্ধ

বেদমন্ত্র পাঠ করা যায় না, বিবিধ ছন্দঃ-শাস্ত্রের আলোচনা ও অনুশীলন বেদপাঠে অপরিহার্য। সামবেদীয় নিদানসূত্র, শৌনকীয় ঋক্‌প্রাতিশাখ্য প্রভৃতি গ্রন্থে গায়ত্রী, অনুষ্ঠুপ্, ত্রিষ্টুপাদি নানা বৈদিক ছন্দের কথা পাওয়া যায়। মহর্ষি পিঙ্গলাচার্যের ছন্দঃশাস্ত্র ছন্দঃবিষয়ে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। যদিও তা খুব প্রাচীন নয়। তাঁর নামে একটি ছন্দেরও প্রচলন আছে। তাঁর গ্রন্থে বৈদিক ছন্দ ছাড়া লৌকিক ছন্দেরও আলোচনা পাওয়া যায়। বৈদিক ছন্দ মুখ্যত গীতি-স্বর বা সুরের উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্যপক্ষে লৌকিক ছন্দে হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত। ছন্দঃশাস্ত্র নিয়ে সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ রয়েছে। আর তাতে বিভিন্ন ছন্দের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

জ্যোতিষচর্চা আজ অনেকের অবহেলার বিষয় হলেও প্রাচীন ভারতে তা ছিল রীতিমত :অধীতব্য শাস্ত্র। এবং এ শাস্ত্র ছিল প্রকৃত বেদচক্ষু-স্বরূপ, ষড় বেদাঙ্গের বিশিষ্ট অঙ্গ। বৈদিক ভারতের মুনি-ঋষিরা সৌরজগতের চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতি নবগ্রহের গতিবিধি নির্ণয় করতেন এ শাস্ত্রের মারফৎ। যাগযজ্ঞের বিশেষ আয়োজন করতেন। 'প্রাচীন ভারতের সূক্ষ্ম গাণিতিক জ্ঞান ও জ্যোতিষিক উপলব্ধির পরিচয় সংহিতা-ব্রাহ্মণের উক্তির মধ্যে, বিশেষতঃ যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বেশ পাওয়া যায়।' 'বেদাঙ্গজ্যোতিষ' নামে একটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন গ্রন্থে চন্দ্রের গতি অনুসারে তিথিনক্ষত্র গণনার কিছু কিছু নিয়ম উল্লেখ রয়েছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে জ্যোতিষ-সংহিতা বা গ্রহনক্ষত্রের যোগাযোগ থেকে নৈসর্গিক ফল গণনা ; গণিত বা গ্রহ-নক্ষত্রের গতি নির্ণয় আর বিশুদ্ধ জ্যোতিষ শাস্ত্র ছাড়া ফলিত জ্যোতিষের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রহনক্ষত্র ও লগ্নবিশেষে মানুষের ভাগ্যগণনা ফলিত জ্যোতিষের বিষয়বস্তু। মহর্ষি পরাশর, জৈমিনি, আর্যভট্ট, বরাহ-মিহির, খনা, ভাস্করাচার্য প্রভৃতি মনীষীরা সেকালে জ্যোতিষ-শাস্ত্রালোচনায় অগ্রণী ছিলেন। লোকমান্য তিলক (The Arctic Home in the Vedas), অধ্যাপক সুধাকর দ্বিবেদী (গণক-তরঙ্গিণী), পুণার শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত (ভারতীয় জ্যোতিষ-শাস্ত্র) অথবা শ্রদ্ধেয় ডাঃ যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি (আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী) প্রমুখ পণ্ডিতরা জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনায় নতুন নতুন আলোকসম্পাৎ করে গেছেন।

পুরাণ

কন্যার বিষণ্ণ মুখ দেখেই দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য শাপগ্রস্ত করেছিলেন আপন জামাতাকে। বলেছিলেন : 'যে যৌবন-মদমত্ত হয়ে তুমি আমা মেয়েকে অবহেলা করেছো, সে দেহে তোমার মহাঘোর জরা প্রবেশ করুক।'

পিতার অভিশাপবাক্য শুনে কন্যা দেবযানী আঁতকে উঠেছিলেন। আর জামাতা যযাতির মাথায় পড়ল যেন বাজ। হায়! হায়! এ কি হোল! জীবনের সাধ-আহ্লাদ—ভোগ-বিলাস এখনো কত বাকি। সে সব পূর্ণ না হতে কিনা হতে হবে তাঁকে জরাগ্রস্ত? কন্যা আর জামাতা দু'জনেই তখন লুটিয়ে পড়লেন মহর্ষির পায়ে। কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন শুক্রাচার্যের নিকট। কিন্তু সত্যদ্রষ্টা ব্রাহ্মণের বাক্য ব্রহ্মাও পারেন না লঙ্ঘন করতে। শুক্রাচার্য আত্মস্থ হলেন। তারপর এক সময় মাথা নেড়ে বললেন : 'পথ একটা আছে।'

তিনি জামাতার দিকে মুখ তুলে তাকালেন।—'পথ অবশ্য একটা আছে। তোমার কোন পুত্র যদি তোমার এই জরার ভার গ্রহণ করতে রাজী হয়, তবে তুমি আবার তোমার পুরাতন-দেহ-সৌষ্ঠব লাভ করবে।'

শ্বশুর মশাইয়ের কথা শুনে রাজা যযাতি স্বস্তির হাঁফ ছাড়লেন। তখন তিনি তাঁর পাঁচ পুত্রকে ডেকে বললেন :

'তোমরা কেউ আমার জরা গ্রহণ করো। আমি তোমাদের যৌবন গ্রহণ করে আরও কিছুকাল বিষয়-আশয় ভোগ করতে বাসনা করি।'

যুবরাজ যদু থেকে আরম্ভ করে তাঁর চার পুত্রই পিতৃ-আজ্ঞা পালনে সম্মত হোল না। কিন্তু সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু এলেন এগিয়ে। পিতৃভক্তি-পরায়ণ এই পুত্রটি পিতাকে গিয়ে বললেন :

'আপনি আমার যৌবন গ্রহণ করুন। নবীন শরীর ধারণ করে আপনি সুখ ভোগ করুন। আর আপনার ব্যাধি ও জরা আমাকে দিন।'

ভোগবিলাসী রাজা যযাতি তাই করলেন। কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে আপনার মহাঘোর জরা দিয়ে নিজে আবার বিলাস-সাগরে ডুব দিলেন। এভাবে দীর্ঘ দিন—হাজার বছর কেটে গেল। কিন্তু নবযৌবনদীপ্ত রাজা যযাতির বাসনা আর লালসার তৃপ্তি হোল কই? সব কামনাই যে এখনো অতৃপ্ত— রয়ে গেল অপূর্ণ! যতই তিনি বিষয়-ভোগে মত্ত হন,

ততই যেন ভোগের গণ্ডি তাঁর বেড়ে যায় মায়ামরীচিকার মত। তৃপ্তি কই? শান্তি কই? তাই তিনি জরাতুর পুত্রের নিকট গিয়ে বললেন:

'ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ ৬০
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্য পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ॥ ৬১'

[মৎস্য পুরাণ]

অর্থাৎ—ভোগ্যবস্তুর উপভোগে কখনও বিষয়-বাসনার পরিতৃপ্তি হয় না। আগুনে ঘি ঢাললে আগুন যেমন বেশী করে জ্বলে ওঠে—নেভে না, ঠিক তেমনি কাম্যবস্তুর উপভোগে ভোগ-লালসার নিবৃত্তি নেই। এই পৃথিবীতে যত প্রকার শস্য উৎপন্ন হয়, যত পরিমাণে সুবর্ণ, পশু এবং সুন্দরী যুবতী বর্তমান আছে, সেই সমুদয় যদি এক ব্যক্তির অধিকার-গত হয়, তবু তাতে তৃপ্তি নেই, এ কথা বিবেচনা করে শান্তির পথ গ্রহণ করবে।

রাজা যযাতি পুত্র পুরুকে এই উপদেশ দিয়ে আর পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে গেলেন বনে জীবনের শেষ-কর্ম ধ্যান-ধারণা সমাধান করতে। ত্যাগেই শান্তি, ভোগে বাসনার নিবৃত্তি নেই—প্রাচীন ভারতের এই গূঢ় তত্ত্বকথা সেদিন রূপায়িত হয়েছিল মৎস্য-পুরাণের একটি সাধারণ লৌকিক উপাখ্যানে।

শুধু ভোগ বিলাসের নিরাসক্ত নীতিকথা নয়, ধর্মাত্মা হরিশ্চন্দ্র, বিদুষী মহিলা মদালসা কিংবা রাজা পরীক্ষিৎ উপাখ্যানে, ভক্তবীর ধ্রুব ও প্রহ্লাদের আদর্শ চরিত্র কাহিনীতে, সীতা-সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি ভারতীয় নারীর প্রতীক, সগর রাজার জন্মকথা ইত্যাদি বহু আখ্যায়িকা, ইতিবৃত্ত, সৃষ্টিতত্ত্ব, রাজাদের বংশ-বৃত্তান্ত—সব কিছুই লিপি-বদ্ধ আছে বিভিন্ন এই পুরাণগুলিতে সাধারণের সহজবোধ্য গল্পাকারে—যা পাঠ করলে বেদের কর্মকাণ্ডে, উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ডে, স্মৃতির সদাচারে, দর্শনের তত্ত্ববিচারে, পুরাণের পুরাবৃত্তে, নীতির লোকতত্ত্বে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মে। সংস্কৃত সাহিত্যের সেই অপূর্ব গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতও এই পুরাণ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবত একখানি উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থও। জ্ঞানগর্ভ এই পুরাণখানি বৈষ্ণবদের নিকট বেদ-তুল্য। তার কিছুটা

নমুনা উৎকলন করা গেল রমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সংকলিত ও অনূদিত 'হিন্দুশাস্ত্র' থেকে।

'ভগবান বলিলেন, মেঘরাশি যেমন প্রবল বায়ু কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়াও তাহার বিক্রম জানিতে অক্ষম, সেইরূপ জীবসকল বলবান কাল দ্বারা পরিচালিত হইয়াও নিশ্চয় উহার প্রবল বিক্রম জানিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্য সুখ প্রাপ্তির আশায় বহুক্লেশ করিয়া যে যে উপায় অবলম্বন করে, ভগবান কাল তাহাদের সেই সেই উপায়কেই বিনাশ করেন এবং মনুষ্যগণ উহার নিমিত্ত পরিশেষে কেবল শোক করিতেই থাকে। এই কালের বশে মোহিত হইয়া দুর্মতি মনুষ্যগণ পুত্র-কলত্রাদি দ্বারা সম্বন্ধ, এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট গৃহ, ক্ষেত্র ও ধনকে একেবারে অবিনাশী বলিয়া বিবেচনা করে। জন্তুগণ এই সংসারে যে যে যোনিতে জন্মলাভ করে, তাহাতে বিরক্ত না হইয়া বরং নিবৃত্তিই প্রাপ্ত হয়। অধিক কি বলিব, ঈশ্বরের মায়ায় বিমোহিত মনুষ্য নরকস্থ হইয়াও সেইস্থানে কেমন একটি অনির্বচনীয় নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয় যে, সেই নারকী দেহও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। ১-৫।' [কর্মবিপাক]

পুরাণের এমনিধারা অধিকাংশ রচনাই রূপক আকারে পরিবেশিত হয়েছে জনসাধারণের জন্য। বেদ-সংহিতায় যা অতি সংক্ষিপ্তভাবে ব্যক্ত হয়েছে, পুরাণে তাই রূপ নিয়েছে বিস্তারিত উপাখ্যানের। আর এই উপাখ্যানকে বৃহত্তর করতে গিয়ে অনেক অবান্তর কাহিনীও পুরাণের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে বলে পণ্ডিতদের ধারণা।

আধ্যাত্মিক আত্মচিন্তাই কেবল এই পুরাণ সাহিত্যের বিষয়বস্তু নয়, রাজনীতি, রাজ্যাভিষেকের পর রাজার নানা কর্তব্য প্রসঙ্গও স্থান পেয়েছে তাদের মধ্যে। তাই-তো বায়ু-পুরাণের এক শ্লোকে [১।২০০-১॥] বলা হয়েছে :

'পুরাণ পাঠ না করলে বিদ্যা কখনই সম্পূর্ণতা লাভ করে না। যদি কোন ব্রাহ্মণ চার বেদ, ছয় বেদাঙ্গ আর সব উপনিষদ আয়ত্ত করে থাকেন, কিন্তু পুরাণ পাঠ করেন নি, তবে তাঁকে শাস্ত্রজ্ঞ বলা যায় না। কেননা, ইতিহাস ও পুরাণ অধ্যয়ন করলেই তবে বেদের অর্থ হয় পরিস্ফুট। তাইতো ব্রাহ্মণের কর্তব্য হোল ইতিহাস ও পুরাণ পাঠ করে বৈদিক-জ্ঞান লাভ করা। যিনি প্রাচীন কাহিনীসমূহ উত্তমরূপে

অবগত নন, তাঁকে দেখে বেদ ভীত হয়ে ভাবেন যে, 'উনি বুঝি আমাকে প্রহার করিবেন।'

'পুরাণ' শব্দের সাধারণ মানে হল পূর্বতন। পুরা ভবম্ ইতি পুরাণম্। অর্থাৎ, প্রাচীন আখ্যায়িকাযুক্ত গ্রন্থবিশেষ। ছান্দোগ্যো-পনিষদে ইতিহাস ও পুরাণকে বলা হয়েছে পঞ্চম বেদ। অথর্ববেদ, শতপথ-ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক, মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে এমনিধারা বহু প্রাচীন আখ্যায়িকা নিহিত রয়েছে—যাতে সৃষ্টিতত্ত্ব, ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজাদের বংশাবলীর বিবরণ, ধর্ম ও ব্রতানুষ্ঠান, ক্রিয়া-কলাপাদি বিষয়ের (পুরাণের এই 'পঞ্চ লক্ষণ'-এর) নানা কথা সবিস্তারে সন্নিবেশিত দেখা যায়। আর এসব পুরাতন বৃত্তান্তের বেশীর ভাগই রচিত হয়েছিল গদ্যে নয়—অনুষ্টুভ্ ছন্দে।

পুরাণ বা মহাপুরাণের সংখ্যা আঠার খানি। এই অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্মপুরাণে ব্রহ্মার মহিমা কীর্তিত হয়েছে। বিষ্ণু, নারদীয়, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহপুরাণে বিষ্ণুর গুণগান করা হয়েছে। আর মৎস্য, কূর্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নিপুরাণে শিবের জয়গাথা বর্ণিত হয়েছে। এই আঠারখানি পুরাণে মোট প্রায় চার লক্ষ শ্লোক আছে বলে পণ্ডিতেরা নির্ণয় করেছেন। এই অষ্টাদশ পুরাণ ছাড়াও রয়েছে আরও আঠারো খানি উপপুরাণ। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে পুরাণের রচয়িতা বলে আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এক জনই ছিলেন মনে করলে ভুল হবে। সম্ভবতঃ 'ব্যাস' একটি উপাধি বিশেষ। কেননা, যুগে যুগে এক একজন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সন্ধান মিলে। বোধ হয়, যে মহর্ষিই পুরা কাহিনী সংগ্রহ করতেন, তিনিই ঐ নামে পরিচিত হতেন। [মৎস্যপুরাণ, বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু, ভাগবত, গরুড় ও ভবিষ্য পুরাণে কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পরবর্তী ভারতবর্ষীয় রাজাদের ঐতিহাসিক বংশাবলীর বিবরণ পাওয়া যায়]। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি পার্জিটার সাহেব প্রমুখ পণ্ডিতদের গবেষণা এই ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে সহায়তা করেছে বিপুলভাবে। ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস রচনার উপকরণ যুগিয়েছে এই পুরানো সাহিত্যকে অবলম্বন করে। অষ্টাদশ পুরাণের এই ঐতিহাসিক দিক ছাড়া তার

সাহিত্যিক অবদান এমনি যে তাদের সহজবোধ্য লোক-সাহিত্যের সার্থক প্রতীক হিসেবেও সত্যি গণ্য করা যায়।

তাই বুঝি শ্রীনেহরু তাঁর 'দি ডিস্‌কভারি অব্ ইণ্ডিয়া'র একস্থলে পুরাণ প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'এগুলিতে গল্পের আকারে বহু বিষয়ের নিদর্শন কাল্পনিক প্রতীকরূপে আছে, আর মোটের উপর সেগুলি সুন্দর। এগুলিকে নষ্ট হ'তে দিলে তা বড়ই পরিতাপের বিষয় হবে।'

[ভারত সন্ধানে: পৃ: ১০৪।]

তন্ত্র-সাহিত্য

'হে মাতঃ! তুমি শিব-সুন্দরী, তোমার দেহকান্তি অন্ধকার ও ঘন জলদের ন্যায় মনোহর। যাহারা তোমার 'ক্রীং' এই মন্ত্রটি একবার জপ করে তাহাদিগের বদন হইতে গদ্যপদ্যময়ী বাণীসকল নিয়ত নির্গত হইতে থাকে এবং তাহারা অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করে॥১॥ হে মহেশ্বরি! তোমার ললাটে অর্ধচন্দ্র শোভমান রহিয়াছে, তোমার শ্রবণযুগলে অতি ভয়ঙ্কর বালক অলঙ্কাররূপে শোভা পাইতেছে! হে জননি! যাহারা মূঢ়চিত্ত তাহারাও যদি তোমার 'হুঁ' মন্ত্রটি দুইবার জপ করে, তবে বাগাধিপতি ও ধনপতি কুবেরকেও জয় করিতে পারে এবং পদ্মাক্ষী নারিগণকেও সম্মুগ্ধ করিতে সক্ষম হয়॥২॥ হে কালিকে! তোমার কুন্তলপাশ বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে। তোমার মুখপ্রান্তভাগ হইতে দুইধারে শোণিতধারা বিগলিত হইয়াছে। তুমি শিবকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছ, সেই হেতু তোমাকে দক্ষিণা বলে। তুমি ওঙ্কাররূপিণী। যাহারা ত্বদীয় 'হ্রীঁ' মন্ত্র দুইবার জপ করে, তাহারা শত্রু ধ্বংস করিতে সক্ষম হয় এবং ত্রিভুবন আপন বশীভূত করিতে পারে॥৩॥

'হে মাতঃ স্মেরাননে শিবসুন্দরি! যাহারা তোমার স্বরূপ ধ্যান করত ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা' এই নবাক্ষর মন্ত্র জপ করে, তাহারা কামদেবের সদৃশ হইয়া থাকে।...'

১৬শ শতকের বাঙলার তান্ত্রিক সাধক পূর্ণানন্দ পরমহংস ঠাকুর তাঁর সুবিখ্যাত 'শ্যামারহস্যম্' গ্রন্থে আদ্যাশক্তি কালীর বন্দনাগান গেয়েছেন অনূদিত এই স্তোত্রে।

তন্ত্রশাস্ত্রের মূল সুরটি ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতীয় সাধনার

ঐক্য' পুস্তকে ব্যক্ত করেছেন সুন্দরভাবে। তান্ত্রিকদের ধর্মমত উদ্ধৃতি করে লিখেছেন ঃ

'দেহই সত্যের মন্দির, সকল তত্ত্বের বাহন ; ইহাকেই যন্ত্র করিয়া ইহার ভিতরেই সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ইহার ভিতরেই শিব-শক্তির মিলন ঘটাইতে হইবে। নিজের ভিতরে এই শিব-শক্তির মিলনের দ্বার' সত্য-প্রতিষ্ঠা হইলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়াও সেই সত্যকে উপলব্ধি করা সহজ হইবে। সাধককে তাই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিতে হইবে দেহভাণ্ডে—ইহাই তান্ত্রিক সাধনার প্রথম অঙ্ক।'

তন্ত্রশাস্ত্রের মোদ্দা কথা তাই সত্যকে উপলব্ধি করবার কার্যকরী পন্থা —তার সাধন-প্রণালী। দার্শনিক কোন মতবাদ নয়। আর এই তন্ত্রোপাসনায় পুরুষ মাত্রই হলেন শিব-স্বরূপ এবং নারী শক্তি-স্বরূপা। তন্ত্রমতে শিবই হলেন পরমেশ্বর এবং তাঁর শক্তিই মহাবিদ্যা। তন্ত্রসাধনায় নির্গুণ নিরাকার উপাস্যের স্থান নেই। উপাস্য দেবতার রূপ মনে মনে অন্ততঃ কল্পনা না করে সাধনা চলে না। তান্ত্রিক উপাসনার যন্ত্র বা চক্র-গুলি সব দেবতারই প্রতীক। আর তান্ত্রিক বীজমন্ত্রগুলি উচ্চারিত করতে হয় চন্দ্রবিন্দুসহকারে। শুধু তাই নয়, কোন কোন মন্ত্রে অবোধ্য শব্দের প্রয়োগও দেখা যায়। [যেমন, ক্রীঁ হূঁ, হ্রীঁ অথবা হিলি হিলি কিলি কিলি প্রভৃতি ইষ্টদেবতা বা বীজমন্ত্রের কথা।]

তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতির একটি প্রধান অঙ্গ তার ষটচক্র। তান্ত্রিকরা মানব দেহের মেরুদণ্ডটিকে মেরুপর্বতের মত দেহ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান বলে কল্পনা করে থাকেন। এই মেরুদণ্ডের বহির্দেশে ঈড়া ও পিঙ্গলা নামে দুটি নাড়ী অবস্থিত এবং সুষুম্না নাড়ীটি মল কেন্দ্র থেকে শিরোদেশ পর্যন্ত লম্বা। ['কমলাকান্তের সাধন-রঞ্জন'—সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাবলী—সং ৭১।] এ মেরুদণ্ডের নীচের তলায় রয়েছে মূলাধার চক্র আর সকলের উর্ধ্বে অবস্থিত 'সহস্রার' চক্র—শিবের আলয়। মূলাধার চক্রের মধ্যেই অবস্থান করে দেহের আভ্যন্তরীণ শক্তি। সহস্রার ও মূলাধারের মধ্যে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা প্রভৃতি বিবিধ চক্র বা পদ্ম রয়েছে। প্রবৃত্তির রাজ্য মূলাধার চক্রে অবস্থিত নিদ্রিতা শক্তিকে যৌগিক সাধনা দ্বারা জাগিয়ে তুলে তাকে উর্ধ্বতর চক্রে সিদ্ধির পথে উন্নীত করাই তান্ত্রিক সাধনার মূল কথা।

প্রাগ্‌বৈদিক যুগ থেকে তান্ত্রিক সাধনার অনুষ্ঠানগুলি প্রচলিত হয়ে আসছে এদেশে। মোহেন-জো-দাড়োয় আবিষ্কৃত পোড়ামাটির মাতৃকা-মূর্তি ও যোগাসনে আসীন পুরুষ মূর্তিগুলি তান্ত্রিক উপাসনার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত করে বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। বৈদিক কালের ঋষি বশিষ্ঠ, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য প্রমুখ, পৌরাণিক কালের পরশুরাম, রামচন্দ্র, রাবণ প্রভৃতি, ঐতিহাসিক কালের শংকরাচার্য, স্বামী কৃষ্ণানন্দ, পূর্ণানন্দ, ত্রৈলঙ্গ-স্বামী, লক্ষ্মণ দেশিক, ভাস্কর রায়, কাশ্মীরের অভিনব গুপ্ত, সাহিব কৌল প্রভৃতি এবং এ যুগের বাংলার রামপ্রসাদ, বামাক্ষেপা, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রভৃতি হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সাধকরা তন্ত্রোক্ত উপাসনার ধারা ও ব্যাপকত্ব বজায় রেখেছেন এবং তাঁদের সাধনালব্ধ তত্ত্বকথায় এমন এক বিরাট, বিপুল ও ব্যাপক সাহিত্য গড়ে তুলেছেন, যাতে উপনিষদ, সূত্র, দেবমুখনির্গত মূলতন্ত্র, টীকাটিপ্পনী, নিবন্ধ প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন দিককে করেছে সমৃদ্ধ। বাঙলার নিজস্ব মঙ্গল-কাব্য আর শ্যামাসঙ্গীতগুলি বিরাট বিশাল এই তন্ত্র সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

প্রাচীন ভারতের তান্ত্রিক সাধক-সম্প্রদায় ও তাঁদের রচিত অজস্র পুঁথি ও গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু বলার পূর্বে বাংলার তান্ত্রিক আচার্যদের পরিচয় আশাকরি, অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বাংলার তান্ত্রিক সাধকদের মধ্যে সকলের অগ্রে নামোল্লেখ করতে হয় স্বামী কৃষ্ণানন্দের। তাঁর রচিত 'তন্ত্রসার' গ্রন্থ এখনও নিষ্ঠাবান বাঙালীর ঘরে সাদরে পঠিত হয়। 'শ্যামা-রহস্যে'র সাধক-কবি স্বামী পূর্ণানন্দের জন্মস্থান ময়মনসিংহ জেলার কাটিহালি গ্রামে। 'শ্যামারহস্যম্' ছাড়াও শ্রীতত্ত্ব চিন্তামণি', 'শাক্তক্রম', 'তত্ত্বানন্দ তরঙ্গিণী' প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তাঁর গুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দ 'তারারহস্য', 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। এঁরা ছাড়া স্বামী সর্বানন্দ, অর্ধকালী, চাঁদ-কেদার রায়ের গুরু গোঁসাই ভট্টাচার্য, বামাক্ষেপা, অম্বিকা-কালনার 'সাধকরঞ্জন' কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ পরমহংস, চট্টগ্রামের ভক্তসাধক তারাচরণ পরমহংসদেব প্রমুখ আচার্যদেবরা নিজেরা মস্ত বড় পণ্ডিত বা কবি না হয়েও ইষ্টদেবীর প্রেরণায় উচ্চাঙ্গের সাধন-গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর কবি-কঙ্কণ চণ্ডীর ভণিতায় তাই স্বীকার করেছেন :

'ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে
নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥
হাতে লয়ে পত্রমসী
আপনি কলমে বসি
নানা ছন্দে লিখেন কবিত্ব।
যেই মন্ত্রে দিল দীক্ষা
সেই মন্ত্র করি শিক্ষা—
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য ॥
দেবী চণ্ডী মহামায়া
দিলেন চরণ ছায়া
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সংগীত।...'

শুধু কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী নন, কবি বিজয় গুপ্ত, রামপ্রসাদ, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র প্রভৃতির রচনাতেও এমনি গভীর ভক্তিরসের পরিচয় পাওয়া যায়। আর বাঙলার দূর পল্লীতে পল্লীতে এমনি বহু অজ্ঞাত অখ্যাত ভক্ত সাধকের হদিস মেলে—যাঁদের সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের হয়ত বা পরিচয় নেই, কিন্তু তন্ত্রসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের দান অগণ্য বলা যায় না। এক্ষেত্রে বাঙলায় তন্ত্রসাহিত্য প্রচার ও প্রচলনে রসিকলাল চট্টোপাধ্যায় মশাইয়ের দান অপরিসীম। প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মশাইও বহু তান্ত্রিক প্রবন্ধাবলি সুলভে প্রকাশিত করে তন্ত্র-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু এ সব তন্ত্রগ্রন্থ বাঙলায় ছাপা হয়েছিল। তাই অবাঙালীর নিকট তেমন সমাদৃত হতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন সুপণ্ডিত শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী মশাই। ['তন্ত্রকথা' ঃ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ]।

বাঙলার বাইরের অসংখ্য তান্ত্রিক সাধকদের মধ্যে শ্রীমৎ শংকরাচার্যের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীরের অভিনব গুপ্ত ও সাহিব কৌল, দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ী পণ্ডিত শ্রীনিবাস ভট্ট, মহারাষ্ট্রের নীলকণ্ঠ চতুর্ধুরী, কাশীর কাশীনাথ ভট্ট, নেপালের নবমী সিংহ, মিথিলার দামোদর সূরি ('তন্ত্রচিন্তামণি' ও 'যন্ত্রচিন্তামণি'), উড়িষ্যার লক্ষ্মীধর (শৈবকল্পদ্রুম) প্রভৃতি তান্ত্রিক উপাসকদের স্থান তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় অনেক উর্ধ্বে। নীলকণ্ঠের 'দেবী ভাগবতের টীকা'য় শক্তি-উপাসনার রহস্য লিপিবদ্ধ

হয়েছে। শ্রীনিবাস ভট্টের 'শিবোবর্ণ চন্দ্রিকা'য় তান্ত্রিক উপাসনা-পদ্ধতির কথা লেখা আছে। কাশীনাথ ভট্টের রচিত গ্রন্থগুলিতে তন্ত্র ও তন্ত্র-সংক্রান্ত বিবিধ বিষয় আলোচিত হয়েছে। অভিনব গুপ্ত (১০ম-১১শ শতকের) ও সাহিব কৌল প্রমুখ পণ্ডিতদের দৌলতে কাশ্মীরে বিশাল এক তন্ত্রসাহিত্য গড়ে উঠেছে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-সাধনায়। হর-প্রসাদ শাস্ত্রী মশাই গুপ্ত-যুগের লেখা অনেকগুলি তন্ত্রপুঁথি নেপাল দরবারের লাইব্রেরী থেকে উদ্ধার করেন।

[শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী : হরপ্রসাদ সংবর্ধন-লেখমালা' : ১ম খণ্ড।]

শুধু ঐতিহাসিক যুগে নয়, বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে তন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। অথর্ববেদের অন্তর্গত কালিকোপনিষদে উল্লেখিত আছে : 'পঞ্চ মকারের দ্বারা সকলেই বিদ্যাকে লাভ করতে পারেন। মুক্তি, জ্ঞান বা ধর্মলাভের আর অন্য কোন পথ নাই। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান দৃশ্যাদৃশ্য, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত বস্তুতত্ত্বই কালিকাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে।' [শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র তর্কতীর্থ : সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—৬২ বর্ষ]। ঋক্, যজুঃ ও সামবেদেও তান্ত্রিক আচারের ভুরি ভূরি প্রয়োগ দেখা যায়। ঋগ্বেদীয় দেবীসূক্তে পরব্রহ্মকে শক্তিরূপে দেখান হয়েছে।

রামায়ণ-মহাভারতে দেখা যায়, রাবণ কিংবা ইন্দ্রজিৎ প্রমুখ রাক্ষসরা অপূর্ব মায়াবলে অদৃশ্য হয়ে ভিন্নরূপ ধারণ করে প্রতিপক্ষের নিকট অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। যদিও বৈদিক ঋষিরা যোগবলে বহু অলৌকিক শক্তি-মত্তার পরিচয় দিয়েছেন, তবুও মায়াবিদ্যা যোগবিদ্যা থেকে ভিন্ন এবং মায়াবিদ্যাকে অনার্য তান্ত্রিকানুষ্ঠান বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। পুরাণে দেখতে পাই, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার প্রভাবে তাঁর শিষ্য কচকে পুনর্জীবিত করেছেন। (মহাভারত, আদি পর্ব) পঞ্চ মকারের সিদ্ধ উপাসক শুক্রাচার্য যে তান্ত্রিক ছিলেন, বলা বাহুল্য। মহর্ষি বশিষ্ঠ, পরশুরাম, রামচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই যে তান্ত্রিক ধর্ম ও শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে প্রাচীন সাহিত্যের অনেক স্থলে।

কাজেই এতে কেবল তন্ত্রসাহিত্যের ব্যাপকতা প্রমাণিত হয় না, খৃষ্টপূর্ব হাজার বছর পূর্বেও ভারতে যে তান্ত্রিকতা বিদ্যমান ছিল তার

প্রমাণ পাওয়া যায়। অধ্যাপক শ্যাম শাস্ত্রীর মতে, খৃষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে কতকগুলি ভারতীয় মুদ্রার উপর যে সব দুর্বোধ্য চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেছে, সে সব তান্ত্রিক মন্ত্র বলে তিনি বিশ্বাস করেন। [শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী : হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা—১ম খণ্ড।] তান্ত্রিক উপাসনায় পঞ্চ মকারের ব্যবহার ও সিদ্ধি লাভের জন্য মারণ, উচাটন, স্তম্ভন, বশীকরণ প্রভৃতি ষট্‌প্রকরণের আশ্রয় গ্রহণ, যোগানুষ্ঠান প্রভৃতিকে যাঁরা বেদবহির্ভূত বলে নিন্দা করে থাকেন, তাঁরা নিশ্চয় তন্ত্রসাধন পদ্ধতির দার্শনিক রূপটিকে উপেক্ষা করে যান বলতে হবে।

প্রাকৃত

'পবিত্রাত্মা সম্রাটের প্রতিও যদি কেউ অন্যায় কি ক্ষতিকর কিছু করে, তা যতদূর সহ্য করা যায় তা করা হবে। সম্রাট তাঁর রাজ্যের অরণ্যবাসীদের উপরেও কৃপার সঙ্গে দৃষ্টিপাত করেন এবং তাদের যথার্থ-ভাবে চিন্তা করবার জন্য শিক্ষা দিতে প্রয়াস পান, কারণ যদি তিনি এরূপ না করেন, তা হলে তাঁকে অনুতপ্ত হতে হবে।...'

অথবা,—'প্রত্যেক ধর্মেরই এমনি একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। অপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে লোকে নিজের সম্প্রদায়েরই গৌরব বৃদ্ধি করে এবং অপরের সেবা করবার সুযোগ লাভ করে।...'

'দেবানাং প্রিয়' সম্রাট অশোকের এমনি ধারা বহু অনুজ্ঞা আর অনুশাসনলিপি একদা ছড়িয়ে পড়েছিল আসমুদ্র হিমাচল—পূর্বে অঙ্গ-বঙ্গ থেকে সুদূর পশ্চিমের গান্ধার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ জনপদ আর গিরি-কান্তারে। সম্রাট অশোকের এই মৈত্রী করুণার মন্ত্র—ভারতের মর্ম-বাণীর কথা দেশ হ'তে দেশান্তরে জনসাধারণের নিকট বহন করে বেড়িয়েছে, যে ভাষা—সে হোল প্রাকৃত। শুধু সম্রাট অশোকের অনুশাসন নয় সেকালের বেশীর ভাগ শিলালিপির ভাষাই ছিল সহজবোধ্য প্রাকৃত। চেটিরাজ খারবেলার হাতিগুম্ফা শিলালিপি প্রাকৃত ভাষাতে লিখিত। এ ভাষার মারফতই জগতের দুই শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু—বুদ্ধ আর মহাবীর—তাঁদের মতবাদ প্রচার করে গেছেন আপামর সাধারণের কাছে। বিকীর্ণ করেছেন এশিয়ার জ্ঞানের আলো। এ প্রাকৃতই ছিল

খৃষ্টীয় হাজার শতক পর্যন্ত প্রাচীন ভারতের চলতি ভাষা। এ থেকেই আজকের বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি উত্তর ভারতের আধুনিক ভাষাগুলি রূপ নিয়েছে।

প্রাকৃত প্রাচীন ভারতের কথ্য ভাষা। সংস্কৃত ছিল সেকালের বিদগ্ধ সমাজ—রাজা-মহারাজা, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত প্রভৃতি উচ্চবর্ণদের অনুশীলনী ভাষা। সমাজের নীচের তলার লোকেরা কিন্তু সাধারণতঃ কথা-বার্তা চালাতো প্রাকৃতে। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশও রয়েছে। কৃষ্ণ পণ্ডিত তাঁর 'প্রাকৃত চন্দ্রিকা'য় লিখেছেন:

'দেবতা, রাজা, মন্ত্রী, অমাত্য আর ণকদের ভাষা হবে সংস্কৃত। এ ছাড়া কেউ কেউ সংস্কৃতে, কেউ বা প্রাকৃতে এবং কোন কোন ব্যক্তি কথা কইচে ম্লেচ্ছ বা পৈচাশী ভাষায়। স্ত্রীলোকদের প্রাকৃত ভিন্ন অন্য ভাষায় কথা কইতে নেই। বালক, বৃদ্ধ, ভিক্ষুক, শ্রাবক অথবা কপটদণ্ডীদের বেলায়ও তাই।'

অলংকার শাস্ত্রের এ বিধান মতে তাই অধিকাংশ সার্থক সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃত ভাষার প্রয়োগ কমবেশী রয়েছে (দেশাচার ও স্থানভেদে অবশ্য কোথাও তা সৌরসেনী, কোথাও মাগধী, অবন্তী, আভিরী, অপভ্রংশ প্রভৃতি বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করেছে)। সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অবদান রাজা শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের বেশীর ভাগই চলতি প্রাকৃত (মহারাষ্ট্রী) ভাষায় লেখা। আর তা কি জীবন্ত আর বলিষ্ঠ! মহাকবি কালিদাসের নাটকেও এর ব্যতিক্রম নেই। তাঁর 'বিক্রমোর্বশী'র গানগুলি অপভ্রংশ প্রাকৃতে রচিত। 'শকুন্তলা' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে গোড়ায় অনসূয়া প্রিয়ংবদাকে বলছেন:

'জইবি গান্ধব্বেন বিহিনা নিব্বুও কল্লানা সউন্দলা অনুরূপভত্তুগামিনী সংবুত্তেতি নিব্বুদং মে হিঅঅং তহবি এতিঅং চিন্তনিজ্জং'।—এর সংস্কৃত হোল: 'যদ্যপি গান্ধর্বেণ বিধিনা নিবৃত্ত কল্যাণা শকুন্তলা অনুরূপভর্তৃ-গামিনী সংবৃত্তেতি নির্বৃতং মে হৃদয়ং তথাপি এতাবচ্চিন্তনীয়ম' (অর্থাৎ, যদিও গন্ধর্ববিধি মতো মঙ্গলকার্য সম্পন্ন হওয়ায় শকুন্তলা উপযুক্ত বরেই সমর্পিত হয়েছে বলে আমার প্রাণে আনন্দ, তথাপি এই একটি কথা ভাববার আছে।)

মূল প্রাকৃতের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার যে খুব একটা আকাশ-পাতাল

তফাত নেই উপরের এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়। আর বিদ্যাপতি ঠাকুরের (খৃষ্টীয় ১৪শ শতক) রচিত কাব্য-নাট্যগুলি আমাদের এতই অতি পরিচিত যে, তাকে মৈথিলী প্রাকৃত ভাষা বলে মেনে নিতে বেগ পেতে হয়:

সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানইতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতি পথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গমাওল
না বুঝিনু কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল
তৈও হিয় জুড়ন ন গেল॥…

প্রাকৃত শুধু সংস্কৃত নাটকের বা নীতিকাব্যের পাদপূরণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়নি। তার নিজস্ব ভাষায় রচিত নাটক-নাটিকারও অভাব নেই। এ শ্রেণীর প্রাকৃত নাটককে বলা হয় সাত্তক। সাত্তক নাটকগুলি অনেকটা সংস্কৃত নাটিকার অনুরূপ। তবে পুরোপুরি প্রাকৃতে লেখা। রাজশেখর-এর (আনুমানিক খৃষ্টীয় নবম শতক) 'কর্পূর মঞ্জরী' এমনি একখানি সার্থক নাটক যা শুধু প্রাকৃত ভাষায় নয় সমগ্র ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসেও আপন বৈশিষ্ট্য দাবি করে। নায়ক চন্দপাল ও নায়িকা কর্পূর মঞ্জরীর প্রেম ও পরিশেষে পরিণয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই মিলনান্তক নাটকখানি। কিছুটা কষ্টকল্প হলেও রুদ্রদাসের (১৭শ শতক) 'চন্দ্রলেখা' নাটকখানি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঞ্জোরের রাজা তুলাজির (১৮শ শতক) সভা-কবি ঘনশ্যাম-এর লেখা 'আনন্দ-সুন্দরী' নাটক ও নয়চন্দ্রের 'রম্ভামঞ্জরী' প্রভৃতি প্রাকৃত নাটকগুলি 'কর্পূর-মঞ্জরীর' ধাঁচে রচিত।

প্রাকৃত সাহিত্যের আর একটি সম্পদ হোল তার আগম বা জৈন ধর্ম গ্রন্থগুলি। এগুলি 'অর্ধমাগধী' প্রাকৃতে লেখা। বৌদ্ধদের মত সব

রকমের জাতি-ভেদাভেদের উর্ধ্বে—নিরীশ্বরবাদী প্রেমধর্মের উপর এই ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত—যার কৈবল্য বা নির্বাণের জন্য প্রয়োজন জ্ঞান, শ্রদ্ধা, চারিত্রিক বল, কৃচ্ছ্রসাধন আর অহিংসা। জিন বা আত্মজয়ী মহাবীর (৫৯৯-৫২৭ খৃঃ পূঃ) এ ধর্মের প্রথম প্রবর্তক না হলেও তিনি ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা (বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে তাঁকে গৌতম বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী নিগণ্ঠনাত পুত্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে)। মহাবীর ও তাঁর পরবর্তী বহু সিদ্ধান্ত মহাপুরুষদের রচিত বিবিধ রচনায় জৈন শাস্ত্রের আলোচনাই কেবল লিপিবদ্ধ হয়নি, তখনকার দিনের ঐতিহাসিক ও সামাজিক বহু চিত্রও উৎকলিত হয়েছে। যেমন, 'জৈন প্রবাদ মতে মহাবীরের মৃত্যুর প্রায় দু'শ' বছর পরে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে মগধে নাকি এক দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়, আর তা পুরো বারো বছরকাল ধরে চলে। সেই দুর্ভিক্ষের সময়ে জৈন সঙ্ঘের প্রধান কর্তা ভদ্রবাহু সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ও আরো অনেক জৈনধর্মাবলম্বীদের নিয়ে দাক্ষিণাত্যে চলে যান। চন্দ্রগুপ্ত নাকি তখন সিংহাসন পরিত্যাগ করে জৈনধর্ম গ্রহণ করেন এবং দাক্ষিণাত্যেই ভিক্ষু বেশে উপবাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন।'

এ ছাড়া, বিবিধ ছন্দোবদ্ধ 'নিরুক্তি' ভাষ্য আর প্রাকৃত আর সংস্কৃত মিশ্রিত 'চুনি' রচনার দ্বারাও পরবর্তীকালের প্রাকৃত সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। আর তাদের মধ্যে বীরসেন-জিনসেন (৮১৬ খৃঃ) ভদ্র-বাহু, জিনভদ্র, ক্ষমশ্রমণ, জিনদাস মহত্তর প্রভৃতির রচনাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা বৌদ্ধ সাহিত্য

প্রদীপের নিচেই থাকে অন্ধকার। 'এশিয়ার আলো' ভগবান তথা-গতের মৈত্রী-করুণার বাণী, তার ত্রি-শরণ-মন্ত্র সমগ্র এশিয়ায় একদা ছড়িয়ে পড়লেও জন্মভূমি ভারতে আজ তা অনেকটা ম্রিয়মাণ। তবুও ভারতীয় মানসে বৌদ্ধ ধর্ম ও ভাবধারার প্রভাব অনস্বীকার্য। সমগ্র পৃথিবীতে গৌতম বুদ্ধের মত অমন ব্যক্তিত্বশীল মহাপুরুষ আর একটি জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁর কর্ম আর তপস্যার মূল লক্ষ্য ছিল মানবের কল্যাণ আর মুক্তি। তাই অল্প দিনের মধ্যে তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম দেশ হতে দেশান্তরে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতি দূর দূর

দেশে প্রসার লাভ করেছিল। ভারতকে দান করেছিল তীর্থক্ষেত্রের সুমহান মর্যাদা।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বৌদ্ধ-চর্যাপদ আর দোঁহা নিয়ে প্রথম যাত্রা শুরু করে। তখন বাংলা দেশ ছিল বৌদ্ধ পাল রাজাদের অধীন। সপ্তম শতকের প্রথম দিকে চীন পরিব্রাজক হিউএন সাং যখন এদেশে আসেন, মুঙ্গের ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহে তিনি বহু সংখ্যক বৌদ্ধ শ্রমণের সাক্ষাৎ পান। তুর্কী বিজয়ের পর বাংলায় অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব কিছুটা হ্রাস পায়। তাহলেও বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম ও ভাবধারার অভাব ছিল না। বাংলা সাহিত্যের মুকুরে তারই প্রতিফলন দেখা যায়।

চর্যাপদ বা গীতিগুলির রচনাকাল খৃষ্টীয় দশম—দ্বাদশ শতকের মধ্যে বলে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতেরা নির্ধারিত করেছেন। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই নেপালে গিয়ে এই চর্যাপদ আর দোঁহাগুলি পুনরুদ্ধার করে আনেন। আর ১৩২৩ সালে তা সম্পাদিত করে 'হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' প্রকাশ করেন। এই সব চর্যা গানের সংখ্যা প্রায় একান্নটি। এবং কবি হলেন বাইশজন। লুই-পা, কাহ্ন-পা হাড়ি-পা, শবরী-পা, তন্ত্রী পাদ প্রভৃতি পদ-কর্তারাই সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এঁরা সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য।

চর্যাগীত

এই গীতগুলি শুধু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নয়, নবীন ভারতীয় আর্য ভাষায় প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে অমূল্য বলে পণ্ডিতদের মত। তখনকার সাহিত্য ছিল প্রধানত ধর্মের বাহন। সাধারণের বোধগম্য ভাষায় বৌদ্ধ আচার্যরা সাধনতত্ত্বমূলক এই সব গান আর দোঁহা রচনা করেন। বৌদ্ধ আচার্যদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন সহজিয়াপন্থী, এ 'দোঁহা'গুলি তাঁদের লেখা। এইসব বৌদ্ধ সাধক কবিদের কয়েকটি আধ্যাত্মিক গীতি-কবিতা সাধারণ পাঠকদের নিকট তুলে ধরা গেল:

'এসো জপহোমে মণ্ডল-কম্মে
অনুদিন আচ্ছসি বাহিউ-ধম্মে।

তো বিণু তরুণি নিরন্তর ণেহে
বোধি কি লব্‌ভই এণ বি দেহে ॥'

[দোঁহাকোষ]

[এই জপ হোম-মণ্ডল কর্মরূপ বাহ্যধর্ম অনুদিন (লিপ্ত) আছিস। তোর নিরন্তর স্নেহ বিনা, হে তরুণি, এই দেহে কি বোধি লাভ হয়।]

চর্যা গানের মধ্যেই পরবর্তীকালে বাংলা পয়ার বা ত্রিপদী ছন্দের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন—

'তিন না চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণীর নিলয় ণ জাণী ॥
হরিণী লোলঅ সুণ হরিণা তো।
এ বন চ্ছাড়ি হোহু ভান্তো ॥'

অর্থাৎ—ভয়ে তৃণ ছোঁয় না হরিণ, না খায় জল; হরিণ জানে না হরিণীর নিলয়। হরিণী আসিয়া বলে, হরিণ, তুমি শোনো, এ বন ছাড়িয়া ভ্রান্ত হইয়া চলিয়া যাও।

শুধু বাংলা পয়ার বা ত্রিপদী ছন্দ নয়, বাংলা সংগীতের মূল সুরটিও এই সব চর্যা গান আর দোঁহায় মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে বলা চলে। দোঁহাকোষের নিজস্ব ধারা উনিশ শতকের বাংলার বাউল গানের আর সুফী-মরমীদের আধ্যাত্মিক সংগীতের মধ্যে রূপ নেয়। বৌদ্ধ আচার্যদের এই সব আধ্যাত্মিক গান রাজদরবার কি পণ্ডিত সমাজের জন্য রচিত নয়। সাহিত্যিক ঠাট খুব তাতে ছিল না। কিন্তু ভাবসমৃদ্ধে তা কম যায় না। যেমন—

'কিং তো দীবে কিং তো নিবেজ্জঁ
কিং তো কিজ্জুই মন্তহ সেব্বঁ।
কিং তো তিত্থ তপোবন জাই
মোক্‌খ কি লব্‌ ভই পাণী হ্নাই।'

[দোঁহাকোষ]

[কি (হইবে) তোর দীপে, কি (হইবে) তোর নৈবেদ্যে, কি তোর করা হইবে মন্ত্রের সেবায়, কি (হইবে) তোর তীর্থ তপোবনে যাইয়া। জলে স্নান করিলে কি মোক্ষলাভ হয়।]

বৌদ্ধ দর্শনের নীতিগত ও ধর্মীয় আদর্শ খাড়া করে চর্যাপদকর্তারা শুধু ক্ষান্ত হননি। ধর্মাশ্রয়ী গীতি ছাড়া কিছু কিছু প্রেমের কবিতাও রচিত হয়েছিল। আর ছন্দবৈচিত্র্য ও লালিত্যে সেগুলি খুব নগণ্য নয়। বাংলার তুর্কী বিজয়ের পর লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মের অনেক দেবদেবী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে আশ্রয় খুঁজে নেন। এই সব দেবদেবীর মধ্যে 'ধর্ম ঠাকুর'-এর নাম সবিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি একাধারে হিন্দু দেবতা—সূর্য, বিষ্ণু ও শিব আর অপরদিকে নামহীন গোত্রহীন হাড়ি-ডোমদের উপাস্য দেবতা বিশেষ, যার বাহন হোল উল্লুক বা বানর। বাংলার মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যগুলিতে: চাঁদ সদাগর, লখিন্দর, বেহুলা-ধনপতি-লহনা-খুল্লনা-শ্রীমন্ত-কালকেতু প্রভৃতি কাহিনীতে এবং গোপীচাঁদের গানে সহজিয়া বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মের ছাপ রয়েছে।

শুধু মঙ্গলকাব্যগুলি নয় বাংলার বহু পুঁথিতেও বৌদ্ধভাবধারার স্বাক্ষর রয়েছে। 'কৃত্তিবাসী' (বাল্মীকি নহে) রামায়ণে বৌদ্ধ দুঃখবাদের ছাপ দেখা যায়। কবি বৃন্দাবন দাস কৃত 'চৈতন্য ভাগবতে' উল্লেখ আছে:

'যোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত।
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত॥'

মহারাজ ধর্মপালের সমসাময়িক রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণে' বৌদ্ধ-ধর্মের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে 'শূন্য পুরাণ' বৌদ্ধদের পুঁথি এবং ধর্ম-ঠাকুর হোল তার সংগুপ্ত বুদ্ধ। 'শূন্য পুরাণের' একান্নটি অধ্যায়ের মধ্যে সৃষ্টি-পত্তন সম্পর্কিত অংশটি মহাযানী বৌদ্ধদের মতবাদ বহন করে।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পালরাজাদের আমলে লেখা 'ডাকার্ণব' পুস্তকখানি বৌদ্ধ বজ্রযানী সম্প্রদায়ের পুঁথি বলে পণ্ডিতদের ধারণা। হাজার বছরের পুরনো চর্যা গান ও দোঁহার মত এই পুস্তকখানিও ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই নেপাল থেকে উদ্ধার করেছেন। বাংলা ডাকের বচন এই 'ডাকার্ণব' বৌদ্ধ গ্রন্থেরই নামান্তর মাত্র বলা চলে। একটা উদাহরণ:

'ভাল দ্রব্য যখন পাব।
কালিকার জন্য তুলিয়া না থোব॥
দধি দুগ্ধ করিয়া ভোগ।
ঔষধ দিয়া খণ্ডাব রোগ॥

বলে ডাক এই সংসার।
আপন মইলে কিসের আর ॥'

বৌদ্ধ ভাবাশ্রিত এই গ্রন্থের চার্বাক দর্শনের অনুরূপ মতবাদ লক্ষ্য করবার।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বহু পুস্তক ও পুঁথিতে বৌদ্ধ ভাবধারার এমনি স্বাক্ষর রয়েছে। বাংলা সাহিত্যে কবি ও লেখকদের বৌদ্ধ ভাবধারা কম প্রভাবান্বিত করেনি। প্রায় একশ' বছর পূর্বে চট্টগ্রামের কবি নীলকমল দাস বৌদ্ধ রঞ্জিকা নামে একখানি বুদ্ধদেবের জীবনচরিত বাংলায় অনুবাদ করেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে 'ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষের অনুবাদ করেন ফুলচন্দ্র। কবি সর্বানন্দের কাব্যগ্রন্থ 'জগজ্জ্যোতিঃ' ও 'শ্রীশ্রীবুদ্ধ চরিতামৃত' তখনকার লেখকগোষ্ঠীর অকুণ্ঠ সমাদরলাভ করে। ঊনবিংশ শতকে বহু বাঙ্গালী কবি ও লেখক বুদ্ধের জীবন-চরিত অবলম্বনে বহু কাব্য, নাটক রচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে কবি নবীনচন্দ্র সেন ('অমিতাভ' কাব্য), নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ (এডুইন আর্নল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' কাব্য অবলম্বনে লেখা 'অবতার মহাপুরুষ' নাটক) বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের নানা গ্রন্থ, দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রভৃতি মনীষীদের নানা রচনায় বৌদ্ধ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা ও নাটক এশিয়ার এই মহামানবকে উদ্দেশ করে রচিত। 'বুদ্ধদেবের প্রতি' কবিতায় কবিগুরু তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছেন :

'ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশ, দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।'

'পরিশোধ'-এর 'বোরোবুদুর' কবিতায় কবি 'বুদ্ধের শরণ' নিয়ে লিখছেন :

অমেয় প্রেমের মন্ত্র—'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চণ্ডালিকা', 'নটীর পূজা', বুদ্ধের উপাসিকা রাজকন্যা 'মালিনী, 'শ্যামা' প্রভৃতি গীতিনাট্যে এবং 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা', 'পূজারিনী', 'অভিসার', 'নগরলক্ষ্মী' প্রভৃতি বিভিন্ন কবিতায় বৌদ্ধ ভাবধারাটিকে মূর্ত করে তুলেছেন নানা ছন্দে আর গানে।

এ ছাড়া ত্রিপিটকের বিবিধ অনুবাদ, ঈশানচন্দ্র ঘোষের অনূদিত 'জাতক', ডাঃ বিমলাচরণ লাহার 'গৌতম বুদ্ধ', চারুচন্দ্র বসুর অনূদিত 'ধর্ম-পদ', প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ধর্মপদ পরিচয়', ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর বৌদ্ধ-সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক বহু গ্রন্থ, শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদিত 'অশ্ব ঘোষের বুদ্ধচরিত', শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্তের লেখা 'সারীপুত্ত ও মোগ্গল্লায়ন' প্রভৃতি বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থ বাংলা-সাহিত্যের যাত্রাপথকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে।

প্রাচীন তামিল সাহিত্য

পাণ্ড্য রাজাদের সাহায্যপুষ্ট কবি-আকাদমি বা 'সংঘম' যুগেরই একটি কাহিনী। কবি-পরিষদের অধিবেশন বসেছিল। প্রসিদ্ধ কবি নাক্কিরার নিজেই পরিচালনা করছিলেন সভার কাজ। পাণ্ড্যরাজ নিজেও উপস্থিত ছিলেন অধিবেশনে। তিনিই কথাটা পাড়লেন। বললেনঃ কাল রাজ-মহিষীর কেশদামে এমন এক অপূর্ব সুগন্ধির ঘ্রাণ নাকি পেয়েছেন যার উৎস তিনি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছেন না। পরিষদের কোন কবি যদি শ্লোক রচনা করে এর সন্ধান দিতে পারেন, তিনি তবে কবিকে এক হাজার সোনার মোহর উপহার দেবেন।

রাজার এই ঘোষণার কথা মাদুরার সুন্দরেশ্বর (মহাদেব) মন্দিরের গরীব পূজারী ধর্মীর কানেও গেল। গরীব পূজারী ধর্মী এ উদ্দেশ্যে শ্লোক রচনা করতে সুন্দরেশ্বরের উপাসনায় মেতে গেলেন। মহাদেবের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানালেনঃ হে দেবাদিদেব মহেশ্বর, আমায় শ্লোক রচনার এমন ক্ষমতা দাও, যার বলে রাজ-পুরস্কার আমি যেন লাভ করি।

মহাদেব বুঝি গরীব বামুনের প্রতি সদয় হলেন। বলা নেই—কথা নেই, শিবলিঙ্গ-এর পিছন থেকে সহসা খসে পড়ল এক ভূর্জপত্র আর তাতে কবিতাকারে লেখা আছেঃ 'এক প্রেমিক এক ভ্রমরকে বলছে, হে ভ্রমর, তুমি তো ফুলের পর ফুলে মধু খেয়ে বেড়াও, কিন্তু বল দেখি যদি কোন রূপসী তন্বী তোমায় ভালবাসে, তবে তার সুরভিত কেশপাশে যে সুগন্ধি বেরোয় তার কি কিছু তুলনা আছে, যদি সে মানিনী তোমার প্রেমে গরবিনী হয়?' [অনুবাদঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।]

দীন পুজারীর কাব্যশক্তি দেখে রাজা খুশী হলেন এবং প্রতিশ্রুত পুরস্কার দিতে চাইলেন। কিন্তু কবি নাক্কিরার বাধ সাধলেন। বললেন :

স্ত্রীলোকের চুল আপনা-আপনি সুরভিত হয় না। তাছাড়া, ওই কবিতায় ত্রুটিও রয়েছে বিস্তর। দীন ধর্মী তখন আবার ছুটলেন সুন্দরেশ্বরের নিকট ধর্না দিতে। ভক্তের আকুল প্রার্থনায় মহাদেব এবার নিজেই কবির বেশ ধরে এলেন তর্কযুদ্ধে কবি-পরিষদে। কবি নাক্কিরারের সে একই কথা : স্ত্রীলোকের কেশ আপনা-আপনি সুরভিত হয় না সুগন্ধ তেল বা ফুলের নির্যাস না পেলে।

কবিবেশধারী সুন্দরেশ্বর তখন বললেন : পার্বতীর কুন্দকুন্তল যে অমনি সদা-সর্বদা সুরভিত হয়ে থাকে। কবি নাক্কিরার জবাব দিলেন : মিথ্যে কথা। শিব তাঁর ত্রিনয়ন উন্মোচন করলেও আমি তা বিশ্বাস করবো না। বটে! সাক্ষাৎ মহাদেবের নিন্দা? কবি নাক্কিরার শিবের শাপে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। নাক্কিরার তখন শিবের বন্দনা শুরু করেন এবং কৈলাসের দিকে যাত্রা করেন। পথে এক রাক্ষসের কবলে পড়লেন তিনি। তারপর অবশ্য (সুব্রাহ্মণ্য) মুরুগ-এর আরাধনা করে রাক্ষসের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান। ঐ আরাধনা-স্তোত্রই কবি নাক্কিরারের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ তিরুমুরুগারুপদাইয়ের (Tirumurugarrupadai) বিষয়বস্তু। সংঘম বা 'কবি-পরিষদ' যুগের রচনাগুলি প্রাচীন তামিল সাহিত্যের এক অতুলনীয় কাব্য-সম্পদ। ভাব, ভাষা বা বর্ণনাচাতুর্যের দিক থেকেও তারা অপূর্ব। দাক্ষিণাত্যে যে শৈবধর্ম তখন প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করতে পারে নি, তার পরিচয়ও নাক্কিরারের এই কাব্যে পাওয়া যায়।

নাক্কিরার অবশ্য সংঘম যুগেরই কবি। প্রাচীনতম তামিল সাহিত্যের সন্ধান তারও বহু পূর্ব থেকে পাওয়া যায়। কারো কারো মতে প্রাচীন তামিল সাহিত্য ঋক্‌বেদেরও পূর্বে রচিত হয়। মোহেন-জো-দাড়ো বা হরাপ্পার লিপিমালার সমকালীন বলেও কেউ কেউ মনে করেন। অবশ্য আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথায় : 'তমিলের প্রাচীনতম কাব্য-গ্রন্থগুলির মূল রূপ খৃষ্ট-জন্মের পরের প্রথম দুই-তিন শত বৎসরে গিয়া পহুঁছায়। প্রাচীন তমিল একটি বিশেষ প্রৌঢ়, স্বতন্ত্র ভাষা, ইহা সংস্কৃতের প্রভাব হইতে অনেকটা মুক্ত ; প্রেম ও যুদ্ধ অবলম্বন করিয়া রচিত ইহার কাব্যগ্রন্থগুলিতে আদি দ্রাবিড় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য এবং অতি মনোহর প্রকাশ

দেখা যায়। পরবর্তী কালে শৈবসিদ্ধ ও বৈষ্ণব 'অঝ্‌ৱার' অর্থাৎ ভক্তদের রচিত তমিল আধ্যাত্মিক ভাবের পদ, ভারতের ধর্ম-চিন্তার ইতিহাসে একটি গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রাচীন তমিলকে 'চেন্-তমিঝ্‌' বলে, ইহার পরিবর্তনে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের পরে 'কোডুন্-দমিঝ্‌' বা আধুনিক-তমিল। প্রসারে, স্বতন্ত্রতায় এবং বিচিত্রতায় তমিল সাহিত্য ভারতবর্ষে সংস্কৃত সাহিত্যের পরেই উল্লেখিত হইবার যোগ্য।' [পৃঃ ২৩ঃ 'ভারতের ভাষা ও ভাষা-সমস্যা'।]

তামিল সাহিত্যের ধারাকে মোটামুটি এই কয় ভাগে ভাগ করা যায়ঃ 'চেনতমিজ' বা প্রাচীন যুগ; মধ্যযুগ আর বর্তমান যুগ। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার তাঁর 'তামিল স্টাডিস' গ্রন্থে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত প্রাচীন যুগের সীমারেখা টেনেছেন। 'তোলকপ্পীয়াম', 'কুরুল' সংঘম-কাব্যগুলি, 'শিলপ্পাদিকরম', 'জীবক-চিন্তামণি', 'মণিমেখলাই' ইত্যাদি এই কালের সেরা সাহিত্য-নিদর্শনই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম-মতেরও প্রভাব দেখা যায় এ যুগের সাহিত্যে।

দ্বিতীয় যুগের কাল-নির্দেশ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ধরা যায়। এ যুগের সেরা সাহিত্য হল বৈষ্ণব আলোয়ার ও শৈবসিদ্ধান্তীদের ভক্তিগাথা আর পদাবলিগুলি। এ কালের 'নলিয়ারা-প্রবন্ধম' তামিল বৈষ্ণবদের নিকট অনেকটা বেদের মত। পইকইর, পুথাত্তর, পেই-আর, কুলশেখর, নম্মাড়বার, তিরুপ্পান প্রভৃতি আলোয়ার কবিরা তাঁদের মধুর গীতি-কবিতায় মধ্যযুগীয় তামিল সাহিত্যকে করে তুলেছেন রস-সমৃদ্ধ।

মহিলা আলোয়ারদেরও অভাব ছিল না। কবি অণ্ডাল ছিলেন দাক্ষিণাত্যের মীরাবাঈ। মীরাবাঈয়ের মতো তিনিও ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী। অণ্ডালের পদাবলীতে তাঁর ভগবৎ প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। যেমনঃ 'প্রেমে পাগল হয়ে তিনি বাগানের কোকিলকে ডেকে বলছেনঃ হে কোকিল, তুমি তোমার মধুর স্বরে আমার প্রিয়তমকে ডেকে নিয়ে এস। আমি তাঁর রূপ দেখিনি, কিন্তু আমার হৃদয় তিনি দখল করে বসে আছেন। কোকিল, তুমি জান প্রিয়বিরহে মানুষের প্রাণে কি বেদনা দেখা দেয়, তাই তাঁর আগমনী গান কর।...'

আবার বলছেনঃ 'দক্ষিণ হাওয়া ও চাঁদের জ্যোৎস্না আমার অস্থি-মাংস

বিদীর্ণ করছে, কোকিল, তুমি আর আমার দুঃখ বাড়িও না। তোমার গানে যদি আমার প্রভু না আসেন, তবে তোমাকে বাগান থেকে তাড়িয়ে দেব।' [ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ : 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস'।]

তিরুমুরাই

শুধু বৈষ্ণব পদাবলীতে নয়, শৈব-সিদ্ধান্তীদের—তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর অপ্পরস্বামী, মাণিক্যভাস্কর প্রভৃতির—ভক্তি-রসপূর্ণ রচনার দ্বারাও মধ্য-যুগীয় তামিল সাহিত্য সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছিল। 'তিরুমুরাই' এই শৈব-সাহিত্যের অন্যতম সেরা গ্রন্থ। মাণিক্যভাস্করের রচিত 'তিরুভাষকম্' সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে, 'তিরুভাষকম্' যার হৃদয় দ্রবীভূত করতে পারে না, তার নিশ্চয়ই পাষাণ-হৃদয় (উইন্টারনিট্স)। এ যুগের আর একটি প্রসিদ্ধ কাব্য কাম্বানের রামায়ণ 'মাধবকলঙ্কী'। মধ্যযুগের পর আধুনিক যুগ—খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকে এ যুগের সূচনা। 'কোডুতমিজ' হোল এ যুগের ভাষা।

কবি কাম্বানের রামায়ণের আলোচনার আগে 'সংঘম' যুগের খান-কয়েক কাব্যের কথা বলে রাখা যাক। তোলকপ্পীয়ারের ব্যাকরণগ্রন্থ তোলকপ্পীয়াম সেকালের তামিল ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ। সংস্কৃত পাণিনির মতই কপ্পীয়ারের ব্যাকরণের স্থান। তাঁর ব্যাকরণে (এর্ষতু) বা ধ্বনিতত্ত্ব, (চোল্ল) বা শব্দতত্ত্ব আর (পরুল) বা ছন্দবিন্যাস—এই তিনটি বিভাগ রয়েছে। তোলকপ্পীয়াম শুধু শব্দশাস্ত্র অনুশীলনে সীমাবদ্ধ থাকেনি, দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন হয়েছে তার মণিমুকুরে। কবি নাক্কিরার-এর মত কবি কপিলারও তখনকার দিনের একজন সেরা রচয়িতা। এতূনকার যুগে একটি কাব্যের কাহিনী উদ্ধৃত করা গেল : 'এক বৃদ্ধা মাতার কানে গেল যে তাঁর পুত্র সম্মুখ-সংগ্রাম ক্ষেত্র থেকে ভীরু কাপুরুষের মত এসেছে পালিয়ে। অভিমানী মাতা তখন দিশাহারা হয়ে আপন স্তনযুগল কেটে ফেল্লেন।—বল্লেন, কাপুরুষ সন্তান যে স্তন পান করেছে, তা তিনি আর রাখবেন না। তবু হাজার হোক, মায়ের মন। ভীরু কাপুরুষ সন্তান পেটে ধরেছেন বলে কিছুতেই তিনি নিজে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাই রাত্রির অন্ধকারে তিনি ছুটলেন রণক্ষেত্রে। দেখলেন—আশঙ্কা তাঁর

অমূলক নয়। তাঁর বীরপুত্র অমিতবিক্রমে সংগ্রাম করতে করতে মরে পড়ে আছে। পুত্রহারা জননীর চক্ষে তখন ছাপিয়ে উঠলো অশ্রু। মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ-মমতা, আর তেজস্বিতা অপূর্বচিত্তে রূপায়িত হয়েছে সংঘম যুগের এমনি বহু কাব্যে। যুদ্ধবিগ্রহ, প্রেমের বিচিত্র গতি আর প্রকৃতি বর্ণনায় 'সংঘম' যুগের কাব্যগুলির মূল কথা বলা যায়।

কুরুল

প্রাচীন তামিল সাহিত্যের আর একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হোল কবি তিরু-বল্লুবরের 'কুরুল'। দাক্ষিণাত্যে কুরুল বা মুপ্পাল তামিল-বেদ নামে পরিচিত। কদর তার মনুসংহিতার মত। শ্রীরাজাগোপালাচারী এক জায়গায় 'কুরুল' সম্পর্কে লিখেছেন: 'যদি কেউ তামিল জাতির প্রতিভা সঠিক উপলব্ধি করতে চান তাঁকে 'ত্রিক-কুরুল' অবশ্যই পড়তে হবে। ভারতীয় সাহিত্যের পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্যও এই পুস্তক পাঠ অত্যাবশ্যক। এই গ্রন্থে উত্তর ভারত আর তার সভ্যতা ও বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে তামিল জাতির সভ্যতা ও বৈদগ্ধ্যের ঐক্য ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখতে পাবে। তদুপরি 'ত্রিক-কুরুল' দক্ষিণ ভারতের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য পরিস্ফুট করে তুলেছে।' কুরুলে ধর্ম—(আক্রম), অর্থ—(পুরুল), কাম—(ইন্‌বাম), জীবনের এই তিন বিষয়ক নানা নীতি ও ভক্তিমূলক উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ আছে। নির্বাণ বা মোক্ষ লাভের কথা খুব একটা নেই বলা চলে। কবি তিরুবল্লুবর-এর জন্ম এখনকার মাদ্রাজের নিকটবর্তী এক অচ্ছুৎ সম্প্রদায়ে। কাপড় বুনেই তাঁকে জীবিকার্জন করতে হোত। 'কুরুলে'র অধ্যায় সংখ্যা ১৩৩টি। তা থেকে কিছুটা ত করা গেল:

'ধনসম্পত্তি আর ইন্দ্রিয় সুখের উত্তাল সমুদ্র তারাই পার হতে সমর্থ—যারা ধর্মসিন্ধু মুনীশ্বরের চরণে লীন থাকে।'...'কেবল তারাই দুঃখ থেকে উদ্ধার পায়, যারা সেই অদ্বিতীয় পুরুষের শরণ গ্রহণ করে।' 'আত্মসংযমের দ্বারা স্বর্গ লাভ হয় কিন্তু অসংযত ইন্দ্রিয়-লিপ্সা ঘোর নরকের জন্য করে দেয় সহজ সরল রাস্তা।'

কাম্বানের 'রাম অবতার' কাব্যগ্রন্থ বাল্মীকির রামায়ণ থেকে ভিন্ন। ৪২ হাজারের মত তার পঙ্‌ক্তি সংখ্যা এবং তিনি সংঘম, বৈষ্ণব, আলোয়ার

আর শিব-সিদ্ধান্তীদের কাব্যের সমন্বয় সাধন করেছেন এই রচনায়। রাবণ-বিজয়ী রাম কাম্বানের হাতে পড়ে ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছেন।

তাঞ্জোরের চোল সাম্রাজ্য সে-যুগে সুদূর বঙ্গদেশ, মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। অনুরণন তুলেছিল তাদের সাংস্কৃতিক জীবনধারায়। তার প্রতিফলন সে যুগের প্রাচীন সাহিত্যে দেখা যায়। তারপর ষোড়শ শতকে মুসলমান, মহারাষ্ট্রীয় ও পরবর্তী কালের ইউরোপীয় শাসক ও শোষকবর্গের সংস্পর্শে এসে তামিল সাহিত্যের সেই জয়যাত্রা বন্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে অবদান তার নগণ্য নয়।

তামিল কবি কাম্বানের 'রাম অবতার' থেকে একটি উদ্ধৃতি:

কোশল ভূমি

'নদীর কল্লোল,
ক্ষেতে কৃষকের কলরব,
ইক্ষুপ্রেষণযন্ত্রে ইক্ষুরসধার,
উচ্চনাদে শঙ্খধ্বনি,
বলদের উল্লসিত ক্রীড়া,
ঘোলাজলে মহিষের অঙ্গপ্রক্ষেপণ—
এইসব শব্দ মিলে অপূর্ব মূর্ছনা
কর্ষিত মাটির বুকে।

তবু,
এদেশের সব স্থান—
দূর-দূরান্তরে
দেখা যায় রয়েছে প্রচুর—
সমুদ্রে শিকার করা মাছ,
পাহাড়িয়া মধু,
চারণভূমির অবদান:
ছানা, আর কর্ষিত জমি থেকে পাওয়া
তাড়ি এবং ঝোলা গুড়।

এ যেন স্ফুলিঙ্গ জীবনের
না-থামা গতিতে;
ভিন্ন পরিবেশে জন্মলাভ করে,
স্বকার্যে সনিষ্ঠ থাকে
প্রান্তদেশে উত্তরণ পথে।
তীক্ষ্ণ আর উদার চাহনি
কোশল নারীর
ভাগোরে অবজ্ঞা করে;
হস্তিনী লজ্জিতা হয় দেহের গঠনে,
বক্ষ যেন শতদল শোভা,
মুখচন্দ্রমার তুলনীয়।

বদান্যতা অজানা এদেশে
কারণ অভাব নেই কিছু;
এখনো পৌরুষ সেইমত
কারণ শত্রু নেই কেউ;
সত্য—তাও নেই দেখি
কারণ মিথ্যার স্থান নেই;
এদেশে দর্শক কেউ নয়
কারণ জ্ঞানের আলো সকল অন্তরে।'*

[অনুবাদ : দেবদত্ত গুপ্ত]

* [তামিল কবিদের মধ্যে কাম্বানের স্থান সর্বাগ্রে, তবু কবির জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। সাধারণত মেনে নেওয়া হয়েছে যে, তামিলনাদের থেরেজ-হুন্দুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর কাব্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সেকালের গণ্যমান্য কোন এক সাদায়াপ্পা। কাম্বান কোন্ যুগের কবি সে সম্বন্ধেও মতভেদ আছে; কেউ কেউ মনে করেন, তিনি খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীর কবি আবার কেউ কেউ মনে করেন দ্বাদশ শতাব্দীর।

বর্তমান কবিতা কবির তামিল 'রাম অবতার' মহাকাব্য থেকে সংকলিত। রামের জীবন এই কাব্যের প্রধান উপজীব্য। কবি বাল্মীকির মূল সংস্কৃত রামায়ণ থেকে তাঁর কাব্যের গল্পাংশ সংগ্রহ করেন। তামিল ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে যা কিছু তাৎপর্যপূর্ণ তার উৎস ঐ মহাকাব্য। কাম্বানকে সেইদিক দিয়ে তামিল সংস্কৃতির ধারক বলা যায়।

তামিল সাহিত্যের বহু প্রাচীনগ্রন্থ অক্ষত অবস্থায় কিছু কিছু উদ্ধার করা হয়েছে সম্প্রতি। তাদের অনেকগুলিই কুরলের মত বিখ্যাত। নীচে তাদের একটা তালিকা দেওয়া গেল :

গ্রন্থের নাম	পংক্তি সংখ্যা	গ্রন্থকার	রচনাকাল
কুরল বা মপ্পাল	২৬৬০	তিরুবল্লুবর	১০০-১৩০ খৃঃ
মণিমেখলই	৪৮৫৭	চিত্তলৈচ-চাওনর	১১০-১৪০ ,,
চিলপ্পদিকরম	৪৯৪৭	ইলঙ্কো আদিকশ	১১০-১৪০ ,,
কলিত-তোকই	৪৩০৪	নল্লন্থুবনর	···
ইন্নই-নারপতু	১৬০	পুথন-চেন্থনর	১১০-১৩০ ,,
পেরুক্ক-কুরিঞ্চি	২৬১	কবিলর	৯০-১৩০ ,,
কুরিঞ্চি-পদ্দই	৪০০	,,	,,
তিরু-মরুকরুপ-পদ্দই	৩১৭	নক্কিবর	১০০-১৩০ ,,
নেদু-নল্-বদই	১৮৮	,,	,,
পোরুনর্-অরুপ-পদ্দই	২৪৮	মুতুত্ত-তামক কন্নিয়র	৬০-৯০ ,,
পেরুম-পান্-অরুপ-পদ্দই	৫০০	উরুত্ত-তিরুঙ্ক কন্ননর	৪০-৭০ ,,
পদ্দিনপ্-পালই	৩০১	,,	,,
মাদুরৈক-কাঞ্চি	৭৮২	মঙ্কদি-মরুতানর	৯০-১৩০ ,,
মলই-পদু-কদাম	৫৮৩	পেরুঙ্ক-কৌশিকনর	১০০-১৩০ ,,
পতিরুপ্-পতু	৬০০	——	১১০-১৪০ ,,

এ ছাড়া 'পুর-নানূরু অকন্-নানূরু' 'করুন্তোকই'ও 'নর্রিনই' প্রভৃতি আর খান তিনেক প্রাচীন তামিল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের রচনা কাল ১০০ থেকে ১৪০ খৃষ্টীয় শতক ধরা হয়ে থাকে। গ্রন্থকারের নাম জানা যায় না।—[কুরল্ : নলিনীমোহন সান্যাল অনুদিত : পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।]

'চিলপ্পদিকরম'এর আখ্যানভাগের কিছুটা উদ্ধৃতি করা গেল :

যেখানে কাবেরী নদী সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, সেখানে পুগার নামে একটি মহাসমৃদ্ধ বন্দর ছিল। ঐ নগরে এক ধনী ও বদান্য বণিকের পরমাসুন্দরী ও অশেষ গুণসম্পন্না একটি কন্যা ছিল। নাম কন্নকী। ঐ

তিনি তাঁর পূর্ব যুগের সমস্ত মূল্যবান সংস্কৃতি তাঁর কাব্যে সংযোজিত করেছেন। প্রাচীন তামিল কবিদের বৈষ্ণব দর্শন ও চিন্তাধারা, কাব্যের সরলতা, নৈতিক বোধ ইত্যাদি সবই তিনি তাঁর কাব্যে লাগিয়েছেন। বর্তমান কবিতাটি 'যোজনা' পাক্ষিক পত্রিকা (ইংরেজী) থেকে সংগৃহীত।

নগরে আর একটি ধনী বণিক পুত্রও ছিল। নাম তার কোবিলন। যেমনি রূপবান তেমনি গুণবান। কোবিলনের সঙ্গে কন্নকীর বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর কোবিলনের পিতা, পুত্র ও পুত্র-বধূর জন্য প্রশস্ত বাগানের মধ্যে এক সুরম্য উদ্যান-বাটিকা নির্মাণ করে দিলেন। নব পরিণীত পুত্র ও পুত্রবধূ দু'জনে তাতে সুখে শান্তিতে দিন যাপন করতে লাগল।

দিন যায়। একদিন রাজসভায় মাধবী নামে এক নর্তকীর মনোহর গান শুনে কোবিলন তাতে মজে গেল। পাগল হয়ে উঠল নর্তকী মাধবীর জন্য। মুগ্ধ কোবিলন আর বাড়ি ফেরে না। স্ত্রী কন্নকীর সঙ্গে দেখা করে না। মাধবীর ঘরেই দিন রাত কাটিয়ে দেয়। বছর কয়েকের মধ্যে কোবিলন তাই সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। পতি-প্রাণা কন্নকী তখন তার সমস্ত অলংকার খুলে দিল একে একে। থাকল শুধু দু'গাছি সোনার মল।

এদিকে একদিন মাধবীর এক গান শুনে কোবিলনের মনে হল, যার জন্য সে সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে এল, সে তাকে আর ভালবাসে না। তখন সে মাধবীর নিকট যাওয়া বন্ধ করে দিল। এর আগে মাধবীর গর্ভে কোবিলনের একটি কন্যা জন্মেছিল। নাম তার মণিমেখলাই। কোবিলনের মনে অনুতাপ এল। একদিন কন্নকীর নিকট গিয়ে তার দুষ্কর্মের জন্য পরিতাপ করল এবং বলল, সে এখন অনুতপ্ত। বারবনিতার কুহকে পড়ে সর্বস্বান্ত। আজ তার এমন কিছু নেই যা দিয়ে সে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে স্বাধীনভাবে।

কন্নকী বলল : 'কেন, এখনও আমার মণিময় সোনার মল আছে, তুমি তা নাও।'

কোবিলন তাই নিল। বলল : আমি মাদুরা নগরে গিয়ে তোমার সোনার মল বেচে যা পাব তাকে মূলধন করে ব্যবসায় আরম্ভ করব এবং নষ্ট সম্পদের পুনরুদ্ধার করব। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।

কন্নকী অত্যন্ত আনন্দিত হল এবং পরদিন সকালে কা'কেও না বলে মাদুরাভিমুখে যাত্রা করল। কোমলাঙ্গী কন্নকীর পক্ষে ঐ পথশ্রম খুবই কষ্টের হোল। তবু তারা মাদুরায় গিয়ে উপস্থিত হোল। এক গোপপল্লীতে এসে আশ্রয় নিল। একদিন কন্নকীর পায়ের একগাছি মল নিয়ে বাজারে বেচতে গিয়েছিল কোবিলন। গরীব কোবিলনের নিকট মহামূল্য মল দেখে সবাই তাকে চোর বলে ধরে নিলে। কিছুদিন

আগে রানীরও অমনি একগাছি মল চুরি গিয়েছিল। চুরি করার অপরাধে কোবিলনের শিরশ্ছেদ হোল। কন্নকী এ খবর শুনে ক্ষিপ্তর মত ছুটে গেল রাজার নিকট। তার নিজের অপর মলগাছটি দেখালে সে। প্রার্থনা করলে রাজার নিকট সুবিচার। রাজা তখন নিজ ভুল বুঝতে পারলেন। কিন্তু নিরুপায়। কন্নকীর শাপে এদিকে রাজপুরী পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কন্নকীও স্বামীর শোকে প্রাণ ত্যাগ করলে। তার মৃত্যুর পর তামিল দেশে ও দেবীর ন্যায় সম্মানিত হয়ে উঠল। মন্দিরে মন্দিরে তার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হোল।

'মণিমেখলই' ঃ সেকালের তামিল মহাকাব্যের মধ্যে 'মণিমেখলই' প্রথম লিখিত হয়েছিল। রচনা নৈপুণ্যের দিক থেকে তার স্থান অতি উচ্চে। বচনভঙ্গিও অতি সরস। ভাষা অতি সুললিত ও সহজ সরল। প্রকৃতি বর্ণনায় কবি অসীম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন অনেক স্থলে। তার আখ্যান ভাগ বলা গেল সংক্ষেপে।

'চিলপ্পদিকরমে' যে নর্তকী কন্যার কথা উল্লেখিত আছে সেই 'মণি-মেখলই' এ কাব্যের নায়িকা। তার চরিত্র অতি নিপুণভাবে বর্ণিত করা হয়েছে। রূপসী নর্তকী-কন্যা হয়েও মণিমেখলই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হোল যৌবনে। বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর জীবনই সে অতিবাহিত করল। তার অপরূপ রূপযৌবনে আকৃষ্ট হয়েছিল দেশের রাজকুমার। কিন্তু মণিমেখলই তার সংকল্পে অটল। ব্রতচারিণী মণিমেখলই রাজকুমারকে অবজ্ঞা না করেও প্রকৃত রমণীর মত তাঁর অন্তরের বেদনা অনুভব করল এবং তাঁকে পবিত্র ও আধ্যাত্মিক জীবন যাপনে পরামর্শ দান করলে। এ কাব্যের শেষ চারি পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার প্রধান প্রধান দর্শনশাস্ত্রের বিবরণ দিয়েছেন।

শোনা যায়, গ্রন্থ শেষ করে গ্রন্থকার কেরল রাজ চেঙ্কখুদ্দিবন ও তাঁর বিদ্যোৎসাহী ভ্রাতা ইলঙ্কো আদিকলনের অতিথি হয়েছিলেন। রাজ ভ্রাতা আদিকলন নাকি যৌবনের প্রারম্ভেই সংসার ত্যাগ করে নিগ্রন্থসম্প্রদায় ভুক্ত হয়েছিলেন এবং নগরের বাহিরে বাস করতেন। বহু বৎসর পর যখন 'মণিমেখলই' প্রণেতা চিত্তলৈচ্‌চাওনর কেরল রাজসভায় আগমন করলেন এবং তাঁর কাব্য পাঠ করলেন, তখন নাকি রাজ-সন্ন্যাসী মণিমেখলইর মাতাপিতার জীবন অবলম্বন করে এক-

খানি মহাকাব্য রচনা করতে তাঁকে অনুরোধ করেন। তিনি তখন এ 'চিলপ্পদিকরম' গ্রন্থ রচনা করেন—পূর্বেই তা উল্লেখ করা হয়েছে।

['কুরল' : নলিনীমোহন সান্যাল অনূদিত।]

সংস্কৃত মহাকাব্য

তমসা নদীর তীরে একদা কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের ক্রৌঞ্চকে ব্যাধের শরে বিদ্ধ হতে দেখে সকরুণ ক্রন্দন করে উঠেছিল ক্রৌঞ্চী। ব্যথাতুর ক্রৌঞ্চীর এই কাতর ক্রন্দন কুলপতি বাল্মীকিকে করে তুলেছিল শোকাভিভূত। মুখ দিয়ে তাঁর বেরিয়ে পড়েছিল শোকনিসৃত অভিসম্পাত :

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকম্ অবধীঃ কামমোহিতম্॥

(রামায়ণ—বালকাণ্ডঃ)

'রে নিষাদ! কোথাও তুই প্রতিষ্ঠা পাবি না, যেহেতু তুই কাম-মোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করলি।'

কুলপতি বাল্মীকির এই শোকনিসৃত শ্লোকগাথাই নাকি মহাকাব্য রামায়ণের আদি কথা। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'রামায়ণ করুণার অশ্রু-নির্ঝর। ক্রৌঞ্চ-বিরহীর শোকার্ত ক্রন্দন রামায়ণ কথার মর্মস্থলে ধ্বনিত হইতেছে।' রাবণও ব্যাধের মতো প্রেমিক যুগলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে; লঙ্কাকাণ্ডের যুদ্ধ-ব্যাপার উন্মত্ত বিরহীর পাখার ঝটপটি।...

তিনি আরও লিখেছেন: 'ক্রৌঞ্চমিথুনের গল্পটি রামায়ণের মূল ভাবটির সংক্ষিপ্ত রূপক। স্থূল কথা এই, লোকে এই সত্যটুকু নিঃসন্দেহ আবিষ্কার করিয়াছে যে, মহাকবির নির্মল অনুষ্টুপ ছন্দঃ-প্রবাহ করুণার উত্তাপেই বিগলিত হইয়া স্পন্দ্যমান হইয়াছে, অকালে দাম্পত্য প্রেমের চিরবিচ্ছেদ ঘটানই ঋষির করুণার্দ্র কবিত্বকে উন্মথিত করিয়াছে।'

['কবি জীবনী' : সাহিত্য।]

করুণ রস তাই রামায়ণের উপাদান। জনকরাজ কন্যা সীতা ঐ ক্রৌঞ্চীরই যেন প্রতিচ্ছবি। কিন্তু সংস্কৃত কাব্য বা নাট্যসাহিত্যে বিয়োগান্ত বা দুঃখবাদের স্থান কই? রামায়ণ ও মহাভারতের সুখ-দুঃখ, আশা

নিরাশা ইত্যাদিও তাই নায়ক-নায়িকা বা ব্যক্তি-বিশেষের সুখ-দুঃখের অনুভূতি নয়। কেন না, তারা 'কোন একলা কবির কথা নয়, বৃহৎ সম্পাদকেরই কথা।' 'প্রাচীন সাহিত্যে' রামায়ণ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

এক শ্রেণীর কবি আছে যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে, আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানুষের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিকে মহাকবি বলা হয়। সমগ্র দেশের, সমগ্র জাতির সরস্বতী ইঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকেন—ইঁহারা যাহা রচনা করেন, তাহাকে কোন ব্যক্তি-বিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় যেন তাহা বৃহৎ বনস্পতির মত দেশের ভূতল-জঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়-ছায়া দান করিয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলা-কুমারসম্ভবে বিশেষভাবে কালিদাসের নিপুণ হস্তের পরিচয় পাই। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায়। তাহারা ভারতেরই—ব্যাস-বাল্মীকি উপলক্ষ মাত্র।'

রামায়ণ-মহাভারত ভারতেরই জাতীয় সম্পদ। যুগ যুগ ধরে এ দুই মহাকাব্য তুলে ধরেছে ভারতের মর্মকথাকে। ভারতের প্রাণধারাকে করে এসেছে অমৃত ধারায় সিঞ্চিত। ভারতীয় সমাজ-জীবনের প্রতিটি ছত্রে তাই এ দুই গ্রন্থের প্রভাব অপরিসীম। রামায়ণ-মহাভারতের আদর্শ চরিত্র আজ পর্যন্ত পথ নির্দেশ করে আসছে ভারতীয় জীবন সত্তাকে অভ্রান্তভাবে। রামের মত পুত্র, লক্ষ্মণের মত ভ্রাতা, সীতার মত পতিব্রতা পত্নী, হনুমানের মত সেবাব্রতী, সত্য রক্ষায় ভীষ্ম, দানধর্মে কর্ণ, ধর্মে যুধিষ্ঠির এবং মানবতার প্রতীক মহাভারতের পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি বহু চরিত্র আজিও ভারতীয় মানসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রকৃতপক্ষে ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রয়োগক্ষেত্র এই দুই মহাকাব্য। আর্য ও অনার্য এই দুই সভ্যতা ও কৃষ্টির মিলন ঘটেছে রামায়ণে।

বাল্মীকি রামায়ণে সূর্য বংশের ইতিহাস ও বিশেষভাবে রঘুকুল-চূড়ামণি রামচন্দ্রের চরিতকথা শ্লোকছন্দে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ভাষা তার সহজ-প্রাঞ্জল; প্রসাদগুণশালী ও সুমধুর। এবং বৈদর্ভ রীতিতে রচিত। ঘটনা বিন্যাসে, চরিত্র চিত্রণ ও নৈসর্গিক বর্ণনায় আদি কবির

প্রতিভা লোকোত্তর। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি জীবন্ত ও স্বাভাবিক। কোথাও তিনি গুরু বা শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। নেপথ্যে থেকেই শুধু চাবিকাঠি নেড়ে গেছেন। লোকশিক্ষা দানের শক্তি তাঁর অনন্যসাধারণ। দক্ষিণাপথের নিবিড় অরণ্যানী, চিত্রকূট পর্বতের অপরূপ শোভা, দণ্ডকারণ্য, তাপস মুনির আশ্রম, সেতুবন্ধের ফেনিল লবণাম্বু-রাশির অনিন্দনীয় রূপটি নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে এই আদি কাব্যে। রামচন্দ্রের পরিচয় অসুরবিজয়ী রাবণ বধে নয়। পরিচয় তাঁর রাজধর্মে —সুবিচার ও প্রজারঞ্জনে। প্রজারা রাজ-রানী সীতার নামে কলঙ্ক রটনা করছে দেখে, তিনি তাদের বিচার করতে যান নি। বরং প্রজাদের তুষ্টি-বিধানের জন্য প্রিয়তমা পত্নীকে বিসর্জন দিতে কসুর করেন নি। প্রজা-বৎসল রাম-চরিত্রের এখানেই বৈশিষ্ট্য।

কথায় বলে, 'যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে',—মহাভারত সত্যিই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক ঐশ্বর্যভাণ্ডার। পঞ্চম বেদও তাকে কেউ কেউ বলে থাকেন। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ-কাহিনীই মহাভারতের প্রধান বিষয়-বস্তু। বেদের বহু দেবত্ববাদ, উপনিষদের অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, একেশ্বরবাদ ইত্যাদি একাধারে সব কিছুরই সন্ধান মেলে এই মহাগ্রন্থে। শ্লোকসংখ্যা তার এক লক্ষের মত। আঠারো পর্বে বিভক্ত। বীর রসই মহাভারতের প্রধান রস। কিন্তু শত যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেও শান্তির ললিত বাণীই অনুরণিত হয় মহাভারতের প্রতি ছত্রে ছত্রে। অমর কবি বেদব্যাসের এখানেই কলা-নিপুণতার পরিচয় রয়েছে।

মহাভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধ্যায় (ভীষ্ম পর্বের অন্তর্ভুক্ত) ভগবদ্-গীতা। ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও মননশীলতার শ্রেষ্ঠতম প্রতীক। ভারতীয় সংস্কৃতির মুকুর। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব ও কৌরবগণ যুদ্ধার্থ সমবেত হলে অর্জুনের মন আপন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের হত্যা সম্ভাবনায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তখন বিভ্রান্ত অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে কথোপকথন, তাই গীতার সূচনা। ফলাফলের দিকে না তাকিয়ে কর্মেই তোমার অধিকার—কর্ম-জড়তা ত্যাগ করে কাজ করে যাওয়াই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই বুঝি গীতার মূল কথা। সাম্প্রদায়িকতা শিক্ষাদান তার লক্ষ্য নয় রচিত হবার আড়াই হাজার বছর পরও আজ তাই এই গ্রন্থের মূল সুর অম্লান, অভ্রান্ত ও অমোঘ।

শঙ্করাচার্য ('গীতাভাষ্য' —৮ম শতাব্দী), অভিনব গুপ্ত (১০ম শতক), শ্রীধর স্বামী (১২ শতক), রামানুজ (১৩শ শতাব্দী), নীলকণ্ঠ (১৬শ শতক), মধুসূদন সরস্বতী (১৭ শতক) এবং লোকমান্য তিলক, শ্রীঅরবিন্দ ও মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি বহু মনীষীই ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা বা টীকা রচনা করে গেছেন। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের মূল ভিত তো গীতার মধ্যেই নিহিত।

মহাকাব্যের সময় নিরূপণ করা অবশ্য কঠিন। পণ্ডিত জওহরলালের কথায়, "তাতে আছে সেই পুরাতন যুগের কথা যখন আর্যরা ভারতে বসবাসের ব্যবস্থা করতে ও সমস্ত গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। সহজেই জানা যায় যে, বহু লেখক এগুলিতে কিছু কিছু করে লিখেছেন, কিংবা কালে কালে আপনাদের রচনা যোগ করে দিয়েছেন। রামায়ণ মহাকাব্যের বিশেষত্ব এই যে, এর রচনায় একটা ঐক্য দেখা যায়। মহাভারত একখানি বিরাট গ্রন্থ, নানা বিষয়ে প্রাচীন কথার সমষ্টি। এই দুখানি গ্রন্থই নিশ্চয় বৌদ্ধ যুগের আগেই রূপ গ্রহণ করেছিল, যদিচ বুদ্ধ-পরবর্তীকালে কিছু কিছু অংশ এই বই দুটিতে যুক্ত করা হয়েছে।" ['ডিস্‌কভারি অব্ ইণ্ডিয়া' : ১৩ : মহাভারত।]

রামায়ণ যদিও মহাকাব্যরূপে মহান এবং জনপ্রিয়, মহাভারতই জগতের সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলির একটি। বিরাট এ গ্রন্থ জনশ্রুতি, কাহিনী, প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন প্রভৃতির বিশাল বিশ্ব-কোষ।

ভগিনী নিবেদিতা (মার্গারেট নোবল্) মহাভারত সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন 'বিদেশী পাঠক দুইটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন। একটি হোল বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ; আর একটি হোল এর মধ্যে বরাবর পাঠকের মনে ভারতের একত্বের ধারণা জাগাবার প্রচেষ্টা। এবং দেশের বীরত্বব্যঞ্জক ঐতিহ্য সকল সময়ে সংগঠন এবং প্রেরণা দান।'

পরবর্তীকালের সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে বিশেষ করে সংস্কৃত নাটক ও কাব্যে এই দুই মহাকাব্যের প্রভাব কতখানি ব্যাপক, নীচের এই তালিকা থেকে জানা যায়। মহাকবি ভাসের অভিষেক নাটক ও প্রতিমা নাটক ; কালিদাসের রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব কাব্য ; ভবভূতির মহাবীর চরিত ও উত্তর রামচরিত নাটক ; ভর্তৃহরির ভট্টিকাব্য ; কুমার

দাসের জানকী-হরণ কাব্য ; চক্র-কবির জানকী-পরিণয় কাব্য ; অভিনন্দ ও সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত ; শক্তি ভদ্রের আশ্চর্য চূড়ামণি ; জয়দেবের প্রসন্ন রাঘব ; রাজশেখরের বালরামায়ণ ; দামোদর মিশ্রের হনুমান নাটক ; ক্ষেমেন্দ্রের রামায়ণ-মঞ্জরী ; নীলকণ্ঠ দীক্ষিতের গঙ্গাবতরণ ; রূপনাথ উপাধ্যায়ের রাজবিজয় প্রভৃতি বহু কাব্য ও নাটক রচিত হয় রামায়ণ অবলম্বনে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে লেখা অশ্ব ঘোষের বুদ্ধচরিতেও রামায়ণের প্রভাব আছে বলে পণ্ডিতদের বিশ্বাস।

এত গেল শুধু রামায়ণের কথা। মহাভারত অবলম্বনে রচিত প্রধান সংস্কৃত সাহিত্য-সম্পদের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় : ভাসের পঞ্চ-রাত্র, দূত-বাক্য, কর্ণভার ও উরুভঙ্গ ; কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, বিক্রমোর্বশীয় নাটক ; ভারবির কিরাতার্জ্যুনীয়ম্ ; মাঘের শিশুপাল বধ মহাকাব্য ; শ্রীহর্ষের নৈষধীয় চরিত ; ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার নাটক ; কুলশেখর বর্মার তপতী সংবরণ ও সুভদ্রা-ধনঞ্জয় নাটক ; নীলকণ্ঠ দীক্ষিতের নলচরিত্র নাটক ইত্যাদির।

এ ছাড়া আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে রামায়ণ-মহাভারতের প্রচারের কথা তো ছেড়েই দেওয়া গেল এখানে। দ্বীপময় ভারত জাভা ও বলি দ্বীপের প্রচলিত কবি-ভাষায় রচিত 'রাম কিউন' বা রামায়ণের কাহিনী এখানে লিপিবদ্ধ আছে। আর ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে 'সম্মুখ সমরে পড়ি—বীরচূড়ামণি বীরবাহু' বলে অমিত্রাক্ষর ছন্দের যে কাব্য আরম্ভ করেছিলেন কবি শ্রীমধুসূদন তার উৎসও ছিল এই রামায়ণ (যদিও বাল্মীকির চাইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণেই তিনি তাঁর কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন।) এবং তুলসী দাসের 'রামচরিত মানস' পাঠ করে যত লোক এযাবৎ অশ্রু-বিসর্জন করেছে, তত লোক বাইবেল পাঠ করেছে কিনা সন্দেহ।

সংস্কৃত নাটক

প্রাচীন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল একটি অধ্যায় রূপায়িত হয়েছিল নাটকখানিতে। ক্ষয়িষ্ণু নগর সভ্যতার একটা দিক্।

স্থান : রাজধানী উজ্জয়িনী। কাল : অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, গুপ্তযুগের শেষার্ধ।

নাটকের প্রধান নায়ক শ্রেষ্ঠী চারু দত্ত। মহানগরী উজ্জয়িনীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবক। দয়ার্দ্রচিত্ত। সচ্চরিত্র। নায়িকা উজ্জয়িনীর সুন্দরী রাজনটী বসন্তসেনা। চারুদত্তের 'গুণানুরক্তা গণিকা।' কিন্তু রাজার শ্যালক 'সংস্থানক শকার' সুন্দরী বসন্তসেনাকে বিয়ে করতে চান ভুলিয়ে-ভাগিয়ে জোর করে। কিন্তু বসন্তসেনা তাতে নারাজ। ঈর্ষাপরবশ ব্যর্থ প্রণয়ী কর্তৃক তখন প্রণয়িনীকে হত্যার প্রচেষ্টা। আর এ চক্রান্তে নিরপরাধ ব্রাহ্মণ-কুমার চারুদত্ত হোল কারারুদ্ধ। রাজনটীর হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। অবশেষে ঘটনাচক্রে বসন্ত-সেনার জীবনরক্ষা এবং সত্য ঘটনার প্রকাশ। আর চারুদত্তের মুক্তিলাভ। নায়ক-নায়িকার মিলন ও পরিণয়। একটা মৃচ্ছ-কটিক বা গাড়ি-বিভ্রাটকে কেন্দ্র করেই এই অতি-নাটকীয় রোমাঞ্চকর ঘটনা-সমাবেশ। একাধারে প্রেম ও ঘৃণা, মহৎ ও নীচ চরিত্র, হাস্য ও করুণ রসের অনাস্বাদিত ব্যঞ্জনা; বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত পরস্পর বিরোধী ভাবাবেগের অপূর্ব সংমিশ্রণ। নাগরিক সভ্যতার অন্যতম প্রতীক দ্যূত-ক্রীড়া, চুরি-রাহাজানি, দাসত্ব-প্রথা, বিলাস-বিলাসিতা রাজ-আত্মীয়ের অপকীর্তি, বিচার-বিভ্রাট এবং ন্যায়ধর্ম ও স্বাধীনতার উপাসক বিদ্রোহী রাখাল আর্যক কর্তৃক রাজ পরিবর্তন ইত্যাদি নাগরিক জীবন-ধারার নানান চিত্রই নিপুণ হস্তে তুলে ধরা হয়েছে দর্শকের সামনে এই দৃশ্য কাব্য 'মৃচ্ছকটিকে।'

'মৃচ্ছকটিক' যে যুগে লেখা সে যুগে ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্র ভাব-প্রতিপত্তি ছিল বিস্তর। কিন্তু বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কোনরূপ রেষারেষি বা বিদ্বেষভাব ছিল বলে প্রমাণ মেলে না নাটকখানির কোথাও। তা ছাড়া, 'নীচকুলে জন্মগ্রহণ করলেই নীচু হয় না; 'ধর্মার্জন উঁচু-নীচু সকল জাতীয় লোকেরই সাধ্যায়ত্ত ও সাধনা-সাপেক্ষ; 'শরণাগতজনকে আশ্রয় দান করবে;' 'অপরাধীকে উপকারের দ্বারা জয় করবে' ইত্যাদি বৌদ্ধ নীতিতত্ত্বগুলি এই নাটকে জীবন্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে দেখা যায়। তাই দেখি, বারাঙ্গানাকুলে জন্মেও গণিকা বসন্তসেনা নানান সদ্‌গুণে বিভূষিতা, রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেও 'শকার' যারপরনাই নীচ-ভাবাপন্ন, 'স্থাবরক' দাস হয়েও বৌদ্ধধর্ম পরায়ণ এবং 'শর্বিলক' ব্রাহ্মণকুলে জন্মেও চুরি কাজে রত।—[মৃচ্ছকটিক : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত অনুবাদ।]

'মৃচ্ছকটিক' দশ অঙ্কের ; শূদ্রক এর লেখক বলে পরিচিত। কিন্তু রাজা শূদ্রক যে কে ছিলেন, তা পুরো জানা যায় না। মৃচ্ছকটিকের মঙ্গলাচরণ ও প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা থেকে এটুকু বলা যায়, তিনি একজন রাজা ছিলেন এবং ধর্মে ছিলেন শৈব। বহু শাস্ত্রবিশারদ বলেও উল্লেখ আছে মৃচ্ছকটিকে। তাঁর কাল আর জন্মস্থান সম্পর্কে কিন্তু নানা পণ্ডিতের নানা মত। রাজা শূদ্রক তৃতীয় কি ষষ্ঠ যে শতকেই জন্মগ্রহণ করে থাকুন, তাঁর রচিত 'মৃচ্ছকটিক' সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটক। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়োপযোগী নাট্যকলা নৈপুণ্যের দিক থেকে অতি উচ্চাঙ্গের। এমনিতর নাটক সংস্কৃত ভাষায় দ্বিতীয় আর একখানি আছে কিনা সন্দেহ। ইয়োরোপএর বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদও হয়েছে এবং লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক ও মস্কোর পুস্কিন রঙ্গমঞ্চে তার সাফল্যজনক অভিনয়ও অনুষ্ঠিত হয়েছে। হাজার হাজার মুগ্ধ দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে বহুবার। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে নিউ ইয়র্ক শহরে মৃচ্ছকটিকের অভিনয় দেখে সুবিখ্যাত নাট্যকলা সমালোচক জোসেফ্ ক্রাচ্ (Joseph Krutch) 'দি নেশন' পত্রিকায় লিখেছিলেন :

'নিছক তত্ত্বের খাতিরে যাকে 'বিশুদ্ধ নাট্যকলা' বলা হয়ে থাকে তারই খাঁটি পরিচয় পাবে এই নাটকে দর্শকেরা। কেননা, নাটকখানি সম্পূর্ণ অবাস্তব অথচ অদ্ভুত প্রাণময় ও গতিশীল। শুধু বাস্তবানুগ নয়, সম্পূর্ণ বাস্তবও। যিনি এর রচয়িতা—তিনি চতুর্থ কি অষ্টম শতকের যে যুগেই বাস করুন না কেন—তিনি ছিলেন প্রকৃত হৃদয়বান এবং জ্ঞানী। তাঁর রচনায় যে অকৃত্রিম সহানুভূতির স্পর্শ পাওয়া যায়, তা নীতি-কথার নিছক উক্তি নয়। অকপট সমবেদনা ও আন্তরিকতার গুণে সমুজ্জ্বল। এমন সৃষ্টি কেবল সে যুগেই সম্ভব, যে যুগ আত্মস্থ হবার চেষ্টা করছে ; যুগ সমস্যা মীমাংসার পথে প্রকৃতই যা মহৎ, যা সহিষ্ণু, যা শান্ত-উদার তার অনুসন্ধানে রত। শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' এবং 'ওথেলো' যত মহৎ ও দুর্ধর্ষ বীরপুরুষই হোক না কেন, তারা বর্বর।...

জোসেফ ক্রাচ্-র আপন জবানিতে : 'Macbeth and Othello, however, great and stirring they might be, are barbarous heroes, because the passionate tumult of Shakespeare is the tumult produced by the conflict

between a newly awakened sensibility and a series of ethical concepts inherited from the savage age. The realistic drama of our own days is a product of a like confusion, but when the problems are settled and when passions are reconciled with the decisions of an intellect then form alone matters. Nowhere in European part do we find, this side of the classics, a work more completely civilised'.

('দি ক্লাসিক্যাল ইণ্ডিয়ান ড্রামা': 'মার্চ অব ইণ্ডিয়া'—৮ম খণ্ড, ১১ সংখ্যা।)

সংস্কৃত সাহিত্যের সেরা নাটক শূদ্রকের এই মৃচ্ছকটিক ভাসের 'চারু-দত্ত' অবলম্বন করেই রচিত। ভাসের এই নাটকখানি অসম্পূর্ণ। তার প্রথম ও শেষের দিকের শ্লোকগুলি পাওয়া যায়নি। কিন্তু আখ্যান-ভাগে দু' খানি নাটকের আশ্চর্যজনক মিল দেখা যায়। তাই 'চারুদত্ত'ই পরবর্তীকালে 'মৃচ্ছকটিকে' পরিবর্ধিত হয়েছে বলে পণ্ডিতদের বিশ্বাস।

বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে (১৯০৯-১২) পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী ভাসের নাটকগুলি 'স্বপ্ন বাসবদত্তা', 'চারুদত্ত,' 'প্রতিমা নাটক' ইত্যাদি) পুনরুদ্ধার করে প্রকাশিত করেন। ভাসকে তিনি পাণিনি এবং বুদ্ধ-দেবের আগেকার বলে নির্দেশ করেছেন। সংস্কৃত মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারতের পরে ভাসের নাটকগুলিই যে প্রাচীন তা অধিকাংশ পণ্ডিতই মনে করেন। কালিদাস, বাণভট্ট, রাজশেখর প্রভৃতি অনেকেই নাট্যকবি ভাসকে প্রসিদ্ধ নাট্যকার বলে স্বীকার করে গেছেন। ভাসের নাটকগুলি সহজ সরল এবং দীর্ঘ সমাসহীন। বৈদর্ভী রীতিতে লেখা। উপাদান সংগৃহীত রামায়ণ-মহাভারত, বৃহৎকথা প্রভৃতি থেকে। চরিত্রগুলিও অশ্লীলতা দোষবর্জিত। 'স্বপ্ন বাসবদত্তা'ই ভাসের শ্রেষ্ঠ নাটক। নায়ক বৎসরাজ উদয়ন ও নায়িকা অবন্তী রাজকন্যা বাসবদত্তার গভীর প্রেম ও মিলন এই নাটকের প্রধান উপজীব্য। শূদ্রক, কি কালিদাসের অসাধারণ কাব্য ও নাট্য-প্রতিভা প্রাচীন নাট্যকবি ভাসের না থাকলেও তাঁর সহজ নাটকগুলি ছিল জনসাধারণের প্রিয়।

ভাসের পরে উল্লেখ করতে হয় অশ্বঘোষের নাম। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধ

চরিত'ই বোধ হয় খৃষ্টীয় প্রথম শতকের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত রচনা। তিনি রাজা কনিষ্কের গুরু ছিলেন। সুতরাং তাঁর সময়কার। 'বুদ্ধ-চরিত' ছাড়াও তিনি সূত্রালঙ্কার, বজ্রসূচী, সৌন্দরানন্দ কাব্য প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তুরফান নামক স্থানে অতি প্রাচীন তালপাতার উপর লেখা 'শারিপুত্র প্রকরণ' নামক অশ্বঘোষের রচিত একখানি অসম্পূর্ণ নাটকও সম্প্রতি পাওয়া গেছে। এই প্রকরণখানি ৯ অঙ্কের। এবং ভরত নাট্যশাস্ত্রের রীতি অনুসৃত। পরিশেষে ভরতবাক্যও ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষা তার অশোকস্তম্ভের অর্ধমাগধী প্রাকৃত।

অশ্বঘোষের পরই সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগের সুরু। 'কবিকুল-চূড়ামণি' কালিদাস, শ্রীহর্ষ, বাণভট্ট, ভারবি, ভবভূতি প্রমুখ সংস্কৃত কাব্য ও নাটকের দিকপালগণ এই যুগেই করেন জন্মগ্রহণ। তাঁদের অপূর্ব সৃজনি-প্রতিভা সংস্কৃত সাহিত্যকে তুলে ধরেছে বিশ্ব-সাহিত্যের উচ্চতম আসনে। এক কালিদাস সম্পর্কেই বিদ্যাসাগর বলেছেন : 'তিনি (কালিদাস) সংস্কৃত ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট নাটক, সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য লিখিয়া গিয়াছেন।' আর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কালিদাসের 'শকুন্তলার মতো এমন প্রশান্ত গম্ভীর, এমন সংযত সম্পূর্ণ নাটক শেক্‌স্পিয়রের নাট্যাবলীর মধ্যে একখানিও নাই।···মূক প্রকৃতিকে কোন কোন নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান—এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধ করি সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই।'

'মালাবিকাগ্নিমিত্র' (যদিও কালিদাসের প্রথম জীবনের রচনা), 'বিক্রমোর্বশীয়' ও 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' বাণীর বরপুত্র কালিদাসের এই তিনখানি অমূল্য রত্নই তার সাক্ষ্য।

কালিদাসের সমকালীন বা ঠিক পরবর্তী কালের কোন উল্লেখযোগ্য নাটক বা নাট্যকারের বড় সন্ধান পাওয়া যায় না। কালিদাসের অসাধারণ প্রতিভা-ভাস্করের নিকট হয়তো তাঁরা ম্রিয়মান হয়ে থাকবেন। কালিদাসের সমকালীন বলে বিবেচিত একখানি প্রাচীন নাটক সেদিন মুদ্রিত হয়েছে। নাটকখানির নাম : 'কুন্দমালা'; নাট্যকার বৌদ্ধাচার্য কবি দিঙ্‌নাগ। 'সাহিত্যদর্পণাদ্দি' গ্রন্থে এ নাটকের উল্লেখ রয়েছে। মল্লিনাথের মেঘদূতের ভাষ্যে কবি দিঙ্‌নাগকে কালিদাসের প্রতিপক্ষ বলে বলা

হয়েছে। কুন্দমালা ছয় অঙ্কের। সীতার বনবাসই এ নাটকের বিষয়বস্তু।

শিল্পনৈপুণ্যের দিক থেকে কালিদাসের পর শ্রীহর্ষ বা কান্যকুব্জরাজ হর্ষবর্ধনের নাটক 'রত্নাবলী', 'প্রিয়দর্শিকা' আর 'নাগানন্দ'র নাম উল্লেখযোগ্য। এ তিনখানি নাটকেই শ্রীহর্ষের নাট্যপ্রতিভা ও কাব্য-সম্পদের প্রত্যক্ষ পরিচয় মেলে। অবশ্য কোন কোন সমালোচক এ নাটক-গুলি হর্ষবর্ধনের সভাকবি ধাবকের রচনা বলে অনুমান করেন। 'রত্নাবলী' ও 'প্রিয়দর্শিকা' নাটক দুখানিই ৪ অঙ্কের। এবং নাটক দুখানির নায়ক হলেন বৎসরাজ উদয়ন। তাঁর প্রণয়-কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে নাটক দুখানিতে। সিংহল রাজদুহিতা রত্নাবলীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহই রত্নাবলীর বিষয়বস্তু। 'নাগানন্দে' (৫মাঙ্ক নাটক) বৌদ্ধ জীমূতবাহনের আত্মত্যাগের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 'বৃহৎকথা' থেকে তার আখ্যায়িকা নেওয়া। শ্রীহর্ষের ভাষা সহজ ও প্রাঞ্জল এবং সংযত।

'মত্তবিলাস' হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক কালে রচিত একখানি প্রহসন। দাক্ষিণাত্যের পল্লবরাজ কর্তৃক প্রণীত।

'উত্তররামচরিত', 'মালতীমাধব' আর 'মহাবীরচরিত' নাটকের যশস্বী নাট্যকার ভবভূতির (পুরো নাম শ্রীকণ্ঠ নীলকণ্ঠ) স্থান সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যে কালিদাসের সমপর্যায়ে। অপূর্ব কবিত্ব-শক্তির মহড়ায় দুজনেই অতুলনীয়। উত্তররামচরিতের আলেখ্য দর্শনাঙ্ক সংস্কৃত সাহিত্যে সত্যি এক অভিনব সৃষ্টি। রামায়ণের উত্তরকাণ্ড থেকে অনুগৃহীত বলে নাটকের তাই নামকরণ হয়েছে। ভবভূতির 'মহাবীর-চরিতে'র শেষাংশ বলে তাকে উত্তরচরিতও বলা হয়।

'মুদ্রারাক্ষস' (বিশাখাদত্ত বা বিশাখদেব লিখিত) সংস্কৃত সাহিত্যের আর একখানি অভিনব নাটক। ঐতিহাসিক ঘটনা—রাজনৈতিক বিপ্লব অবলম্বনে ৭ অঙ্কের এই নাটকখানি। চাণক্য পণ্ডিতের সহযোগিতায় চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক নন্দবংশ ধ্বংস করে মৌর্যরাজ প্রতিষ্ঠা করাই এ নাটকের বিষয়বস্তু। ভাষা স্বাভাবিক ও ওজস্বী। চাণক্য, রাক্ষস, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি চরিত্রগুলি যেন প্রাণময় আলেখ্য। এ শ্রেণীর রাজনৈতিক নাটক খুব বড় একটা নেই। কৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'ও আর একখানি নতুন শ্রেণীর অপূর্ব নাটক। অদ্বৈত বৈষ্ণব মতের সমর্থনই এ রূপক

নাটকের মূল লক্ষ্য। বিবেক, মোহ, প্রবোধ, বিদ্যা, বৈরাগ্য প্রভৃতি মানবচিত্তের বিভিন্ন দিক হোল তার নায়ক-নায়িকা।

এ ছাড়া দামোদর মিশ্রের 'মহানাটক' (হনুমান নাটক), ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ড-কৌশীক' নাটক, বিহ্লন কবি ('কর্ণ-সুন্দরী' নাটিকা), জয়দেবের ('গীতগোবিন্দ' রচয়িতা থেকে ভিন্ন) "প্রসন্ন-রাঘব' প্রভৃতি নাটক এবং ভট্টনারায়ণ, অনঙ্গহর্ষ ('তাপসবৎসরাজ') মায়ুরাজ, মুরারি, রাজশেখর ('বলিভারত', 'কর্পূর-মঞ্জরী' ইত্যাদি) প্রমুখ নাট্যকারগণের রচনা সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যকে বহু দিক দিয়ে করেছে সমৃদ্ধ। সৌমিল্ল, কবিপুত্র প্রভৃতি অপর সুপ্রাচীন নাট্যকারগণের নামও কালিদাস তাঁর মালবিকাগ্নি-মিত্রের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করেছেন।

প্রাচীন ভারতে নাট্য সাহিত্যের যে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ ঘটেছিল তার প্রকৃষ্ট পরিচয় একাদশ শতকে রচিত 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থখানি (পণ্ডিত বিশ্বনাথ কৃত)। আঙ্গিকের দিক থেকেও তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মেলে। তাই পরিশেষে উদ্ধৃতিবিশেষ মারফত এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করি :

'আধুনিক ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকেই শেক্স্পিয়রের নাটকের সঙ্গে অল্পাধিক পরিচিত, আমি তাঁদের মৃচ্ছকটিক পড়তে অনুরোধ করি। আমাদের দেশের নাট্যকার শেকৃস্পিয়রের প্রায় এক হাজার বৎসর পুর্বে কি রকম সুন্দর নাটক লিখেছেন তা দেখে নিশ্চয়ই মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসবে।'

সংস্কৃত কথা-সাহিত্য

চটুল রহস্যপ্রিয়া রাজরাণী। বয়সেও নবীনা। মহারাজের সঙ্গে জলকেলি করছিলেন একদা। রাজার গায়ে খানিকটা জল ছিটিয়ে দিয়ে কৌতুকভরে বলে উঠেছিলেন :

'মোদকং দেহি মে রাজন্।'

বিদুষী ভার্যা। জলক্রীড়া করে করে বুঝি ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছেন তাই মোদক অর্থাৎ মিষ্টান্ন চাচ্ছেন রাজ সমীপে। সাতবাহন-রাজ তাই রাণীর জন্য মিষ্টান্ন আনতে হুকুম করেছিলেন পার্শ্বচরদের।

মিষ্টান্ন দেখে রাণী তো হেসে খুন। গায়ে জল ছিটিয়ে রাজা কোথায় মজা করবেন, তা না, তার পরিবর্তে মিষ্টান্ন। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ

সাতবাহন রাজও কম অপ্রস্তুত হননি। লজ্জায় মাথা হোল তাঁর অবনত। সাতবাহন রাজ তখন সহজ সংস্কৃত শিক্ষার জন্ম ব্যাকরণ রচনা করতে নির্দেশ দেন পণ্ডিত শর্ববর্মণের উপর। শর্ববর্মন তখন কাতন্ত্র ব্যাকরণ প্রণয়ন করলেন। কবি গুণাঢ্যর মাথায়ও জিদ চাপল। সংস্কৃত ব্যাকরণ ছাড়া বিশুদ্ধ কথ্য ভাষায় কি পারঙ্গম হওয়া যায় না? কবি গুণাঢ্য রচনা করলেন তখন এক অপরূপ কথা-সাগর। নাম দিলেন 'বৃহৎকথা'। ভারতীয় কথা-সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ। আদি উপাখ্যান। দণ্ডাচার্য তাঁর 'কাব্যাদর্শে' গুণাঢ্যের এই বৃহৎকথাকে "ভূতভাষাময়ীং প্রাহুরদ্ভুতার্থং বৃহৎকথাম্" বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর বাণভট্ট তাঁর 'হর্ষচরিতে' এ গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখেছেন: "হরলীলেব নো কস্য বিস্ময়ায় বৃহৎকথা।"

'বৃহৎকথা'র মূল গ্রন্থ অবশ্য আজ নেই। কালের করাল গ্রাসে ধ্বংস হয়ে গেছে। সহজ কথ্যভাষা প্রাকৃতেই লিপিবদ্ধ হয়েছিল এই আদি আখ্যায়িকামালা। বিন্ধ্য গিরির দক্ষিণ পাদদেশবর্তী অপেক্ষাকৃত সংস্কৃত-ঘেঁষা পৈশাচী প্রাকৃতে।

পৈশাচী কথ্যভাষায় 'বৃহৎকথা'র মূল গ্রন্থের সন্ধান না মিললেও পরবর্তী কালে তার বিভিন্ন সংস্কৃত অনুবাদের হদিস মেলে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে গঙ্গা রাজ দুর্বিনীতই প্রথম 'বৃহৎকথা' সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করে রাখেন বলে জানা যায়। অবশ্য সোমদেবের 'কথা সরিৎসাগর' বৃহৎকথার প্রামাণ্য পুস্তক বলে প্রসিদ্ধ। কাশ্মীরের রাজা অনন্তর বিদুষী মহিষী সূর্যমতীর চিত্তবিনোদন উদ্দেশ্যে সোমদেব (খৃষ্টীয় ১১শ শতক) 'বৃহৎকথা' 'কথাসরিৎসাগর' নামে ভাষান্তরিত করেন। সোমদেবেরও পূর্বে ক্ষেমেন্দ্র 'বৃহৎ কথামঞ্জরী' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন গুণাঢ্যকে অবলম্বন করে। ক্ষেমেন্দ্রর 'বৃহৎ কথামঞ্জরী'র শ্লোক সংখ্যা সাত হাজারের উপর। তবে তাঁর কথামঞ্জরীগুলি অনেকটা যেন খাপছাড়া খাপছাড়া এবং কাহিনী-গুলিও অনেকাংশে সহজবোধ্য নয়। সোমদেবের 'কথা-সরিৎ-সাগরের' মোট শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২২ হাজারের মত এবং ১২৪টি তরঙ্গে বিভক্ত। গোড়ার দিকে কবি গুণাঢ্যের জন্মবৃত্তান্তও রয়েছে। গুণাঢ্য দাক্ষিণাত্যের প্রতিষ্ঠান রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠান নগরে জন্মগ্রহণ

করেন বলে কথিত আছে। পণ্ডিতদের মতে তিনি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক।

'বৃহৎকথায়' গুণাঢ্য তাঁর নিজের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে লিখেছেন:

'......প্রতিষ্ঠান রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত নামে এক নগর আছে। সোমশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতেন। বৎস ও গুল্মক নামে তাঁহার দুই পুত্র এবং শ্রুতার্থা নামে এক কন্যা ছিল। কালক্রমে সোমশর্মা ও তাঁহার ভার্যার লোকান্তর হইলে বৎস ও গুল্মক উভয়ে ভগিনী শ্রুতার্থাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে শ্রুতার্থা অকস্মাৎ গর্ভবতী হইলে বৎস ও গুল্মক উভয়ে হঠাৎ তাঁহার গর্ভচিহ্ন দেখিয়া পরস্পরের প্রতি পরস্পর আশঙ্কা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন শ্রুতার্থা তাঁহাদিগের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,...... এক দিবস আমি স্নানার্থ গমন করিতেছিলাম। পথমধ্যে নাগরাজ বাসুকির ভ্রাতৃপুত্র কুমার কীর্তিসেন আমাকে দেখিয়া পরিচয় প্রদানপূর্বক গান্ধর্ব বিধানানুসারে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।...... শ্রুতার্থার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বৎস ও গুল্মক কহিলেন, ইহা কি প্রকারে প্রত্যয়যোগ্য হইতে পারে। তখন শ্রুতার্থা দুঃখিতান্তঃকরণে নির্জনে বসিয়া স্মরণ করাতে নাগকুমার কীর্তিসেন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া বৎস ও গুল্মককে কহিলেন, আমি ইঁহাকে বিবাহ করিয়াছি।

'তোমরা তিনজনেই শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। শ্রুতার্থার এই গর্ভে এক পুত্র জন্মিবে। সে জন্মিবামাত্র তোমরা শাপ হইতে মুক্ত হইবে। ইহা বলিয়া কীর্তিসেন অন্তর্হিত হইলেন।...এইরূপে কিয়ৎকাল গতে শ্রুতার্থার প্রসবকাল উপস্থিত হইলে আমি ভূমিষ্ঠ হইলাম। আমার জন্ম হইবামাত্র আকাশবাণী হইল যে, এই বালক গুণাবতার, অতএব গুণাঢ্য ইঁহার নাম হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া গুণাঢ্য আমার নাম রাখিয়া মাতা ও মাতুলদ্বয় শাপ হইতে মুক্ত হইয়া শরীর পরিত্যাগ-পূর্বক অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন।

'অনন্তর আমি তথায় বর্ধমান এবং শোকে মুহ্যমান হইয়া ক্রমশঃ দেশ-দেশান্তর ভ্রমণপূর্বক নানা বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া কিয়ৎকাল পরে কতকগুলিন শিষ্য সহিত পুনর্বার সেই সুপ্রতিষ্ঠিত নগরে আসিয়া উপস্থিত

হইয়া দেখি যে কোন কোন স্থানে সামবেদীরা বিহিত বিধানে সাম গান করিতেছে, কোন স্থানে বিপ্রগণ বেদের তাৎপর্য নির্ণয় করিবার জন্য মহা বিবাদ করিতেছে, কোন স্থানে দ্যূত-ক্রীড়ার প্রশংসা করিতেছে, এক স্থানে দেখিলাম বণিকেরা নিজ নিজ বাণিজ্যের কৌশল ব্যক্ত করিতেছে; আমি তথায় দণ্ডায়মান হইবামাত্র একজন বণিক স্বীয় সম্পত্তির কারণ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল। আমিও কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলাম।'—ইত্যাদি। ['বৃহৎকথা': অনুঃ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ। Bengali Family Library, কলিকাতা ১৮৫৮।]

'বৃহৎকথা' কেবল গুণাঢ্যের জন্মবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে ক্ষান্ত হয় নি। বৎসরাজ উদয়ন, মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ, বাসবদত্তা ও তাঁর পরিণয় কাহিনী, পুরুরবা ও উর্বশী ইত্যাদি তার সরস কথা বা আখ্যায়িকাগুলি পরবর্তীকালে বহু কবি ও নাট্যকারের অমর সৃষ্টির রসদ জুগিয়েছে। ভারতের অফুরন্ত গল্প-উপাখ্যানের ভাণ্ডারে রামায়ণ-মহাভারতের মত 'বৃহৎকথা' থেকে সাহিত্য-উপকরণ সংগ্রহ করেছেন—অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন কালিদাস (বিক্রমোর্বশীয়), নাট্যকবি ভাস (স্বপ্ন-বাসবদত্তা), বাণভট্ট (কাদম্বরী), ভবভূতি (মালতী-মাধব), শ্রীহর্ষ (নাগানন্দ) প্রমুখ বাণীর বহু বরপুত্র। তখনকার ভারতের সামাজিক জীবন-যাত্রার (দ্যূতক্রীড়া, বাণিজ্য উদ্দেশ্যে দূরদেশে গমন ইত্যাদি) প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায় 'বৃহৎকথা'র মণিমুকুরে।

বেতাল পঞ্চবিংশতি

'বেতাল পঞ্চবিংশতি'ও এমনি আর একখানি প্রাচীন লোক-সাহিত্য, যার তালবেতালের রোমাঞ্চকর উপাখ্যানের উল্লেখ সোমদেব আর ক্ষেমেন্দ্রের রচনাতে দেখা যায়। ভারতে এমন কোন ভাষা নেই যাতে মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও নবরত্নকে কেন্দ্র করে রচিত অপূর্ব এই গ্রন্থের ভাষান্তর ঘটে নি। 'শুকসপ্ততি' আর 'সিংহাসন দ্বাত্রিংশিকা'র কদর প্রতি ঘরে ঘরে আজও কমেনি। ঘরের পোষা এক শুকপাখীর ৭০টি কাহিনীই লিপিবদ্ধ আছে 'শুকসপ্ততি'তে।

বাণিজ্য উদ্দেশ্যে গৃহস্বামী দীর্ঘকাল অনুপস্থিত। গৃহকর্ত্রীর অভিসারিকা হবার প্রবৃত্তি। তাঁকে নিবৃত্ত করবার জন্যই কল্যাণকামী

শুকপাখীর কথকের এ ভূমিকা। প্রতি রাত্রে গৃহকর্ত্রীকে নিবৃত্ত করবার জন্য সে এমন একটি মজাদার কাহিনী ফেঁদে বসত, যা শেষ হ'তে না হ'তেই রাত্রি হোত অবসান। গৃহকর্ত্রীর আর অভিসারে যাওয়া হোত না। এমনি ৭০টি অপরূপ আখ্যায়িকা। গল্প-ফাঁদার 'শুকসপ্ততি'র এই টেক্‌নিকই পরবর্তীকালে 'আরব্য-রজনী'তে অনুসরণ করা হয়েছে। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র মত 'সিংহাসন দ্বাত্রিংশিকা'ও মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও তাঁর ময়ূর সিংহাসনের নিম্নস্থ ৩২টি পুত্তলিকাকে ঘিরে রচিত হয়েছে লোকপ্রিয় ঐ উপাখ্যানগুলি। শিবদাসের 'কথার্ণব' গ্রন্থেও কপট ও মূর্খদের নিয়ে ৩৫টি সরস কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। জৈন-লেখক রাজশেখর-এর 'প্রবন্ধকেশ', মেরুতুঙ্গের 'প্রবন্ধ চিন্তামণি' কিংবা বিদ্যাপতি ঠাকুরের (চতুর্দশ-শতক) 'পুরুষ-পরীক্ষা' প্রভৃতি বিবিধ রচনাতেও এমনিধারা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর কথা-সাহিত্যের অভাব নেই। রমিলা ও সোমিলা অথবা পঞ্চসিকার 'শূদ্রককথা'-মালাও (দণ্ডির অবন্তীসুন্দরী গৃহীত হয়েছে যার থেকে) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু যে সংস্কৃত কথা-সাহিত্য বিশ্বের দরবারে আপনার আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে তা বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' (অনেক পণ্ডিতের মতে 'হিতোপদেশ'ও)। পৃথিবীর এমন ভাষা অল্পই আছে যাতে 'পঞ্চতন্ত্র' অনূদিত হয় নি বা পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী যাকে অল্প-বিস্তর প্রভাবান্বিত করে নি। ইউরোপে মুদ্রিত প্রাচীনতম পুস্তকাবলীর মধ্যে পঞ্চতন্ত্রও (জার্মান ভাষায় অনূদিত) রয়েছে। ক্ল্যাক্সটন-এর ছাপাখানাতে তার ইংরাজী অনুবাদ মুদ্রিত হয়।

পঞ্চতন্ত্র

জীবজন্তু, পশুপক্ষীর রূপক আলেখ্য 'পঞ্চতন্ত্র'। বনের সিংহ, হাতী, শৃগাল, মৃগ, কাক, পেঁচা প্রভৃতিই তার প্রধান চরিত্র। এটাই তার বৈশিষ্ট্য। বনের সিংহ, হাতী, শৃগাল, কাক প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেই বিষ্ণুশর্মা রাজকুমারদের শিক্ষার জন্য সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় মিত্র-লাভ, সুহৃদভেদ প্রভৃতি পাঁচটি তন্ত্র-আখ্যায়িকা রচনা করেন। নীতিকথা শিখানই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কবে এই আখ্যায়িকাগুলি প্রথম রচিত

হয়েছিল, তা সঠিক করে বলা যায় না। তবে 'পদহীন এই কাহিনীগুলি' লোক মুখে দেশবিদেশে এতদূর ছড়িয়ে পড়েছিল যে খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে প্রাচীন পারস্য (পহলবী) ও সিরীয় ভাষায় তার অনুবাদ হয়। অষ্টম শতাব্দীতে হয় আরবীতে, একাদশ শতকে হিব্রুতে এবং ত্রয়োদশ শতকে হয় স্পেনীয় ও লাটিন ভাষায়। সার টমাস নর্থ ষোড়শ শতকে পঞ্চতন্ত্রের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। পঞ্চতন্ত্রের মূল শ্লোকের সঙ্গে পরবর্তীকালে বহু কাহিনীও সংযোজিত হয়ে পড়ে। তবু পাশ্চাত্য সমঝদারের চোখে ভারতের 'পঞ্চতন্ত্র' হোল :

One Vishnusharman, shrewdly gleaming,
All worldly wisdom's inner meaning,
In these five books the charm compresses
Of all such books the world possesses,

নারায়ণ পণ্ডিতের 'হিতোপদেশ' পঞ্চতন্ত্রেরই পরিবর্ধিত সংস্করণ বলা যায়। তিনিও রাজকুমারদের (পাটলীপুত্ররাজ সুদর্শনের) শিক্ষার জন্য হিতোপদেশের হিতকথাগুলি রচনা করেন। পঞ্চতন্ত্রের অধিকাংশ আখ্যায়িকাই হিতোপদেশে অবিকল গৃহীত এবং অনাড়ম্বর সহজ ভাষায় লিখিত লোক-শিক্ষার উদ্দেশ্যে।

গল্প উপাখ্যানের ভাণ্ডার হোল প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য। বৌদ্ধ জাতক কাহিনীকে বাদ দিলেও ভারতের রামায়ণ-মহাভারত, তার পুরাণ, উপনিষদ প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষার মণি-মঞ্জুষাগুলিতে অফুরন্ত কথা আর আখ্যায়িকা রয়েছে ছড়িয়ে—কথা সরিৎসাগর, বেতাল পঞ্চবিংশতি বা পঞ্চতন্ত্র তো আছেই। জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ভারত। বিশ্বাস করে যে জীব-জন্তু, বনের পশুপক্ষীও মানুষের মত কথা বলতে পারে। চিন্তা করতে পারে, হিতাহিত বিবেচনা করতে পারে। শুক পাখীর মত পারে আপদে-বিপদে সৎ পরামর্শ দান করতে। প্রাচীন ভারতের কথা-শিল্পীরা তাই সিংহ, হাতী, শৃগাল প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ারের মুখ দিয়ে লোক-শিক্ষার জন্য ধর্মকথা, নীতিকথা, অথবা গূঢ় রাজনৈতিক তত্ত্বের অবতারণা করেছেন সহজ সরস গল্পের মাধ্যমে। ভারতের এই 'পদহীন আখ্যায়িকা-গুলি' মুখে মুখে দূর দেশ-বিদেশে পড়েছিল একদা ছড়িয়ে। বিশ্বের গল্প-সাহিত্যকে করেছে তারা প্রভাবান্বিত। আস্বাদ দিয়েছে গল্প-উপাখ্যানের

মারফত চিত্ত বিনোদনের। সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন এই কথা-সাহিত্যের স্থান তাই অনেক উর্ধ্বে।

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

হিস্ট্রী অব্ ইণ্ডিয়ান লিটারেচার : এম. উইন্টারনিজ (অনুঃ এস. কে. টকার)
এ সর্ট হিস্ট্রী অব্ স্যান্সক্রিট লিটারেচার : আর্থার এ. ম্যাকডোনেল
হিস্ট্রী অব্ স্যান্সক্রিট লিটারেচার : এ. বি. কিথ
স্যান্সক্রিট ড্রামা : এ. বি. কিথ
হিস্ট্রী অব্ স্যান্সক্রিট লিটারেচার (১ম খণ্ড) : ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও ডঃ সুশীলকুমার দে
স্টাডিস্ ইন দি হিস্ট্রী অব্ স্যান্সক্রিট পোয়েটিক্স (২য় খণ্ড) : ডঃ সুশীলকুমার দে
এ হিস্ট্রী অব্ সিভিলিজেশন ইন এ্যান্সেণ্ট ইণ্ডিয়া (১ম—৩য় খণ্ড) : রমেশচন্দ্র দত্ত
ঋগ্বেদ সংহিতা (বঙ্গানুবাদ) : রমেশচন্দ্র দত্ত
হিন্দুশাস্ত্র (সংকলিত ও অনূদিত) : রমেশচন্দ্র দত্ত
বৈদিক দেবতা (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ সিরিজ) : শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
হিস্ট্রী অব্ পালি লিটারেচার : ডঃ বিমলাচরণ লাহা
তামিল লিটারেচার : এম. এস. পূর্ণলিঙ্গম পিল্লাই
ভারতের সংস্কৃতি (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ সিঃ) : ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
বেদান্ত-দর্শন (ঐ) : ডঃ রমা চৌধুরী
উপনিষদ (ঐ) : মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী
তন্ত্রকথা (ঐ) : শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
ভারতীয় সাধনার ঐক্য (ঐ) : ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত
সংস্কৃত সাহিত্যের কথা (ঐ) : শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য (ঐ) : ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী
জৈনধর্ম : অমূল্যচন্দ্র সেন
তামিল এইটিন ইয়ারস এগো : ভি. কে. পিল্লাই
স্টাডিস্ ইন তামিল লিটারেচার : ভি. আর. রামচন্দ্র দিক্ষিতার
তিরুকুরল (অনুবাদ) : জি. ইউ. পোপ
কুরল (টীকাসহ অনুবাদ) : শ্রীরাজাগোপালাচারী
ভারত মিলাপ (টীকাসহ অনুবাদ) : ঐ
মণিমেখলাই (ঐ) : ঐ
কম্ব রামায়ণ (আলোচনা) : ভি. ভি. এস্. আয়ার

যুবতী বধূ জল আনতে গিয়েছিল পাহাড়ী ঝরনা থেকে। মাথায় মাটির কলসী। পথে দেখা আপন দয়িতের সঙ্গে। তারপর বিরহ-মিলনের কথা: দয়িতার অভিমান, আর সে অভিমান ভাঙতে নায়কের শত সাধ্য-সাধনা—বিস্তর কাকুতি-মিনতি। তবু কি সহজে নায়িকার মন মিলে? তারপর প্রিয়-সঙ্গর বাড়াবাড়িতেই বুঝি এক সময় মাথার কলসীটি পড়ে গিয়ে ভেঙে যায় টুকরো টুকরো হয়ে।

আর তাই নিয়ে যখন বধূ বাড়ী ফেরে, শাশুড়ী যায় চটে। বিলম্বের হেতু জানতে চায়। টিপ্পনী কাটে। ইঙ্গিত করে, মনের মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিস নাকি? শৃঙ্গার করতে গিয়েই ('প্রথম পানির পরশ' পেয়ে) কলসীটি বুঝি ভাঙল—জল-বাদলায় পা পিছলে পড়ে নয়। বলে: আকাশে নেই আজ মেঘের লেশমাত্রটি; বাজ পড়েনি কোথাও; আমি জানি গো জানি, এ ঠিক 'শুকনো মেঘের বজ্রাঘাত'; তাই ভেঙেছে তোর মাটির কলস—ভেঙেছে 'প্রথম পানির পরশ' লেগে।...

অথবা:

'রাজা গো রাজা, হৃদয় আমার পাগল হয়েছে—পাগল হয়ে গেছি গো আমি তোমার জন্য। গৃহের উত্তপ্ত শয্যা ছেড়ে গেছো তুমি চলে। বনের ফল-মূল তুলে তুমি খাচ্ছো বাইরে ঘুরে ঘুরে—আমায় ফেলে একাকী। ওগো ক্যাপা, এসো গো এসো! চলো আমরা দু'জনে বনে যাই। বনের সবুজ পাহাড় হয়ে গেছে আজ আরো সবুজ: বাঁশ ঝাড়ের মাথায় জড়িয়ে আছে সোনালী পাত: কালিন্দর লতায় ডেকেছে সবুজের বান; খোঁপায় গুঁজেছি আমি দেখো করন্দ ফুল: সন্ধান পাবো আমি আমার রাজার কোন্ বনে গেলে? যে বনেই যাও তুমি, বনের লতাপাতারা তোমায় জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু তোমার কোঁকড়ানো চুলে কে তেল ঢেলে দেবে, ওগো বলো, আমার হারানো পাখি!'

দীর্ঘকাল দেখা নেই। বিরহিণী বধূ আপন দয়িতের অদর্শনে কাতর। বিরহ-কাতর হৃদয়ে তার সন্দেহও দানা বাঁধে। তার হৃদয়ের 'রাজা'

সুপুরুষ। বনের প্রতিটি লতাপাতাই তাকে দু' বাহু বাড়িয়ে যখন জড়িয়ে ধরতে চায়, তখন অপর মেয়েরা কি ছাড়বে? তার কাছ থেকে তাকে নেবে ঠিক ছিনিয়ে। আর কোঁকড়ানো চুলে তেল মাখিয়ে দিয়ে দাম্পত্য অধিকার থেকে তাকে করবে নিশ্চয় বঞ্চিত। তাই আদিবাসিনীর মনের আকুলতা।

মৈকাল পাহাড়ের বিরহিণী কোন আদিবাসিনীর হৃদয়ের আকুলতাটি ফুটে উঠেছে এ গীতি-কবিতায়।

এ-শ্রেণীর 'বিরহ'-গীতি মধ্য ভারতের গোণ্ড আর বৈগা উপজাতির আদিবাসীদের মধ্যেই বিশেষ করে প্রচলিত। সাধারণতঃ এ সব গাওয়া হয়ে থাকে বরের সঙ্গে কনে যখন শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করে তখন অথবা মৃতের দশ দিনের দিন অনুষ্ঠিত ভোজনোৎসবের পর। গাওয়া হয় সবাই মিলে সুর করে। গানের রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই শাল-মহুয়ার বনে কাঁপন তুলে বেজে ওঠে ঢোল-মৃদঙ্গ, তালে তালে শুরু হয় সমবেত নৃত্য।

আগে প্রেম, তবে তো বিরহ। প্রেমিক-যুগলের চোখে মুগ্ধ বিহ্বলতা।

ওগো বধূ, তোমার রূপের 'বাখন' আমি করে উঠতে পারি না। তোমায় দেখে খুশিতে আমি হেসে উঠি উচ্চস্বরে। মাথায় তোমার জলের কলস: কাঁকে তোমার বেতের ঝুড়ি। ফিরে তাকাই আমি তোমার পানে বার বার, রূপসী মেয়ে! ['পাতকূয়া']

নয়নে শুধু বিহ্বল প্রেমের 'নীলাঞ্জন' লাগা নয়, গ্রামের পাতকূয়াকে কেন্দ্র করে গভীর প্রেমের তত্ত্বকথার সুরও অনেক ক্ষেত্রে অনুরঞ্জন তোলে আদিবাসীদের গীতি-কবিতায়। তার ব্যঞ্জনা-মুখর প্রতীকগুলি বিশেষ লক্ষ্য করবার।

যথা:

এই হোল প্রেমের ধারা
পাত্রের গলায় দড়িটি দাও পরিয়ে
তারপর দাও তাকে কূয়োর মধ্যে গড়িয়ে
আর মিটিয়ে নাও তৃষ্ণা তোমার।
গড়িয়ে দাও পাত্রটি
গড়িয়ে দাও পাত্রটি
আর তুলে নাও জল।

আদিবাসী সাহিত্যে এমনি আর একটি প্রতীক হোল প্রদীপ। কামনার চিহ্ন। অনূঢ়া কন্যা প্রেমে পড়েছে সুদর্শন এক স্বগোষ্ঠী যুবকের। কিন্তু এ প্রেম তাদের নিষিদ্ধ। বিয়ে হতে পারে না একই পরিবার-গোষ্ঠীতে। মেয়ে তাই মায়ের কাছে কেঁদে বলছে :

মা গো, আমি কি করি এখন আমার নিষিদ্ধ ভালবাসা নিয়ে? জ্বলন্ত প্রদীপ-শিখায় পতঙ্গটি যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল গো। ['প্রদীপ']

আদিবাসী সাহিত্যের অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে উপকথা আর ঘুমপাড়ানি 'মাসি-পিসি' জাতীয় ছড়া আর গান। তাদের অধিকাংশই মুখে মুখে বাঁধা হয়ে থাকে এবং কাল-পাত্র ভেদে কিছুটা তারতম্য থাকলেও মূল সুরটি কিন্তু তাদের একই। মধ্য প্রদেশের এমনি একটি ঘুমপাড়ানি ছড়া :

'হিরোলি হিরোলি ও দাই সো জাই সো জাই ও
কন্ মারে কন্ গারে দে ও লাধাইতিন্ তোলা নিন্‌ধি আরে ও..'
ইত্যাদি

অর্থাৎ—হিরোলি মা হিরোলি, ঘুমাও তুমি ঘুমাও। কে মারে তোমায়, কে গালি দেয়? ঘুমাও তুমি, ঘুমাও আমার সোনামণি! আমার সোনামণির জন্য বুঝি ডাকছে বাছুরটি; আমার সোনামণির জন্য ভেড়ার ছানাটাকে নিয়ে আয় রে রামুলা!—

['লোকগাথা' : ভেরিয়ার এল্‌উইন্]

দুর্ভিক্ষের গান

শুধু ঘুমপাড়ানি গান কিংবা লোকগাথাই (বিশেষ করে মহাকৌশল-এর—ভেরিয়ার এল্‌উইন্‌কৃত 'ফোক-টেলস্ অব্ মহাকৌশল' দ্রষ্টব্য) নয়, আকাল, মহামারী, বন্যা অথবা দুর্দিন-দুর্যোগের ছাপও পড়েছে এ-সব নিরীহ-নিরুপদ্রব আদিবাসীদের লোক-সাহিত্যে। বিলাসপুরের ১৮৬৮ সালের দুর্ভিক্ষের এমনি একটি গান :

'হায়, কি আর বলবার আছে? ধোপা ছেড়েছে কাপড় ধোয়া; 'রাওয়াৎ' ভুলেছে ধোহা গান। ছেলেরা ছুঁড়ছে ঢিল আর পাটকেল বাড়ীতে বাড়ীতে।

'খানিকটা ফেন ফুটিয়ে নিলাম। কিন্তু তাতে পেটের এক কোণও

ভরল না। তোমার পায়ে গড় করি, মহুয়া, তুমিই মোদের জীবন বাঁচালে।

'হাটে গেনু হাঁড়ি-কুড়ি কিনতে : কাতারে কাতারে লোক দেখি পড়ে আছে পথে-ঘাটে; '৬৮-এর আকালে হায়নারা ছিঁড়ে খেল পথের ধারে পড়ে থাকা মানুষের মাংস। বড় সা'ব আর ছোট সা'ব খুললে লঙরখানা গরীব আদমীদের জন্য। জাত-বিচার নেই কো সেথা। হ্যাংলা ছোট ছোট ছেলে-পিলেদের ছোঁ মেরে নেয় আকাশের চিল। এমনি সময় এলো আদমসুমারির লোক। গাঁ কে গাঁ উজাড় : ভিখিরীর দল মাটির পাত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল গাঁয়ে গাঁয়ে। মুখে শুধু এক রা : 'কেন দে—প্রাণ দে'। কাকগুলো ঠুক্‌রে নেয় নাক ভিক্ষাপাত্র হাতে-বসা শাশুড়ী আর পুত্রবধূর। বড় সা'ব আর ছোট সা'ব বললে : পাথর ভাঙো—মজুরি মিলবে ছ' পয়সা। পরাণে বুঝি বাঁচলাম।...

['ছত্রিশগড়ের লোক-গাতি' : ভেরিয়ার এলউইন্ : পৃঃ ১৬৪]

উনিশ শ' চল্লিশ সালের মহামারীর প্রতিফলনও পড়েছে দেখা যায় এদের সাহিত্যে। লোক-কবির কথায় :

'চল্লিশের মহা আকাল : বাগান রাখো ঘেরা দিয়ে ; দেয়ালের মাঝে মাঝে রাখো ফুটো। বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা বেরিয়েছে ভিক্ষা মাগতে। ঝড়-জলে ভেসে গেছে ক্ষেতের ফসল। শুকিয়ে গেছে সরিষার বীজ। মাটির নীচের ইন্দুরও গেছে পালিয়ে। বিড়াল হয়েছে উধাও।'

[ঐ : এল্‌উইন্]

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-থাকা আদিবাসীদের, বিশেষ করে বিহার, মধ্য প্রদেশ, উড়িষ্যা, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যের এই গ্রামীণ সংস্কৃতি-ধারা এখনো পুরোপুরি সংগৃহীত হয়নি। দৈনন্দিন জীবন শত অভাব-অনটনের মধ্যেও তাদের আনন্দমুখর। সভ্যতার কৃত্রিম বাধা-নিষেধ তাদের জীবনযাত্রাকে এখনও জটিলতর করে তোলেনি পদে পদে। তাই তাদের প্রতিটি উৎসব পান, ভোজন ও নৃত্য-গীতে প্রাণময়। তাদের সংগীত আর নৃত্যের মাধ্যমেই ফুটে উঠেছে কল্পনাশ্রয়ী ভাববিন্যাস। আদি-বাসীদের নাচ-গান ও সাহিত্যের মণি-মুকুরে তাই দেখতে পাই তাদের সজীব মনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ প্রকাশ। উচ্চস্তরের কাব্যানুভূতির পরিচয়ও যে পাওয়া যায় না এমন নয়। উপরের অনূদিত কোন কোন

গান আর কবিতাগুলি তার প্রমাণ। অবশ্য এ সাহিত্য মুখেমুখেই প্রচলিত। লিখিত নয়।

আদিবাসী সাহিত্য ও সঙ্গীত-ধারাকে মোটামুটি সামাজিক ও ধর্মীয় এ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ঋতু পরিবর্তন. কৃষিকর্ম, শস্য-কর্তন, হাট-বাজারের কেনাকাটা প্রভৃতি বিভিন্ন পর্ব ও অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই তাদের যত সব সাহিত্য ও গান রচিত। সুতরাং এ সাহিত্য হোল তাদের প্রেম, অনুরাগ, বিষাদ, হর্ষ, বিদ্রূপ প্রভৃতি মানব-হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতিরই প্রতিফলন মাত্র।

স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে দল বেঁধেই এরা নাচ-গান-হল্লায় মেতে যায়। 'দাদারিয়া' সঙ্গীতই বুঝি তার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। ছত্রিশগড় এলাকায় তার নাম হোল 'সাল্‌হো'। খাঁটি 'বন-ভজন' গানও তাকে বলা যায়। এ-গান খুবই মধুর ও প্রাণস্পর্শী। কিন্তু কথাগুলি তার চটুল ও লঘু। এ-শ্রেণীর 'বন-ভজন' গীত হয়ে থাকে ক্ষেত-খামারে কাজ করতে করতে কিংবা মেয়েরা যখন দল বেঁধে বাজারে যায় তখন অথবা আগুনের সামনে ছেলে-মেয়ে সবাই কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে যখন আগুন পোহাতে থাকে, তখন। প্রেমিক তরুণ-তরুণীদের মধ্যেই এই গান সবিশেষ প্রিয়। বাসর-ঘরে বর-কনে দুই পক্ষ সমান পাল্লা দিয়ে গেয়ে থাকে এ-গান বেঁধে।

মধ্য প্রদেশের বস্তার অঞ্চলের মুড়িয়া প্রভৃতি উপজাতিদের মধ্যেও এমনি ধারা লোক-সাহিত্য প্রচলিত। গাঁয়ের বিবাহ উৎসবকে উপলক্ষ করে বর-কনের ভাবী জীবনযাত্রাই হোল তাদের বিষয়বস্তু। পুরো আট দিন ধরে তা চলতে থাকে। খরিয়া ও বিন্দ্রনবাগড় এলাকার কামার ও ভুঞিয়াদের মধ্যে এ-শ্রেণীর লোক-সঙ্গীতের প্রচলন বেশী। নীতিবাগীশ কোন কোন বিদেশী মিশনারী ও পণ্ডিতের চোখে এসব অবশ্য কুরুচিপূর্ণ ও অশ্লীল।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা আদিবাসীদের, বিশেষ করে বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যের এই সংস্কৃতি-ধারার নিদর্শন এখনো পুরোপুরি সংগৃহীত হয়নি আগেই বলেছি। আশার কথা, ভারতের লক্ষ লক্ষ আদিবাসীদের মুখে মুখে প্রচলিত এ লোক-সাহিত্যের পুনরুদ্ধার ও লিপিবদ্ধ করার দুরূহ কাজে হালে বহু দেশী ও বিদেশী

মনীষী গবেষণা-কাজে লিপ্ত হয়েছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে ইন্দোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনকালে স্বর্গত জওহরলাল নেহরুর দৃষ্টিও আদিবাসীদের প্রতি বিশেষ করে আকর্ষণ করা হয়েছিল। প্রাণোচ্ছল ও সঞ্জীবতাপূর্ণ এই বিপুল লোক-সাহিত্যের ব্যাপক আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আমি সে চেষ্টা করিনি। সম্ভাবনার আভাস-ইঙ্গিত করলাম।

পরলোকগত ডক্টর ভেরিয়ার এলউইনের আদিবাসী লোককাব্য সম্বন্ধে একটি সরস আলোচনা এখানে উদ্ধৃত করা গেল কিছুকাল আগেই প্রকাশিত 'আকাশবাণী' থেকে।

পরলোকগত ডঃ ভেরিয়ার এলউইন তাঁর এ চিন্তাশীল প্রবন্ধে যথার্থ লিখেছেন :

'ভারতের আদিবাসী লোককাব্য হল সরল মানুষের সহজ ও স্বতঃ-স্ফূর্ত কাব্যিক অভিব্যক্তি।' ডঃ ভেরিয়ার এলউইন সহজ, সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে অতুলনীয় এই লোককাব্য সম্বন্ধে আকাশবাণীর প্রচারিত কথিকায় আরও লিখেছেন :

'সাতাশ বছর পূর্বে মধ্য প্রদেশের একটি আদিবাসী গ্রামে আমি যখন প্রথম বাস করতে যাই, তখন ভেবেছিলাম সেখানে দেখতে পাবো দারিদ্র্য, ব্যাধি আর অজ্ঞতা। এ কথা কখনো ভাবিনি যে তাদের কাব্যিক প্রেরণার অভিব্যক্তি দেখে অনুপ্রাণিত ও আনন্দিত হবো।

'আদিবাসীদের কবিতাগুলি লিখিত নয়, এগুলি আবৃত্তিও করা হয় না। এগুলি সব সময়েই গাওয়া হয়। এর ফলে কবিতার আঙ্গিক, সঙ্গীত ও নৃত্যের ছন্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে।

'আদিবাসী জীবনে নির্মম এমন কি কুৎসিত অনেক জিনিস আছে। কারণ দারিদ্র্যই কবিতার চিরন্তন শত্রু।

'এর মধ্যে অনেক কিছুই বিষাদময়। এবং যে বিষাক্ত জলধারা মৃত্যু থেকে জীবনের মধ্য দিয়ে প্রবহমান সেটাই আদিবাসী ভারতের পাহাড় ও অরণ্যের অভ্যন্তরে এক বিরাট নদীর আকার নিয়েছে। তথাপি কবিতাই এই সরল মানুষের জীবনযাত্রায় নিয়ত দিয়েছে সাহস, দিয়েছে মাধুর্যের আনন্দ। তারা একান্তভাবে সৌন্দর্যের প্রেমিক। নিম্নে উদ্ধৃত করছি একটি গোণ্ড কবিতা। একটি সুন্দরী তরুণীর উদ্দেশ্যে কবিতাটিতে বলা হয়েছে :

'তোমার চোখছুটো যেন জোনাকী
তোমার চুল, হে প্রেয়সী আমার,
সুন্দর কোঁকড়ানো।
হে প্রেয়সী, তুমি কী সুন্দর!
সান্ধ্যভোজের জন্য ক্ষিদেয় যেন
মরে যাচ্ছি,
তোমার চোখছুটো যেন জোনাকী
হে আমার রূপসী প্রেয়সী।'

ডঃ এলউইনের কথায়ঃ

'আমি তাদের দুঃখের কথা বলেছি। তাদের শিশু সন্তানদের অকাল-মৃত্যুর জন্য এ নিরবচ্ছিন্ন বেদনা তাদের অন্তরকে নিয়ত নির্দয় আঘাতে জর্জরিত করে রাখে। আমার মনে আছে একবার একটি শিশুর শেষ-কৃত্যানুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। শিশু সন্তানের ছোট্ট সমাধির ওপর আছড়ে পড়ে শোকার্ত মাতার কণ্ঠে শুনলাম বিলাপ:

'সোনা আমার, তুমি যখন ছিলে
আমি ছিলাম রাণীর মতো।
তুমি আমার বুকের উপর শুয়ে থাকতে
যেন সম্রাটের সিংহাসন।
কিন্তু এখন তুমি মৃত,
তোমাকে শুইয়ে দিয়ে গেলাম
এই কঠিন মৃত্তিকা শয্যায়।'

আরেকবার ডঃ এলউইন একটি তরুণী বধূর শোকার্ত কান্না শুনে-ছিলেন বলে উল্লেখ করেন। বেড়ার আড়ালে মুখ ঢেকে সে দাঁড়িয়েছিল। তার সদ্যমৃত শিশুটির জন্য করুণ সুরে সে গাইছিল:

'সোনামণি আমার
তারা কোথায় তোমায় লুকিয়ে রেখেছে?
খোকনমণি আমার,
তারা কি তোমায় শস্যগোলার
আড়ালে রেখেছে,

তারা কি তোমায় লুকিয়ে রেখেছে
গমের ক্ষেতের ভিতরে ?
তারা কি তোমায় বনের ভিতরে নিয়ে
ঢেকে রেখেছে পাতা দিয়ে ?
হায়, কোথায় লুকিয়েছে তোমায়
সোনামণি আমার ?'

জীবনের এই অনিত্যতাবোধ সম্ভবতঃ খুবই স্বাভাবিক। জীবন ক্ষণস্থায়ী। জীবন তো দু'দিনের। প্রত্যেক শিশুই মৃত্যুর দৃশ্যের সঙ্গে পরিচিত। তারা দেখেছে মৃতদেহ সংকারের সময়ের বিষাদময় অনুষ্ঠান।

গোণ্ডদের একটি গানে বলা হয়ে থাকে :

'মানুষের দেহটা কী ?
সে তো আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ,
জলের স্পর্শে এলেই তা নিভে যায়।
মানুষের দেহটা কী ? একমুঠো খড়
আগুনের ছোঁয়া লাগলেই তা পুড়ে যায়।
মানুষের দেহটা কী ?
ক্ষণিকের জল বুদ্‌বুদ্‌,
হাওয়া লাগলেই তা ভেঙ্গে যায়।'

ডঃ এল্‌উইন আরও লিখেছেন :

'আদিবাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কয়েকজন কবির সন্ধান আমি পেয়েছি মধ্য প্রদেশের গোণ্ড ও প্রধানদের মধ্যে। তাদের কবিতা নিয়ে আমি তিনটি গ্রন্থে আলোচনা করেছি। শ্রীশ্যামরাও হিভালের সহযোগিতায় আমি এই বই তিনটি লিখেছি। ওরাঁও এবং সাঁওতালদের কবিতা সুন্দর অনুবাদ করেছেন ডব্লু. জি. আর্চার। কোনিয়াকদের কয়েকটি সঙ্গীতের অনুবাদ করেছেন ডাঃ ফুরার হাইমেনডর্ফ। শ্রীদেবেন্দ্র সত্যার্থী আরও অনেক কবিতা সংগ্রহ করে অনুবাদ করেছেন। নাগাদের কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যে কাব্য-বোধই যে খুব প্রবল তা নয়, তাদের সঙ্গীতও ভারতের শ্রেষ্ঠ জিনিসের মধ্যে গণ্য হতে পারে। কিছুকাল আগে আমি আঙ্গামীদের একটি প্রেমের গান শুনেছিলাম। এ গানটির বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য হল এই যে, কোনো প্রেমিক যেমনভাবে তার প্রেমিকার কানে

কানে কথা বলে ঠিক তেমন মৃদুস্বরে এই গানটি গাওয়া। সেই অতি সুন্দর মৃদু উচ্চারিত কোমল সঙ্গীতের স্মৃতি আমি কখনও ভুলবো না। আদিবাসী কবিতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য হল তার প্রতীকধর্মিতা। তাদের সাধারণ জীবনযাত্রার যে আচরণ পদ্ধতি—কবিতায় তারই সম্প্রসারণ লক্ষণীয়—তারা সারাদিনই প্রতীক ব্যবহারে কথাবার্তা বলে। যদি কোন ব্যক্তির বিবাহযোগ্যা কন্যা থাকে তা হলে প্রত্যেককেই সে বলবে তার ঘরে শস্য আছে; যদি কোন যুবক বিবাহের জন্য স্ত্রীর সন্ধান করে তাহলে সে বলবে সে একটি তুম্বিপাত্র চায় যাতে জল রাখতে পারে কিংবা মাথার চুলে দেবার জন্য ফুল।'

'আদিবাসী সাহিত্যে প্রতীকধর্মিতায় প্রয়োগ সম্বন্ধে ডঃ এলউইন তারপর লিখেছেন :

মিঃ আর্চার বর্ণনা করেছেন, কী ভাবে ওরাঁওদের বিবাহের কবিতায় দ্বিবিধ প্রতীকী পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হবে কবিতার প্রাকৃতিক বস্তু সম্পর্কে বলা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে তাতে বিবাহের প্রসঙ্গই উত্থাপিত। কখনো বা অর্থকে একটু বিশ্লিষ্ট করে দ্বিতীয় অর্থটি সুপরিস্ফুট করা হয়। কুসুমিত ডুমুর গাছ রূপায়িত হয় কোন যুবতীতে। কারণ তার সুগন্ধ চল্লিশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। বাছুরও অনেক সময় যুবতীকে বোঝায়। কারণ বাছুরটি মায়ের সন্তান। এভাবে প্রতীকী বস্তুর অংশ-বিশেষ দিয়ে যে বস্তুর প্রতীক হিসেবে এটি ব্যবহৃত তার রূপকল্প তৈরি করা হয়। বরযাত্রীর দল যুবতীর গৃহে নেমে আসছে পাহাড়ী পথ দিয়ে। এ দৃশ্যের সমান্তরাল চিত্র দেখানো হবে একদল সারস নামছে নদীতে, কিংবা একদল চড়াই পাখি ঝাঁক বেঁধে এসে বসেছে একটি গাছের ওপর। বিবাহের কথাবার্তার জন্য ঘটকরা আসছে মেয়ের বাড়িতে। এই দৃশ্যকে তুলনা করা হয় ফুলের চারধারে জড় হচ্ছে মৌমাছির দল কিংবা একটি মাকড়সার জাল দিয়ে।'

ভারতের সর্বত্র জনপ্রিয় লোকসঙ্গীতে সোনা ও রূপোর রূপকল্প প্রায়ই দেখা যায়। যেমন,

'আমার আছে একটি ছোট্ট বাদাম গাছ
তাতে ফলবে না কিছু আর,

একটি রূপোলী জায়ফল
এবং নাসপাতি সোনার।'

ঠিক এ রকমই ছড়া আছে গোণ্ডদের মধ্যে। তারা গায়—

'তোমার রূপোলী চাঁদ
চুরি করেছে আমার ঘুম;
গলিয়ে দিয়েছে আমার মাটি
তোমার সোনালী জল।
হে পাখি, তোমার ডানা
আমার হৃদয়ের চারধারে ঝাপটায়।
দিনের বেলাতে সে সূর্য,
রাতের আলোকে সে চাঁদ।
আমার প্রেয়সী সে তো সোনার,
সোনার ঘর থেকে সদ্য আনা,
তার হাত ও পা দুটো সোনার,
সোনালী তার দাঁতগুলো।
কিন্তু সোনার মোহর যেমন সহজে
মেলে না
ওকেও জয় করা তেমনি কঠিন।'

প্রেমের প্রতীক রূপে মৌমাছির ব্যবহার সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজী কাব্যে খুবই দেখা যায়। আদিবাসীদের গানেও এর প্রয়োগ রয়েছে প্রচুর। এখানে আর একটি গোণ্ডদের গান উদ্ধৃত করেছেন ডঃ এলউইন:

'ওগো আমার গাঁদাফুল,
তোমায় ভালবাসতে দিয়ে
তারপর ভুলে গেলে আমায়,
তোমার কবরীতে ফুল গুঁজে,
তোমার সেই মধুর পথের কথা
মনে হলে,
আমার মন বেদনায় ভরে ওঠে।
ওগো আমার হীরে,

তোমার অনাঘ্রাত ওই সুতনু
একদিন ধুলোয় যাবে মিশে,
প্রেমকে তুমি চূর্ণ করেছো,
আমাকে তুমি পান করিয়েছো বিষ।
এক জোড়া মৌমাছির মতো
কী সুন্দর প্রণয়ী যুগল।
আমি হবো মধুকর,
আর তুমি হবে ফুল,
কিন্তু তোমার অকলংক তনু
মাটিতে ধুলো হয়ে যাবে মিশে।'

চিরায়ত ও আদিবাসী উভয় কাব্যেই মেঘ ও জল প্রেমের বহু-ব্যবহৃত প্রতীক। দৃষ্টান্তস্বরূপ ডঃ এলউইন এখানে উদ্ধৃত করছেন বিলাসপুরের আহিরদের একটি সুন্দর কবিতা ঃ

'তোমার কলসী গেছে ভরে
ওগো সোনার বরণ মেয়ে।
তোমার নতুন যৌবন
যেন বজ্রভরা মেঘ।
বিদ্যুতের মতো চমকাচ্ছে
তোমার সুন্দর মুখশ্রী।
ফোঁটায় ফোঁটায়
পূর্ণ হলো তোমার কলসী,
কিন্তু তোমার যৌবন যে ব্যর্থ হলো,
আমার সোনার বরণ মেয়ে।'

আরেকটি উদাহরণ—

'পূবের আকাশে মেঘ,
দক্ষিণাকাশে বৃষ্টি,
ওগো মেয়ে, তোমার বাড়ন্ত যৌবন
অগ্নিবৃষ্টি করছে।'

প্রেমের কবিতায় জলের প্রতীকও প্রচুর। কারণ নদীর ঘাটে মেয়েরা যখন জল আনতে যায়, তখনই প্রণয়ের হয় সূত্রপাত। বাংলা লোকসঙ্গীতে এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। আদিবাসীদের মধ্যেও একই ঘটনা ঘটে। গোণ্ডদের একটি গানে দেখা যায়:

'নদী শুকু শুকু,
ওগো ফুলকুমারী, তুমি যাও
নিয়ে এসো আমার জন্যে ফুল।
দীঘি গেছে শুকিয়ে
তাই সেখানে নেই কোনো পদ্ম।
যার প্রেমিক নেই,
সেই সুন্দরী মেয়েও শুকনো,
ওগো ফুলকুমারী তুমি যাও,
নিয়ে এসো আমার জন্যে জল।'

এ গানের কথায় ডঃ এলউইনের একটি পাঞ্জাবী লোকসঙ্গীতের কথা মনে পড়ল বলে উল্লেখ করেছেন:

'আমি যাচ্ছিলাম জলের ঘাটে
জল আনতে,
পথের মাঝে প্রেমিকের সঙ্গে দেখা,
আমার সকল দুঃখ গেল দূরে,
আমার হৃদয় ধীরে ধীরে বিকশিত
হয়ে উঠলো ফুলের মতো।'

ডঃ এলউইন তারপর উপসংহারে লিখেছেন:

'কাব্যের মূলধর্ম এবং কল্পনাশক্তি ও লোককাহিনী এবং আদিবাসীদের পৌরাণিক কাহিনী রচনায় দিয়েছে অনুপ্রেরণা। এর প্রমাণ বিশেষ ভাবে মেলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে। কারণ তুষারাবৃত পর্বতের অনুপম সৌন্দর্য, গহন অরণ্য আর আঁকাবাঁকা নদী-স্রোতের মাঝখানে প্রকৃতির এত কাছাকাছি বাস করে তারা এই স্বাভাবিক প্রেরণা লাভ করেছে।' ['আকাশবাণী'র সৌজন্যে]

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

ট্রাইবেল মিথস্ অব ওড়িস্তা : ভেরিয়ার এল্যুইন
মিথস্ অব মিডল ইণ্ডিয়া : ভেরিয়ার এল্যুইন
এ মিকির টেইল এ্যাণ্ড ইটস সাঁওতালী প্যারালেল : কালিপদ মিত্র
স্টাডিস্ ইন ফোকলোরস অব আসাম : পি. গোস্বামী
ফোকলোর ইন ইণ্ডিয়া (ইণ্ডিয়ান এ্যান্টিকুইটি) : ডি. এইস্. ওয়াদিয়া
দি আও নাগাস : জে. পি. মিলস
দি ওরাল টেলস্ অব ইণ্ডিয়া : স্টীল থমপ্সন ও জে. কলিন্স্

পাকিস্তান সাহিত্য

'মোদের পাকিস্তান,
দেহ দিয়ে গড়া জান দিয়ে গড়া, প্রাণ দিয়ে গড়া মান,
এইখানে এসে বুক টান করে আমরা দাঁড়াতে পারি,
উচ্চে ফুকারি হাঁক দেই যবে অধিক দুনিয়া নাড়ি।
ঈরান, তুরাণ, মিশর আজম প্রসারিত হয়ে বুক,
তবু ভরে না রে অতৃপ্ত স্নেহ, বিন্দু যে ধরাটুক।
কোটি ধরণীরে প্রসারিয়া আছে অনন্ত মহীয়ান
তাই তো তাহারে ফুকারিয়া ফেরে এ বুকের ফোরকান।
মোদের পাকিস্তান,
লহু দিয়ে গড়া, জান দিয়ে গড়া, প্রাণ দিয়ে গড়া মান।
দুনিয়ার বুকে রোপিয়াছি মোরা এই নব ছায়া-তরু,—
এইখানে এসে জুড়াইবে প্রাণ যত পথচারী মরু।
যত ব্যথাতুর যত নিপীড়িত যত বঞ্চিত জন,
এইখানে এসে জুড়াবে তাদের বুকভরা ক্রন্দন।
রাঙা ফজরের মেহেদীর রঙে হাসিছে আতসবাজ,
মানুষেরে দিয়ে গড়িবে ধরায় আবার সে নবতাজ।
আবার আসিবে ওমর ফারুক আর আবু বক্কর,
খলিফায়ে রাশে দিনের তখ্‌ত নামিবে ধরার পর।
ছেঁড়া মাদুরের অর্দ্ধেকে যারা জাহান করিত ক্রয়,
ভাঙ্গা তাম্বুর ছায়ায় রচিত জগতের আশ্রয়।
অর্দ্ধেক রুটি পাগড়িতে বাঁধি ঘুরিত ধরণী ভরে,
সাত সাগরের তুফান দুলিত যাদের পোতের ভরে।
ক্ষুধার পেটেতে পাথর বাঁধিয়া যুঝিত ভায়ের তরে,
এক হাতে নাঙা তলওয়ার আর ফোরকান আর করে।
তাহারা আজিকে এসেছে মোদের রক্ত ধারায় নেয়ে
সহসা আমরা কি হয়েছি যেন ধরণীর বুকে কিবা সম্পদ পেয়ে!

আবার আমরা গড়িব কুতুব ইঁট কাঠ দিয়ে নয়,
জীবন দানের কীর্তি যে হেথা অনন্ত অক্ষয়।
গড়িব হাফেজ রুমি খৈয়া'ম গালিব ও আলোয়াল,
যাঁদের কীর্তি পাহারায় রবে অনন্ত মহাকাল।
মানুষের গড়া ইট কাট দিয়ে মানুষেরে আবরিয়া,
যারা গড়েছিল গোরস্থান যে ভরি ধরণীর হিয়া
সে সব আজিকে ভাঙিয়া গড়িব মানুষের জিন্নাত
জাগিবে মানুষ দিকে দিগন্তে গাহি জীবনের বাত।

*　　　　*　　　　*

মোদের কবির কণ্ঠে যেন গো জনগণ রূপ পায়,
তাহাদের তরবারি যেন সেথা খরধারে চমকায়।
অশনি বাজের ত্রাস হয়ে তাহা সপ্ত আকাশে ঠুকে
শত শোষিতের ব্যথা বিষয়িত অত্যাচারীর বুকে,
যেন ভেঙে পড়ে যুগের যুগের নাশি নির্মম মার'
পাকিস্তানের ছায়া তরুতলে সকল সকলকার।'

—জসীমউদ্‌দীন

আজাদী-পূর্ব বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত মুসলিম লেখকগণ প্রায় সকলেই দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানে চলে আসেন। এঁদের অনেকেই পূর্ব বাংলার অধিবাসী হলেও অবিভক্ত বাংলার তদানীন্তন প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কলকাতাই ছিল এঁদের কর্ম-জীবনের কেন্দ্র।

আজাদীর পরবর্তী যে সকল প্রধান মুসলিম লেখক পরলোক গমন করেছেন তাঁদের মধ্যে কায়কোবাদ, সৈয়দ এমদাদ্ আলী, মওলানা মনিরুজ্জামান, ইসলামাবাদী, ডঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, আবদুল করীম সাহিত্য-বিশারদ, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, শাহাদৎ হোসেন, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, কাজী আকরাম হোসেন প্রমুখ অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই কম বেশী লেখনী চালনা করে আসছেন। আজীবন প্রাচীন সাহিত্যের সাধক ও গবেষক আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ আজাদীর পরে পাকিস্তানের

জাতীয় সাহিত্য ও তরুণ লেখকদের বিষয়ে নতুন পথ নির্দেশমূলক চিন্তাশীল বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও অবিরাম লিখে গেছেন। পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা, সাহিত্য ও সমাজ তাঁর চিন্তাশীল প্রবন্ধগুলো থেকে অনেক চিন্তার খোরাক জুটিয়েছে। কবি শাহাদাৎ হোসেন তাঁর ঢাকার জীবনে রেডিও পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর পাকিস্তানের জাতীয় ভাবধারার দ্যোতক কাব্য-সংকলন 'রূপচ্ছন্দা' স্বাধীনতার পরে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য ও সমাজ এখনো বিভাগ-পূর্বকালের ঐতিহ্যবাহী যেসব প্রবীণ লেখকের চিন্তাশীল রচনায় ধন্য, তাঁরা হলেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাহবুবউল আলম, আবুল মনসুর আহমদ, আকবরউদ্দীন, জসীম উদ্‌দীন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল ফজল, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, আবদুল মওদুদ, মতিনউদ্দীন আহমদ, সুফিয়া কামাল, নূরুল মোমেন, আবদুল কাদির, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, শামসুন্নাহার মাহমুদ, মহীউদ্দীন, বেনজীর আহমদ, বন্দে আলী মিয়া, মঈনুদ্দীন, কাজী কাদের নওয়াজ প্রমুখ।

পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য সমাজের অগ্রসূরী এ বর্ষীয়ান লেখকবৃন্দ বিভাগ-পূর্ব কাল থেকেই সাহিত্যক্ষেত্রে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠা ও অবদান-সম্ভার নিয়ে এসেছেন। নজরুল ইসলাম এবং পূর্বোক্ত পরলোকগত সাহিত্যিক-দের তাঁদের সঙ্গে ধরলে বলা যায়, আধুনিক বাংলা মুসলিম সাহিত্যের প্রাণ ও রূপরেখা এঁদের হাতেই মণ্ডিত হয়েছে। এ সকল জীবিত সাহিত্যিকদের প্রায় সকলেই পঞ্চাশোর্ধ বয়স্ক এবং কয়েকজন শতাব্দীর তিন-চতুর্থ পার হয়ে এসেছেন। তা সত্ত্বেও সৌভাগ্যের বিষয়, এঁদের সৃষ্টিশীল লেখনীর অবদান এখনো পাকিস্তানের সাহিত্য ভাণ্ডারকে পুষ্ট করে চলেছে।

এঁদের পরবর্তী লেখকগোষ্ঠী যাঁরা বিভাগ-পূর্ব থেকেই কম-বেশী প্রতিষ্ঠিত তাঁদের মধ্যে শওকত ওসমান, আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, মবিনউদ্দীন আহমদ, আবু জাফর শামসুদ্দীন, আবু রুশদ্, তালিম হোসেন, সৈয়দ আলী আহ্‌সান, আবুল হোসেন, মতিউল ইসলাম, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, আবদুল হক, সিকন্দর আবু জাফর, শাহেদ আলী, মুফাখ্‌খারুল ইসলাম, আবদুল হাই

মাশরেকী, হাবিবুর রহমান, আ.ন.ম. বজলুর রশীদ, আজহারুল ইসলাম প্রমুখ লেখকদের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের অধিকাংশই পাকিস্তান পরবর্তীকালে সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তবে এঁদের সাহিত্য কর্মের ক্ষেত্র এবং ভূমিকা ও প্রতিভার প্রতিশ্রুতি বিভাগ-পূর্বকালেই নির্দিষ্ট রূপ নিয়েছিল। হয়তো কেউ কেউ উত্তরকালে অধিকতর সৃষ্টি-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশরই উল্লেখযোগ্য অবদান হোল দেশ-বিভাগের আগেই। পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য-সমাজের প্রবীণ ও নবীন ধারার লেখকদের মধ্যে এঁরাই হলেন সেতুবন্ধস্বরূপ। প্রবীণদের দৃষ্টি, অভিজ্ঞতা এবং প্রকরণ এঁরা ঐতিহ্য হিসেবে নিয়ে এসেছেন আবার অতি নবীনদের ব্যত্যয়ী ধারারও এঁরা পথ উন্মোচকের কাজ করেছেন। এক হিসেবে, পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য সম্ভারের অনুভবযোগ্য অংশ এঁদেরই অবদান।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে গত পনর বছরে পূর্ব পাকিস্তানে অনেক প্রতিশ্রুতিশীল লেখক জন্ম নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে কত জন পাকিস্তান সাহিত্যে স্থায়ী ঐশ্বর্য রেখে যেতে পারবেন এখনো সে-কথা বলার সময় হয়ত আসে নি। তবে একটি বিষয় সানন্দে লক্ষ্যযোগ্য যে, পাক-সাহিত্যের ঐতিহ্য ধারায় এক নতুন প্রাণের স্পর্শ এনে দেবার সাধনায় এ নবীন লেখকদের অনেকেই পরম নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা পাঠকমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন মুনীর চৌধুরী, আসকার ইব্‌নে শাইখ, অবদুর রশীদখান, ডঃ মুযহারুল ইসলাম, আশরাফ সিদ্দিকী, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্, রওশান ইজদানী, আহমদ শরীফ, আলাউদ্দীন আল আজাদ, শামসুর রহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আবদুল গফ্‌ফার চৌধুরী, মির্জা আ. মু. আবদুল হাই, সরদার জয়েন-উদ্দীন, সৈয়দ আলী আশরাফ, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আবু ইস্‌হাক, সৈয়দ শামসুল হক, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্, আবদুস সাত্তার, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, রশীদ করিম, আতোয়ার রহমান, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, লতীফা হিলালী, জাহানারা আরজু, আল মাহমুদ, শওকত আলী প্রমুখ।

এ ছাড়াও আরও বহু নতুন লেখক পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য ক্ষেত্রে পদচারণা শুরু করেছেন। তাঁদের নাম এখানে উল্লেখিত না হলেও তাঁদের প্রতিশ্রুতি অনুজ্জ্বল নয়। প্রতিষ্ঠিত লেখকদের সঙ্গে নবাগত প্রাণ-চঞ্চল তরুণদের সম্মিলিত সাহিত্য-সাধনা নবজাগ্রত জাতির সাহিত্যকে অদূর ভবিষ্যতে নিঃসন্দেহে ফলে-ফুলে মুঞ্জরিত করে তুলবে বলে আশা জ্ঞাপন করেছেন চিন্তাশীল লেখক আবুল হাসান 'মাহে নাও'-এর পৃষ্ঠায়।

।। পূর্ব-পাকিস্তানের কবিতা ।।

'আমার পূর্ব-বাংলা এক গুচ্ছ স্নিগ্ধ
অন্ধকারের তমাল
অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায়
একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ
সন্ধ্যার উন্মেষের মতো
সরোবরের অতলের মতো
কালো-কেশ মেঘের সঞ্চয়ের মতো
বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি
আমার পূর্ব-বাংলা বর্ষার অন্ধকারের অনুরাগ
হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া
সিক্ত নিলাম্বরী
নিকুঞ্জের তমাল কনক-লতায় ঘেরা
কবরী এলো ক'রে আকাশ মুহূর্ত দেখার
অশেষ অনুভব নিয়ে
পুলকিত সচ্ছলতা
এক সময় সূর্যকে ঢেকে
অনেক মেঘের পালক
রাশি রাশি ধান মাটি আর পানির
কেমন নিশ্চেতন করা গন্ধ
কত দশা বিরহিণীব—এক দুই তিন
দশটি

এখানে ত্রস্ত আকুলতায় চিরকাল
অভিসার
ঘর আর বিদেশ আঙিনা
আকুলতায় একাকার—
তিনটি ফুল আর অনেক পাতা নিয়ে
কদম্ব তরুর একটি শাখা
মাটি ছুঁয়েছে
আরও অনেক গাছ পাতা লতা
নীল হলুদ বেগুণী অথবা সাদা
অজস্র ফুলের বন্যা অফুরন্ত
ঘুমের অলসতায় চোখ বুঁজে আসার মতো
শান্তি
কাকের চোখের মতো কালো চুল
এলিয়ে—
পানিতে পা ডুবিয়ে—রাঙা উৎপল
যার উপমা
হৃদয় ছুয়ে যাওয়া সিক্ত তমাল—।
তুমি আমার পূর্ব বাংলা
পুলকিত সচ্ছলতায় প্রগাঢ় নিকুঞ্জ
একক সন্ধ্যায় বসন্ত ॥'

॥ 'আমার পূর্ব-বাঙলার নদী' ॥ সৈয়দ আলী আহ্সান

পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক কাব্য প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে তার পূর্বসূরী কবিদের প্রসঙ্গ স্বতঃসিদ্ধভাবে এসে পড়ে। এ পূর্বসূরীদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯—), কাইকোবাদ (১৮৫৮-১৯৫১), জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩—), স্বর্গত গোলাম মুস্তাফা (জন্মঃ ১৮৫৭), আবদুল কাদির (১৯০৬—), বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১—) ও মালিমুদা খাতুন সিকদ্দিক (১৯১০—) প্রমুখ কবিরা বহুমুখী কাব্য-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কাজী নজরুল ইসলামের মত অনেকের বাণী আজ স্তব্ধ

হয়ে গেছে ঠিক। কিন্তু দু বাংলায় তাঁদের অনুরাগী পাঠক-পাঠিকার অভাব নেই। বস্তুতঃ, 'বিদ্রোহী' কবির 'অগ্নিবীণার' ঝংকার এখনও অনির্বাণ। তাঁর গীতিকবিতা ও গান পূর্ব-পশ্চিম বঙ্গের দিগন্ত মুখরিত। মার্কিন কবি হুইটম্যানের সঙ্গে তিনি সমতুল্য। শুধু কাব্যছন্দ ও সুরঝঙ্কারে নয়, ভাষার দিক থেকেও তিনি বাংলাকে সুসমৃদ্ধ করে তুলেছেন। সাজিয়েছেন আপনার মাতৃভাষাকে উর্দু, ফারসী, আরবী আর সংস্কৃত নানা আলঙ্কারিক শব্দ প্রয়োগে।

এখানে উল্লেখযোগ্য, পূর্বসূরীদের মধ্যে অনেকেরই কাব্যসৃষ্টি পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে (১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের পত্তন হয়)। পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক সাহিত্যকে সমকালীন ইউরোপীয় ও মার্কিন সাহিত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করা চলে। কেননা, এ সাহিত্য কেবল সুসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের আদিগঙ্গার জলকল্লোল প্রবাহিত ও ধ্বনিত নয়, বর্তমান ইউরোপীয় সাহিত্যের বিশালতা আর প্রাচুর্য গুণেও তা সমুজ্জ্বল। বস্তুতঃ, উনবিংশ ও বিংশ শতকের কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের প্রতিফলন আধুনিক পূর্ববাংলার লেখায় রয়েছে। গ্যেটে, ভিক্টর হিউগো, লাকার্ন, বোদ্যঁলেয়ার শুধু উল্লেখ নয়, তাঁদের সাহিত্য কীর্তির সার্থক অনুবাদও হয়েছে এবং হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক সাহিত্যে।

এখানে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য যে, পাশ্চাত্য কবি ও লেখকদের কেবল ইংরেজী ভাষার মারফত নয় মূল রচনার সঙ্গেও পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক লেখকদের যোগসাজশ ঘটেছে। মূল ফরাসী, জর্মান, ইটালীয়ান, স্পেনিস সাহিত্যের মণিমঞ্জুসা আহরণ করে আধুনিক লেখকেরা আপন মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধতর করেছেন। আলম্‌-রসিদ, শ্রীমতী জাহানারা আরজু, মামুদ-শা কুরেশী, আবুল ফজল, আবদুস সত্তার প্রমুখ অনেকের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সামসুর রহমানের সুবিখ্যাত কবিতা 'চেনা অচেনা'য় [॥ রৌদ্র করোটী ॥] রেমঁব্রার প্রভাব লক্ষ্য করবার। সৈয়দ সামসুল হকের 'একদা এক রাজ্যে' [সন্ধ্যা প্রকাশনী] নীৎসের ও সোফক্লিসের উল্লেখ দেখা যায়। শুধু উল্লেখ কিংবা প্রভাব নয়, সমকালীন পূর্বপাকিস্তানের অনেকেই ইউরোপীয় মনীষীদের রচনাবলীর সার্থক অনুবাদ করেছেন তা আগেই বলা হয়েছে। আবুল ফজলের ভলতেয়ার, আবুল হাসেনের রবার্ট ফস্ট, আবদুস সত্তরের আরবী কবি,

নাসিক-অল-ইয়াজেদী ও আহাম্মদ জাকির আবুল সাদি আরবী কবির মূলভিক অনুবাদ, শ্রীমতি জিনাদ আরা মালিক ও প্রশান্ত ঘোষালের এজরা পাউণ্ডের অনুবাদ যেমন সুখপাঠ্য তেমনি ভাষা ও সাহিত্যকে দিগন্ত প্রসারিতও করে দিয়েছে তা। মামুদ শা-উরেশীর লরকা থেকে অনুবাদ, জহর উল হকের কবি রীলক্-এর অনুবাদও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আহম্মদ আবদুল্লা রফি আজাদ লণ্ডন প্রবাসী তরুণ ভারতীয় কবি ডম মোরাস-এর কবিতার সার্থক অনুবাদ করেন।

আলাউদ্দীন-আল-আজাদ আর মহম্মদ রফিগ জার্মান কবি গটফ্রিড বেনর জর্জ ট্রাকোলের কবিতার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানীদের পরিচয় করিয়ে দেন। কাজেই আধুনিক কবিদের প্রচেষ্টায় ইউরোপ-আমেরিকার কাব্য জগতের সঙ্গে পূর্ববাংলার আজ সেতুবন্ধন ঘটেছে ভাষার মারফত। এ সকল কবিদের আন্তরিক কাব্য অনুশীলনের ফলে যেমন গ্যেটে, হিউগো, এজরা পাউণ্ড, টি. এস. ইলিয়ট, ফরাসী সিম্বোলিস্ট (Symbolist)-এর সঙ্গে যোগসাজশ ঘটেছে, তেমনি অনুবাদকের চিন্তাধারাও সমানভাবে প্রকটিত হয়েছে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের কবিতা আজ বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সমান আসনের দাবিদার বলা চলে। বিশ্বের সীমারেখা আজ যখন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রাকার হতে চলেছে তখন সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সব কিছুই অবশ্য বিশ্বজনীন হতে বাধ্য। স্থানীয় বৈশিষ্ট্যও তার সমাদর স্বীকৃতি লাভ করবে। পূর্বপাকিস্তানের আধুনিক কবিতায় পদ্মা নদীর মাঝির গান, নিরন্ন কৃষক-রমণীর বুকভাঙা কান্না, উলঙ্গ শিশুর মরা কান্না যেমন প্রতিফলিত হয়েছে তারই পাশাপাশি বোঁদলেয়ার, দান্তে, ইলিয়টের কাব্য মাধুর্যের সুর-সংযোগ ও তাই দেখা যায়। সামসুর রহমানের কবিতা 'বেকার যুবকের উক্তি'র মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি রূপ ফুটে উঠেছে। 'একটি টিনের বাঁশি' কবিতায় তিনি একটি হৃতস্বাস্থ্য বালকের মারফত নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরেছেন। ['সমকাল কবিতা সংকলন']

এখানে উল্লেখযোগ্য, যদিও পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক কবিতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখন চলছে, তবে সুখের বিষয়, একটি নতুন সুষ্ঠুরূপ ইতিমধ্যে তার পরিগ্রহ করেছে। এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র হোল নতুন শব্দসংযোজন। ইতিপূর্বে কাজী নজরুল ইসলাম বিদেশী ভাষা থেকে শব্দ

চয়ন করে মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন তা আগেই বলা হয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ফারুক আহম্মদ প্রমুখ আধুনিক কোন কোন কবি বাংলাকে কোণঠাসা করে ফারসী ও আরবী-বহুল শব্দ প্রয়োগ করে কাব্য রচনার রীতি প্রবর্তন করেন। তবে বিদেশী শব্দ প্রয়োগ সব্যসাচী নজরুল ইসলামের হাতে জোরদার পরিণতি লাভ করেছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু অনেক কবির কবিতায় তা কেবল শ্রুতিকটু, কষ্টপ্রয়োগ ও দুরূহ ঠেকে। ফারুক আহম্মদের 'আমাদের সোনার দেশ' কবিতায় ঝিনদান [অর্থাৎ কারাগার], ঝালিন [অত্যাচার], ঝুলমত [অন্ধকার], জিনজির প্রভৃতি বহু অপ্রচলিত নতুন নতুন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় যার পাঠোদ্ধার করতে আরবী বা ফার্সী অভিধানের শরণাপন্ন হতে হয় বারে বারে। অবশ্য এ কথা সত্য, এ সকল পরীক্ষা ও নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হোল পূর্ব বাংলার সাহিত্যকে পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ধাঁচে ঢালাই করা। পূর্ব বাংলায় গণজীবন ও শিক্ষাদীক্ষা যে পশ্চিম বাংলা থেকে সমুৎসারিত এবং প্রবাহিত একই নদীর দুই পার—যেমন গ্রেট বৃটেনের ইংরাজী আর আমেরিকায় বসবাসকারীদের ইংরাজী একই ধারার দুই স্রোত। আটলান্টিক মহাসাগরের এপার-ওপার—একথা পূর্বপাকিস্তানের গোঁড়া বহু কবি বুঝি বিস্মৃত হন। পাশাপাশি আবার আর এক শ্রেণীর কবি আছেন—এঁদের পুরধায় রয়েছেন কবি আব্দুল কাদের প্রমুখ অনেকে—তাঁরা পূর্ব বাংলার মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে হিন্দু আচার ব্যবহার পর্যন্ত প্রচলিত করতে সচেষ্ট। বিবাহিত হিন্দু মহিলারা সিঁথিতে সিঁদুর পরে থাকেন। অতি উৎসাহে এ সকল কবি মুসলিম মহিলাদের সিঁথিতেও সিঁদুরবিন্দু পরাতে দ্বিধা করেন নি। [॥ সনেট ॥ 'সমকাল কবিতা']

ফারুক আহমদ [১৯১৮—], হাসান হাবিব [১৯১৭—] ও সৈয়দ আলি হাসান [১৯২২—] প্রমুখ কবিরা পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বেই কাব্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ফারুক আহমদ নজরুল ইসলামের মত তাঁর কবিতায় মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও শব্দসম্পদ আমদানী করেন। এ প্রাণোচ্ছল শব্দঝঙ্কার তাঁর কাব্যে রুক্ষ দুরূহতাকে অনেকটা সহজ করে তুলেছিল। ফারুক আহমদ মুসলিম সংস্কৃতি ও ধর্ম বিশ্বাসে ছিলেন বিশ্বাসী। পূর্ব বাংলায় লোকসাহিত্যে

তাঁর এ দান প্রভূত সম্ভাবনা সূচনা করে। 'আকাশ নাবিক' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব বাংলার পুরাতন কবিদের মধ্যে সামসুর রহমান বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁর আগেকার কবিতা এখনও পশ্চিমবঙ্গে সমাদৃত ও পঠিত। বিষয়বস্তু ও ছন্দনৈপুণ্যে তাঁর কবিতা সমৃদ্ধ। এবং পাণ্ডিত্য, প্রাঞ্জলতা ও বৈশিষ্ট্যেরও তা দাবি রাখে। তাঁর কবিতা কেবল বাস্তবানুগ নয়, বাস্তব জীবনের প্রতিফলন—সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ, হাসিকান্নার জের রয়েছে তা'তে। পার্কের ধারে নিঃসঙ্গ পঙ্গু মানবতা, খাদ্যান্বেষী একদল মানবশিশুর আর্ত আবেদন, আকাশচুম্বী প্রাসাদের পার্শ্বে ভগ্ন কুটীর—দারিদ্র্যের লজ্জা তাঁর কবিতার অন্যতম বিষয়বস্তু। রূপক ও ইঙ্গিতও লক্ষ্য করবার। 'খুসির গান' ও 'সূর্য করোটী' গ্রন্থের কবিতাগুলি এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে লক্ষণীয়। সামসুর রহমানের নতুন আঙ্গিকের সাহিত্যকীর্তি যে কোন দেশের সমকালীন কবিদের সগোত্রীয় বলা চলে।

সৈয়দ আলী আহসান ও সানাউল হক সমকালীন কবিদের মধ্যে প্রবীণতম। কিন্তু নতুন নতুন কবিতা রচনায় তাঁরা কেউ পিছিয়ে নেই। পাশ্চাত্য কবিতার সার্থক অনুবাদের মারফৎ পূর্ব বাংলার কাব্য জগতকে তাঁরা সমৃদ্ধও করে তুলেছেন। কবি সৈয়দ আহসান ঢাকার বাংলা আকাদেমীর অধ্যক্ষ। ওয়াল্ট হুইটম্যানের অমর সৃষ্টি 'লিভস্ অফ্ গ্রাস্'-এর বহু কবিতা তিনি অনূদিত করেছেন। সানাউল হকের মত ইনিও আমেরিকা ও ইউরোপের বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। কবি সানাউল হক সোভিয়েট কবি পেস্তারনকের ছয়চল্লিশটি কবিতা অনুবাদ করেন এবং শ্রেষ্ঠ অনুবাদকের সম্মানে ভূষিত হন। ম্যাক্স্ হাওয়ার, আর. জে. এন. কোহানের কিছু কিছু কবিতাও সানাউল হক ভাষান্তরিত করেছেন। পাকিস্তান সরকারের শাসনাধীন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকেও তাঁর কাব্য-প্রচেষ্টায় বিরাম ঘটেনি। 'সমকাল কবিতা সংকলনে' সঙ্কলিত বহু কবিতায় তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যায়।

আবুল হাসানের (১৯২২—) কবিতার সংখ্যা খুব একটা বেশী নয়। কিন্তু শিল্পকারুকার্যে তা বৈশিষ্ট্য। লোকগাথা ও ছেলেভুলানো ছড়া রচনাতেও তিনি সমান পটু। ক্ষমতাসীন মানুষের কপটতা, রিরংসা,

ধনবৈষম্যের প্রতি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গোক্তি তাঁর কবিতার অন্যতম বিশেষত্ব। ঢাকার আধুনিক কাব্য সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত 'মানপত্র' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আবুজাফর ওবেদুল্লা (১৯৩২—) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক। 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকায় প্রকাশিত ভার্জিনিয়া উলফের উপর তাঁর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ গভীর অন্তর্দৃষ্টির আর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়। ঢাকা বিচিত্রা প্রকাশনী থেকে মুদ্রিত 'শত নরির হার' (১৯৫৬) কবিতার বই তাঁকে তরুণ কবির স্বীকৃতি দান করেছে। কবি হাউসম্যানের প্রভাব তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করবার। হাউসম্যানের মত তিনিও গ্রাম্য জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে কবিতা রচনায় প্রয়াসী এবং শহর ও গ্রাম্য জীবনের পার্থক্য তুলে ধরেছেন তাঁর সার্থক লেখনীর মুখে। কীটসের মত তিনিও প্রকৃতি-প্রিয়। পূর্ব পাকিস্তানের 'কবি হাউসম্যান' বলে তাঁকে অভিহিত করা হয়।

মহম্মদ আব্দুল গণি হাজারী (১৯২৫—) সমকালীন পূর্ব বাংলার কবিদের মধ্যে বিশিষ্ট একটি নাম। 'সমকাল' মাসিক পত্রে প্রকাশিত তাঁর 'কতিপয় আমলার স্ত্রী' (১৯৬৩) আন্তর্জাতিক পি. ই. এন-এর ফিলিপাইন শাখায় কবিতার জন্য এশিয়ান পুরস্কার লাভ করে। তাঁর এ কবিতাটি অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ইংরেজীতে অনূদিত করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সূর্যের সিঁড়ি' কবি ফারুক আহমদকে উৎসর্গ করা হয়েছে। তাঁর এ কাব্য চিরাচরিত কাব্যধারা থেকে ব্যতিক্রম। বস্তুতঃ, তিনি পূর্ব পাকিস্তানী কবিতায় সম্পূর্ণ এক নতুন আঙ্গিকের সূচনা করেন। যুদ্ধোত্তর গণজীবনে নতুন ব্যঞ্জনা, বিশেষ করে নতুন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও পরিবেশ তাঁর আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটিকে অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দান করেছে। কেবল আঙ্গিক নয়, নতুন চিন্তার খোরাকও তাঁর বহু কবিতায় পাওয়া যায়। 'কোন বন্ধুর পুত্রের মৃত্যুতে' প্রভৃতি কবিতা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য, 'কতিপয় আমলার স্ত্রী' তাঁর অধিকতর আলোচিত কবিতা।

আলাউদ্দীন অল আজাদ (১৯৩২) ও হাসান হাফিজু রহমান (১৯৩৩) সমকালীন কবিদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নবীন। রোমাণ্টিক আবিলতার মোহপাশ কাটিয়ে উঠতে না পারলেও সমাজসচেতনতার ছাপ তাঁদের কবিতায় রয়েছে ['পরিক্রমা'তে প্রকাশিত 'অবিচ্ছিন্ন' কবিতাটি দ্রষ্টব্য]।

পূর্ব-পাকিস্তানের অপরাপর তরুণ কবিদের মত আলাউদ্দীন অল আজাদ ও হাসান হাফিজুর রহমান পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে উপমা ও প্রতীক ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন নি। যেমন, হাসান রহমানের 'গোলকধাঁধা' আলাউদ্দীন অল আজাদের কবিতার অনেকটা কাছাকাছি। আজাদ ও রহমান—এ দু'কবি নব প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় ধনিক সম্প্রদায়, ক্ষমতাধীন শাসক সম্প্রদায়, সম্পদ ও বিত্তের পাশাপাশি বিত্তহীনদের অভাব অভিযোগের চিত্র রূপায়িত করেছেন তাঁদের কবিতায় অপরিসীম মুন্সিয়ানার সঙ্গে। 'অমর ২১'-এ [॥ বিমুখ প্রান্তর॥ ·· পারাবত প্রকাশনী] পূর্ববাংলা ভাষা আন্দোলনের শহীদের স্মৃতি উদ্দেশ্যে রচিত। এ একটি মাত্র কবিতাই তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী কবির মর্যাদা দান করেছে।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান (১৯৩৬) ও আবু হেনা মোস্তাফা কামাল(১৯৩৬) দু'জনেই বাংলা ভাষার অধ্যাপক এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। তাঁদের কবিতায় পূর্ববাংলার নৈসর্গিক রূপরেখা প্রকটিত। ঢাকা রেডিও পাকিস্তানের মারফত তাঁরা গান ও কবিতা পাঠও করে থাকেন [আবু হেনা মোস্তাফা কামালের 'আমার সত্য এই দেশ']। মনিরুজ্জামানের 'দুর্লভ দিন' [প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৬১] গীতিধর্মী। এঁর অনেকগুলি কবিতাই সহজ সুরে গাওয়া চলে—যথা 'মিত্রলিপি', 'নদীরূপবতী' ইত্যাদি। 'নদী রূপবতী'র অন্তর্নিহিত ভাব ও লিপিকুশলতা অনেককেই মুগ্ধ করবে।

সৈয়দ সামসুল হক ঔপন্যাসিক হিসাবেই সবিশেষ খ্যাত। তিনি কিন্তু নিরীক্ষামূলক কবিতা রচনারও অনলস কবি। তাঁর উপন্যাসে যে উষ্ণ অস্থিরতার সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁর কবিতাতেও তার অনুরণন ফুটে উঠেছে ['মহিলাকে—শিল্পীর উত্তর']।

পূর্ব পাকিস্তানের সমকালীন কবিতার রূপরেখার কিছুটা আভাস দেওয়ার চেষ্টা করা হলো এখানে। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। প্রতিনিধি-মূলকও নয়। ব্যাপকও নয়। দু' বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন আজ অনেকটা বিচ্ছিন্ন। একই মায়ের দুই যমজ সন্তান। পূর্ব বাংলার ব্যাপক সাহিত্য কীর্তির সঙ্গে আমাদের সংযোগ আজ অনেকটা ক্ষীণ রাজনৈতিক বাধা নিষেধের ফলে। তবু যেটুকু উপছে এসে পড়েছে এ পারে তাতে বোঝা যায় পূর্ব পাকিস্তানে সার্থক সাহিত্যের নিরীক্ষা পরীক্ষার অন্ত নেই এবং তার জয়যাত্রাও এগিয়ে চলেছে অগ্রগতির পথে। এর কিছুটা পরিচয় দক্ষিণ

এশিয়া সাহিত্য মাসিক পত্র 'মহফিল'-(Mahfil)-এর তৃতীয় খণ্ড চতুর্থ সংখ্যায় অধ্যাপিকা রাজিয়া খান আমীন পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক কবিতা'র সমালোচনায় তুলে ধরেছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য-সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে হাসান হাফিজুর রহমান, (সহকারী সম্পাদক, 'দৈনিক পাকিস্তান' ঢাকা,) 'সাহিত্য পত্রিকা' বর্ষ সংখ্যা ১৩৭৩, লিখেছেন :

...সৈয়দ আলী আহসান চল্লিশ দশকে কবিতা লেখা শুরু করলেও তিনি পাকিস্তানের সাম্প্রতিকতম নিরীক্ষারত অগ্রগামী কবিদেরই একজন।...তাঁর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিককে সর্বতোপায়ে এ্যাবস্ট্রাকশনের মধ্যে গ্রহণ করেন, বয়সের আনুকূল্যে এবং সময়ের আবহে স্বাভাবিকভাবে উজ্জীবিত অন্যান্য তরুণতম কবির বেলায় যা সম্ভব নয়। সৈয়দ আহসানের 'অনেক আকাশ' এবং 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' কাব্যগ্রন্থ থেকে কিছু দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক :

'মানুষের কামনায় ধানের শীষ হলুদ হয়েছে
কত অনুতাপ প্রলাপ কত বিষ
অনেক আনন্দে রমণী পদ্মিনী
সময় তো উল্লাসের মতো
হাসাহাসি অথবা সচকিত বাতাস
এবং মুহূর্তের সচেতনতায় আমি পৃথিবী।'

[॥ অনবরত ॥]

'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটি 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' কাব্যগ্রন্থের প্রতিনিধি স্থানীয় রচনা এবং সম্ভবতঃ সৈয়দ আলী আহসানের সব চেয়ে সাড়া দেওয়া কবিতা।

সৈয়দ আলী আহসানের মত সানাউল হকও দেশী-বিদেশী কাব্য সম্পদ থেকে নির্বিচারে আত্ম-সমিধ সংগ্রহ করলেও, দু'জনেরই উপজীব্য ব্যাপকতর অর্থে স্বদেশ, স্বকাল ও স্বজাতি। দু'জনের নির্ভরও আবহমান বাংলার নিরপেক্ষ ঐতিহ্যিক ললিত পট। তবে এঁদের মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে। সেটা হোল :

'সৈয়দ আলী আহসান মানবধর্মী আর সানাউল হক চিত্রধর্মী। সৈয়দ আলী আহসান স্মৃতি-উজ্জীবিত, সানাউল হক ঘটমানতা-উদ্বুদ্ধ।

সৈয়দ আলী আহসান নৈর্ব্যক্তিক, বিমূর্ত-প্রসূত এবং তাৎক্ষণিক বা প্রত্যক্ষ ফলাকাঙ্ক্ষায় নির্বিকার, কিন্তু সানাউল হক প্রয়োগবাদী, নির্দিষ্ট ফলাকাঙ্ক্ষী এবং যতদূর সম্ভব প্রসঙ্গলগ্ন' বলে মন্তব্য করেছেন হাসান হাফিজুর রহমান। তবে সানাউল হক হলেন সাধারণ বাঙালী মানসের উত্তরাধিকারী। যথা:

'তীরে তীরে কতো না বন্ধন, নানা নীড়-পাখি
কত বউ কলসিনী ধান ও ধ্বংসের ইতিহাস:
হাসি ঝরা প্রিয়মুখ, ছলছল অভিমানী আঁখি;
ভাঙামাঠ রাঙামাঠ একপাল মোর পাতিহাঁস।
কাশফুল গো-বাথান জেলেপাড়া বুড়ো কুঁজো বাড়ি:
এই নদী কারিগর তট শিল্পী হয়তো বা কবি
ধ্যানী জ্ঞানী যাযাবর খেয়ালী কি আজন্ম নেশাড়ী:
বুকে গান ঠোঁটে রস কটিকাঁখে কত ফোটে ছবি।'

[।। তিতাস: 'পূর্বরাগ' ।। 'সূর্য অন্যতর' ।।]

সানাউল হকের এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ হোল: 'নদী ও মানুষের কবিতা', 'সূর্য অন্যতর' এবং 'সম্ভবা অনন্যা'।

'দিশারী' ও 'শাহীন' কাব্যের কবি তালিম হোসেন এবং 'বৈরী বৃষ্টি'র কবি সিকান্দার আবুজাফর কাজী নজরুলের কাব্যাদর্শ থেকেই প্রেরণা পেয়েছেন। তালিম হোসেন নজরুল ইসলামের মুসলিম চেতনামূলক কাব্যের অনুসারী এবং সিকান্দার আবুজাফর নজরুলের সমাজ-সচেতন সংগ্রামী ধারাতেই তাঁর কাব্যের মূল সুর খুঁজে পেয়েছেন বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন হাফিজুর রহমান সাহেব তাঁর প্রবন্ধে।

'দিশারী'কে মুসলিম পুনর্জাগরণের চারণ খণ্ডকাব্য বলা যায়। ফররুখ আহমদের ঢঙে 'দিশারী'তে কবি আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগে দ্বিধা করেন নি।

সিকান্দার আবুজাফরের 'বৈরী বৃষ্টি' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতার শেষ কলি এখানে উদ্ধৃত করা গেল:

'ধ্বংসের রাহু পেয়েছে রাজ্যভার।
বিশ্ব মানবতার
দিক্ দিগন্তে একি ক্ষমাহীন অকুণ্ঠ ব্যভিচার?
স্তব্ধ কৌতূহলে

অতীত যুগের পাতা ছিঁড়ে একে একে
ভাসাই তিক্ত বিস্মরণের জলে।'

সিকান্দার আবুজাফর হলেন সজীব কবি। বক্তব্যে তিনি স্পষ্টভাষী। গদ্য ও পদ্যের প্রয়োগের চিরন্তনী প্রথা মেনে নিতে রাজী নন তিনি। এখানে একটি উদ্ধৃতি :

'বাপজান,
ঈদের সালাম নিও, দোয়া কোরো, আগামী বছরে।
কাটিয়ে উঠতে পারি যেন এই তিক্ত বছরের
সমস্ত ব্যর্থতা।
অন্ততঃ ঈদের দিনে সাদাসিধে লুঙ্গি একখানি,
একটি পাঞ্জাবী আর সাদা গোল টুপী
তোমাকে পাঠাতে যেন পারি ;
আর দিতে পারি পাঁচটি নগদ টাকা।
এইটুকু পেলে
দশজন পড়শীর মাঝে
পুত্রের কৃতিত্ব ভেবে ছুটি অন্ধ চোখে
হয়তো আসবে ফিরে দৃষ্টির সান্ত্বনা।'

[॥ ঈদের চিঠি ॥]।

১৯৫০ সাল সত্যই পূর্ববাংলার কাব্যে পালাবদলের কাল। এ বছর 'নতুন কবিতা' নামে তরুণ কবিদের এক যৌথ কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। তা থেকে কয়েকটি নমুনা এখানে তুলে ধরা গেল :

॥ নদী রূপবতী ॥

'ভুলি না বিচিত্র ভঙ্গে তার প্রিয় গানের আলাপ,
কখনো জলদ মন্দ্রে কখনো বা প্রশান্ত বৈকালী ;
সে আমার দু' নয়নে নৃত্য নিয়ে আসে আর নামে,
প্লাবনের উগ্র স্বাদে, পরিশ্রান্ত শয়নে নতুবা।

অমোঘ নিয়তি জানি দগ্ধ সেনা হতায়ু পাণ্ডুর,
বালির বিষণ্ণ রেখা—মরীচিকা মারীচ-বধিনী ;
প্রতিধ্বনি ফিরে ফিরে আসে শুধু তৃষ্ণার্ত কণ্ঠের।

যাত্রা দূরে, সবল বিস্ফারে আবর্ত বিভায় মুগ্ধ।
চঞ্চলা প্রসাদ রাখে ক্বচিৎ কোথাও : সে তো শুধু
চলিত জাগর। তবু এই চাতকের কান্না তাকে
দুর্বিপাকে বাঁধে—কূলে সেই উচ্ছ্বসিত বিলাপের মত ;
বিফল প্রয়াস তার ভুলে থাকা স্পন্দমান দাহ।
আমি তো ভুলি না তাকে ; গরল দিয়েছে তুলে, তবু
এ-ও জানি : অমৃতের নিশ্চিত আধার শুধু সে-ই।'

[—মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান]

মোহাম্মদ-মনিরুজ্জমানের আর একটি কবিতা :

'গভীর চেতনায় যে ঘণ্টাধ্বনি বাজছে
তাকে আমি কেমন করে ভুলব।
সবুজ আস্তরণটায় যে প্রশান্তি
নির্জন বটমূলে যে বাউল
গানের দ্বিধায় উচ্চকিত যে বাঁশী
তার ছায়া
তার ধ্যান
তার গমক
আমার ব্যাকুলতার প্রিয়চর।'

['চেতনার যে ধ্বনি']

পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক কবিতার নমুনা হিসাবে আরো কয়েকটি প্রতিনিধিমূলক রচনা এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

'পাতাল থেকে আসছি
আমরা, পাতাল থেকে
আসছি
সূর্য জ্বালবার
সোপান খুঁজতে
পাতাল থেকে আসছি।'

[আলাউদ্দীন আজাদ : 'সূর্য জ্বালার সোপান'

দিলওয়ার-এর 'একমুঠো রদ্দুর' থেকে :

'একমুঠো রোদ্দুর কতদূর যায়
নিশানা কি কেউ তার পায় ?
সুমেরুর হাত ধরে কুমেরু কখন্
সেই রোদে করে আলাপন।
আকাশের মন নিয়ে রোদ্দুর তরে
আমরা পৃথিবী জুড়ে রবো।'

অপেক্ষাকৃত তরুণ কবি আজিজুল হক-এর একটি কবিতা থেকে :

'যেন এক সমুদ্রের পাখি
সুনীল রৌদ্র ভেঙ্গে সকালের
রূপালী ডানায়
উড়ে যেতে পারবে না আর
সালুতে ছড়িয়ে ঘাস দেখবে না আর
নিটোল জলের কাছে কাছে
স্থলিত প্রহরে এক মুক্তাবতী
ঝিনুক রমণী শুয়ে আছে।'

কবি হায়াৎ মামুদ :

'প্রিয়তম, প্রিয়তম হে
জীবন তো পদ্মপত্রে জল
আয়ু কেবল গড়িয়ে পড়ে,
হয়ত বা তমসা, তমসাই প্রাণ।'

['বিলাপ']

তরুণ কবি প্রজেশকুমার রায়ও গেয়েছেন 'নূতন দিনে'র গান। তার একটু মূর্ছনা :

'উদয় শিখরে সূর্য বাজায় বীণ—
জাগো, জাগো, জাগো, এলো রে নূতন দিন।
এলো নব যুগ, নব-বিধান,
ওড়ে নূতনের জয় নিশান।

দিকে দিকে ওঠে নূতন দিনের গান ;
আঁধারের দেশে এলো রে আলোর বান।
বিভীষিকাময়ী নিশি হল অবসান ;
নব-জীবনের শুরু হ'ল অভিযান।
মরা গাঙে এলো নব প্রাণ-কল্লোল—
দশদিশি হ'ল আনন্দে উতরোল।
সম্মুখে জাগে অন্তবিহীন পথ
আশা-উজ্জ্বল বিপুল ভবিষ্যৎ।
নীড়ে এলো আজ দূরের আমন্ত্রণ—
পাখা মেলে দিলো বিহঙ্গ কবি-মন।
পূর্ব-অচল সূর্য বাজায় বীণ
নূতন স্বপ্নে দিগন্ত রঙ্গিন।
মাটিতে মিলায় মৃত বিধান,—
ওড়ে সবুজের জয়-নিশান ॥'

শিশু-সাহিত্য

সাহিত্যের অপরাপর ক্ষেত্রের মত শিশু-সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিও পাকিস্তান সরকার সবিশেষ মনোযোগ দেন। উপযুক্ত প্রকাশনের অভাব এ শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টির মূলে দারুণ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৬২ সালের এক সরকারী বিবরণ থেকে জানা যায় যে, মাত্র ৭৩৬ খানি শিশুদের উপযোগী গ্রন্থ পাকিস্তানী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। তাদের মধ্যে মাত্র ১৮৫ খানি হোল জীবনী ; ১৭১ খানি খুন-খারাপী, গুপ্তচর, উদ্ধার, রহস্য কাহিনী ইত্যাদি পুস্তক ; ১৫০ খানি গল্পের বই ; ৫৯ খানি রূপকথা ; ৪২ খানি উপন্যাস ; ৪১ খানি বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প বা প্রাথমিক আলোচনা পুস্তক ; ৩৩ খানি নাটক-নাটিকা ; ১৮ খানি ধর্মবিষয়ক কাহিনী ; ১৩ খানি ছড়া ও ছবির বই ; ১৩ খানি ভ্রমণ-কাহিনী ; আর ১৪ খানি বিবিধ গ্রন্থ।

এ তালিকা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পাকিস্তান সরকার শিশু-সাহিত্যের প্রতি কতখানি উদাসীন ছিলেন।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত শিশুদের জন্য কোন ছড়ার বই প্রকাশিত হয় নি পূর্ব পাকিস্তানে। অথচ খুন-খারাপী ডাকাতি প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ পুস্তকের সংখ্যা ১৭১ খানির উপর। তার মধ্যে আবার ন্যাশন্যাল বুক সেন্টারের পূর্বাঞ্চল শাখার এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানা যায়, ৭৩৬ খানি পুস্তকের মধ্যে ৩৯৫ খানি পুস্তকই এখন বাজারে দুষ্প্রাপ্য। অতএব বাকী রইল মাত্র ৩৪১ খানি শিশু পুস্তক।

প্রকাশিত পুস্তকের মান নিকৃষ্ট হলেও এটা আশার কথা যে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকার প্রায় প্রত্যেকটিরই সঙ্গে একটি ছোটদের বিভাগ সংযোজিত থাকে। যেমন দৈনিক আজাদের 'মুকুল মহফিল', ইত্তেফাকের 'কচি-কাঁচার আসর' ও সংবাদের 'খেলাঘর'। 'মুকুল মহফিলে' এককালে বর্তমান অনেক খ্যাতনামা ও প্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যিকেরই হাতে-খড়ি হয়েছিল। শিশুদের মাসিক পত্রের মধ্যে 'সবুজপাতা' উল্লেখযোগ্য।

এ সকল ছোটদের আসরে ছড়া, কবিতা, গল্প, ধাঁধাঁ, ভ্রমণ-কাহিনী ও বিজ্ঞানের পরিচয় এবং রূপকথা প্রভৃতি নানা বিষয়ের মনোরম কাহিনী দেখা যায়। মান সব সময় উচ্চ না হলেও কিশোরদের রচনা বলে তাদের মূল্য নেহাৎ কম নয়। বস্তুতঃ, ছোটদের পত্র 'মুকুল' (সম্পাদক: আবদুল্লাহ আল্‌মুতী), 'মিনার' (সম্পাদক: ফৌজিয়া সামাদ), 'সবুজ নিশান' (সম্পাদক: সৈয়দ আবদুল মান্নান), 'হুল্লোড়' (সম্পাদক: ফয়েজ আহমদ) এবং 'শাহীম' ও 'সিতারা' (সম্পাদক: সরদার জয়েনউদ্দীন) প্রভৃতির অবদান অনস্বীকার্য।

পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের মধ্যে গোলাম মোস্তাফা, জসীমউদ্দীন, কাদের নওয়াজ, মোহাম্মদ মঈন উদ্দীন, বন্দে আলী মিঞা, মোহাম্মদ নাসির আলী প্রমুখ কবি ও কথাশিল্পী এবং হালের ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, তালিম হোসেন, শওকত ওসমান, হোসনে আরা, ফয়েজ আহমদ, হাবীবুর রহমান, আশরাফ সিদ্দিকী, আজিজুর রহমান, সিকান্দর আবুজাফর, আতোয়ার রহমান, নুরুল ইসলাম কাব্যবিনোদ, সৈয়দ আবদুল মান্নান, মুফাখ খারুল ইসলাম, গোলাম রহমান, চৌধুরী ওসমান, প্রজেশকুমার রায়, আবদুল রহমান, কাজী গোলাম আকবর, ফকরুজ্জামান চৌধুরী, আলি কামাল, আবদুল ওহাব,

হেদায়েত হোসেন মোরশেদ, বেনজীর আহম্মদ, মনোমোহন বর্মণ, আবদুস সাত্তার, কাজী আবুল কাসেম প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কেবল বড়দের নয়, শিশু সাহিত্যেও। ['মাহে নাও']

পূর্ব বাংলার জনসংখ্যা গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, পর্তুগাল, আরব, পারস্য, তুর্কি প্রভৃতি দেশের চেয়ে বেশী। এ সোনার বাংলাকে কেবল জনে নয়, ধনে ধান্যে, জ্ঞানে গুণে, শিল্প-বিজ্ঞানে পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশের সমকক্ষ হতে হবে। তাই কেবল কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না; দর্শন, ইতিহাস, ভুগোল, গণিত, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল বিভাগে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যকে উচ্চ আসন নিতে হবে। আর তা সম্ভব, শিক্ষার মাধ্যম যদি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আগাগোড়া বাংলা করা হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি 'নুরনামার' লেখক আবদুল হাকিমের একটি কথা এখানে তুলে ধরলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না আশা করি:

'যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণএ না জানি॥
দেশী ভাষা বিদ্যা জার মনে না যুয়াএ।
নিজ দেশ তেয়াগি যেন বিদেশ না জাএ॥
মাতাপিতা মোহো ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মন হিতয়তি॥'

কথা সাহিত্য

পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে মীর মুশারাফ হোসেন লিখিত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বিষাদ-সিন্ধু' ছিল মুসলিম লেখকদের লেখা একমাত্র স্মরণীয় গ্রন্থ। একে পাথেয় করেই আধুনিক পূর্ব পাকিস্তানের কথা সাহিত্যের যাত্রাপথ শুরু বলা চলে। তবে মীর মুশারাফ হোসেনের এ উপন্যাস রচিত হয়েছিল অবিভক্ত বাংলায়। পাকিস্তান সৃষ্টির বহুকাল আগে। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে। বিষাদ-সিন্ধু তিন পর্বে বিভক্ত। মহরমের মূল কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এজিদের সঙ্গে খলিফার পদ

নিয়ে হজরত মহম্মদের দুই দৌহিত্র হাসান ও হোসেনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মৃত্যুবরণ সকরুণ এ গ্রন্থের উপজীব্য।

মীর মুশারাফ হোসেনের মত ইসমাইল হোসেন সিরাজীও ঐসলামিক সংস্কৃতির পটভূমিকায় খানকয়েক উপাখ্যান রচনা করেন। তবে এগুলি নিছক উপকথা জাতীয়। প্রকৃত উপন্যাস বলা যায় না। পরবর্তী অধ্যায়ে মোজামূল হক, কাজী ইমদাদুল হক, লুৎফুর রহমান ও আরও অনেকে উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের রচনা রোমান্টিক ভাবালুতা ছাড়া আর কিছু নয়। কেবল ইমদাদুল হকই তাঁর উপন্যাস 'আবদুল্লা'য় কিছুটা সমাজ সচেতনতার পরিচয় দেন। 'আবদুল্লা' উপন্যাসে তিনি দু শ্রেণী লোকের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। এদের এক শ্রেণী হোল ধর্ম ও সংস্কারে বিশ্বাসী। আর অপর শ্রেণী আধুনিক মতবাদ ও যুক্তিবাদে বিশ্বাসী। এ দু মতবাদের সংজ্ঞা চিত্রিত হয়েছে কাজী ইমদাদুল হকের উপন্যাস 'আবদুল্লায়'। লুৎফুর রহমানের উপন্যাসেও মানবতার চিত্র অঙ্কিত রয়েছে।

এদের পরবর্তী যুগে অ-বিভক্ত বাংলার বহু মুসলিম লেখক বাংলা কথাশিল্পের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখেন। তাঁদের মধ্যে ওয়াজেদ আলী, সাহাদাদ হোসেন, ইব্রাহিম খাঁ, আকবর উদ্দিন, সেখ ফজলুল করিম, আবুল মনসুর আহমেদ, মহবুবুল আলম ও আবুল ফজল। কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবি ও সুরকার হিসাবে সর্বজন পরিচিত হলেও প্রথম জীবনে তিনি উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মহ্‌বুবুল আলম পাক-স্বাধীনতার প্রাক্‌কাল থেকে শক্তিশালী লেখনী ধারণ করে আসছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা 'মফিজান'। এ উপন্যাসে তিনি অন্তঃদৃষ্টির সঙ্গে মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজের চিত্র অঙ্কিত করেছেন মনোবিকলন ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে। একান্ত সহৃদয়তার সঙ্গে তিনি তাঁর চরিত্রগুলি অঙ্কিত করেছেন। ডি. এইচ. লরেন্স-এর নারী চরিত্রের সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়।

আবুল ফজল ছোট গল্প লিখিয়ে হিসেবে খ্যাতিমান। শ্রেণী সংগ্রামের ঘূর্ণ্যাবর্তে আকৃষ্ট না হলেও সমাজ সচেতন চরিত্রগুলি তাঁর সজীব ও প্রাণবন্ত। ভাষাও সহজ, সরল এবং অনাবিল। মহ্‌বুবুল আলমের মত তিনিও নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র অঙ্কিত করেছেন।

সৈয়েদ ওয়ালীউল্লাহ আধুনিক পাকিস্তানী কথা সাহিত্যের বিশিষ্ট একটি নাম। তাঁর সর্বাধিক প্রচারিত উপন্যাস 'লালশালু'। ইংরাজী ও ইউরোপের একাধিক ভাষায় এ উপন্যাসখানি আজ অনূদিত। এই উপন্যাসে তিনি সামাজিক গলদ তুলে ধরেছেন সহানুভূতির সঙ্গে। আর তা করতে গিয়ে তিনি তাঁর শিল্পী মনের ব্যতিক্রম ঘটান নি কোথাও। হন নি লক্ষ্যভ্রষ্ট। সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি কেবল বস্তুনিষ্ঠ নন, বাস্তববাদীও। চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ মনোবিশ্লেষণে তিনি হলেন কুশলী শিল্পী।

তাঁর 'লালশালু' উপন্যাসটির ফরাসী অনুবাদ সম্পর্কে 'ওরিয়েন্ট' পত্রিকা বলেছেন : একটি বলিষ্ঠ ও মনোরম সামাজিক চিত্র, যেখানে ঘৃণা হচ্ছে প্রেমেরই রূপান্তর। প্রসঙ্গত, সৈয়দ সাহেব ব্যক্তিগত জীবনে ফ্রান্সে অবস্থিত পাকিস্তানী এ্যামব্যাসীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরূপে। যদিও ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর নাম, তবু ছোট গল্পকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি স্বল্প নয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ওপর লেখা ছোট গল্প একটি তুলসী গাছের আত্মকথায় তিনি অসাধারণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দাঙ্গার মূল্যায়ন করেছিলেন। কলকাতার 'পূর্বাশা প্রকাশনী' তাঁর 'নয়নচারা' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশিত গ্রন্থ 'অমাবস্যার চাঁদ'-এ স্ট্রীম অব কনশাসনেস-এর কাজ আছে।

ওয়ালীউল্লাহর 'লালশালু'র কাহিনীটি এখানে লিপিবদ্ধ করা গেল :

'লালশালু' হচ্ছে মজিদের বিশ্বাস, ভালোবাসা আর ঘৃণার উপাখ্যান। সে তার শস্যহীন দেশ ত্যাগ করে ধনধান্যপূর্ণ ভূমিতে এসেছিল মৌলভী হয়ে। সে 'অধার্মিকদের' বিশ্বাস করাতে পেরেছিল যে আল্লার জন্যেই ধান হয় অজস্র। কোরাণ হেফাজ না করলে বেহেস্তে যাওয়া যায় না। মহব্বতনগর গ্রামে মজিদ মৌলভী হয়ে নিজের ঘরবাড়ি বানালো আর গড়ে তুললো লালশালুতে আবৃত এক মাজার। অবশেষে সে বিয়ে করলো রহিমাকে। কিন্তু রহিমার গর্ভে মজিদের কোন সন্তান জন্মালো না। বাধ্য হয়ে জমিলা নামে একটি কিশোরীকে বিয়ে করলো মজিদ। কিন্তু রহিমার মতন সে কোরাণ হেফাজ করতো, মাজার মান্তো না। মজিদ ক্রমশঃ যতই তাকে মহবৎ শেখায় ততই সে আরো বেশি অসহিষ্ণু হয়। —অবশেষে সে হাল ছেড়ে দেয়। মাঠে বেরিয়ে দেখে

আগের দিন রাত্রের শিলাবৃষ্টিতে ক্ষেতের সমস্ত ধান ঝরে গেছে। এই প্রথম গ্রামের লোকেরা তাকে প্রশ্ন করে 'এইবার নিজেই বা খামু কী, পোলাপানদেরই বা দিমু কী?' মজিদের জীবনের এই গোপন ব্যর্থতাকে একটি কিশোরীই প্রথম নগ্ন করে দিল তার নিজের কাছে।

মজিদই 'লালশালু' উপন্যাসের নায়ক। মজিদ ভবঘুরে, মজিদ ভাগ্যান্বেষী। নদীবিধৌত চট্টগ্রামের ঊর্মি-মেখলা একদিকে, অন্যদিকে শৈলচূড়ার স্তব্ধ মহিমা। মাঝখানে অরণ্যের মর্মর ও অবহেলিত গ্রাম-জীবনের নিস্তরঙ্গ কর্মধারা। মজিদ, দুটি লুংগী, একটি ছিন্ন সার্ট আর আধা ফকিরের ফেজ নিয়ে একদিন মহব্বতপুরের ছোট গ্রামে এসে পৌঁছলো। জলা-জংগলাকীর্ণ এক জায়গাতে সে একটি কবরখানা দেখতে পেল। নিরক্ষর গ্রামবাসীদের জীবনধারা সে লক্ষ্য করলো। আল্লাহের প্রতি তাদের না বীতরাগ, না গভীর শ্রদ্ধার চিহ্ন সে দেখতে পেল। গ্রামের সকলের কাছে সে প্রচার করলো স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সে এই গ্রামে এসেছে আল্লাহ-র নাম প্রচারের উদ্দেশ্যে। এ গ্রামেই পীরশাহ সাদিকের কবরখানা আছে, সেখানেই আল্লাহ সকলের পূজা নেবেন। সরলপ্রাণ গ্রামবাসীরা তাঁকে বিশ্বাস করলো। ধীরে ধীরে কবরখানার রূপ ফিরলো। নামাজের সংগীততরঙ্গ গ্রামবাসীদের ভয় ও ভক্তিকে আপ্লুত করলো। মজিদ রাত্রে আল্লাহর কাছে কাঁদলো, মনে মনে গ্রামবাসীদের এভাবে প্রতারণা করবার জন্য। আবার মনে মনে সে যুক্তির কাঠামো সাজালো। সে বাঁচতে চায়, ভালভাবে বাঁচতে। এ প্রতারণার মধ্য দিয়ে সুদিন আসবেই সে বুঝতে পেরেছে। হোক প্রতারণা তবু ত এ ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণার পথ। অতএব, এ প্রতারণা তার কাছে গুরুভার বলে বোধ হল না।

দরগার মহিমা ধীরে ধীরে সকলকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করলো। মজিদ জমি কিনলো। রহিমাকে বিয়ে করলো। স্বচ্ছল সংসারী হল সে। গ্রামের জমিদার খালেক তাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। বেশ সুখ আর প্রতিপত্তিতে দিন কাটাচ্ছিল সে। কিছুকাল পরে পাশের গ্রামে এক খ্যাতনামা পীর সাহেব এলেন। মজিদের প্রতি ভক্তির জোয়ারে একটু ভাঁটা পড়লো। দীর্ঘ দ্বাদশ বছরেও তাদের সন্তান সন্ততি হল না। জামিলা নামে আর একটি মেয়েকেও বিয়ে করলো। অবোধ বালিকা

জামিলা কিন্তু মজিদকে অতটা শ্রদ্ধা করে না। ফলে তার ওপর মজিদের পীড়নের অন্ত নেই। খালেকের প্রথমা স্ত্রীরও ছেলেপুলে নেই। মন্ত্রপূত জল দেবার প্রতারণা মজিদ করেছে। ধীরে ধীরে সেই পবিত্র রমণীর আকুল কান্না এবং অবশেষে তার উন্মাদ অবস্থার কথা নৈপুণ্যের সঙ্গে রচনা করেছেন কাহিনীকার।

এর পর প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিল। দারুণ ঝড়ে সব ফসল নষ্ট হল। মজিদ আল্লাহ-র মহিমা ঘোষণা করতে চায় এই বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েও। তারপর এলো সর্ববিধ্বংসী বন্যা। সমগ্র অঞ্চলকে গ্রাস করলো এই বন্যা। খালেকের ঘরে সব গ্রামবাসী আশ্রয় নিয়েছে। মজিদের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন খালেক। কিন্তু সাড়া দেয়নি মজিদ। কারণ দরগা ছেড়ে সে গেলে আল্লাহ-র মহিমা প্রচার খর্ব হবে। অবশেষে প্রাণ রক্ষার তাগিদে এক বুক জল কেটে কেটে মজিদ রহিমা ও জামিলাকে পৌঁছে না দিয়ে পারেনি খালেকের নিরাপদ আশ্রয়ে। কিন্তু নিজে সে আবার ফিরে এলো দরগার কাছে। প্রতারণার মধ্য দিয়ে ধর্ম প্রচারে নেমেছিল আজ আল্লাহ তার অন্তরে সত্যই ধর্মের প্রদীপ জ্বেলেছেন বুঝি!

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ নিঃসন্দেহে শিল্পীমনের অধিকারী কিন্তু তাঁর শিল্পসত্তা উদ্দেশ্যমুখীন।

আবু রুশদও পাকিস্তান সৃষ্টির আগে থেকে গল্প উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। মুসলিম সমাজের দৈনন্দিন চিত্র ও সমাজ চিন্তা তাঁরও কাহিনীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তিনি গতানুগতিক ধারার লেখক। সাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার খুব একটা পক্ষপাতী নন। 'সামনে নতুন দিন' তাঁর সমসাময়িক যুগে একটি সার্থক আলেখ্য। এ যুগে আর একজন যশস্বী লেখক হলেন সামসুদ্দীন আবুল কালাম। বাংলার গরীব, নিরন্ন মুসলমানদের কথাই তিনি তুলে ধরেছেন বহুবিধ গল্প উপন্যাসে যথাযথ ভাবে। সামসুদ্দীন আবুল কালামের রচনাভঙ্গী কাব্যিক সুষমামণ্ডিত। বাংলার কৃষাণদের জীবনযাত্রা তাঁর সার্থক লেখনীতে অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

আবু ইসাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ী'ও একটি নিখুঁৎ উপন্যাস। পল্লী

বাংলার নিরন্ন, দারিদ্র্যক্লিষ্ট সমাজচিত্র অঙ্কিত করেছেন তিনি এই 'সূর্য দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে।

পূর্ব পাকিস্তানে সব সাহিত্যশাখাকেই উচ্চ রুচির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চলেছে। এবং যাঁরা ভাষার জন্যে প্রাণ দিতে পারেন তাঁরা তা পারবেনও। এপারে ছোট গল্প এবং উপন্যাসের যেমন নতুন নতুন শিল্পী এসেছেন, সীমান্তের ওপারেও তেমনি তাঁদের নিজস্ব রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক চেতনা নিয়ে এসেছেন বহু সার্থক স্রষ্টা। তাঁদের মধ্যে চারজন ঔপন্যাসিকের কথা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। এ চারজন ভিন্ন বয়সী এবং ভিন্ন ধারণাকে বহন করছেন। তাঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ হচ্ছেন আবু ইসহাক। তিনি অবিভক্ত বাংলা দেশেরই লেখক ছিলেন। পরে পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান। তাঁর যে উপন্যাসটি সর্বাধিক খ্যাতি পেয়েছিল সেই 'সূর্য দীঘল বাড়ী' বইটির প্রতি অন্নদাশঙ্কর রায় মশাই প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গ্রামের শেষ প্রান্তের বাড়ীটিতে সূর্য লম্বালম্বি ছায়া, এবং তা নাকি এক অশুভ লক্ষণ। এ অশুভ চেতনা বাড়ীর গৃহকর্ত্রীকে সর্বদা আচ্ছন্ন করে আছে। একা থাকেন তিনি তাঁর ঘরে। পাশে থাকেন অন্যান্যরা। মাঝে মাঝে প্রৌঢ় মৌলভী এসে গল্প করেন, কখনও বা রসিকতাও। কিন্তু তিনি যেদিন পান খেতে চাইলেন তাঁর হাতে সাজা তখন এ একাকী মহিলা—স্বামী পরিত্যক্তার আর কোন সন্দেহ রইলো না। তাঁর ছোট্ট মেয়েটি মাঠের ওপারে থাকা বাবার কাছে রোজ যেত। কিন্তু মা একদিন যেতে বারণ করলেন বর্ষার জন্যে। অথচ মেয়েটি যাবেই। বাড়ীর বাইরে এসে দেখলো সমস্ত মাঠ জলে থই থই করছে। বাবার কাছে যাবার কোন রাস্তাই খোলা নেই। অনেক আধুনিক লেখক শিকড়-হীনভাবে যে 'এ্যালিয়েনেসনের' কথা বলেন আবু ইসহাক এক গ্রামিক সত্তার মধ্যে দিয়ে রূপকাশ্রিত সত্যের মারফত তা বলার চেষ্টা করেছেন। পাকিস্তানের 'আদমজী পুরস্কার'-প্রাপ্ত এ উপন্যাসটি কিন্তু প্রথম বেরিয়েছিল কলকাতা থেকেই—পরে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

['পূর্ব পাকিস্তানের চারজন ঔপন্যাসিক' : 'গ্রন্থবার্তা' : যুগান্তর]

আবু ইসহাকের পর যাঁর নাম সঙ্গত কারণেই উঠতে পারে, তিনি আলাউদ্দীন আল আজাদ। ইনি চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের বাংলা

বিভাগের প্রধান। মূলত তিনি গল্পকার কিন্তু উপন্যাসও লিখেছেন বেশ কিছু। তাঁর এ যাবৎ কাল 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসটিকেই শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলা হয়ে থাকে। এটিও আদমজী পুরস্কার পেয়েছিল।

এক ছিন্নমূল পরিবারের অবক্ষয় এবং তার থেকে উত্তরণের কথা বলা হয়েছে এ উপন্যাসে। রাজুর বাবা মা আর বোনটি গ্রামের দুর্ভিক্ষের জন্যে চলে আসে ঢাকা শহরে। কিন্তু শহর তো সব সময়েই সর্বগ্রাসী। তাই রাজুর যে কবি-মন তা আস্তে চোখ খুলে দেখলো : তার মা লজ্জা-শীলতা ত্যাগ করে অপরের বাড়ীতে চাকরি নিল, বাবা পথ হারিয়ে ফিরে আসার সময় দুর্ঘটনায় মারা গেল এবং বোন পতিতাবৃত্তি নিতে বাধ্য হলো। রাজু নিজের জীবনের দিক থেকে বুঝেছে যে তারা ছিন্নমূল শুধু নয়, দুঃখ শুধু তাদেরই নয়—সেলিনা চৌধুরীও আত্মহত্যা করলো এক গভীর দুঃখের জন্যে, তার প্রেমের কোন মূল্য বোধ স্বীকৃত হয়নি বলেই। অথচ সেলিনা চৌধুরীরা বড়লোক, অন্য জগতের বাসিন্দা। এ সমস্ত শিক্ষা তো ব্যর্থ হবার নয়—সে পথে বেরিয়ে পড়লো তার পতিতা বোনকে খুঁজে আনতে। চট্টগ্রামের মিলিটারী ব্যারাকে তার বোন ছিল একথা সে খবর পেয়েছিল। পথে অন্ধকার হয়ে এল। কার যেন গলা শুনলো—কোন মেয়েমানুষ, সবেমাত্র মা হয়েছে। রাজু সে মেয়েটির প্রতি সমস্ত মমতা এবং ভালোবাসা দিয়ে তার সন্তানকে কোলে তুলে নিল এবং তাকে জড়িয়ে ধরে দূর সমুদ্রের গর্জন শুনতে পেল। আর কিছুক্ষণ পরেই শীত শেষ হয়ে যাবে, সূর্য উঠবে তার আশ্বাস নিয়ে। আলাউদ্দীন আল আজাদের লেখা যে কোন মুহূর্তেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করাবে—কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সামাজিক চেতনা এবং বিশ্বাস ছিল আলাউদ্দীন সাহেব বোধ হয় তা দেখাতে পারেন নি। রাজু নামক কিশোরটি যে তার যৌবনের স্বীকৃতি পেল ধীরে ধীরে চোখ কান খোলা অবস্থায়, তাকে প্রকৃতপক্ষে মনে হবে বিভূতিভূষণের অপুর ঠিক বিপরীত মেরুতে চলাফেরা করছে। আলাউদ্দীন আল আজাদকে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য সমালোচকরা বলেছেন 'দেহবাদী'। প্রকৃতপক্ষে সুফী ধর্মের দেহবাদই তাঁর সাহিত্যকে বেশি প্রভাবান্বিত করেছে। তিনি দেহকে ছাড়িয়ে তাঁর আশ্রিত দুঃখকে পেরিয়ে এক অমর্ত দেহ-

হীনতায় কি যেতে চেয়েছেন? যা প্লেটোনিক এবং ধর্মবোধের আধার হয়ে থাকবে?—[ঐ : 'গ্রন্থবার্তা' : যুগান্তর]

সর্বকনিষ্ঠ লেখক শহীদুল্লাহ কায়সার 'সারেং বৌ' লিখেছিলেন জেলে থাকার সময়। প্রগতিশীল সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এ লেখক প্রত্যক্ষ রাজনীতিতেও একজন স্বীকৃত নেতা—তাঁকে বহু বছর কারাবাসে কাটাতে হয়েছে এ কারণেই। প্রথম বই 'সংসপ্তক'কে এপিক ধর্মী লেখা বলা হয়ে থাকে। অন্যান্য বইগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে 'রাজবন্দীর রোজনামচা'।

সারেং তার স্ত্রীকে রেখে জাহাজে চাকরি নিয়ে বিদেশ গেছে। এদিকে বিবি দুঃখে আর ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়। গ্রামের জোতদার চৌধুরী তার পেছনে লাগে কিন্তু বিবি তা প্রত্যাখ্যান করেন—করেন প্রতিরোধ। একদিন সারেং ফিরে এলো তার বিবির কাছে। সমস্ত উষ্ণতা আর ভালোবাসার আনন্দে দিন কাটাতে লাগলো। কিন্তু একদিন ঝড় আর বন্যায় তাদের সব আশ্বাস ভেস্তে গেল। শুধু তারা দুজন গাছের ডাল আঁকড়ে কোন রকমে বেঁচে রইলো। তারা দুজনেই আদম এবং ইভের মতন আদি পিতামাতা হয়ে বেঁচে রইলো নতুন মানব সভ্যতার।—['পূর্ব পাকিস্তানের চারজন ঔপন্যাসিক' : 'গ্রন্থবার্তা' : যুগান্তর]

সমকালীন পূর্ব পাকিস্তানী কবিতার মতো আধুনিক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও পরীক্ষা নিরীক্ষার অন্ত নেই। এ নতুন দলের কথা সাহিত্যিকদের মধ্যে সৌকত ওসমান হলেন অগ্রণী। সামাজিক বিশ্লেষণ ও সমালোচনা তাঁর রচনার অন্যতম। সমাজের শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণীসংঘাতের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে। সমালোচকদের মতে, 'নদীতে যারা দাঁড় টানে সে সব মাঝি মাল্লা আর মুনিবের খানা যারা বানায় সে সব বাবুর্চীদের কথা। কিংবা দুঃস্থ কৃষাণদের কথা তিনি লিখেছেন তাঁর উপন্যাসে। এমনিধারা বঞ্চিত মানবাত্মার চিত্র অঙ্কনে তিনি মূল সমাজ ব্যবস্থার প্রতি কটূক্তি করতে ছাড়েন নি। 'ক্রীতদাসের হাসি' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এ উপন্যাসের জন্য তিনি 'আদমজী পুরস্কার' দ্বারা ভূষিত হন।

আলাউদ্দীন আল্ আজাদও শক্তিশালী লেখক সন্দেহ নেই, তবে সৌকত ওসমানের মত তিনি সামাজিক শ্লেষ বিদ্রূপে তত মুখর নন।

শ্রেণীসংঘাতের চিত্রাঙ্কন তিনিও করেছেন। তবে তিনি সহানুভূতি ও সমবেদনার কথা বিস্মৃত হননি। আলাউদ্দীন অল্ আজাদ—কুশলী শিল্পী। তিনি তাই তাঁর নিজস্ব মতবাদকে পাঠকপাঠিকার ঘাড়ে চাপান নি।

সর্দার জয়নুদ্দীনও ছোট গল্প লেখক হিসেবে এঁদের স্বগোত্রীয়। তিনি একাধিক সার্থক ছোট গল্প রচনা করে যশস্বী হয়েছেন। তবে হালের রচনায় তিনি শ্রেণী-সচেতনতার মতবাদকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি। শহীদ আলী একদা সার্থক গল্প লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। উত্তর বাংলায় ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকদের জীবনযাত্রা ছিল তাঁর এ সব গল্পের বিষয়বস্তু। তাঁর লেখনী ধারা আজ শীর্ণকায় হয়ে এলেও নিখুঁৎ কাহিনী হিসেবে তাঁর গল্পগুলি অনবদ্য। অপরাপর শক্তিমান লেখকদের মধ্যে সৈয়দ সামসুল হক, শহীদ সবির, জাহির রেইহান, শহীদ করিম, আবদুর রজ্জক ও সৈয়দউল্লা কাজী সবিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। এঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ রচনা রীতিতে বৈশিষ্ট্য। জাহির রেইহান, শহীদ করিম, আবদুর রজ্জক ও সৈয়দউল্লা কাজীও 'আদমজী পুরস্কার' লাভ করেছেন।

নাটক

আধুনিক নাট্য সাহিত্যেও পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাঙলা পিছিয়ে নেই। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে মুসলমান লেখকরা নাটক রচনায় খুব একটা আগ্রহশীল ছিলেন না। এর কারণ যাই থাক, মুশারফ হোসেন, মহম্মদ আবদুল করিম, নজরুল ইসলাম, ইব্রাহিম খাঁ, মাহদা হোসেন, আকবরউদ্দীন ও নরুল মোমেন প্রমুখ বহু শক্তিশালী সাহিত্যিকই নাটক রচনায় কিন্তু এগিয়ে এসেছিলেন।

প্রাক-স্বাধীনতা যুগে মীর মুশারফ হোসেনই প্রথম নাট্য রচনায় অগ্রণী হন মুসলমানদের মধ্যে। তিনি তাঁর 'জমিদার দর্পণে' জমিদারী প্রথার কুফল তুলে ধরেন দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণের' মত। সামাজিক অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে, মুসলমান লেখকদের মধ্যে এটিই প্রথম বাংলা নাটক। 'নীলদর্পণ' আর 'জমিদার দর্পণ'-এর পরবর্তীকালে যে জাতীয়তার ঢেউ বাঙলা বইয়ে প্রবাহিত হতে থাকে তাতে বাঙালী

মুসলমানের দানও কম ছিল না। ইব্রাহিম খাঁ ও শাহাদাত হোসেনের নাটকই তাঁর প্রমাণ। নবজাগ্রত তুরস্কের অনুপ্রেরণায় নাটক রচনায় তাঁরা বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। ইব্রাহিম খাঁ তুরস্কের নবনায়ক কামাল পাশা ও জগলুল পাশাকে কেন্দ্র করে দুখানি নাটক লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর লেখা 'কোফেলা'য় তিনি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত করে তুলেছেন। শাহাদাত হোসেনও শরফরাজ খাঁ, নবাব আলীবর্দী, 'আনারকলি', মসনদে মোহা প্রভৃতি বহু ঐতিহাসিক নাটক লিখে গেছেন।

মূলতঃ কবি ও সুরকারই ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তবুও প্রথম জীবনে তিনি কিন্তু 'ঝিলিমিলি' ও 'আলেয়া' নামে দুখানি রোমান্টিক গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। আনোয়ার পাশা, কামাল পাশা ও চিরঞ্জীব জগলুলদের নিয়ে একাধিক কবিতাও তিনি লিখেছেন।

পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক নাট্যকারদের মধ্যে আকবরউদ্দীন বৈশিষ্ট্য অর্জন করেন। 'সিন্ধুবিজয়' তাঁর প্রথম রচনা। মহম্মদ বিন কাসিম-এর সিন্ধু দেশ জয়ের পটভূমিকায় এ নাটক লিখিত। 'নাদিরশা' নামে তিনি অনুরূপ আরও একখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। .'আজান' আকবরউদ্দীনের একখানি সামাজিক মনোজ্ঞ নাটক। আবুল ফজল কোয়েদ-ই-আজম-এর ঘটনামুখর জীবন নাট্য নিয়ে একটি নাটিকা লিপিবদ্ধ করার প্রয়াসী হন। তবে তিনি খুব একটা সাফল্য অর্জন করেছেন বলা যায় না।

পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে নুরুল মোমেন হলেন সকলের অগ্রণী। নুরুল মোমেনের প্রথম নাটক 'নেমেসিস' বা নিয়তি প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। পূর্ব পাকিস্তানের সার্থক সর্ব প্রথম নাট্য প্রচেষ্টা হিসাবে তাঁকে সাদরে বরণ করে নেওয়া হয়। নরুল মোমেনের দ্বিতীয় নাটক হল 'রূপান্তর'। রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'র সঙ্গে 'রূপান্তরে'র অনেকখানি সাদৃশ্য রয়েছে চরিত্র সৃষ্টি ও ভাষার দিক থেকে। তাঁর হালের নাটক 'নয়া খণ্ডন' পূর্ব পাকিস্তানের নতুন নাট্য আন্দোলনের দিগন্ত দিশারী। অপরাপর নাট্যকারদের মধ্যে আস্কর ইবনে শেখ, শৌকৎ ওসমান, মুনীর চৌধুরী প্রমুখ তরুণ সাহিত্যিকরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আস্কর ইবনে শেখের সার্থক নাটক হল 'বিরোধ', 'পদ্মা',

'তিতুমীর' ও 'অগ্নিগিরি' প্রভৃতি। তিনি তাঁর প্রতিটি নাটকে পূর্ব-বাংলার গণ-জীবনকে উত্থাপিত করবার চেষ্টা করেছেন। 'অগ্নিগিরি' ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় রচিত দেশাত্মমূলক সার্থক রচনা।

শৌকৎ ওসমান কবি ও ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু খ্যাতিমান নাট্যকার রূপেও তিনি আপন আসন করে নিয়েছেন। 'তস্কর ও তস্কর' আর 'আমলার মামলা' তাঁর দুখানি প্রহসন। 'কামারমনি' নাটকে তিনি বাস্তব ও রূপকথার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। মুনীর চৌধুরী তাঁর একাঙ্ক নাটিকা 'কবর'-এ সার্থকতার সঙ্গে সামাজিক সত্যকে রূপায়িত করেছেন। তীক্ষ্ম ও বলিষ্ঠ সংলাপের জন্য তিনি বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখেন। রসজ্ঞানও তাঁর তীক্ষ্ণ। পাণিপথ যুদ্ধের পশ্চাদপটে লিখিত তাঁর নাটক 'মানুষ ও রক্তপ্রান্তর' অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসন তাঁকে দান করেছে সার্থক নাট্যকার রূপে। তিনি জর্জ বার্নাড শ'র প্রহসন 'ইউ নেভার ক্যান টেল' মাতৃভাষায় অনূদিত করেন।

কবি জসীমুদ্দীন 'বেদের মেয়ে'তে লোক-নাট্যের ঢঙে এক সাপুড়ে বধূর করুণ কাহিনী তুলে ধরেছেন। হাজীমুদ্দীন-এর 'মহুয়া' এমনি ধারা আর একখানি গীতিনাট্য। ফারুক আহম্মদের গীতিনাট্য 'নওফেল ও হাতেম' পূর্ব বাংলার নাট্য আন্দোলনের আর এক নতুন নিরীক্ষা। রোমান্স ধর্মী ছন্দবদ্ধ তাঁর আবেগময় সংলাপ নতুন এক সম্ভাবনার দিক তুলে ধরেছে। সৈয়দ আলীউল্লাহ সর্বজনবরেণ্য কথাশিল্পী এবং মূলতঃ ঔপন্যাসিক হলেও কিন্তু নাট্য রচনায় পিছিয়ে নেই। তিনি পি. ই. এন. পুরস্কারও লাভ করেন। অপরাপর তরুণ নাট্যকারদের মধ্যে ইব্রাহিম খলিল, গোলাম রহমান, আশরফ উজ্জমান, ওবেদুল হক, আবদুল হক প্রমুখ অনেকেই আজ অগ্রণী।

।। সমালোচনা ।।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর—স্বাধীনতার পর ঐসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্যালোচনা করেন বুঝি নজরুল ইসলাম। এ আলোচনায় তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মুসলমানদের অবদানের প্রতি বিশেষ করে জোর দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ শহীদুল্লাহর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' ও 'বাংলা ভাষার ইতিহাস' প্রামাণ্য এ দুখানি গ্রন্থ তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও বাংলার ঐতিহ্যের প্রতি গভীর

অনুরাগের পরিচয় দেয়। আবদুল লতিফ চৌধুরীর 'বাংলা ভাষার ইতিহাস'ও আর একখানি সংযোজক। ডঃ এনামুল হকের 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে মুসলমানদের অবদানের বহু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এর ইংরাজী অনুবাদও বিশেষ ভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সৈয়দ আলী আসরফ-এর 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম' ভাবধারা ও মুসলিম ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। মহম্মদ-মনসুর উদ্দীনের 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা'ও আর একখানি বিশেষ চিন্তাশীল গ্রন্থ।

'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'ই বোধ হয় এ ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এর লেখক হলেন সৈয়দ আলী আহসান ও মোহম্মদ আবদুল হাই। উভয় লেখকই সমালোচকের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করেছেন। ডঃ কাজী দীন মহম্মদের 'সাহিত্য সম্ভার'ও একখানি সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থ। ডঃ কাজী আবদুল মানানের সাম্প্রতিক রচনা 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা'য় গবেষণামূলক বহু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। 'বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম মানস'ও আর একখানি বিশিষ্ট রচনা। আনীসউজ্জমান হলেন এর লেখক। ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম-এর 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সমাজ ও বাংলা নাটক' গ্রন্থে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও বাংলা মননের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। ডঃ নীলিমা ইব্রাহিমের আর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল 'শরৎ প্রতিভা'। শরৎ সাহিত্যের মূল্যায়ন করেছেন তিনি মুনশিয়ানার সঙ্গে এ পুস্তকে।

কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য ও জীবনী নিয়ে সম্প্রতি বহু গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। সৈয়দ আলী আহসান কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী ও কাব্যালোচনা করেছেন একান্ত দরদের সঙ্গে। তাঁর গ্রন্থই হল নজরুল কাব্য প্রতিভার সঠিক মূল্যায়নের প্রথম গ্রন্থ। কাজী মোতাহের হোসেনের 'নজরুল কাব্য পরিচিতি' আর একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। সাহিত্য আলোচনা ছাড়াও বাংলা সংস্কৃতি বিষয়ক একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে সম্প্রতি। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সাহিত্য সংস্কৃতি কথা' সত্যিই একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। মোহম্মদ আবদুল হাই-এর 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'ভাষা ও সাহিত্য' এবং 'তোষামদ ও রাজনীতির

ভাষা' প্রভৃতি গ্রন্থ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। আবুল ফজলের রচনা 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধন' এবং আবুল কালাম সামসুদ্দীন-এর 'দৃষ্টিকোণ' এ ক্ষেত্রে সার্থক প্রচেষ্টা। ডঃ মাঝরুল ইসলামের 'সাহিত্য পথে' ও আহম্মদ রফির 'শিল্প-সংস্কৃতি জীবন'ও দুখানি বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থ। সাহিত্য সমালোচনার মূল ধারা ও পদ্ধতি এবং অলঙ্কার শাস্ত্র বিষয়েও গ্রন্থ রচিত হয়নি এমন নয়। তবে সংখ্যা তাদের বেশী নয়।

পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলার এ সমালোচনা ভাবধারার মূল উৎস কিন্তু ইংরাজী সমালোচনা সাহিত্য, বিশেষ করে টি. এস. ইলিয়টের প্রভাব। অবশ্য বাংলা সাহিত্য ধারাকে বিসর্জন দেন নি এঁরা কেউ। পূর্ব পাকিস্তানের যে সকল সমালোচক ইউরোপীয় সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত তাঁদের মধ্যে সুপণ্ডিত সৈয়দ আলী আহ্সান, সৈয়দ আলী আসরফ, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, মুনীর চৌধুরী ও হাসান হাফিজু রহমান বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। সৈয়দ আলী আহ্সান তাঁর 'কবিতার কথা' গ্রন্থে কাব্যরীতি ও শব্দচয়নে ইলিয়ট-আশ্রিত। সৈয়দ আলী আসরফ তাঁর 'কাব্য পরিচয়'-এ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অলঙ্কার রীতির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। হাসান হাফিজু রহমান দক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সমকালীন কবিদের রচনার মান নির্ণয়ন করেছেন ইলিয়ট-এর কাব্য পরিপ্রেক্ষিতে। অপর সমালোচকদের মধ্যে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, মোহম্মদ আবদুল হাই, খান সারোয়া খুরসিদ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, এবং আবদুল মান্নান সৈয়দ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য সমালোচনা ধারার দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের কাব্য সমীক্ষা পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ কবিদের উজ্জীবিত করে চলেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের রুহল আমিন নিজামী সম্পাদিত 'পূর্ববাংলার সমকালীন সেরা গল্প'-এর ভূমিকায় সম্পাদকের উক্তি বিশেষ এখানে উদ্ধৃতি করা গেল পরিপূরক হিসাবে:

'প্রবীণদের মধ্যে আছেন উভয় বঙ্গের স্বীকৃতিনামা শিল্পী আবুল ফজল, মাহবুব আলম, নবীনদের মধ্যে আছেন শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আবুল কালাম সামশুদ্দীন, বুলবুল চৌধুরী প্রভৃতি।

'আবার একেবারে নতুন দলে আছেন মুনীর চৌধুরী, আবু রুশদ, আনিস চৌধুরী, আলাউদ্দীন আল আজাদ, সর্দার জয়েন উদ্দীন, সিরাজুল

ইসলাম, ফজলহল লোহানী, শাহেদ আলী, আবছুল হাই এবং আরে অনেকে। এঁদের সবাই পাশের মানুষকে দেখেছেন, আর সে দেখার সত্য সাহিত্যের সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে। তাই দেখা যায় প্রবীণ কথা শিল্পী আবুল ফজল মওলানাকে ঘাত-প্রতিঘাতে মেহনতি মানুষের সামিল করে দিয়েছেন, মাহবুব আলম 'মোমেনের জবানবন্দী'র স্তর থেকে নেমে এসে কমল মরামি আর নবীনের মনের ব্যথাকে রূপ দিয়েছেন।... সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সামান্য তুলসী গাছকে কেন্দ্র করে নীচতলার মানুষের মনের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। আর আবু রুশদ এঁকেছেন আনকোরা মধ্যবিত্ত সমাজের ছবি। মুনীর চৌধুরী নেমে গেছেন দৈনন্দিন জীবনে। আবুল কালাম সামশুদ্দীন একটি সড়ককে কেন্দ্র করে লিখেছেন নগণ্য গহর আলীর ব্যর্থ জীবনকাহিনী।

'এমনি করে প্রবীণ আর নবীনের দল মিলে সারা পূর্ব বঙ্গকে কলমের টানে টানে ফুটিয়ে তুলেছেন। নদী মাঠ পথঘাট গ্রাম শহর রঙে রেখায় জেগে উঠেছে, পূর্ববাংলার মানুষের আশা, ভরসা, সুখদুঃখ রূপ পেয়েছে। এক কথায়...পূর্ববঙ্গেরই পরিচয়। শিল্পীরা এই পরিচয় দিতে গিয়ে কোথাও বা রোমান্টিক হয়ে উঠেছেন; কোথাও বা বস্তুতান্ত্রিকতার ঝোঁকে রূপকে খর্ব করেছেন। কোথাও বা রূপের ঝোঁকে আসল জিনিসও গেছে হারিয়ে। এবং পূর্ব পাকিস্তানের নতুন এক সমালোচনা প্রবর্তন করেছেন।'

পরিশেষে, ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান বাংলা সাহিত্য সম্মিলনে ডক্টর শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ভাষণে যা বলেছিলেন তাও এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

'১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট বহু দিনের গোলামীর পর যখন আজাদীর সুপ্রভাত হ'ল তখন প্রাণে আশা জেগেছিল যে এখন স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে বাংলা সাহিত্য তার সমৃদ্ধির পথ খুঁজে পাবে।...

'কিন্তু তারপর যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাতে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলুম, স্বাধীনতার নূতন নেশা আমাদের মতিচ্ছন্ন করে দিয়েছে। আরবী হরফে বাংলা লেখা, বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত আরবী-ফারসী শব্দের অবাধ আমদানী, প্রচলিত বাংলা ভাষাকে গঙ্গাতীরের ভাষা ব'লে তার পরিবর্তে পদ্মাতীরের ভাষা প্রচলনের খেয়াল প্রভৃতি বাতুলতা আমাদের

একদল সাহিত্যিককে পেয়ে বসল। তাঁরা এসব মাতলামিতে এমন মেতে গেলেন যে, প্রকৃত সাহিত্য সেবা—যাতে দেশের ও দশের মঙ্গল হ'তে পারে, তার পথে আবর্জনাস্তূপ দিয়ে সাহিত্যের উন্নতি পথ কেবল রুদ্ধ করেই খুশিতে ভূষিত হলেন না, বরং খাঁটি সাহিত্যসেবীদিগকে নানা প্রকারে বিড়ম্বিত ও বিপদগ্রস্ত করতে আদা-জল খেয়ে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। তাতে কতক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী উস্কানি দিতে কসুর করলেন না। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্য পশ্চিমবঙ্গের কবি ও সাহিত্যিকগণের কাব্য ও গ্রন্থ আলোচনা, এমন কি বাঙ্গালী নামটি পর্যন্ত যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে কেউ কেউ মনে করতে লাগলেন। কেউ বা এতে মিলিত বঙ্গের ভূতের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আবল-তাবল বক্‌তে শুরু করে দিলেন এবং বেজায় হাত পা ছুঁড়তে লাগলেন। করাচীর তাঁবেদার লীগ গভর্ণমেণ্ট বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য কিছু করা দূরে থাক বাঙ্গালী বালকের কচি মাথায় উর্দুর বোঝা চাপিয়ে দিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আরবী হরফে বাংলা ভাষা লেখার এবং উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অপচেষ্টায় সহযোগিতা করলেন।'

ডঃ শহীদুল্লাহ আরও বলেন ঃ

'পূর্ববঙ্গবাসীদের উদারতা যে, তারা চার কোটি লোকের ভাষাকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবী না করে বরং উর্দুকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে মানতে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই উদারতায় কৃতজ্ঞ না হয়ে কেউ কেউ এখনো হুঙ্কার দিয়ে বলছেন, যারা বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবী করে তারা পাকিস্তানের দুশমন। আমরা পাকিস্তানের দোস্ত, তার জন্যে আন্তঃপ্রাদেশিক ঐক্য চাই; সেই ঐক্যের খাতিরে আমরা বাংলার সঙ্গে উর্দুরও দাবী মেনে নিয়েছি। যারা জবরদস্তি ক্রমে সমস্ত পাকিস্তানের ওপর কোন একটি ভাষা চাপিয়ে দিতে চায়, তারাই পাকিস্তানের দুশমন, তারাই পাকিস্তান ধ্বংস করবে।

'সুখের বিষয়, মুসলীম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির কিঞ্চিৎ সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে। তাঁরা উর্দু ও বাংলা উভয়কে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। যদিও অন্য কতকগুলি ভাষার বিষয় তাঁরা বিবেচনা করতে স্বীকৃত হয়েছেন, কিন্তু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার আসনে

আসীন দেখলেই আমরা চরিতার্থ হব না, যদি না সেই সঙ্গে আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধিকেও না দেখতে পাই।

'মূল আর্য ভাষার সঙ্গে মিশেছে আদি যুগে কোল, মধ্যযুগে ফারসী ও ফারসীর ভিতর দিয়ে কিছু আরবী ও যৎসামান্য তুর্কি এবং পরবর্তী যুগে পর্তুগীজ আর ইংরেজী। দু-চারটা দ্রাবিড়, মোঙ্গলীয়, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি ভাষার শব্দও বাংলায় আছে। মিশ্র ভাষা বলে আমাদের কিছু লজ্জা নেই, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা চলিত ভাষা ইংরেজীর প্রায় দশ আনা শব্দসমষ্টি বিদেশী। পশ্চিম বাংলার পরিভাষা নির্মাণ সমিতি খাঁটি সংস্কৃত ভাষায় পরিভাষা রচনা করেছেন। পাঠ্যপুস্তকে এইরূপ খাঁটি আর্যভাষা চলতে পারে, কিন্তু ভাষায় চলে না। আমাদের মনে রাখতে হবে ভাষার ক্ষেত্রে গোঁড়ামি বা ছুঁৎমার্গের কোন স্থান নেই।

'ঘৃণা ঘৃণাকে জন্ম দেয়। গোঁড়ামি গোড়ামিকে জন্ম দেয়। একদল যেমন বাংলাকে সংস্কৃত ঘেঁষা করতে চেয়েছে, তেমনি আর একদল বাংলাকে আরবী-ফারসী ঘেঁষা করতে উদ্যত হয়েছে। একদল চাচ্ছে 'জবে' করতে; একদিকে কামারের খাঁড়া, আর একদিকে কসাইয়ের ছুরি।'

ডঃ শহীদুল্লাহ পরিশেষে বলেন:

'নদীর গতিপথ যেমন নির্দেশ করে দেওয়া যায় না, ভাষাও তেমনি। একমাত্র কালই ভাষার গতি নির্দিষ্ট করে। ভাষার রীতি ও গতি কোন নির্দিষ্ট ধরা-বাঁধা নিয়মের অধীন হতে পারে না, মানুষে মানুষে যেমন তফাৎ, প্রত্যেক লোকের রচনাতেও তেমনি তফাৎ থাকা স্বাভাবিক। এ পার্থক্য নির্ভর করে লেখকের শিক্ষাদীক্ষা, বংশ এবং পরিবেষ্টনীর উপর। মোট কথা ভাষা হওয়া চাই সহজ, সরল এবং ভাষার রীতি হওয়া চাই স্বতঃস্ফূর্ত, সুন্দর ও মধুর। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, ভাষা ভাবপ্রকাশের জন্য, ভাবগোপনের জন্য নয়। আর সাহিত্যের প্রাণ সৌন্দর্য, গোঁড়ামি নয়।'

সাহিত্য সমালোচনা ছাড়া ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, জীবনী, ধর্ম এবং ভ্রমণ-কাহিনী নিয়েও বহু গ্রন্থ রচিত হচ্ছে, হয়েছে আজকের বাংলা সাহিত্যে।

উর্দু সাহিত্য

উর্দু একটি আধুনিক ভাষা। এ ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস ঠিক ইংরেজী ভাষার ইতিহাসের মত। ফরাসী ভাষী নর্মানরা ইংলণ্ড দখলের

পর ফরাসী ভাষাকে সে-দেশের দরবারী ভাষা রূপে প্রবর্তন করেছিল। এ ভাবে যে ফরাসী প্রভাবিত এ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষার উৎপত্তি হয় তারই নাম ইংরেজী। এ ভাষাই কালক্রমে সারা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। ['পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার': সম্পাদক—শেক মোহাম্মদ ইকরাম (পাকিস্তান পাবলিকেশন, ঢাকা)]

ফারসী ভাষী মুসলমানরা উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানে (পাঞ্জাব) দখল করে ফারসীকে সে দেশের দরবারী ভাষারূপে প্রচলন করে। তা থেকেই উর্দু নামক ফারসী প্রভাবিত পাঞ্জাবী ভাষার উৎপত্তি। এ ভাষা ক্রমে সমগ্র উত্তর ভারত এবং দাক্ষিণাত্যে বিস্তার লাভ করে। বিজয়ী উইলিয়ম ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে পদার্পণ করেছিলেন। আর সুলতান মাহ্‌মুদ ১০২২ খৃষ্টাব্দে লাহোর দখল করে পাঞ্জাবের রাজধানীতে পরিণত করেন।

এ নতুন উর্দু ভাষা পাঞ্জাবীও ছিল না, ফারসীও না। দিল্লী নতুন মুসলিম রাজশক্তির কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার পর লাহোর ও মুলতানের সেনানিবাসগুলিতে উর্দু গদ্যের সব চেয়ে প্রাচীন মুদ্রিত নিদর্শন হচ্ছে খাজা বান্দা নওয়াজের (১৩২১-১৭২২ খৃঃ) একটি আধ্যাত্মিক পুস্তিকা। ইনি ছিলেন ইংরেজ কবি চসারের সমসাময়িক। সব চেয়ে প্রাচীন বলে পরিচিত কাব্যগ্রন্থ 'হাফ্‌ত আসরার'ও সে সময়েরই রচনা। কিন্তু এগুলি সবই পুস্তিকামাত্র। সাহিত্যপদবাচ্য নয়।

উর্দুতে সাহিত্য রচনার শুরু লাহোরে নয়। দিল্লীতেও নয়। তা শুরু হয় সুদূর দক্ষিণ অঞ্চলে—দাক্ষিণাত্যে (ভারতের হায়দরাবাদে)। ফারসীর ঐতিহ্য তখনো এ অঞ্চলের গৌরবের বস্তু। উর্দু ছিল অশিক্ষিত জনসাধারণের ব্যবহৃত একটি কথ্য ভাষা মাত্র। ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের বাহ্‌মনী বংশ বিদ্রোহ এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সম্ভবত কেন্দ্র থেকে এ স্বাধীনতার নিদর্শন স্বরূপ দাক্ষিণাত্য উর্দুকে রাজভাষারূপে গ্রহণ করে। বিশ বছর আগে মুহম্মদ তোগলকের সেনাদল সেখানে উর্দুর প্রবর্তন করে এবং সেনাবাহিনীর এ ভাষাই পরবর্তীকালে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। উর্দু ভাষার প্রথম বিশিষ্ট কবি হচ্ছেন দাক্ষিণাত্যের রাজা

মুহম্মদ কুলী মহম্মদ কুতুব শাহ্। উর্দু ভাষার আর কোন কবিই সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এত প্রশস্ত পরিধি, কাব্যে এমন উজ্জ্বল স্থানীয় অনুরঞ্জন আর মাটি মায়ের প্রতি এত ভালবাসা দেখাননি। গজল, মশনভী, ধর্মীয় গাথা, মর্সিয়া এবং রুবাই মিলে তাঁর সংগৃহীত রচনার পরিমাণ প্রায় ১০ লক্ষ লাইন হবে। তিনি একজন উঁচু দরের কবি ছিলেন।

প্রথমে উর্দু সাহিত্যের প্রধান স্রোত দাক্ষিণাত্যেই প্রবাহিত ছিল। পরে তা দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। এবং পরবর্তী দু'শো বছর দিল্লীর ঐতিহ্যই উর্দু সাহিত্যের প্রধান ঐতিহ্যরূপে দেখা দেয়।

চার শ' বছর ধরে উর্দুতে গদ্য এবং পদ্য লেখা হয়েছে। তা ছাড়া উর্দুই ছিল দিল্লীর অধিবাসীদের কথ্য ভাষা। তা সত্ত্বেও সেখানে কেউ উর্দুতে সাহিত্য রচনা করেন নি। তাদের সাহিত্যের ভাষা ছিল সেখান-কার দরবারী ভাষা ফারসী। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে দাক্ষিণাত্যের কবি ওয়ালী (১৬৬৭-১৭৭৪) দিল্লী আগমন করেন। তাঁর সংস্পর্শেই দিল্লী তার স্থানীয় কথ্য ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে ওঠে। ওয়ালী ছিলেন একজন মহান শিল্পী। মূল ফারসীর সমস্ত সৌন্দর্য ও সৌকর্যই ছিল তাঁর রচিত গজলে। তা ছাড়া তাতে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত মুনশীয়ানার স্পর্শ। সে যুগটাও ছিল সৌকর্যবাদ আর সৌন্দর্যবাদের। বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছে। নাদির শাহ দিল্লী আক্রমণ করে তাকে তছনছ করে ফেলেছিল। এদিকে মুসলিম রাজন্যবর্গ নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধে ব্যাপৃত।

কৃষ্টিগত আনন্দ লাভের জন্য তখনকার বুদ্ধিজীবীরা প্রেমমূলক সৌন্দর্য, প্রীতি ছাড়া আর কিছুই অবলম্বনীয় করবার পথ খুঁজে পেলেন না। কিন্তু তাঁরা শুধুমাত্র জীবন-পলাতকই ছিলেন না। সে যুগের দু'জন প্রখ্যাতনামা কবি—মীর এবং সওদা—বাইরের দুনিয়ার মুখোমুখি হয়ে তাকে নির্মমভাবে সমালোচনা করেন। তবে তাঁরাও নিজেদের অন্ত-র্লোকেও দৃষ্টি ফিরিয়েছেন সুষমা ও আনন্দের উৎস-সন্ধানে। সওদার (১৭১৩-৮০) রচনায় নির্মম ব্যঙ্গের সুর আর মীরের (১৭২৪-১৮১০) রচনায় মৃদু অভিযোগের সুর ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু গজলে তাঁদের প্রসারণশীল মনোভঙ্গীটি হচ্ছে গভীর বেদনামূলক। মানুষ তার নিজের

চারপাশে যে বেদনাময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তার জন্য তাঁদের হৃদয় সমবেদনার্ত—ব্যথাকাতর।

মীরের হাতে গজল হয়েছে মনের সব রকম ভঙ্গী ও ভাব প্রকাশের বাহন। মাত্র প্রেমমূলক গীতি কবিতাতে তা আর সীমাবদ্ধ থাকেনি। গজলের পদগুলো একই রকম মিল দিয়ে সাজানো। তার ভিন্ন ভিন্ন পদের মধ্যে কোনো রকম অপরিহার্য যৌক্তিক যোগসূত্র নেই। একটি বিশেষ ঢং, মিল ও ছন্দের সূত্রেই মাত্র তারা একত্র গ্রথিত। গজলের এ অসংশ্লিষ্ট ঢংটি সে-যুগের মনোভঙ্গীর সঙ্গে বেশ মানিয়ে গিয়েছিল। সব কিছুই শিথিল গ্রন্থি হয়ে গিয়েছিল। মাত্র একটি সর্বব্যাপী আশা-ভঙ্গের সুর সব কিছুকেই এক তারে বেঁধে দিয়েছিল। মুসলিম ঐতিহ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। কিন্তু তার জায়গায় তখন সত্যিকারের কিছু গড়েও ওঠে নি।

দূর দিগন্তে তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী বণিকদের ছায়া পড়েছে। এ দেশবাসীদের সঙ্গে তাদের কোন কিছুতেই মিল নেই। তারা এসেছে লুটতরাজ করতে। আর ফিরে গেছে ঝোলাভর্তি সোনাদানা নিয়ে। আবার ফিরে এসেছে—সে-ও শুধু নতুন করে লুঠতরাজ করতেই। উর্দু সাহিত্য একেবারে মরে যায়নি বটে, তবে তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ছোট-ছোট নবাব সুবার দরবারে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে, সংরক্ষণশীলদের পরিমণ্ডলেই মাত্র তা বেঁচে ছিল। সে সময়ের যে সব উর্দু লেখকের নাম করা যায়, তাঁদের বেশীর ভাগই ছিলেন নিম্নস্তরের লেখক—ঠিক ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগে ইংরেজী সাহিত্যের লেখকদের মত। তাঁদের মতই এঁরাও ছিল বুদ্ধিদীপ্ত ঋজু আর ভাবপ্রবণ।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এঁরা অভব্য এবং অশ্লীলও বটে। কিন্তু বাণীকে ক্ষুরধার এবং বক্তব্যকে জোরালো করার জন্য এঁদের যত্ন ছিল একান্ত। এঁদের সাহিত্যের বক্তব্য হয়তো বেশী কিছু নেই। কিন্তু যেটুকু এঁরা প্রকাশ করেছেন, সার্থক ভাবেই তা করেছেন। এঁরা যে বাক্‌ভঙ্গী অনুশীলন করেছেন, তা আজিও অনুসৃত হচ্ছে। আজকের দিনের লেখকদের মত জমায়েত হোত এক জায়গায়—সে হচ্ছে লাখ্‌নৌতে অযোধ্যার নবাব দরবারে।

লাখ্‌নৌতেই খালিক (১৭৭৪-১৮০৪) এবং জামির শোকরসাত্মক

গাথা কবিতার গঠনভঙ্গীর শেষ বিবর্তন সাধন করেন এবং লাখ্‌নৌতেই আনিস (১৮০২-১৮৭৪) এবং দবির (১৮৩৯-১৮৭৫) সে সবের সুষ্ঠু বিকাশ সাধন করেন। আতিশ (মৃত্যু—১৮৪৬) এবং নাসিখ (মৃঃ ১৮৩৮) নিজেদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে মুশাফি এবং ইন্‌শার ধারাই অনুসরণ করেন। লাখ্‌নৌর কবিরা কবিতাকে আধ্যাত্মিকতা এবং মরমীবাদের কবল থেকে উদ্ধার করেন। সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাই ছিল তাঁদের কবিতার ভাববস্তু। আর তা প্রকাশের বাহন হিসেবে তাঁরা দৈনন্দিন ব্যবহার্য ভাষাই ব্যবহার করেছেন। লাখ্‌নৌর তিনজন দিক্‌পাল হচ্ছেন ইন্‌শা (মৃঃ ১৮১৭), হাসান (মৃঃ ১৭৮৬) আর আনিস। বিষয়ের ব্যাপকতা, ভঙ্গীর বলিষ্ঠতা আর হাস্যরস সৃষ্টিতে উর্দু সাহিত্যে ইন্‌শার জুড়ি নেই। হাসান তাঁর একটি রোমান্টিক গীতিকাব্যের জন্য অমর হয়ে আছেন। উর্দু সাহিত্যে সে কবিতা সর্বশ্রেষ্ঠ না হলেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ বটে।

উর্দু ভাষা গোড়ার দিকে পাঞ্জাবের আশেপাশের কথ্যভাষার রূপ পরিগ্রহ করলেও দাক্ষিণাত্যই ছিল তার প্রথম সাহিত্য কেন্দ্র। পরে এল দিল্লীতে এবং দিল্লী থেকে তার ঐতিহ্য-কেন্দ্র পার হয়ে এল লাখ্‌নৌতে। পাইকারীভাবে লাখ্‌নৌতে হিজরত শুরু হলে দিল্লী প্রায় সাহিত্যিক শূন্য হয়ে পড়ে। কিন্তু বৃটিশ শাসন দিল্লীর মসনদে পাকা-পোক্ত হয়ে উঠলে, আবার রাজধানী দিল্লীতেই উর্দুর গৌরব যুগ ফিরে আসে।

গালিব

এ পুনরুজ্জীবন যুগের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হলেন গালিব। অষ্টাদশ শতকের শেষে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পাঁচ বছর আগে মাত্র ইংরেজ কবি শেলী আর তিন বছর পরে মেকলের জন্ম। এ সময়েই শীলার, গ্যেটে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এবং কোলরিজ নতুন নতুন কাব্য রচনা করে আপন মাতৃভাষাকে ঐশ্বর্যশালী করছিলেন।

গালিব ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। (গালিবের পরলোক গমনের মাত্র ৫ বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের জন্ম।) তাঁর জন্মকালেই ডারউইনের মৃত্যু হয় এবং ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সংঘটিত

হয়। এই সব আধুনিক কবি ও বৈজ্ঞানিকের নাম উল্লেখ করার কারণ এই যে, সম্ভবতঃ গালিবই অতীতের একমাত্র উর্দু কবি যাঁর উপর সমসাময়িককালের প্রভাব সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে দেখা যায়।

গালিবকে আধুনিক উর্দু গদ্যের জনক বলে অভিহিতও করা হয়। যদিও ইন্‌শাই তাঁর 'দরিয়া-ই-লিতাফত-'এ সর্বপ্রথম নতুন উর্দু গদ্য শৈলীর প্রচলন করেন, তবুও গালিবের পত্রাবলীর মধ্যেই আধুনিক উর্দু গদ্যের সচেতন এবং প্রবহমান ধারা শুরু হয়। এ সবের মানবিক সংবেদনা এবং স্বচ্ছন্দ মুক্ত ভঙ্গীর তুলনা হয় না। অতীতের ধারায় গালিব একটি আকস্মিক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিলেন। এ কাজে তাঁর সামনে কোনো পূর্ব-সূরীর ঐতিহ্য ছিল না। তাঁর যুগ পর্যন্ত উর্দু সাহিত্যে ইউরোপীয় সাহিত্যের হাওয়া এসে লাগে নি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ইংরেজী ঐতিহ্য আমদানী হয় ১৮০০ সালে ডঃ গিলক্রাইস্টের সচেতন প্রচেষ্টায়। এক দল লেখক উর্দু লোক-কাহিনীগুলিকে পুনর্লিখনের ভার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মীর আম্মান উঁচু দরের সাহিত্যিক কৃতিত্ব অর্জন করেন। তবু এ সব রচনা উর্দু সাহিত্যের ঐতিহ্যকে প্রভাবান্বিত করতে পারে নি। কিন্তু গালিবের গদ্য সার সৈয়দ আহম্মদকে প্রভাবিত করে এবং তাঁর মাধ্যমে জীবনী ও সাহিত্যের ইতিহাস লেখকদের একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তার করে।

কিন্তু গালিবের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হোল তাঁর কাব্য সাহিত্য। মীরের সঙ্গে তাঁর নাম সমগ্র উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে কীর্তিত হয়। গালিব উর্দু কবিতার চিরাচরিত ঐতিহ্য লঙ্ঘন করে যাননি। ছন্দ ও শিল্প-রীতির নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষাও তিনি চালান নি। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা প্রায় সবই ঐকিক মিলযুক্ত গজলে সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাঁর কাব্যের সুরটি মৌলিকতায় এমন একক এবং এমন বিস্ময়কর একক বৈশিষ্ট্য তাতে ফুটে উঠে যে, তাঁর রচিত যে কোনো একটি লাইনে অন্যান্য কবিদের রচনা থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অতীতের ও বর্তমানের অপরাপর সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবির মত গালিবও দু'ভাষায় সাহিত্য রচনা করতেন।

মৌলানা আজাদ কলেজের সহ-গ্রন্থগারিক শ্রীযুত সত্যেন্দ্র আচার্যের

১৯৬৯ সালে গালিবের মৃত্যু শতবার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

'আজ বাংলা সাহিত্যে যেমন রবীন্দ্রনাথ, তেমনি উর্দু সাহিত্যে মীর্জা গালিবের সেই একই গৌরবময় স্থান। অবিস্মরণীয় অবদানে গালিব অন্যতম জনপ্রিয় কবি। এই গালিবের আসল নাম আসাদুল্লা খান। ইংরেজী ১৭৯৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর আগ্রার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল কাটে আগ্রায়। কিন্তু ১৫ বছর বয়সে দিল্লী আশ্রয়ী হন এবং ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী দিল্লীতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

'ফলে তিনি দিল্লীর মোগল শাহীর সমাপ্তি দেখেছেন। দেখেছিলেন 'সিপাহী বিদ্রোহ', দিল্লীর মোগল বংশের রক্তপাত। নবাব বংশে জন্ম নিয়ে যেমন বিলাসব্যসনে জীবন কাটিয়েছিলেন, তেমনি দুঃখদারিদ্র্যের যন্ত্রণাকে বুকের ওপর তুলে নিয়েছিলেন অবলীলায়। ফারসী গ্রন্থ 'দসতম্বু' সেই রক্তপাতের কাহিনী বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে চিরকাল।

'শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ্ও 'ব্যথার' এ ছদ্মনামের আড়ালে একজন নামকরা কবি ছিলেন এবং গালিব ছিলেন এ মোগল রাজদরবারের কবিগুরুদের অন্যতম। 'সিপাহী বিদ্রোহ' সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে ইংরেজ শাসক ভারতের ওপর শক্তি বিস্তার করে। ফলে, রাজদরবার থেকে গালিব যে মাসোহারা পেতেন ইংরাজরা তা বন্ধ করে দেয়। সেই অর্থাভাব আর দুঃখ-দারিদ্র্যের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে ছুটে আসেন কলকাতায়। কাকার মোকদ্দমার তদ্বিরের জন্যই তিনি কলকাতায় চলে আসেন। ১৮২৭ সালে পথযাত্রা শুরু করেন কানপুরের উদ্দেশ্যে। এবং পরে লক্ষ্ণৌতে কিছুদিন অবস্থানের পর সেখান থেকে আসেন বেনারস এবং সেখানেও কিছুদিন কাটিয়ে অশ্বারোহণে আসেন পাটনায়। গালিব কলকাতায় আসেন ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮২৮ সালে। সুদূর দিল্লী থেকে কলকাতা, তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল সাহেবের কাছে আর্জি পেশ করার এই যাত্রা তাঁর জীবনের দীর্ঘতম পথ-ভ্রমণ।'

শ্রীযুত আচার্য তারপর লেখেন, 'এই বাংলা দেশে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে তদানীন্তন কবি-মজলিসে (মুসায়ারা)। কলকাতা ছাড়াও হুগলী, মুর্শিদাবাদ এবং ঢাকাতেও সমাদর পান।

তাঁর এ অবস্থানের সময় তৎকালীন সমাজের বিদগ্ধজন ও ফারসী বা উর্দু সাহিত্যের সুপণ্ডিত ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডিরোজিও, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কলকাতার সিমলা বাজারে মীর্জা আলি সওদাগরের আতিথ্য গ্রহণের পর ১৮২৯ সালের ২৯শে নভেম্বর আবার দিল্লীতে তিনি ফিরে যান।

'গালিবের কবিকৃতি ছিল অনায়াস। যে কোন বিষয় নিয়ে এবং যে কোন সময়ে তাঁর কবিতা রচনা কবিবর্গের একটি বিশেষ গুণ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। একবার কলকাতার এক মুসায়ারায় একজন উৎসাহী শ্রোতা একটি সুপারী হাতে দিয়ে তাঁকে একটি কবিতা রচনার জন্য অনুরোধ করেন। সেই মুহূর্তেই গালিব একটি অসাধারণ কবিতা লিখে দিয়ে উপস্থিত বিদগ্ধজনদের বিস্মিত করেছিলেন।

'তাঁর এই কবিধর্মের সঙ্গে আত্মাভিমানেরও অন্ত ছিল না। দিল্লী কলেজে একবার তিনি অধ্যাপনার ভার পান। যথারীতি নির্দিষ্ট দিনে গেটের সামনে গিয়ে হাজির। কিন্তু গেটের সামনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বাহকদের হুকুম দিলেন পাল্কী ফিরিয়ে নিতে। জবাবে ইংরেজ অধ্যক্ষকে জানিয়েছিলেন, 'আমি গালিব, আমায় অভ্যর্থনা করে তুমি নিয়ে যেতে আসনি বলে আমি ফিরে গেছি'।

'গালিব ভারতের প্রথম প্রগতিবাদী কবি। সুফীমতবাদে বিশ্বাসী গালিব শুধু আচার অনুষ্ঠানে নয়, এমন কি ধর্মকেও পরিহাস করেছেন। যা পুরানো তা ভেঙ্গেচুরে পেছনে ফেলে দিয়ে নতুনের সজীবতাকে আহ্বান জানিয়েছিলেন আজ থেকে সেই শোয়া শ' বছর আগে : "I know fully well the truth about Paradise ; whatever it is, it is a pleasant chimera to think about."

(স্বর্গের কথা তো গালিব আমার জানা আছে, মনকে ভুলিয়ে রাখতে এ পদ্ধতি মন্দ নয়।)

প্রেমের কবিতাতেও গালিব ভুবন বিখ্যাত। তাঁর স্বরচিত বিচিত্র এপিটাফ :

'চন্দ্ তসবিরে বুঁতা চন্দ্ হাসি নোকে ঘুতুর
বাদ মরণেকে মেরে ঘরসে এ সামান নিকলা।'

অর্থাৎ, 'আমার মৃত্যুর পর আমার ঘর থেকে বেরোবে কিছু সুন্দরীদের ছবি আর কিছু প্রেমপত্র।' এই প্রেমিকা আবার কখনো তাঁর কাছে মমতাহীন :

'বুএ গুল না লয়ে দিল দুত্এ চেরাগএ ম্যায় ফিল
জো তেরি বাজমসে নিকলা সো পরিসাঁ নিকলা।'

অর্থাৎ, 'গোলাপের গন্ধ, হৃদয়ের শোকানুভূতি, বাতির সেই ধুম্রছায়া যেমন বাড়িতে থেকেও চলে যায় দুঃখে—মমতাহীন প্রেমিকার জন্য কবিরও তেমনি দুঃখের অন্ত নেই।' অথচ এই প্রেমিকার প্রতি অন্যত্র তাঁর কত না আর্তি :

'সিদ উসকি হ্যায় দেমাক উসকা হ্যায় রাতেঁ উসকি হ্যাঁয়
তেরি জুলফেঁ জিসকে বাজুপর পরিসা হোঁ গয়ি।'

অর্থাৎ, 'তুমি যদি এস এবং তোমার ঘন কেশরাশি যদি আমার বাহুর ওপর ফেলে দাও তবে এই রাত আমার, ঘুম আমার, এই ললাটলিপি আমারই।'

'মূলত কবিধর্মে গালিব ছিলেন দুঃখের কবি। গালিব একখানি কাব্য-গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন : 'আমি ৬৯ বছর এই দুনিয়ায় কাটালাম। আর কতদিনই বা বাঁচব? শেষ পরিণাম এই দেহে বল নেই, কলমেরও জোর নেই। মনে না আছে আগ্রহ, না আছে উৎসাহ উদ্দীপনা।··· এখনও যে কবিতা বা কাব্য সম্বন্ধে দুচার কথা বলতে পারি, কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে দুচারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি তার একমাত্র কারণ হল বিগত অর্ধশতাব্দী কালেরও বেশী সময় ধরে আমি কাব্য রচনার মধ্যে ডুবে ছিলাম এটা তারই অভ্যাসের ফল।'

'এই অর্ধশতাব্দীই তাঁর সংগ্রাম দুঃখের সঙ্গেই। একদিকে অর্থসংকট, মানসিক উদ্বেগ, অপর দিকে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে সাত সাতটি সন্তানের মৃত্যু এবং এ সকলের ভেতর দিয়ে দুঃখের আগুন যত দাউ দাউ করে জ্বলেছে তত তাঁর কাব্য অসাধারণ সুষমায় ভরে উঠেছে। দুঃখের অপার মহিমা তত ঘোষণা করেছে, 'রঞ্জ কা খুগর হো ইনসান তো মিট যাতা হ্যায় রঞ্জ'। 'দুঃখের ভেতর ডুবে গেলে দুঃখ তো মিটেই গেল।' এই সার্থক, শাশ্বত পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর অনন্যসাধারণ

কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে, অক্ষরে অক্ষরে। উর্দুতে তাঁর রচিত 'দিওয়ানে গালিব' উর্দু সাহিত্যের অন্যতম রত্ন।'

গালিবের একটি গজলের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

প্রিয়তমার প্রতি

'এস, আমরা বেহেস্ত্-এর চলার পথ বদলে দি—'

'মদের পেয়ালা ভ্রাম্যমাণ
ভাগ্য বদলে দিক আমাদের।
এক কোণে বসে রইব
দরজা রাখব খোলা,
ভয় কিসের কোতয়ালকে
আসুক সে শাস্তি দিতে আমাদের,
ভ্রূক্ষেপ নেই শাহেন্‌শাকেও
যদি তিনি ইনাম পাঠান আমাদের
গ্রহণ করব না আমরা।
স্বয়ং মুসা যদি বাণী দেন
কানেই তুলব না তাঁর কথা
সেলাম জানাব না তাঁকেও।
ফুল, শুধু ছড়িয়ে যাব ফুল
ছিটিয়ে যাব গুলাবি আতর
ছায়াবীথি বরাবর, পায়ে-চলার পথে,
শুধু সংগ্রহ করব খানিকটা সরাব
আর পেয়ালাটি ভরে
রেখে দেব দুজনের মাঝখানে।
সাকিকে বরখাস্ত করব,
দূর করে দেব যত বন্ধু আর বাজনদারদের,
আর এমন বাঁধভাঙ্গা চুম্বন করব পরস্পরকে—
তারকারা শিউরে উঠবে, লজ্জায় রক্তিম হয়ে যাবে
ঊষাকে ঠেকিয়ে রাখব আমরা,
দিনের দাহকে দেব নির্বাসন

আর এমন ঠকান ঠকাব দুনিয়াটাকে! ভাণ করব
যেন রাত্রি এখনও সবটা খরচ হয়ে যায়নি,
রাখালকে বলে দেব, ফিরিয়ে নিয়ে যাও তোমার
জন্তুর পাল।

আর গুলবাগ থেকে তার ফুলের নজরানা
আদায় করতে আসবে যেই লুটেরার দল—
জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেব ওদের,
ফুলের খালি সাজি-হাতে পালিয়ে প্রাণ রাখুক ওরা।
ভোরের পাখিকে মিষ্টি করে বলব, ফিরে যাও তো
ভাই বাসায়।

প্রিয়তমা, তুমি আর আমি
আমরা-যে হায়দর্-এর * অনুরক্ত ভক্ত!
আমরা পারি, সূর্যকে সবলে পূর্ব দিগন্তের অন্তরালে
ফিরিয়ে নিতে!'

[অনুবাদ: মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়]

গালিব যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ভারতে মুসলিম রাজশক্তি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। তাঁর জীবিতকালে 'সিপাই বিদ্রোহ' সংঘটিত হয় এবং দিল্লীতে ইংরেজ সৈন্যদের অনুষ্ঠিত বর্বরতা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর পরিচিত পৃথিবী গতায়ু হয়েছে এবং নতুন এক পৃথিবীর জন্ম হচ্ছে। কিন্তু গোঁড়া শ্রেণীর বিদ্রোহীদের মতো নতুন পরিস্থিতির বাস্তবতাকে তিনি চোখ বুজে উপেক্ষা করেন নি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইকবাল তাঁর সমধর্মী। বস্তুতঃপক্ষে, ইকবাল গালিব ও স্যার সৈয়দের মিলিত রূপ। তিনি উভয়ের মনোভঙ্গীকে একটি সৃজনশীল সার্থকতায় মণ্ডিত করেন। দু'টি তারা যেন তাঁর ভিতরে মিলেছে—একটি চাঁদ হয়ে। গালিব আর ইকবালের মাঝখানের অন্তর্বর্তী যুগ হল হালী (১৮৩৭-১৯১৪) আর আজাদের (১৮৩৪-১৯১০)। এঁদের নেতৃত্বে লাহোরে একটি নতুন লেখক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হল।

* হায়দর—হজ্‌রত আলি। মুসলমান ধর্মের প্রবক্তা হজরত মহম্মদের জামাতা

আলতাফ হোসেন হালী লিখলেন তাঁর সুবিখ্যাত 'মুসাদ্দাস', যাকে আধুনিক কালের মহত্তম কাব্য বলে গণ্য করা যায়। হালী সুললিত ভাষায় মুসলিম কৃষ্টির গৌরবান্বিত ইতিহাস জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ এ কাব্যে পর্যালোচনা করেন। আর তার সঙ্গে মুসলিম জগতের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা নগ্নভাবে প্রকটিত করেন। এ ভাবে গজলের যুগ ছেড়ে প্রবহমান কবিতার ঐতিহাসিক পদক্ষেপ শুরু হল। হালী কাব্য-সমালোচনার উপরেও একটি গ্রন্থ রচনা করলেন। আজও সে গ্রন্থ উর্দুতে সাহিত্য-সমালোচনার আদর্শ সংক্রান্ত একটি অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

মহম্মদ হুসেন আজাদও উর্দু সাহিত্যের অন্যতম যুগ প্রবর্তক। একাধারে কবি, সমালোচক, ভাষাবিদ। 'মসনবীয়ে-শবে ক্বদর', 'আবরে-করম', সুবাহ-উমীদ', 'মসনবীয়ে-হুব্বে-উঅত্বন' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা। তাঁর 'আবে-হায়াৎ' সাহিত্য ইতিহাসখানি কাব্য-রসে ভরপুর।

ইকবাল

এর পরে এলেন ইকবাল। পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা দার্শনিক কবি ডক্টর মহম্মদ ইকবাল (১৮৭৫-১৯৩৮)। ইসলাম ভিত্তিক 'খুদী'র আদর্শ ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের নীতির উপর তাঁর সমগ্র জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠিত।

গালিবের মত তিনিও ফারসী ও উর্দু উভয় ভাষাতে কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কবিতায় মানবতার সুউচ্চ মহিমা কীর্তিত হয়েছে যা মানুষকে অপার্থিব মর্যাদার স্তরে উন্নীত করেছে। তরুণ ও প্রবীণ, সাধারণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবী—সকল শ্রেণীর পাকিস্তানীরই তিনি আদর্শ পুরুষ। ইকবাল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সেতুবন্ধ স্বরূপ। ইসলামী শিক্ষা-সভ্যতার মধ্যে জাগ্রত সমস্ত উপাদানকেই তিনি আত্মস্থ করেছেন। পাকিস্তানী জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা।

ইকবাল দার্শনিক কবি। তাই বলে তিনি বাঁধা-বুলির কবি নন। পূর্বধারণাকৃত তথ্য নয়, আবেগ-সৃষ্ট-ভাবই তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। আবদুল কাইয়ুম 'পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার' সংকলন গ্রন্থে কবি ইকবাল সম্পর্কে লিখেছেন:

ডক্টর (স্যার) মহম্মদ ইকবাল শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেন।

ছেলেবেলায় তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন শামসুল উলামা মীর হাসান। নিজের কবিতায় ইকবাল মীর হাসানের স্মৃতিকে অমর করে গেছেন। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি ১৮৯৫ সালে লাহোরে আসেন এবং এম-এ পাশ করে সেখানকার স্থানীয় সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করতে থাকেন। এ সময় স্যার টমাস আরনোল্ডও আলিগড় ছেড়ে লাহোরের সরকারী কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তরুণ কবি ও অধ্যাপক ইকবালের সঙ্গে তাঁর তখন পরিচয় হয়। এবং স্যার টমাসের উপদেশে ইকবাল ১৯০৫ সালে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলেতে যান।

এর পরের তিন বছর ধরে কেম্‌ব্রিজ, লণ্ডন ও মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলিতে চলল ইকবালের জ্ঞানসাধনার পালা। কেম্‌ব্রিজে তিনি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'পারস্যের তত্ত্বদর্শনের বিকাশ' সম্বন্ধে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। এর পর তিনি লণ্ডনে আইন ব্যবসায়ে যোগদান করেন। তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনীষীদের লেখা ভালো করেই অধ্যয়ন করেছিলেন।

ইউরোপ যাবার আগেই কবি হিসেবে ইকবাল সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ইউরোপে পৌঁছে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা ও পঠনপাঠনের সুযোগ পান। এর ফলে তিনি তাঁর পূর্ব মতামত নতুন করে ঢেলে সাজান। এ যাবৎ তাঁর কাব্যে অদ্বৈতবাদের প্রভাব দেখা দিয়েছিল। ইরাণ ও অপরাপর মুসলিম দার্শনিকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় ইসলামের জীবন নিরপেক্ষ এ রহস্যবাদের (তাসাওফের) প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর মনে সংশয় দানা বাঁধে। সুফীদের বিশ্বই ব্রহ্ম, এ-অনুভূতি থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করে ইসলামকে ভৌগোলিক সীমারেখাহীন এক সমাজশক্তিরূপে দেখতে শিখলেন। বিলেত যাবার আগে ইকবাল ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উগ্র সমর্থক এবং প্রচারক। কিন্তু বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি 'প্যান-ইসলামিক' ভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। ভারতীয় উপমহাদেশে ফিরবার পথে ১৯০৮ সালে তিনি যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন তাতেই তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। আরব মুসলমানদের শাসনাধীনে ছিল

এক সময় সিসিলী। এখানকার সিসিলীর দিকে চেয়ে কবি তাই বেদনাতুর কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন :

'হে আমার রক্ত-ঝরা চোখ, কাঁদো, যত পারো কাঁদো,
দূরে দেখা যায় মুসলিম সংস্কৃতির ঐ গোরস্তান।
এক সময়ে এখানেই মরুবাসীরা তাদের তাঁবু গেড়েছিল,
তাদেরই জাহাজ করতো মহাসাগরে খেলাধূলা,
বড়ো বড়ো রাজা-বাদশাহদের দরবার তারাই কাঁপিয়ে দিয়েছিল ;
তাদের বাঁকা তলোয়ারের ধারে জীবনের আগুনের তেজ ছিল
লুকানো,—
তা জ্বলে উঠলেই জরাজীর্ণ আদর্শের মৃত্যু-পরোয়ানা ঘোষিত হোত।
তাদের ভয়ে মিথ্যার দুর্গগুলো কেঁপে কেঁপে উঠতো।
ওদের যাদুস্পর্শে দুনিয়াতে জীবন জেগে উঠেছে,
আর ওরাই দুনিয়াকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করেছিল।
হে আমার চোখ, তোমার যন্ত্রণার কথা আমাকে বলো,
তোমার মত আমার ব্যথাও কম নয়।'

[অনুবাদ : মহম্মদ আবদুল হাই]

ইকবাল তাঁর কবি জীবনের শুরুতে প্রধানত গীতি-কবিতা ও স্বদেশ-প্রীতিমূলক কবিতা রচনা করেছিলেন। কিন্তু প্রাচ্যজগতে কবি শুধু কবিই নন। ইকবালকেও তাই দেখা যায় কাব্যের ভেতর দিয়ে তাঁর পরিণত চিন্তা প্রকাশ করতে। তাঁর সমগ্র রচনাতেই দার্শনিকতার কিছু কিছু আঁচ পাওয়া যায়। কিন্তু ১৯১৫ সালে লেখা 'আসরাব-ই-খ (Secrets of Self) এবং ১৯১৮ সালে প্রকাশিত 'রামুযে বেখ (Mysteries of Selflessness) নামক মসনভী দু'টিতে তার একটা ঘনীভূত রূপ ফুটে উঠেছে। পরে এ দু'টো কাব্য একত্রে প্রকাশিত হয়।

'আসরাব-ই-খুদী'তে ইকবাল দর্শনের মূল বক্তব্য হচ্ছে : জীবন গতিশীল, জীবনের এ গতিশীলতার পথে যত কিছু বাধা-বিপত্তি আসবে তাদের জয় করেই জীবন এগিয়ে যাবে। ইকবাল এর নাম দিয়েছেন : 'এককত্বের দিকে গতিশীলতা।' আর এ পথে চলার জন্যে 'অহং'কে তিনটি স্তরে অতিক্রম করতে হয়।

এর প্রথম স্তর 'আইনানুগ হওয়া' বা 'নিয়ম-শৃঙ্খলা' মেনে চলা। জীবনের পথে কোনো আদর্শে পৌঁছতে হলে শৃঙ্খলার শাসন প্রত্যেক মানুষকেই মেনে চলতে হবে। না মানলে কোনো মানুষেরই ব্যক্তিত্ব পূর্ণ হবে না। এ পথে অগ্রসর হলে কোনো মানুষই তার ব্যক্তি-স্বাধীনতা হারায় না। অধিকন্তু নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলে সহজেই আদর্শে পৌঁছুতে পারে।

দ্বিতীয় স্তর 'আত্মসংযম'। আত্মসচেতনতা বা অহংবাদের শ্রেষ্ঠ রূপই হচ্ছে 'আত্মসংযম'। জীবনের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারার আগে প্রত্যেকেরই তার নিজের উপর সম্পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নিজের দুর্বলতাকে যে জয় করতে পারে সেই হয় শক্তির অধিকারী। 'আসরাব-ই-খুদী'তে কবি তাই গেয়েছেন :

'উটের মতো তোমার আত্মা শুধু যদি নিজের কথাই ভাবতে থাকে,
তা হ'লে তা হয় উদ্ধত, স্বশাসিত এবং স্বেচ্ছাচারী ;
মানুষ হও, নিজেকে চালিয়ে নেবার শক্তি রাখো তোমার
নিজের হাতে—
কুমোরের পাত্র হলেও, তা'হলে তুমি মুক্তোর মতো হতে পারবে।
যে নিজেকে শাসন করতে জানে না, অপরের শাসন শুধু তারই
উপর চলে।'

[অনুবাদ : মহম্মদ আবদুল হাই]

তৃতীয় স্তর বা দুনিয়াতে মানুষের বিকাশের শেষ স্তর 'খোদার খলিফা' হওয়া। এ স্তরেই হয় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ শক্তির সংযোগ। মানুষ এ পর্যায়ে পৌঁছুলে তার সব ভাব ও কর্ম, প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি একাকার হয়ে যায়।

কবির কথায় :

'খোদার খলিফা যে, সে হবে দুনিয়ার স্নায়ুকেন্দ্রের মতো,
তার সত্তার মধ্যে আছে মহত্তম নামের ছায়া,
পূর্ণ ও অপূর্ণের রহস্য সে জানে।
খোদার আদেশ দুনিয়াতে সে-ই কাজে পরিণত করে,
আর এই প্রাচীন সতরঞ্চকে সে-ই জড়িয়ে তোলে।

তার প্রতিভা জীবনের সহগামী,
আর তা জীবনের পথ ধরেই উন্মীলিত হয়।
তার ইচ্ছায় সৃষ্টি হয় আর একটা জগৎ।
এ জগতের মতো ছোট বড়ো অসংখ্য জগৎ
তার কল্পনার বীজ থেকে গোলাপের মতো
মুকুলিত ও মুঞ্জরিত হয়।'

[অনুবাদ : মহম্মদ আবদুল হাই]

ইকবাল তাঁর 'আসরার-ই-খুদী'তে জীবনের প্রতি সুফীদের নিষ্ক্রিয়, নিস্পৃহ এবং অবশ দৃষ্টিভঙ্গীর নির্মম সমালোচনা করেন। একদিকে রাজনৈতিক নৈরাশ্য এবং অপর দিকে সুফীদের এ-জীবন বিমুখ শিক্ষা মুসলমানদের মধ্যে একটা পরাজয়ের মনোভাব জাগিয়ে তোলে। ইকবাল এ 'ঘুমপাড়ানি' দর্শনকে যথাসাধ্য চাবকে নির্জীব মুসলমানদের কর্মচঞ্চল করে তুলতে চেয়েছিলেন :

'জীবনের পথ নিহিত আছে কাজের মধ্যেই
সৃষ্টিতে আনন্দ পাওয়াই হচ্ছে জীবনের ধর্ম।
ওঠো, নতুন জগৎ সৃষ্টি কর।
ইব্‌রাহীমের মতো হও, নিজেকে অগ্নিশিখা দিয়ে জড়িয়ে ফেলো।
যে-জগৎ তোমার সিদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়
তার সংগে সহযোগিতা করার সহজ অর্থ হচ্ছে
যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ হাতে নিজের ঢাল ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া।
বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ যে, নিজের উপর যার কর্তৃত্ব আছে,
সে দেখবে অদৃষ্ট তারই বিরুদ্ধে জানাচ্ছে অভিযোগ।'

কর্মবিমুখতা ও জীবন্মৃতাবস্থার প্রতি ইকবালের ঘৃণা ছিল তীব্র। যে শিল্প 'অহং', ব্যক্তি ও জাতির উন্নতিতে সহায়তা করে, ইকবালের মতে সে শিল্প সুস্থ ও মূল্যবান। তাঁর 'অহং'-দর্শনের মধ্যে এ শিল্পানুভূতিরও ঠাঁই আছে। কিন্তু যে শিল্প মানুষের 'আমি'-কে দুর্বল করে, ইকবালের মতে তা বেদনাদায়ক। যে কবির কাব্যে জীবনকে সমৃদ্ধ করে তার ব্যক্তিত্বকে দেয় শক্তি তার সম্বন্ধে ইকবাল মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন :

'কবির চিত্তেই সুন্দর তার দল-পাঁপড়ি মেলে,
তার সিনাই থেকেই সুন্দরের রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়।

কবির চোখেই সুন্দর হয় সুন্দরতর।
তারই প্রতিভার যাদুস্পর্শে প্রকৃতি হয় আরও রমণীয়।
তার ঠোঁটের বাণী থেকেই কোকিল গান শেখে ;
আর গোলাপের গাল যে লাল হয় সেও তো কবিরই তুলিকায়।'
['আসরার-ই-খুদী']

যে শিল্পীর শিল্প জীবনের আবেগকে দুর্বল করে দেয় এবং মানুষের আত্মাকে নিঝুম করে তোলে ইকবাল তাকে বরদাস্ত করতে পারতেন না।

জাতির জীবন গঠনে কবি-শিল্পীদের দায়িত্বের প্রতি ইকবাল বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর 'মরক্কো-ই-চুকতাই'-এর ভূমিকায় কবি তাই লিখেছেন :

'কবি-শিল্পীরা যে রকম প্রেরণা পায় মূলতঃ তারই উপরে জাতির নৈতিক জীবনের ভিত্তি গড়ে ওঠে। আদর্শহীন অধঃপতিত কবি শিল্পীর শিল্প সংগীতে কোন জাতি সম্মোহিত হ'লে সে জাতি জীবনে এটিলা কিংবা চেঙ্গিসের অগণিত ধ্বংসকারী সৈন্যের তুলনায় তাই বেশী মারাত্মক হয়ে ওঠে।'

ইকবালের মতে মানুষ যে সমাজে বাস করে উক্ত সমাজ থেকে সে যদি নৈতিক প্রেরণা না পায়, তা'হলে তার ব্যক্তিত্বও পূর্ণ হয় না এবং সে মুক্ত মনেরও অধিকারী হয় না। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বই যদিও বা মূল লক্ষ্য এবং সমাজ উপলক্ষ্য, তবু ব্যক্তি সমাজেই জন্মগ্রহণ করে এবং সমাজই ব্যক্তির লালন ও বিচরণ ভূমি। এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে দেখা যাবে সমাজ-জীবনে সন্ন্যাসীদের কোন স্থান নেই। যে মূলনীতি অবলম্বন করলে মানুষের জন্য আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা যায় ইকবাল তাঁর 'রামুজে বেখুদী'তে সুন্দরভাবে তা আলোচনা করেছেন।

ইকবালই প্রথম পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে বুদ্ধির জগতে বিপ্লব সাধন-মানসে তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাই মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে।

কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্না ইকবাল সম্বন্ধে বলেছেন :

'তিনি আমার কাছে ছিলেন বন্ধু, পথপ্রদর্শক ও দার্শনিক। মুসলিম লীগের চরম সংকট কালে সব সময় তিনি অটল পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে-

ছিলেন। মুহূর্তকালের জন্যও কোনদিন তিনি দমে যাননি।...মুসলিম-চিন্তা ও সংস্কৃতির তিনিই ছিলেন সার্থক বীণাবাদক। জগতের সুন্দরতম কাব্য তাঁর বীণা থেকে স্বতোৎসারিত হয়েছে। যতদিন ইসলাম থাকবে, ততদিন তাঁর নামও থাকবে অম্লান হয়ে। তাঁর কাব্যে মুসলমানদের যথার্থ আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে। তা থেকে আমরাই যে শুধু প্রেরণা পাই তা নয়, আমাদের বহু পুরুষ পরের মুসলমানরাও ইকবালের কাব্য থেকে সমভাবেই প্রেরণা পাবে।'

['পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার'।]

আধুনিক কাব্যধারা

শতাব্দীর অধিককাল থেকে পাশ্চাত্য প্রভাব পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে। উর্দু কবিতাকেও এ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পটভূমি থেকে মুক্ত করে দেখা চলে না। এমন কি, বিগত শতাব্দীর শেষার্ধের প্রারম্ভ থেকে হালী, আজাদ, ইসমাইল প্রমুখ উর্দু কবিরা গতানুগতিকতা ত্যাগ করে পাশ্চাত্য ধরনে মাতৃভাষার কাব্যাকৃতি গড়ে তুলতে তৎপর হন। তাঁদের প্রচেষ্টার ফল জনসাধারণের কাছে প্রতিভাত হয়ে ওঠে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে লাহোরে অনুষ্ঠিত এক মুশায়েরা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এ মুশায়েরায় নেতৃত্ব করেন কর্ন্যাল হলকইড্ নামক এক বিশিষ্ট ইংরেজ কাব্য-রসিক।

গত পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের উর্দু কবিতায় যে সব প্রবণতা ও ঘাত-প্রতিঘাত দেখা দিয়েছে, এখানে তারই একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানের প্রচেষ্টা করা গেল।

১৯৩৬ সনে ইউরোপে নতুন 'প্রগতিপন্থী' সাহিত্যিক সংঘের মারফত একটি ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এ সাহিত্যিক সংঘ প্যারিস-এ একত্রিত হয়ে মুসোলিনী ও হিটলার-প্রবর্তিত ফ্যাসি ও নাৎসী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রবল আওয়াজ তোলে। ভারতবর্ষেও সে একই সময়ে এবং একই উদ্দেশ্য নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন আরম্ভ হয়। ভারতের বহু সংখ্যক প্রগতিশীল কবি ও সাহিত্যিকও দ্বিধাহীন চিত্তে এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

স্বভাবতঃ স্বাধীনতা প্রাক্-কালীন উর্দু সাহিত্যের বিভিন্নমুখী প্রবণতার মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির বলিষ্ঠ রূপ লাভ করেঃ

বিদেশী শাসন শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিবাদ ও সংগ্রামের স্পৃহা; বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়ন-প্রেরণা।

সঙ্গে সঙ্গে উর্দু কবিতার কঠোর মানসিক, আধ্যাত্মিক ও আঙ্গিক গতানুগতিকতার উপর প্রবল আঘাত উদ্যত হয়ে উঠে এবং এ সব যুগ যুগ লালিত কারুকর্মাদিকে ফুংকারে উড়িয়ে দিতে উর্দু কবিকুল সোৎসাহে এগিয়ে আসেন।

উর্দু কবিতায় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকগুলিতেও লক্ষ্যগোচর হয়েছিল। অতএব এ যুগ পরিবর্তনের মুখে যখন এ আন্দোলন প্রবলতম রূপ ধারণ করে সর্ব ভারতের হিন্দু, মুসলিম ও শিখকে এক জনসমুদ্রে এনে মিলিত করে, তখন উর্দু কবিকুল সর্বান্তঃকরণে এবং পরিপূর্ণ আবেগে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধাবোধ করেন নি। ইতিমধ্যেই আকবর এলাহাবাদী ও ইকবালের কবিতায় এ সুর বিনা দ্বিধায় ধ্বনিত হচ্ছিল। কিছুকাল পরে চকবস্ত এ পদে দৃঢ়পদে এগিয়ে এসে ঘোষণা করলেন:

> 'ন লেঁ বিহিশ্‌ত ভি হাম্
>
> হোমরূল কি বদলে।'
>
> (হোমরুল এর বদলায়
>
> বিহিশ্‌তও আমরা নেব না।)

কিন্তু এ আন্দোলন যখন সত্যিই জাতীয় মঞ্চে রূপায়িত হয়ে উঠলো, তখন চকবস্ত আর বেঁচে নেই। তখন একে একে যাঁরা উদিত হলেন, তাঁরা হচ্ছেনঃ আফসার মিরাবী, আহ্‌সান দানিশ, আকবর শীরানী, সঘর নিযামী প্রভৃতি। এঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় উর্দু কবিতার ক্ষেত্রে দেশপ্রেমের শিখা অনির্বাণ জ্বলতে লাগল। এর পর যখন জোশ্‌ মহলাবাদী এলেন তখনই সাধিত হল সত্যিকারের বিপ্লব। শুধু কবি সংঘ নয়, জোশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের আপামর জনসাধারণও মুক্তি-যুদ্ধের জয় গানের উন্মাদনায় চঞ্চল হয়ে উঠলো। পাক-ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের আর এক দিক ছিল সাম্যবাদ। অনেক প্রথিতযশা রাজনীতিক এ মতবাদে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। ম্যাকসিম গোর্কি,

মায়াকভস্কি প্রমুখ সোভিয়েট কবি লেখকদের প্রেরণায় তরুণ দেশকর্মীদের সঙ্গে উদীয়মান উর্দু কবিসংঘও দেশের অবহেলিত জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশায় মুখর হয়ে উঠেন। এ যুগের উর্দু কবিতা তার নিজস্ব কাব্যিক সুর ও মাধুর্য হারিয়ে ধনিক-শ্রমিক, জমিদার-মহাজন-খাতক, ধনবান-নির্ধনের সম্পর্ক বিচারেই যেন আত্মনিয়োগ করেছে। জোশ্ নিজেও এ পথে এগিয়ে যান, কিন্তু কাব্যভঙ্গির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর থেকে যায়।

ইকবাল এ মনোভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত ছিলেন এ কথা বলা যায় না। তাঁর লেখায় বিত্তহীন শোষিত জনগণের দুঃখ বেদনা কোথাও কোথাও তীব্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এতে এ ধারা কিছুকালের জন্য উর্দু কাব্যের ঐতিহ্যের মর্যাদা লাভ করে। উদাহরণতঃ জোশ্-এর 'ফরমান-ই-খুদা' এবং সঘর-এর 'খিবির-ই-রাহ্' গ্রন্থাদি দস্তুরমতো অগ্নিগর্ভ বাণীর সমাহার। সাজ্জাদ্ এ গোষ্ঠীর চরমতম দৃষ্টান্ত। কিন্তু তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা নিদারুণ নৈরাশ্যমূলক:

'বড়হ কে ইস্ ইন্দার সভাকা
 সাথ্-ও-সাঁমা ফুঁক্ দোঁ
ইস্কা গুল্শন্ ফুঁক দোঁ
 ইস্কা শবিস্তাঁ ফুঁক দোঁ
তখ্ত্-ই-সুলতান ক্যা, মায়্ঁ
 সারা কসর-ই-সুলতান ফুঁক দোঁ
আয়্ গ্বম্ই-দিল্ ক্যা করোঁ
 আয়্ ওয়াহ্শত্-ই-দিল ক্যা করোঁ।'

অর্থাৎ,

('হে আমার অন্তরের দুঃখ!
 হে আমার হৃদয়ের জ্বালা!
 আমি কি করি? আমি কি করি?
এই ইন্দ্রসভা সাজ-সজ্জায় কি
 আগুন লাগিয়ে দেবো?
তার উদ্যান, তার বিরামাগার কি
 পুড়িয়ে দেবো?

রাজসিংহাসন কি—

সমগ্র রাজপ্রাসাদই কি পুড়িয়ে দেবো ?')

সাজ্জাদ্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ও বিপ্লবের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। তাই তিনি গাইলেন :

'আর হে হেঁ জঙ্‌কে বাদল্

উমড়ুতে হুয়ে

আগ্ দামন্ মেঁ হু পায়ে

খূন্ বর্‌সাতে হুয়ে।'

অর্থাৎ,

('রণ দামামা মেঘগম্ভীরে বাজে,

আগুন উজায়, রক্ত রাজে।')

এ কবিগোষ্ঠী দৈহিক পীড়নের ঝুঁকি নিয়েই প্রকাশ্যভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ উচ্ছেদের বাণী প্রচার করেছেন। সাজ্জাদ্ স্পষ্টতঃ বলেছেন :

'মে'রা-ঈমাঁ হ্যায় বাগ্বাওয়াত্

মে'রা মসল্‌ক ইনকিলাব্।'

('আমার ইমান হলো বিদ্রোহ

আমার নীতি বিপ্লব।')

এ প্রগতিপন্থী কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো জীবন ও প্রকৃতিকে বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে দেখা। জীবন ও জগৎপটে ঘটনাবলীর পশ্চাতে কোন্ অদৃশ্য নৈতিক সত্য কার্যকরী রয়েছে, তার প্রতি তাকিয়ে থাকার পক্ষপাতী নন্ এঁরা। অন্য পক্ষে, এঁদের দৃষ্টিতে জীবন বাস্তবতঃই সত্য, সুন্দর ও শ্রদ্ধেয়। তার রয়েছে অতুলনীয় প্রাণশক্তি ও বিকাশ ক্ষমতা। অবশ্য এ কথা মনে করা উচিত হবে না যে, উর্দু কবিতার পূর্বেকার যুগে বাস্তব জীবন-দৃষ্টি বা প্রকৃতির বাস্তব রূপ বর্ণনার অভাব ছিল, তা মোটেই নয়। কোন মহৎ সৃষ্টিই জীবনের সত্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। উর্দু কবিতার পথিকৃৎদের বেলায়ও দেখা যায় যে, জীবনের বাস্তব দিককে তাঁরা যোগ্য আসন দিয়েছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের মডেল ছিল সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখা মানুষ। প্রকৃতিও ছিল তেমনই অখণ্ড অস্তিত্ব। এতে বাস্তবের সঙ্গে রহস্যেরও স্থান

ছিল। দৈহিক রূপের সঙ্গে হৃদয়ের ঐশ্বর্যেরও যোগ ছিল। আধুনিক কবিরাও প্রকৃতিকে—মানুষকে স্বীকৃতি দিয়েছেন: জীবন-মৃত্যু, গঙ্গা-যমুনা, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত, চাঁদ-চাঁদনি তারার স্তুতিগান করেছেন—কিন্তু রহস্যবর্জিত বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে।

বাস্তববাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে আসে প্রদর্শনী মনোভাব (exhibitionism)। এ মনোভাব জোশ্ ও তাঁর অনুসৃত কবিদের মধ্যে লক্ষণীয়। অবশ্য এও তাঁদের দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম অভিব্যক্তির একটি উপলক্ষ্য বিশেষ। জীবনের সামান্যতম অনুভূতি বা প্রকৃতির ইতরতম দৃশ্যপটকেও তাঁরা এমন একান্ত অনুরাগের সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন যে, পাঠক সাধারণকে তা মুগ্ধ করে। জোশ্-এর 'গামনী আওর্ দেহাতী বাজার' বা 'ঝুমতি বরসাত্' ইত্যাদি কবিতার উল্লেখ এ পর্যায়ে করা যায়। অন্যদিকে জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী বা সমাজবিরোধী কার্যাবলীর বিরুদ্ধেও তাঁদের লেখনী সমভাবেই বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করেছে। এ ক্ষেত্রে তাঁদের প্রশংসাবাদ যেমন অনুপম, অন্যদিকে তাঁদের আক্রমণও তেমনি কঠোর ও নির্মম। এ প্রসংগে জোশ্-এর কবিতা 'নায়ুক আন্দামান-ই-কালেজ' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নীতিবিগর্হিত আচার বা মনুষ্যত্বহীন মনোভাবকেও এঁরা আক্রমণ করেছেন। জোশ্-এর 'খান্‌কাহ্', সঘর-এর 'নাগ', অধ্যাপক শোর-এর 'দেওলত কি খুদায়ী' ইত্যাদি রচনা পাঠক মনকে সত্যিই অভিভূত করার ক্ষমতা রাখে।

এ আধুনিক লেখকদের বাস্তববাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে রোম্যান্‌টিক দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁদের দৃষ্টিতে যৌবন হলো জীবনের শ্রেষ্ঠতম ও পরম কাম্য অংশ। মানুষ যত ইতরবৃত্তিই অবলম্বন করুক না কেন, সে কখনও ছোট নয়। তার যুব-মন তেমনই প্রেমপ্রবণ, তেমনই নিসর্গ রূপগ্রাহী। প্রতিটি যুবতীই রূপবতী, হলোই বা তার চণ্ডালের ঘরে জন্ম। কবির স্তুতিবাক্যের সে সমভাবেই হক্‌দার, যেমন হক্‌দার হতে পারে রাজকন্যা। এ স্তুতিবাদ অকৃপণভাবে করেছেন জোশ্। পূর্বেকার গজল গীতির স্থানে আধুনিককালে এ রোম্যান্‌টিক কবিকৃতি প্রাধান্য লাভ করেছে। এ বিভাগে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন সঘর। তাঁর কাব্য সঞ্চয়নের বেশীর ভাগই রোম্যান্‌টিক কবিতার সৃষ্টি। তাঁর অপরূপ কাব্য সৃষ্টির নমুনা স্বরূপ উল্লেখ করা যায় 'নাগ' কবিতাটির। একটি হিংস্র

কদর্য ভয়াবহ সরীসৃপকে তিনি এমন রূপদৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন যে পাঠকের কাছে তা সুন্দরের মনোহরের দূত বলে প্রতিভাত হয়। এক কথায়, সঘর-এ কাব্যিক বৈশিষ্ট্যই হলো রোম্যান্‌টিসিজম্ বা কল্পরূপ দৃষ্টি।

এ ক্ষেত্রে অন্য যাঁরা বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন তাঁরা হলেনঃ (প্রবীণদের মধ্যে) হাফিয্ জলন্ধরী ও আহ্‌সান দানিশ্ এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত নবাগতরা—যাঁদের অন্যতম হলেন হিমায়েত আলী শায়ের। এ ভাবধারা পাশ্চাত্য থেকে আমদানী হয়ে থাকলেও ফার্সী ও উর্দু গজল-এর সঙ্গে এর মর্মের মিল অনেকখানি। তাতে বহুসংখ্যক কবি ও পাঠকের কাছে এ সহজেই আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আঙ্গিক ও কারুকার্য বিচারে বলা যায় যে, বর্তমান উর্দু কবিতা একটি নবতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলেছে। এখন দিনের পর দিন যে সব নতুন কবিতাধারা সৃষ্টি হয়ে চলেছে তাকে কিছুতেই পুরাতন ব্যাকরণের চৌহদ্দির মধ্যে আটকানো যাবে না। এ সবের নজীর পূর্বসূরীদের লেখায় অপ্রাপ্য। বিশেষ করে পূর্বেকার মাপাজোকা স্তবকে বাঁধা কবিতা এখন আর বেশী সংখ্যায় লেখা হচ্ছে না। এখন এক একটা কবিতা-কলি হচ্ছে ছায়াছবিতে বর্ণনাযোগ্য আকারে এক একটা ভাবকে রূপ দিয়ে রচিত—অবশ্য পূর্বাপর ভাবধারার সঙ্গে সংযোগ রেখে। ফিরাক-এর 'জুঙ্গো' এবং জগন্নাথ আজাদ-এর 'আফসানায়ে আনশাহী' কবিতাদ্বয় এ পর্যায়ের কাব্যসৃষ্টির উপমাস্থল।

এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে উর্দু কবিতা পূর্বেকার বাঁধাধরা ছন্দ, মিল, অবয়ব—সবই উপেক্ষা করে সসম্মানে এগিয়ে এসেছে। এখন সে আর পুরানো 'ক্বাফিয়াহ্' ও 'রদীফ্' মেনে চল্‌ছে না—এমন কি, পূর্বেকার কোন কানুনই মেনে চলছে না। এ প্রসঙ্গে অবশ্য একটি বিষয় প্রণিধান-যোগ্য যে এভাবে পূর্বেকার বহিরারোপিত খোলস থেকে বেরিয়ে না আসলে উর্দু কবিতার মর্মস্থলে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছে, তাকে ধারণ করবার ক্ষমতা আয়ত্ত করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হতো।

এ সব নব প্রবর্তিত ও বিবর্তিত ছন্দের প্রথমটি হলো 'নয্‌ম্-ই-মুআর্‌রাহ্'—যা ইউরোপ থেকে আমদানী করা ব্ল্যাঙ্ক ভার্স বা অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুরূপ। এ ছন্দ উর্দু কবিতায় আমদানী করেন ইস্‌মাইল মীরাথী বিগত শতকের সপ্তম দশকে। এ ছন্দে রচিত তাঁর

কবিতা 'তাঁরো চরি রাত' সমধিক প্রসিদ্ধ। তারপর 'নয্ম্-ই-আবাদ' বা ইউরোপীয় ফ্রী ভার্স (মুক্তছন্দ)-এর অনুরূপ ছন্দ প্রযুক্ত হচ্ছে আরও আধুনিককালে। পরবর্তী কবিদের মধ্যে যাঁরা এ ক্ষেত্রে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁরা হলেন: এন্. এম্. রশিদ, মীরানজী, আলী সর্দার জ্বাফ্‌রী এবং ইউসুফ জাফর।

অবশ্য অন্যান্য শ্রেণীর কবিতার তুলনায় গজ্‌ল-এর প্রভাব উর্দু ভাষায় সর্বাপেক্ষা অধিক রয়েছে এবং থাকবে। এর বিশেষ কারণ গজল-এর সরলতা ও সরসতা, তার ঐতিহাসিক জনপ্রিয়তা, তার বিষয় নির্বাচন, বলিষ্ঠ বাচনভঙ্গি এবং মৃদু মধুর সাংগীতিক রূপ। এ কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে না যে, উর্দু কবিতা লেখার শিক্ষানবীশী আরম্ভ হয় প্রায় সর্বক্ষেত্রেই গজল দিয়ে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে গজল-এর বিরুদ্ধে বহুতর প্রচার চলেছে। কিন্তু তাতে তার মর্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। বরঞ্চ গজল ও গজল-রচয়িতার সংখ্যা সর্বদাই সমধিক রয়েছে। এমন কি হাস্‌রত, আস্‌গর, ফানী ফিরাক, আরযু, জিগর প্রমুখ শ্রেষ্ঠতম কবিকুল বিশেষ করে গজল-এরই বৈজয়ন্তীবাহী। অবশ্য হাস্‌রতই প্রথম গজল্‌কে নতুন আঙ্গিকের রূপ দিয়ে নবতর জীবনীশক্তি দান করেন।

আধুনিক গজল-রচয়িতাদের মধ্যে আবার গালিব-এর অনুসরণ বৃত্তি ফিরে এসেছে। গজল-এর আঙ্গিক এমন কি, বর্ণনারীতির ক্ষেত্রেও তাঁদের উপর গালিবের প্রভাব দৃশ্যমান। এ কবিপ্রধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদও এঁরা বিশ্বস্তভাবে আত্মস্থ করেছেন। কিন্তু গালিবের চিন্তাধারা ও আদর্শবাদে যে সৃষ্টিধর্মিতা এবং তাঁর বর্ণনার যে আভিজাত্য প্রবহমান, আমাদের আজকের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে তা দুর্লভ। কিন্তু সুন্দর সহজ মধুর ভাষা ও অলঙ্কারের অনায়াস প্রয়াসে তাঁরা গুরুকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছেন।

ফানী ফিরাক্, জিগর এবং তাঁদের সহকর্মীদের গজল একাধারে ভাবধারার মাধুর্য, বর্ণনার রূপৈশ্বর্য এবং রচনারীতির প্রগাঢ়ত্বে মণ্ডিত। সাধারণ মানবীয় চিন্তাভাবনা মানুষের সর্ব কালের সঙ্গ বটে। কিন্তু এসব বিষয় ব্যক্তিগত অনুভূতি দিয়ে এঁরা এমনভাবে পাঠকসমক্ষে তুলে ধরেছেন যে তাতে নবতর আবিষ্কারের স্বাদ জাজ্বল্যমান হয়ে ধরা

দিয়েছে। গালিব ছাড়াও মীরমর্দ, সওদা মুশাবী, মু'মিন প্রমুখ মহারথীরাও আমাদের আধুনিক কবিদের লেখনী স্পর্শে পুনরাবিষ্কৃত হচ্ছেন। ['মর্ণিং নিউজ' স্বাধীনতা দিবস ক্রোড়পত্র (১৯৬১)]

উর্দু গদ্য

স্যার সৈয়দের সময় উর্দু সাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা হয়েছিল। উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস মওলানা মোহম্মদ হোসেন আজাদের 'আবে-হায়াৎ' প্রাঞ্জল বিশ্লেষণমূলক ভঙ্গীতে লিখিত হয়। এ গ্রন্থেই সর্ব প্রথম বর্ণনামূলক তাজকারাকে সমালোচনা করা হয়। আজাদ ভাষাতত্ত্ব ও ইতিহাসের উপর কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। হালীর সহযোগিতায় আজাদ নির্দিষ্ট ছন্দের পরিবর্তে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে মুশায়েরায় কবিতা আবৃত্তির ঐতিহ্য গড়ে তোলেন। এসব মুশায়েরা থেকেই আধুনিক উর্দু কবিতার জন্ম। এ একই সময় নাজম গজলের স্থান দখল করে। কিছু সংখ্যক ইংরেজী কবিতার স্বচ্ছ তরজমাও এ সময় প্রকাশিত হয়। তারপর উর্দু ধীরে ধীরে বিদেশী কাব্য-ঐতিহ্য গ্রহণ করতে শুরু করে।

হালী 'মুকাদ্দামা-ই-শেয়র ও শায়রী' লিখেন। তিনি উর্দু কাব্যের ইতিহাসকে নয়া দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্লেষণ করেন। তিনি কাব্যের মান উন্নয়নের জন্য কতকগুলি প্রস্তাব করেন। এ থেকেই উর্দু ভাষায় নিয়মিত সাহিত্য আলোচনার সূত্রপাত হয় বলা যায়। হালী জীবন-চরিত রচনার ধারাকেও পুনর্বিন্যস্ত করেন। 'হায়াত জাবেদ', 'ইয়াদগার-ই-গালিব' ও 'হায়াতে সাদা' এদিক থেকে প্রথম নমুনা।

যুগের রাজনৈতিক চাহিদা পরিপূরণের উদ্দেশ্যে হালীর সমসাময়িক লেখক নাজীর আহমদ সামাজিক উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ডিকেন্স ও স্কট থেকে তিনি অবাধে বিভিন্ন বিষয় গ্রহণ করেন। নাজীর আহমদ পবিত্র কোরাণকে কথ্য ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর ফৌজদারী দণ্ডবিধির অনুবাদ আজকেও জনপ্রিয়। তিনি আরবীতেও সুপণ্ডিত ছিলেন।

'শেয়র-উল-আজম' গ্রন্থে শিবলী ফার্সী ভাষা ও কাব্যের বিশ্লেষণ-মূলক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। তিনি উর্দু সাহিত্যে মুসলিম মহাপুরুষদের

জীবনী রচনা করেন। এ সব জীবনচরিতের মধ্যে 'আল-ফারুক', 'আল-মামুন', 'হায়াতে আবু হানিফা' ও 'সিরাতুন নবী' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ।

প্রায় একই সময়ে সৈয়দ আহমদ দেহলবী 'ফারহাঙ্গে-আসফিয়া' নামে এক উর্দু অভিধান প্রণয়ন করেন। চার খণ্ডে এ অভিধান বিভক্ত। উর্দু সাহিত্যে প্রথম হাস্যরসাত্মক ম্যাগাজিন 'ঔধপাঞ্চ' ও তার লেখক-গোষ্ঠীর উল্লেখ না করলে উর্দু সাহিত্য ও তার আধুনিক গতিধারার ইতিহাস আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এ সময়ের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশে 'নওল কিশোর প্রেম' যথেষ্ট সহায়তা করে। পুরাতন ও নতুন পুস্তক প্রকাশ করে এ প্রেম উর্দু সাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ করে তোলে।

এ সময় রজব আলী বেগ সরুর বর্ণনাপ্রধান রচনা ও উপন্যাসের মাঝামাঝি একটা রীতি গড়ে তুলবার চেষ্টা করেন। তাঁর 'ফাসানায়ে আজীয়ের' এ ধরনের একটা রচনা।

ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক রচনাকে উৎসাহিত করে 'ঔধপাঞ্চ' সম্ভাবনার এক নয়া রাজপথ উন্মুক্ত করে দেয়। 'ঔধপাঞ্চ' এমন একদল লেখক গড়ে তোলে যাঁরা উর্দু গদ্যসাহিত্যে সুদূর প্রসারী পরিবর্তন ফিরে আনে। 'ঔধপাঞ্চ'-এর সম্পাদক মুন্সী সাজ্জাদ হোসেন হাস্যরসাত্মক উপন্যাস লিখে একটা ঐতিহ্য গড়ে তোলেন। তাঁর লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন মীর্জা মাচ্ছু বেগ, সিতাম জারিফ, তীরভূম নাথ হিজর এবং ঢাকার নওয়াব সৈয়দ মোহম্মদ আজাদ। এ একই গোষ্ঠীর লেখক আকবর এলাহাবাদী উর্দুতে ব্যঙ্গ কবিতার আদর্শ প্রচারের এক নয়া কার্যকরী মাধ্যম গড়ে তোলেন। সত্যি সত্যি উর্দু কবিতায় ব্যঙ্গ ঐতিহ্যের প্রবর্তক। খ্যাতনামা ব্যঙ্গ রচয়িতা ও ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সরুর অন্যতম। গদ্য বর্ণনা ও চরিত্রচিত্রণের দিক থেকে তাঁর 'ফাসানায়ে আজাদ' একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সাড়ে তিন হাজার পৃষ্ঠার এ গ্রন্থখানিকে লক্ষ্ণৌ তামদ্দুনের বিশ্বকোষ বলা হয়। এর চরিত্রগুলি আজও আমাদের অনুভূতিশীল জীবনের অন্যতম অঙ্গ। শাবার ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটি ধারা গড়ে তোলেন। 'উমরাওজান' আদা-র রচয়িতা মীর্জা রসুভা আধুনিক উর্দু উপন্যাসের ভিত্তি গড়ে তোলেন।

ওয়াজেদ আলী শাহের সময়ে উর্দু নাটকের বীজ উপ্ত হয়। ইংরেজী

নাটক উর্দুতে তরজমা করে আগা হাশর এ প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, মুন্সী প্রেমচাঁদ যদিও মূলতঃ হিন্দী কথাশিল্পী এবং ভারতীয় লেখক কিন্তু উর্দু গদ্যে গল্প বলার রীতিতে তিনি সম্পূর্ণ নতুন স্টাইল প্রবর্তন করেন। তাঁর উপন্যাস ও ছোট গল্পে হিন্দুস্থানী গ্রাম্য ও শহরে জীবন যথার্থরূপে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর সুন্দর ও বলিষ্ঠ গল্পে উর্দু সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করেছে। দাসত্ব থেকে মুক্তি, স্বাধীনতার সংগ্রাম, গ্রাম্য জীবনের পশ্চাদপদতা, যুবসমাজের বেকার সমস্যা ও সমাজের অধঃপাতিত অবস্থা এ সব সমস্যা তাঁর রচনাবলীর সর্বত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে।

জোশ মালিহাবাদী রোমান্টিক ও বৈপ্লবিক কবিতার নয়া ভাবধারা প্রবর্তন করেন। তাঁর নির্ভীকতা ও ভাষার উপর অসামান্য দখল উর্দু কবিতাকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে ধ্বনিবৈচিত্র্যে।

একসময় বাংলা ছোট গল্প উর্দুকে প্রভাবান্বিত করতে শুরু করেছিল। বহু গুরুত্বপূর্ণ তরজমাকার্য সম্পন্ন করা হয়। উর্দুভাবাপন্ন নতুন এক 'রম্য রচনা'ও (ইনশা-ই-লতিফ) গড়ে ওঠে।—['মাহে নাও']

সমালোচনা

পাকিস্তান সৃষ্টি তথা ভারত বিভাগের ফলে উর্দু সাহিত্যে দুই বিশিষ্ট দিক্‌পাল পাকিস্তানে চলে আসেন চিরস্থায়ীভাবে। এঁরা হলেন ডঃ আবদুল হক ও নিয়াজ ফতেপুরী। এঁরা দু'জনেই উর্দু সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর সমালোচক। ডঃ সাদানি, ডঃ সবজুয়ালী, ডঃ আবুল লাইস সিদ্দিকী, ডঃ ইবাদাৎ বেরেলবী, আবিদ আলী আবিদ, ভিকার হাজিম প্রমুখ অনেকেই আধুনিক উর্দু সাহিত্যে বিশিষ্ট সমালোচক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁরা সেকাল ও একালের উর্দু গদ্যের সমালোচনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে প্রয়াসী হয়েছেন। বিকার হাজিম উর্দু উপন্যাসের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন দুই খণ্ডে তাঁর 'দাস্তান সে আফসেন তাক' গ্রন্থে। ডঃ আবুল লাইস সিদ্দিকী লক্ষ্মৌ ইস্কুল উর্দু কবিতার বিশদ আলোচনা করেছেন তাঁর গ্রন্থে। সৈয়দ আবিদ আলী আবিদ তাঁর 'উসুল-ই ইন্তিকাদ' গ্রন্থে সমালোচনা ধারার

নতুন মূল্যায়ণ নিরূপণে প্রয়াসী হয়েছেন। ডঃ আহ্সান ফারুকী নিজে একজন বিশিষ্ট কথাশিল্পী। উর্দু কথা সাহিত্য নিয়ে তিনি গবেষণামূলক বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। হাসান আসকারী ও মামতাজ শিরিন দুজনেই আধুনিক গল্প লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা উর্দু সাহিত্যকে যাচাই করেছেন। মামতাজ হোসেন ও ডঃ সৈয়দ আবদুল্লা বিদগ্ধ সমালোচক হিসাবে স্বীকৃত। ডঃ ওয়াজেদ আলী সমাজ সচেতন সাহিত্য চিন্তা ও সমীক্ষা উর্দু সমালোচনাকে নতুন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। সাহিত্য সমালোচক হিসাবে মুজাফর আলী সৈয়দ, ডঃ ওয়াহিদ কুরেসি ও জামিল জালিবী উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া উর্দু সাহিত্যে হাস্যরসাত্মক রচনারও অভাব নেই। ব্যঙ্গ ও প্রহসন মূলক কবিতার জন্য সৈয়দ জামির জাফরী, সৈয়দ মহম্মদ জাফরী, রেইস আমরোহভি ও মামুদ শাহিদীর দান অনস্বীকার্য। সমসাময়িক ঘটনাবলী ও ব্যক্তি বিশেষে চাল চলন ও ভাব ভঙ্গির প্যারোডি করায় এঁদের প্রধান লক্ষ্য।

হালের কয়েকখানি নাম করা উর্দু উপন্যাস :

মমতাজ মুক্তির লেখা 'হালিপুর কা এ ইলি'; আহম্মদ হামিদের লেখা 'বিরান মহল', 'আঁধেরেকে সুরজ' ও 'রশ্মি কা রাগ'; গোলাম আব্বাস—'ঝাড়ে কী চাঁদনী'; আবদুল্লা হোসেন—'উদাসে নাসলেন'; জামিল হাশমী—'তালাশ-ই-বহরান'; রাজিয়া ফাসি আহমেদ—'আবলা পা'। (১৯৬৪ সালের আদমজী পুরস্কারে ভূষিত) নাভেদ আনজুম, সিম্মি; আগা আসরফ—'কিরণ কিরণ আঁধে', 'উফুক সে উফুক তক'; সাহিদা সুলতানা—'শারারে'; আনোয়ার সাজ্জাদ—'চৌরাহে'; মাসুদ মুক্তি—'মোহাদ্দপ শিশা'; এস. কাশিম মামুদ—'কস্থর কি মেইন্দী'; খাদিজা মাস্তুর—'অনগণ', 'তিস্‌রি মঞ্জিল; হাজিরা মাসরুর—'দীওয়ারেন'; হামিদ কাশ্মীরী—'চার নভেলেট' ইত্যাদি।

নাম করা কয়েকখানি উর্দু কবিতার বই :

কবি ফৈয়জ আহ্‌মেদ ফৈয়জ-এর লেখা 'দাস্ত-ই-তা-ই-সাঙ্গ'; শাদ অমৃতসারী—'দাগ-ই-ফ্রিরাগ'; মহম্মদ সফদার—'দার্দ কা ফুল'; আবদুল

আজিজ খালেদ—'ফারকোয়ালিং' ; ডঃ ওয়াজির আগা—'সাম আও সায়ে' ; আবদুল হামিদ আদক—'নাকোয়াদ-ই-দিল' ইত্যাদি।

কয়েকখানি হালের উর্দু সমালোচনা গ্রন্থ :

ডঃ এস. আবদুল্লার 'শাখশিয়াৎ' ও 'মীর আম্মান সে আবদুল হক্তক্' ; ভিকর আজিমের 'ফান আওর ফুনকার' ; ডঃ উজির আগার 'উর্দু শারকি কা মিরাজ' ; জামিল জালিবী-র 'পাকিস্তানী সাকোয়াফৎ' ; আসলাম ফারুকি-র 'মহম্মদ হুসান আজাদ' ; ডঃ এ. শাদাবী—'তাহ্‌কিক্ কা রৌশমি মেন' ; ফৈয়জ রামপুরী—'মোমিন' ; ডঃ বাহিদ কুরেশি—'ক্লাশিকি আদব কা তাহকি কী মুতায়লা' ; ডঃ এস. সাবজোয়ারী—'উর্দু লিসনিয়া'।

গদ্যের ক্ষেত্রেও সম্প্রতি আরও অনেকগুলি সার্থক গল্প রচিত হয়েছে। মুস্তাক ইউসুফির 'চিরাগতালে' ; মিসেস আখতিয়ার রিয়াজুদ্দীনের লেখা 'সাতসমুদ্রের পার' ; কর্ণেল মহম্মদ খাঁ-র 'বাজাস্তা আমাদ', বিশেষ করে এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

পাকিস্তানের নতুন সাহিত্যে উন্নতি ও প্রসারকল্পে সরকারী ও বে-সরকারী তরফের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রবীণ ও নবীন লেখকদের উৎসাহিত করবার জন্য বহুবিধ সাহিত্য সংস্থা গঠিত হয়েছে। তাদের মধ্যে 'পাকিস্তান লেখক গোষ্ঠী' ; বাংলা ও উর্দুর উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় বোর্ড, আঞ্জুমান-ই-তারাককী-ই-উর্দু, বাংলা একাদেমী (ঢাকা), উর্দু একাদেমী (বাহাওয়ালপুর), পুশতু একাদেমী (পেশোয়ার), পশ্চিম পাকিস্তান সাহিত্য এ্যাডভান্সমেণ্ট বোর্ড, আনজুমান সাকোয়াফৎ-ই-ইসলামিয়া, নজরুল একাদেমী (করাচী), ইকবাল একাদেমী (করাচী), সিন্ধী আদাবী বোর্ড (হায়দরাবাদ), উর্দু উন্নয়ন বোর্ড (করাচী) ইত্যাদি।

উর্দু নাটক

সাহিত্যের অপরাপর ক্ষেত্রের তুলনায় উর্দু নাট্য সাহিত্য সময়োপযোগী রূপ লাভ করেছে বলতে হয় কিছুটা দেরীতে। এর সৃষ্টি বিগত শতকের মাঝামাঝি সময়ে অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের দরবারে। কিন্তু বিদেশী ভাবধারার প্রভাবে আধুনিক জগতে স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে এর প্রায় এক শ' বছর কেটে

গেছে। প্রথম পর্যায়ে মির্জা আমানত, রওনক বারান্নসী, পণ্ডিত বিনায়ক প্রসাদ, মেহদী আলি আহসান প্রমুখ প্রতিভাশালী নাট্য-কারদের হাতে যে সব কাহিনী সৃষ্ট হয় তা ছিল অবাস্তব কল্পনাশ্রয়ী। কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে নি। সাহিত্যিকগোষ্ঠী সাধারণতঃ সমাজ সচেতন হয়ে থাকেন। তার উপর তখন ইউরোপীয় শিক্ষার প্রসারের দিন।

এ সব কারণ পরম্পরা এ দেশেও নব নব সাহিত্য রচনার ক্ষেত্র সুগম করে দেয়। এ সময়ে পাকিস্তানের নাট্যকাররা যে সব নাটক রচনা করেন তাতে দেখা যায় সামাজিক ও মানবিক সমস্যাবলীর প্রতিফলন। নাট্য সাহিত্য এ সময় সামাজিক হয়ে ওঠে। উর্দু নাট্য সাহিত্যে প্রথম মৌলিকতার ভাবধারা আনেন মেহদী আলি আহসান। তিনি সেকেলে লিখনভঙ্গী ত্যাগ করে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। কিন্তু বাস্তব রচনা তিনি খুব সামান্যই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর নাটকের অধিকাংশই পাশ্চাত্য লেখকদের অনুসরণ করে রচিত। এ সব নাটকে আবার কথাবার্তা বা বর্ণনার ছক-বাঁধা পদ্ধতি থেকে মুক্ত করে সহজ, সরল, স্বাভাবিক ও মঞ্চমুখী করে দাঁড় করিয়েছেন তালিব বানারসী। এ দিক থেকে মেহদী আলি আহসানকে বলা যায় উর্দু নাট্য সাহিত্যের অগ্রদূত। জীবনকে সহজভাবে বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে দেখা এবং বিশ্বস্তভাবে চিত্রণই হল এঁদের লক্ষ্য। সমাজের নৈতিক সমস্যা তুলে ধরতে গিয়ে তাঁরা প্রশংসাসূচক ভাবে আর্টের মর্যাদার সীমা মেনে চলেছেন। এর আগেকার নাট্যকারের মধ্যে প্রথমেই নাম করা উচিত আগা হাশর কাশ্মীরীর। বর্তমান পর্যায়ের নাট্যবিদদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রধান সার্থক 'ভাষা শিল্পী'।

আধুনিক সমাজে প্রচলিত অনাচারের প্রতি তিনি তীব্র চাবুকাঘাত করেন। তিনি অনেক বাস্তব নাটক সৃষ্টি করেছেন। তা ছাড়া, শেক্সপীয়রের রচিত কয়েকটি নাটকের তিনি সুন্দর অনুবাদ করেছেন। উর্দু নাট্য ক্ষেত্রে এ সকল নবীন প্রতিভাবান শিল্পীদের যথেষ্ট সম্মান দিতে হবে। অবশ্য, স্বীকার করতে হবে আধুনিক নাট্য সমালোচকের দৃষ্টিতে এঁদের নাটকের অনেক টেকনিক্যাল গলদ ধরা পড়বে। এর কারণ বুঝতে হলে পাকিস্তানের উর্দু নাট্য সাহিত্যের ঐতিহ্যের খোঁজ করতে হবে।

উর্দু নাট্য সাহিত্য যখন আধুনিক রূপ নিতে আরম্ভ করে, তখন প্রথমত ছিল ইংরেজী এলিজাবেথীয় মঞ্চের প্রসার। অধিকাংশ শিক্ষিত নাট্যলেখক সম্প্রদায় ছিলেন তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত। দ্বিতীয়তঃ, এঁদের অনেকে ছিলেন মঞ্চ পরিচালনার ব্যাপারে অজ্ঞ। তাঁদের রচনার মাপকাঠি ছিল পূর্ব প্রচারিত জনপ্রিয় নাটকাবলী। তৃতীয়তঃ, অজ্ঞ, অদূরদর্শী থিয়েটার মালিকদের নির্দেশ ছিল অলঙ্ঘ্য। এঁরা নাটকের শিল্পরূপের চেয়ে নগদ পয়সার সমারোহের প্রতিই ছিলেন অধিক আকৃষ্ট। আধুনিক পর্যায়ের নাট্যসাহিত্যে পাকিস্তানীদের কোন নিজস্ব ঐতিহ্য না থাকায়, উচ্চ মানের এবং আকর্ষণীয় অভিনয়ের আয়োজনে পাকিস্তানী নাট্যকারদের বাধ্য হয়ে পশ্চিমী আদর্শই গ্রহণ করতে হয়েছিল। তা ছাড়া, যে ধরনের মঞ্চ তখন সাধারণভাবে চালু ছিল, তার মডেল ছিল ফার্সী। ওয়াজিদ আলী শাহের দরবারে জনৈক ফার্সী অভ্যাগতের তৈরী একটি মঞ্চের অনুকরণেই এগুলি গড়ে উঠেছিল। অতএব এলিজাবেথীয় মঞ্চের মতোই এসব মঞ্চেও 'ড্রপ্ সীন' বা যবনিকা পতনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। নাটকও রচিত হতো শেক্সপীয়রীয় মডেলে।

তারপর পাশ্চাত্যেরই অনুকরণে পাকিস্তানীদের মঞ্চে যখন 'ড্রপ্ কার্টেন' ও অপরাপর কিছু কিছু হের্ ফেরের আমদানী হলো, তখনও পাকিস্তানী লেখকেরা আগেকার আঙ্গিকেই নাটক রচনা করে চলেছেন। এ দিকে সামাজিক জীবনের দুর্দশা পরাধীনতার প্রতি অসন্তোষ এবং এ দু'য়ের পরস্পর সম্পর্কের প্রতি সচেতনতা যতই থাকুক না কেন, পাকিস্তানী নাট্যকারেরা তখনও পাশ্চাত্যের পুরাতন কৃতী নাট্যকারদের প্রভাব থেকে মুক্ত হবার কথা ভাবেন নি। নাটকে নতুন বিষয়াদির আমদানী হয়েছে, কিন্তু সেই পূর্বেকার ধরন-ধারণ অব্যাহত রয়ে গেছে।

এ অবস্থায় যখন ১৯৪৭ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম হলো এবং নাট্য-সাহিত্য ও শিল্পকে যুগোপযোগী করে দাঁড় করাবার সুতীব্র প্রয়োজন অনুভূত হলো তখন দেখা গেল পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে নাট্য সাহিত্যের মারফত প্রগতির বাণী নিয়ে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলবার মতো একটি মাত্র রচনাও নেই। আগা হাশরের পরে যাঁরা নাটক লিখেছেন, দেখা গেল যে তাঁদের দৌড় ছিল রেডিও প্রোগ্রাম বা সাহিত্য মজলিশ পর্যন্ত। সত্যিকারের নাট্য রচনার মধ্যে নয়।

এখন এ নবতর প্রয়োজনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাকিস্তানী নাট্যকার ও মঞ্চশিল্পীরা ত্বরিত গতিতে এ প্রতিষ্ঠানের নবরূপায়ণে উদ্যোগী হলেন। তাঁদের প্রচেষ্টা অল্পকালের মধ্যেই ভবিষ্যতের জন্য শুভ ইঙ্গিত বহন করে আনলো। সহজে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে কার্যক্ষেত্রে অবতরণের জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক সহায়তা আকর্ষণের উদ্দেশ্যে তাঁরা প্রথমতঃ বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণ এবং ভাবানুকরণ নিয়ে নাট্য রচনা শুরু করলেন।

পরে পরে পাকিস্তানের নবাগত নাট্যকারেরা মৌলিক রচনায়ও হাত দিলেন। আয়োজন, আসবাব, মাল-মসলার অভাব সর্বক্ষেত্রে অনুভূত হওয়া সত্ত্বেও এ উৎসাহী সংঘ পিছপাও হলেন না। বিভিন্ন মঞ্চে অভিনয় শুরু হয়ে গেলো। উপস্থিত ক্ষেত্রে দর্শক আকর্ষণ করে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করাবার জন্য কোন কোন দল ইংরেজী নাটক দিয়ে যাত্রা আরম্ভ করলেন। কিন্তু করাচীর 'অবস্তু গার্দে আর্ট থিয়েটার' ইত্যাদি কোন কোন প্রতিষ্ঠান উর্দুতেই কাজ শুরু করেন এবং বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্যে শিল্প প্রচেষ্টার রূপ দেবার বলিষ্ঠ সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন।

বিগত দশ-বারো বছরের মধ্যে পাকিস্তানে নানান নাট্যসাহিত্য রচিত হয়েছে। মঞ্চাভিনয়ের প্রতি দর্শক সাধারণের মোটামুটি অবহেলার ফলে প্রথম থেকেই উন্নতমানের নাটক পরিবেশন সম্ভব হয়নি। বেশির ভাগ সহজ হাসি-রসিকতাপূর্ণ মিলনান্তক অথবা ব্যঙ্গ বিদ্রূপধর্মী নাটকই এখনও অভিনীত হচ্ছে। কদাচিৎ দু'একটি চিন্তাশীল বা উদ্দেশ্যমূলক অভিনয়ের আয়োজন যে হচ্ছে না, তা অবশ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, খাওয়াজা মইনুদ্দীন রচিত 'লাল কিল্লা সে লালু-ক্ষেত' রচনাটির। এ নাটকে বিবৃত হয়েছে একটি পাকিস্তান পরিবারের কথা। হিজরত করে আসবার পথে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার নিদারুণ কাহিনী ও সুতীব্র মানসিক ঘাত-সংঘাত। এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে একটি নতুন জাতির, নতুন দেশের কষ্টকঠিন জন্মলাভ ও প্রতিষ্ঠা প্রাক্কালে কি করে বন্ধু শত্রু হয়ে পড়ে, মানুষ মানবতাবোধ হারায়, ধাপে ধাপে মানবাত্মা অবনতির নিম্নস্তরে নেমে যায়—তারই ইতিহাস। 'নয়া নিশান' রচিত হয়েছে (ভূস্বর্গ) কাশ্মীর নিয়ে। অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত

ব্যাপ্ত পাকিস্তানী সামাজিক জীবনের তমসাচ্ছন্ন ছবি আঁকা হয়েছে 'যবতক চম্‌কে সোনা' নাটিকায়। আজ পর্যন্ত, মনে হয়, এটিই প্রথম এবং শেষ উল্লেখযোগ্য রচনা যাতে পাকিস্তানের সভ্য আমলের মানসিক এবং নৈতিক বিপ্লবের পর্যায়ক্রম খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এসব নাট্য রচনার একটি সাধারণ ত্রুটি এই যে, যথাযথ মঞ্চ ব্যবস্থার অনুপস্থিতির দরুন এসব কাহিনীর স্বাভাবিক পূর্ণরূপ দেওয়া যায়নি। একটি প্রসঙ্গকেই যতখানি পারা যায় শাখাপল্লব ছাঁটাই করে দাঁড় করাতে হয়েছে। তাকে জোরদার করবার জন্যে পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক চিত্রাবলীর অবতারণা করা হয়নি। তা ছাড়া এখনও যথেষ্ট সংখ্যায় অভিনয় শিল্পীর—বিশেষ করে ভালো অভিনেত্রীর—অভাব খুবই অনুভূত হয়। এ অবস্থায় বেশির ভাগ নাটিকাই লেখা হচ্ছে স্বল্পসংখ্যক অভিনেতা দিয়ে মঞ্চস্থ করবার যোগ্য করে। তার উপর ছোট মঞ্চে সীন্ ঘন ঘন বদলান যায় না বলে, এতে অবতারণা করা হয়েছে যতটা পারা যায় কম সংখ্যক দৃশ্য ও সেট। দুঃখের বিষয় এই যে, সমগ্র পাকিস্তানে আধুনিক একটি যথাযথ আসবাবপত্র সজ্জিত রঙ্গমঞ্চ নেই বললেও চলে। অতএব আধুনিক নাট্যকারেরা টেকনিকের দিক থেকে সহজ করে তুলবার জন্যে মাত্র একটি সেট দিয়েই কাহিনী সমাপ্ত করবার চেষ্টা করেন। এ দিয়ে অভিনয় ব্যবস্থার ব্যয় দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে বিপুলভাবে। অথচ সৌখিন নাট্য-সম্প্রদায়ের প্রমোদ-কর থেকে রেহাই নেই। তদুপরি যথাযথ সঙ্গতি ও সজ্জাব্যবস্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেও মঞ্চ মালিকেরা ভাড়ার অঙ্ক উঁচিয়ে ধরে রেখেছেন। অতএব আর্থিক সম্ভাব্যতার অভাবে এখন পর্যন্ত অতি অল্পসংখ্যক নাটক লিখিত এবং তারও চেয়ে অল্প সংখ্যক নাটক অভিনীত হয়েছে।

একথা বলা হয়েছে যে পাকিস্তানের রঙ্গালয়গুলি আধুনিক নাট্যকলা মঞ্চস্থ করবার পক্ষে যথাযথভাবে যোগ্য নয়। প্রথম দিকে শব্দ পরিবহণের ব্যবস্থাও ছিল না। তাই ষ্টেজে কয়েকটি মাইক্রোফোন খাটিয়ে দেওয়া হতো। এতে অভিনেতাদের ছিল খুবই অসুবিধা। অনেক সময় মাইকের নিকটে নিকটে থাকবার সচেতন প্রয়াস তাঁদের অভিনয় করার কৃতীর প্রতিই অমনোযোগ দেখা যায়। এমনকি তাঁরা কখনো কখনো ষ্টেজ-এর নিয়ম-কানুন রক্ষায় পর্যন্ত ভুল করে বসতেন।

তাই পরবর্তী পর্যায়ে মিয়া মহিউদ্দীন, ফরিদ আহমদ, আলী আহমদ প্রমুখ সুযোগ্য পরিচালকেরা মাইক্রোফোন বাদ দিয়ে ভয়েস্ কাল্চার-এ মনোনিবেশ করেন। এ পরীক্ষা থেকে অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক ফল পাওয়া গেছে। এখন বেশ কয়েকজন সৌখীন তরুণ অভিনেতা-অভিনেত্রী আন্তরিক প্রচেষ্টাই এ ব্যাপারে কৃতকার্য অর্জন করতে চলেছেন। সময় সাপেক্ষ হলেও এঁদের ভবিষ্যৎ সবিশেষ আশাপ্রদ।

বর্তমানে বিষয়-নির্বাচন ব্যাপারে আমাদের নাট্যকারেরা আর সেই পূর্বেকার বহু-বিশ্রুত ও ক্লান্তিকর প্রেম কাহিনীর অবতারণা করেন না। এখন তাঁরা নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করছেন। এখনকার বিষয়বস্তুতে ভাবালুতার চেয়ে চারিত্রিক সততা এবং কল্পনাপ্রিয়তার চেয়ে সমাজ সচেতনতাই অধিকতর সম্মানিত স্থান লাভ করেছে। এও সত্যিই একটা আশাপ্রদ দিক।

কিছুদিন পূর্বে 'অবন্ত গার্দে আর্ট থিয়েটারে' উর্দুতে স্যামুয়েল বেকেট্-এর রূপক বিরহ মিলনান্তক নাটক 'ওয়েটিং ফর গড' (উর্দু নাম 'সুবাহ হোনে তক্') অভিনয় করে করাচীর নাট্যামোদী সম্প্রদায়কে চমৎকৃত করে দেন। অপূর্ব কৃতকার্যতার সঙ্গে এ বইয়ের সচ্ছন্দ উর্দু রূপ দেন নাট্যকার-পরিচালক আলী আহমদ। মাত্র পাঁচজন অভিনেতা নিয়ে—একজনও অভিনেত্রী ছাড়া—এবং হস্তপদ পরিচালনা প্রায় বাদ দিয়েই এ বিদ্রূপাত্মক রূপক কাহিনীর রূপ দানে মূলের সঙ্গে আশ্চর্য সঙ্গতি রেখে উর্দু মঞ্চে সার্থক অভিনয় আলী আহমদের একটি স্মরণীয় কৃতিত্ব।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকের এ হেন মনন-সমৃদ্ধ লেখার জনপ্রিয়তা থেকে ধারণা করা যায় যে, উর্দু মঞ্চ শিল্প সত্যিই প্রগতির পথে দৃঢ় পদে এগিয়ে চলেছে। এখন তাকে আর ফিরে তাকাতে হবে না। যথাযথ যত্ন ও সাধনা নিয়ে নবতর পরীক্ষা নিরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করলে এখন এ পথে কৃতকার্যতা অবশ্যম্ভাবী। মঞ্চ শিল্পের চুম্বকাকর্ষণ এখনও মিথ্যা হয়ে যায়নি, বরং নবতর শক্তিতে দেখা দিয়েছে।

বহুতর বাধা-বিপত্তি সত্বেও পাকিস্তানী নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক সংঘ যথাসাধ্য আন্তরিকতার সঙ্গে পাকিস্তানের এ শিল্পের একটি

পূর্ণাবয়ব ঐতিহ্য গড়ে তুলতে আত্মনিয়োগ করেছেন। এক্ষেত্রে রসজ্ঞ দেশবাসীর কাছ থেকে যা সাড়া পাওয়া গেছে তাও নিঃসন্দেহে পরম উৎসাহব্যঞ্জক। অতএব এ শুভ উদ্দেশ্য নিয়েই এগিয়ে চলাই একান্তভাবে কাম্য।

সিন্ধী সাহিত্য

সিন্ধী একটি প্রাচীন ভাষা। প্রাকৃতের বীরচদ উপভাষা থেকে সরাসরি এর উৎপত্তি। তবে সিন্ধী ভাষায় এমন বহু শব্দ রয়েছে সংস্কৃতের সঙ্গে যেগুলির কোন মৌলিক সম্বন্ধ নেই। এ শব্দগুলি হয়ত এমনি কোন আদি ভাষার ছিটেফোঁটা যার সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক বিদ্যমান। এ সত্য অনস্বীকার্য যে, খ্রীষ্টজন্মের প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে আর্যজাতি ভারত ও সিন্ধুতে সংস্কৃত ভাষা আমদানী করেন। তবে মহেঞ্জোদরোর ভগ্নাবশেষ ও অন্যান্য ঢিবি থেকে প্রমাণিত হয় যে, এর বহু পূর্ব থেকেই সিন্ধুর একটা স্বকীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, মহেঞ্জোদরোর ভাষার সঙ্গে সোমারীয় ও অন্যান্য প্রাচীন ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে। হয়ত এ সব ভাষাই মহেঞ্জোদরোর ভাষার মূল ভিত্তি। তবে মহেঞ্জোদরোর লিপির বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধারের পূর্বে সিন্ধী ভাষার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে কিছু বলা যায় না।

এ সত্ত্বেও সিন্ধী ভাষা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ভাষা হিসাবে পরিগণিত। সিন্ধী ভাষায় রচিত গানের অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি আমরা হিজরীর দ্বিতীয় শতকের শেষ দিকে শুনতে পাই। কথিত আছে, জনৈক সিন্ধী কবি বারমিসাইড্ মন্ত্রী ফজল-বেন-ইয়াহ্ইয়ার গুণকীর্তন-সূচক কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন (১৯৩ হিজরী—৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ)। এ

কবিতাটি কোন কোন আরবী ও ফার্সি ভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থে সংরক্ষিত রয়েছে। কবিতাটি এইরূপ 'আরা বারা কানকারা কারাকারি মানদারা'। অর্থাৎ, আমাদের দেশে কোন মহৎ কর্মের কথা আলোচনা হলেই উদাহরণস্বরূপ তোমার নাম উচ্চারিত হয়।

এই কবিতা শ্রবণে ফজল এত সন্তুষ্ট হন যে, তিনি সিন্ধী কবিকে খেলাত ও হাজার স্বর্ণ দিনারসহ বহু সংখ্যক উষ্ট্র ও অন্যান্য গবাদি-পশু উপঢৌকন প্রদান করেন। এই কবিতার অনুবাদককেও তিনি পাঁচশত স্বর্ণ দিনার উপহার দিয়ে সখেদে মন্তব্য করেন: 'আফশোস! এই ভাষা আমার অবোধ্য!'

সিন্ধী ভাষা কখন ভাব আদান প্রদানের মাধ্যমরূপে প্রথম ব্যবহৃত হয়, সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত নই। তবে দশম শতাব্দীর আল-ইসতাখরী ও আল-মাকাদিসীর মত আরব্য পরিব্রাজকদের অবিসংবাদিত সাক্ষ্য রয়েছে যে, তখন দয়বাল, মানসুরা ও মুলতানের কথ্য ভাষা ছিল আরবী ও সিন্ধী। সিন্ধী ভাষা যে বর্ণমালায় লিখিত হতো সে সম্বন্ধে আল-বেরুনী (৯৭৩—১০৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর রচিত 'কিতবুল হিন্দে' লিখে গেছেন যে, সমুদ্রোপকূলবর্তী দক্ষিণ সিন্ধুতে মালোয়ারী বর্ণমালা ব্যবহৃত হতো এবং প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলে আধা নাগরী বর্ণমালা প্রচলিত ছিলো।

এই বর্ণমালা কবে আরবী বর্ণমালায় রূপান্তরিত হলো সে সম্বন্ধে সঠিক তথ্য অজ্ঞাত। তবে এই রূপান্তরপ্রক্রিয়া নিশ্চয়ই নিয়মিত ও মন্থরগতিতে সাধিত হয়েছিলো। মনে হয়, মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র কোরাণের ভাষা এই পৌত্তলিক ভাষার স্থান দখল করে। এমনি অদ্ভুত ঘটনা পারশ্য দেশেও সংঘটিত হয়েছিলো। সেখানেও অগ্নি-পূজাবাদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আরবী লিপির অনুকূলে পাহলভী লিপি পরিত্যক্ত হয়। আরবী ভাষার বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে লিখিত সিন্ধী লিপির প্রাচীনতম নমুনা পাওয়া যায় বুলরীবাসী সিন্ধী কবি শাহ্ করিমের (১৫৩৭—১৬২৩ খ্রীঃ) বয়াতে। এই বয়াত তাঁর 'গন্নগুজবে' সন্নিবিষ্ট আছে। এই গ্রন্থ তাঁর শাগরেদ মুহাম্মদ রিদা ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেন। তবে আরবী-পদ্ধতিতে সিন্ধী ভাষা লিখন-রীতি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। কারণ এতে উচ্চারণ দীর্ঘায়িতকরণ ও

সানুনাসিক শব্দের কোন স্থান নেই। সিন্ধী ভাষার বায়ান্নটি ধ্বনিকে আরবী ভাষার ত্রিশটি বর্ণমালায় ব্যক্ত করতে হয়, তবে বুঝতে অসুবিধে হয় না।

পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার ন্যায় সিন্ধী ভাষারও প্রথম সাহিত্য কাব্য। সিন্ধী কাব্য যে যুগে প্রথম রচিত ও গীত হয়, সে যুগে সিন্ধুবাসীরা অসভ্য ছিলো না। আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পর সিন্ধুবাসীরা তাদের অতীত ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়। তাদের মন ইসলামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও সুফী প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে উঠে। তাই তাদের প্রাচীনতম কবিতার যে নমুনা পাওয়া যায় তাতে ধর্মীয় আবেগ, নীতিকথা ও উপদেশের বাহুল্য রক্ষিত হয়। প্রথম দিকে তাদের কাব্য শ্রুতিকটু, স্বাচ্ছন্দ্যহীন ও কল্পনা সম্পদহীন হলেও কাব্য গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধী কাব্যে সঙ্গীতমাধুর্য বাড়তে থাকে। অবশেষে ভিটের শাহ্ আবদুল লতিফের শ্রুতিমধুর ও করুণ রস সমৃদ্ধ কাব্যে সিন্ধু কাব্য যোগ্য বাহন খুঁজে পায়। তাঁর কাব্য ছন্দ প্রবাহে ভাবগরিমায় এবং প্রকাশ মাধুর্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

সিন্ধী সাহিত্যের বিশেষ দুর্ভাগ্য যে সিন্ধুর প্রাচীন পণ্ডিতমণ্ডলী আরবী এবং ফার্সি সাহিত্য চর্চায় ব্যস্ত থাকতেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত আরবী ফার্সিই ছিলো তাঁদের কাব্য ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনার মাধ্যম। তাঁরা তাঁদের সুমধুর মাতৃভাষার প্রতি উদাসীন ছিলেন। বহু মহাকবিই হয়ত সিন্ধুতে জন্মেছেন। কিন্তু তাঁদের কাব্য-গাথা কেউ লিপিবদ্ধ করে রাখেনি বলে কিছুকাল লোককণ্ঠে গীত হবার পর সেগুলো উষর মরুর হাওয়ার সঙ্গে বিলীন হয়ে গেছে। তদুপরি, সে যুগে এমন 'রাবি' বা কথক সম্প্রদায় ছিলো না যারা সে যুগের কাব্যগাথা উত্তর পুরুষের কাছে হস্তান্তরিত করে দিতে পারতো। সিন্ধুর পণ্ডিতমণ্ডলীর এই অবহেলার ফলে সিন্ধুর প্রাচীন কবিতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। স্বামীয়ের মস্তকবিহীন সপ্ত তাপসের রচনা বলে কথিত অপ্রামাণিক কবিতাবলী এখনও বিদ্যমান আছে। এই সপ্ত তাপস সাম্মা শাসনের অবসান ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। উপরোক্ত কবিতাবলী বার্টন ও হেগের গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে।

কিন্তু শেখ হাম্মাদ জামালী (১৩৬২ খ্রীষ্টাব্দ), শেখ ভিরিয়ো ইসহাক

আহিস্থার (কর্মকার) দরবেশ রাজো, কামিল মাজধুব ও অন্যান্যদের রচিত কবিতাবলী চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। একমাত্র ইসহাকের ছুটো কবিতার চরণ এখনও বেঁচে রয়েছে। চরণ ছুটো কল্পনামাধুর্যে সমুজ্জ্বল। চরণ ছুটোর ভাবার্থ হলো 'প্রেমিক পুরুষ চটকপক্ষীর ছদ্মবেশে তার দয়িতার ডানার উপর বসে থাকবে যাতে সে দয়িতার মধুর সোহাগবাণী শুনতে পায়।' এমন কি দ্বিতীয় সাঈদ আলীর (৯৭১ হিজরী) সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বী বিখ্যাত কবি দারস আল্লাহদিনো, কবি ইসহাক সাহতো এবং মাখছুম মুহাম্মদ মুঈনের রচিত কবিতারও কোন হদিস পাওয়া যায় না, যদিও জীবদ্দশায় তাঁরা অত্যন্ত লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

হালা কান্দিব (প্রাচীন হালা) মাখছুম আহমদ ভাট্টির মৃত্যুর সঙ্গে সম্পৃক্ত ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হায়দারাবাদের এক 'সামা' সমাবেশে আবৃত্তি করা। বহু পূর্বে রচিত ছুটো বয়াতে সত্যিকার সিন্ধী কাব্যের সূচনা ও ভবিষ্যৎ গতিপ্রবাহ লক্ষিত হয়। পরবর্তী কালে কাজী কাদানের (মৃত্যু ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দ) রচিত সাতটি বয়াতও বহু উপলক্ষে শাহ্ করিম কর্তৃক বহুবার আবৃত্তি করা হয়। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর 'গল্প-গুজবে' এই বয়াতগুলি রক্ষিত আছে। নতুবা সে-গুলিও অন্ধকারে মিলিয়ে যেতো। বয়াত-গুলি সুফিবাদমূলক। এতে স্বতঃই ধারণা হয় যে, সে যুগের অন্যতম মহাজ্ঞানী ও পরম সূফী কাজী এমনি আরও কবিতা রচনা করেছিলেন।

মাখছুম নূহর (১৫০৫—১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ) প্রচারবাণী অধুনা সিন্ধী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বহু বয়াত রচনার কৃতিত্বের অধিকারী তিনি। তবে তাঁর রচিত বয়াতের সামান্য কয়েকটি মাত্র বর্তমানে পাওয়া যায়। প্রায় তাঁর সমকালেই আর একজন মহাকবি ও আউলিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি হলেন মাখছুম পীর মুহাম্মদ লাখভী। তাঁর একটি বয়াত 'বাযাদ-এ-খাদিমী' গ্রন্থে সঙ্কলিত আছে। এই বয়াতে তিনি আল্লাহ্র দূত ও প্রেয়সীর বার্তাবাহক ভোরের হাওয়াকে তাঁর আকাঙ্খা ও অভিনন্দন রসুলাল্লাহ্র সমীপে পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। এই কবিতা কাব্য সাহিত্যের এক বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত।

পরবর্তী যুগে মাখছুম মুহাম্মদ হাসিম মিঞা আবছুল্লাহ মানধিরো ও কামারোর পীর মুহাম্মদ আশরাফ এই শ্রেণীর কাব্যে সম্পূর্ণতা

আনয়ন করেন। তাঁরা সবাই তাঁদের কবি-জীবনে ইবনুল ফরিদ ও আল বুসিরির 'বুর্দা' কাব্য থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। প্রাচীন ধর্মীয় ও সুফী-কাব্যে এই দুজন কবির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। বুর্দা কাব্য গ্রন্থখানা মৌলভী শফী মুহাম্মদ, মৌলভী আলী মুহাম্মদ মাহেরি ও আবদুল্লাহ্ আতহার কর্তৃক সিন্ধী ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

এখন সৈয়দ আবদুল করিম বা বুলরির শাহ্ করিমের যুগের কাব্য-ধারা সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক। সৈয়দ আবদুল করিমকে সিন্ধী কাব্যাকাশের শুকতারা আখ্যায়িত করা যায়। তাঁর কাব্যপ্রাঙ্গণ খুব বিস্তৃত নয়। তাঁর রচিত মাত্র একানব্বইটি দ্বিপদী কবিতা, দুটি ত্রিপদী কবিতা, ও একটি মাত্র কাব্যগাথা পাওয়া যায়। তাঁর কাব্যের পরিধি ও বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর কাব্যে রয়েছে ব্যাকুল আত্মার কামনা প্রকাশের তীব্রতা। কাব্য ও সঙ্গীত তাঁর সত্তার সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে। তাঁর কাব্য শ্রুতিকটু আর স্বাচ্ছন্দ্যহীন হলেও তা ভাবব্যঞ্জনা বা সহজাত সৌন্দর্যবিহীন নয়। তাঁর কাব্য সংক্ষিপ্ত ও বলিষ্ঠ এবং নীতিকথাও মরমীতত্ত্বে পূর্ণ। প্রায় এক শতাব্দী পরে তাঁর দ্বিপদী কবিতা বা 'দাহিরা' শাহ্ আবদুল লতিফ কর্তৃক আরও উন্নীত ও ত্রুটি-বিচ্যুতিহীন হয়ে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। শেখ করিমের কাব্যের বাহন খাঁটি সিন্ধী ভাষা! এতে আরবী-ফার্সি শব্দের সংমিশ্রণ নেই। তাতে এ সত্যই প্রতিপন্ন হয় যে, সিন্ধী ভাষা অন্য কোন ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকেও গম্ভীর ও জটিল ভাব প্রকাশে সক্ষম। শাহ্ আবদুল লতিফের ন্যায় মহামনীষীর হাতে সিন্ধী ভাষা গভীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাবধারা ও মধুর সুন্দর প্রকাশের সূক্ষ্ম বাহনরূপে পরিণত হয়। অন্য কোন সাহিত্যে এই মাধুর্য ও শৈলী দুর্লভ।

শাহ্ করিমের মৃত্যুর পর প্রায় এক শতাব্দীকাল সিন্ধী সাহিত্যে শূন্যতা বিরাজ করে। এ সময় সিন্ধুর কাব্য জগতের কোন শ্রেষ্ঠ কবির সাক্ষাৎ মেলে না। তবে এমন কোন প্রমাণও নেই যে, সে সময় সিন্ধুতে কোন কবি ছিলেন না। অন্তত: এমন দু'জন কবি সে সময় প্রসিদ্ধি লাভ করেন যাঁদের কাব্য শাহ্ করিমের কাব্যের চেয়ে উৎকৃষ্টতর মনে হয়।

ওসমান ইহ্সানি শাহ্ করিমের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তিনি 'ওয়াতান নামা' নামক একখানি কবিতা গ্রন্থ রচনা করেন। এ কবিতায়

তিনি মৃত্যুত্তোর জীবনের সমস্যা নিয়ে ইহলোকের অনিত্যতা ও পরলোকের নিত্যতা সম্বন্ধে অতি শোকপূর্ণ আলোচনা করেছেন। লুৎফুল্লাহ্ কাদিরি তাঁর গ্রন্থ 'মিনহাজুল মাবিকা' হিজরী ১০৭৮ সালে রচনা করেন। তিনি কেবল সূফীতত্ত্ব সম্বলিত প্রবন্ধকাররূপেই খ্যাতি অর্জন করেন নি, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবিও ছিলেন। তাঁর রচিত পনরটি বয়াত উল্লেখিত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। তবে তাঁর প্রবন্ধপুস্তক 'তুহফাতুস সালেকিন' চিরতরে অবলুপ্ত হয়ে গেছে বলেই মনে হয়। এমনি করে শহীদ আওলিয়া ঝোকের শাহ্ এনায়েতের (১১৩০ হিজরী) রচনা বলে কথিত কবিতা-বলীরও কোন অস্তিত্ব নেই।

সুতরাং সিন্ধুর কাব্য-জগতে শাহ্ লতিফের আবির্ভাব কোন (১১০২-১১৬৫ হিজরী; ১৬৮৯-১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দ) বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ভাবগরিমায় ও প্রতিভার বহুমুখীতায় তাঁর স্থান তাঁর পূর্বসূরী ও সমসাময়িকদের অনেক উচ্চে হলেও কাব্য-ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের কাছে বহুভাবে ঋণী। তাঁর কাব্যের বাহন বয়াত বা দাহিরার আঙ্গিক তাঁর পূর্বসূরীরা নির্ধারণ করে গেছেন। মার্লোর সঙ্গে শেক্সপীয়ারের যে সম্পর্ক তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক নাসরপুরের শাহ্ এনায়েতের সঙ্গে শাহ্ লতিফের সেই সম্পর্ক। শাহ্ এনায়েতের কাব্য প্রাচীন খাঁটি সিন্ধী শব্দ সম্পদে বরং অধিক সম্পদশালী। তবে শাহ্ লতিফের কাব্যের সেই অতুলনীয়তা, গতিশীলতা ও মাধুরিমার স্বাক্ষর তাতে নেই। বলা বাহুল্য শাহ্ করিম, শাহ্ এনায়েত ও অন্যান্য প্রাচীন কবিবৃন্দ শাহ্ লতিফের শ্রেষ্ঠত্বের পথ রচনা করেছিলেন।

শাহ্ লতিফের কাব্যে একটা সার্বজনীন আবেদন রয়েছে। বিশ্বের সেরা কবিদের পংক্তিতে তাঁর আসন। তাঁর কাব্যে প্রশান্তি ও স্বর্গীয় তৃপ্তির নিঃশ্বাস প্রবাহিত। তাঁর উক্তি, 'হে মানব, ভেবো না এগুলো ছন্দোবদ্ধ চরণ মাত্র; এগুলো স্বর্গীয় কাব্য,' অতিরঞ্জন নয়।

তাঁর কাব্য পাঠককে প্রিয়ার কুঞ্জে পৌঁছে দেয়। তাঁর কাব্য উজ্জ্বল হীরক তুল্য। তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু বিচিত্র। সূফী আধ্যাত্মিকতা, নীতি কথা, রোমান্টিকতা ও গীতি-ধর্ম কোনটাই তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু থেকে বাদ পড়েনি। তবে তাঁর কাব্যের আঙ্গিকে বিভিন্নতা থাকলেও কাব্যের মূল সুরসৃষ্টির অন্তিম আশ্রয় স্রষ্টার সুরে বাঁধা। স্বর্গীয় নির্যাতনে

পরমানন্দ উপভোগ তাঁর কাব্যের সহজাত প্রেরণা। তাঁর কাব্যে প্রিয়-বিরহের যাতনা, প্রেমাতুর আত্মার তীব্র আকুলতা ও বিরহীচিত্তের অনন্ত পুরুষের সঙ্গে একাত্মতা লাভের বাসনা রূপায়িত। তাঁর কাব্য দেশাত্মবোধেও সমুজ্জল। তাঁর কাব্যে আছে সিন্ধুর আকাশ-মাটির সৌন্দর্য বর্ণনা আর নদ-নদীর বিরাটত্বের কীর্তন। বিষয়বস্তুর কথা বাদ দিলেও তাঁর কাব্যে রয়েছে শিল্প-সিদ্ধ সৌন্দর্যবোধ ও বাক্যালঙ্কারের মাধুর্য। ছন্দ-প্রবাহের তালে তালে অনুপ্রাসের অনুরণন তাঁর কাব্যে ঢেলে দিয়েছে আরও সুখ-শ্রুতি। বার বার শুনেও মন অতৃপ্ত থেকে যায়। শাহ্ লতিফের কাব্য সিন্ধী-সাহিত্যের ভাণ্ডার। যতদিন তাঁর কাম্য বর্তমান থাকবে ততদিন সিন্ধী ভাষা এবং সাহিত্যও অক্ষয় হয়ে থাকবে। তাঁর রচিত বয়াত এমনি নিখুঁত ও ত্রুটিবিচ্যুতিহীন যে তাঁর উত্তরসাধক কবিবৃন্দ তাঁর রচনা-রীতি অনুসরণ করেছেন বটে কিন্তু তাঁর সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেননি। শাহ্ লতিফ অন্য এক শ্রেণীর কাব্য অর্থাৎ ওয়াই বা কাফির (গাথা) ও উদ্ভাবক। তাঁর উত্তরসূরীরা এ কাব্যের আরও উন্নয়ন সাধন করেন। রমজান (কুম্ভকার) আহমদ আলী, নূর মুহাম্মদ মিস্ত্রী শাহ্ প্রমুখ কবিদের হাতে গাথা-কাব্য উঁচু স্তরের শিল্পকর্মের মর্যাদা লাভ করেছে।

ইংরেজী সাহিত্যে এলিজাবেথীয় যুগের মত শাহ্ লতিফের যুগে সিন্ধুতে বহু শক্তিধর প্রতিভার আবির্ভাব হয়। তাঁরা কাব্যের অন্যান্য শাখায় বিশেষতঃ ধর্মীয় কাব্য ও মরমীকাব্য রচনায় খ্যাতি অর্জন করেন। পীর মুহাম্মদ লাখভী কর্তৃক উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর বা তথা-কথিত 'আ' অন্ত (আলিফুল ইসবাহ্) পদাবলী মাখদুম আবুল হাসান (মৃত্যু ১১৬৫ হিজরী), মাখদুম মুহাম্মদ হাশিম (মৃত্যু ১১৭৪ হিজরী) ও মাখদুম আবদুল্লাহ্ মানধিরো লোকপ্রিয় করে তুলেন। কাব্য রচনার এই সহজ ও অমার্জিত রূপ নিম্নস্তরের প্রতিভা-সম্পন্ন কবিদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করে। তাঁরাও এ কাব্য রচনার রীতি অনুসরণ করেন। মাখদুম দিযাউদ্দিনের (মৃত্যু ১১৭১ হিজরী) রচিত ধর্মীয় কাব্য অত্যন্ত অমার্জিত ও মাধুর্যহীন। তবে তাঁর ভক্ত শিষ্য মাখদুম মুহাম্মদ হাশিম তাঁর রচিত 'কুতুল আশেকিন' গ্রন্থে উন্নত মানের ভাব-গম্ভীর ও করুণরস পরিবেশন করেছেন, যদিও 'আ' অন্ত ছন্দে রচিত অলৌকিক ঘটনাবলী

বা মৌজেজার বিবরণ প্রাণহীন ও বিরস। পীর মুহাম্মদ আশরাফ (মৃত্যু ১১৭৭ হিজরী), মিঞা আবদুল্লাহ্, সৈয়দ হারুণ ও মিঞা ঈসা রচিত এ শ্রেণীর কবিতা শান্ত মধুর ভাববর্জিত নয়। প্রাচীন মুসলিম কবিদের প্রিয়তম নবীর প্রতি ভক্তিরসে তাঁদের কাব্য উজ্জ্বল। এই কবিত্রয়ের রচিত সুদীর্ঘ 'ত্রিচ্ আখরী' যে কবিতার প্রতি অনুচ্ছেদ আরবীর কোন বর্ণমালা দিয়ে আরম্ভ) কবিতামালা বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা ও প্রকাশ-মাধুর্যে চমৎকারিত্বের অধিকারী। প্রাচীন হালার অধিবাসী মাখদুম রউফ শাহ্ লতিফের এন্তেকালের মাত্র এক বছর পর এন্তেকাল করেন। সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম কবি যিনি ছন্দ-প্রকরণের রীতি অনুসারে 'মাওলুদ' কাব্য রচনা করেন। শাহের অন্যতম সমসাময়িক কবি ফ'কর সাহেব দীন (১১০১-১১৯৮ হিজরী) বহু বয়াত ও কাফির রচয়িতা। তাঁর এই কাব্য থেকেই তাঁর পৌত্র সাচাল উচ্ছ্বাসপূর্ণ গীতিকাব্য রচনার প্রেরণা লাভ করেন।

শাহ্ লতিফের বয়োকনিষ্ঠ কবি লুনওয়ারীর খাজা মুহাম্মদ জামান—যাঁর আশীর্বাদ তিনি অন্তিম জীবনে কামনা করেছিলেন—মরমী কাব্য 'আবিয়াত-এ-সিন্ধী' রচনা করে যশস্বী হয়েছেন। এ কাব্যগ্রন্থ তাঁর উদ্যমশীল ভক্ত শেখ আবদুর রহিম (১৭৩৯-১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ) আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। বর্তমান প্রবন্ধকার সিন্ধী ভাষায় এই কাব্য-গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা করে প্রাচীন সিন্ধী কাব্যে প্রচলিত বহু মরমী চিন্তাধারা উদ্ঘাটিত করেছেন। আবদুর রহিম স্বয়ং ছিলেন গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ও একজন উঁচুদরের কবি। তিনি শাহ্ লতিফের পদ্ধতি অনুসারে 'কালিমা' নামক বহু দীর্ঘ কবিতা ও দ্বিপদী কবিতা রচনা করেন। এ কবিতাগুলো অতীব মরমী ভাব-সম্পন্ন অথচ কাব্য হিসাবেও চমৎকার। যে মোল্লারা স্বার্থ সাধন মানসে কোরাণ ও হাদিসের অনুজ্ঞার অপব্যাখ্যা করে, তাঁর কবিতাবলীতে এ সব ধর্মধ্বজী মোল্লাদের ভণ্ডামীর তীব্র নিন্দাও রয়েছে। এখানে সিন্ধুর রাশিদী পীর গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ মুহাম্মদ বাঝার (১১৩৫-১১৯০ হিজরী) নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর কবিতায় স্বকীয় মাধুর্য বর্তমান। রহিল্ এবং তাঁর পুত্রদের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের কাব্যে মরমী ও বেদান্ত ভাবধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে।

উল্লেখিত কবিদের অধিকাংশই কালহোরা যুগের লোক। সত্যি বলতে কি সিন্ধীসাহিত্যের এ স্বর্ণ যুগ। সে যুগে 'বয়াত' কাব্যই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। এই বংশের এক যুবরাজ মুহাম্মদ সরফরাজ খান (রাজত্ব কাল ১৭৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন একজন সৌখীন কবি। তিনি 'মাদাহ্' (হজরত মুহাম্মদ ও তাঁর সাহাবীদের প্রশংসাবাচক কবিতা) নামক এক শ্রেণীর কাব্যের প্রবর্তন করেন। জুমন চরণ, সাদরুদ্দীন, ফাতেহ্ ফকির ও হাফিজ পিন্যু এ কাব্যের উন্নয়ন সাধন করেন। তাঁরা তালপুর যুগে (১৭৮৩-১৮৪৩ খ্রীঃ) খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁদের হাতে এ কাব্য অত্যন্ত সুরেলা, অলঙ্কারবহুল ও ভাষা-সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে।

'মসনভী' কাব্যের রচনার জন্যও কালহোরা যুগ বিশেষ প্রসিদ্ধ। মসনভী কাব্যের শ্রেষ্ঠ রচনা লায়লী-মজনুর প্রেম-কাব্য। ফাজিল ও খলিফা আবদুল্লাহ নিজামানী কর্তৃক এই কাব্য সুষ্ঠুভাবে ও নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদিত হয়। তালপুরের শাহেরা ছিলেন ক্ষমাশীল শিয়াসম্প্রদায় ভুক্ত মুসলমান। ধর্ম বিশ্বাসের জন্য কাউকে তাঁরা পীড়ন করতেন না। বরং ইমামদের ও হজরত আলীর অনুসারীদের প্রশংসাসূচক কবিতার তাঁরা যথেষ্ট কদর করতেন। এমনি করে শোকগাথা 'মর্সিয়া' কাব্যের সৃষ্টি হয়। সৈয়দ সাবিত আলী শাহের হাতে (১৭৪০-১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ) মর্সিয়া কাব্য চরম বিকাশ লাভ করে। তাঁর কবি-প্রতিভা উর্দু শোক-গাথা রচয়িতা আনিস ও দবিরের সঙ্গে তুলনীয়।

সাচাল সারমাস্তকে (১৭০৭-১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ) তালপুর যুগের শ্রেষ্ঠতম কবি বলে গণ্য করা যায়। তাঁর কাব্য-পরিধি বিস্তৃত এবং কাব্য স্বকীয়তা-পূর্ণ হলেও, তিনি শাহ লতিফের সমকক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হন নি। তাঁর 'কাফি' ও গজল বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তিনি হাফিজে কোরাণ এবং ইসলামী শাস্ত্রে পণ্ডিত হলেও, মরমীবাদের অতিরঞ্জনে তিনি পল্লবগ্রাহিতা করেছেন। আল্লাহ্‌তায়ালার নিন্দাবাদে তিনি মনসুর আল-হাল্লাজকেও ছাড়িয়ে গেলেন। এ কারণে সর্বসাধারণ তাঁর কাব্যের অনুরাগী নয়। তার বাল্যকালে শাহ লতিফ নাকি তাঁকে দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তিনি (শাহ লতিফ) উনুনের উপর যে ঢাকনী চাপা কেটলি স্থাপন করেছিলেন এই বালক একদিন সেই ঢাকনী খুলে দেবে।

এর মর্মার্থ হলো, সাচাল মরমীপন্থার মর্মরহস্য উদ্‌ঘাটিত করে দেবেন।

সাচাল ব্যতীত হিন্দু কবি স্বামী আস্থ ও দলপত—যাঁরা বেদান্তবাদ নিয়ে কাব্য রচনা করতেন। মুসলমান কবি খলিফা গুল মুহাম্মদ, পীর আলী গহর শাহ্ রাশিদী ওরফে আসগর, সৈয়দ খায়ের শাহ্ এবং হাসান লাঘারীকে বাদ দিলে, সিন্ধী সাহিত্যে আর বেশী সংখ্যক উঁচুদরের কবির সন্ধান পাওয়া যায় না। খলিফা গুল মুহাম্মদই (১৭৮৪-১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) নাকি প্রথম সিন্ধী কবি যিনি ছন্দপ্রকরণের রীতি অনুসারে একখানি সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ 'দিওয়ান' রচনা করেন। ভাষা-সম্পদে সম্পদশালী হলেও তাঁর কাব্য সাবলীল মোটেই নয়, রসমাধুর্যহীন। যদিও তাঁর কাব্যে বর্ণসুষমা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে। সৈয়দ খায়ের শাহ্, সাবিত আলী শাহ্ রচিত 'মসনভীর' জওয়াবে একখানা 'জঙ্গ-নামা' রচনা করেন, তবে সাবিত আলী শাহের খ্যাতি তিনি অর্জন করতে পারেন নি। তাঁর বিতর্কমূলক কবিতা "টুপী ও পাগড়ী" এক শ্রেণীর প্রহসনকাব্য। এ কাব্য আরবী ও ফার্সি সাহিত্যের 'মুনাযারা' কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আসগর একজন শক্তিধর কবি। তাঁর রচিত 'কাফি' অকৃত্রিম ভাব-সম্পদে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সিন্ধী ও সিরাইকী কবিতা রচনায় হামাল সিদ্ধহস্ত, তাঁর কাব্য পরিমাণে প্রচুর ও সূক্ষ্ম হাস্য-রসে ঝলমল।

ব্রিটিশ শাসনকালে (১৮৪৩-১৯৪৭) কাব্য ক্ষেত্রে নব উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছিল। তবে ছন্দবিন্যাসে প্রাচীন গানের পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে। এই ছন্দবিন্যাস আমাদের প্রাচীন চারণকবিদের বৈশিষ্ট্য। ক্রমশঃ প্রাচীন ফার্সি কাব্যের বহিরঙ্গের অনুকরণপ্রিয়তার ফলে সিন্ধীকাব্য তার মৌলিকতা, বলিষ্ঠতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়ে ফেলে। খলিফা মুহাম্মদ কাশিম (মৃত্যু ১৮৯১ খ্রীঃ), হাফিজ হামিদ (মৃত্যু ১৮৯৮ খ্রীঃ), সৈয়দ ফাজিল শাহ্ (মৃত্যু ১৯০০ খ্রীঃ), মরহুম মুহাম্মদ ইব্রাহিম ভাট্টি সূফী (১৮৬৩—১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ), মীর আবুল হুসেন সাঙ্গী (১৮৫০-১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ), আখন্দ দীন মুহাম্মদ মিসকিন (মৃত্যু ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ), মীর্জা কালিচ বেগ (১৮৫৫-১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ), মুহাম্মদ বখশ্ ওয়াসিক (১৮৯২-১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ), নিয়াজ আলী নিয়াজ প্রমুখ এ সময়কার খ্যাতনামা সিন্ধী কবি। ফার্সির কাব্যবহিরঙ্গের অনুকরণে কাব্য রচনা এঁদের হাতে প্রায় একঘেঁয়ে হয়ে উঠে। তাঁদের কাব্য নীতিমূলক উচ্ছ্বাস, কল্পিত

প্রেমিকার উদ্দেশ্যে প্রেম গাথা বা মালাকরের প্রতি নিন্দাসূচক মন্তব্যসহ বুলবুল আর গোলাপের অসার প্রলাপ।

তবে কয়েকজন শক্তিমান কবি আছেন যাঁরা প্রাচীন পদ্ধতির অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও মনোরম কবিতা রচনা করেছেন। এ সব কবিতা সিন্ধী সাহিত্যের গৌরবময় সম্পদ। এঁদের মধ্যে নিরক্ষর কবি রামধন কুম্ভারের (কুম্ভকার) নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর রচিত অলৌকিক কাব্য (মোজেজা) 'মৌলুদ' ও 'কাফিতে' খাঁটি গ্রাম্য পরিবেশের প্রলেপ লাগিয়েছেন। তাঁর কাব্যে ছন্দপ্রকরণের নীতি অনুসরণের বাহুল্য নেই। তাঁর কাব্য ঐশী প্রেমে উদ্বুদ্ধ। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত মৌলভী আল্লাহ্ বখশের (আবোঝো) 'মুসাদ্দাস' সিন্ধী সাহিত্যে এ ধরনের প্রথম কাব্য। এই কাব্য কবির কৃতিত্বের পরিচায়ক। তাঁকে সিন্ধুর 'হালী' বলা চলে। হাকিম মুহাম্মদ ওয়াসিল নব্বই বছর বয়সে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে গতায়ু হন। তিনি সিন্ধী যুগল-প্রেমিক সাস্‌হী ও পুনহুর প্রেম-কাহিনী অবলম্বনে 'গুলজারে ওয়াসিল' নামক এক সুদীর্ঘ মসনভী রচনা করেন। মল মাহমুদ পল্লীর কবিতাও মৌলিক ভাবধারায় প্রোজ্জ্বল। মৌলভী গোলাম মুহাম্মদ খাঞ্জার একজন যশস্বী সাহিত্যিক। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত তাঁর 'রিসালো' এবং খলিফা নবী বখশের 'রিসালো' শাহ লতিফের 'রিসালোর' সঙ্গে তুলনীয়। তবে ফকির রাদির 'রিসালো' নিম্নস্তরের অনুকরণ মাত্র।

তরুণ কবিসম্প্রদায় ফার্সি-কাব্যের বহিরঙ্গ অনুসরণ করলেও বিষয়-বস্তুর নির্বাচনে নতুন পন্থা অবলম্বন করেছেন। আঙ্গিকেও তাঁরা সংস্কার সাধন ও অভিনবত্ব আনয়ন করেছেন। তাঁরা পঞ্চপদী ষষ্ঠপদী, অষ্টপদী ও অন্যান্য ধরনের কবিতা রচনা করেছেন। এ সব কবিতা ও রচনাশৈলীর তাল-মান-লয়ে বৈচিত্র্যময়। তাঁরা তাঁদের অপূর্ব শব্দবিন্যাসের মায়া-মন্ত্রে শ্রোতাকে মুগ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের ভাবসম্পদ ঐশ্বর্য-শালী ও বৈচিত্র্যময়। গতানুগতিকতার মোহমুক্তি যাঁরা লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কিষন চাঁদ বেওয়াস, আহমদ নিজামী, ডাক্তার মুহাম্মদ ইব্‌রাহিম খলিল, লুৎফুল্লাহ্ বাদভী, হায়দার বখ্‌শ জাতোই, গোলাম মুহাম্মদ গিরামী, গোলাম আলী মাসরুর, হাফিজ আহসান, আবদুল্লাহ্ আতহার, মুহাম্মদ আলম আব্বাসী, রশিদ আহমদ লাঘারী,

আয়াজ কাদিরী আবদুল্লাহ আব্‌দ্, সারওয়ার আলী সুরুর এবং আরও জনকয়েক। তাঁরা নতুন ধরনের কাব্যরচনায় খ্যাতি অর্জন করেছেন।

সৈয়দ মীরান শাহ্ একজন সখের কবি ও গদ্য লেখক। সুখের বিষয় জনকয়েক মুসলিম তরুণীও বর্তমানে কাব্য জগতে অবতীর্ণা হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে হালার মিস্ ফকরুননেসা ও মিসেস রওশনআরা বেগমের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে দুঃখের বিষয়, তাঁরা উর্দু-কাব্যের অনুকরণ করছেন। আর ফার্সি-কাব্য রচনা-পদ্ধতি প্রয়োগ তাঁদের কাব্যে এমনি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে যে সিন্ধী কবিতার মৌলিকতা সংরক্ষণে সঙ্কট দেখা দিয়েছে। সবচেয়ে অপ্রীতিকর ব্যাপার এই যে তাঁদের রচনা সর্বসাধারণের বোধগম্য নয়।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বুঝা যাবে যে, সিন্ধী কাব্যের পরিধি ব্যাপক আর সমৃদ্ধিপূর্ণ। প্রদেশ জুড়ে সর্ববিধ কাব্যসম্পদ যথেষ্ট পরিমাণে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। এ সম্পদ এখনও সংগৃহীত হয় নি, হয়ত হবেও না। সিন্ধী-কাব্য সম্বন্ধে বার্টন মন্তব্য করেছেন, 'এ কাব্য এক দিকে যেমন বিশুদ্ধ রচনা-শৈলী, যথেষ্ট মৌলিক এবং পরিমাণে প্রচুর, অন্য দিকে তেমনি সহজ ও স্বাভাবিক।' এতে দার্শনিকতার হয়ত অভাব আছে, কিন্তু তা পাঠে আনন্দ ও উপকার হয়, তবে ভাষা সম্পদের দিক থেকে সিন্ধী গদ্য-সাহিত্য সম্বন্ধে কিন্তু এ-কথা প্রযোজ্য নয়। সিন্ধী-সাহিত্যের গদ্যের অবদান নতুন। উর্দু ও ইংরেজী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য—সাবলীলতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা এতে নেই। ভীরু ও দ্বিধা-জড়িত পদক্ষেপে এর আবির্ভাব। গদ্যের বাহনে কোন কিছু প্রকাশ করা যেন সিন্ধী-পাণ্ডিত্যের পক্ষে অপমানজনক। কারণ, অতীতে গদ্যের ব্যবহার কেবল আরবী ও ফার্সিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। আমাদের শক্তিধর প্রতিভাশালী পণ্ডিতমণ্ডলী পর্যন্ত সহজ গদ্যে কিছু লিখতে ঘৃণাবোধ করতেন। গদ্য ব্যবহারের পরিবর্তে তাঁরা অমার্জিত ভাষায় 'আ'-অন্ত ধর্ম-কাব্য রচনা করে আপন শক্তি ক্ষয় করেছেন। তবে অধুনা সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে উর্দু-গদ্য সাহিত্যের সংস্পর্শ ও সিন্ধুবাসীদের স্বকীয় ভাষায় সৃজনশীল গ্রন্থ রচনার প্রতি আগ্রহের ফলে অদূর ভবিষ্যতে সিন্ধী গদ্য-সাহিত্য নিজস্ব পথে অগ্রসর হবে।

সিন্ধী-গদ্য-সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন আবদুর রহিম গির হোরির

নীতি বচন। প্রাচীন যুগের প্রবাদ ও হেঁয়ালী সিন্ধী-ভাষার সম্পদশালী উত্তরাধিকার শাহ করিম ও খাজা মুহাম্মদ জামানের প্রচারবাণী মূলতঃ সিন্ধী-গদ্যে লিপিবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাদের উন্নাসিক ভক্তের দল সে প্রচার-বাণী আরবী ও ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেন। প্রাচীন গদ্য-সাহিত্য আরবী ও ফার্সি সাহিত্যের অবিকল অনুকরণ। অনুবাদে মূল বিষয়বস্তু রচনার কাঠামো পর্যন্ত রক্ষিত হয়েছে। এমনি করে আমরা মাতারীর আখন্দ আজিজুল্লা (১৭৪৬-১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ) কর্তৃক কোরাণের এবং দেওয়ান নন্দীরাম কর্তৃক তারিখ-এ মাসুমীর সিন্ধী অনুবাদ পেয়েছি, মাতারীর সৈয়দ মীরণ শাহ, 'মুকিতুস সিরিয়ান' ও সাধাতুরো ও কাধাতুরো রচনা করে এবং গোলাম হুসেন 'ভাস্তো' রচনা করে সিন্ধী গদ্য-সাহিত্যের প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেন। দিওয়ান কেবল রামের 'সুখিরী', 'গুল শক্কর' এবং 'গুল' গ্রন্থাবলী সিন্ধী-গদ্যে মূল রচনা এবং আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

এক্ষণে সিন্ধী সাহিত্যের গুরুজন শামসুল উলামা মীর্জা কালিচ বেগ (১৮৫৯-১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ) সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। তিনি ছিলেন একজন অক্লান্ত গদ্য লেখক। শাহ লতিফের জীবন বৃত্তান্ত তাঁর গদ্য-সাহিত্য প্রচেষ্টার প্রথম নিদর্শন। এটা গদ্য-সাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ। তাঁর ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষা থেকে সিন্ধী অনুবাদ উচুদরের নয়। সে সব অনুবাদ পাঠক-মনে তৃপ্তির সঞ্চার করে না। তাঁর রচিত 'খুরশিদ' ও 'জিনাত' মৌলিকতার স্বাক্ষর বহন করে এবং অন্য ভাষা থেকে অভিযোজিত কতিপয় নাটিকায় তিনি তার সঠিক বাগ্‌ভঙ্গি অর্জন করেন। তাঁর কাব্য ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্য-মানের অসমতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত তাঁর কাব্যও মাঝে মাঝে উৎকর্ষের চরম শিখরে পৌঁচেছে এবং মাঝে মাঝে অপকর্ষের নিম্নস্তরে নেমে গেছে। আহমদ খান, তাগিরো খান জালবানী ও লুৎফুল্লাহ গদ্য-কবিতা রচনা করেছেন, তাতে কাব্যের স্বতঃস্ফূর্ততা ও স্বাভাবিকতার অভাব লক্ষিত হয় না। লুৎফুল্লাহ কর্তৃক বিখ্যাত উর্দু উপন্যাস 'ফিসানা-এ-আজায়েব' এর অনুবাদ 'গুল-এ-খানদান' একখানা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

কাজী হেদায়েতুল্লাহ 'মুর্শতা' সিন্ধী আলঙ্কারিক গদ্য-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁর শিল্প-চাতুর্য ও রচনা-শৈলী হেদায়েতুল ইনসাব

মতন অননুকরণীয় গ্রন্থে প্রকটমান। পত্র-লিখনকলা এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু। তাঁর রচিত 'মিসবাহুল আশেকিন' ও 'নুসরাতুল আশেকিন'ও লেখকের রচনাশৈলীর নিদর্শন। এই গ্রন্থদ্বয়ে তিনি উন্নত গদ্যে হজরত মুহম্মদের (দঃ) জন্মের সঙ্গে জড়িত উপকথাসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন। গদ্যের ফাঁকে ফাঁকে তিনি কবিতায় মুক্তো ছিটিয়ে দিয়েছেন। মুস্তাক ছিলেন একজন উঁচু স্তরের কবি; তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হলে উপযুক্ত পণ্ডিতের প্রয়োজন। তরুণ মৌলভী আবদুল খালেক ছিলেন একজন প্রতিভাশালী প্রহসন রচয়িতা। তিনি অকালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আব ওয়াসিক হিন্দু শাস্ত্র-গ্রন্থসমূহ বিশেষভাবে অধ্যয়ন করে ধর্ম সম্বন্ধে অনেকগুলো বিতর্কমূলক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মৌলভী হাকিম ফতেহ মুহাম্মদ সেহ্‌ওয়ানী (মৃত্যু ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন একজন খ্যাতিমান গদ্যগ্রন্থকার। তিনি কোরাণের অবতরণিকা রূপে 'নুরুল ইসলাম' এবং হজরত মুহম্মদের (দঃ) জীবনী অবলম্বনে 'হায়াতুন-নবী' গ্রন্থ দু'টি রচনা করেন। তিনি 'আবুল ফজল ও ফৈজী', 'মীবান-ফী-সাহাবী' এবং 'কামাল ও জামাল' গ্রন্থ তিনখানির রচয়িতা। তাঁর লিখনরীতি সহজ ও সুন্দর, যদিও এ সৌন্দর্য মাঝে মাঝে বাগ্বাহুল্যে ব্যাহত হয়েছে। কবিতাও তিনি বেশ ভালো লিখতেন। সিন্ধী কাব্যে তিনি 'ফার্দ' প্রবর্তন করেন।

আবদুর রেজাক মেমন (মৃত্যু ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন একজন উঁচু স্তরের গদ্য ও পদ্য রচয়িতা। তাঁর রচিত 'জাহানআরা' ও 'গ্যাটে' সিন্ধী গদ্য-সাহিত্যের মৌলিক অবদান। মৌলভী দীন মুহম্মদ ওয়াফাই ছিলেন একজন যথেষ্ট শক্তিশালী চিন্তাশীল গদ্য লেখক। তিনি ছিলেন সিন্ধু-বিষয়ক যে কোন বিষয়ের চলন্ত 'বিদ্যা-কল্পদ্রুম'। স্ত্রী-শিক্ষার অগ্রাধিনায়ক রূপে প্রসিদ্ধ মুহম্মদ সাদিক মেমন ছিলেন একজন বেশ ভাল গদ্য লেখক ও কবি। তবে তাঁর নামে প্রকাশিত অধিকাংশ গ্রন্থ নাকি ভাড়াটে লিখিয়েদের দ্বারা লিখিত। কাজী আবদুর রেজাকের রচনা কল্পনা-ক্লিষ্ট আর অস্বচ্ছল। মুহম্মদ সালিহ ভাট্টির (জন্ম ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ) রচনা সহজ ও সুন্দর। ইসলাম ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করে আলী খান আবরো (মৃত্যু ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) সিন্ধী সাহিত্যের পরম উৎকর্ষ সাধন করেছেন। মরহুম গোলাম মুহম্মদ ছিলেন অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিশীল সাহিত্যিক। তাঁর অকাল মৃত্যুতে সিন্ধু-সাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মরহুম ডাক্তার এইচ. এম. গুরবাক্সাণী ছিলেন বলিষ্ঠ বাণী-ভঙ্গীর অধিকারী। তাঁর রচিত 'নুরজাহান' এবং 'শাহ-জো রিসালোর' ভূমিকা ক্লাসিকের মর্যাদা অর্জন করেছে। এই গ্রন্থদ্বয় চিরদিন ভাবুক পাঠকের মনোরঞ্জন করবে। প্রাক্তন অধ্যক্ষ এস. সি. সাহানী তাঁর সামাজিক উপন্যাস 'বিলো খোথার' ও 'তারান-জো-অধ্যায়' এর মাধ্যমে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। টমাস হার্ডির উপন্যাস তাঁর প্রেরণার উৎস হলেও তাঁর রচিত উপন্যাস সিন্ধী ভাষায় উপন্যাস রচনার ইতিহাসে নতুন যুগের প্রবর্তন করে। জেঠ মলের (মৃত্যু ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ) গদ্য-সাহিত্য অর্থহীন ভাবাবেগময় ও সৌকর্যহীন। লাল চাঁদ জাগতিয়ানী (মৃত্যু ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর রচনায় মেয়েলী কথ্যভাষার বহুল প্রয়োগ করেছেন। তাঁর রচনায় শাহ লতিফের ব্যবহৃত বাক্যাংশের উদ্ধৃতি নানাভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। উদ্ধৃতির এ অপব্যবহার মাঝে মাঝে কানে বেসুরে শোনায়।

ভেরুমল মিহরাচাঁদ আধ্যানী (মৃত্যু ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন একজন প্রবীণ লেখক। তাঁর রচনা-ভঙ্গি হিন্দু-মুসলিম বৈশিষ্ট্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ। শব্দ-বিন্যাস ও লিখন-ভঙ্গির মনোজ্ঞতায় ডাক্তার গুরবাক্সাণীর পরেই লেখরাজ কিষণচাঁদ আজিজের স্থান। মনোহর দাস খিলনানী ও আশানন্দ মামতোরা দু'জনই ভালো লেখক। তবে তাঁদের রচনা সংস্কৃতের অতিব্যবহারে দুষ্ট। আশানন্দের পিতা দেওয়ান কাউরোমল ছিলেন একজন প্রবীণ গদ্য লেখক। সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের প্রীতি তাঁরও ছিল। এন. এইচ. ভম ভানী কতিপয় সামাজিক উপন্যাস রচনা করেন। ভাষার বলিষ্ঠতা ও মানব-চরিত্রাঙ্কন তাঁর উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। সিন্ধী নাটকের জন্য আমরা এম.ইউ. মারকানীর কাছে ঋণী। তিনি এবং বামপাঞ্জুবানী, হরি সদারঙ্গানী, ঝার্মর ভারবানী প্রমুখ সিন্ধু ত্যাগ করে চলে গেলেও ভারতে বসে তাঁরা সিন্ধী সাহিত্য ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি সাধন করছেন।

আধুনিক গদ্য লেখকদের মধ্যে ওসমান আলী আনসারী, আত্তাহুসেন শাহ মুসাভী ও তাঁর ভাই আবদুল হুসেন মুসাভী, রহিম বখশ মেমন, আল্লাহ বাচায়ো সামনু, মুহম্মদ ইসমাইল ওরসানী, আগা তাজ মুহম্মদ, মুহম্মদ ইব্রাহিম জোয়ো, সারওয়ার আলী সারওয়ার, কোরবান আলী

নকশবন্দী, রাজ বুবাই, মুহাম্মদ ওরস্ সায়েব, আবদুল করিম সিন্দেলো, মুহম্মদ গণি, মাহবুব আলী চান্না, কাজী আখতার, করিম বখশ চান্না, মর্যানী প্রমুখ অনেকেই রয়েছেন। তবে তাঁদের রচিত সাহিত্যের মূল্যমান এখনও নির্ধারিত হয়নি। তরুণ কবিদের প্রসঙ্গে উল্লেখিত লুৎফুল্লাহ বেশ ভালো গদ্য লেখেন। তাঁর রচিত দুই খণ্ড 'সিন্ধী-সাহিত্যের ইতিহাস' সিন্ধী কাব্যসমালোচনা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অবদান। মরহুম গোলাম, মুহম্মদ সাহওয়ানী ও ডাক্তার মুহম্মদ ইব্রাহিমের সমালোচনামূলক প্রবন্ধাদি সমালোচনাসাহিত্যে স্বার্থক অবদান। জি. এম. সাঈদের রচনা স্বকীয় মনোজ্ঞতায় বিশিষ্ট। হিসামুদ্দিন রাশিদী তাঁর কোন কোন প্রবন্ধে যথেষ্ট চিন্তা-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তাঁর অধিকতর প্রতিভাশালী ভ্রাতা সত্যিকারের সুলেখক আলী মুহম্মদ রাশিদী রাজনীতিতে তাঁর শক্তি ও সময়ের অপচয় করছেন। দিপলায় রচিত নাটিকাসমূহ অমার্জিত রুচি-সম্পন্ন লোকদের মনোরঞ্জনে সমর্থ। এ নাটিকাগুলির কোন স্থায়ী মূল্য নেই। সিন্ধুর সাহিত্যাকাশে ডাক্তার নবী বখশ্ বালুচ উদীয়মান জ্যোতিষ্ক। সিন্ধী ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে শামসুল উলেমা ও ডঃ ইউ. এম. দাউদপোতার দানও উপেক্ষার নয়। এখানে মিস্ জেবুন্নেসা করিমদিনো ও মিসেস বাদাম বেগমের নামোল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মিস জেবুন্নেসা বহু সামাজিক প্রবন্ধ প্রকাশ করছেন এবং মিসেস বাদাম বেগম কিছুসংখ্যক মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস রচনা করেছেন।

এ অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের কথা যে সিন্ধী সাহিত্য বর্তমানে সুগঠিত ও স্বাভাবিকত্ব অর্জন করছে। এতে ভবিষ্যৎ ঔজ্জ্বল্যই সূচিত হয়। সিন্ধী সাহিত্য একদিন পূর্ণ বিকাশ লাভ করবে এই আশা ও বিশ্বাস বুকে নিয়ে আমরা ভবিষ্যতের পানে তাকাতে পারি।

সমকালীন সিন্ধী কবিদের মধ্যে সেখ এয়াজ সংগীত ও গীতি কবিতা রচনায় বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন। তাঁর 'বন্দর ভোরে আকাশ' সম্প্রতি লেখক গীল্ড পুরস্কার লাভ করেছে। শেখ এয়াজ শাহ ভিতাই-এর 'রিসালো' কবিতাখানি উর্দু তে অনুবাদ করেন।

অপরাধের অতি আধুনিক কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নিয়াজ, বারদো, তানওয়ার, শামশের হাইদেরী, জুলফিকর, রশিদি, রশিদ লাশারী,

ইমদাদ আলি ও তাসজ সাইদ। কালোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এঁরা সকলেই প্রথিতযশা।

কয়েকখানি অতি হারে সিন্ধী বই: তানওয়ার আব্বাসি: 'রঙ্গন তেহন রাহাব'; শামশের হাইদেরী: 'কাক মহল'; রারদো সিন্ধী: 'আক্বইন মেঘ মালার', মহম্মদ জামাল হালা: 'সোজই-ঈষাক' ইত্যাদি।

খানকয়েক হালের উপন্যাস: শেখ এয়াজ: 'পানকাল খামপুস'; জামাল আব্রো: 'পিসোস পাশা'; গোলাম রাব্বাণী: 'আলি হায়াত; আগা শা: চাঁদ যা জামাতে; রসিদ ভাট্টি: 'ঘড়ি-ঘড়ি মিক-ঘর' গোলাম নবি মোধুল: 'নমুন শাহ্'। তারিক আশ্রফ: 'দোনখন্ পাথর পিয়ার'; হামিদ সিন্ধী: 'উদাস ওয়াদিয়ান'; আয়াজ কোয়াদ্রি—'বিলো দাদা।'*

[ডঃ ইউ. এম. দাউদপোতা
অনু: আবদুল হাফিজ]

বালোচ সাহিত্য

'প্রতিবেশী গিরিশ্রেণী হলো আমাদের দুর্গ,
কোন্ দুশ্‌মন সৈন্যদল আমাদের গিরিশৃঙ্গের চেয়ে অধিক শক্তিধর?
এই সুউচ্চ বিশালতা বালোচ জাতির দৃঢ়মিত্র,
ইতস্তত: ছড়ানো গিরিসঙ্কটাবলী আমাদের বন্ধু।
আমরা তৃষ্ণা নিবারণ করি ফল্গুধারার বুকে,
কণ্টতকুঞ্জ আমাদের শয্যা
আমাদের উপাধান কঠিন মৃত্তিকা।'

এ কয়টি পংক্তি বালোচ হাসান গরগেষ্ রচিত একটি সমর-সঙ্গীত থেকে উদ্ধৃত। প্রতিদ্বন্দ্বী বালোচী সর্দার বিভারঘ-এর উদ্দেশ্যে রচিত এ সঙ্গীতে বালোচ জাতীয় চরিত্রের একটি সুস্পষ্ট পরিচিতি বিধৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ চরিত্র গড়ে ওঠার পেছনে রয়েছে বালোচিস্তানের ভৌগোলিক পরিবেশ ও তজ্জনিত জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা। এই দু:সাহসী ও উদ্যমশীল বালোচ জাতির বাসভূমিতে সর্বত্র দেখা যাবে

* মাহে-নাও-এর সৌজন্যে

ঊষর আনন্দলেশবর্জিত পর্বতশ্রেণী, শুষ্ক বিস্তীর্ণ মরুভূমি এবং মরুভূমির আশে-পাশে অপ্রত্যাশিতভাবে ছড়ানো নয়নাভিরাম উর্বর উপত্যকারাজি। বৃষ্টিপাত স্বল্প। গ্রীষ্ম বা শীত কোনো ঋতুতেই নিয়মিত নয়। 'গোরীচ' এবং 'কান্দ্‌হারী' বায়ু বলে অভিহিত শীতল প্রবাহের দাপটে দলে দলে বালোচ উপজাতিদের ভিন্ন ভিন্ন কাফেলা নিজ নিজ আসবাবপত্র নিয়ে সিবি-উপত্যকার দিকে গিয়ে আশ্রয় নেয়। গ্রীষ্মকালে 'লাওয়ার' উষ্ণপ্রবাহের জ্বালাময় স্পর্শে বহু নরনারী ও বৃক্ষলতার মৃত্যু ঘটে।

এসব প্রাকৃতিক কারণে বালোচিস্তানের অধিবাসীরা জন্ম থেকেই কষ্টসহিষ্ণু ও কঠোরচিত্ত হয়ে গড়ে ওঠে। শুধু প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে নয়, এদের দৃঢ় অস্থি, সবল মাংসপেশী এবং ততোধিক কঠোর মনোবৃত্তি অনবরতঃ নিয়োজিত রয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে। এ-সংগ্রামে কোনো বিরতি নেই। কোনো ফাঁক নেই। কিন্তু প্রকৃতি যখনই এঁদের প্রতি একটু সদয় হয়ে দেখা দেয়, তখনই এ-সব সরল সাহসী ও উদার-চেতা প্রকৃতি-সন্তানেরা আনন্দে ও আমোদ-প্রমোদে আত্মহারা হয়ে ওঠে। তখন লাফ-ঝাঁপ নাচ-গানের তালে সমগ্র বালোচভূমি আন্দোলিত হতে থাকে। প্রকৃতি আবার যখন নির্মম মূর্তি ধারণ করে, তখন এরাও সাহস এবং সহিষ্ণুতার অফুরন্ত সঞ্চয় নিয়ে তার মোকাবিলায় দাঁড়ায়।

বালোচ জাতির কোনো কোনো সম্প্রদায় শহর বা গ্রামাঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। তারা সাধারণতঃ ছোটোখাটো ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করে। অথবা ক্ষুদ্রায়তন চারণভূমি বা খামার পত্তন করে ছাগ-মেষ চরায়। কৃষি, পশুপালন, দোকান-পাট করা অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য এসব হলো গৃহস্থ বালোচদের সাধারণ পেশা। কিন্তু যাযাবর বালোচদের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের জীবন বিপদসঙ্কুল ও সঙ্কটবহুল। আবহাওয়ার ইঙ্গিত বা জীবিকার্জনের তাগিদ অনুযায়ী তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ায় এবং এতেই তারা গর্ববোধ করে। কিন্তু স্থায়ী বসবাসে এখন ক্রমশঃ আরাম-আয়েশ বৃদ্ধির ফলে বালোচজাতির অনেকে ইদানিং যাযাবরবৃত্তি ত্যাগ করতে শুরু করেছে।

বালোচদের সাধারণ পোষাক হলো পাশ্‌ক-নামীয় লম্বা কামিজ, ঢিলা পায়জামা বা শালওয়ার, বিরাটাকার পাগড়ি (দাস্‌তার) এবং

স্যাণ্ডেল (সিওয়ান)। এই বেশভূষার এবং ঘন শ্মশ্রুমণ্ডিত চেহারায় এই বিরাটকায় আদম-সন্তানেরা যখন নিজেদের তৈরী বাঁশী হাতে পাহাড় পর্বত উপত্যকাময় পথে পথে আনন্দ-উজ্জ্বল গতিতে গান গেয়ে ও সঙ্গীত-লহরী তুলে ঘুরে বেড়ায়, তখন তাদের দেখে মনে হবে যে, এ জগৎ ও জীবগোষ্ঠী যেন কোনো আলদা পৃথিবীর অংশ। বালোচ মেয়েদের বেশভূষায় রয়েছে হাতে তৈরী পোষাক, বাহুতে, কানে, নাকে ও পায়ে অলঙ্কারাদি যথাক্রমে থাওয়াথ (বালা), দূর্ (কানবালা), পুল্লাক্ (নোলক) এবং পায়জের (খাড়ু)। তাদের কর্তব্য কৃষিকর্মে সহায়তা, ছাগ-মেষ চরানো এবং ঝরণা বা কূয়ো থেকে কলসী, বালতি বা ভেড়ার চামড়ায় তৈরী মশকে করে জল তোলা। এই শেষের কাজের জন্যে তাদের দল বেঁধে অনেকদূর পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে হয় বিরল ঝরণা বা কূয়োর উদ্দেশে। বালোচ যুবকেরা এখন পর্যন্ত চাকারীয়-যুগের ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ও তার প্রতি দৃঢ়ভাবে অনুগত। গোলাগুলী ছোঁড়া, শিকার করা, ঘোড়াদৌড়ানো, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা, ঘেরাও করা, তীর ছোঁড়া এবং কুস্তি প্রতিযোগিতা হলো এদের প্রিয় ক্রীড়া। গান ও নাচ এদের জীবন যাপনের একটা স্বাভাবিক অংশের মতো।

বালোচ লোকগীতিতে এ-সবের পরিচয় সুস্পষ্ট। বালোচ লোক-গীতির শ্রেণীবিভাগ করলে দেখা যায়—এতে রয়েছে অধ্যাত্মচিন্তা ও সুফীবাদের প্রভাব, নৈতিকতা ও উপদেশাত্মক বাণী, বাস্তবতা স্ফূর্তিজনক বাক্যালাপ এবং পানোৎসবমত্ততা ও স্তুতিমূলক বাগাড়ম্বর। কোনো কোনো গানে রয়েছে বালোচ বীরদের দুঃসাহসিকতা ও অশ্ব-চালন কৌশলের প্রশংসাবাদ এবং তাঁদের প্রণয়িনীদের প্রেম ও রূপের খ্যাতি।

বালোচী সঙ্গীতাবলীর মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থানীয় হলো লারোগ। এর কথা ও সুর স্ফূর্তি-উদ্দীপক। মেয়েরা দলবদ্ধ হয়ে ঢোলক সংযোগে এ-গান গেয়ে থাকে। বিবাহ বা উৎসব আনন্দ দিনে এ গানের মারফত সমবেত জনতার মনোরঞ্জন করা হয়। এতে গীত হয় কনের সৌন্দর্য ও কুমারিত্বের প্রশংসাবাদ, বরের শৌর্য ও সাহসিকতার কাহিনী, শিশুর জন্মে আনন্দোচ্ছ্বাস ইত্যাদি।

লারোগ-এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। অতীতে বালোচ জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ-বিবাদ অতি-সাধারণ ব্যাপার ছিল। এক

সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যখন তখন যুদ্ধ ঘোষণা করতো এবং দু'পক্ষের যোদ্ধারা অতুলনীয় সাহসিকতার সঙ্গে পরস্পর সংহারে নিয়োজিত হতো। এ-সব উপলক্ষে বালোচ রমণীরা তাদের স্বামীদেরকে শত্রুনিপাতে উৎসাহিত করবার জন্যে লারোগ গানের অনুষ্ঠান করতো। এখন এ-সব যুদ্ধ-বিগ্রহ কমে যাওয়ায় লারোগ গীত হয় বিবাহ ও অন্যান্য আনন্দ-উৎসব উপলক্ষে; কিন্তু এর সুরে সেই যুদ্ধং দেহি মনোভাবের প্রতিধ্বনি রয়ে গেছে। এ গানের ভাষা সরল ও স্পষ্ট।

'আমি অপেক্ষা করছি, হে প্রিয়তম!
আমার কোলাহলহীন একান্ত প্রকোষ্ঠে।
আমার বন্ধু একজন বীর যোদ্ধা,
তীর-নিশানায় তাঁর জুড়ি নেই
তাঁর হার্মাদ-তৈরী বন্দুক দিয়ে তিনি
যাকে নিশানা করেন, তার মৃত্যু অবধারিত,
তাঁর চলনেরই বৈশিষ্ট্য এমন যে
মনে হয় তিনি যেন শত্রুদুর্গ জয় করতে চলেছেন।
যখন তিনি শত্রুদের দিকে তাকান—
তাঁর দৃষ্টিপাতেই তারা ভয়ে কাঁপতে থাকে।
তিনি আমার কাছে ফিরে আসতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ;
নিঃসংশয়ে তিনি ফিরে আসবেন, আসবেনই—
তাঁর রৌপ্যোজ্জ্বল বন্দুক হাতে নিয়ে
লীলাভরে হেলে দুলে—
কেন না, বালোচ রক্ত তাঁর শিরায় সঞ্চরমান।'

'যাহীরোক্' বেদনার গান। এতে রয়েছে বিরহের সুর এবং এ গীত হয় একক কণ্ঠে, কোনো বাদ্যযন্ত্র ব্যতিরেকে। স্বামী চলে গেছেন বহুদূর দেশে জীবিকা বা ব্যবসায় উপলক্ষে। বিরহিনী স্ত্রী তাঁকে স্মরণ করছে। তিনিই ছিলেন তার সমস্ত সুখের উৎসমূল। তার প্রতি ছিলেন আসক্ত ও করুণার্ত। এখন সংসারজীবনের কঠিন পীড়নে হয়রান ও পেরেশান হয়ে সে বন্ধুর স্নেহ ও প্রেম ফিরে পাবার জন্যে আকুল আবেদন জানাচ্ছে এবং তাঁর উদ্দেশে নিবেদন করছে নিজের নিরানন্দ ও দুর্দশার করুণ কাহিনী:

'আমার ক্রন্দনরত নয়নদ্ব'টি অবিরাম তোমাকে খোঁজে,
তুমি যে নেই!
ধূসর মেঘমালা দিগন্তে দিগন্তে ঘুরে বেড়ায়,
তুমি যে নেই!
আমার কপোল বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে চলছে,
তুমি যে নেই!
কোথায় আমার শান্তি ও সান্ত্বনা,
তুমি যে নেই!
আমার অন্তরের গভীর রোদন শোনে না কেউ,
তুমি যে নেই!
আমার হৃদয় বিরহ-বেদনায় ভারাক্রান্ত,
তুমি যে নেই!'

দূর-দূরান্তর মরুভূমির বুকে বা সীমাহীন প্রান্তরে এক উষ্ট্র-সওয়ার একাকী গন্তব্যের উদ্দেশে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে চলেছে। তার মনে পড়েছে ঘরে ছেড়ে আসা সুন্দরী, সরলা, সৎস্বভাবা বধূর মুখ। সে বিরাহাকুল হয়ে মীর চকর খান রিন্দ-এর বীর সহচর মীরান-এর ন্যায় একটি কবুতর মারফত তার বেদনাময় বাণী পাঠাচ্ছে:

'ওহে কবুতর! প্রিয়তমাকে আমার হাল জানিয়ো,
এ দীর্ঘ পথ তুমিই অতিক্রম করতে পারবে।
সু-উচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় তুমি রাত্রি-যাপন কর,
সে শৈলবাস থেকে হে অনিল-বাহী পাখী!
উড়ে যাও আমার প্রিয়ার গৃহপ্রাঙ্গণে
এবং তার শয্যার ডানপাশে গিয়ে বসো,
সে তোমাকে তার আস্তিনে জড়িয়ে নেবে।
তোমার তীক্ষ্ণ নখরের স্পর্শে তাকে শঙ্কিত করো না,
আমার প্রিয়াকে আঘাত দিয়ো না,
শুধু আমার মনোবেদনা তাকে জানিয়ো!'

জনৈক প্রেমিক নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে প্রিয়তমা থেকে বিচ্ছিন্ন। সে তার দলবল নিয়ে অদম্য সাহসে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাস্ত হয়েছে। শত্রু তার চারণভূমি ও ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত করে দিয়ে তার

প্রেয়সীকে বন্দী করেছে। সে এখন নিতান্ত সম্বলহীন। কিন্তু হতোদ্যম নয়। প্রেয়সী তার জন্যে অপেক্ষায় কালক্ষেপণ করছে। সে ফিরে এসে শত্রুকে আবার দ্বন্দ্বে আহ্বান করবে এবং পরাস্ত করবে। প্রিয়তমাকে মুক্ত করবে। সে প্রিয়াকে উদ্দেশ করে বলছে, 'কেঁদো না, ধৈর্য হারিয়ো না':

'প্রেয়সী আমার! কেঁদো না, দুঃখ করো না,
যে মুহূর্তে অবস্থার পরিবর্তন হবে,
তোমার কাছে ফিরে আসতে আমি এক মুহূর্তও
বিলম্ব করবো না।
আমি ছুটে আসবো ভাসমান মেঘখণ্ডের মতো
মিলন-দিনের স্মৃতিস্পর্শে দু'চোখে ধারা বইয়ে।
আমি আসবোই তোমার কাছে আমার যে প্রতিজ্ঞা
তা পালন করবোই।
আমার উন্মত্ত অশ্ব এগিয়ে চলবে
হ্রেষাধ্বনি করে, গর্জন করে এবং
পাহাড় ও প্রান্তর মথিত করে,
সেই স্বর্ণ-দূর্গের দ্বারপ্রান্তে
যেখানে আমার প্রিয়তমা বন্দিনী রয়েছে।'

সোয়াত হলো গ্রামবাসীদের জনপ্রিয় উৎসব-সঙ্গীত। বিবাহ বা অন্যান্য উৎসব-আয়োজনে এ সঙ্গীত সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়। কৃষকদের শস্য-আহরণের সময়ও মাঠে প্রান্তরে এ গান-গাওয়ার রেওয়াজ আছে। সরল-প্রাণ চাষী ও খামারুরা এ গানের ধূয়ায় বিশেষ স্ফূর্তি লাভ করে।

প্রিয়তমার উদ্দেশে চিরাচরিত অতিপ্রশংসাবাদ, বিরহী প্রেমিকের অন্তর্বেদনা, প্রিয় সাহচর্যে অতিবাহিত দুর্লভ মুহূর্তগুলির স্মরণ, অতীত প্রেমের স্মৃতি ইত্যাদি এ গানের বিষয়বস্তু:

'আমি বুলবুল-এর মতো কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছি,
হে প্রিয়! আমার কী অপরাধ?
আমি তপ্ত বালু বেলায় জ্বলন্ত সূর্যের নীচে দাঁড়িয়ে
তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি,
হে প্রিয়! আমার কী অপরাধ?

বিগত রাত্রে নিদ্রার ঘোরে
আমি স্বপ্নে দেখলাম তোমাকে,
হে প্রিয়! কী আমার অপরাধ?'

আর একটি সোয়াত-গানের হুবহু অনুবাদ দেওয়া হলো:

'আজ থেকে আমি আর তাকে মনে করবো না,
এই আমার শপথ।
সেই নিষ্ঠুর, অবিশ্বাসিনী. মিথ্যাবাদিনী প্রিয়াকে
আমি ত্যাগ করলাম
চিরতরে ত্যাগ করলাম।
সেই উড়ন্ত বলাকাকে ধরবার জন্যে
আমি শূন্যে হাত ছুঁড়ছি,
আমি এক উন্মাদ।
এ আহম্মকি আর নয়; আর কিছুতেই নয়
আর এ হয় না।
এ দুনিয়ার বাগিচায় অনেক ফুল আছে
যার বর্ণ আছে, কিন্তু গন্ধ নেই,
ভুল করে আমি খোশবুর খোঁজে ঘুরেছি
এখন আর নয়।
কত প্রণয়ীর স্বর্ণ-প্রাসাদ সে পুড়িয়ে ছাই করেছে,
আমার হৃদয়েও প্রেমের দাবাগ্নি জ্বলছে,
কিন্তু আর নয়।'

হালো এক ধরনের নৃত্য-গীতি। এ গান তারা নেচে নেচে গায়; আবার এ গান গাইতে গাইতে তারা নাচে। গ্রামের মোড়লের বা মহল্লার সর্দারের সন্তান জন্মগ্রহণ করলো। তিনি দরিদ্রের নিয়াষ দিলেন। তারা গান গেয়ে গেয়ে নেচে নেচে আসলো মোড়লের বাড়ীতে। করলো দলপতিকে অনুষ্ঠানিক অভিবাদন। এ উপলক্ষে ঘোড়দৌড় বা অনুরূপ প্রতিযোগিতার আয়োজন হলো। তারপর তারা চক্রাকারে সমবেত হয়ে নেচে নেচে হালো-সঙ্গীতের আসর জমালো। দলনেতার বা তাঁর গৃহে কারুর বিবাহ উপলক্ষেও হালো গীতি-নৃত্যের আয়োজন হয়। একটি উদাহরণ দেওয়া গেলো:

'কী সুন্দর আজকের দিন,
বর সেজে চলেছেন আজ আমাদের সর্দার,
আজকে তিনি ধরা দেবেন বিবাহ-বন্ধনে
আজ থেকে আর তিনি একেলা নন।
এই শুভদিনে।
প্রতিটি দম্পতি স্মরণ করছে
তাদের বিবাহ-দিবসের কথা,
তাদের মনে পড়ছে হেনা ও সেজ রাঙানোর কথা,
মনে পড়ছে ঘোড়া ছুটিয়ে চলার কথা,
আর দ্রুত বহমান স্রোতস্বতী পেরিয়ে চলবার কথা,
এই জন্যেই তো আজ
প্রতিটি পুরুষ সেজেছে এক একটি
ফুলের তোড়ার মতো,
প্রতিটি মেয়ে সেজেছে রাজ-দুহিতার মতো,
আমাদের বাদক যেন আজ মত্ত-মাতাল
ফোটা ফুলের বাগিচায় বুলবুল-এর মতো।
যার হাত পায়ে জোর আছে সে-ই
আজ নাচছে চকোরের মতো।'

'লাইলী মো'র যেন মরুভূমির বুকে সুরের রাজকন্যা। এ গানে ধ্বনিত হয় বিচ্ছেদের হা-হুতাশ এবং বিরহী প্রণয়ীর ভারাক্রান্ত হৃদয়ের ক্রন্দন। এ গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর সকরুণ সুর।

'দেহী' হলো বালোচ রাখাল ও মেষচারণদের গান। এ গান গেয়ে গেয়ে তারা মাঠে-প্রান্তরে চারণভূমিতে ঘুরে বেড়ায়। বসন্ত সমাগমে তাদের মনে পড়ে ঘরে ছেড়ে আসা তাদের চন্দ্রমুখী প্রিয়াদের কথা। তাতে তাদের মন হয়ে ওঠে বেদনাভারাক্রান্ত। এতে আরও জোগান দেয় ঝোপ-ঝাড়ে ফুটে-ওঠা ফুলের থোপা, আকাশে ভাসমান মেঘপুঞ্জ এবং গাছে গাছে ভীড় জমানো গায়কপক্ষীরা। এসব রঙের খেলা, গান এবং নাচের সমারোহে তাদের মনে পড়ে গোলাপী পোষাক-পরিহিতা, নাক, কান ও পায়ে অলংকার ঝলমল তাদের নববধূদের কথা। মারুরী

ও বুগতী উপজাতিদের এবং ডেরা ইসমাইল খান-এ বসতি-স্থাপনকারী বালোচ সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে দেহী গান অতি জনপ্রিয়।

বিষয়বস্তু ও আকারে দেহী গান পাঞ্জাবী লোকগীতি মাহিয়ার মতো। মাহিয়ার মতো দেহীরও প্রথম লাইনের কোনো অর্থ থাকে না। মাহিয়ার মতো দেহীর ভাবসম্পদও বিচিত্র। কোনো দেহীতে যদি প্রিয়ার দৈহিক সৌন্দর্য বর্ণনা থাকে তবে অন্য এক দেহীতে থাকবে তার মানস-রূপের বিশ্লেষণ। পাষাণোপম প্রেয়সীর সঙ্গে মিলন এবং বিচ্ছেদের উত্তেজনা-মূলক মুহূর্তগুলির বর্ণনাও এতে পাওয়া যাবে:

'কে বলে যে প্রেম সুখের ?
আমি জানি, বিরহ রাত্রি কি ভাবে কাটে।
খোদা তোমাকে আবার কবে ফিরিয়ে আনবেন,
যাতে আমি আবার তোমাকে দেখতে পাই।
যে মনোরমার বিরহে আমি যাতনাময়
কাল যাপন করছি

জানি না সে কোথায়!
আমার হৃদয় তার জন্যে একান্ত আকুল।
গতকালও তার চাঁদমুখ আমি দেখতে পেয়েছি,
আজকে আমি দিশেহারা ও বেদনার্ত।
প্রিয়তমা! আমার অনুযোগ কি তোমার
কাছে পৌঁছায় ?

তুমি কি শুনতে পাও আমার আকুল আবেদন ?
কবে তোমাকে আবার দেখতে পাবো ?
আমার হৃদয় বিচ্ছেদ-বেদনায় পাগল,
কিন্তু বিশ্বস্ত থাকবে সে চিরকাল।'

'লীকো' হলো সরলচিত্ত উষ্ট্র-চালকদের গান। নিবাস ছেড়ে যখন তারা বহুদূরে চলে যায়, তখন লীকো গানে তাদের অন্তরের অকপট বেদনা-ধারা বেরিয়ে আসে। সম্মুখে-পশ্চাতে বিশাল মরুভূমি; খাদ্য নেই, পানীয় নেই, আশ্রয় নেই—নেই, নেই, নেই। একা মানুষ আর তার মরুবন্ধু উট—এই দু'য়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে চলেছে। চলার

পথে কোনো বৈচিত্র্যও নেই। এই একঘেয়েমির মধ্যে ক্লান্ত পথিকের কণ্ঠ ধীরে ধীরে ভরে ওঠে লীকোর ছন্দে ও সুরে। সুর চড়ে উঠলে এ গানের রেশ প্রতিধ্বনিত হয় কন্দরে কন্দরে। বাংলাদেশের দীর্ঘপথবাহী গো-শকট চালকদের চটকা-গানের সঙ্গে লীকোর সাদৃশ্য রয়েছে।

লীকো যে শুধু সারবান বা উষ্ট্রচালকের গান—তা নয়। বালোচ নারীরাও এ গান গেয়ে থাকে। বসন্ত সমাগমে দূর-প্রবাসী উষ্ট্রচালক স্বামীদের মনে করে তারা এ গানের ধ্বনি তোলে। লীকোর বিষয়বস্তু ব্যাপক। সাধারণতঃ এতে থাকে উটের প্রশংসাবাদ, প্রিয়তমার স্মৃতিকথা, বিরহ-বেদনার প্রকাশ, শত্রু-সম্প্রদায়ের যুবকদের প্রতি শ্লেষোক্তি, আপন দলের শৌর্যবর্ণনা ও বীরত্ব কাহিনী ইত্যাদি। মেয়েরা যখন এ গান গায়, তখন গানের বিষয়বস্তুতে থাকে স্বামীর সাহস, শৌর্য ও বীরত্বের কাহিনী এবং প্রশংসাবাদ।

একজন উষ্ট্রচালকের মুখে আমরা শুনতে পাই ঃ

'আমি চারণ-ভূমি ও খাড়িতে খাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছি
আমার মানস-প্রিয়ার সন্ধানে।
তারা তাকে নিয়ে গেছে সারওয়ান প্রদেশে।
তার অলকগুচ্ছ নিয়ে আমি পাগড়িতে সাজাই,
তার বিরহে আমি হতাশ ও বিষণ্ণ।
যাযাবর দল পাহাড়ের পথে হেঁকে চলেছে।
এসো, হে মোর প্রিয়তমা!
আমার ওই শৃঙ্গটির আড়ালে একটু বসি।
তোমার আর আমার মাঝে দাঁড়িয়ে একটি সুউচ্চ পর্বত-শিখর,
তুমি আমার কাছে আসো না
তোমার কোনো বার্তাবহও আসে না।
আমার উটের আভিজাত্য ও সাজ-সজ্জা তুলনাহীন,
তার বলিষ্ঠ বপু ও চলা-বলার সৌন্দর্য অনুপম,
আমার প্রিয়ার নাম বরজান (রূপসী-শ্রেষ্ঠা)।'

জনৈক নগরবাসীর ভাষায় ঃ

'সোনারকে আমি অনুনয় করে বলি,
আমার প্রিয়তমার সুন্দর হাতের মাপে বলয় গড়তে।

এসো এসো, হে বল্লভা
তোমার অদর্শনে আমার হৃদয় বেদনাপ্লুত,
তোমার বিরহে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত।'

একটি নারী কণ্ঠে :

'সেই যে তুমি চলে গেলে,
তারপর কতদিন আর আমাদের দেখা নেই ;
বিরহ-বেদানা আমার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।
আমার হৃদয় যেন ছিল একটি একলা ফোটা ফুল,
বিরানা বন-প্রান্তরে
নির্জনে করছিল সুবাস বিতরণ আর বর্ণ বিকীরণ,
আজ উষ্ণ মরুপ্রবাহ তাকে জ্বালিয়ে দিলো।
বিরহের দাহভরা বায়ুস্পর্শে
নাজুক ফুল কতক্ষণ টিকে থাকবে ?
সে শুকিয়ে গেলো, মরে গেলো।
আমার হৃদয় এখন একটি উষর ভূমিখণ্ডের মতো,
কোনো সবুজ শষ্প তাতে গজায় না,
কঠিন মাটি, পাথর এবং ধূলায়
সব জীবন স্পন্দন ঢাকা পড়েছে।
জীবনের কোনো চিহ্ন আর অবশিষ্ট নেই—
শুধু উষ্ণপ্রবাহ বয়ে চলেছে চারিদিকে
আর প্রান্তরে-প্রান্তরে দীর্ঘশ্বাস আর ক্রন্দন
ছড়িয়ে চলেছে।'

লীকো সঙ্গীতে এ ধরনের বেদনাদায়ক কথা ও ভাবের সমাবেশ।

'দাস্তানাঘ্' হলো মুলতানী দোহ্‌রা, পোশতু মিসরা বা সিন্ধী সান্‌য়ারো সঙ্গীতের সমতুল্য। এ গানগুলো ক্ষুদ্রাকার। গীত হয় পাঞ্জাবী ওয়াঞ্জ্‌লী (বাঁশী)-সদৃশ নারহ্ বলে' কথিত একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র সংযোগে। গায়ক ও বংশীবাদক একসঙ্গে বসে পাহাড়ী পশু-চারণ দলের প্রিয় এই সঙ্গীত গান করে। যেমন—

'আমি চলি দ্রুতগামিনী ঘোটকীর পৃষ্ঠে
আমার প্রিয়া বাস করে চন্দ্রমুখী কুমারীদের সাথে।

আমি বিশ্রাম করি পাহাড়ী সবুজ জলাধারের ধারে
মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে।
তারপর ছুটে যাবো
প্রিয়ার আশ্চর্যান্বিত মুখ অবলোকন করতে।
মৃত্যুর চিহ্ন হলো তাপজ্বর
বৃষ্টির চিহ্ন হলো ধূলিঝড়
আর ভালবাসার চিহ্ন হলো মৃদুহাস্য।'

'মোরো' হলো একপ্রকার ছোট-আকারের রাখালী গান। এ গীত হয় দুই কণ্ঠে, সওয়াল ও জওয়াবের ভঙ্গিতে। প্রথম লাইনে এক গায়ক অন্যকে একটি প্রশ্ন করে। দ্বিতীয় লাইনে অন্য গায়ক তার উত্তর দেয়।

একই গায়ক কখনো কখনো প্রশ্ন-উত্তর দুইটিই গানের সুরে শোনায়।

অতীতকালে যখন বালক-বালিকাদের মেলামেশায় বাধা ছিল না, তখন মোরো সঙ্গীত অতিশয় জনপ্রিয় ছিল। এখন ও-রকম মেলা-মেশাকে সমাজে অপছন্দ করা হয়। যে কারণে মোরো এখন কতকটা কাল্পনিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন প্রেমিক ও আর অন্যজন প্রেমাষ্পদের অভিনয় করে এ গানের আসর জমায়। এ-ভাবেই প্রান্তরে, পাহাড়ে ও মরুবক্ষে মোরো গান গীত হয়।

এই চুটকি-গানের সুর বেদনাত্মক। প্রেমাষ্পদের বিশ্বাসঘাতকতা, প্রণয়ভঙ্গ ইত্যাদি এর বিষয়বস্তু। বিরহী প্রেমিক ভাবাবেশ জড়িয়ে চাপাকণ্ঠে প্রথম লাইন গান করে, তারপর প্রেমাষ্পদের ভূমিকায় অন্য গায়ক জবাবে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। যেমন—

'তুমি তো জানো, প্রিয়া!
তোমার স্মৃতিস্পর্শে আমার হৃদয়
  কুয়াশার ন্যায় গলে পড়ে।
তা সত্যি, বন্ধু!
কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তির সাথে
  যুদ্ধ করে কি ফল?'

'সিপাথা' হলো ধর্মীয় সঙ্গীত। বালোচী 'সিপত' শব্দ ফারসী সিফত (প্রশংসাবাদ)-এর সমার্থবোধক। বিশেষ করে আল্লাহ্‌তাআলা ও

হযরত রসূলে করীমের প্রশংসাবাদ অর্থে এর প্রচলন। সিপত লোক-গীতির বিষয়বস্তুও আল্লাহ্, রসূল এবং ওলীআল্লাহ্দের স্তুতিবাচন।

বালোচ মেয়েরা রাত্রে এ-গানের আসর জমায়। কোনো বাড়ীতে সন্তানের জন্ম হলে পড়শী মেয়েরা প্রসূতির গৃহাঙ্গনে জমায়েত হয়ে চক্রাকারে আসন গ্রহণ করে। ঢোলধারীরা বসে চক্রের মধ্যস্থলে। তারপর সারারাত ধরে সিপত গান চলতে থাকে। একে শোকর-গোযারীর গানও বলা চলে। এ অনুষ্ঠান উপর্যুপরি সারারাত ধরে চলে।

দু'টি সিপত গানের প্রথম দু'লাইন অনুবাদ ক'রে নিয়ে দেওয়া হলো:

'আল্লাহ্ই সকল প্রশংসা ও সুবাদের মালিক,
ইবাদত ও বন্দেগী একমাত্র আল্লাহ্ ও
তাঁর রসূলের জন্যেই।"

'কে ঘুমায় এবং কে প্রহরারত থাকে?
মানুষ ঘুমায়, আল্লাহ্ জাগেন।'

'লোলী' একপ্রকার ঘুমপাড়ানি গান। একে মেকরাণী বালোচীতে বলা হয় লীলু। পৃথিবীর সব ভাষাতেই ঘুমপাড়ানি গানের প্রচলন রয়েছে। এর বিষয়বস্তু হলো, মায়ের জননীসুলভ স্নেহমমতার প্রকাশ এবং সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গলকামনা। বালোচী ঘুমপাড়ানি গানে এই মমতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এদের জাতীয় মনোভাবের একটি পরিচয়ও পাওয়া যায়। প্রসূতি মনে করেন যে, তাঁর সন্তান হবে যুদ্ধক্ষেত্রে দলের অগ্রণী ও অমিতবিক্রম—শিরায্-এর তলোয়ার চালাতে অদ্বিতীয়। যেমন,—

'আমার সন্তান যখন যৌবনে উপনীত হবে,
তখন তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে।
আর ছয় অস্ত্রে যে সজ্জিত থাকবে
ঢাল, বন্দুক, ছোরা, তূণভরা তীর ও ধনুক
আর শিরাযী তলোয়ার।

সে চলবে সবচেয়ে দ্রুতগামী ঘোটকীতে,
আর হরণ করে আনবে তার রূপ-গুণ মুগ্ধা
শত্রু কন্যাকে।'

*

'ঘুমাও ঘুমাও আমার ছোট্ট খুকুটি,
সে ডাকে তার বাবাকে, চাচাদেরকে,
ভাইকে আর ভাইয়ের সুদর্শন বন্ধুদেরকে,
আর তার সিংহের মতো সাহসী চাচাতো ভাইদেরকে :
'এসো, সকলে এসো আমার তাঁবুতে।
কেন না, আকাশে মেঘ ঘনিয়েছে
তোমাদের ক্ষুরধার অস্ত্রের ফলা, আর তোমাদের
তীরপূর্ণ তূণ
বৃষ্টিতে ভিজে সেঁত-সেঁতিয়ে যাবে।'
দাস-বালিকারা কাজে চলে গেছে,
গাই আর বাছুরগুলি গেছে জঙ্গলে,
গুজার রাখালদল গেছে গরু চরাতে,
ঘুমোও, ঘুমোও আমার ছোট্ট খুকুটি।

বালোচী নাযিক গানের মধ্যে পড়ে ঘুমপাড়ানি গান, দোলনার গান এবং খেলাধূলার গান। পূর্ব-বালোচিস্তানে লোলী প্রচলিত আর মেকরান, খারান, লাসবেলা অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে নাযিক। লোলীর তুলনায় নাযিক-এর বিষয়বস্তু অনেক বেশী ব্যাপক। লোলী গান মায়ের গান। কিন্তু নাযিক গীত হয় নবজাতকের মা ও বোন—উভয়ের পক্ষ থেকে। বাগদান, বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক উৎসবাদি উপলক্ষে সমবেত মহিলা ও বালিকাদল ঢোলক সংযোগে একতানে নাযিক-গান করে থাকেন :

'খোদা জানেন সেদিনের কথা
যেদিন আমার বাবু ফুলের মতো একটি কন্যাকে
বিয়ে করে আনবে।
কঠোর পরিশ্রম করে
সে জমা করবে পাহাড়-প্রমাণ স্বর্ণরৌপ্য।

খোরাসান থেকে এমন একটি বৃক্ষ সে নিয়ে আসবে
যার ফল ফলবে সোনা রূপার
আর ফুল ফুটবে সুদৃশ্য হীরা-মুক্তার।'

'মোদক' হলো বালোচ শোকগীতি। পরিবারের কারুর মৃত্যু হলে এ গান সমবেত কণ্ঠে গীত হয়। এতে থাকে সোজাসুজি ব্যক্তিগত ও সাম্প্রদায়িক শোকবর্ণনা—দুঃখ-বেদনার একান্ত অকপট প্রকাশ! মৃতের প্রতি স্তোকবাদও এর বিষয়বস্তু। মৃতের জীবনকাহিনী এবং চরিত্রাদর্শ নিয়েও এতে অনেক কথা বলা হয়।

সর্দার মুহম্মদ খান বালোচ বলেন: মৃতের ঘোড়া, বর্শা ও তলোয়ারের বর্ণনা, সভাসদ ও বন্ধুদের নিয়ে তাঁর আড্ডা, প্রণয়কাহিনী, তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য, সাহস, শক্তি, ঔদার্য, দুঃসাহসিক অভিযানাবলী, যুদ্ধবিগ্রহ, লুণ্ঠন—এসব কিছুই মোদক-এর বিষয়বস্তু।

সাধারণ নর-নারীর শোকগাথা হয় স্বভাবতঃই সহজ সরল। এতে থাকে বালোচ জাতির সাধারণ গুণাবলীর ব্যাখ্যান, যেমন, সাহসিকতা, অধ্যবসায়, আতিথেয়তা ইত্যাদি। কোনো মহিলার মৃত্যু হলে তাঁর সম্পর্কে মোদক-এ উল্লিখিত হবে নারীসুলভ গুণাবলী; যথা, রূপ, সতীত্ব, সারল্য, অনাড়ম্বরতা ইত্যাদি। পুরো তিনরাত তিনদিন ধরে মৃতের গৃহে মোদক-গীতি চলে।

জনৈক সর্দারের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত একটি প্রসিদ্ধ মোদক-গীতি নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

'এ কিসের শোর গোল?
পৃথিবী কেন কেঁপে কেঁপে উঠছে?
আকাশে দাবাগ্নির ঝলক,
বৃষ্টিতেও যেন আগুনের জ্বালা,
উর্ধ্ব আকাশে উড়ন্ত চিলদের পালকেও
যেন আগুন জ্বলছে,
পাহাড়-পর্বত থরথরমান,
আমাদের সর্দার আজ পরলোক প্রয়াণ করেছেন।
বিশ্বের চতুর্দিক আজ দিক বদল করেছে,
সিন্ধু ও হিরাত স্থান-বিনিময় করেছে।

সপ্ত-সাগর ওলট-পালট হয়েছে,
রোষে সমুদ্র ফুঁসছে।
বৃক্ষাদি এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছে,
পাহাড়গুলি হন্তদন্ত,
রাজপ্রাসাদাবলী দুমড়ে পড়েছে,
সিবি-দুর্গের চারিটি প্রাকার ভেঙ্গে পড়েছে।
ওহে গায়েনরা! গান গাও আর শোনাও—
স্মরণ করিয়ে দাও আমীর চাকার-এর বীরোচিত
কীর্তিকাহিনী:
যাঁর ধৈর্য ও জ্ঞান-গরিমার প্রভায়
উত্তাল সমুদ্রবক্ষ পর্যন্ত শান্তভাব ধারণ করতো,
ঝলসান গোশ্‌ত ছাড়া
অন্য কোনো খাদ্য যিনি গ্রহণ করতেন না,
গলানো মাখন দিয়ে যিনি মেহ্‌মানদের হাত ধোয়াতেন।
তাঁর সুন্দর সুঠাম হাত থেকে
কখনো বন্দুকের কুঁদো নাগালের বাইরে থাকতো না,
বিদ্যুৎগতি রণ-অশ্বের রেকাব
সতত তাঁর পায়ের শোভাবর্ধন করতো।
তাঁর শিকার ছিল—
হয়তো আকাশের ঈগল পাখী,
অথবা দ্রুত পলায়নপর পাগাড়ী ছাগ-নেতা
অথবা শত্রুর কলিজা।
যুদ্ধাস্ত্রে আমাদের সর্দার এমনভাবে সজ্জিত থাকতেন যে
তাঁর পোষাক খুলতে যেয়ে
ক্রীতদাসদের হাতে জং ধরে যেতো।
ওহো! তুমি যদি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে,
তবে হে দলপতি!
তোমার তলোয়ারের সামনে শত্রুরা মেষপালের মতো কাঁপতো,
তোমার তলোয়ারের ঝলক
বন্ধুদের মনে আনতো আনন্দের দীপ্তি,

এবং অন্ধ করে দিতো তোমার শত্রুদের ধূলাচ্ছন্ন দৃষ্টি,
তোমার তীররাজি সিক্ত হতো শত্রুদের রক্ত ধারায়,
তোমার বর্শাগ্র রঞ্জিত হতো শত্রুসেনার কলুষিত শোণিত
প্রবাহে।'

বালোচদের সমর-সঙ্গীত ও বীর-রসাত্মক কবিতাবলীকে বলা হয় শে'র। বালোচ যোদ্ধাদের কীর্তি-কাহিনী নিয়েও শে'র রচিত হয়। সাধারণতঃ জাতীয় ইতিহাসের প্রখ্যাত বীরপুরুষদের সম্বন্ধে বিভিন্ন শে'র প্রচলিত আছে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যখন কলহ-বিবাদ চলতে থাকে, তখন দলনেতারা সমর-প্রস্তুতি, যুদ্ধকালীন উন্মাদনা সৃষ্টি এবং যুদ্ধান্তে নিজ নিজ কীর্তিকলাপ বর্ণনা ইত্যাদি উপলক্ষে নানারূপ শে'র রচনা করে থাকেন। অতীতকাল থেকে লোরী বা পেশাগত গায়েনের দল সে-সব শে'র মুখস্থ রেখে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করে আসছে। এভাবেই মুখে মুখে অনেক শে'র বিভিন্ন দল উপদলের মধ্যে রক্ষিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক উৎসবাদিতে এসব গান সমারোহের সঙ্গে গীত হয় এবং এতে করে নিজ নিজ পূর্বপুরুষদের কীর্তিকথা স্মরণ করে সকলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এসব বর্ণনা অত্যন্ত বাস্তবধর্মী ও জীবন্ত। এতে প্রকৃতপক্ষে থাকে প্রসিদ্ধ সর্দারদের যুদ্ধ ও শান্তিকালীন কার্যকলাপের বর্ণনা, প্রেম ও প্রতিহিংসার কথা, সাহসিকতা ও কাপুরুষতার কাহিনী এবং যুদ্ধে লিপ্ত বীরদের চরিত্র মাহাত্ম্য ও সমালোচনা। শে'র হয় স্পষ্ট, সতেজ এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনাবাহী। সম্প্রদায়-জীবনে এর প্রভাব অতি গভীর। যেমন,

'মনে করো না আমার যুদ্ধ-হুঙ্কার শৃগালের চিৎকার-তুল্য।
আমি শত্রুব্যূহে ঝাঁপিয়ে পড়ি ক্রুদ্ধ শার্দুলের মতো'
অস্ত্র-শস্ত্রের প্রাচুর্যে
কিম্বা বিরাট বাহিনীর সহায়তার নয়—
বরং আমার শৌর্য সম্বল করেই
আমি আক্রমণ চালাই প্রতি নিশীথে,
বৃষ্টির মধ্যে যেন ঝঞ্ঝা-ঝড়।
শত্রু যুবকদল যখন তাদের প্রিয়াদের বাহুডোরে
নিদ্রায় অভিভূত,

তখন তাদের নীরব কুটির প্রকম্পিত করে
আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি ঝটিকার মতো।'

'বিবার্গ! তুমি একটি দুধের শিশু
তীর দেখলেই তোমার দেহে কাঁপুনি ছোটে,
ঝক্ঝকে হিন্দ তলোয়ারে তোমার ভীতি।
মিসরীয় লোহা তোমার মনে আনে মৃত্যুভয়।
ভয় নেই বিবার্গ, ভয় নেই,
আমাদের উদ্যত তরবারী যখন ঝলকে উঠবে,
তখন তোমাকে আমরা অনেক দূরে বসিয়ে রাখবো,
যাতে শত্রুর তীর তোমার গায়ে না লাগে।'

নাত্তিয়া শে'র ধর্মভাবাপন্ন কবিতা ও কাহিনী সমষ্টি। এতে রয়েছে নৈতিক উপদেশাত্মক, আধ্যাত্মিক এবং প্রতীকমূলক কবিতা ও কাহিনী-সমাবেশ, হযরত রসূলুল্লাহ্ ও অন্যান্য সাধু পুরুষদের দ্বারা অনুষ্ঠিত মাজেযাবলী এবং আল্লাহ্‌তাআলার মাহাত্ম্য গুণগান। আরও কতকগুলি কাহিনীকাব্য এ পর্যায়ে পড়ে যাতে আল্লাহ্‌র বিচারশীলতা, হযরত আলীর মহানুভবতা এবং ইসলামী বিশ্বাসের ভিত্তিতে নানারূপ বিবরণ ও কল্পনা স্থান পেয়েছে।

নাত্তিয়া শে'র-এর বিষয়বস্তুতে প্রতিফলিত হয়েছে বালোচ জীবনের নীতিবোধ। এদের চোখে ঔদার্য হলো মানব-চরিত্রের শ্রেষ্ঠতম গুণ এবং স্বার্থপরতা ও ধনলিপ্সা সবচেয়ে নিকৃষ্ট সামাজিক ও ধর্মীয় হীনবৃত্তি। যারা বিপৎকালে অন্যদের সাহায্য করে এবং মানুষ ও জীবজন্তুর উপকারার্থে কাজ করে, তারা মৃত্যুর পর বেহেশ্‌তবাসী হবে; আর যারা স্বার্থপর ও হীনমনোভাবাপন্ন, তাদের জন্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা হলো মৃত্যুর পর নরক-যন্ত্রণা।

ধর্মীয় সমাবেশ এবং অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সামাজিক উৎসবে নাত্তিয়া শে'র-এর আয়োজন হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে শারিন্দা ও তাম্বুরা সঙ্গত। নাত্তিয়া শে'র গীত হয় সবিশেষ আন্তরিকতা ও একাগ্রতা সহকারে।

বিশিষ্ট বালোচ প্রেমোপাখ্যানগুলি রচিত হয়েছে দীর্ঘতর কবিতায়। এসব কবিতার রচনাভঙ্গি সহজ ও সচ্ছন্দগতি। প্রেমের পথে দুঃখ-দুর্দশা, পরীক্ষা, দুর্দৈব ইত্যাদির বর্ণনাই এগুলোর বিষয়বস্তুর বৃহত্তর অংশ। স্বভাবতঃই এসব বর্ণনায় চিত্রিত হয়েছে একাগ্র প্রেম, যুদ্ধাভিযান, অশ্বচালনা-কৌশল এবং প্রণয়িনীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগমূলক কার্যাবলী। 'হানী শেহ্ মুরীদ' হলো সুন্দরী হানুম ও সুফীপন্থী মুরাদের মর্মান্তিক প্রেম কাহিনী। দলপতি মীর চকর খান রিন্দ-এর বন্দীশালায় হানীর কালযাপনের দৈনন্দিন কাহিনী অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়ে ফুটে উঠেছে লোক-কবির রচনায়। কাহিনীর শেষ হয়েছে গানের সুরে। 'মস্ত্-ও-সাম্মো'-ও অনুরূপ। 'দোস্তীন-ও-শিরীণ' একটি খাঁটি প্রেমোপাখ্যান। এর বর্ণনাসৌষ্ঠবও উচ্চ শ্রেণীর। 'বিবর্গ ও-গ্রানায', 'লাল্লাহ গ্রানায', এবং 'শাহ্দাদ ও-মাহ্নায' ইত্যাদি এ শ্রেণীর উপাখ্যান।

এই কাহিনী কাব্যগুলো শহুরে, গ্রামবাসী এবং যাযাবর—সর্বশ্রেণীর কাছেই সমান প্রিয়। দীর্ঘপথ অতিক্রমকালে, শস্যাদি আহরণকালে, পরিশ্রান্ত হয়ে বৃক্ষছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ-সময়ে অথবা সামাজিক মিলনোৎসবে তারা এ-সব কাহিনীর সমগ্রটা অথবা অংশ বিশেষ আবৃত্তি ও গান করে। প্রকৃতির নিরন্তর কঠোরতার মধ্যে লালিত এই পরম কষ্টসহিষ্ণু জাতি এদের লোকসঙ্গীতের মারফত-ই কখনো কখনো কথঞ্চিত সান্ত্বনা ও প্রশান্তি খুঁজে পায়। এই লোকসঙ্গীত চর্চাই এদের আত্মবিনোদের শ্রেষ্ঠতম অবলম্বন।*

[সলিম খান জীম্মী
অনুবাদঃ কামালউদ্দীন খান]

বেলুচী কাব্যের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ প্রসঙ্গে বৃটিশ সিভিলিয়ান টি. এইচ. সোরলে লিখেছেন:

'আকার ও প্রকারের দিক থেকে বেলুচী সাহিত্য একান্তরূপে জন-সাহিত্য। দ্বিতীয়তঃ, বেলুচী কবিতা-সকল সব সময়েই জনসাধারণের কণ্ঠস্থ থাকে। এমন কি পেশাদার গায়কগণ তা সব জায়গাতেই গেয়ে বেড়ায়। এই সব দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, তা আরবদের

* মাহে-নাও-এর

প্রাক্-ইস্‌লামী যুগের কবিতার সঙ্গে অনেকাংশে মিল রয়েছে। যে সমস্ত কবিতা যথাযথরূপে পাঠকদের অন্তরে আঁকা ছিল এবং সাধারণতঃ উপজাতীয় অঞ্চলসমূহে ও মেলায় গাওয়া হোত।'

'বালোচ' শব্দটি বিভিন্ন রকম অর্থে ব্যবহৃত হয়। পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিকগণ শব্দটিকে 'বালোচ জাতি' বুঝাবার জন্যই ব্যবহার করেছেন। যদিও বালোচদের অনেকেই তাদের বাসস্থান অনুযায়ী সিন্ধী, পাঞ্জাবী ও সিরাইকি (লুহ্‌ন্দা) ভাষায় কথা বলে, তবু তাদের প্রধান অংশটি পাকিস্তানে বাস করে এবং নিজেদের বালোচী ভাষায় কথা বলে। বালোচী সাহিত্য বলতে সাধারণতঃ পাকিস্তানের (মাকরাণ, পাকিস্তানী বালোচিস্তান ও তার সংলগ্ন রাজ্য সিন্ধু ও পাঞ্জাবের) বালোচ জাতির সাহিত্য এবং তাদের পূর্বপুরুষদের বালোচ ভাষাকেই বুঝায়।

বালোচী ভাষার দুইটি শাখা। সোলায়মানী—যা উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম অর্থাৎ সিন্ধু এবং পাঞ্জাবের দিকের অঞ্চল সমূহে প্রচলিত রয়েছে। মাকরানী—যা দক্ষিণ-পশ্চিম এবং পশ্চিমে ইরানের নিকটবর্তী এলাকা সমূহের অধিবাসীদের ভাষা। আধুনিক ফারসী ভাষার সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল রয়েছে এবং পাকিস্তান ও ইরানের সংস্কৃতির মধ্যে এই ভাষা একটি যোগসূত্র-স্বরূপ। বালোচী ভাষার শব্দ ভাণ্ডারের প্রায় অর্ধেক বাহ্যতঃ শুধু অপভ্রংশ, অথবা সম্ভবতঃ ফারসীতে প্রকাশিত পুস্তকের ভাষার অপভ্রংশ। যা হোক, ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে বালোচী ভাষা ফারসী ভাষা থেকে উদ্ভূত নয়। এটি একটি স্বতন্ত্র ও প্রাচীন ভাষা—প্রাচীন ফারসীর চেয়ে জেন্দ অথবা পুরাতন ব্যাক্‌টেরিয়ান ভাষার সঙ্গে বহু দিক থেকে এই ভাষার মিল আছে।

বালোচীস্তান একটি পার্বত্য এবং মরু অঞ্চল। সেখানে বৃষ্টি খুবই কম হয়। লতাগুল্মহীন অনুর্বর মাঠ ময়দান এবং পার্বত্য অঞ্চল দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। সেখানকার অধিবাসীরা উপজাতীয়দের মতো জীবন যাপন করে থাকে। তাদের মধ্যে অনেক সময়ই শক্তি পরীক্ষা হয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে গোত্রীয় বিরোধ বছরের পর বছর ধরে চলে। বালোচী ভাষা এবং সাহিত্যে প্রকৃতপক্ষে তাদের এই মনোবৃত্তির প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। পর্বত সংকুল দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য, পর্বত, নদী, উপত্যকা, শৈল-সানু, গিরিশৃঙ্গ, গিরিপথ

প্রভৃতির মতো বালোচীস্তানের অধিবাসীদের ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকতার দরুন বালোচী ভাষা শব্দ-সম্পদে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। সাহিত্যে প্রেম ও যুদ্ধের সুস্পষ্ট দৃশ্য প্রকটিত হয়েছে এই বালোচী সাহিত্যে।

বালোচী গদ্য সাহিত্য তার পদ্য সাহিত্য অপেক্ষা অনেক অংশে ক্ষুদ্র। বালোচী গদ্য সাহিত্য বর্তমানে বালোচী কবিতার মতো এতো ব্যাপক ও উন্নত নয়। এতে সাধারণতঃ উপাখ্যান ও কিস্‌সা কাহিনী সমূহই গদ্যাকারে লিখিত আছে। এই সমস্ত গদ্য কাহিনী সাধুদরবেশের উপাখ্যান, বালোচীদের নিজেদের উপকথা, রূপকথা এবং 'লায়লা মজনু-র মতো (মূল আরবীতে লিখিত) প্রেমকাহিনী প্রভৃতিতে ভাগ করা যেতে পারে। 'দোস্তেন শিরিণ', 'শাহ্ মুরিদ্ ও হানী' এবং 'মুগাব্বাত খান ও সামরী'র মতো খাঁটি বালোচী রোমান্সও আছে।

বালোচী ভাষায় এমন বহু সংখ্যক কবিতা আছে, যা সব সময়েই বালোচীগণের মুখে মুখে প্রচলিত। 'ডেমস্' সেগুলিকে সর্বপ্রথম যথোপযুক্ত ভাবে সংকলিত করেন। কিন্তু মাক্‌রাণ অঞ্চলের জনপ্রিয় কবিতাগুলি এখনও পর্যন্ত সংগৃহীত না হলেও 'ডেমস্'-এর সংকলিত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি মাক্‌রাণের বালোচদের ভিতরেও পাওয়া যায়। এই সকল অঞ্চলে নিজস্ব কবিরও আবির্ভাব ঘটেছে। মান্দ জেলার মোল্লা ফজুল ও মোল্লা কাসিম ও তাঁদের সমসাময়িক মোল্লা বুহার মহান রিন্দ্ উপজাতিদের শ্রেষ্ঠ কবি। কালমাটি উপজাতির মোল্লা হায়দার ও গুহরাম ছিলেন তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী কবি। সোলায়মানী অঞ্চলের কবিগণ যে-ছন্দে কাব্য রচনা করেছিলেন মাক্‌রাণী এলাকার কবিগণও সেই ছন্দের অনুকরণ করেন।

বালোচী সাহিত্য তার এপিক কাব্যের জন্য বিখ্যাত। ডেমস্ বালোচী সাহিত্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: যে ফারসী কবিতার আঙ্গিক আফগানিস্তান ও মুসলিম ভারতের এমন কি জনপ্রিয় কবিতারও সার্বজনীন মানদণ্ড হয়েছে, তা এখানে পাওয়া যাবে না। এখানে 'গজল', 'রদীফ' দিওয়ান এবং ফারসী ছন্দের পাণ্ডিত্য নেই। আংকিকের মতো বালোচী কবিতার বিষয়বস্তু খুবই সরল এবং তার প্রকাশভঙ্গি খুবই ঋজু। এই কবিতায় দেশের ও জনজীবনের ছবি স্পষ্ট ভাবেই ফুটে উঠেছে। কোন কোন সময়ে পাহাড়ী দেশে বজ্রবিদ্যুতের যে চমকানি

লীলাখেলা দেখা যায় এবং বৃষ্টিপাতের দরুন গ্রামাঞ্চলে যে আকস্মিক পরিবর্তন দেখা যায় সেই বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিরা লাভ করতেন যথেষ্ট আনন্দ। তার কারণ সেই শুষ্ক দেশে জল নেই, মেঘ বৃষ্টি অল্পই হয়ে থাকে। তাই সেই দেশের কবিরা অল্প বৃষ্টিপাতের ফলেই আনন্দে মেতে উঠে।

বালোচী ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে জঙ্গ-লড়াই সম্পর্কীয় বীররসের গাথা। 'রান্দরণ' এবং 'লা-শারীউঁ' নামক দুই গোত্রের মধ্যে যে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল সংঘর্ষ চলেছিল তাই এই উপাখ্যানের মূল বিষয়বস্তু। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় যুগে "রান্দারণ" ও 'দোয়ানীতিদের' সংঘর্ষ এবং শাহ্‌জাদের নায়কত্বে বালোচ অভিযান —যে অভিযান সম্রাট, হুমায়ুনকে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী পুনরধিকার করতে সাহায্য করেছিল—তা নিয়েও এই গাথা রচিত হয়েছিল। (এই জঙ্গ-লড়াই সংক্রান্ত কাব্যকে 'রজমিয়া শয়েরী' বলে।)

বালোচিস্তানের এপিক কবিতার সঙ্গে প্রাক্-ইসলাম যুগের আরবদের কবিতার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বালোচরা যে প্রকৃত আরবীয়, সে ঐতিহ্যের উপর সুন্দর আলোক সম্পাত করেছে এই সকল কবিতা। ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের দুই নায়ক—রিন্দের সর্দার মীর চাকুর ও লাশারীদের নেতা গৌয়াহারাম কবিতার মাধ্যমে নিজেদের যে পরস্পর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তাতে বালোচীদের 'রজমিয়া শায়েরী'র বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

"শাইহাকের পুত্র মীর চাকুর গান করেন: রিন্দের রাজা গান করেন।

তিনি রিন্দ্ ও লাশারীদের যুদ্ধের গান করেন: গৌয়াহারামের জবাবে তিনি গান করেন।

হে গৌয়াহারাম, তুমি শত্রুতা বৃদ্ধি করে ও বালোচীদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে নিজের ক্ষতিই করেছ। তুমি তোমার কটিবন্ধের উপর 'নাল্গি' নাম খোদাই করেছ এবং 'নধবাদাঘ' নাম উচ্চে তুলে ধরে একবার তোমার খেলায় জিতেছ। রিন্দ্‌দের দ্রুতগামী ঘোটকী যার পায়ের চিহ্ন মোল্লার নিচু ভূমিতে পরিষ্কার দাগ রেখেছে তাকে নিধন করেছ। কিন্তু এর প্রতিশোধের কথা স্মরণ করো। স্মরণ করো কিরূপে বাংগী, হাসান ও

পুত্র নোধাক্ একত্রে নিহত হয়েছিল—আদম, খ্যাতনামা নধবানদাঘ, আহমদ ও সামন্ত কাল্লো নিহত হয়েছিল। রিন্দদের তীর যখন ভীষণ যুদ্ধের দিনে তাদের পিছন থেকে ঘিরে ফেলেছিল, তখন তুমি পালিয়েছিলে পলায়নরত বন্য গর্দভের মতো। তুমি দাব-দুর্গ থেকে পালিয়েছিলে এবং মোল্লার মুখ দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলে। তোমার এই দুর্দশা দেখে আমি তোমাকে বিদ্রূপ করিনি—চারণ পাঠাইনি—যে তোমাকে তোমার শ্রীমুখের ওপর ব্যঙ্গ করবে বা বীণার সাহায্যে গান গেয়ে তোমাকে নিয়ে তামাশা করবে। আমার ব্যাঘ্র থাবা তোমার কানের নীচে আঘাত করেনি যখন তুমি পৃথিবীর কোন নিভৃত স্থানে বা কোন গর্তে তোমার মাথা লুকিয়ে এস্তা ঘোটকীর মতো মাথা নেড়েছিল। তোমার অনেক লোক ঘজ ও গুজরাতের দিকে পালিয়েছিল আবার কেউ কেউ পালিয়েছিল বাহাওয়ালপুরের দিকে। তুমি রিন্দ্‌দের প্রতি হীন আনুগত্য স্বীকার করে এসো। তোমার সাদা পোষাকের কিনার দিয়ে শয্যা পরিমাপ করার কথা বলে এসো। তুমি মাথায় কালো পানির (জল) কলস নিয়ে বলো এবং লজ্জায় তোমার মাথা নত হয়ে পড়ে। এখন তুমি ওমরের আশ্রয়ে মাথা লুকিয়ে আছ। আমি তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব ভাইয়ের তলোয়ারে আঘাতপ্রাপ্ত মর্মাহতের মতো। আমরা প্রাতঃ সমীরণ অপেক্ষা দ্রুতগামিনী ঘোটকীর মালিক রিন্দ্‌রা এবং আমরা শীঘ্রই তোমাদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করব। আমরা উভয় দিক থেকে তোমাদের আক্রমণ করে তোমাদের যথাসর্বস্ব লুটে নোব। মুখরোচক বুনন-বিশারদ গোয়াহারাম! অন্তরের কানে সকল কথা শ্রবণ করো, দীর্ঘ পথের যাত্রী হও। এই ভাবে হয়তো তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হতেও পারে। আমি বাজী রেখে লম্বা কথা বলব এবং শেষে আমাব প্রতিজ্ঞা অনুসারে বিসম্বাদ সৃষ্টি করে আমার বন্ধুদের হৃদয় থেকে সকল ভয় দূর করব।'

পরবর্তী কালে বালোচী সাহিত্যে যে 'জঙ্গনামা' রচিত হয়েছে তাতে প্রধানত অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর উপজাতীয়দের মধ্যের সংঘর্ষের বিবরণই বর্ণিত আছে। এর মধ্যে কোন কোনটি চরম উত্তেজনা পূর্ণ আবার কোন কোনগুলি যুদ্ধরত বীর যোদ্ধাদের নামের ফিরিস্তি মাত্র।

বালোচী সাহিত্যের রোমান্স সংক্রান্ত উপাখ্যানের ভাষা সহজ ও চিত্তাগ্রাহী। আপত্তিকর ভাষার যে ত্রুটি পরবর্তী যুগের কতগুলি যুদ্ধ গাথার উৎকর্ষ নষ্ট করেছে তা থেকে এই ভাষা মুক্ত। প্রেমসংগীতে যে অলংকার বাহুল্য দেখা যায়, তাও এই ভাষায় নেই। রচনাশৈলীর দিক দিয়ে এদের কয়েকটি সাবেক কালের বীর রসাত্মক গাথাগুলির মতো এবং ভাষার দিক থেকে বিচার করলে এগুলির কোনটিই খুব সাম্প্রতিক নয়। অধিকাংশ গাথা বালোচী রোমান্সের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। এমন কি যখন 'লায়লা মনঞ্জ'র মতো বিদেশী আরব-রোমান্সের আখ্যান ভাগ নেওয়া হয়েছে তাতেও বালোচী ঢং আরোপিত করা হয়েছে।

বালোচদের প্রেম-গীতিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি জাম দরক। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে তিনি কালাতের শাসনকর্তা নাজীরখানের দরবারী কবি ছিলেন। বালোচী সাহিত্যের সমালোচক ডেম্‌জ বালোচীদের প্রেমসংগীত সম্পর্কে লিখেছেন :

'বালোচী প্রেমসংগীত বিচার করলে দেখা যায় যে, মরুভূমির হাওয়ায় বাজারের আবহাওয়া কতক পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছে। বালোচরা জন্মকাল থেকেই শহরবাসী হয় নি। তারা মরুচারী। মাঝে মাঝে কোন কারণে তারা শহরে আসে। তাদের প্রেমিকা শহরের কোন মহিলা হলেও তারা তার চিত্র অঙ্কনে সাধারণতঃ মুক্ত প্রকৃতির উপমার সাহায্য নিয়ে থাকে। যখন তারা মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, লতানো গাছ প্রভৃতির বর্ণনা করে থাকে, তখন তারা সঙ্গে সঙ্গে (মহিলাদের) গহনা সুগন্ধি দ্রব্যের বর্ণনা করে থাকে। তাতে বুঝা যায় যে লেখক শহরের বাসিন্দা নহেন—মরুর সন্তান।'—(ডেম্‌জ)

বালোচী ভাষায় ধর্মীয় ও নৈতিক বিষয়বস্তু অবলম্বনের অনেক কবিতা রচিত হয়েছে। এ ছাড়া বালোচী ভাষায় ছোটখাট বহু কবিতা দেখা যায়। এই শ্রেণীর কবিতাকে বলা হয় 'দাস্তানাগ'। আর এক শ্রেণীর কবিতাকে বলা হয় 'নায়রাগী'। এই শ্রেণীর গীতি-কবিতা সচরার বাঁশীর সঙ্গে গাওয়া হয়। প্রেমের খুঁটিনাটি তার বিষয়বস্তু। কোন কোনটাতে আবার শ্লেষের কষাঘাতও দেখা যায়। দাস্তানাগ

পার্বত্য এলাকায় সহজ মানুষগুলোর মধ্যেই বিশেষ করে প্রচলিত। নাগরিক জীবনের ছাপ কোথাও নেই। পহিলিয়াঁ ও দু সখনেও জাতীয় পদ্যে বালুচীস্তানে মরুচারী জনসাধারণের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর প্রতিফলন দেখা যায়।

বালোচী প্রেম-কাব্যের প্রকৃতি ও প্রাণকে বোঝাবার জন্য নিম্নোক্ত নজীরগুলি সংগৃহিত করা হয়েছে :

(ক) জাম দুরকের প্রেমসংগীত :

'গত রাত্রে যে বিদ্যুৎ চমকালো, তার গতিবিধি দেখে মনে হলো যেন 'জলগু'র দিক হতে কোন মদ্যপায়ী মাতাল হেলে দুলে আসছে। সে নিয়ে আসল আমার মাহ্‌বুবের পয়গাম। আমার মনে হলো যেন কেউ আমার শরীর ঢেকে ফেলেছে ফুলের চাদরে। উত্তর আকাশে রামধনু খেলেছে। তার পাশে যে কাল রঙের মেঘ জমেছে, তা ঠিক আমার প্রেয়সীরই সমবর্ণের মতো।'

'আমি সূর্য বলেই, আমি আমার অন্তরের সঙ্গে লড়াই করে থাকি। আমার অন্তরও নাদান, তাই সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে থাকে। সে সোনালী চেহারার অধিকারী মাসুম বাচ্চার মত কান্নাকাটি করে থাকে। আবার লুণ্ঠনরত বদমেজাজী তুর্কের মত রুক্ষতাও প্রকাশ করে থাকে। যে স্তম্ভের সঙ্গে তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে হয়েছে, সে তাকে উঠিয়ে ফেলতে চায়।'

তাঁর আর একটি প্রেমসংগীতের তর্জমা :

'হে খুশবুতে মাতোয়ারা প্রভু। তোমার শিরস্ত্রাণে রয়েছে খোরাসানের মৃগনাভির গন্ধ। খোদার ওয়াস্তে সাবধান হয়ে চলো। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব, সেখানে হরিণচোখ 'সারভ-কদ' প্রেয়সী থাকে। সে মিষ্ট ভাষায় তোমাকে করবে সম্ভাষণ। সেখানে লালা জোওয়াহেরাত আছে—আর আছে পুরানো দিনের মধুর স্মৃতি। পুরানো দিনের কথা আবার স্মরণ কর এবং তার পুনরুক্তি করতে থাক। তাঁর সামনে বসে তাঁকে অন্তরের মর্মবেদনা শুনাও। এবং এইভাবে মনের সকল দুশ্চিন্তা লাঘব কর।'

[অনুবাদ : মৌলানা মুস্তাফীজুর রহমান]

পাঞ্জাবী সাহিত্য

পাঞ্জাবের চাষীদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীই পাঞ্জাবী সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। এই সাহিত্যের লেখকগণ শহরের জীবন অপেক্ষা গ্রাম্য জীবনের দিকটাকেই সাহিত্যে বিশেষভাবে স্থান দিয়েছেন।

পাঞ্জাবী সাহিত্য বহু প্রাচীন। এ ভাষার প্রচলন ছিল আর্যদের আগমনের পূর্ব থেকেই। এ সাহিত্যের ভিত্তি রচিত হয়েছে প্রাচীন লোকগাথার উপর। এ সকল গাথা আবার গ্রথিত রয়েছে কতকগুলি প্রেমমূলক কাহিনীর মারফত। কাব্যগুলির কোনটি কোনটি কিছু অদল বদল করে গ্রামের মিলন-মণ্ডপে অভিনীত বা পঠিত হোত।

পাঞ্জাবী সাহিত্যে পাঁচটি প্রধান লোককাহিনী প্রচলিত আছে। যেমন—হীর-রানঝা, শশীপুন্নু, সোহিনী-মাহিওয়াল, মির্জা-সাহিবাঁ এবং পুরাণ ভকত। এগুলির মধ্যে 'হীর রানঝা'কে কেন্দ্র করে বহু পাঞ্জাবী কবি কাব্যরূপ দান করেছেন।

'হীর রানঝায়ের' কাহিনীর বিষয়বস্তু এতই জনপ্রিয় যে তা একদা সারা পাঞ্জাবে বিস্তৃত ছিল। এ কাহিনীর বিষয়বস্তু দেখে অনুমান করা যায় যে তা রচিত হয়েছিল মুঘল যুগের কয়েক বৎসর পূর্বে। কাহিনীটি লোকগাথার রূপ দেখে কবি 'দামোদরের' চেষ্টায় আকবরের শাসনকালে রোমান্সের আকার পায়। এই কাহিনীর নায়িকা হীরের সমাধি এখনও তার জন্মভূমি ঝাং-এ রয়েছে। প্রতি বৎসর তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে সেখানে একটি উৎসবের অনুষ্ঠান হয়।

হীর-রানঝা কাহিনীতে চুচাকের কন্যা হীর এবং প্রতিবেশী একজন উপজাতীয় সর্দারের কনিষ্ঠ পুত্র রানঝার প্রেমকাহিনী আলোচিত হয়েছে। রানঝার অন্যান্য ভাইয়েরা তার প্রতি ঈর্ষাতুর হয়ে পড়ে এবং পিতার মৃত্যুর পর তারা তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। রানঝা ঘুরতে ঘুরতে চিনাব নদীর তীরে পৌঁছে একজন মাঝির নৌকায় আশ্রয় নেয়।

বজরাটি ছিল চুচাকের কন্যা হীরের। হীর বজরায় উঠে রানঝাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই একে অপরের প্রেমে পড়ে। রানঝার উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানোর কথা শুনে হীর তাকে

পিতার খামার বাড়ীর রাখালের কাজে লাগায়। আর গোপনে উভয়ে প্রেম করতে শুরু করে। হীরের পিতা উভয়ের গোপন প্রেমের কথা জানতে পেরে রানঝাকে নির্বাসিত করেন। এবং হীরকে রাংপুরের প্রধান 'সাইদা'কে বিয়ে করতে বাধ্য করেন। কিন্তু একদিন রানঝা যোগিনীর বেশে রাংপুরে গিয়ে সাইদার ভগ্নি মেহতীর সাহায্যে তার প্রিয়তমা হীরকে নিয়ে পলায়ন করে। কিন্তু রানঝা পুনরায় ধরা পড়ে এবং নির্বাসিত হয়। এর কিছুকাল পরেই রাংপুরে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ড হয়। এই অগ্নিকাণ্ডের কারণ হিসাবে লোকে ধারণা করে হীর-রানঝার দুঃখ। সকলে মনে করে হীর বিচ্ছেদই এই অশান্তির কারণ। তাই তারা হীরকে রানঝার সঙ্গে মিলিত হওয়ার অনুমতি দেয়। হীর বিবাহের ব্যবস্থা করবার জন্য পিতার নিকট ঝাংয়ে চলে যায়। বিবাহের সব কিছু ঠিক। যোগাড়যন্ত্র চলছে। এমন সময় হীরের বাবা ও কাকা এসে জানালে যে রানঝা নিহত হয়েছে।

তারা হীরকে বিষদান করল। হীর দুঃখে বেদনায় প্রাণত্যাগ করল। কিন্তু ঝাংয়ে পৌঁছে রানঝা যখন এ তিক্ত সত্য জানতে পারল তখন সে একেবারে শোকে অভিভূত হয়ে পড়ল। এবং অবশেষে সেও তার প্রিয়তমার কবরের উপর আছড়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করল।

সংক্ষেপে এ হোল হীর-রানঝার কাহিনী। এ কাহিনীর সবটাই দুঃখের। হীর-রানঝার জীবন দুঃখের মধ্যে কি ভাবে শেষ হয়ে গেল তাই এই কাহিনীতে লিপিবদ্ধ আছে।

পাঞ্জাব ও সিন্ধু দেশেই 'শশীপুন্নু' লোকগাথা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। হাশিম্ শাহ্, হাফিস বারখুরদার, আহমদ ইয়ার এবং আরও বহু কবি এই কাহিনীকে কেন্দ্র করে কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু হাশিম্ শাহের কাব্যরূপ সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। হাশিম্ শাহের কাহিনীটি এরূপ ঃ

ভামভোরের রাজা আদমজানের দরবারের জ্যোতিষীগণ বললে তার নবজাত শিশু-কন্যা শশী একটি প্রণয়ঘটিত ব্যাপারের পর মরুভূমির মধ্যে মৃত্যু বরণ করবে। তাই শুনে রাজা মন্ত্রীবর্গের সহিত পরামর্শ করে শশীকে তার যৌতুকস্বরূপ বহু হীরা, কিছু দুধ এবং তার পূর্ণ পরিচয় সম্বলিত একটি পত্র সহ প্রকাণ্ড একটি সিন্ধুকে পুরে নদীতে ফেলে দিলেন।

আত্তা নামে এক নিঃসন্তান ধোপা সিন্ধুকটি দেখে খুলে ফেলল এবং ভিতরকার টাকাকড়ি দিয়ে একটি প্রাসাদ তৈরী করে শিশুকে তার কন্যারূপে গ্রহণ করল। শশী বড় হয়ে 'কেচাম'-এর কুমার পুন্নুর ছবি দেখে মুগ্ধ হল। সে পুন্নুর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করল। এবং অতি শীঘ্রই ওরা উভয়ে পরস্পরের প্রেমে পড়ল। এই কেলেঙ্কারীর কথা শুনে পুন্নুর পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি পুন্নুকে ফিরিয়ে আনার জন্য অন্য পুত্রদের পাঠিয়ে দিলেন। একটি উৎসব আসরে তারা শশী-পুন্নুকে এত বেশী মদ্য পান করাল যে তাতে শশী-পুন্নু অজ্ঞান হয়ে পড়ল। আর ভাইয়েরা পুন্নুকে একটি উটে করে নিয়ে চলে গেল। শশী যখন জ্ঞান ফিরে পেয়ে জেগে উঠল, তখন সে হলের মরুভূমিতে পুন্নুকে অনুসরণ করল। কিন্তু মরুভূমির তীব্র দহন জ্বালা সে সহ্য করতে পারল না। সে সেই মরুর মধ্যে মরে পড়ে রইল। এক রাখাল তাকে কবর দিয়ে সেখানে কোরান শরীফ পাঠ করতে লাগল।

এদিকে কেচামের পথে জ্ঞান ফিরে পেয়ে পুন্নু ভাইদের সঙ্গে যুদ্ধ করে একটি উটে চড়ে পালিয়ে এল। কিন্তু তার পূর্বেই মরুভূমির তপ্ত বালুর মধ্যে যে শশীর জীবন শেষ হয়ে গেছে তা পুন্নুর ধারণার বাহিরে ছিল। পুন্নু পথের মধ্যে একটি তাজা কবর দেখতে পেয়ে রাখালটিকে জিজ্ঞাসা করল ওটা কার কবর। রাখালের কাছে সব কিছু শুনে পুন্নু আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। কবর উন্মুক্ত হলো এবং শশীর সঙ্গে পুন্নুও চির শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল। এ হোল সংক্ষেপে শশী-পুন্নুর কাহিনী।

পাঞ্জাবের আর একটি প্রাচীন লোকগাথা 'সোহিনী-মাহিওয়াল'। এ কাহিনীর জন্য ফজল শাহ্ বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর কাব্য রূপায়ণই সর্বোৎকৃষ্ট বলে গণ্য করা হয়। সাধারণ লোকে মনে করে সোহিনী-মাহিওয়াল-এর ঘটনাটি বিয়োগান্ত এবং এই ঘটনাটি শাজাহানের সময়কার। কিন্তু ষোড়শ শতকের প্রাসাদ গাথা থেকে এ ঘটনাটি আরও প্রাচীন বলে মনে হয়।

সোহিনী তুল্লার সুন্দরী কন্যা। তুল্লা ছিল চিনাব নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত গুজরাট শহরের কুম্ভকার। বুখারার এক সুন্দর যুবক ইজ্জত বেগ গুজরাটের পথ অতিক্রম করার সময় সোহিনীর প্রেমে পড়ে। সে হাঁড়ি-পাতিল কিনবার ছল করে কুমারের বাড়ী আসত। এভাবে

অল্পকালের মধ্যেই সে সমস্ত সম্পদ নিঃশেষ করে দরিদ্র হয়ে গেলো। তখন সে তুল্লার বাড়ীর চাকর হয়ে যায়। তার চেহারা ও কার্যে তুল্লা তুষ্ট হয়ে তাকে তার মহিষপালের রাখাল করে দেয়। একদিন মাহিওয়াল সোহিনীকে জানাল যে সে তাকে ভালবাসে। শীঘ্রই তাদের প্রেম জানা জানি হয়ে গেল। ফলে মাহিওয়াল পদচ্যুত হলো এবং এক প্রতিবেশীর পুত্রের সঙ্গে সোহিনীর বিবাহ হয়ে গেল। সোহিনী কিন্তু মাহিওয়ালের সঙ্গে গোপনে দেখা করতে যেতো। মাহিওয়াল ফকীর হয়ে চিনাবের অপর তীরে বসে থাকতো। প্রতি রাত্রে সোহিনীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সাঁতরে নদী পার হয়ে আসতো। একবার ঝড়ের দরুন মাহিওয়াল কয়েক দিনের জন্য আসতে পারল না। তাই সোহিনী নিজেই একটি শূন্য মাটির পাত্র সম্বল করে নদী পার হয়। ফিরে এসে সে পাত্রটিকে লুকিয়ে রাখল। কিন্তু সোহিনীর ননদ পাত্রটি বদল করে একটি কাঁচা মাটির পাত্র রেখে এলো। রাত্রে সোহিনী সেই পাত্রটি নিয়ে নদীতে নামল। অমনি পাত্রটি কাঁচা মাটির ছিল বলে জলে গলে গেল। সোহিনী এদিকে প্রাণ ভয়ে মাহিওয়ালকে ডাকতে লাগল। সোহিনীর ডাক শুনে মাহিওয়াল নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সোহিনীকে বাঁচাবার জন্য। কিন্তু মাহিওয়ালের অদৃষ্ট এতই মন্দ যে সে সোহিনীর কাছে পৌঁছিবার পূর্বেই সোহিনী জলে ডুবে গেল। মাহিওয়াল সোহিনীর সঙ্গে ইহজগতের মিলনের আশা ছেড়ে দিয়ে যাতে করে পরজগতে প্রিয়তমার সঙ্গে মিলিত হতে পারে তার জন্যে নিজেও ডুবে গেল অতল জলে।

এই তিনটি লোকগাথাকে ভিত্তি করেই পাঞ্জাবী কাব্য-সাহিত্য গড়ে উঠেছে। সূফী কবিগণের কাছে এগুলি ছিল গভীর আধ্যাত্মিকপূর্ণ। তাই তাঁরা মরমী জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করার জন্য এই গাথাগুলির সাহায্য নিয়েছেন। এই তিনটি লোকগাথার নায়িকাগণ প্রিয়তমের সহিত মিলনকামী অনন্তপ্রয়াসী সূফীদের প্রতীক, অন্যান্য মরমীবাদীর মতো পাঞ্জাবী সূফীর প্রিয়তম আল্লাহ্।

পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে শেখ ইব্রাহিম ফরীদ ফারসী বা উর্দুর পরিবর্তে পাঞ্জাবী ভাষায় কবিতা রচনা করেন। শেখ ফরীদ ছিলেন বিখ্যাত সাধক বাবা ফরীদের বংশধর। তাঁর ভাষা ছিল সরল, স্বাভাবিক, শক্তিশালী এবং মর্মস্পর্শী।

অবশ্য তাঁর পরবর্তী মাধোলাল হুসেইনের (১৫৩৯-১৫৪৮ খৃঃ) কবিতায় যে অনুভূতির গভীরতা দেখা যায় তা তাঁর কবিতায় ছিল না। হুসেইন লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সূফীবাদে এক অদ্ভুত ধরনের পারসিক ও ভারতীয় প্রভাবের বিচিত্র সংমিশ্রণ ছিল। তিনি শরাব পান করে নাচতেন, নিজের গান গাইতেন এবং জনসাধারণের নিকট ধর্ম প্রচার করতেন। তিনি উচ্চ মরমী ভাবব্যঞ্জক বহুসংখ্যক 'কাফি' রেখে গেছেন। তিনি প্রিয়তমের সঙ্গে আধ্যাত্মিক মিলনের স্তরে কখনও উন্নীত হননি। ফলে তাঁর কবিতার মূলে ছিল ব্যর্থতার অনুভূতি।

সুলতান বাহু (১৬৩১-৯১ খৃঃ) আরবী ও ফারসীতে বহু গ্রন্থ এবং পাঞ্জাবীতে একটি সুদীর্ঘ 'সিহার-ফি' ('সিহার-ফি' হোল কবিতার ত্রিশটি শ্লোক, একটির পর একটি আরবী বর্ণমালার ত্রিশটি অক্ষরের দ্বারা সূচিত।) তাঁর কবিতা পার্থিব প্রেম ও তার সর্বপ্রকার আদর্শ বর্জ্জিত এবং ধর্মীয়ভাবে পূর্ণ হলেও সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিমতা মুক্ত বলে তাঁর রচনা ছিল সরল ও বাহুল্য বর্জিত।

বুলেহ্ শাহ্ (১৬৮০-১৭৫৮ খৃঃ) পাঞ্জাবী মরমী সাধকদের মধ্যে সর্ব-শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিলেন। সূফী কবিরূপে তিনি প্রিয়তমের সঙ্গে চিরমিলনের আনন্দ-উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগ নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। যে আচার নিষ্ঠা এবং সঙ্কীর্ণ ধর্মান্ধতা বেহেশ্‌তী প্রেমের প্রকাশকে নিষিদ্ধ করে, তিনি তার একজন নির্ভীক সমালোচক ছিলেন। তিনি তাঁর দেশের নিজস্ব সঙ্গীতময় কাব্যপদ্ধতিতে পাঞ্জাবী জীবনের বলিষ্ঠতা ও বীর্যবত্তা থেকে রূপ ও ভাব-কল্পনা গ্রহণ করে কাব্য রচনা করেছিলেন।

ওয়ারিশ শাহ্ অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাবী ভাষার শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক বা শাস্ত্রীয় কবি। ১১১৪ হিজরী সনে গুজরানওয়ালার নিকটবর্তী জান্‌দিয়ালা শেরখান গ্রামে তিনি এক সম্ভ্রান্ত সৈয়িদ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কাসুরে হাফিয গুলাম মুরতাযার নিকট তিনি তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ওয়ারিশ শাহ্ সূফীবাদের চিশ্‌তিয়া তরিকার অনুসারী ছিলেন। পরিণত যৌবনে তিনি পাকপতনের নিকটবর্তী গ্রামে কিছুদিন থাকাকালীন 'ভাগভারি' নামে একটি সুন্দরী কন্যার প্রেমে পড়েন। সৈয়িদ বলে গ্রামের সকলেই তাঁকে

সম্মান করত। কিন্তু 'ভাগভারি'র সঙ্গে তাঁর প্রেমের কথা শুনে সকলে তাঁকে গ্রাম থেকে বের করে দিল। দুঃখে তিনি এত অভিভূত হয়ে পড়লেন যে, মণ্টগোমারী জেলার একটি গ্রামে একাকী সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করতে লাগলেন। তিনি তাঁর প্রেমের বেদনাকে মহিমামণ্ডিত রূপদান করেন 'হীর-রানঝা' নামক লোকপ্রিয় রম্যকাহিনীতে। হীর-রানঝা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠকাব্যকীর্তি বলে গণ্য।

অষ্টাদশ শতকে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল পাঞ্জাবে কোন শান্তি ছিল না। নাদীর শাহের অভিযান, আহমদশাহ আবদালীর ক্রমাগত আক্রমণ, মুঘল সাম্রাজ্যের দ্রুত ভাঙ্গন এবং শিখদলের অভ্যুত্থান পাঞ্জাবে শিল্পকলার বিকাশ একরূপ রুদ্ধ করে দেয়। আলী হায়দর, ফরীদ ফকীর এবং হাশিম শাহ্ এই তিনজনই এই যুগের উল্লেখযোগ্য কবি। এঁদের মধ্যে হাশিম শাহ্ তাঁর সমসাময়িকদের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। 'শশীপুন্নু' ছাড়াও তাঁর 'দোহরে' অত্যন্ত জনপ্রিয়। দোহরের কবিতাগুলির মধ্যে তিনি শুদ্ধ সূফী কবিরূপে তাঁর অন্তরের মরমী ভাবের গান করেছেন।

শিখ শাসনের প্রথম দিকে দেশ কিছুটা অরাজক অবস্থায় বিরাজ করে এবং হাশিম শাহের পরে মরমী কাব্যের পতন শুরু হয়। ১৮৪৮ সালে ইংরাজ শাসন প্রবর্তনের সময় পাঞ্জাবীরা পাশ্চাত্যের নতুন ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারার সঙ্গে আপনাদের খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করে। সে সময়ে মৌলভী আবদুল্লাহ্ আবদি এবং ফকীর দরজী (একজন 'সৌচিক'), মিয়া আবদুল হাকিম, মিয়া নওরোজ এবং মিয়া বখ্শ নিছক ধর্মীয় ভাবপূর্ণ কাব্য প্রণয়ন করেন।

'যুদ্ধের কবিতা' রচনা হাসিদ শাহ্ অব্বাসিই প্রথম শুরু করেন। তিনি কারাবালার ঘটনা নিয়ে একটি বর্ণনামূলক কাব্য রচনা করেন। 'নাদীর শা'র আক্রমণ সম্বন্ধে নজাবত লেখেন এবং 'পুরাণ ভকত'-এর লেখক কাজীর ইয়ার শিখ আফগান সংঘর্ষ সমূহের কাহিনী নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন।

সত্যিকার পাঞ্জাবী ঐতিহ্য বেঁচে থাকে হিদায়েতুল্লাহ্ এবং স্যার শাহাবুদ্দীনের (তিনি পাঞ্জাবী ভাষায় 'মুসদ্দম-ই-হালী'র অনুবাদ করেন) মতো লেখকদের রচনাবলীর মধ্যে। বর্তমানে বাবু করিম অমৃতসরী, মালিক লালদীন কাইসার, কুনজাহের গুলাম সারওয়ার এবং আরও

অনেকে প্রাচীন ভাবধারার অনুসারী। আর উসদাদ্ দমন, গুজরানওয়ালার ডক্টর ফকির মুহম্মদ, জগুয়া ফজলউদ্দীন এবং সফদর আলী শাহ বহু নতুন ভাবধারার প্রবর্তন করেছেন। এই সকল ভাবধারা পাঞ্জাবী কাব্যের বিষয়বস্তু ও প্রকাশের উন্নতিলাভে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। মওলানা আবদুল মজিদ মালিক এবং সূফী গুলাম মুস্তাফা তাবাস্সুম এই দুজন নেতৃস্থানীয় উর্দু কবি পাঞ্জাবী ভাষায় বহু গজল রচনা করেছেন। নবীন লেখকদের মধ্যে সাজ্জাদ হায়দর নাটক ও ছোটগল্পের জন্য এবং শরীফ কুনজাহি ও আবদুল মজিদ ভট্টি তাঁদের কবিতার গঠনমূলক সামাজিক ভাবধারার জন্য পরিচিত।

সেকালের পাঞ্জাবী সাহিত্যের পরিচয়ই শুধু দেওয়া গেল। আধুনিক সাহিত্যের যাত্রাপথের পাঁচালী নয়।

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

১. বাংলা সাহিত্যের কথা : ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ
২. সাহিত্য ও সংস্কৃতি : ডঃ মহম্মদ আবদুল হাই
৩. ভাষা ও সাহিত্য : ডঃ মহম্মদ আবদুল হাই
৪. মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮) : আনিসুজ্জমান
৫. আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা (১ম খণ্ড) : কাজী আবদুল মান্নান
৬. উনিশ শতকের সাহিত্য পত্র ও বাঙ্‌লা সাহিত্য : কাজী আবদুল মান্নান
৭. উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাঙ্‌লা নাটক : ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম
৮. মুসলমানী বাঙলা সাহিত্য : মঃ ইমামুল হক
৯. ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায় : মুনীর চৌধুরী
১০. বিলুপ্ত হৃদয় : আজহার উদ্দীন খান
১১. বাংলা সাহিত্যে নজরুল : আজহার উদ্দীন খান
১২. পুঁথি-পরিচিতি : আবদুল করিম, সাহিত্যবিশারদ
১৩. আধুনিক কাব্য সংগ্রহ : বাঙ্‌লা একাডেমি (ঢাকা)
১৪. আধুনিক গল্প-সংগ্রহ : বাঙ্‌লা একাডেমি (বর্ধমান হাউস : ঢাকা)
১৫. হারামনি (লোক-সংগীত সংগ্রহ) : আবদুল হাই ও মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সম্পাদিত
১৬. উত্তর বঙ্গের মেয়েলী গীত : অধ্যাপক হাসান হাফিজুর রহমান ও আলমগীর জালিল
১৭. মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতা : আবদুল হাই ও আহম্মদ শরিফ

১৮. 'জেগে আছি': আলাউদ্দিন অল-আজাদ (নতুন সাহিত্য : ঢাকা)
১৯. পূর্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিতা : শক্তি চট্টোপাধ্যায়
২০. জীবন কথা (১ম খণ্ড) : জসীম উদ্দীন
২১. সাহিত্য সম্ভার : কাজী দীন মুহম্মদ
২২. মাহে-নও সংকলন : সম্পাদক : আবদুল কাদির, পাকিস্তান পাবলিকেশনস্ (ঢাকা)
২৩. পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার : সম্পাদক : শেখ মোহম্মদ ইকরাম
২৪. পশ্চিম পাকিস্তানের সাহিত্য : মওলানা মহম্মদ সারওয়ার
২৫. প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান : ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন
২৬. ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস : মহম্মদ আবুল কাশেম
২৭. নদীবক্ষে : কাজী আবদুল ওদুদ
২৮. মহ্ফিল (এ কোয়ার্টার্লি অফ সাউথ-এশিয়ান লিটারেচার : ৩য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা (মিচিগান বিশ্বঃ, আমেরিকা)
২৯. ফাইভ থাউজেণ্ড ইয়ারস্ অব পাকিস্তান : আর. ই. এম. হুইলার
৩০. নবজীবনের গান : আসকর-ইবন-ই-শেখ (বাঙ্লা একাডেমি)
৩১. উপন্যাসের শিল্পরূপ : রণেশ দাশগুপ্ত
৩২. রবি-পরিক্রমা : মুফজ্জল হাইদার চৌধুরী
৩৩. উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস : ডঃ হরেন্দ্র চন্দ্র পাল
৩৪. পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস : ডঃ হরেন্দ্র চন্দ্র পাল
৩৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : মহম্মদ আবদুল হাই ও আলি আহসান সৈয়দ
৩৬. কাব্য-সঞ্চয়—ইকবাল : অনুবাদ—মুনিরুদ্দিন ইউসুফ
৩৭. নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায় : সুফী জুলফিকর হাইদার
৩৮. পূর্ব বাঙলায় পলাশ ফোটার দিন : সম্পাদক : অজয় গুপ্ত
৩৯. ইকবাল : হিজ আর্ট এ্যাণ্ড থট : সৈয়দ আবদুল বাহিদ
৪০. দি পোয়েট অব দি ইস্ট (ইকবালের জীবনী ও রচনা) : আবদুল আনওয়ার বেগ
৪১. ইকবাল : দি পোয়েট এ্যাণ্ড হিজ্ মেসেজ : সৎচিদানন্দ সিংহ
৪২. কালচারেল হেরিটেজ অব পাকিস্তান : এম. এম. ইকরাম ও পারসিভেল স্পীয়ার
৪৩. পোয়েমস অব্ ইকবাল : অনুবাদ—ভি. জি. খিয়েরম্যান
৪৪. গালিব—জীবনী ও ফারসি কবিতা : গিলানী আরিফ
৪৫. প্রেজেন্টিং পাকিস্তানি পোয়েট্রি : জি. এ. আল্লানা
৪৬. বুলবুল এ্যাণ্ড দি রোজ (উর্দু কবিতা সংকলন) : আহম্মদ আলি
৪৭. কনটেম্পোরারী মুস্লিম পাকিস্তান শর্ট স্টোরিস : নাসির আহম্মদ ফারুকী (সম্পাদিত)

পাকিস্তান সাহিত্য

৪৮. ইস্ট পাকিস্তান : এ কালচারেল সার্ভে : মহম্মদ হুসেন
৪৯. আর্ডেন্ট পিলগ্রীম : ইকবাল সিং
৫০. এ হিসট্রি অব উর্দু লিটারেচার : মুহম্মদ সাদিক
৫১. মর্ডান উর্দু ক্রিটিক : মুরতাজা শফি
৫২. কনটেমপোরারী রাইটিংস্ ইন ইস্ট পাকিস্তান (প্রবন্ধ সংকলন) : সারওয়ার মুরসিদ
৫৩. আর্ট ইন উর্দু পোয়েট্রি (প্রবন্ধ) : শাহাবুদ্দিন রহমাতুল্লা
৫৪. পাকিস্তান এ্যানথলজি (গদ্য-পদ্য সংকলন) : সম্পাদক : সৈয়দ সজ্জাদ হোসেন
৫৫. এ ভয়েস ফ্রম দি ইস্ট (ইকবাল কবিতা সংকলন) : সম্পাদক—জুলফিকর আলি খান
৫৬. পাকিস্তান থিন্‌কার্‌স্ ফোরাম (আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মিলনের ধারা বিবরণীর

৫৭. পারসিয়ান পোয়েটস্ অব সিন্ধ : এইচ. টি. সাদারন
৫৮. ক্রাইস্ ইন দি নাইট (পাক-কাব্য সংকলন) : সম্পাদক : সুফী আবদুল কদির নিয়াজ
৫৯. পাকিস্তান কোয়াটারলি (১২শ খণ্ড, ২নং—১৯৬৪)
৬০. দি পাকিস্তান রিভিয়ু (ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০)
৬১. দি সিলেকশন্ ফ্রম পোয়েট্রি অব আফগানস্ : এইচ. জি. র‍্যাভেনটি
৬২. আরবী ছোট গল্প : আলাউদ্দিন অল-আজাদ (সম্পাদিত)
৬৩. টোয়েনটি ইয়ার্স অব পাকিস্তান (১৯৪৭-৬৭) :
৬৪. এশিয়া : এ হ্যাণ্ড বুক : গাই উইণ্ট (সম্পাদিত)

মালয়েশিয়ার সাহিত্য

মালয় ফেডারেশনের সৃষ্টি ১৯৫৭ সালের ৩১শে আগস্ট। মালয়ের সামন্ত নৃপতিবৃন্দ বৃটিশ সরকারের সঙ্গে তখন ক্ষমতা হস্তান্তরে চুক্তিবদ্ধ হন। মালয়েশিয়ার নামকরণ আরো পরে—সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ খৃস্টাব্দে। মালয় ফেডারেশনের সঙ্গে তখন সিঙ্গাপুর, সারাওয়াক ও বৃটিশ উত্তর বোর্নিও (এখনকার নাম সাবা) যুক্ত হয়। সিঙ্গাপুর পরে অবশ্য ফেডারেশন থেকে বেরিয়ে যায়। স্থলভূমি থেকে দক্ষিণ-চীন সাগর বরাবর ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জমুখো দীর্ঘ ঋজু এই এলাকার আয়তন ১,২৮,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটির কিছু বেশী।

এখনকার মালয়েশিয়ার শতকরা ষাট জন লোক চীন বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং বাদ বাকী মাত্র মালয়ী। কাজেই বর্তমান মালয়েশিয়ায় মালয়, চীনা, তামিল, শিখ, মালয়েশিয়ান, ইউরেশিয়ান এবং ইউরোপীয়ান প্রভৃতি জাতির সংমিশ্রণ। চীন ও তামিল ভাষাভাষীরা নিজেদের মাতৃভাষায় কেবল কথা বলে না নিজেদের মধ্যে, কিছু কিছু সাহিত্য রচনাও করে গেছেন। মালয়েশিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মাতৃভাষা বাজার মেলেয়ু ইংরেজীর পরিবর্তে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কার মর্যাদা লাভ করে।

চীন আর তামিলভাষী কিংবা ইংরেজী ভাষী প্রতিটি মালয় অধিবাসীই মালয়েশিয়ার বৃহত্তম পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে কিন্তু দেখে থাকেন। কাজেই আজকের মালয় সাহিত্য বলতে গেলে এই তিন ভাষাভাষীর সাহিত্য প্রচেষ্টার সমন্বয়। এর আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, সব কয়টি না হলেও অধিকাংশ লেখকই এখানকার বয়সে নবীন। গড়পড়তা তাঁদের বয়স পঁচিশ ত্রিশ-এর বেশী নয়। চীনাই হোন আর ভারতীয়ই হোন প্রত্যেকেই কিন্তু দেশমাতৃকার সাহিত্যে ও সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে এক হয়ে গেছেন।

মালয়েশিয়ায় তামিল ভাষাভাষীদের সাহিত্য প্রচেষ্টা খুব বেশি দিনকার নয়। উল্লেখযোগ্য তেমন কোন সৃজনশীল সাহিত্যও সৃষ্ট

হয়নি। উপাখ্যান ছাড়া তেমন কোন মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচিত হয়নি। স্থানীয় সংবাদপত্র আর বেতার মারফতই এই সব রচনা প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়ে থাকে বিশেষ করে গত অর্ধশতকে। বেশীর ভাগ তামিল লেখকই ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য—রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদির অনুকরণে সাহিত্য রচনা করেছেন। নীতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যান, প্রকৃতি বর্ণনা, দক্ষিণ ভারতীয় গার্হস্থ্য জীবন চিত্র—ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার ইত্যাদি বিবিধ সমাজচিত্র এই সকল মালয়েশীয় তামিল সাহিত্যের উপজীব্য। পেরুমল, প'লানিভেঁলু, এ. শন্মুগম, সেতুরমণ, থিরুবরসু প্রমুখ অনেকেই তামিল মালয়ী লেখকদের অন্যতম। পেরুমলের 'অভিযোগ' আর পালানিভেলুর লেখা 'পিঁপিড়ে, মানুষ, প্রকৃতি' ইত্যাদির রচনায় নৈসর্গিক শক্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। এ শন্মুগমের 'পুতুল', হাসান গণির 'চলনাম', কে. পেরুমলের 'ভক্ত' আর 'একটু থেকে তারপর যাও' অথবা টি. এ. শন্মুগমের 'থালিব' প্রভৃতির লেখায় হিন্দুসমাজের বিবিধ দিক তুলে ধরা হয়েছে। পেরুমলের 'কালক্কনকু' (Kalakkanaku)তেও সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রভাব প্রতিপত্তির কথা চিত্রিত হয়েছে দেখা যায়। পেরুমলের 'স্বাধীনতার শুরুতে' আর 'রবার শিল্প', অথবা এম. সেতুরমণের 'নতুন হাওয়া' আর থিরুবরসুর 'আমাদের দেশ' রচনায় মালয়েশিয়ার প্রাক-স্বাধীন ও স্বাধীনতা-উত্তর যুগের দেশের কথা, স্বাধীনতার জন্য আকুলতার কথা—দেশপ্রেমের কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই সকল তামিল কবিতা পাঠ করার চাইতে শুনতেই ভাল লাগে। ছাপার হরফে ঠিক ততটা নয়।

পাশ্চাত্য আঙ্গিকের ছোটগল্প মালয়-তামিল সাহিত্যে একরূপ বিরল বলা যায়। যা আছে তার মূল উদ্দেশ্য হল নীতিকথা ব্যাখ্যান। কাহিনীটি কোথায় শেষ হবে তারও কোন হদিশ নেই। সাদামাটা ভাষায় খানিকটা বর্ণনা করে লেখক তাঁর কর্তব্য সমাধা করেছেন। ছিমছাম চরিত্রসৃষ্টির কোন প্রচেষ্টা নেই। অবশ্য তামিল বেতার নাটক-নাটিকাগুলি এক্ষেত্রে কিছুটা অনন্য। এই নাটক-নাটিকাগুলিতে আর যাই থাক আর নাই থাক ঘরোয়া রসিকতার কিন্তু অভাব নেই। কে. পেরুমল-এর বেতার নাটকগুলি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি মালয় বেতারের সাম্রাক্ষণের কর্মী এবং কর্মজীবনের মাধ্যমে গল্প,

কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, প্রহসন প্রভৃতি বিবিধ রচনার দ্বারা মালয়ী তামিলের কলেবর বৃদ্ধি করেছেন।

অবশ্য একথা ঠিক, পাঞ্জাবী, সিংহলী, হিন্দী ও উর্দুভাষী বহু ভারতীয় মালয়েশিয়ায় বাস করে থাকেন। কিন্তু সকলেই তামিলকে নিজেদের আপন মাতৃভাষা বলে স্বীকার করে নেন—হলেনই বা তিনি দূর সিংহল বা কেরালার বাসিন্দা, কিংবা উত্তর ভারতের কোন মুসলিম অধিবাসী। তামিলই গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে পাঁচমিশেলী এ সকল প্রবাসী ভারতীয়দের 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' হিসেবে কাজ করে আসছে। অরুণাচেলম চেট্টিয়ার গত ত্রিশ দশকে তামিল ভাষায় এক সাহিত্যপত্র প্রকাশিত করেন আপন সম্পাদনায়। অরুণাচেলমের সম্পাদিত পত্রিকা প্রকাশের পর মালয়েশিয়ার তামিল ভাষায় সাহিত্য প্রচার বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জাতীয়তা-বাদের ঢেউ মালয়, সিঙ্গাপুরের উপকূলেও মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে এবং প্রবাসী তামিল ভাষায়ও তাঁর অনুরণন তোলে। মালয়ী তামিল ভাষায় তখন স্থানীয় প্রভাবটা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। মালয়েশিয়ার বিভিন্ন রবার বাগানে যে সকল দক্ষিণ ভারতীয় শ্রমিক কাজ করত তাদের সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগের কথা ফুটে উঠেছে এ সকল রচনায়। আর তাদের এই অভাব-অভিযোগকে বলিষ্ঠ ভাষা দান করে তামিল 'মুরাসু' ও 'তামিল নেশন' সংবাদপত্র। 'তামিল সুধার', 'ইনামনি' প্রভৃতি স্থানীয় তামিল সাময়িকীগুলির দানও উপেক্ষণীয় নয়।

অবশ্য একথা ঠিক, ভাষা উৎকর্ষের দিক থেকে মালয়েশিয়ায় এই তামিল তেমন কোন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে না। মাতৃভাষা তামিলের অগ্রগতি ও সাহিত্য সম্পদের ছাপও পড়েনি তাদের লেখায়। স্থানীয় লেখকদের মধ্যেও তেমন কেউ শিল্প নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখান নি। তবে রেডিও মালয়ের দৌলতে মালয়েশিয়া প্রবাসী বহু ভারতীয়ই তামিল গল্প, নাটক, কবিতা, প্রহসন ইত্যাদি রচনার দ্বারা তামিল সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁদের সৃষ্ট এই তামিল সাহিত্যে স্থানীয় বহু শব্দ এসে পড়েছে। Tamil Engal Uyir (তামিল আমাদের জীবন), তামিল তিরুনাল (তামিল উৎসব) ইত্যাদি মালয়েশীয় তামিল ভাষীদের সাংস্কৃতিক

আন্দোলনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইণ্ডিয়ান স্টাডি চেয়ার স্থাপিত হয়েছে। কুরাল ইয়াঙ্কিয়াম ও ইয়ুথ বেল ক্লাবস্-এর দৌলতে তামিলভাষী তরুণ লেখকদের সাহিত্য প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা হয়।

সুব্বা নারায়ণ, পেরুমল, সেতুরমণ প্রমুখ প্রবীণ লেখকগোষ্ঠীর অনেকে কিন্তু ভারতেই তাঁদের লেখক জীবন শুরু করেন। যদিও মহান সাহিত্য কিছু একটা তাঁরা রচনা করেন নি, তবু তাঁদের লেখা স্বীকৃতির দাবী রাখে। কয়েকজন মালয়ী তামিল কবি ও লেখকদের কিছু পরিচয় দেওয়া গেল :

কে. পেরুমল সাম্প্রতিক মালয়ী তামিল সাহিত্যের অন্যতম সেরা লেখক। গল্প, কবিতা, নাটক ও নাটিকা প্রচুর তিনি লিখে আসছেন। অভিনেতা হিসেবেও তাঁর সুনাম রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের নামক্কলে তাঁর জন্ম। মালয়েশিয়ায় এখন স্থায়ী বাসিন্দা। কলেজীয় উচ্চ শিক্ষালাভ তিনি করেন নি। রবার বাগানে শ্রমিক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু। 'ফ্রি লান্সার' সাংবাদিক হিসেবেও তিনি প্রতিষ্ঠিত। 'মালয় রেডিওর' তামিল বিভাগে পাণ্ডুলিপি লেখকের কাজে এখন রত। তামিল কবিতা ও মালয়ী লোকগীতির 'ভিল্লুপট' অনুবাদ ও চিন্তাশীল নিবন্ধ 'যুরুবাহকথাই' তাঁর নামকরা রচনা। 'অভিযোগ' নাটিকা ও 'নিয়তি' গল্পে তাঁর সৃজনশীল মনের ছাপ রয়েছে।

এন. পালানিভেলুর জন্মও ভারতে। ভারতীয় স্কুলে তাঁর পড়াশোনা। ১৯২৮ সালে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে মালয়ে তাঁর আগমন। কেরানী জীবন, শিক্ষকতা ইত্যাদি নানা বৃত্তির পর তিনি সিঙ্গাপুর রেডিওর তামিল বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। গল্প, কবিতা, নাটিকা ইত্যাদি রচনা করেন বেতার-প্রচার উদ্দেশ্যে। 'কুসুম' নামে তাঁর একটি কবিতাও প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে।

টি. এস. শম্মুগমেরও জন্ম ভারতে এবং মালয়েশিয়া প্রবাসী। বহু ছোট গল্প ও কাহিনী রচনা করে তিনি মালয়ী তামিল সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজেকে। তাঁর 'ইয়ং লিফ এস্প্রাউটিং' গল্পটি তামিল থেকে এস. রামচন্দ্রন অনুবাদ করেছেন টি. উইসনেসান সম্পাদিত 'বাঙ্গা এমাস' সংকলনে। তিনি মালয় রেডিওর তামিল বিভাগে বার্তা সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

বি. এস. নারায়ণ মালয়েশিয়ায় আসেন ১৯২০ সালে। তাঁর জন্মও দক্ষিণ ভারতের ত্রিচি জেলায়। ১৯৪৫ সাল থেকে তিনি সাংবাদিকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং তামিলভাষী পত্রিকার নিয়মিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখতে থাকেন। মালয়ের বেতারে সারাক্ষণের পাণ্ডুলিপির লেখক হিসেবেও তিনি দীর্ঘকাল কাজ করেন। মালয় বেতারে তাঁর বহু নাটিকা, কবিতা ও গল্প প্রচারিত হয়েছে। এস. রামচন্দ্রন-এর সম্পাদিত তাঁর 'লভ্ অব আইস' নাটিকাটিতে বি. এস. নারায়ণের সৃষ্টি প্রতিভার বিশিষ্ট স্বাক্ষর পাওয়া যায়।

সমকালীন মালয় সাহিত্যের নিদর্শন স্বরূপ একটি তামিল-মালয়ী কবিতা এখানে অনূদিত হল :

॥ পিঁপড়ে : মানুষ : প্রকৃতি ॥

আমের একটি শাখা একবার ঝুলে পড়েছিল এক চাষীর পায়ে চলা পথের উপর। ছোট একটি পিঁপড়ে খাবারের খোঁজে বেরিয়েছিল। ডালটার এক প্রান্তে এসে দেখল সে : শ্রান্ত এক চাষী আসছে ওই পথ দিয়ে। ওকে দেখে পিঁপড়েটা একটা নিশ্বাস ফেললে। বললে :

'আহা, সারাদিন ধরে আমি হাঁটছি ত হাঁটছি ; পাগুলি আমার ধরে এল। বাসার এখনও হদিশ নেই, লোকগুলো কেমন বাড়ী ফিরে চলেছে। সাথীদের সঙ্গে মিলন হবে। শকটে করে বাড়ী ফেরে অনেক সময়। আহা, কি মজাই না লাগে তখন।'

এই বলে পিঁপড়েটা তখন করল কি, চাষীটির মাথার উপর এক সময় টুক করে নেমে পড়ল। চাষীটি টেরও পেল না। পিঁপড়েটা তখন মাথার এপাশ ওপাশ ঘোরাঘুরি করতে করতে ভাবতে বসল আপন মনে :

'আঃ, মানুষ হল এখন আমার শকট। মানুষের মাথায় আমি চড়ে বেড়াচ্ছি। কাজেই আমি হলাম ওর চাইতে শক্তিমান। ঠিক কথা, বিজ্ঞ লোকের বিদ্যা নিয়ে আমরা শাসন করি। হলাম না হয় আমি আকারে ক্ষুদ্র, জ্ঞান গরিমায় আমি কিন্তু খাটো না। এই যেমন আমি এক মানুষের মাথায় চড়ে চলেছি, আমার তুলনায় সে হল পর্বতের সমান। সেই মানুষই কিনা আজ ক্ষুদ্র এক পিপীলিকার ক্রীতদাস।'

এই বলে পিঁপড়েটি তখন করল কি, চাষীটির মাথায় দিল হুল

ফুটিয়ে। উঃ বলে কৃষাণটি তখন পিঁপড়াটাকে মুঠোয় নিয়ে মেরে ফেললে পিষে।

[এন. পালানিভেলু; ইংরেজী অনু: এস. সিঙ্গরা ভেলু]

আধুনিক সাহিত্য

ইউরোপ বা আমেরিকার মাপকাঠিতে লেখা আধুনিক সাহিত্যের প্রচলন ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বেশী দিনকার নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বরং বলা যায়। ডাসদের শিক্ষাদীক্ষায় শিক্ষিত ইন্দোনেশীয় লেখকেরা বিশ দশকে প্রথম উপন্যাস রচনা করেন ('আজব দান সংসার') 'বালয় পুস্তক সংস্থা'র দৌলতে। 'আজব দান সংসারকে' মালয়ী উপন্যাসের জনক বলা যায়। আধুনিক কবিতার প্রচলন করেন মহম্মদ যা মন 'জং সুমাত্রা' পত্রিকায়। এ কবিতাকে মালয় ভাষায় বলা হয় 'সাজক'। প্রচলিত চার-পংক্তির 'পানতুন' কাব্যরীতির ব্যতিক্রম।

মালয়ে অবশ্য এই আধুনিক সাহিত্যের ঢেউ এসে পড়ে আরও পরে। মালয়ের লেখকেরা 'পানতুন', 'জায়ের' (S'jair), 'সেলোকা', 'গুরিং দাম' ইত্যাদি ছন্দের মামুলি ধারার লোকগাথা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে প্রগতিশীল ইন্দোনেশীয় লেখকদের অনুপ্রেরণায়। প্রকৃত উপন্যাসের সূচনা করেন সৈয়দ শেখ অল্ হাদির 'হিকায়ৎ ফরিদ হান্নুন' ও আহম্মদ বিন মোহম্মদ রসিদ 'কওয়ান বেনার'। সৈয়দ শেখ অল্ হাদির উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে আর 'কওয়ান বেনার' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। মনসুরী এস. এন.-এর 'আওয়ান পুতে' পানতুন ছন্দে রচিত হলেও তা সমকালীন সাহিত্য-স্বীকৃতি লাভ করে। যুদ্ধপূর্ব মালয় উপন্যাসগুলিতে প্রায় পানতুন শ্লোকের উপস্থিতি লক্ষ্য করবার। ইন্দোনেশীয় লেখক আরমিন পানির 'বেলেনগু' (শৃঙ্খলিত), মোইস-এর 'সালে আজুহান' (ভুল প্রতিপালন), আলি যবনের 'লাজর টেরকেমব্যাং' (পালতোলা জাহাজ) কিংবা মারহ্ রাসলির 'সিত্তি নুরবাজা' (নারী মুক্তি) প্রভৃতি গ্রন্থ আধুনিক মালয় উপন্যাসের পথপ্রদর্শক বলা যায় এক কথায়।

পাশ্চাত্য আঙ্গিকের ছোটগল্পও উনিশ শ' পঞ্চাশের আগে মালেয়,

তামিল বা মালয়ী চীন ভাষায় লেখা হয়নি। তবে ইতিমধ্যে তারা ইন্দোনেশীয় ভাষায় প্রচলিত হয়ে গেছে। এই ব্যাপারে জাতীয়তাবাদী ইন্দোনেশীয় যুব কংগ্রেস ও বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টা মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির এ পুনরুজ্জীবনে সাড়া জাগায়। জাপানী সামরিক অধিকারের সময় মাতৃভাষা মালেয়ু স্বীকৃতিলাভও করে। মালয় ও সিঙ্গাপুরের অধিকাংশ লেখক ও বুদ্ধিজীবী যাঁরা এতকাল ইংরেজীতে লিখতেন, তাঁরা এবার মালয় ভাষায় লিখতে শুরু করেন। এবং 'বাজার মেলেয়ু' লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা বা জাতীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করে।

এই স্বীকৃতি মালয়ী লেখকদের মাতৃভাষায় নতুন নতুন রচনা সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানে সামরিক শাসন খুব বেশি দিন ছিল না। তবু এ স্বল্প কালের মধ্যে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নগ্ন রূপ প্রকট হয়ে উঠে। ইন্দোনেশীয় কবি ও লেখক কায়রিল আনোয়ার, বিভাই আপিন, আসরুল সানি, সিতু মোরাং, উতি. টি. সন্তনি প্রমুখ বিভিন্ন কবি, লেখক ও নাট্যকারদের অনুপ্রেরণায় মালয়েশীয় কবি মাসুরী ও টংকাত ওয়ারন প্রমুখ কবিরা পুরাতন রচনা-রীতি ছেড়ে স্বাধীন ইন্দোনেশীয় লেখকদের অনুসরণে ব্রতী হন নতুন সাহিত্য রচনায়। কবি মাসুরীর 'আওয়ান পুতে', টংকাত ওয়ারনের 'জেলুম বং' প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পুইসি মেলয়ু বারু (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) এবং সাজক মেলয়ু বারু (১৯৪৬-১৯৬১)—আধুনিক মালয় কবিতা গ্রন্থে এই প্রচেষ্টার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। যুদ্ধোত্তর মালয় সাহিত্যে নতুন ভাবধারায় গল্প সৃষ্টির কবিতা, নাটক ও উপন্যাসের বান ডাকে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়—বিশেষ করে সংবাদপত্রে এই সকল রচনা প্রকাশিত হত। সহজ অনাড়ম্বর এই কাব্য প্রচেষ্টা জাতীয় উন্মেষের সহায়তা করে অনেকখানি। কেবল ইন্দোনেশীয় নতুন সাহিত্যের অনুকরণ নয়, পাশ্চাত্য ও মার্কিন কবি ও লেখকদের রচনার সার্থক অনুবাদের কাজও চলতে থাকে সমানে। ইন্দোনেশিয়ায় জাত ডাচ কবি হ্যা পেরন কিংবা টি. এস. ইলিয়টও বাদ যাননি। গল্পে মোঁপাশা ও এণ্টন চোকভের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কেরিস মাস তাঁর 'পাতে তুম্ব' প্রভৃতি গল্পে কিংবা রুগলি তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'এনক দান কেমানে-কন' প্রভৃতি রচনায় সমাজ সংস্কারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার কষ্টিপাথরে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের পরিবর্তনের ধারা রূপায়িত করার চেষ্টা করেন তিনি আপন লেখনীতে।

উতাই টি. সন্তনির নাটক 'আওয়াল দান মিরা' স্বাধীনতা-উত্তর ইন্দোনেশীয় সরকারী গলদের মুখোশ খসিয়ে দেয়। মোচতার লুবিস তাঁর উপন্যাস 'তিদক আদ, ইসক'-এ (আগামী কাল নয়) জাকার্তার সমকালীন ইন্দোনেশীয় জীবন ধারার নগ্নরূপ তুলে ধরেন। তিনি তাঁর এ উপন্যাসে একটির পর একটি নানা গল্পের সাহায্যে ঔপন্যাসিক ঘটনা পরম্পরার ধারা অব্যাহত রেখেছেন। প্রমুদ্য অনন্ত তুর 'পরিবার' কিংবা তাঁর দীর্ঘ উপন্যাস 'বিকলাঙ্গ যারা' এবং ইদ্রুস, অচ্ছদিয়াৎ, কে, মহাজা-এর 'এথিস্' প্রভৃতি ইন্দোনেশীয় উপন্যাসের প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রতিবেশী মালয় লেখকদের উপর দেখা যায়। মালয়ী ঔপন্যাসিক আহমদ লুতফি, ইশাক বিন হাজি মহম্মদ এবং হারুণ বিন মহম্মদ আমিন প্রমুখ অনেকেই ইন্দোনেশীয় ঔপন্যাসিকদের অনুসরণে লিখতে শুরু করলেও আঙ্গিকের দিক থেকে তাঁদের লেখা উপন্যাস-সংজ্ঞা লাভ করেছে কিনা ঠিক বলা যায় না। উপন্যাসের বৃহৎ কলেবরও লাভ করেনি তাদের অনেকে। আহমদ লুতফির কাহিনীগুলি অনেকটা পর্ণগ্রাফি ঘেঁষা শয়নকক্ষের কেচ্ছা কাহিনীতে পর্যবসিত। অবশ্য, তাঁর 'বেঙ্কাই বান্নিয়াওয়া' ও 'সিসা মেরাকা তুনিয়া' প্রভৃতি উপন্যাসে জাপ অধিকৃত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানী নির্যাতন ও নিপীড়নের নিষ্ঠুর কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে—বিশেষ করে যুদ্ধবন্দী ও শ্রমিকদের উপর জাপানীদের অকথ্য অত্যাচারের কথা। ইশাক তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাস 'পুতেরা গুনং তাহান' ও 'এনাক মাত লেঙ্গা গিলা' প্রভৃতিতে ব্রিটিশ শাসকপুষ্ট মালয়েশিয়ার অভিজাত ও আমলাতান্ত্রিক সমাজের রূপটি প্রতিফলিত করেছেন কটুর ব্যঙ্গ পরিহাসের মারফত। অবশ্য, তিনি তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'যুডি কারেন', 'বুদক বেচা' ও 'পৈনগানতিন বারু'তে সামাজিক বিপ্লবের জিগির তুলেছেন। হারুণ বিন মহম্মদ আমিনের দ্বাদশ গল্পের সংকলন 'চেরিতা পেনডেক' আধুনিক বহু মালয় গল্প সংকলনের পথিকৃৎ বলা যায়। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'পাঙ্গলিমা আওয়াং' এ্যানরিক মাগেলানের প্রথম বিশ্বপরিক্রমার পটভূমিকায় রচিত। ইশাক বিন হাজি মহম্মদ ও আহম্মদ লুতফি যদিও সমাজ সচেতন

রাজনৈতিক পটভূমিকায় প্রচারমূলক একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, তবুও কিন্তু তাঁদের লেখা অন্তঃসারশূন্য রাজনৈতিক কচকচানিতে পর্যবসিত। মালয়ী উপন্যাসের অগ্রগতির পথ হয়েছে তাতে ব্যাহত।

বর্তমান রাষ্ট্রীয় ও ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া আজ দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ভাষা ও সংস্কৃতি এ দুই দেশের মধ্যে অনেকখানি বিদ্যমান। মালয়েশিয়ার প্রাচীন সাহিত্য ও ইন্দোনেশীয় পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে—একই বলা যায়। সুতরাং সমকালীন মালয়-সাহিত্যকেও আধুনিক ইন্দোনেশীয় সাহিত্যের ধাঁচে ঢালাই করাই বিধেয়। [T. Wignesan তাঁর সম্পাদিত Bunga Emas গ্রন্থে এই মত পোষণ করেছেন।]

ছোট গল্প

ছোটগল্প মালয়-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইংরেজীতে এই ছোটগল্প ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি কাল থেকে লেখা শুরু হয়। ইউরোপীয় ও মার্কিন সাহিত্যই মালয়েশিয়ার এই সকল কথা-সাহিত্যিকদের গল্প রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। স্থানীয় আচার ব্যবহার ও জীবনধারা প্রতিফলিত করেছিল তাঁদের ঐ সকল গল্প কাহিনীতে। এই লেখকদের সকলে প্রায় ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত। ইংরেজী পড়ুয়াদের জন্যই বিশেষ করে এঁরা লেখনী ধারণ করেছেন। মুষ্টিমেয় এই সকল পাঠকেরাই ছিল এঁদের সমর্থক। কারণ, কোন সংবাদ প্রতিষ্ঠান বা বড় পুস্তক প্রকাশনের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে তাঁরা ছিলেন বঞ্চিত। এমন কি, কোন সাহিত্যপত্রও সে সময় প্রকাশিত হয়নি। বাধ্য হয়ে এই সকল লেখকদের তখন বিদেশী পত্র-পত্রিকায় নিজেদের রচনা প্রকাশের জন্য ধরণা দিতে হত। ফলে একটা লাভ হল যে, মালয়েশিয়ার ছোটগল্প সুলভ প্রচারের অভাবে আপন বৈশিষ্ট্য হারাতে পারেনি।

ইংরেজীতে মালয় ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে এস. রাজরত্নম, লি কক লিয়াং, আওয়াং কেতুয়া প্রমুখ কথাশিল্পীরা প্রসিদ্ধ। রাজরত্নম সিংহলে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর ছোটবেলা থেকে তিনি মালয়ের বাসিন্দা। ইংলণ্ডে উচ্চশিক্ষার জন্য ছিলেন দীর্ঘকাল। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি

সিঙ্গাপুরে পি. এ. পি. সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ফলে লেখনী তাঁর আজ স্তব্ধ। তবু তিনি সার্থক কথাশিল্পী হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর 'ফেমিন', 'দি লোকাষ্ট', 'হোয়াট হ্যাজ টু বি ডান' প্রভৃতি কাহিনীগুলি তার প্রমাণ। প্রবীণদের মধ্যে লি কক লিয়াংই এখন পর্যন্ত সাহিত্যসৃষ্টির ধারা অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর গল্পসংগ্রহ 'মিউটস ইন দি সান এ্যাণ্ড আদার ষ্টোরিস' ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। এর অনেকগুলি কাহিনী বিশেষ করে 'বার্থডে', 'আমি তোফু' ও 'রিটার্ন টু মালয়' (প্রবন্ধ) ইত্যাদি রচনা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। 'এনকাউন্টার', 'চান্স', 'প্রেজেণ্ট ওপিনিয়ন', 'মাম' ইত্যাদি কাগজে তাঁর ছোটগল্প স্থান লাভ করেছে। 'মাম' পত্রিকার তিনি সম্পাদকও ছিলেন।

মালয়েশিয়ার এই সকল আধুনিক লেখক পাশ্চাত্য রীতি ও আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের সাহিত্যকর্মে। তাঁদের সাহিত্য সাধনার অধিক কালও কেটেছে বিদেশে বিদেশে। রাজরত্নমের কেটেছে যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডে। ব্যারিষ্টার লি কক লিয়াং-এর কেটেছে অস্ট্রেলিয়ায়। আর ওয়াং কেন্থুয়ার জাতীয়তাবাদী চীন ও বিদেশের নানা স্থানে। এস. রাজরত্নমই প্রথম ইংরেজী ছোটগল্পের অঙ্গসৌষ্ঠব মালয়েশিয়ায় প্রবর্তন করেন। দেশের গরীব, অনুন্নত ও পদদলিত সম্প্রদায়ের মৌন ভাষা মুখর হয়ে উঠেছে তাঁর সৃষ্টিতে। সাধারণ মানুষের এই হাসিকান্নার কথা মানবিকতার কষ্টিপাথরে তিনি প্রতিফলিত করেছেন—সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা নিয়েছেন। এ জন্য তিনি প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করতেও দ্বিধা করেন নি। তিনি তাঁর 'ধর্ম' গল্পে ধর্মভীরু সাধারণ মানুষের প্রতি ধর্ম-সংস্কারকের অবিচারের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। 'দুর্ভিক্ষ' কিংবা 'কেবল তারাদের জন্য' কাহিনী নীচের তলার গরীব মানুষদের উপজীব্য করে রচিত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট মালয়ের জাতীয় উন্মেষের জন্যও তিনি লেখনী ধারণ করেন। তাঁর এই সকল গল্পকাহিনী কেবল অনুন্নত দেশ মালয়েশিয়ায় নয়, ভারতের জনগণের মনে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। 'পঙ্গপাল', 'কী করা হবে' প্রভৃতি গল্প এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রাজরত্নমের রাজনীতি ও সমাজসচেতন সাহিত্যবোধের সার্থক উত্তর-সাধক বাস্তববাদী লি কক লিয়াং।

এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে শক্তিধর এই গল্প লেখক উচ্চশিক্ষার্থে অস্ট্রেলিয়া চলে যান। মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে তিনি প্রথম গল্প লিখতে শুরু করেন এবং ছোটগল্পের টেকনিকটি আয়ত্ত করেন। রাজরত্নমের মত তিনিও সমাজের নীচের তলার লোক—পঙ্গু, অক্ষম, বুদ্ধিহীন, অসুস্থ, অবহেলিতদের নিয়ে কাহিনী ফেঁদেছেন। এই ক্ষেত্রে তিনি কেবল বাস্তবপন্থী নন, আশাবাদীও। 'জন্মদিন', 'একটি বালিকা মাত্র,' 'আমি টুকু' প্রভৃতি গল্পে এই স্বাক্ষর রয়েছে। কাশিম আহমেদ-এর ছোটগল্পেও বিশেষ করে এই রাজনৈতিক চেতনার সন্ধান পাওয়া যায়। 'একটি সাধারণ গল্পে' এই সম্ভাবনার প্রভূত স্বাক্ষর রয়েছে।

অবশ্য একথা ঠিক যে, আধুনিক মালয়েশিয়ার অধিকাংশ কথাশিল্পী বিত্তশালী মধ্যবিত্ত সুখী পরিবার থেকে এসেছেন। এবং সমাজের নীচের তলার লোকদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক অনেকটা পুঁথিগত। নাড়ীর সম্পর্ক তেমন নেই। ওয়াং কেতুয়াও এমনি এক শক্তিধর লেখক, যদিও তাঁর অধিকাংশ গল্পে ফ্রয়েডীয় যৌন বিশ্লেষণের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি নরনারী চরিত্র চিত্রণে তাদের পূর্বসংস্কার, নৈতিক নিয়মকানুন ও যৌনবোধের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। নতুন সমাজগঠনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। অধিকাংশ চরিত্রই তাঁর বারবনিতা, পতিতা, 'দেবদাসী' আর কুমারী মাতা বা কন্যাদের নিয়ে রচিত। 'কোন সিঁড়ির নীচে মক্ষিরাণী', 'একটি নতুন অনুভূতি' প্রভৃতি গল্পকাহিনীতে তাঁর সমাজ সচেতন নতুন সাহিত্য সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। মালয়েশিয়ার বাসিন্দা ইন্দোনেশীয় লেখক ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীরই ছদ্মনাম হলো ওয়াং কেতুয়া। ওয়াং কেতুয়ার মত আর একজন প্রসিদ্ধ গল্প লেখক হলেন উই বুম সেঙ। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে কুয়ালালামপুরে তাঁর জন্ম। সিঙ্গাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাশাস্ত্রের স্নাতক তিনি। মালয়-বেতারে নিয়মিত লেখকও। 'অড্ অবসেশন' গল্পে তিনিও ওয়াং কেতুয়ার অনুসৃত গল্পশৈলির পথ বেছে নিয়েছেন।

রাজরত্নম, লি কক লিয়াং বা ওয়াং কেতুয়ার অনুকরণে নতুন একদল গল্প লেখক-লেখিকারও আবির্ভাব ঘটে। স্থানীয় স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনে কিংবা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় এঁরা গল্পলেখায় হাত মক্স করেন।

এঁদের অধিকাংশ হল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক বা অধ্যাপক কিংবা সাংবাদিক। তরুণ এ সকল গল্প লেখকের মধ্যে লিম থিএন সু, তান হক সেনঙ্, লয়েড ফার্ণাণ্ডো, ব্যাদা লিম, সো ইং লিম, বালাম সুব্রাম, গো সু তিয়ান, পেট্রিক ইং কা ওন্ন ও গ্যারী ইয়াং বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের অনেকেই অন্তত একটি না একটি রসোত্তীর্ণ রচনা সৃষ্টি করার দাবী রাখেন।

অবশ্য এঁদের মধ্যে লিম থিএন সু, সো ইং লিম, পেট্রিক ইং কা ওন্ন ও গ্যারী ইয়াং ইতিমধ্যেই স্বীকৃতি লাভ করেছেন গল্প লেখক হিসেবে। গ্যারী ইয়াংএর রচনা যদিও পরিণতি লাভ করেনি তবুও তাঁর সৃষ্টিশীল লেখনীর বিরাম নেই। অতি সাধারণ ছোটখাট বিষয় নিয়ে তিনি গল্প ফাঁদতে পটু। তান হক সেনঙ্, লয়েড ফার্ণাণ্ডো বা কাসিম আহমেদ কেবল গল্প বলার জন্য গল্প লেখেন না বরং তাঁরা নিজস্ব মতবাদ প্রচারের জন্য গল্পের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। ফার্ণাণ্ডোর 'পেইড্ ইন ফুল' আর 'দি রিটার্ণ' এখানে স্মরণীয়। তিনি তাঁর প্রায় প্রতিটি গল্পের শেষে চমক বা সারপ্রাইজের আশ্রয় নেন (Twixt cup and the Lip)। এই গল্পে তিনি মালয়ের অসাম্প্রদায়িক বিবাহকে কেন্দ্র করে যে সমস্যা আজকের সমাজে দেখা দিয়েছে তাকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তান হক সেনঙ্ লয়েড ফার্ণাণ্ডোর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন গল্প লেখায়। তবে তিনি ফার্ণাণ্ডোর চাইতে শক্তিধর। এখনও তিনি গল্পে ঝানু সম্পাদকের মত টীকা-টিপ্পনী প্রয়োগ করতে ছাড়েন না।

তরুণ লেখকদের মধ্যে ব্যাদা লিমের 'স্ট্রেট অব এ্যাফের্য়াস', প্যাট্রিক ইং-এর 'ইন্টারভিউ', বালান সুব্রমের 'স্যাটারডে নাইট' প্রভৃতি গল্পে মার্কিন সাহিত্যের প্রত্যক্ষ ছাপ রয়েছে, বিশেষ করে 'অ্যাফি'-এ হেমিংওয়ের বিখ্যাত কাহিনী 'ওল্ড ম্যান এ্যাণ্ড দি সী'র প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করবার।

আধুনিক মালয়েশিয়ার কথাসাহিত্যের আলোচনা অসমাপ্ত হয়ে থাকবে যদি না আর একজন শক্তিশালী কথাশিল্পী ও কবির উল্লেখ না করা হয় এখানে। তিনি হলেন টি. উইগনেশান। মালয়ের কুয়ালা-ক্রাইয়ে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার কোন ছাপ তাঁর নেই। কিন্তু আধুনিক মালয়-সাহিত্যে তাঁর স্থান প্রথম সারিতে। 'ওয়ান মোর ওয়ার', 'দি অল্টার ক্লথ এ্যাণ্ড দি পোপ' এবং 'দি বগি ইন

দি টলটি অব দি লঙ নেম' প্রভৃতি গল্পে তিনি তাঁর স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'ট্রাকস অব্ এ ট্রাম্প' শিরোনামায় তিনি তাঁর কবিতার একটি সংকলনও প্রকাশিত করেছেন। কিন্তু তাঁর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান হল 'বাঙ্গাইমাস' (সোনালী ফুল)। ১৯৩০ থেকে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সমকালীন মালয়েশীয় গল্প কবিতা ও নাটকের এ সংকলনটি প্রকাশিত করেন তিনি, সম্পাদিত করে—Rayrath (Raybooks) Publications, Malaysia।

চীনা লেখক

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানী সমরশক্তির পরাভবের পর থেকে মালয় প্রবাসী চীনারা মালয়কে স্বদেশভূমি বলে ভাবতে শুরু করেন। এর কারণও ছিল। চীন ভূখণ্ডে জাতীয়তাবাদী কুয়োমিণ্টাং সরকারের তখন পতন ঘটেছে। জেনারেলিসিমো চিয়াং-কাইশেক তখন মহাচীন থেকে বিতাড়িত। আশ্রয় নিয়েছেন তাইওয়ান দ্বীপে। মহাচীনের বুকে উদয় হয়েছে তখন রক্ত তারকা। কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ প্রবাসী এই সকল চীনা বাসিন্দারা মালয়কে তাদের মাতৃভূমি বানিয়ে তুলে। এবং স্থানীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠে কালক্রমে। তাদের সন্তান-সন্ততিরাও এই চৈনিক শিক্ষাদীক্ষায় ক্রমশঃ দীক্ষিত হয়ে উঠে। ক্লাশিক্যাল চীনের আঙ্গিকে মালয় প্রবাসী চীনারা তখন এক সাহিত্য গড়ে তুলে। বিপ্লবোত্তর চীনের নতুন সাহিত্যের ঢেউ মালয়েশিয়ার উপকূলেও এসে পড়ে। তবে এই নতুন সাহিত্যের মধ্যে রস-সৃষ্টি খুব একটা থাকুক বা না থাকুক রাজনৈতিক কচকচানির অভাব ছিল না।

তবে ব্যতিক্রম যে নেই এমন নয়। য়ু ইঙ্ বা চ্যাং শু-সেং প্রমুখ কথাসাহিত্যিকরা কিছুটা ছিলেন স্বতন্ত্র য়ু ইঙ-এর লেখা 'খনি মজুর' উল্লেখযোগ্য। এ গল্পে তিনি দু'জন খনিমজুরের কর্মজীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা বর্ণিত করেছেন। এক শ্রমিক অত্যাচারী ফোরম্যানের বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্য ছাঁটাই হয়। অপর জন তখন মুখ বুঁজে সব অত্যাচার সহ্য করে যেত। তবুও কিন্তু তার জবাব হল। কেননা, টিনের দাম মন্দা পড়ল বাজারে।

সুলেখক চ্যাং শু সেঙ তাঁর গল্প 'কাঁচির শব্দে' এক চীনা উদ্বাস্তু বালিকার আলেখ্য তুলে ধরেছেন। ক্যান্টনের বোমাবর্ষণে বালিকাটির পরিবারস্থ সকলে নিহত হয়। মেয়েটি কোন রকমে প্রাণ নিয়ে মালয়ে পালিয়ে আসে। এক রবার কারখানায় সে কাজ নেয়। তাকে নিয়ে কারখানার মধ্যে কানাঘুষা, হাসি-টিটকারির অভাব নেই। তবু কিন্তু সে কাজ করে যেতে লাগল মুখ বুঁজে। তাকে খেটেই খেতে হবে। কিন্তু একদিন সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল। তবু তার মনে আশঙ্কা সদাসর্বদা উঁকি মারতে লাগল—চাকরীটা তার বজায় থাকবে তো? এ দুই গল্পে পল্লীজীবনের সাধারণ মানুষ কী করে ধীরে ধীরে কলকারখানার রসদে পরিণত হচ্ছে তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন সমাজ সচেতন লেখক।

উই ই উন (Wei Yun)-এর আগেকার গল্পেও এমনি ধারা স্বাদ মেলে। 'লিটল ডেভিল সান সেন' গল্পে একটি ক্ষুদ্র বালকের দেশাত্মবোধ ও উপেক্ষার কথা বিবৃত হয়েছে। গরীবের ছেলে—বইপত্র কেনবার সামর্থ্য নেই, মাইনে দেবার মত অর্থও নেই। কিন্তু স্বাধীনতা তহবিলে চাঁদার খাতায় তাকেও চাঁদা দিতে হবে আর সব বড়লোক ছেলেদের মত। চাল নেই, চুলো নেই—সে অত টাকা পাবে কোথা থেকে? কিন্তু চাঁদা নিয়ে না গেলে নয়। সহপাঠীদের হাসি মস্করা, শিক্ষকের তিরস্কার গঞ্জনা কপালে জুটবে। তাই ছোট ছেলেটা করল কি, নিজে না খেয়ে বাবার কাছ থেকে চাঁদার টাকাটা চেয়ে নিল এবং তাই জমা দিল চাঁদার খাতায়। কিন্তু সহপাঠীরা পরস্পর পরস্পরের দিকে মুখ টিপে হাসতে লাগল। ভাবখানা গরীবের ছেলে. ও আবার টাকা পেল কোথায়। তাদের মত জাতীয় তহবিলে দান করবার মত অর্থ? নিশ্চয় চুরি করেছে কারো কাছ থেকে। ছেলের দল শিক্ষকের কাছে নালিশ করল ওর বিরুদ্ধে। ওরা বলল: ও নিশ্চয় কারো পকেট কেটেছে।

তাই শুনে শিক্ষকমশাই ওকে শাস্তি দিলেন নিষ্ঠুর হস্তে। মুখ বুঁজে সব সহ্য করল ছেলেটা। প্রতিবাদ সে করেনি। সে জানে, দেশের জন্য তার এই নির্যাতন ব্যর্থ হবার নয়। এমনি ধারা অতি সাধারণ কাহিনীর মধ্য দিয়ে উই ই উন প্রবাসী বহু চীনা পাঠকের হৃদয় জয় করেছেন। ১৯৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তাঁর একখানি উপন্যাস, একটি উপন্যাসিকা ও তিনটি গল্প-সংগ্রহ প্রকাশিত হয় দীর্ঘকাল পর।

উই ই উনের মত মিয়াও সিউও মালয়েশিয়ার আর একজন প্রথিতযশা কথাশিল্পী। শৈশবে তিনি মালয়ে এসেছিলেন এবং মাতৃভাষা চীনার পরিবর্তে ইংরেজীতে শিক্ষালাভ করেন। চীনা ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনে রত হন পরে। কাজেই উই ই উনের মত ভাষাসৌষ্ঠব তাঁর লেখায় নেই। তবে মিয়াও সিউ-এর গল্পগুলি আরও সজীব। আরও জীবন্ত। চরিত্রগুলি সাড়া জাগায় মনের পর্দায়। জাপ-অধিকৃত মালয়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় তাঁর বহু রচনা আধুনিক মালয়-সাহিত্যের সম্পদ। বিশেষ করে তাঁর 'হ্যাণ্ড আউট দি রেড' গল্পটি উল্লেখযোগ্য।

মালয়েশিয়ায় আধুনিক চীনা কাব্যের খুব একটা প্রসার ঘটেনি। এ যুগে স্মরণীয় কবিদের মধ্যে উই পেই হুয়া সবিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি হলেন ইন্দোনেশীয় চীনা। স্থানে স্থানে তাঁর কবিতা কষ্টপ্রদ হলেও কোথাও মৌলিকতার অভাব দেখা যায় না এবং বিপ্লবী চেতনা ও জীবনবেদের স্বাদ পাওয়া যায় তাঁর আশাবাদী বহু কবিতায়। চ্যাঙ্গ চি তু-এর কবিতা মূলত লিরিক ধর্মী। তাঁর ছোট ছোট কবিতাগুলি, বিশেষ করে 'কুসুমিত রবার বৃক্ষে'র অন্তর্ভুক্ত কোন কোন কবিতায় ভাবালুতার প্রাধান্য দেখা যায়। চি উ শী উ কবি হিসেবে খুব একটা প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে না পারলেও প্রতিশ্রুতির অভাব নেই। 'I do not sing' (আমি গান করি না) কবিতাটি 'বাঙ্গা ইমাস' সংকলনে সংকলিত হয়েছে। এখানে কবিতাটির বাংলা অনুবাদ দেওয়া গেল :

॥ আমি গান গাই না ॥

রাতের গভীর অন্ধকারে
আমি গাই না গান ভালোবাসার।
আমি গাই না কো গান ভালোবাসার।
গান গাই না চিত্তকে করতে তুষ্ট।
এখন আর গাই না গান
যদিও গানের পরে গান গেয়েছি আমি কত।
হৃদয়হীন বলে ডাকতে নাকো আমায়
আমায় যদি তুমি জানতে।

আমি যারে বাসি ভালো
সে যেন মানুষকেই বাসে ভালো একান্ত নিবিড়।
বাস আমাদের যুদ্ধমান যুগে
জীবনের চেয়ে সময়কে দিই আমি মহামূল্য।
দিই সোনার চাইতে।
প্রেম হোল সুশীতল নির্ঝর
আর লড়াই হোল আকাশের বুকে
গলিত লাভার লেলিহান জিভা।
প্রেমের গান গাই না আমি আর
গাছের আগডালে প্রভাতের সূর্য যখন
চূর্ণ হয়ে পড়ে,
সোনালি আলো যখন ছুঁয়ে যায় আমার
মুখ, চোখ
আমার গান তখন অশেষ, অবিরাম,
অফুরন্ত।
আজ রাতে চল মোরা গান গাই
যুদ্ধের গান।

—চিয়েন সি
[ইং অনুঃ ওয়াং গুং য়ু]

অবশ্য, এ ছাড়া বহু তরুণ কবির নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সাহিত্য সাধনার চাইতে রাজনৈতিক প্রচার হল তাঁদের মূল উৎস। কিন্তু ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তা নয়। মালয়ে চীনা ছোটগল্প সত্যই অত্যন্ত জনপ্রিয়। অধিকাংশ এই গল্প-লেখক বয়সে নবীন। এঁদের মধ্যে ইউ মো-উয়ো, সিয়ে কো, ইউন লি ফেঙ, মা-এ্যাঙ, চেং ইয়েন হলেন বিশেষ শক্তিশালী কথাশিল্পী। ইউ মো-উয়োর 'সুতো' এবং 'বীজ ধান' ও 'আধুনিক পন্থা' গল্প সঙ্কলন এবং সিয়ে কো-র 'পরবর্তী বংশধরদের জন্য', 'অবরুদ্ধ নগরী', 'সিঙ্গাপুরের দৃশ্যাবলী' আর 'ফিরে আসা ছাত্র' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলি পাঠকবর্গের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। ইউন লি ফেঙ-এর 'কৃষ্ণ জেল ফটক' ও 'বহিঃপ্রকাশ' আর তিয়াও

উয়েন-মেই-এর 'খুদে শয়তানের ক্রমপঞ্জী', 'ক্ষয়' কাহিনীগুলিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। চেং ইয়েন ও মা এ্যাঙ বয়সে তরুণ। তাঁদের লেখা 'পথের শেষ' ও 'ঠাকুর্দার কাহিনী' ও 'নদীর ধারে প্রেমের সঙ্গী' চীনা মালয়ী গল্পের সম্পদ বলা যায়।

হো চিন ও সুঙ ইয়া ইতিমধ্যে তরুণ ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। হো চিনের 'এটপ হাট' (কুঁড়ের চালের উপর) ও সুঙ ইয়ার 'সবুজ লতা'—দুই তরুণ লেখকের রচনা। 'প্রেম সমুদ্র' ও 'অরণ্য মহাসাগর'-এর লেখক চাউ যুঙ আর 'প্রথম ওড়ার' লেখক তু হুনও সমান প্রতিষ্ঠার দাবী রাখেন।

অতি হালের চীনা তরুণ কবিদের মধ্যে ইয়েন তুঙ ও ইউয়ান তিয়েন-এর নামও এ প্রসঙ্গে করতে হয়। ইয়েন তুঙ-এর লেখা 'ক্রীতদাসের স্বপ্ন' ও ইউয়ান তিয়েনের 'বসন্তের অশ্রু' কবিতাগ্রন্থ মালয়েশিয়া সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

নাটক সম্পর্কে লিখতে হলে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় যে মালয়েশিয়ায় নাটকের সমাদর কম নয়। সিঙ্গাপুরের নিত্য নতুন নাট্য অভিনয় হয়ে থাকে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে। তবে মালয়বাসী চীনা নাট্যকারের সংখ্যা খুব একটা নেই। লাই সিনকো ও তরুণ নাট্যকার লিন চেন-এর নামও এই প্রসঙ্গে করতে হয়। লাই সিনকো অবশ্য প্রবীণ নাট্যকার। একাঙ্কিকা থেকে পূর্ণাঙ্গ নাটকের জয়যাত্রা আধুনিক চীনা নাট্য আন্দোলনে এগিয়ে চলেছে।

শুধু গল্প নাটক নয়, মননশীল সাহিত্যেও মালয়বাসী চীন সাহিত্য কম সমৃদ্ধ নয়। ফ্যাঙসিউ-এর মালয় চীন-সাহিত্যের উপর ঐতিহাসিক নিবন্ধের কথা প্রথমে উল্লেখ করতে হয়। ত্রিশ দশকে লিখিত হলেও মালয়ে আধুনিক চীনা-সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ে আলোচনা এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে তার কদর আজিও হ্রাস পায়নি। ইতো, সি চিয়াও ও চাউ যুও প্রমুখ সাহিত্য সমালোচকদের কথাও এখানে সমান উল্লেখ করতে হয়। ইতো হলেন মালয়বাসী চীনা আন্দোলনের সমর্থক এবং এই আন্দোলনের সমর্থনে তিনি লেখনী ধারণ করেন। সি চিয়াও ইতোর মত মালয়বাসী চীনা আন্দোলনের পক্ষে লেখনী ধারণ করেন। ঔপন্যাসিক মিয়াও সিওর সাহিত্য

কীর্তির উপর দুখানি সমালোচনা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঔপন্যাসিক চাও যুঙ্ কথাসাহিত্যিক উই ইমুন-এর পরবর্তী রচনার উপর একটি মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেন।

মালয়বাসী চীনা সাহিত্যের অগ্রগতি এখানে থেমে নেই। তরুণ লেখকেরা মাতৃভাষা রপ্ত করে চীনাতে মালয়ী গল্প অনুবাদের কাজে রত রয়েছেন কুয়ালালামপুরস্থ মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন অধ্যাপক ওয়াঙ গুঙ-উ প্রবাসী এ সাহিত্য সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করেন।

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

বাঙগা ইমাস : টি. উইগনেশান

এশিয়া : এ হ্যাণ্ডবুক : গাই উইন্ট-সম্পাদিত

দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য : অধ্যাপক হিমাংশু সরকার

নিউ এশিয়া : ডঃ কালিদাস নাগ

এন্‌সাইক্লোপীডিয়া অব ওয়ার্ল্ড লিটারেচার ইন টোয়েন্টিয়েথ সেনচুরী (খণ্ড ১—৩)

ট্রেজারী অব ওয়ার্ল্ড লিটারেচার : ডাগোর্বার্ট দ' রুয়েন (সম্পাদিত)

দি পেঙ্গুইন কমপেনীয়ন টু লিটারেচার (খণ্ড ৪র্থ)

লেখক পরিচিতি

চীন

মাও তুং (জন্ম : ১৮৯৬ খ্রীঃ) : ছদ্মনাম ; প্রকৃত নাম সেন ইয়েং পিং। আধুনিক চীন সাহিত্যের শক্তিধর ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক, নাট্যকার, সাহিত্য সমালোচক ও অনুবাদক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। চেকিয়াং প্রদেশে এক বর্ধিষ্ণু পণ্ডিতের ঘরে জন্ম। হ্যাং চাওএর আনটিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অতি অল্প বয়সে স্নাতক হন। পাঠ্য অবস্থায় সাহিত্য চর্চায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেন। পিকিংএর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপনের পূর্বেই আর্থিক অনটন হেতু বাধ্য হয়ে তাঁকে জীবিকা অর্জনের জন্য প্রুফ-রীডারের কাজ নিতে হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্-চেন্-তো, চো-সো জেন প্রমুখ সাহিত্য সেবকদের নিয়ে মাও তুং এক সাহিত্য গবেষণা সমিতি পত্তন করেন। এবং তার মুখপত্র হিসেবে একখানি ছোটগল্প মাসিকপত্র বার করেন। নিজে তার সম্পাদকও হন। এ সময়ই তাঁর 'ডিস্ইলিউসন', 'এজিটেশন' এবং 'পারস্যুট' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ সালে তাঁরই উদ্যোগে বামপন্থী লেখক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। 'দি রেনবো', 'থ্রি ইন এ রো', 'দি রোড', 'মিউনাইট' (১৯৩৩), 'ইক্লিপস' ইত্যাদি তাঁর নানা উপন্যাসে চীনের বৈপ্লবিক সত্তা—সাম্রাজ্যবাদী শোষণনীতির মুখোস উদ্ঘাটিত করা হয়। তাঁর 'ইরোসান' উপন্যাসে (১৯৪৫) চীনের উপর সাম্রাজ্যবাদী জাপানের আক্রমণের চিত্র ফুটে উঠেছে। মাও তুং কেবল আধুনিক চীনের শক্তিশালী লেখক নন, চীন প্রজাতন্ত্রের সংস্কৃতি মন্ত্রীর পদেও বৃত হন। বর্তমানে 'চাইনিজ লিটারেচ'র মাসিক পত্রের সম্পাদক।

তিংলিং (জন্ম : ১৯০৭ খ্রীঃ) : চীনের মহিলা লেখিকাদের মধ্যে তিংলিং সবিশেষ খ্যাত। জন্ম তাঁর হুনান্ প্রদেশের এক ধনী জমিদার পরিবারে। অতি অল্প বয়সে তিংলিং রক্ষনশীল সমাজ ও পরিবারের জন্মগত সংস্কার ও বাধানিষেধ অতিক্রম করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন তাঁর বাল্যবন্ধু ওয়াং চুন-হুঙের প্রভাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কিছুদিন পরেই তাঁর প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু ঘটে। আর এই শোকছায়া তরুণী লেখিকার মনে এমনই গভীর রেখাপাত করেছিল যে একটি নারী ও সোপীর ডায়েরী প্রভৃতি তাঁর রচনায় কিশোর হৃদয়ের এই বিরহ বিয়োগ ব্যথার মৌন চিত্র প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে।

কনফুসিয়াস্ (খ্রীঃ পূঃ ৫৫১-৪৭৮) : প্রকৃত নাম কুঙ ফু-যু। চীনের দার্শনিক পণ্ডিত। লু-প্রদেশে জন্ম। সে যুগে চীন বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সাধারণ লোকের মধ্যে কোন উচ্চ আদর্শ বা ধর্মবোধ ছিল না। ভদ্রতা বা মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রচার করাই কুঙের উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য বহু রাজসভায় গিয়ে তিনি আদর্শ রাজ্য স্থাপনের কথা ব্যাখ্যা করে আসেন। লু-র রাজা তাঁকে সুযোগ

দেন কিন্তু আদর্শবাদী দার্শনিকের সঙ্গে বিষয়ী রাজার বেশী দিন বনে নি ও কুঙ রাজানুগ্রহ হতে বঞ্চিত হন। আড়াই হাজার বছর কন্‌ফুসিয়াসের নীতিশিক্ষা চীনাদের ধর্ম পথে পরিচালিত করেছে। রাষ্ট্র, সমাজ, গ্রাম, পরিবারের প্রতি কর্তব্য ব্যক্তি মাত্রেরই প্রথম ও প্রধান ধর্ম। কুঙ প্রাচীন কবিতা, প্রবাদ প্রভৃতি সংগ্রহ করেন। তাঁর গ্রন্থসমূহ চীনাদের অবশ্য পাঠ্য। পোর্তুগীজরা তাঁর নাম বিকৃত করে কন্‌ফুসিয়াস করেছে এবং তাই সর্বদেশে প্রচলিত। চীন ভাষায় কুঙ ফু-যুর ধর্ম ও নীতিকে আশ্রয় করে বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠেছে।

লু স্থন (১৮৮১—১৯৩৬): আধুনিক চীন সাহিত্যের জনক। লু স্থন তাঁর ছদ্ম নাম। প্রকৃত নাম চৌ শু-জেন। তাঁকে চীন সাহিত্যের 'ম্যাক্সিম গোর্কী' বলা হয়। লু স্থন সাধারণ মানুষের ভাষা 'পেই হুয়া'-তে লিখতেন তাঁর গল্প উপন্যাসগুলি। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী লেখক। তাঁর অজস্র ছোটগল্পে এই ছাপ পাওয়া যায়। তাঁর রচনা যেমন বলিষ্ঠ তেমনি হৃদয়গ্রাহী। রচনারীতিও তেমনি অপূর্ব। 'আ-কিউ' জীবনী তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস-ক্রম বড় গল্প। সমাজ সচেতন পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়, এমন কি বাংলাতেও বইখানি অনূদিত হয়েছে। লু স্থনের জীবন দর্শনকে এক কথায় বলা যায়: 'তোমার মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায় তাই হল প্রাণবন্যা। তাই যখন তুমি কোন বনানীকে পাও দেখতে, তখন তাকে বসবাসের ভূমি করে নাও। যখনই যদি তুমি দেখতে পাও কোন বিজন প্রান্তর তখন তাতে বৃক্ষ রোপণ করতে থাক, আর যদি দেখতে পাও কোন মরুভূমি, খুঁড়তে থাক পাতকুয়ো'।

চু-সি (১১২৯—১২০০): চীনের প্রখ্যাত দার্শনিক, কবি ও শিক্ষাবিদ্। তিনি কনফুসিয়াসের মতবাদকে বৌদ্ধ ও তাও প্রবর্তিত ধর্মে নতুন আলোকপাত করেন। চু-সি বিশ্বাস করতেন, সৃষ্টির আদিতে লি আর চি দুই প্রকৃতির প্রতিভূ। চু-সির প্রধান রচনা হল ওয়েন শি—তাঁর রচনার সংকলন। আর তুং, চিয়েন ক্যাং মু (সু মা কুয়াঙের ইতিহাসের দর্পণ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার)। তাঁর দার্শনিক রচনার মধ্যে প্রধান হল 'ইউ লু' (বাণী সংকলন)। আনুমানিক পঞ্চদশ শতকে চু-সি প্রচারিত বাণী কোরিয়া ও জাপানেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

চু-ইউয়ান (**আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ৩২৮—২৮৫**): প্রাচীন চীনের শ্রেষ্ঠ কবি। চু ইউয়ান সম্পর্কে তেমন কিছু বিশেষ জানা যায় না। তবে তাঁর নামে প্রচলিত রচনা চীনের পণ্ডিতদের নতুন শিক্ষাদীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। আরথার ওয়ালে ও লীম বুন ক্যাং-এর দৌলতে তাঁর অধিকাংশ রচনাই আজ ইংরাজীতে অনূদিত হয়েছে। 'গ্রেট সামনস', 'নাইন হিমস' ও 'লি সাও' সবিশেষ বিখ্যাত। তাঁর ভাষা ছিল প্রাঞ্জল ও সুসংস্কৃত। তবে তিনি ছিলেন দুঃখবাদী কবি।

চুয়াং চৌ (**মৃত্যুঃ আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ২৭৫**): প্রাচীন চীনা সাহিত্যের

অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্ক ও তাও মতবাদের প্রধান প্রচারক। তাঁর প্রচারিত দার্শনিক ব্যাখ্যায় সাহিত্য, কল্পনা ও হাস্যরসের সংমিশ্রন দেখা যায়। পণ্ডিতেরা তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে স্পিনোজা ও তাঁর রচনারীতির সঙ্গে প্ল্যাটোর তুলনা করে থাকেন। তাঁর প্রসিদ্ধ রচনার মধ্যে 'শিয়াও হিয়াও ইউ' (স্বাধীনতার পথে), 'চী ইউ লুন' (বস্তুর সমতা), 'জেন চিয়েন সি' (মানব জগৎ), 'তা স্বুঙ্ সি' (মহান শিক্ষক), 'ইং তি ওয়াং' (বিজ্ঞ শাসক) প্রভৃতি বিখ্যাত। 'বস্তুর সমতা' শেষ অনুচ্ছেদটি দৃষ্টি আকর্ষক। চুয়াং চৌ লিখেছেন: একদা আমি—চুয়াং চৌ স্বপ্ন দেখলাম, আমি যেন একটি প্রজাপতি। ঘুরে বেড়াচ্ছি এখানে ওখানে ডানা ঝাপটিয়ে আর নিজেকে করছি উপভোগ। আমি যে প্রজাপতি তাতেই ছিলাম আমি সচেতন। হঠাৎ আমি উঠলাম জেগে আর আমি যে আবার চুয়াং চৌ তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না। এখন হয়েছে কি, আমি জানি না আমি সেই চুয়াং চৌ কিনা যে স্বপ্ন দেখেছিল প্রজাপতির অথবা সেই প্রজাপতিটি যে স্বপ্ন দেখল নিজেকে চুয়াং চৌ বলে।

কুয়ো মো-জো (জন্মঃ ১৮৯২): আধুনিক চীনা সাহিত্যে অন্যতম পথিকৃৎ। সি চুয়াং প্রদেশে জন্ম। চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন কালে তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং পাঁচ খণ্ড কবিতা, ছয় খণ্ড প্রবন্ধ, ছয় খানি নাটক ও দশখানি উপন্যাস রচনা করেন। জার্মান ও রুশ লেখকদের বারোখানা গ্রন্থও অনূদিত করেন তিনি। তার মধ্যে গ্যেটের 'ফাউস্ট', টলষ্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' রয়েছে। তাঁর প্রসিদ্ধ রচনার মধ্যে 'দেবী' (দীর্ঘ কাব্য), 'ত্রয়ী বিদ্রোহিনী (নাটক), 'প্রাচীন চীন সমাজ সমীক্ষা' (প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক) প্রবন্ধ সংকলন বিখ্যাত।

কু ইয়েন য়ু (১৬১৩—১৬৮২): সপ্তদশ শতকের চীনের ইতিহাস, দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব, অর্থনীতির বিশিষ্ট পণ্ডিত। বিজ্ঞান ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। কন্‌ফুসিয়াসের শিক্ষাদীক্ষার উপর তাঁর গ্রন্থ ছিল সর্বজনবিদিত। তাঁর রচিত 'তিং লিন সি চুয়াং' সংকলন প্রথম মুদ্রিত হয় ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হল 'জি ছিলু (প্রকাশ কাল ১৬৭০ খ্রী:)।

স্থুন চিং (আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ১৯৮—২৩৮): চীনের সেকালের দার্শনিক ও কনফুসিয়াস মতবাদের প্রবক্তা। তিনি 'ফু' রীতিতে কবিতা লিখতেন। তাঁর দার্শনিক রচনাগুলি স্থুং জু নামে পরিচিত।

হু সি (জন্ম: ১৮৯১ খ্রী:): আধুনিক চীনের অন্যতম বিশিষ্ট পণ্ডিত। জন্ম সাংহায়-এ। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। পিকিং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালে 'সাহিত্য বিপ্লব' ও 'নবচিন্তা' আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। 'আধফালি চাঁদ' মাসিক পত্র সম্পাদনা করেন। আমেরিকায় কুয়ো মিন টাং সরকারের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হল 'চীন দর্শনের ইতিহাস' পাই হুয়া ভাষায় লেখা। 'নিরীক্ষা' নামে একখানি কবিতা-সংকলন আর হু-সি

সংকলিত রচনাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংরাজীতে তাঁর লেখা 'চীনা সংস্কৃতির জাগৃতি' সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

হান ইউ (৭৬৮—৮২৪): তাং যুগের বিখ্যাত চীনা লেখক ও কবি। বৌদ্ধ ধর্মে বিকৃত রূপান্তরে তিনি বিরূপ সমালোচনা করে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন। কিন্তু গদ্য রচনায় তিনি বলিষ্ঠ রচনা রীতির প্রবর্তন করেন। প্রবন্ধ ছাড়া তিনি বহু কবিতা রচনা করেন। তাঁর সমগ্র রচনাবলী বা 'হাং চাং লি চুয়ান সি' এখনও সাদরে পঠিত হয়ে থাকে।

লি পো (৭০১—৭৬২): সেকালের প্রসিদ্ধ চীনা কবি। তি লি, লি তাই-পি, লি তাই পো, লাই পি ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন। নারী ও সুরা ছিল তাঁর অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু। তিনি ছিলেন রূপ ও রঙের স্বভাব কবি। নীতিবাগিশ সমালোচকদের নিকট তিনি অবশ্য, নিন্দার পসরা লাভ করেন নি, এমন নয়।

লিয়াং চি চাও (১৮৭৩—১৯২৯): বিংশ শতকের প্রথম দিকে চীনা সাংস্কৃতিক জগতের অন্যতম জ্যোতিষ্ক। জাতীয়তাবাদী স্বাদেশিকতার স্বপক্ষে তিনি বলিষ্ঠ লেখনী ধারণ করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষারও তিনি ছিলেন প্রধান সমর্থক। প্রধান গ্রন্থ 'চীনা ইতিহাসের পাঠক্রম', 'মাও জু', 'চীনা রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাস' ইত্যাদি।

লিন ইউ-তাং (জন্মঃ ১৮৯৫): আধুনিক চীনা ভাষায় প্রসিদ্ধ লেখক ও সুপণ্ডিত। জন্ম ফুকিয়েন প্রদেশে। হারবার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করে লীপজিক যান তিনি এবং পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। দ্বিমাসিক পত্র 'লুন ইউ' সম্পাদনা করেন। চীনা ভাষায় লিখিত গ্রন্থের মধ্যে 'ওটি হুয়া' (আমার মনে হয়), 'তা হুয়াং চি' (একলা চলার পথিক) দার্শনিক প্রবন্ধগুলি প্রসিদ্ধ। আর ইংরাজী রচনার মধ্যে 'মাই কান্ট্রি এ্যাণ্ড মাই পিপল'; 'ইমর্পর্টেন্স্ অফ লিভিং', 'বিটুইন টিয়ারস এ্যাণ্ড লাফটার', 'মোমেণ্টস ইন পিকিং' 'উইথ লাভ এণ্ড আইরণি' আর 'এ লিপ ইন দি স্টরম'। তিনি চীন ও ভারতের প্রজ্ঞা নামে একখানি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন।

সুন ইউয়াং লিউ (৭৭৩—৮১৯): প্রাচীন যুগের চীন সাহিত্যের কবি ও লেখক। কনফুসিয়াসের শিক্ষাদীক্ষায় ছিলেন পারংগম। তাঁর রচনায় বৌদ্ধ প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। চীনা ভাষায় তিনি কেবল সুপণ্ডিত ছিলেন না, তাঁর হস্তলিপিও ছিল অনন্য। 'লিউ সুন ইউয়ান ওয়েন সি' গ্রন্থে তাঁর রচনাবলী লিপিবদ্ধ আছে।

ওউ ইয়াং সিইউ: সেকালের চৈনিক ঐতিহাসিক, কবি, প্রবন্ধকার ও কূটনীতিজ্ঞ। রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'সিন তাংশু' বা তাং যুগের নয়া ইতিহাস। সমালোচকেরা এ গ্রন্থখানিকে ম্যাকলের 'ইংলণ্ডের ইতিহাসের' সঙ্গে তুলনা করেন।

অপরাপর রচনার মধ্যে প্রসিদ্ধ 'সিন ইউ তাই সি', 'লোয়াং', 'মুতাং চি', 'লিউ ই যু', 'মাঙ শি পাং' ইত্যাদি।

লিউ ইউ (১১২৫—১২১০): দ্বাদশ শতকের অগ্রণী কবি। তিনি নিজেকে 'ফ্রাং ওয়েং' বা স্বাধীন বৃদ্ধ মানুষ বলে অভিহিত করতেন। তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থ হল 'ফ্রাং ওয়েং যু' (ফ্রাং ওয়েনের সংকলিত কবিতা) আর চিয়েং নান শি তিতি (চিয়াং নামে কবিতা সংগ্রহ)। তাতারদের শৌর্যবীর্য ও যুদ্ধ কাহিনী নিয়ে রচিত তাঁর কবিতা আজও সাদরে পঠিত হয়।

সু-মা চিয়েং (**আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ১৪৫—৯৭**): চীন সাহিত্যের প্রথম প্রকৃত ঐতিহাসিক। শি চি (ঐতিহাসিক দলিলপঞ্জী বা স্মরণগ্রন্থ) আড়াই হাজার বৎসর আগেকার ঘটনার বিবরণ, দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক, সঙ্গীতকলা, জ্যোতিষশাস্ত্র, বিধিনিষেধ—এক কথায় সর্ব কিছু এই ঐতিহাসিক কুলপঞ্জীতে লিপিবদ্ধ আছে ১৩০টি অধ্যায়ে। বস্তুতঃ তিনি প্রথম প্রকৃত ইতিহাস রচনার প্রবর্তন করেন।

সু-শি (১০৩৬—১১০১): চীনের বিদ্যোৎসাহী সমাজে একটি বিশেষ স্মরণীয় নাম। সু টুং-পো নামে পরিচিত। শিজুয়াং প্রদেশের শিক্ষাদীক্ষায় গরীষ্ঠ এক পরিবারে তাঁর জন্ম। প্রধান প্রধান রচনাবলীর মধ্যে 'তুং পো যু' (তুং পো কবিতা সংকলনে) আর 'তুং পো চুয়ান চি' (তুং পোর সমগ্র রচনাবলীতে) তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সুন ইয়াৎ-সেন (১৮৬৬—১৯২৫): জাতীয়তাবাদী চীন প্রজাতন্ত্রের জনক। সুন উয়েন নামেও পরিচিত। জন্ম কোয়াংটুং প্রদেশে। গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি হনলুলুতে গমন করেন এবং ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন। হংকং থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে উপাধি লাভ করেন। মাঞ্চু সম্রাটদের স্বৈরচারী শাসন ও শোষণ থেকে চীনের জনসাধারণকে মুক্ত করতে তারপর ব্রতী হন। এবং চীন বিপ্লবের পথে মাঞ্চু সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন চীন গণতন্ত্র 'কুয়ো মিন টাং' সরকারের। ডাঃ সুন ইয়াৎ সেন কেবল বিপ্লবী ছিলেন না, তাঁর বিপ্লবের অন্যতম হাতিয়ার ছিল সাহিত্য। তাঁর প্রধান রচনাবলীর অন্যতম হল 'সান মিন চু আই' (তিন গণতান্ত্রিক পন্থা), 'জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা,' 'জাতীয় উন্নয়নের সাধারণ নিয়ম পন্থা'। 'সুন ইয়ান সুয়ে সু' (সুন ইয়াৎসেনের মতবাদ) ইংরাজীতে রচিত ডাঃ সুনের চীনের 'আন্তর্জাতিক উন্নয়ন' পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবোত্তর মহাচীনের স্মরণীয় গ্রন্থ।

তাই চেন (১৭২৪—১৭৭৭): অষ্টাদশ শতকের চীনের দার্শনিক পণ্ডিত। তাই তুং উয়াং নামেও পরিচিত। জন্ম আন হুই প্রদেশে। বিশ বৎসর থেকে তিনি লিখতে শুরু করেন এবং প্রায় পঞ্চাশখানির মত গ্রন্থ রচনা করেন। অঙ্কশাস্ত্র,

ভাবাত্বত্ব ও দর্শন বিষয়ক তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে 'উ আন শান' (সততার উৎস) আজিও পণ্ডিত সমাজে আদৃত।

তাও চিয়েন (৩৭২—৪২৭): প্রাচীন চীনের স্বভাব কবি। তাও ইউ আন-মিং নামেও পরিচিত। তিনি প্রায় একশত গীতিকবিতা প্রণয়ন করেন এবং প্রত্যেকটির এক একটি রত্ন বিশেষ। তাঁর কবিতাগুলি 'কুই চু লাই যু' ইস্কুল ছাত্রদের একদা পঠনীয় বিষয়বস্তু ছিল। গদ্য রচনা ('আপন মৃত্যু গাথা') তাঁর যেমন প্রাঞ্জল তেমনি চিন্তাশীল।

তু ফু (৭১২—৭৭০): সেকালের চীনের শ্রেষ্ঠ কবি। কবিবর লি পোর সঙ্গে সমতুল্য। পনের বৎসর বয়স থেকে তু ফু কবিতা রচনায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। কিন্তু প্রথম সাহিত্য পরীক্ষায় হন অকৃতকার্য। তিনি তারপর কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং অচিরে চীন সম্রাটের সুনজরে পতিত হন। সভা কবির পদ অলঙ্কৃত করেন। কিন্তু রাজসম্মান ও সম্পদ ত্যাগ করে তিনি দুঃস্থ ও দুঃসাহসিক জীবন বরণ করে নেন। জীবনের এই তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যের প্রধান উপজীব্য। তু ফুর লেখা: 'তু কুং পু চি' (তু রচনা সংগ্রহ)।

শুন্-চিং (জন্ম খ্রীঃপূঃ ২৯৮): প্রখ্যাত কবি ও দার্শনিক। তাঁর রাষ্ট্র-চিন্তা কন্‌ফুসিয়াসের মতবাদে প্রভাবান্বিত হ'লেও তাঁর কাব্যচিন্তা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে জীবনের অনুভূতিতে। শুন্-চিং 'ফু' নামক কবিতার রচয়িতা। মানুষের প্রকৃতি ও জ্ঞানের রহস্যলোকে তাঁর আনাগোনা।

ইউ-শা (জন্মঃ ১৮৯১ খ্রীঃ): আধুনিক চিন্তাধারা সমৃদ্ধ সাহিত্য বিপ্লবের প্রধান নায়ক। চীনা ও ইংরাজী ভাষায় বহু গ্রন্থের রচয়িতা। দৃপ্ত তথা বলিষ্ঠ তাঁর সাহিত্য-ভঙ্গিমা। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা হ'ল 'চীন দর্শনের ইতিহাস', 'রচনা সংকলন', 'তার্কিক পদ্ধতির উন্নয়ন' ইত্যাদি।

মঙ্গোল

চেঙ্গিস খাঁ: মঙ্গোলিয়ার দুর্ধর্ষ সম্রাট কবি। জন্ম ১১৫৫ খ্রীঃ। আসল নাম ছিল 'তিমুচিন'। মধ্য এশিয়ার মঙ্গোল যাযাবরদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তিনি আমুদরিয়া আর পীত সাগরের উপকূলভাগ থেকে শুরু করে সুদূর পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত মঙ্গোল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। নিজে নিরক্ষর হলেও তিনি সাহিত্য ও ললিতকলার ছিলেন প্রকৃত সমঝদার।

জাপান

কাওয়াবাতা ইয়াসুনারী (জন্মঃ ১৮৯৯ খ্রীঃ): নোবেল পুরস্কার বিজয়ী জাপানী কবি ও ঔপন্যাসিক। জন্ম ওসাকা প্রদেশে। শৈশবে পিতা মাতাকে

হারান। স্নাতক পরীক্ষার পর ছোট গল্প লিখতে শুরু করেন। তাঁর গল্পগুলি তখনই পাঠক মহলে দোলা দেয়। এর পর তিনি উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'উকিগুনি' (স্নো-কান্ট্রি বা বরফের দেশ) লিখতে শুরু করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এ উপন্যাস পুস্তাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৭ সালে ইংরাজীতে বইখানি অনূদিত হয়। স্নো-কান্ট্রির জন্যই কাওয়াবাতা ১৯৬৮ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 'বরফের দেশ' উপন্যাসে কাওয়াবাতা প্রাচীন হাইকু কাব্য-রীতির অনুসরণ করেন। এই উপন্যাস বর্ণাঢ্য বর্ণনাভঙ্গীময় ধ্রুপদী জাপানী ঔপন্যাসিকা মুরাসাকীর কথা মনে করিয়ে দেয়। কাওয়াবাতার সংলাপ কাব্যধর্মী ও সংক্ষিপ্ত। নায়ক সিমামুরা বিত্তবান, পল্লবগ্রাহী এবং ভালবাসায় অক্ষম। অন্য দিকে নায়িকা ইয়োকো 'উষ্ণ প্রস্রবণের' গেইশা বারবণিতা। উভয়ে ভালবাসতে চেয়েছে। কিন্তু পরিণতিতে দুজনেই মিলিত হতে পারেনি একান্তভাবে। যতই কাছাকাছি আসার চেষ্টা করেছে ততই যেন তারা দূরে সরে গেছে। সিমামুরা একদিকে যেমন বিশ্ব নিন্দুক, অপর-দিকে তেমনি স্বপ্নময় জগতের বিচরণকারী। পাপের মধ্যে পবিত্রতার অপূর্ব সমাবেশ। 'বরফের দেশ' কাওয়াবাতা ইয়াসুনারীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তিনি সিমামুরার প্রেমের প্রত্যাখ্যানকে সার্থক প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সমকালীন প্রাচ্য জীবনের রূপ ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসখানিতে। কাওয়াবাতার অপর উপন্যাস হল 'থাউজ্যাণ্ড ক্রেন্স' (সহস্র সারস)। বিড়ম্বিত ভালবাসার আর এক সরস কাহিনী। কাওয়াবাতা 'নিওস্যানস্যুয়েলিষ্ট' গোষ্ঠীর প্রবক্তা।

মুরাসাকী সিকিবু (৯৭৮—১০১৫): খৃষ্টীয় একাদশ শতকের হিইয়ান যুগের বিখ্যাত জাপানী লেখিকা। 'জেঞ্জী মোনোগাতারী' (জেঞ্জী-কাহিনী) তাঁর অমর কীর্তি। 'জেঞ্জী মোনোগাতারী' প্রাচীন জাপানী সাহিত্যে বাস্তবানুগ উপাখ্যানের প্রথম সূত্রাপাত করেন। মুরাসাকীর পুরো নাম জানা যায় না। জেঞ্জী কাহিনী ছাড়াও তিনি আরও দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 'মুরাসাকী সিকিবু নিক্কী'—তাঁর নিজের দিনলিপি। 'মুরাসাকী, সিকিবু শু' তাঁর আর এক সংকলিত গ্রন্থ। এই সংকলনে মানব প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর গভীর মনন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

উকিও মিশিমা (১৯২৫-১৯৭০): প্রখ্যাত জাপানী কথাশিল্পী। জন্ম টোকিওতে। পিতার মত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে জাপান সরকারের অর্থ দপ্তরে যোগদান করেন। কিন্তু সরকারী কাজ ত্যাগ করে একান্তভাবে লেখক জীবন গ্রহণ করেন। প্রথম রচনা আত্মচরিত মূলক উপন্যাস 'কন্‌ফেশনস্ অব্ মাস্ক' (মুখোসের স্বীকৃতি)। উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও নাটক নিয়ে মিশিমা প্রায় ১০০ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। 'সী অব ফারটিলিটি', 'দি রানিং হস', 'দি গোল্ডেন প্যাভিলিয়ন' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। মিশিমা হারিকিরি করে সম্প্রতি আত্মহত্যা করেন।

মোতুরী নোরিনাগা (১৭৩০-১৮০১) : ইডো যুগের সুবিখ্যাত ওয়াগা কুশা বা জাপানী ক্লাশিক্যাল পণ্ডিত। একুশ বৎসরে তিনি কিওটো শহরে গিয়েছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে। সেখানে তিনি কনফুসীয় ধর্মবিশ্বাসে প্রভাবিত হন। পরে তিনি অবশ্য সমসাময়িক জাপানী শাস্ত্রীয় পণ্ডিত কামো নো মাবুচীর সংস্পর্শে আসেন। মোতুরী বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। 'কোজিকি দেন' বা কোজিকি অন্বয় তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা। এ গ্রন্থে তিনি সিণ্টো মতের পরিপ্রেক্ষিতে চীনা নীতিবাদ ও দর্শনের সমালোচনা করেন। তাঁর ভাষা ছিল অনাড়ম্বর সহজ-বোধ্য।

নাৎসুমি সোশেকি (১৮৬৭-১৯১৬) : ইডো যুগের আর একজন লেখক। নাৎসুমি সোশেকি ছদ্মনাম। প্রকৃত নাম নাৎসুমি কিন্নোসুকি। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে টোকিও সামরিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন ইংরাজী সাহিত্যে। ১৯০০ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত তিনি ইংলণ্ডে ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তারপর স্বদেশে ফিরে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 'টোকিও আসাহি' সংবাদপত্রের সাহিত্য সম্পাদক পদে তিনি তারপর অধিষ্ঠিত হন। নাৎসুমির বুদ্ধিদীপ্ত ও সরস রচনা জাপানী পাঠকের চিত্ত জয় করে। তিনি তৎকালীন জাপানী সাহিত্যে ন্যাচারালিজমের কড়া সমালোচনা করেন। কিকুচি কান, মুশাকোজি সানিয়াৎসু, কুমি মাসাও প্রমুখ বহু সমকালীন লেখককে তিনি প্রভাবিত করেন। 'বোৎচান' (পরম প্রিয়), 'কুশামাকুরা' (অমানুসিক পরিভ্রমণ) প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর সাহিত্য কুশলতার পরিচয় রয়েছে।

সিন্নাই শোনাগণ : হিয়ান যুগের প্রখ্যাত জাপানী লেখিকা। তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে এটুকু জানা যায় তিনি অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশবকাল থেকে শিক্ষা সংস্কৃতিতে বিশেষ পারংগম হয়ে উঠেন। তিনি 'জেঙ্কীকাহিনী'র লেখিকা মুরাসাকী সিকিবুর সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর মাকুরা নো সোশি উপাদান চিত্রপটে চীনা সাহিত্যেও সংস্কৃতির ছাপ রয়েছে।

কিকুচি কান (জন্ম : ১৮৮৮) : আধুনিক জাপানী কথাশিল্পী। তাকামাৎসু শহরে জন্ম। পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষায় তিনি ছিলেন দীক্ষিত। সাহিত্য কেবল সাহিত্য সৃষ্টির জন্য এই মতবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর রচনা ছিল বাস্তবানুগ। সাহিত্য পত্র 'বুনজিয়াই সুনজু'-র তিনি সম্পাদক ও প্রকাশক। বহু তরুণ ও শক্তিশালী জাপানী লেখক তাঁকে অনুসরণ করত। উপন্যাস ও নাটক রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর 'চিচি কেরু' (পিতার প্রত্যাবর্তন) ও 'তোজুরো নো কোই' (তোজুরোর প্রেম) দুখানি নামকরা নাটক। ইংরাজীতে অনূদিত প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাসের মধ্যে 'শোহাই' (জয় পরাজয়) ও 'শিনজু ফুজিন' (শ্রীমতি মুক্তা)।

ইয়াম্নহিরো তাকিউচি (জন্ম : ১৯০০) : আধুনিক জাপানী ঔপন্যা-

সিক ও তরুণ জাপানী সাহিত্য সমালোচক। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়-এর স্নাতক। ১৯৪৭ সালে প্রথম কাওয়াদে রোমান পুরস্কার লাভ করেন তাঁর 'ফরট্রেস অব হোপ' উপন্যাসের জন্য। এ উপন্যাসে তিনি এশিয়ার যে সব হতভাগ্য অধিবাসী নিজেদের কোন ভাষা নেই তাদের মর্মকথাই তুলে ধরেছেন একান্ত দরদের সঙ্গে। তিনি বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের উপর কয়েকখানি সমালোচনা গ্রন্থও প্রকাশ করেন। জাপানের আফ্রো-এশীয় লেখক আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত। এবং সস্ত্রীক নয়া দিল্লীতে আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে যোগদান্ করতে এসেছিলেন ১৯৭০ সালে।

ইসুকি নাকাজোনো : সমকালীন জাপানী ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক। নয়া জাপানী সাহিত্য আন্দোলনের সক্রিয় সভ্য। আফ্রো-এশীয় সাহিত্য আন্দোলনেরও সক্রিয় সদস্য। সাম্প্রতিক গ্রন্থ : 'জাপানের কোরিয়ান জনগণ'।

কুমিকো কোরা (জন্ম : ১৯৩২) : তরুণ জাপানী মহিলা কবি। কেনীও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ১৯৬৩ সালের জাপানের সেরা 'এইচ' কবিতায় পুরস্কার লাভ করেন। কয়েকটি আধুনিক কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর প্রগতিশীল কবিতায় প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করবার। তাঁর 'অদৃশ্য গলি' অতি হালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি প্রগতিশীল তরুণ জাপানী ঔপন্যাসিক ও সমালোচক ইয়াসুহিরো তাকিউচির সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এবং গত ১৯৭০ সালে নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে যোগদান করেন।

কেন জাবুরো ওই (জন্ম : ১৯৩৫) : টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ১৯৫৭ সালে 'মৃতদেহের ভ্রূকুটি' উপন্যাসের জন্য 'আকুতাগাওয়া পুরস্কার' লাভ করেন। তিনি বহু গল্প-কাহিনীও লিখেছেন। তাঁর হালের রচনা 'মান-এনর প্রথম বৎসরে ফুটবল' জাপানের তরুণ লেখকদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। শুধু প্রভাব নয়, এ কাহিনী জাপানী পাঠক সমাজও সাদরে গ্রহণ করে। 'ওকিনাওয়া'র উপর লেখা তাঁর প্রগতিশীল প্রবন্ধ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

মাৎসুও বাসো (১৬৪৪—১৬৯৪) : হাইকু যুগের শ্রেষ্ঠ জাপানী কবি। আইগার অধিবাসী। কিয়োটোতে লেখাপড়া শিক্ষা করেন। তিনি চিরাচরিত জাপানী কাব্য রচনা পদ্ধতি অনুসরণ না করে শোফু রীতি প্রচলন করেন। হাইকু রীতির এটি ব্যতিক্রম। প্রতীকধর্মী, সহজ স্বভাবসিদ্ধ কয়েকটি শব্দসমষ্টির এই কবিতাগুলি বিশ্বসাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ। বস্তুতঃ আজিকার জাপানী কবিতাতেও মাৎসুও বাসোর প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়।

শিমাজাকী তোসন (জন্ম : ১৮৭২) : লব্ধপ্রতিষ্ঠ জাপানী লেখক। মাসামুনি হাকুচো ও তোকুদা শুসেইর সঙ্গে সমকালীন জাপানী সাহিত্য উন্নয়নে শিমাজাকীর ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়। তাঁর 'হাকাই' উপন্যাসটির পটভূমিকা ইতাকার অনুন্নত সম্প্রদায়কে ভিত্তি করে রচিত। পরবর্তী যুগে বহু জাপানী উপন্যাস-এর অনুসরণে

লিখিত। শিমাজাকীর আর একখানি প্রতিনিধিমূলক উপন্যাস 'উওকি মোর' (সূর্যোদয়ের পূর্বে)। এটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। গ্রামের সাধারণ মানুষ, চাষাভুষোদের নিয়ে গীতধর্মী এই গ্রন্থ রচিত। শিমাজাকীর লেখা অনেক ক্ষেত্রে 'পথের পাঁচালী'র বিভূতিভূষণের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ইন্দোনেশিয়া

(ডাঃ) তাকির আলিযবন (জন্ম: ১৯০৮): ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী কবি ও ঔপন্যাসিক। আধুনিক ইন্দোনেশিয়া সাহিত্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 'পুযঙ্গ বারু' বা 'নতুন লেখক' সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রের প্রধান সম্পাদক। 'নিত্য ভাগ্যং বিড়ম্বিত', 'চির প্রজ্বলিত প্রদীপ', 'লাজর', 'তের কেমরুঙ' (পূর্ণ পাল) প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক। কাব্যগ্রন্থ: 'তেবরেন মেগা' (ছড়ানো মেঘ)।

আর্মিন পানে (জন্ম: ১৯০৮): সমকালীন ইন্দোনেশীয় কথাসাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'বেলেঙ্গু' বা শৃঙ্খল।

সানুসি পানে (জন্ম: ১৯০৫): ইন্দোনেশিয়ার আধুনিক কবি ও কথাশিল্পী। ইন্দোনেশিয়ার সাহিত্যে আর্মিন ও সানুসি পানে ভ্রাতৃদ্বয়ের স্থান আলিযবনের পর বলা যায়। ষোলো বৎসর বয়স থেকে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ্য করবার। প্রসিদ্ধ নাটক: 'মানুসিয়া বারু' (নতুন মানুষ)। ডাচ ভাষায়ও তিনি নাটক রচনা করেছেন।

আবদুল মুইস্: ইন্দোনেশিয়ার প্রখ্যাত সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা। 'সালা আসুয়ান' তাঁর সেরা কাটতি উপন্যাস।

খয়রিল আনোয়ার (১৯২২—৪৯): ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী সংগ্রামী কবি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দেরু জামপুর দেবু' (ছ্যাকরাগাড়ীর ঘরঘর ও ধুলি)। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কেরিকিল তাজম' বা ধারালো উপল। মাত্র সাতাশ বৎসর বয়সে এ বিপ্লবী কবির অকাল মৃত্যু ঘটে। ডাচ্, ইংরাজী, চীন, বাংলা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় তাঁর কবিতা অনূদিত হয়েছে। তিনি তাঁর কয়েকজন বন্ধু ও অনুগামী নিয়ে 'গেল্যাং গ্যাং' বা 'চক্র' নামে একটি প্রগতিশীল লেখক শিল্পীদল সংগঠিত করেন।

রিভাই আপীন ('যোগী' জন্ম: ১৯২৭): ইন্দোনেশিয়ার আধুনিক কবি। তিনি কিছুকাল ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডাঃ শারিয়রের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর কবিতায় স্বদেশপ্রেমের ছাপ সুস্পষ্ট। 'স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া', 'অভিশপ্ত কবি' প্রভৃতি তাঁর অনেক কবিতা ইংরাজীতে অনূদিত হয়েছে।

ইদ্রাস: ইন্দোনেশিয়ার শক্তিশালী কথাশিল্পী। ছোটগল্প রচনায় ছিলেন

সিদ্ধহস্ত। 'সুরবায়া' বিপ্লবকালীন ইন্দোনেশিয়ার বাস্তব জীবনের এক অনবদ্য আলেখ্য। 'আত্মগোপনকারীর ডায়েরী' ও 'আকি' বা 'ঠাকুরদা' তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস।

প্রমুদিয়া অনন্ত তুর (জন্ম: ১৯২৫): ইন্দোনেশিয়ার আধুনিক শক্তিশালী কথাশিল্পী। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কয়েক বৎসর তিনি ডাচ্ কারাগারে বন্দী ছিলেন। সে সময় তিনি স্টেইনবেকের প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'অব মাইনস অ্যাণ্ড মেন' অনুবাদ করেন ইন্দোনেশীয় ভাষায়। তাঁর জনপ্রিয় নাটক 'ব্লারা'।

উতে সনাতনি: ইন্দোনেশিয়ার সমকালীন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক। 'তাম বেরা' ঐতিহাসিক উপন্যাস। জনপ্রিয় নাটক 'বুঙা রুমা মাকন' বা রেঁস্তরার ফুল।

রোসিয়াম আনওয়ার: ইন্দোনেশিয়ার তরুণ কবি ও সাংবাদিক। জাপ-অবরোধ কালে তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক 'সিয়ামত' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা।

আমীর হামজা (১৯১১-৪৬): ডাঃ আলিষবনের সমকালীন ইন্দোনেশীয় কবি। মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে মারা যান।

আকদিয়াত কে. মির্জা (জন্ম: ১৯১১): ইন্দোনেশিয়ার শক্তিশালী কথাশিল্পী।

মহম্মদ যমিন (১৯০৩—৬২): ইন্দোনেশিয়ার প্রবীণ নাট্যকার। তাঁর অধিকাংশ নাটক ক্লাশিক্যাল বিষয়বস্তু আর পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে লেখা।

'এল. হাকিম': ইন্দোনেশিয়ার অন্যতম সমকালীন নাট্যকার। এল. হাকিম ছদ্মনাম। প্রকৃত নাম ডাঃ আবু হানিফা। সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি বহু নাটক রচনা করেছেন। 'তুফান দিয়াওস্ এশিয়া' (এশিয়ার বুকে তুফান) তাঁর সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত নাটক।

অসরুল সানী: ইন্দোনেশিয়ার সংগ্রামী কবি। 'গেল্যাং গ্যাং' চক্রের অন্যতম প্রগতিশীল কবি ও লেখক।

মহম্মদ আকবর যুহানা: ইন্দোনেশিয়ার দেশপ্রাণ কবি। তাঁর 'স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া', 'অভিশপ্ত কবি' প্রভৃতি বহু কবিতা ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে।

মোচতার লুবিস: ইন্দোনেশীয় কথাশিল্পী ও সাংবাদিক। মধ্য সুমাত্রায় জন্ম (১৯২২ সালে)। 'ইন্দোনেশীয় রায়' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। প্রধান রচনা: 'তাক্ আদা ইসক' (আগামীকাল আর নেই), 'জালান তাক্ আদা উজুনং' (সীমাহীন পথ), ছোটগল্প—'সি ডিঙ্গামল' ইত্যাদি।

সিতর সিতুমোরাং: ইন্দোনেশিয়ার বুদ্ধিজীবী ও প্রবন্ধকার। জন্ম ১৯২৪ সালে মধ্য সুমাত্রায়। ডাচ্ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেন। ইন্দোনেশিয়া সাধারণতন্ত্রের সদস্য। গল্প, কবিতা, নাটক, আধুনিক ইন্দোনেশীয় সাহিত্যের উপর নানা প্রবন্ধের লেখক।

ভিয়েৎনাম

(ডাঃ) হো চি-মিন (১৮৯০-১৯৬৯): ভিয়েৎনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের (ডি. আর. ভি. এন.) প্রথম প্রেসিডেন্ট। শুধু রাষ্ট্রপতি নন, ভিয়েৎনাম গণসাহিত্যের পথিকৃৎও। জন্ম কিমলিয়ে গ্রামের এক বুদ্ধিজীবী পরিবারে। সাহিত্যের লক্ষ্য কেবল মনোরঞ্জন নয়—গণচেতনা। সাহিত্য ছিল তাই তাঁর কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামের অস্ত্র বড়ো হাতিয়ার। অতি অল্প বয়স থেকে তিনি ফরাসী উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রাম শুরু করেন এবং বহুবার কারাবরণ করেন। ফ্রান্সের বামপন্থী 'পপুল্যয়ে'র ও 'এল. হিউমানিৎ' পত্রিকার পৃষ্ঠায় তিনি ভিয়েৎনামের সাধারণ মানুষ—নিপীড়িত চাষাভুষাদের কথা নানা গল্প-কাহিনীর মারফত ফুটিয়ে তোলেন। কেবল ছোটগল্প নয়, কবি হিসেবেও তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। 'বাঁশের ড্রগন' তাঁর রূপক গীতিনাট্য।

তো হোয়াই (জন্ম: ১৯২৯): ভিয়েৎনাম প্রজাতন্ত্রের (ডি. আর. ভি. এন.) প্রগতিশীল কথাশিল্পী এবং ভিয়েৎনাম লেখক সঙ্ঘের ডেপুটী জেনারেল সেক্রেটারী। জন্ম হা-নোই-এর উপকণ্ঠে ঘিয়া দো-তে। দোকানী, মাস্টারী, জুতো বেচা থেকে আরম্ভ করে নানাবিধ বিত্তের পর লেখক জীবন গ্রহণ করেন। তো হোয়াই-র রচনায় ভিয়েৎনামী জীবনযাত্রার প্রতিফলন দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস: 'ডায়েরী অব এ ক্রিকেট' (ঝিঁঝিপোকার দিনপঞ্জী), 'টেলস্ ফ্রম দি নর্থ-ওয়েস্ট' (উত্তর-পশ্চিমের কাহিনী); 'আদার হোম কান্ট্রি (অপর গৃহভূমি), 'ওথ ইন মুন লাইট' (ছোটগল্প), 'ওয়েস্টার্ন ল্যাণ্ড' (পশ্চিমভূমি), 'এ ফু এ্যাণ্ড হিজ ওয়াইফ্' (চিত্রনাট্য) ইত্যাদি। লোটাস পুরস্কার বিজয়ী। তো হোয়াই আফ্রো-এশীয় লেখক সঙ্ঘের নয়াদিল্লী অধিবেশনে যোগদান করেন ১৯৭০ সালে।

নগুয়েন ডম্ বিন্: ভিয়েৎনামের আধুনিক কবি। লা ফর্তের 'উপাখ্যানগুলি' তিনি অমৃতাক্ষর ছন্দে অনুবাদ করেন।

তান দা: নগুয়েহ থাক হিউর ছদ্মনাম। ভিয়েৎনামের প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি ছিলেন দুঃখবাদী। সাহিত্য ও সাংবাদিকতা ছিল তাঁর উপজীবিকা।

দি লু: ভিয়েৎনামের সমকালীন কবি। তাঁর 'অরণ্যের বিলাপ' সমধিক প্রসিদ্ধ। তরুণ পাঠকমহলে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়। ১৯৩৬ সালে তাঁর প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয়।

হান মাক তু (১৯১৩-৪০): ভিয়েৎনামের তরুণ কবি। শৈশবে কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হন এবং কুষ্ঠ স্যানাটোরিয়ামে অবস্থান কালে প্রথম কবিতা লিখতে শুরু করেন। প্রেম, মৃত্যু আর শূন্যতা ছিল তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু।

ওয়াভুঙ নগক পাক: ভিয়েৎনামের সমকালীন কথাশিল্পী। ভিয়েৎনাম সাহিত্যের প্রথম আধুনিক উপন্যাস 'তো-তাঙ' প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। দেশের বর্তমান যুব সমাজের চিত্র তিনি অঙ্কিত করেছেন এ উপন্যাসে।

নহাৎ-লিন : ভিয়েৎনামের আধুনিক কথাশিল্পী। পুরো নাম নগুয়েন তুৎং তাং। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের পথপ্রদর্শক। নিম্ন মধ্যবিত্তদের নিয়ে লেখা তাঁর উপন্যাস 'দ্বয়ান তুয়েৎ' (ছেদ) ও 'লান লুং' (উপেক্ষা) জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

খাই হুং : ভিয়েৎনামের প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী। 'হুয়াং চু য়ুয়ান' (আধা বসন্ত), 'হন বুয়ন মোত্তিয়েন' (প্রজাপতির স্বপ্নকথা) ইত্যাদি তাঁর নাম করা উপন্যাস।

ত্রান তিউ : ভিয়েৎনামের অন্যতম কথাশিল্পী। প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'কন্ ত্রাও' (মহিষ), 'চোং কন' (স্বামী ও পুত্রকন্যা)।

চুই হিয়েং : ভিয়েৎনামের আঞ্চলিক ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক। প্রসিদ্ধ গল্প-সংগ্রহ 'নাম ভায়'।

তে হুউ : ভিয়েৎনামের বিপ্লবী কবি। ১৭ বৎসর বয়স থেকে ফরাসী সরকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। প্রসিদ্ধ কবিতা সংকলন 'ভিয়েৎ বাক'। ভিয়েৎনামের কৃষক ও সাধারণ মানুষের প্রিয় কবি। স্বাধীন ভিয়েৎনাম দপ্তরের মন্ত্রীও ছিলেন কিছুকাল।

তু মো : শক্তিশালী ভিয়েৎনাম কবি। কবিতা ছাড়া উপকথা ও প্রশ্নোত্তরে ছড়া গানও রচনা করেছেন। ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর ব্যঙ্গ কবিতা তিন খণ্ডে বিভক্ত। শিরোনাম : 'ধারা বহে উজান'।

গুয়েন গক : ভিয়েৎনামের তরুণ কথাশিল্পী। কিংবদন্তী, লোকগাথা ও লোকসংস্কৃতি তাঁর রচনায় বিষয়বস্তু বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে। 'ভূমির উত্থান' তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। ১৯৫৪-৫৫ সালে এই উপন্যাসখানি সাহিত্য প্রাতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করে।

উয়ান দিয়ু : ভিয়েৎনামী কবি। প্রেম, ভালোবাসা, কালের দুর্বার যাত্রা আর মানুষের স্বপ্ন-আলেখ্য হল তাঁর কাব্যের প্রধান বিষয়। বর্দেল্যয়র, রিমবঁ প্রমুখ ফরাসী কবিদের প্রভাব তাঁর কাব্যে পরিলক্ষিত হয়।

থাইল্যাণ্ড

কুলশপ্যা রানগ্রুইদি : থাইল্যাণ্ডের তরুণ সম্প্রদায় 'দেক' কবিগোষ্ঠীর অন্যতম। পুরো নাম কুমারী কুলশপ্যা চিওনরুন গোজনা। তাঁর কবিতায় বিরহ কাতর সকরুণ প্রতিচ্ছায়া দেখা যায়। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মধ্যেও নিঃসঙ্গতার সুর অনুরণিত।

(প্রিন্স) প্রেমপুরোচ্ছত্র : থাইল্যাণ্ডের আধুনিক কবি। জন্ম ব্যাঙ্ককে ১৯১৫ সালে। শিক্ষাদীক্ষা ইংলণ্ডে। স্বদেশে ফিরে কিছুকাল চুলালংকরণ ও থম্মাসাত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ক্ষীণ দৃষ্টি', 'যাদুকরী পদ্ম' (ম্যাজিক লোটাস), 'বিশ্বপরিক্রমা', 'খুন্চ্যাঙ্খুন্ পান' ইত্যাদি।

রাজা ত্রৈলক : পঞ্চদশ শতকের থাইল্যাণ্ডের প্রখ্যাত কবি। প্রধান কাব্য : 'ফবাল'। রোমান্টিক এ কাব্যের বিষয়বস্তু অনেকটা মহাকবি শেক্সপীয়রের (রোমিও ও জুলিয়েট) নাটকের অনুরূপ। রাজা ত্রৈলকের এ অপূর্ব প্রেমগাথাটিকে আধুনিক নাট্যরূপ দিয়েছেন সমসাময়িক নাট্যকার প্রেম চাই।

শ্রীপাজ্ : থাই সাহিত্যের 'স্বর্ণযুগের কবি'। শ্রেষ্ঠ কাব্য : গীতধর্মী 'ক্লোং কামসুয়ান' ও রোমান্টিক কাব্য 'অনিরুদ্ধ' শ্রীপাজ্-এর কাব্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

সুনতোরণ পু : অষ্টাদশ শতকের থাই সাহিত্যের অমর কবি। সাধারণের কাছে তিনি 'মাতাল কবি' হিসেবে পরিচিত। অধিকাংশ কবিতাই তাঁর গীতধর্মী। 'ফরা অপাই' তাঁর অমর সৃষ্টি।

নরীন্দ্র : রতনকোশীন্দ্র যুগের থাই কবি।

রাজা বিজিরায়ুধ (১৮৮১—১৯২৫) : থাইল্যাণ্ডের আধুনিক নাট্যকার। প্রসিদ্ধ নাটক 'ফরা রুয়ানং'। শেক্সপীয়র ও কালিদাসের মূল নাটক অবলম্বনে তিনি বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেন থাই সাহিত্যে। থাই ভাষায় বৌদ্ধ জাতকও তিনি অনুবাদ করেন। 'অশ্ববাহু' ছদ্ম নামে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

(প্রিন্স) বিত্তালংকরণ (১৮৭৫—১৯৪৫) : আধুনিক থাই সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। যদিও 'এন-এম-এস' এ ছদ্মনামে ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রথম অবতীর্ণ হন। এবং বিশেষ লোকপ্রিয়তা অর্জন করেন। 'কনক নথরন' (স্বর্ণপুরী) তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে এই কাব্য রচিত। 'সাম ক্রুং' (তিন রাজপুরী) তাঁর বৃহত্তম কাব্য। তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই কাব্যে তিনি থাই ইতিহাসের তিন বৃহৎ নগরী : অযুধ্যা, ধোবুড়ি ও ব্যাঙ্কক-এর উত্থান-পতনের বর্ণাঢ্য কাহিনীছন্দ মাধুর্যের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

চিট্ বুড়াঠাট্ (১৮৯২-১৯৪২) : থাইল্যাণ্ডের ক্লাশিক্যাল যুগের শেষ বিখ্যাত কবি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'সমাখীপেত'।

চাও কাসা ধর্মশক্তি মন্ত্রী (১৮৭৭-১৯৪৩) : থাইল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি। 'খ্রূ দেব' ছদ্মনামে লিখতেন। কবিতা হল তাঁর কাছে মত প্রকাশের হাতিয়ার। প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ : 'গুপ্তধন', 'অন্ দি ব্রিয়াঙ-কেলগ্ পোয়েট' প্রভৃতি।

বিচিত্র পিন্‌চিন্দা : থাইল্যাণ্ডের কবি ও সাংবাদিক। ছদ্মনাম 'ছেসদ বিচিত্র'। প্রসিদ্ধ রচনা : 'পারিবদ নও তুমি' ইত্যাদি।

শী বুড়াফা (জন্ম : ১৯০৫) : সমাজসচেতন থাই কথাশিল্পী। আসল নাম : কুলাপ শৈপ্রাদিত্। সার্থক উপন্যাস : 'লুক ফু চাই' (মানুষ বটে), 'পংখ্রাম চিউট' (জীবনসংগ্রাম), খ্যাঙ্ 'ল্যাঙ্ ফাপ' (চিত্রের পশ্চাতে) ইত্যাদি।

ডোক মেই সোড্ (১৯০৬-৬৩) : থাইল্যাণ্ডের মহিলা লেখিকা। প্রকৃত নাম মম লুয়াঙ্ বাবপ্পা সুকিচ নিম্মানহেমিন্দা। 'করম কোয়া' (নিয়তি), 'কোয়ারম

পিঙ ক্রান্ রাগ' (প্রথম ভুল), 'শক্র কঙ্ ছোয়া লোন্' ইত্যাদি ছয় সাতখানি উপন্যাসের লেখিকা।

জিত-কাশেম্‌শিবুন ক্লয়াঙা : থাই লেখক। জন্ম বান্ককে ১৯১৫ সালে। চুলচালংকরন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ইংরাজী, ফরাসী ও থাই ভাষায় তাঁর বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

ফিলিপাইন

কার্লস বুলোসন : আধুনিক ফিলিপাইন সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী ও কবি। সার্থক রচনা : 'আমার পিতার হাসি'।

ফ্রান্সিস্‌কো বালাগ্‌তাস বাল্‌তাজার : ফিলিপাইনের কবি ও নাট্যকার। তিনি স্পেনীয় আমলে জাতীয় ভাষা তাগালগে উচ্চশ্রেণীর বহু কবিতা, গান ও নাটক রচনা করেন। তাঁর 'ফ্লোরেনটি এ্যাট লরা' তাগালগ্ ভাষার অপূর্ব এক মহাকাব্য।

জুয়ান ক্যেব্রেরস লামা (মৃত্যু : ১৯৫৩) : ফিলিপাইনের তাগালগ্ ভাষার বিখ্যাত লেখক। যুদ্ধোত্তর ফিলিপাইনের পটভূমিকায় লেখা তাঁর উপন্যাস 'দিস্ বারানগে'। ১৯৫৩ সালে এক মোটর দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান।

ফ্রান্সিসকো সিওনিল যোশ : ফিলিপাইন কথাশিল্পী ও সাংবাদিক। জন্ম ১৯২৪ সালে। সেণ্ট টমাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে 'স'নডে টাইমস ম্যাগাজিন', 'কমেণ্ট', 'প্রাগ্রেস' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। আন্তর্জাতিক পি. ই. এন-এর ফিলিপাইন শাখার সম্পাদক। উপন্যাস : 'দি চীফ মোরনার', 'দি ব্যালিট ট্রি', 'দি প্রিটেণ্ডার' ইত্যাদি।

জোশ গারসিয়া ভিলা (জন্ম : ১৯১৪) : কবি ও ছোটগল্প লেখিকা। জন্ম ম্যানিলায়। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ফিলিপাইন দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। 'ফুট নোট টু ইউথ্', 'হ্যাভ্ কাম অ্যাম হিয়ার', 'সিলেকটেড পোয়েমস্ এ্যাণ্ড নিউ' ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক।

এন. ভি. এম. গনজালেজ : ফিলিপাইন কথাশিল্পী। জন্ম ১৯১৫ সালে রেমব্রনে। ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। উল্লেখযোগ্য রচনা : 'দি উইণ্ডস্ অব এপ্রিল', 'সেভেন হিলস্ এওয়ে', 'চিল্‌ড্রেন অব দি এ্যাস কভারড্ লোম এ্যাণ্ড আদার স্টোরিস্', 'এ সিজন অব গ্রেস' ইত্যাদি।

বিয়েনভেনিডো এন. সান্তো : ফিলিপাইন কবি ও গল্প লেখক। জন্ম ম্যানিলায় ১৯১১ সালে। শিক্ষা ফিলিপাইন ও মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প রচনার জন্য বহু পুরস্কার লাভ করেন। এবং সৃজনশীল রচনার জন্য রকফেলার ফাউন্‌ডেশন ফেলোসিপ পান। 'ইউ লাভলি পিপল' তাঁর প্রসিদ্ধ গল্প সংকলন এবং 'দি উন্‌ডেড স্ট্যাগ' তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ।

এডিথ্ এল. টিয়েনপো: ফিলিপাইন সমালোচক ও গল্প-লেখিকা। জন্ম ১৯১৯ সালে। সিল্লিমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী অধ্যাপিকা। 'এ ব্ল্যাণ্ড অব ফার্ন' তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। বহু কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধও তাঁর প্রকাশিত হয়েছে।

নেপাল

ভানুভক্ত: নেপালের জাতীয় কবি। জন্ম ১৮১৪ সালে তানাহুনে। মৃত্যু ১৮৬৮ সালে। পিতা ধনঞ্জয় নেপাল সরকারের অধীনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এক ঘাসুড়ের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে তিনি রামায়ণ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কেবল বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ করে ক্ষান্ত হননি, 'আধ্যাত্ম রামায়ণে' তিনি নেপালের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রানুগ গুণাবলী তুলে ধরেছেন। সংস্কৃত ছন্দ ও মাত্রাকে তিনি নেপালী পাঠকের সুবিধার জন্য নতুনভাবে রূপায়িত করেন। তাঁর রচিত 'বধুশিক্ষা', 'প্রশ্নোত্তরী', 'রামগীত', 'ভক্তিমাল' প্রভৃতি গ্রন্থ আজও তাঁর কাব্যপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে।

কোরিয়া

সোল চোং: কোরিয়া সাহিত্যের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। কোরিয়ায় চীনা ধর্মগ্রন্থ শিক্ষার জন্য 'আইদু' লিপিমালার উদ্ভাবক।

কিম পুসিক (১০৭৫-১১৫১): একাধারে কবি ও ঐতিহাসিক। তাঁর 'সমগুকসা' একটি স্মরণীয় গ্রন্থ।

কিম মঞ্জুং (১৬৩৭-১৬৯২): কোরীয় সাহিত্যের অন্যতম ঔপন্যাসিক। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'কুয়ান মং' সে যুগের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা।

ইমাম ব্যাং (১৬৪০-১৭২৩): কোরিয়ার জনপ্রিয় লেখক। বৌদ্ধ জাতকের আখ্যায়িকা এবং কনফুশীয় নীতিমূলক আখ্যায়িকা লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

লী জি জেং: কোরিয়ার অন্যতম শক্তিশালী লেখক। সমাজের নীচের তলার মানুষের কাহিনী ফুটে উঠেছে তাঁর 'গৃহভূমি', 'দুঃস্থ মানব', 'ছুটির আলো' প্রভৃতি গল্পে। 'মৃত্তিকা' তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস।

লী থাই ভিয়ন: আধুনিক কোরিয়ান সাহিত্যের একজন শক্তিশালী কথা-শিল্পী। যুদ্ধোত্তর কোরিয়ার মার্কিনী দখলদারী রূপটি তিনি তাঁর রচনায় সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'প্রথম যুদ্ধ' তাঁর একটি প্রখ্যাত গল্প।

ঈ কোয়াঙ সু (জন্ম: ১৮৯২): আধুনিক কোরীয় সাহিত্যের জনক। একাধারে কবি ও কথাশিল্পী। অতীতের ঐতিহ্যবাহক মামুলি কাব্যধারাকে উপেক্ষা করে জনসাধারণের সহজবোধ্য নতুন চলিত রীতির প্রবর্তক। 'জীবনের সৌরভ', 'ভালবাসা' প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস।

ঈ ইয়াক সা (১৯০৫-১৯৪৪): কোরিয়া সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রতিভাবান তরুণ কবি। তাঁর কাব্য জ্বালাময়ী ও প্রতীকধর্মী। ১৯৩৪ সালে পিকিং বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায় বিনা অপরাধে জাপ সমরকর্তাদের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। 'হৃদ' একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা।

কিম কি রিম (জন্ম : ১৯০৯) : সমকালীন শক্তিশালী কোরীয় কবি। তাঁর মতে প্রকৃত কবিকে হতে হবে নতুন ইতিহাসের পথিকৃৎ। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন রূপটিও তাঁকে ফুটিয়ে তুলতে হ:ব। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'প্রজাপতি ও সমুদ্র'।

আরব, ইরাণ, ইরাক, তুরস্ক, লেবানন, সিরিয়া, জর্ডন

মহম্মদ আবদু (১৮৪৯-১৯০৫) : জন্ম মিশরের এক আরব-তুর্কী কৃষক পরিবারে। জামাল-আল-দীন অল আফগানীর শিষ্য। দেশপ্রেমিক, দক্ষ শাসক ও পণ্ডিত হিসাবে প্রসিদ্ধ। কোরাণে ছিল তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। কিন্তু আধুনিক চিন্তাধারায় ঐশ্লামিক ধর্ম বিশ্বাসকে ঢালাই করতে তিনি দ্বিধা করেননি। 'রিশালত আল্ওয়ারিদাৎ' (অতীন্দ্রিয় অনুপ্রেরণা) আর 'রিশালত অল্-তোয়াহিদ' (ঈশ্বরের একতার পথ) তাঁর দু'খানি চিন্তাশীল গ্রন্থ।

জামাল-আল্-দীন অল্ আফগানী (১৮৩৯-৯৭) : কাবুলের নিকট জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা লাভ মিশরে। প্যান-ইস্লাম মতবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং মুসলিম সংস্কার আন্দোলনের প্রবর্তক। রাজনৈতিক মতবাদের জন্য স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত হন। তাঁর 'অল্ উরওয়া অল-উৎকুয়া' (অচ্ছেদ্য বন্ধন) প্রকাশিত হয় প্যারিস থেকে।

অল্ আখতাল্ (আনু : ৬৪০-৭১০) : দামাস্কাসের উমায়াদ বংশোদ্ভূত কবি। জন্ম ইরাকে। তাঁর রচিত দিওয়ানগুলিতে সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক ও ধর্মমতের ছাপ রয়েছে। তাঁর ব্যঙ্গমূলক 'মুহাযা' অপূর্ব রচনা।

ইবন্ মহম্মদ বতুতা (১৩০৪-৭৭) : প্রসিদ্ধ আরব পর্যটক। জন্ম তাঞ্জোরে। তিনি দীর্ঘ আঠাশ বৎসরকাল প্রাচ্য ও পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং প্রায় পঁচাত্তর হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেন। আর এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমাকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন সহজ সরস অপূর্ব রচনায়।

ইসফাহানি বা আবু-অল্-ফারাজ (৮৯৭-৯৬৭) : আরবী কবি। ইরানে জন্ম। বাগ্দাদে অবস্থানকালে তিনি শাস্ত্রীয় আরবী গ্রন্থে পারদর্শী হন। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইসফাহানির 'কিতাব অল-আঘানি' (গানের বই)। এ গ্রন্থে সমগ্র আরবী কবিতা গানের সুরে স্বরলিপি করা হয়েছে।

ইবন্-অল্-খাতিব (১৩১৩—৮৪) : লিসান-অল্-দিন নামে তিনি ছিলেন পরিচিত। একাধারে তিনি ছিলেন রাজনীতিজ্ঞ, গীতিকার ও বহু গ্রন্থের রচয়িতা। মুওয়াশ কাব্যগ্রন্থের কবি হিসাবেও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইতিহাস, ভূগোল,

দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র বহুবিধ বিষয়ে তিনি আলঙ্কারিক ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

আহম্মদ নাদিম (মৃত্যু আনুঃ ১৭৩০): 'তুলিপ যুগের' বা 'লালে দেভরি' যুগের বিখ্যাত তুর্কী কবি। কশিদা রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ভাষা ও শব্দ চয়নে সুনিপুণ। প্রতিপক্ষকে কবিতার লড়াইয়ে নাজেহাল করতে তিনি ছিলেন পটু।

আবু নুয়াস্ (আনুঃ ৭৫০-৮১০): প্রাচীন যুগের প্রসিদ্ধ আরবী কবি ও গীতিকার। বাগদাদে এসে তিনি বসবাস করেন এবং খলিফা হারুণ অল্-রশিদের অনুগ্রহ লাভ করেন। তাঁর গীতিকবিতায় দ্রাক্ষা ও মদিরার প্রভাব পরিলক্ষিত। রুচির বাদ-বিচার বড় একটা ছিল না তাঁর গীতি রচনায়।

ওমর ইবন-আবি-রাবিরা (আনুঃ ৭১৯): আরবী কবি ও গীতিকার। বাবা ছিলেন মক্কার ধনী মুসলমান আর মা খৃষ্টধর্মী। তাঁর হাস্ত ও লাস্তমুখর কবিতাগুলি গোঁড়া মুসলিম সমাজে বিরূপ সমালোচনার সৃষ্টি করেছিল। সুরা ও সাকী ছিল তাঁর কবিতার উপজীব্য।

ইয়াকুব স্বরূপ: আধুনিক আরবী লেখক। জন্ম লেবাননে। শিক্ষা বেরুট বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁকে আধুনিক আরবী চিন্তাধারার একজন পথিকৃৎ বলা যায়। তাঁর সম্পাদিত 'অল্-মুক্তাতফ্' পত্রের মারফত তিনি আরবী গদ্যের উন্নয়ন সাধনে ব্রতী হন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

আহম্মদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২): তুর্কী বংশোদ্ভূত আরবী কবি ও গদ্য লেখক। 'অল্-শাওকিয়াৎ' তাঁর প্রথম কাব্য সংকলন। প্রকাশ কাল ১৮৯৮। সাহিত্য সম্পদ ও কাব্য সুষমায় তাঁর রচনা বিদগ্ধ মিশরীয়দের চিত্ত জয় করে। গদ্য রচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত এবং নাট্যকারদের মধ্যেও ছিলেন অগ্রণী।

ইব্রাহিম সিনাসী এফেণ্ডী (১৮২৬-৭১): আধুনিক তুর্কী কবি ও সাংবাদিক। 'তার্জিমানি আহভল' (ঘটনাপঞ্জীর সমীক্ষা) পত্রের সম্পাদক। এ পত্রের মারফত তিনি এক নতুন সাহিত্য রীতি ও আদর্শের প্রচলন করেন। ফরাসী পত্র-পত্রিকা থেকে তিনি বহু কবিতা ও প্রবন্ধ অনূদিত করে তুর্কী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। নামিক-কেম্যালের সহযোগিতায় তিনি 'তস্ভিরি এফকার' বা মতাবলীর ফলক রচনা করেন। তাঁর 'হিম' আধুনিক তুর্কী গীতিকবিতার সেরা নিদর্শন।

তাহা হুসেন: আধুনিক আরবী সাহিত্যের জনক। জন্ম ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। শৈশবে দৃষ্টিশক্তি হারান। কিন্তু আপন অধ্যবসায় গুণে আরবী ও প্রাচীন সাহিত্যে পারদর্শী হয়ে উঠেন এবং আরবী শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় উজ্জীবনে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর 'অল্-আদাব অল্-জাহিলি' (প্রাক্-ইসলামী সাহিত্য) গোঁড়া মুসলিম

সমাজে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি তাঁর 'মুস্তাকবাল অল্-তাকাফা ফি মিশর' (মিশর সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ) গ্রন্থে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে মিশর ইটালী বা ফ্রান্সের মত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। ইংরেজ এক্তিয়ারভুক্ত নয়। উগ্র মিশরীয়পনা সত্ত্বেও তাহা হুসেন ছিলেন আরবীয় উদারনৈতিকদের কাছে প্রিয়। তাঁর রচনারীতি ছিল সহজ, হৃদয়গ্রাহী ও মননশীল। সনাতনীদের কড়া সমালোচনা সত্ত্বেও তাহা হুসেন ছিলেন বুদ্ধিজীবীদের প্রিয় লেখক।

জর্জি জয়দন: আধুনিক আরবী ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম বেইরুটে। তিনি বহু উপন্যাস, পাঁচখণ্ডে বিভক্ত ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস ও চার খণ্ডে আরবী সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করে গেছেন। এ ছাড়া তিনি 'আল হিলাল' (বাঁকা চাঁদ) প্রগতিশীল মাসিক পত্রের সম্পাদনা করেন। পাশ্চাত্য ভাবধারার তিনি ছিলেন অন্যতম প্রবর্তক। তিনি প্রাচীন আরবী সাহিত্য ও ইতিহাসেরও ছিলেন একান্ত গুণগ্রাহী। তাঁর রচনাসম্পদ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যে কোন সেরা সাহিত্যের সমতুল্য। খৃষ্টধর্মী হলেও তিনি ছিলেন মুসলিম আরব জগতের প্রতিভূ।

আবু অল আতাহিয়া (আনুঃ ৭৪৮—৮২৮): প্রাচীন আরবী সাহিত্যের দিকপাল। তাঁর কাব্যে সাধারণ মানুষের ভাষা ফুটে উঠেছে। অলকুফার নামক স্থানে এক গরীবের ঘরে তাঁর জন্ম।

অল ওয়ালতাদা: মুসলিম স্পেনীয় সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি। স্পেনের স্যাফো নামে পরিচিত।

আবু মামা (মৃত্যু ৮৮৬): তিনি ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। জোয়ার-ভাটার নিয়ম সম্পর্কে প্রথমে তিনি ইউরোপকে অনুসন্ধিৎসু করে তোলেন।

আবু তালিব অলমাকি (মৃত্যু ৯৯৬): আরবী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ সূফী। তাঁর রচিত 'হৃদয়ের মোরাক' এখনও সূফী সাহিত্যে সমাদৃত।

হাফিজ ইব্রাহিম: আরবী সাহিত্যের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি মিশরীয় ঐতিহ্যের জয়গান গেয়ে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

ইউসুফ এস সেবাই: মিশরের প্রগতিশীল ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সমালোচক ও ছোটগল্প লেখক। শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের জন্য 'ওগোনিয়ক' সমালোচনা পুরস্কার লাভ করেন। বহু সাহিত্য ও রাজনৈতিক পত্র পত্রিকার সম্পাদক। সর্বাধুনিক উপন্যাস 'উই ডু নট্ প্ল্যান্ট থরনস্' (আমরা কাঁটা পুঁতব না)। প্রকাশ কাল ১৯৬৮। তাঁর বহু উপন্যাস ও নাটক বিভিন্ন ভাষায় আফ্রো-এশিয়ায় অনূদিত হয়েছে। তিনি আফ্রো-এশিয়া লেখক সম্মেলনের জেনারেল সেক্রেটারী এবং লোটস্ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক।

ইব্রাহিম এল-আসোউদ: টিউনেসিয়ার প্রগতিশীল আরবী গল্প-লেখক। তাঁর ছোট গল্প মানব-দরদী ও গীতধর্মী।

মামুদ দরবেশ : প্যালেস্টাইনের তরুণ কবি। পশ্চিম গ্যালিলি অল্ বরোয়া গ্রামে জন্ম। ইস্রাইল অবরোধ বিরোধীতার জন্য তিনি ইস্রাইলি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এবং প্রতিরোধ কবিতা রচনা করেন। তাঁর কাব্যে অত্যাচারী শাসকবর্গের নগ্ন রূপ প্রকটিত হয়েছে। মামুদ দরবেশ ১৯৬৯ সালে 'লোটাস্ পুরস্কার' লাভ করেন।

গিলি-আবদুল রহমান : সুদানী কবি ও সমালোচক। তাঁর সাহিত্য প্রবন্ধ-গুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আধুনিক কবি হিসেবেও তিনি লব্ধ প্রতিষ্ঠিত।

আবদেল বারি আবদেল রজেক এল নেগমি :—ইরাকী বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক। তিনি তাঁর গবেষনামূলক সাহিত্য প্রবন্ধের দ্বারা আধুনিক গল্প সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

রুমী (১২০৭-৭৩)**:** ইরানের সুপ্রসিদ্ধ কবি, দার্শনিক ও দরবেশ। পুরো নাম জালাল অল্-দীন মহম্মদ। তিনি ছিলেন রুম বা এশিয়া মাইনরের অধিবাসী। তাঁর রচিত মসনবীর মোট সংখ্যা প্রায় চব্বিশ হাজারের মত। এই মসনবীগুলিতে তাঁর সূফী মতবাদের প্রত্যক্ষ স্বাক্ষর রয়েছে : এ নিখিল বিশ্ব আল্লার সৃষ্টির অংশবিশেষ। এ বিশ্ব চরাচরের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর স্বরূপ প্রকটিত করেন। মানুষের তাই তাঁর হৃদয়মুকুটকে পরিষ্কার ঝকঝকে করে রাখা উচিত। যাতে ঐ দর্পণে কোনরূপ আবর্জনা জমতে না পারে। এ হল রুমীর দার্শনিক মতবাদ।

জোরাথুস্ত্র (খ্রী:পূঃ ৬৬০-৫৮৩)**:** প্রাচীন পারসিক ধর্ম-সংস্কারক। ইরানের আর্য ধর্মকে ইনিই সর্বপ্রথম একটি পদ্ধতির মধ্যে ফেলে ব্যাখ্যা করেন। জন্ম পশ্চিম এশিয়ায়। অনেকের মতে ইনি অষ্টম শতকের লোক। জোরাথুস্ত্র দ্বৈত শক্তিতে বিশ্বাস করতেন। জোরাথুস্ত্রের প্রবর্তিত ধর্ম পারস্য দেশে ১২০০ বৎসরের উপর প্রচলিত ছিল। সপ্তম শতকে আরবের মুসলমানরা পারস্য অধিকার করলে তখন তা লোপ পায় অনেকটা। পারসিকরা তারপর এসে ভারতে আশ্রয় নেন। জোরাথুস্ত্রের রচিত 'জেন্দাবেস্তা' প্রাচীন ইরানী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

হালিদ এদিব আদিবর : আধুনিক তুর্কী মহিলা কবি ও লেখিকা। হালিদ এদিব নামেই তিনি পরিচিতা। ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী ভাষার অধ্যাপিকা। জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের জন্য তিনি সুবিখ্যাত। 'ভাঁড় ও তাঁর কন্যা' উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। ইংরাজীতে লেখা 'দি তার্কিস অর্ডিল' আর 'স্মৃতিচারণ' তাঁর অপর দু'খানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

ফিকরেট তেভফিক (১৮৬৭-১৯১৫) **:** আধুনিক প্রসিদ্ধ তুর্কী কবি ও সাংবাদিক। তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্র 'সারভেতি ফান্থন' তুর্কী নব সাহিত্য (ইদেবিয়াতি জেদিদে) নতুন সাহিত্য সৃষ্টিতে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। তিনি নতুন

কবিতা ছন্দের প্রবর্তন করেন। তুর্কী সাহিত্যে তিনি সনেটেরও প্রচলন করেন। 'কবাবি শিকেস্তে' তাঁর কবিতার বই। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'সিস্' (কুয়াশা) আবদুল হামিদের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে রচিত। তাঁর সাম্প্রতিক কবিতায় বহু পারসী ও আরবী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

মহম্মদ মাসুদ: ইরানের সমকালীন কথাশিল্পী। 'তল্লাস-ই-মাস' (জীবিকার সন্ধানে) তাঁর বলিষ্ঠ উপন্যাস। প্রকাশ কাল ১৯৩২ সাল। আততায়ীর হাতে তাঁকে প্রাণ হারাতে হয়।

বুর্জগ আলাভি আলি: শক্তিশালী ইরানী গল্প-লেখক। প্রথম গল্প-গ্রন্থ: 'চামদান' (স্যুটকেশ)। রাজনৈতিক কারণে তাঁকে কারাবরণ করতে হয় দীর্ঘকাল। অপর গ্রন্থ: 'বন্দীশালার দিনপঞ্জী', '৫৩ জন', 'নামেহ্' (চিঠি), 'মেয়েটির চোখ' উপন্যাস প্রভৃতি।

সেখ সাদী (আনু: ১২১৫-৯২): বিখ্যাত পারসিক কবি। সিরাজ নগরে জন্ম। তিনি সেখ মোস্‌লেহ উদ্দীন্ সাদী অল্ সিরাজী নামে পরিচিত ছিলেন। শৈশবে বিদ্যাশিক্ষার পর যৌবনে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করেন এবং খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। ত্রিপোলী নগরে তিনি খৃষ্টানদের হাতে বন্দী হন। তিনি 'সূফী' সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আবদুর কাদের গিলানির শিষ্য ছিলেন। 'গোলেস্তাঁ' ও বোস্তান' তাঁর রচিত স্মরণীয় গ্রন্থ।

ফেরদৌসী (৯৩৫-১০২৫): 'শাহানামা' বা রাজপঞ্জীর অমর রচয়িতা। ফেরদৌসীর পুরো নাম আবুঅল্-কাশেম হাসান্ ইবন্ আলি অব্‌তুস। 'শাহানামা'য় তিনি ইরান ও আরবের রাজকুলপঞ্জী বিচিত্র ছন্দ আকারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পাঠক-পাঠিকার চিত্ত আকর্ষণে তিনি তাঁর 'শাহানামা'য় বহুবিধ গল্প কাহিনীর অবতারণা করেছেন। 'শাহানামা' রচনার দীর্ঘ এতকাল পরে ইরানী সাহিত্যে তাঁর স্থান আজিও অম্লান।

ইবন্ সিনা (৯৮০—১০৩৭): অভিসিনা নামে সাধারণের নিকট পরিচিত। পুরো নাম আবু অল্-হোসেন ইবন্ আবদুল্লা। ইরানী গণিতজ্ঞ, জ্যোতিষী, চিকিৎসাশাস্ত্র বিশারদ ও তার্কিক হিসাবে খ্যাত। তিনি প্রায় একশখানি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। আরবী ভাষায় রচিত তাঁর 'কিতাব অল্-শিফা'। অল্-শিফাকে রীতিমত কোষগ্রন্থ বলা যায়। কেননা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল তথ্য জানবার এমন কোন বিষয় বাকী নেই যা তাঁর 'কিতাব অল্-শিফা'তে সংযোজিত হয়নি। চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে তাঁর আর একখানি গ্রন্থ 'অল্-কোয়া হুন'। পারস্য ভাষাতে রচিত তাঁর দার্শনিক গ্রন্থ 'দানেশ নামাই আলাই'। তিনি দু'খানি উপাখ্যানও লিখে গেছেন।

যামী (১৪১৪—৯২): ইরানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। পুরো নাম মুল্লা নূর অল্-দীন আবদ অল্-রহমান। ইরানী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন ফেরদৌসী, নিজামী,

রুমী, সাদী, হাফিজ আর যামী। ফেরদৌসী যদি হন মহাকাব্যে শ্রেষ্ঠ, নিজামী রোমান্সে, রুমী যদি হন অতীন্দ্রিয় কাব্যে, সাদী হন নীতি কাব্যে আর হাফিজ গীতি কবিতায়; যামীর স্থান কিন্তু সর্বাঙ্গীণ কাব্য সুষমায়। তিনি ছিলেন ইরানের প্রাচীন কবিকুলের কনিষ্ঠতম। দিভান, মসনবী 'সাবআ' বা সপ্ত সিংহাসন ইত্যাদি বহু রচনা করেছেন।

নিজামী (১১৪০-১২০৩) : পুরো নাম আবু মহম্মদ ইলিয়াস নিজাম অল্-দীন। প্রসিদ্ধ ইরানী কবি। মসনবী কাব্য উপাখ্যান রচনায় তিনি ছিলেন ফেরদৌসীর পরে। তাঁর 'খামসা' (পঞ্চরত্ন) রচনা করতে সময় লেগেছিল তিরিশ বৎসর। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'খসরু ও শিরিন'। এর শ্লোক সংখ্যা প্রায় সাত হাজার। সাসনীয় রাজা দ্বিতীয় পারভিজকে কেন্দ্র করে এই কাহিনী রচিত। তাঁর প্রথম জীবনের রচনা হল 'দি মখজান অল্-আসার' (অতীন্দ্রিয়লোক)। এ গ্রন্থে তাঁর সুফী মতবাদের ছাপ রয়েছে। কাব্য আকারে তিনি বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের উপাখ্যান ও দর্শন লিপিবদ্ধ করে গেছেন। রচনা গুণে তিনি পাঠকের চিত্ত জয় করতে সক্ষম হন।

ওমর খইয়াম (আনুঃ ১০৫০-১১২৩) : ইরানের অমর কবি, দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ। পুরো নাম ঘিয়াস অল্-দীন আবু-অল্-ফাত ওমর আইবন ইব্রাহিম অল-খইয়াম। আরবীতে তিনি প্রথম বীজগণিত রচনা করেন। ওমর খইয়াম 'যিজ-ই মালিকসাহি' নামে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপরও একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু তাঁর অমর সৃষ্টি হোল রুবাঈয়াৎগুলি। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে এ অমর কবিতাগুলি।

মহম্মদ আবদুল বাকি (১৫৬২—১৬০০) : অটোমেন সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তুর্কী কবি। জন্ম কনস্টান্টিনোপলে। ফুজুলির মত বাকিও সম্রাট সুলেমনের 'স্বর্ণযুগে' ছিলেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর রচিত সম্রাট সুলেমনের প্রশস্তিগীতি তুর্কী সাহিত্যের এক অপূর্ব অবদান। হাফিজের অনুকরণে তিনি সুরা-সাকী আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে বহু অনবদ্য রচনা রচিত করেছেন। তাঁর সমুদয় কাব্য-মূল্যায়ণে তাঁকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির আসনে আসীন করা যায়।

হীবরু ও য়িড্ডিশ

সামুয়েল যোসেফ এগনন (১৮৮৮—১৯৭০) : ইনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯৬৬ সালে সাহিত্য ক্ষেত্রে লেখিকা নেলী স্যাচস্ (Sachs)-র সঙ্গে যুগ্মভাবে। হীবরু সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও ঔপন্যাসিক। জাতিতে ইহুদী। অল্প বয়স থেকে তিনি লিখতে শুরু করেন। সাড়ে পনেরো বৎসর বয়সে তাঁর প্রথম হীবরু কবিতার বই 'একটি ক্ষুদে বীর' প্রকাশিত হয়। আঠারো বৎসর বয়স থেকে তিনি নিয়মিত ইহুদীদের জিওনিষ্ট পত্র-পত্রিকায় লিখতে থাকেন এবং ইহুদী সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণায় রত হন। এই উদ্দেশ্যে

১৯১৩ সালে তিনি অধিক গবেষণার জন্ম বার্লিন গমন করেন। সেখানে শিক্ষকতার দ্বারা আপনার আরাধ্য গবেষণার কাজ চালাতে থাকেন। এ সময় তাঁর প্রথম গল্পের বই প্রকাশিত হয়। হাসিডিমের কাহিনী সংগ্রহেও তিনি এ সময় নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সালে তিনি জেরুজালেমে ফিরে আসেন। পোল্যাণ্ডে ও গ্যালিসিয়ায় ভ্রমণকালে তিনি তথাকার ইহুদীদের জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করেন। প্রবাসী ইহুদীদের দুঃস্থ জীবনযাত্রা নিয়ে তিনি উপন্যাস লেখেন 'এ গেস্ট ফর দি নাইট' (রাত্রির অথিতি)। ১৯৪০ সালে এ প্রকাশিত হয়। তার আগের বৎসর প্রকাশিত হয় 'দি ব্রাইডেল ক্যানোপি'। অষ্টাদশ শতকের গ্যালিসিয়ার এক মনোরম চিত্র। তাঁর আর একখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হল 'ইস্রাইল ভূমি'; আগেকার পথিকৃৎদের নিয়ে লেখা 'অনলি ইয়েস্টার ডে'। গ্যালিসিয়া, পোল্যাণ্ড, লিথুনিয়া, জার্মান ও ইস্রাইল ভূমির ব্যাপক পটভূমিকায় তিনি বহু গল্প কাহিনী, ছোট উপন্যাসিকা রচনা করেছেন। তাঁর গল্প উপন্যাস সংকলনের সাত খণ্ড স্টকহলম থেকে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৪ সালে আর ১৯৬২ সালে তার অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হয়। সামুয়েল এগননের বহু গ্রন্থের মধ্যে 'বুক্‌স্ রাইটারস্ এ্যাণ্ড ষ্টোরিজ' (১৯৩৮), 'ডেস অফ অ' ইত্যাদি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এগননের রচনাবলী পৃথিবীর একাধিক ভাষায় অনূদিত। ১৯৬৭ সালে তাঁর নির্বাচিত এক গল্পসংকলন সুইডিস ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে "I Havets Milt" (সমুদ্রের মধ্যিখানে) শিরোনামায়। ১৯৩৬ সালে তিনি জুইস্ থিওলজিক্যাল সেমিনারি কর্তৃক অবৈতনিক ডক্টরেট সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৩৫-৫১ সালে তেল আভিব মিউনিসিপ্যালিটির 'বিয়ালিক পুরস্কার' লাভ করেন। আর ১৯৫০-৫৮ সালে লাভ করেন ইস্রায়েল পুরস্কার। ১৯৬৩ সালে তিনি প্রথম আরবিং ও বারথা নিউম্যান পুরস্কার পান।

শাগলোম জ্যেকব আব্রামোউইচ (১৮৩৬—১৯১৭): হীবরু ও য়িড্ডিশ লেখক। প্রকৃত নাম মেনডেল মোচার স্ফোরিম। শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়ে তিনি প্রথম সাহিত্য জীবন শুরু করেন। তিনি তিন খণ্ডে প্রাকৃতিক ইতিহাস রচনা করেন। হীবরু ভাষায় রচিত তাঁর উপন্যাস 'হা-এবত ভে-হাবানিম' (পিতা-পুত্র) জনপ্রিয়তা অর্জন করে। স্ফোরিম অতঃপর প্রবাসী ইহুদীদের মাতৃভাষা য়িড্ডিশ ভাষায় গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং য়িড্ডিশ সাহিত্য প্রচারের জন্ম দক্ষিণ রাশিয়ার ইহুদীদের ঘিঞ্জি শহরে বই ফেরি করেন এবং ইহুদীদের জীবনযাত্রার কথা নিয়ে মনোরম উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর প্রথম য়িড্ডিশ উপন্যাস 'দশ ক্লেইন মেনশেল' (বামন)। পরের বৎসর প্রকাশিত হয় তাঁর 'ডশ উইনস্ফিঙ্গারিল' (ইচ্ছাময়ী আংটি), 'দাই তাকশে' (মাংস-কর), 'ফিশকে দের ক্রিমার' (খোঁড়া ফিশকে) প্রভৃতি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। 'ফিশকে দের ক্রিমারে' তিনি তাঁর আপন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এক খোঁড়া ভিখারীর সঙ্গী হিসেবে। 'দের প্রিসিব'

নামে আর একখানি প্রসিদ্ধ নাটকও তিনি রচনা করেন। য়িড্ডিশ কথাশিল্পে তাঁর স্থান রচনাশৈলীর জন্য বিশিষ্ট আসনের অধিকারী এবং আধুনিক য়িড্ডিশ সাহিত্যের জনক নামে পরিচিত। হীবরু সাহিত্যে তাঁর আর এক অবদান হোল 'বে-সেতার রাম' (বজ্র-থেকে রক্ষা) ছোট গল্পগ্রন্থ। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'বা-ইয়ামিন হা-হাইম' (ফেলে-আসা দিনগুলিতে) হীবরু সাহিত্যের জয়যাত্রা বৃদ্ধি করেছে।

আহাদ্ হা-এ্যাম (১৮৫৬-১৯২৭): আধুনিক হীবরু লেখকদের মধ্যে অগ্রণী। দার্শনিক হিসেবেও পরিচিত। প্রকৃত নাম আসের গিনসবার্গ। 'হাসি লোয়া' মাসিক পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক। আহাদ্ হা-এ্যাম পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা ইহুদীদের একত্রিত করে ইস্রায়েল রাজ্য স্থাপনের ছিলেন অন্যতম প্রবর্ত্তক।

যুডা বেন সলোমন অল হারিসি (১১৬৫—১২২৫): হীবরু কবি। দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো আর নীতিমূলক সরস কবিতা গল্প রচনা ছিল তাঁর জীবিকা। তিনি তাঁর কবিতাগুলি 'মাচবেরেত তাহকিমোনি'তে (তাহকিমোনি গ্রন্থে) লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আরবী ভাষা থেকেও তিনি বহু রচনা হীবরুতে অনুবাদ করেন।

হায়িম নহমন বিয়ালিক (১৮৭৩—১৯৩৪): যুদা হালেভির পর শ্রেষ্ঠ হীবরু কবি। জন্ম রাশিয়ার এক গ্রামে। অল্প বয়সে তিনি আহাদ হা-এ্যামের সংস্পর্শে আসেন। এবং জিয়োনিজমের উপর প্রবন্ধ রচনা করে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রথম অবতীর্ণ হন। অপূর্ব কাব্য শক্তি গুণে চিরাচরিত হীবরু কবিতাকে আধুনিক নতুন ঢঙে পরিবেশিত করেন। নতুন করে প্যালেস্টাইন গড়ার স্বপ্নেও তিনি মুখর হয়ে উঠেন। শুধু কবি নন বিয়ালিক, নিজে একজন শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীও। তার প্রমাণ বিয়ালিকের বহু গল্প আর উপন্যাসে নিহিত রয়েছে। প্রাচীন হীবরু সাহিত্যের পুনরুদ্ধারে তিনি ছিলেন সচেষ্ট। বন্ধু যে. এইচ, রবিনস্কির সহযোগিতায় তিনি ইহুদীদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে ব্রতী হন। মধ্যযুগের হীবরু কবিতা সংকলন প্রকাশিত করেন। তা ছাড়া ইবন গ্যাবিরল ও মোজেস ইবন ইজরা কবিতার পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশিত করেন। হীবরু সাহিত্যে সুসম্পাদিত এ দুইটি কবিতাসংকলন অপূর্ব সম্পদ।

আব্রাহাম গোল্ড ফাদেন: য়িড্ডিশ কবি ও গীতিকার। আধুনিক য়িড্ডিশ নাট্যমঞ্চের জনক। জন্ম সোভিয়েট ইউনিয়নের ইউক্রেনে। প্রথম জীবনে ইহুদী পরিবেশে গীতি রচনা করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৮৭৬ সালে রুমানিয়ায় তিনি প্রথম আধুনিক য়িড্ডিশ থিয়েটার স্থাপন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত থিয়েটারের জন্য তিনি নিজে সঙ্গীত রচনা করতেন।

যুদা লোয়েব জর্ডন (১৮৩০-৯২): প্রসিদ্ধ হীবরু কবি ও লেখক। জন্ম লিথুনিয়ায় এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে। তাঁর ধারালো সমালোচনামূলক রচনার জন্য তিনি রুশ কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন। কিন্তু নতুন নতুন স্বদেশী কবিতার জন্য তিনি যুবমহলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।

আব্রাহাম বেন মীরআইবন ইজরা (১০৯২-১১৬৭): মধ্য যুগীয় হীবরু কবি, পণ্ডিত ও পর্যটক। জন্ম স্পেনে। তাঁর কবিতা ভাষার লালিত্য ও ছন্দ নৈপুণ্যের জন্য বিখ্যাত। হীবরু ভাষায় তাঁর ছিল অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। তিনি বাইবেলের টীকা রচনা করে গেছেন।

মোজেস বেন আইবন ইজরা (১০৭০-১১৫০): হীবরু কবি ও গীতিকার। জন্ম স্পেনের গ্রানাদায়। প্রথম জীবনে আপন ভ্রাতুষ্পুত্রীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়ে তিনি পৃথিবীর বহু স্থানে ঘুরে ঘুরে বেড়ান। হীবরু ভাষায় রচিত তাঁর গান ও কবিতাগুলি প্রেম অনুরাগের সোনার অক্ষরে লিখিত। তিনি বহু ধর্মমূলক গীতিও রচনা করে গেছেন। এ জন্য তাঁকে গীতিকার মোজেস বলা হয়ে থাকে।

সলোমন আইবন গ্যাবিরল (১০২১-৫৮): মুরীস স্পেনের স্বর্ণযুগের প্রথম শ্রেষ্ঠ হীবরু কবি। তাঁর জীবনবৃত্তান্ত বিশেষ জানা যায় না। তবে এটুকু শুধু জানা যায় তিনি স্পেনের মালাগাতে জন্মগ্রহণ করেন আর ভ্যালেনসিয়াতে মারা যান। অধিকাংশ কবিতাই তাঁর দর্শন, ধর্ম ও তত্ত্বমূলক। তাঁর 'কেথের মেলুথ'তে (রাজমুকুট) দার্শনিক চিন্তার ছাপ রয়েছে। তিনি আরবীতেও বহু দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। 'মেকন হাইম' (জীবনের প্রস্রবন) তাদের মধ্যে অন্যতম।

ইমানুয়েল বেন সলোমন অব রোম (১২৬৮-১৩৩০): স্পেনীয় স্বর্ণযুগের শেষ হীবরু কবি। স্বর্গ ও নরক বা 'অটস্ ফেথ ভে-হা ইডেন' তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা। দগনতের অনুকরণে রচিত। তাঁর রচনায় হাস্যরসের ছাপও রয়েছে। হীবরু সাহিত্যে তিনি প্রথম ইটালীয় সনেটের প্রবর্তন করেন। বাইবেলের টীকা-টিপ্পনীও তিনি রচনা করে গেছেন।

যুদা হালেভি (১০৮০-১১৪০): প্রাচীন হীবরু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলে পরিগণিত। জন্ম স্পেনে। আইবন গ্যারিবলের মতো তাঁর কবিতা আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদে তেমন সমৃদ্ধ না হলেও, ছন্দলালিত্যে ও কাব্য-সুষমায় তা অনবদ্য। আরবী ভাষাতেও তিনি চিন্তাশীল বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত কবিতাগুলির মধ্যে 'সুইট্ সিঙ্গার অব জিয়ন' (জিয়নের সুকণ্ঠ গায়ক), 'লঙিং ফর জেরুজালেম' (জেরুজালেমের জন্য আকুলতা) প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শোলেম আস্ক (**জন্ম: ১৮৮০**): সমকালীন য়িড্ডিশ কথাশিল্পী। জন্ম পোল্যাণ্ডে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। তাঁর গল্প উপন্যাসের মধ্যে 'তিন নগর' সব চাইতে প্রসিদ্ধ। এই ত্রয়ী উপন্যাসে তিনি প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ প্রাক্কালীন রাশিয়ার ইহুদীদের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। 'প্রতিশোধের দেবতা' তাঁর বিতর্কমূলক নাটক।

রিউবেন ব্রাইনিন (১৮৬২-১৯৩৯): হীবরু সাহিত্যের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও সমালোচক। জন্ম রাশিয়ায়। শিক্ষা ভিয়েনা ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

তিনি হীবরু সাহিত্যে চিরাচরিত প্রথার বিরোধিতা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সেমিজরা উনিমারব' (পূর্ব-পশ্চিম থেকে) সাময়িক পত্রের মারফত তিনি উদারনৈতিক পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রবর্তনে সমর্থন করেন। এবং নতুন লেখকদের উৎসাহ দেন। তিনি কিছুকাল নিউ ইয়র্কে হীবরু মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদনা করেন। শেষ বয়সে তিনি বলশেভিক মতবাদে বিশ্বাসী হন।

ডেভিড্ ফ্রিসম্যান (১৮৬০-১৯২২): আধুনিক হীবরু লেখক। সমকালীন হীবরু লেখকদের মধ্যে কবি ও সমালোচক রূপে প্রতিষ্ঠিত। তিনি হীবরু কবিতাকে ইউরোপীয় শিল্প ও সাহিত্যের মাপকাঠিতে ঢালাই করেন। ইউরোপীয় বহু লেখকের রচনাও অনুবাদ করেন।

ডেভিড্ পিনস্কি (জন্ম: ১৮৭২): য়িড্ডিশ নাট্যকার ও কথাশিল্পী। জন্ম নীপা নদীর তীরে। মেহনতি জনসাধারণের গল্প রচনা করেন। মার্কিন মুলুকে ইহুদীদের জীবনযাত্রা নিয়ে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসও রচনা করেন। কিন্তু নাট্যকার হিসেবে তিনি সবিশেষ খ্যাত। 'তিনটি নাটক', 'দশটি নাটক', 'গুপ্তধন', 'রাজা ডেভিড ও তাঁর রাণীরা' প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য।

ইহোয়াস (১৮৭১-১৯২৭): নতুন য়িড্ডিশ কাব্য সাহিত্যের অগ্রণী। য়িড্ডিশ সাহিত্যে তিনি বাইবেল অনুবাদ করেন। য়িড্ডিশ ভাষায় আমেরিকান কবিদের কবিতারও অনুবাদক।

বাংলা দেশ ও পাকিস্তান

মহম্মদ ইকবাল (১৮৭৫-১৯৩৮): পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা দার্শনিক কবি। ডক্টর (স্যার) মহম্মদ ইকবালের জন্ম শিয়ালকোটে। শিক্ষা লাহোর, ক্যামব্রিজ, লণ্ডন ও মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট হন 'পারস্যের তত্ত্ব দর্শনের বিকাশ' সম্বন্ধে গবেষণা করে। লণ্ডন থেকে ব্যারিস্টারীও পাশ করেন। কবি জীবনের শুরুতে গীতিকবিতা ও স্বদেশপ্রীতিমূলক বহু কবিতা রচনা করেন। গালিবের মত উর্দু ও ফারসী উভয় ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন। 'আসরার ই-খুদী', 'রামুযে বেখুদী' প্রভৃতি রচনায় ইকবালের কাব্য দর্শন ব্যক্ত হয়েছে।—জীবন গতিশীল, জীবনের এই গতিশীলতার পথে যত কিছু বাধা-বিপত্তি আসবে তাদের জয় করে জীবন এগিয়ে যাবে। জীবনের পথে কোন আদর্শে পৌছুতে হলে শৃঙ্খলা, শাসন প্রত্যেক মানুষকেই মেনে চলতে হবে: এ সুরেই হয় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ শক্তির সংযোগ: যে কবির কাব্য জীবনকে সমৃদ্ধ করে, তার ব্যক্তিত্বে দেয় শক্তি তার সম্বন্ধে ইকবাল ছিলেন মুক্ত কণ্ঠ। কায়েদ-ই-আজম জিন্নার কথায় 'ইকবাল ছিলেন আমার কাছে বন্ধু, পথপ্রদর্শক ও দার্শনিক'।

মীর্জা আসাদুল্লা খান গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯): বাংলা সাহিত্যে

রবীন্দ্রনাথের যে স্থান, উর্দু সাহিত্যে মীর্জা গালিবের সেই গৌরবময় স্থান বলা যায়। জন্ম আগ্রার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। জনপ্রিয় উর্দু কবি। যে কোন বিষয় নিয়ে যে কোন সময়ে তিনি কবিতা রচনা করতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। প্রগতিশীল কবি ছিলেন। সুফী মতবাদে বিশ্বাসী হয়েও তিনি ধর্মকে পরিহাস করতে পিছপা হননি। প্রেমের কবিতা রচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর 'দিওয়ানে গালিব' উর্দুতে রচিত শ্রেষ্ঠ রত্ন।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩): বাংলা সাহিত্যের অনুরাগীদের নিকট আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের নাম অজ্ঞাত নয়। এই নীরব সাহিত্যকর্মীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বিপুল সংখ্যক বাংলা পুঁথি আবিষ্কৃত হয়। সাহিত্যবিশারদের রচনাবলীর তালিকা: 'বাংলা পুঁথির বিবরণ' ১ম ও ২য় (১৩২০-২১); 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' (ডঃ মহম্মদ এনামুল হক সহযোগে), 'রাধিকার মানভঞ্জন', 'সত্যনারায়ণ পুঁথি' (কবিবল্লভ বিরচিত), 'মৃগলব্ধ সংবাদ' (রামরাজা বিরচিত); 'মৃগলব্ধ', 'গঙ্গামঙ্গল', 'জ্ঞান সাগর' (আলিরাজা), 'গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস' (বাসুদেব ঘোষ), 'গোরক্ষ বিজয়' (শেখ ফয়জুল্লা), 'সারদা মঙ্গল' (মুক্তারাম সেন), অপ্রকাশিত গ্রন্থ: (১) 'পদ্মাবতী' (আলাওল); (২) 'মুসলিম পুঁথির বিবরণ'।

মীর মশারফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১১): রচনাবলী: 'রত্নবতী', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী', 'বিষাদ-সিন্ধু', 'এজিদ-বধ পর্ব', 'রাজিয়া খাতুন', 'তহমিনা', 'বাঁধাখাতা'; 'নিয়তি কি অবনতি', কাব্য—'গোরাই ব্রীজ' অথবা 'গৌরী সেতু', 'সঙ্গীত লহরী' (১ম খণ্ড), 'বিবি খোদেজার বিবাহ', 'হজরত আমীর হামজীর ধর্মজীবন লাভ', 'মদিনার গৌরব', 'মোসলেম বীরত্ব', 'বাজীমাৎ', 'প্রেম পারিজাত', 'পঞ্চনারী', 'বসন্তকুমারী'; নাটক—'জমিদার দর্পণ', 'এর উপায় কি', 'ভাই ভাই', 'আমার জীবনী', 'বিবি কুলসুম' ইত্যাদি।

কাজী নজরুল ইসলাম (জন্ম: ১৮৯৯): দুই বাঙলার 'বিদ্রোহী' কবি। জন্ম ২৪শে মে বর্ধমান জিলার চুরুলিয়া গ্রামে। দুরারোগ্য ব্যাধিতে বাণী তাঁর আজ স্তব্ধ। কিন্তু কবির 'অগ্নিবীণা'র ঝংকার এখনও অনির্বাণ। দুই বাঙলায় বিদ্রোহী কবির অনুরাগী পাঠক-পাঠিকার অভাব নেই। তাঁর গান ও গীতিকবিতা দুই বাঙলার দিগন্তে আজিও মুখরিত। শুধু কাব্য, ছন্দ ও সুর-ঝংকারে নয়, ভাষার দিক থেকেও তিনি বাংলাভাষাকে সুসমৃদ্ধ করেছেন। সাজিয়েছেন আপন মাতৃভাষাকে উর্দু, ফারসী, আরবী ও সংস্কৃত নানা আলংকারিক শব্দ প্রয়োগে। প্রথম জীবনে সৈনিকরূপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেন। ফিরে এসে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। এবং 'নবযুগ', 'ধূমকেতু', 'লাঙল' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। রাজদ্রোহের জন্য কারাদণ্ডেও দণ্ডিত হন। উল্লেখযোগ্য রচনা: কবিতাগ্রন্থ—'অগ্নিবীণা',

'বিষের বাঁশী', 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট', 'বুল-বুল'। নাটক—'আলেয়া', 'ঝিলমিল'। ছোটগল্প—'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন'। উপন্যাস—'বাঁধনহারা', 'মৃত্যু ক্ষুধা'। তা ছাড়া, কাজী নজরুল হাজার হাজার গানও রচনা করেছেন।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫—১৯৬৫): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। পূর্ব পাকিস্তানের প্রবীণ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষাতাত্ত্বিক। ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রগাঢ় পণ্ডিত। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, তিব্বতী, উর্দু, আরবী, ফারসী প্রভৃতি বহু ভাষাবিদ। বহু গ্রন্থের ও রচনার লেখক। তাঁর প্রধান প্রধান রচিত পুস্তকের মধ্যে 'ভাষা ও সাহিত্য', 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', 'ইকবাল', 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (১ম ও ২য় খণ্ড), 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত', 'পূর্ব-পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান', 'ইসলামী বিশ্বকোষ', 'উর্দু অভিধান', 'বিদ্যাপতি-শতক', 'পলাতক' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

জসীম উদ্দীন (জন্ম: ১৯০৩): দুই বাংলার প্রখ্যাত কবি ও গীতিকার। জন্ম ফরিদপুরে। গ্রামে তাঁর জন্ম। গ্রামেই তিনি লালিত-পালিত। গ্রামের কথাই তাঁর কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর কবিতা নগর-কেন্দ্রিক নয়। গ্রামমুখীন। পল্লীর লক্ষ লক্ষ মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার কথা, প্রাচীন সংস্কৃতি ও পুরাকীর্তির কথা, লোকগাথা রূপায়িত হয়েছে তাঁর রচনায়। গ্রামবাংলার কবি জসীম উদ্দীন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাখালীর' (১৯২৭) অন্তর্ভুক্ত একটি মাত্র কবিতা 'কবর' ('এখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে—') নিয়ে বাংলার কাব্যজগতে স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠিত করে নেন। কিশোর জীবনের রচনা 'কবরে'র মধ্যে যে কবি প্রত্যয়ের উন্মেষ ঘটে, তা পরবর্তী কালের রচনা 'নকসী-কাঁথার মাঠ', 'সোজনবেদিয়ার ঘাট', 'বালুচর', 'ধানখেত', 'রঙীলা নায়ের মাঝি', 'বেদের মেয়ে'তে বিকাশলাভ ঘটে। 'আমার জীবন' কবির সাম্প্রতিক রচনা। তাঁর 'নক্সী কাঁথার মাঠ' (দি ফিল্ড অব দি এমব্রইডার্ড কুইল্ট; অনুবাদক: ই. এম. মিলফোর্ড) ও 'সোজনবেদিয়ার ঘাট' ('দি হোয়র্ফ'—ইউনেসকো) ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে।

কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫১): পূর্ব-পাকিস্তানের কবি। প্রধান প্রধান রচনা: 'বিরহ বিলাপ', 'কুসুম কানন', 'অশ্রুমালা', 'মহাশ্মশান', 'শিবমন্দির', 'শ্মশানভস্ম', 'মহরমশরীফ'।

মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩): প্রধান কাব্যগ্রন্থ—'প্রেম হার', 'অপূর্ব দর্শন', 'হজরত মোহাম্মদ', 'ইসলাম সঙ্গীত', 'জাতীয় ফোয়ারা'। উপন্যাস—'জোহরা', 'দরাফ খান গাজি'। প্রবন্ধ ও জীবনী—'শাহনামা', 'ফেরদৌসী চরিত', 'মহর্ষি মনসুর', 'টিপু সুলতান', 'তাপস-কাহিনী', 'বড়পীর চরিত'। শিশু সাহিত্য—'হাতেম তাই'।

এস. ওয়াজেদ আলী (জন্ম : ১৮৮৮) : প্রধান প্রধান বাংলা রচনা : গল্প ও কাহিনী—'ভাঙা বাঁশী', 'মাশুকের দরবার', 'দরবেশের দোয়া'। রম্য রচনা—'খেয়ালের ফেরদৌসী'। নাটক—'সুলতান সালাদিন'। প্রবন্ধ ও আলোচনা —'ভবিষ্যতের বাঙ্গালী', 'জীবনের শিল্প', 'আমাদের সাহিত্য', 'আল্লার দান', 'পীর পয়গম্বরদের কথা', 'মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ', 'আকবরের রাষ্ট্র-সাধনা', 'ইসলামের ইতিহাস', 'একবালের পয়গাম'। শিশু সাহিত্য—'বাদশাহী গল্প', 'গল্পের মজলিস'।

শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) : কবি। প্রধান রচনা—কাব্য : 'মৃদঙ্গ', 'কল্পলেখা', 'রূপছন্দা মধুছন্দা', 'চিত্রপট'। উপন্যাস : 'মরুর কুসুম', 'হিরণরেখা', 'পরের পথে', 'স্বামীর ভুল', 'ঘরের লক্ষ্মী', 'খেয়াতরী', 'সোনার কাঁকন', 'রিক্তা', 'যুগের আলো', 'পথের দেখা'। নাটক : 'আনারকলি', 'মসনদের মোহ' ইত্যাদি।

গোলাম মোস্তাফা (১৮৯৫—১৯৬৪) : হালকা সুরের সহজবোধ্য কবিতা লেখায় অদ্বিতীয়। প্রধান প্রধান রচনা—কাব্য : 'রক্তরাগ', 'খোশরোজ', 'হাস্নুহানা', 'সাহারা'। কাব্য কাহিনী : 'তরানা-ই-পাকিস্তান', 'বনী আদম বুলবুলিস্তান'। উপন্যাস : 'ভাঙ্গা বুক', 'রূপের নেশা'। অনুবাদ : 'মোসাদ্দাস-ই-হালী', 'জয়-পরাজয়', 'আলকুরাণ', 'শিকোয়া ও জওয়াবে শিকোয়া', 'কালামে ইকবাল'। জীবনী : 'বিশ্বনবী', 'মরুদুলাল'।

ফারুক আহম্মদ (জন্ম : ১৯১৮) : পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠিত কবি। তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য শব্দ সম্পদ। সহজ, সাবলীল শব্দ ঝঙ্কার তাঁর কাব্যকে সজীবতা দান করেছে। মুসলিম সংস্কৃতি ও ধর্ম বিশ্বাসে বিশ্বাসী, পূর্ব বাংলার লোক-সাহিত্যে তাঁর দান প্রভূত। 'আকাশ ও নাবিক' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

সৈয়দ আলী আহসান (জন্ম : ১৯২২) : পূর্ব বাঙলার সমকালীন কবিদের মধ্যে অন্যতম মানবধর্মী কবি। ঢাকা বাংলা একাদেমীর অধ্যক্ষ। 'অনেক আকাশ', 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতা। ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'লিভস অব গ্রাস' তাঁর সার্থক অনুবাদ। কবি নজরুলের কাব্যালোচনাও উল্লেখযোগ্য।

সানাউল হক : সমকালীন কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম চিত্রধর্মী কবি। শ্রেষ্ঠ অনুবাদকের সম্মানেও ভূষিত। আমেরিকা ও রাশিয়ার বহু স্থান পরিভ্রমণ করেছেন। 'নদী ও মানুষের কবিতা', 'সূর্য অন্যতর' এবং 'সম্ভবা অনন্যা' ইত্যাদি গ্রন্থে তাঁর কাব্য প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যায়।

তালিম হোসেন : পূর্ব বাঙলার সমকালীন কবি। 'দিশারী' ও 'শাহীন' তাঁর কাব্য। কবি তালিম হোসেন নজরুলের মুসলিম চেতনামূলক কাব্যের অনুসারী। 'দিশারী'কে মুসলিম চারণ কাব্য বলা যায়।

সৈয়দ সামসুল হক : ঔপন্যাসিক হিসাবেই তিনি খ্যাত। কিন্তু নিরীক্ষামূলক কবিতা রচনারও অনলস কবি। তাঁর উপন্যাসে এই অস্থিরতার সন্ধান পাওয়া যায়।

সিকান্দার আবু জাফর : পূর্ব বাঙলার তথা 'বাঙলা দেশে'র জাতীয়তাবাদী কবি। নজরুলের কাব্যাদর্শ থেকেই তাঁর প্রেরণা। সমাজ সচেতন সংগ্রামী মনোভাব তাঁর কাব্যের প্রতি ছত্রে ফুটে উঠেছে। তাঁর 'বৈরী দৃষ্টি' কাব্যগ্রন্থ এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। বক্তব্যে তিনি স্পষ্টভাষী। তাঁর অতি সাম্প্রতিক একটি সংগ্রামী কবিতা এখানে উৎকলন করা গেল অপ্রাসঙ্গিক হলেও :

।। সংগ্রাম চলবেই ।।

'জনতার সংগ্রাম চলবেই।
আমাদের সংগ্রাম চলবেই ।।
হতমানে অপমানে নয়, সুখ সম্মানে
বাঁচবার অধিকার কাড়তে
দাস্যের নির্মোক ছাড়তে
অগণিত মানুষের প্রাণপণ যুদ্ধ
চলবেই চলবেই,
আমাদের সংগ্রাম চলবেই ।।
প্রতারণা প্রলোভন প্রলেপে
হ'ক না আঁধার নিঃশ্ছিদ্র
আমরা তো সময়ের সারথী
নিশিদিন কাটাবো বিনিদ্র।
দিয়েছি তো শান্তি, আরো দেবো স্বস্তি
দিয়েছি তো সম্ভ্রম, আরো দেবো অস্থি
প্রয়োজন হলে দেবো এক নদী রক্ত
হ'ক না পথের বাধা প্রস্তর শক্ত,
অবিরাম যাত্রার চির সংঘর্ষে
একদিন সে পাহাড় টলবেই।
চলবেই চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই ।।
মৃত্যুর ভর্ৎসনা আমরা তো
অহরহ শুনছি
আঁধার গোরের ক্ষেতে তবু তো
গোরের বীজ বুনছি
আমাদের বিক্ষত চিত্তে
জীবনে জীবনে অস্তিত্বে

কালনাগ-ফণা উৎক্ষিপ্ত
বারবার হলাহল মাখছি,
তবু তো ক্লান্তিহীন যত্নে
প্রাণের পিপাসাটুকু স্বপ্নে
প্রতিটি দণ্ডে মেলে রাখছি।
আমাদের কি বা আছে
কি হবে যে অপচয়,
যার সর্বস্বের পণ
কি সে তার পরাজয়?
বন্ধুর পথে পথে দিনান্ত যাত্রী
ভূতের বাঘের ভয়
সে তো আমাদের নয়।
হতে পারি পথশ্রমে আরো বিদ্ধ
ধিক্কৃত নয় তবু চিত্ত
আমরা তো সুস্থির লক্ষ্যের যাত্রী
চলবার আবেগেই তৃপ্ত।
আমাদের পথরেখা দুস্তর দুর্গম
সাথে তবু অগণিত সঙ্গী
বেদনার কোটি কোটি অংশী
আমাদের চোখে চোখে লেলিহান অ
সকল বিরোধ বিধ্বংসী।
এই কালো রাত্রির সুকঠিন অর্গল
কোনো দিন আমরা যে ভাঙবোই
মুক্ত প্রাণের সাড়া জানবোই,
আমাদের শপথের প্রদীপ্ত স্বাক্ষরে
নতুন সূর্যশিখা জ্বলবেই।
চলবেই চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই ॥'

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ: বিশিষ্ট পূর্ব পাকিস্তানী কথাসাহিত্যিক। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি বাস্তববাদী। তাঁর সর্বাধিক প্রচারিত উপন্যাস 'লাল শালু' পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত। 'নয়নচারা', 'অমাবস্যার চাঁদ' তাঁর বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ। তিনি পি. ই. এন. পুরস্কারও লাভ করেন।

আবু রুশদ: প্রবীণ ঔপন্যাসিক। 'সামনে নতুন দিন' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

আবু ইসাক: পূর্ব বাঙলার নবীন কথাশিল্পী। চট্টগ্রাম কলেজের বাংলা অধ্যাপক। 'সূর্য দীঘল বাড়ী' তাঁর একটি সার্থক উপন্যাস। পল্লীগ্রামের নিখুঁত সমাজচিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই উপন্যাসে। 'আদমজী পুরস্কার' প্রাপ্ত।

শহীদুল্লাহ কায়সার: সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল লেখক। স্বীকৃত রাজনৈতিক নেতা। তাঁর প্রথম বই 'সংশপ্তক' এপিকধর্মী লেখা। 'সারেং বৌ' লিখেছিলেন তিনি জেলে বসে। তাঁর অন্যান্য বইগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে 'রাজবন্দীর রোজনামচা'।

বেগম সুফিয়া কামাল (জন্ম: ১৯১১): পূর্ব পাকিস্তানের বিখ্যাত মহিলা কবি।

মালিমুদা খাতুন সিকদ্দিক (জন্ম: ১৯০০): পূর্ব পাকিস্তানের খ্যাতনামা মহিলা কবি।

সর্দার জয়নুদ্দীন: পূর্ব পাকিস্তানের যশস্বী কথাশিল্পী। একাধিক সার্থক ছোটগল্প লেখকও।

সৌকত ওসমান: পূর্ব পাকিস্তানের সমকালীন অগ্রণী ঔপন্যাসিক। দুঃস্থ কৃষাণদের কথা—শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণীসংঘাতের চিত্র অংকনে তিনি পটু। 'ক্রীত-দাসের হাসি' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এ উপন্যাসের জন্য তিনি 'আদমজী পুরস্কার' লাভ করেন।

আলাউদ্দীন অল্-আজাদ (জন্ম: ১৯৩২): পূর্ব পাকিস্তানের নবীন কবি। সমাজ সচেতনতার ছাপ তাঁর কবিতায় রয়েছে। ধনী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ও গরীবদের অভাব-অভিযোগের কথা তিনি তাঁর কাব্যে তুলে ধরেছেন মুন্সীয়ানার সঙ্গে। 'অনেকটা কাছাকাছি' তাঁর একটি প্রসিদ্ধ কবিতা।

হাসান হাফিজুর রহমান (জন্ম: ১৯৩৩): পূর্ব পাকিস্তানের নবীন কবি। 'গোলক ধাঁধা' তাঁর বিখ্যাত কবিতা।

মোহম্মদ মনিরুজ্জমান (জন্ম: ১৯৩৬): পূর্ব পাকিস্তানের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। তিনি বাংলা ভাষার অধ্যাপক। পূর্ব বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্য তিনি তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। 'ঢাকা রেডিও পাকিস্তানে'র তিনি নিয়মিত গায়ক ও কাব্য পাঠক। তাঁর কবিতা গীতিধর্মী। 'দুর্লভ দিন' একটি প্রখ্যাত কবিতা।

আবু হেনা মোস্তাফা কামাল (জন্ম: ১৯৩৬): পূর্ব পাকিস্তানের খ্যাতনামা কবি ও বাংলা ভাষার অধ্যাপক। তাঁর কবিতায় পূর্ববাংলার প্রাকৃতিক রূপরেখা প্রকটিত। তিনিও ঢাকা রেডিওর নিয়মিত শিল্পী। তাঁর 'আমার সত্য এই দেশ' একটি সুন্দর গীতি কবিতা।

আবুল হাসান (জন্ম: ১৯২২): আবুল হাসান খুব একটা বেশী লেখেন না। কিন্তু শিল্প কারুকার্য মণ্ডিত লোকগাথা ও ছড়া রচনাতে তিনি দক্ষ। ক্ষমতাশীল

মানুষের কপটতা, ধনবৈষম্যের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি তাঁর কবিতার প্রতি ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। ঢাকার আধুনিক কাব্য সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত 'মানপত্র' এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

আবুজফর ওবেদুল্লা (জন্ম : ১৯৩২) : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক। 'সতনরির হার' বইটি তাঁকে তরুণ কবির স্বীকৃতি দান করেছে। 'পূর্ব পাকিস্তানের কবি হাউসম্যান' বলে তাঁকে অভিহিত করা হয়।

মহম্মদ আবদুলগণি হাজারী (জন্ম : ১৯২৫) : সমকালীন পূর্ব বাংলার কবিদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট নাম। পূর্ব পাকিস্তানী কবিতায় তিনি নতুন আঙ্গিক ও নতুন চিন্তাধারার সূচনা করেন। তাঁর 'কতিপয় আমলার স্ত্রী' (১৯৬৩) আন্তর্জাতিক পি. ই. এন-এর ফিলিপাইন শাখায় কবিতার জন্য 'এশিয়ান পুরস্কার' লাভ করে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সূর্যের সিঁড়ি'।

হাসান হাফিজুর রহমান (জন্ম : ১৯৩৩) : পূর্ব বাঙলার সমকালীন কবিদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নবীন। সমাজ সচেতনতার ছাপ তাঁর কাব্যে সুস্পষ্ট। 'গোলক ধাঁধাঁ'র অনেক কবিতা তাঁকে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছে। পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনের শহীদদের উদ্দেশ্যে রচিত কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য।

শাহ করিম (১৫৩৭—১৬২৩) : প্রাচীন সিন্ধী কবি। তিনি ছিলেন বুলেরিবাসী। তাঁর বয়াত্‌গুলি 'গল্পগুজবে' পরিপূর্ণ। আরবী পদ্ধতিতে লেখা সিন্ধী লিপির প্রাচীনতম নমুনা তাঁর বয়াতে পাওয়া যায়।

সৈয়দ আবদুল করিম : সেকালের সিন্ধী কাব্যাকাশের 'শুকতারা'। তাঁর কাব্যের পরিধি ও বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ। তবু কিন্তু তাঁর কাব্য সংক্ষিপ্ত বলিষ্ঠ ও মরমী তত্ত্বে পূর্ণ। তাঁর কবিতা খাঁটি সিন্ধী ভাষার বাহন।

শাহ লতিফ (১৬৮৯—১৭৫২) : সিন্ধী কবি শাহ লতিফকে বিশ্বের সেরা কবিদের সমপর্যায়ে ফেলা যায়। সূফী আধ্যাত্মিকতাবাদ, নৈতিক, রোমান্টিক তত্ত্ব, গীতিধর্ম কোনটারই অভাব নেই। তাঁর কাব্য দেশাত্মবোধক। সার্বজনীন তাঁর কাব্য। সিন্ধী সাহিত্যের উজ্জ্বল হীরকখণ্ড। তাঁর একটি উক্তি, 'হে মানব, ভেবো না এ গুলো ছন্দোবদ্ধ চরণ মাত্র ; এ গুলো স্বর্গীয় কাব্য, অতিরঞ্জন নয়।'

শেখ আবদুল রহিম (১৭৩৯-১৭৭৪) : প্রাচীন সিন্ধী কবি। তাঁর 'কলিমা'গুলি কাব্যগুণে অপূর্ব ; মরমী ভাবাপন্ন।

সাচাল সারমাস্তক (১৭০৭-১৮২৯) : তালপুর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সিন্ধী কবি। তাঁর 'কাফি ও গজল' বৈশিষ্ট্য গুণে সমুজ্জ্বল।

খালিফা গুল মুহাম্মদ (১৭৮৪-১৮৫৬) : সেকালের প্রাচীন সিন্ধী কবি। তিনি প্রথম ছন্দোবদ্ধ সম্পূর্ণ 'দিওয়ান' রচনা করেন সিন্ধী ভাষায়।

মীর্জা কালিচ বেগ (১৮৫৯—১৯২৯) : প্রখ্যাত সিন্ধী গদ্যলেখক. তাঁর রচিত 'খুরশিদ ও জিনাত' মৌলিকতার স্বাক্ষর বহন করে।

কাজী হেদায়েতুল্লাহ : সিন্ধী আলংকারিক গদ্য সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁর শিল্প-চাতুর্য ও রচনাশৈলী হেদায়েতুল ইনসার মতন অনুকরণীয় গ্রন্থে প্রকটমান। তাঁর রচিত 'মিসবাহুল আশেকিন' ও 'নুসরাতুল আশেকিন'ও লেখকের রচনাশৈলীর সেরা নিদর্শন।

মুহাম্মদ সেহ্ওয়ানী (মৃত্যু : ১৯৪২) : প্রখ্যাত সিন্ধী গদ্য লেখক। কোরাণের অবতরণিকা রূপে 'নুরুল ইসলাম' এবং হজরত মুহম্মদের জীবনী অবলম্বনে 'হায়াতুননবী' গ্রন্থের রচয়িতা। 'আবুল ফজল ও ফৈজী', 'মীরান-কী-সাহাবী' এবং 'কামাল ও জামাল' গ্রন্থগুলি তাঁর রচনা। সিন্ধী কাব্যে তিনি 'ফার্দ' প্রবর্তন করেন।

শেখ ইব্রাহিম ফরীদ : পাঞ্জাবী কবি। তাঁর কবিতার ভাষা ছিল সহজ, সরল, শক্তিশালী ও মর্মস্পর্শী। বিখ্যাত সাধক বাবা ফরীদের বংশে তাঁর জন্ম।

মাধোলাল হুসাইন : পাঞ্জাবী কবি। জন্ম লাহোরে। তাঁর সুফীবাদে পারসীক ও ভারতীয় প্রভাবের ছিল বিচিত্র সংমিশ্রণ। উচ্চমরমী ভাবব্যঞ্জক বহুসংখ্যক কাফি তিনি রেখে গেছেন।

সুলতান বাহু (১৬৩১—১৬৯১) : সেকালের পাঞ্জাবী কবি। তাঁর রচনা সরল এবং সর্বপ্রকার বাহুল্য বর্জিত। তাঁর কবিতা পার্থিব প্রেম এবং ধর্মীয়ভাবে পূর্ণ। আরবী ও ফারসীতে বহু গ্রন্থ ও পাঞ্জাবীতে একটি সুদীর্ঘ 'সিহার-ফি' তিনি রচনা করেন।

বুল্লেহ শাহ (১৬৮০-১৭৫৮) : পাঞ্জাবী কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি। সংগীতময় ভাষায় পাঞ্জাবী জীবনের বলিষ্ঠতা, শৌর্য-বীর্য নিয়ে তিনি বহু কাব্য রচনা করেন।

ওয়ারীশ শাহ : পাঞ্জাবী ভাষার শ্রেষ্ঠ ক্লাশিক বা শাস্ত্রীয় কবি। 'হীরারানঝা' নামে লোকপ্রিয় রম্যকাহিনী তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ কাব্য। তিনি সুফীবাদের চিমতিয়া তরিকার অনুসারী ছিলেন।

হাসিম শাহ : সেকালের পাঞ্জাবী মরমী কবি। 'শশীপুন্নু' তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ।

মালয়েশিয়া

কে. পেরুমল : মালয়েশিয়ার খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের মধ্যে পেরুমল অন্যতম। গল্প, কবিতা, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যের নানা শাখাতে বিচরণ করতে তিনি সিদ্ধহস্ত। দক্ষিণ ভারতের নামক্কলে তাঁর জন্ম। কে. পেরুমল ব্যক্তিগত জীবনে একজন সাধারণ শ্রমিক ছিলেন মাত্র। কলেজীয় উচ্চ শিক্ষালাভও তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়নি। তামিল কবিতা ও মালয়ী লোকগীতির 'ভিল্লুপট' অনুবাদ ও চিন্তাশীল নিবন্ধ

'মুরবাহকথাই' তার নামকরা রচনা। 'অভিযোগ' নাটিকা ও 'নিয়তি' গল্পে তাঁর সৃজনশীল মনের ছাপ রয়েছে। তিনি মালয় রেডিওর তামিল বিভাগে পাণ্ডুলিপির কাজে সংশ্লিষ্ট।

এন. পালানিভেলু : মালয়ী লেখক। জন্ম ভারতে। ১৯২৮ সালে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে মালয়ে আগমন। তিনি সিঙ্গাপুর রেডিওর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাঁর লেখা 'লিপি' ও 'মানুষ ও প্রকৃতি'তে নৈসর্গিক শক্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

বি. এস. নারায়ণ : মালয়েশিয়ার প্রখ্যাত লেখক। জন্ম দক্ষিণ ভারতের ত্রিচি জেলায়। মালয়েশিয়া প্রবাসী হন ১৯৪০ সালে। কর্মজীবনে তিনি সাংবাদিক। মালয় বেতারের সক্রিয় কর্মী। 'মালয় বেতারে' তাঁর বহু নাটক, কবিতা, গল্প প্রচারিত হয়েছে। এস. রামচন্দ্রনের সম্পাদিত 'সঙস্ অব আইস' নাটকটিতে তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। মালয়ী কথাশিল্পে ইংরেজী ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য দান করেন। সাধারণ মানুষের হাসিকান্না তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে। তাঁর রাজনীতি ও সমাজ সচেতন রচনা ভারতীয় জনগণের মনেও প্রেরণা যুগিয়েছিল।

এস. রাজরত্নম : বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক। ১৯১৫ সালে সিংহলে জন্ম। ছোটবেলা থেকে তিনি মালয় প্রবাসী। ১৯৫৯ সালে তিনি সিঙ্গাপুরে পি. এ. পি. সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। তাঁর বিখ্যাত গল্পগুলির মধ্যে 'ফেমিন', 'দি লোকাষ্ট', 'দুর্ভিক্ষ', 'ধর্ম' প্রভৃতি প্রধান।

লি কক লিয়াং : মালয়েশিয়ার প্রবীণ সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম। 'মাম' পত্রিকার সম্পাদক। ব্যারিস্টার লি কক লিয়াং ছিলেন রাজরত্নমের সমাজ সচেতন সাহিত্য সৃষ্টির উত্তর সাধক। অধিকাংশ রচনা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। তাঁর গল্পসংগ্রহ 'মিউটস ইন দা এ্যাণ্ড আদার স্টোরিস' ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।

ওয়াং কেভুয়া : মালয়েশিয়ার এক শক্তিধর লেখক। তাঁর লেখাতে তিনি নতুন সমাজ গঠনের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্য সাধনার অধিক কাল কেটেছে দেশে বিদেশে। তাঁর অধিকাংশ গল্পই সমাজের অবহেলিত জীব—বারবনিতা, পতিতা, দেবদাসী প্রভৃতিদের নিয়ে রচিত। 'কোন সিঁড়ির নীচে মক্ষিরাণী', 'একটি নতুন অনুভূতি' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গল্প।

টি. উইগনেসান : মালয়ের কুয়ালালাম্পুরে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। আধুনিক মালয় সাহিত্যে তাঁর স্থান প্রথম সারিতে। মালয়েশিয়ার সাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান 'বাঙ্গা এমাস' (সোনালী ফুল) নামে একটি মালয়েশীয় গল্প, কবিতা ও নাটকের সংকলন। তাঁর অন্যান্য গল্পগুলির মধ্যে 'ওয়ান মোর ওয়ার', 'দি অল্টার ক্লথ এ্যাণ্ড দি পোপ' প্রভৃতি বিখ্যাত।

উই ওয়ান আন : উই ওয়ান আনের গল্পে দেশাত্মবোধের ছাপ রয়েছে। ১৯৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তাঁর একখানি উপন্যাস, একটি উপন্যাসিকা ও তিনটি গল্প-

সংগ্রহ প্রকাশিত হয় দীর্ঘকাল পরে। তিনি ছিলেন মালয়প্রবাসী চীনাদের একজন। অতি সাধারণ কাহিনীও তাঁর লেখার গুণে মূর্ত হয়ে উঠেছে এক অসাধারণ সাহিত্যে।

টি. এস. সন্মুগম: মালয় প্রবাসী লেখক। জন্ম ভারতে। বহু ছোটগল্প ও কাহিনী লিখে মালয়ী তামিল সাহিত্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি মালয় রেডিওর তামিল বিভাগে অধিষ্ঠিত। 'বাঙ্গা এমাস' সংকলনে তাঁর লেখা স্থান পেয়েছে।

আহম্মদ লুৎফি: মালয়েশীয় উপন্যাসিক। ইন্দোনেশিয়ার উপন্যাসের অনুকরণে তিনি উপন্যাস রচনা করেন। যদিও তাঁর কাহিনীর মধ্যে পর্ণগ্রাফী ঘেঁসা শয়নকক্ষের বিবরণ পাওয়া যায়, তবু তাঁর 'বেঙ্কাই বাম্বিয়াওয়া' ও 'সিসা মেরাকা ছুনিয়া' প্রভৃতি উপন্যাসে জাপ অধিকৃত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাপানী নির্যাতন ও অত্যাচারের নিষ্ঠুর কাহিনী লিপিবদ্ধ দেখা যায়।

ইসাক বিন হাজি মহম্মদ: মালয়েশিয়ার আধুনিক ঔপন্যাসিক। তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাস 'পুতেরা গুনং তাহান' ও 'এনাক মাত লেলা শিযলা' প্রভৃতিতে ব্রিটিশ শাসকপুষ্ট মালয়েশীয় অভিজাত ও আমলাতান্ত্রিক রূপটি প্রতিফলিত করেছেন কুটুর ব্যঙ্গ পরিহাসের মারফত। অবশ্য তিনি তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'মুভিকায়েন', 'বুদক বেচা' প্রভৃতিতে সমাজিক বিপ্লবের জিগির তুলেছেন।

হারুণ বিন মহম্মদ আমীন: আধুনিক মালয়েশিয়ার অগ্রণী কথাশিল্পী। 'চেরিতা পেনডেক' গল্পসংকলন কিংবা ঐতিহাসিক উপন্যাস 'পাঙ্গেলিমা আওয়া' ইত্যাদি রচনায় তাঁর সমাজ সচেতন কুশলী মনের ছাপ রয়েছে।

উই বুম্ সেঙ: জন্ম কুয়ালালামপুরে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে। সিঙ্গাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শাস্ত্রের স্নাতক তিনি। মালয় বেতারের নিয়মিত লেখকও। 'অড অবসেকান' তাঁর একটি নাম করা গল্প।

লয়েড ফার্নাণ্ডো: ফার্নাণ্ডো কেবল গল্প বলার জন্য গল্প লেখেন না। গল্পের আশ্রয় নেন তিনি নিজস্ব মতবাদ প্রচারের জন্য। তাঁর গল্পের বৈশিষ্ট্য হল গল্পের শেষে চমক। তাঁর লেখা 'পেইড ইন ফুল' এবং 'রিটার্ণ' স্মরণীয়।

গ্যারী ইয়ং: মালয়েশিয়ার গল্প লেখক হিসাবে গ্যারী ইয়ং ইতিমধ্যেই স্বীকৃত। তাঁর রচনা সৃজনধর্মী। অতি সাধারণ ছোটখাট বিষয় নিয়ে তিনি গল্প ফাঁদতে পটু।

কাসিম আহমেদ: মালয়েশিয়ার অন্যতম কথাশিল্পী।

তান হক সেনা: মালয়েশিয়ার তরুণ গল্প লেখক। তবে বয়সে নবীন হলেও শক্তিধর।

সিংহল

শ্রীরাহুল (আনুঃ ১৪৩০-৬০): সিংহলের প্রাচীন কবি। রাজা মহারাজাদের গুণকীর্তন করে বহু প্রশস্তি গাথা তিনি রচনা করেন। শ্রীরাহুলের 'কাব্যশেখর' একটি অনুপম প্রেমকাব্য।

তুনভিল গজনায়ক নিলাম: প্রাচীন যুগের সিংহলী কবি। 'রতিরত্ন অলংকার', 'কলিঙ্গ বধিজাতক' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। 'তুনভিল পরিবারের কাহিনী'-তে তিনি কাব্যাকারে নিজ পরিবারের কাহিনী বর্ণিত করেছেন।

বালভওল মহাম্মায়: সিংহলের মধ্যযুগীয় মহিলা কবি। তাঁর 'অনুরাগ মালা' কাব্যে বহু প্রেমগীতি লিপিবদ্ধ আছে।

গজামন নোনা: সিংহলী মহিলা কবিদের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান। গজামন নোনা কবির ছদ্মনাম। প্রকৃত নাম দোলাহ ইসাবেলা পেরামল। প্রেমমূলক বহু কবিতা ও গান তাঁর রচনা।

সি. ই. গোদাকুম্বর: সিংহলের প্রখ্যাত সমালোচক। 'সিংহলীজ লিটারেচার' তাঁর প্রামাণ্য সাহিত্যকীর্তি।

ভল গমপায় মহাথেরা: অভয়রাজ পীরিভেনের অধ্যক্ষ। কাণ্ডী রাজ বীরবিক্রমের রাজত্বকালে তিনি 'রাজরত্নাকর' ও 'রাজবলি'—সিংহলের ধারাবাহিক ঐতিহাসিক রাজকুলপঞ্জী রচনা করেন।

'তাম্বিমুত্তু' (জন্ম : ১৯১৬): সিংহলের কবি ও প্রাবন্ধিক। জন্ম জাফনায়। শিক্ষা সিংহল ও লণ্ডনে। 'লণ্ডনে কবিতা' আন্দোলন প্রবর্তন করেন। পরে নিউ ইয়র্ক যান এবং 'পোয়েট্রি লণ্ডন-নিউ ইয়র্ক' পত্রিকা প্রকাশ করেন। কয়েকখানি যুদ্ধকালীন কবিতা সংকলনও প্রকাশিত করেন। ভারতীয় কবিতা সংকলন ছাড়া নিজেও বহু কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প রচনা করেন।

এস. ডবলিউ. আর. ডি. বন্দরনায়ক: সিংহলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও সাহিত্যিক। জন্ম সিংহলে ১৮৯৯ সালে। অক্সফোর্ড থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে তিনি কিছুকাল আইনজীবী রূপে কাজ করেন। পরে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করেন। 'মহাগেনার আতংক' তাঁর অনবদ্য কাহিনী।

বর্মা

উ-তো: বর্মার গীতি নাট্যকার। 'রাম জাগন', 'লগমা গালে' প্রভৃতি তাঁর গীতিনাট্য এককালে বর্মার সর্বত্র সমাদৃত ছিল।

উ-কিন-উ: বর্মার জনপ্রিয় নাট্যকার। পালি আর সিয়ামী ভাষায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। জাতক অবলম্বনে লিখিত 'পারপাহেইন,' 'মাহ', 'ওয়েআলদয়া' তাঁর জনপ্রিয় নাটক।

উ-পন-ন্য: বর্মার উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। 'বিজয় নাটক' তাঁর অপূর্ব সাহিত্য কীর্তি। 'কথলা', 'পদুমা', 'ভেস্তিওয়ালা' নাটকে তাঁর শিল্পকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সায়াই: বর্মার ঐতিহাসিক নাট্যকার। 'থাটনের ইতিহাস' তাঁর মৌলিক রচনা এবং একমাত্র রচনা। এই একখানি মাত্র নাটক লিখে তিনি বর্মার নাট্য-ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

ইউ-কু: বর্মার জনপ্রিয় নাট্যকার। তিনি 'বানর ভাইবোন', 'ওয়েথানদয়া', 'ভূয়িদাত', 'কারকুম্না' প্রভৃতি বহু নাটকের রচয়িতা।

(ডঃ) মঙ্ তিন অঙ্: বর্মার বিদগ্ধ নাট্যসমালোচক। 'বার্মিজ ড্রামা' তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থ। বর্মার উপকথাগুলিও (বার্মিজ ফোক টেলস) তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

উ নু বা থাকিন নু (জন্ম: ১৯০৭): বর্মার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও আধুনিক কথাশিল্পী। প্রগতিশীল উপন্যাস 'য়েৎ-সেৎ-পার বে-কেউই'-র লেখক। বইখানি 'ম্যান দি উলফ অফ ম্যান' বা 'নর শার্দূল' নামে এবং তাঁর নাটক 'লু ডু অঙ্-থান' ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে।

'কে' (K): বর্মা সরকারের এককালীন বেতার অধিকর্তা ও রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগারিক। থাকিন নুর সুবিখ্যাত উপন্যাস 'নর শার্দূল' তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন 'ম্যান্ দি উলফ অফ ম্যান' নামে।

'যগাই' (জন্ম: ১৯০৮): বর্মার বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, অনুবাদক ও কবি। জন্ম পিয়াপন। 'যগাই' তাঁর ছদ্মনাম। প্রকৃত নাম: উ থিইন হান। শিক্ষা রেঙ্গুন, লণ্ডন ও ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। বর্মা অনুবাদ সমিতির কার্যকরী কমিটির সদস্য। কালিদাস, চার্লস্ রীড, মলিয়ঁর বর্মীভাষায় অনুবাদ করেন। বর্মার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী থাকিন নু-র উপন্যাসেরও তিনি ইংরেজী অনুবাদক। 'নিউ ইয়ার ব্লজমস' তাঁর নিজস্ব কাব্য গ্রন্থ। 'উ লুন: মানুষ ও কবি' তাঁর একখানি মননশীল গ্রন্থ।

প্রাচীন ভারতীয় কবি ও নাট্যকার

কালিদাস: (৫ম শতকের গুপ্তযুগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন): সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবি ও নাট্য-রচয়িতা। পশ্চিম মালবে তাঁর জন্মস্থান বলে পণ্ডিতদের বিশ্বাস। তবে এ বিষয়ে কেউ একমত নন এবং তাঁর জন্মস্থান ও কাল সম্বন্ধে বহু মত প্রচলিত আছে। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা', 'বিক্রমোর্বশী', 'মালবিকাগ্নিমিত্র' প্রভৃতি নাটক; 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব' প্রভৃতি মহাকাব্য; 'ঋতুসংহার', খণ্ডকাব্য 'মেঘদূত'—এ ছাড়াও অনেক গ্রন্থ তাঁর রচিত। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় কালিদাসের গ্রন্থাবলীর

অনুবাদ ও আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। স্যার উইলিয়াম জোনস্ই সর্ব প্রথম 'শকুন্তলা' ইংরেজীতে অনূদিত করেন। তাঁর জার্মান অনুবাদ পাঠ করে মহাকবি গ্যেটে মুগ্ধ হয়ে যান।

শ্রীহর্ষ: শ্রীহর্ষ বা হর্ষবর্ধন কনৌজের রাজা। তিনি একজন শক্তিশালী কবি ও নাট্যকারও ছিলেন। 'রত্নাবলী', 'নাগানন্দ' ও 'প্রিয়দর্শিকা' নামক তিনখানি নাটকের তিনিই রচয়িতা। এ তিনখানি নাটকের মধ্যে 'রত্নাবলীই' সমধিক প্রসিদ্ধ। বোধিসত্ত্ব জীমূতবাহনের কাহিনীকে তিনি কবিতায় রূপ দিয়েছিলেন।

বিশাখাদত্ত: বিশাখাদত্ত নিজের সম্পর্কে সামান্যই বলেছেন। 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক তাঁরই রচিত। উইলসন একাদশ বা দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দকে 'মুদ্রারাক্ষসের' রচনাকাল বলে মনে করেন।

ভট্টনারায়ণ: শাণ্ডিল্য গোত্রী ভট্টনারায়ণ 'বেণীসংহার' নাটক রচনা করেন ছয় অঙ্কে। ভট্টনারায়ণ ৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী নাট্যকার।

চিন্তামণি ভট্ট: চিন্তামণি ভট্টের রচিত 'শুক-সপ্ততি' সংস্কৃত কথাসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের পর এর রচনাকাল।

শিবদাস: 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র রচয়িতা। পঁচিশটি গল্প নিয়ে এই 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' রচিত।

দণ্ডী (আনুঃ ৭তম শতক): শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত গদ্য লেখক। 'কাব্যাদর্শ' ও 'দশকুমার চরিত' তিনি রচনা করেন। তাঁর 'কাব্যাদর্শ' অলংকারশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

জয়দেব গোস্বামী (আনুঃ ১২শ শতক): সংস্কৃত সাহিত্যে শেষ শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভাকবি। সাহিত্য কীর্তি 'শ্রীগীতগোবিন্দ'। শ্রীগীতগোবিন্দের ভণিতা থেকে জানা যায় কবি জয়দেব গোস্বামী শ্রীভোজদেব ও বামাদেবীর পুত্র। বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে তাঁর জন্মস্থান। কথিত আছে কবি জয়দেব তাঁর পত্নী পদ্মাবতীর হর্ষ বর্ধনের জন্য 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেন। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমোপাখ্যান গীতিকাব্যের উপজীব্য।

চার্বাক: নাস্তিক মতপ্রবর্তক বৃহস্পতির শিষ্য। মহাভারতে দুর্যোধনের সখা চার্বাক রাক্ষসের প্রসঙ্গ আছে।

কৌটিল্য (খ্রীঃ পূর্ব আনু: ১ম শতক): মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধান মন্ত্রী। 'অর্থশাস্ত্রের' লেখক।

বেদব্যাস: ধীবর কন্যা সত্যবতীর কানীন পুত্র। দ্বীপে জন্মেছিলেন বলে উপনাম দ্বৈপায়ন (কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন)। আর শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হয়ে বেদবিভাগ করেছিলেন বলে বেদব্যাস নামে পরিচিত। চতুর্বেদ বিভাগই বেদব্যাসের একমাত্র কীর্তি নয়। তিনি ১৮ খানি পুরাণ রচনা করেন। তা ছাড়া পঞ্চম বেদ, অর্থাৎ অষ্টাদশপর্ব মহাভারত তাঁর আর এক অক্ষয় কীর্তি। ['জীবনী কোষ': শশিভূষণ বিদ্যালংকার]

বাল্মীকি : ভারতের আদি কবি। রামায়ণ রচয়িতা মহামুনি। বরুণের পুত্র। মহর্ষি বাল্মীকি অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন বলে পণ্ডিতদের অভিমত। ব্রহ্মার অনুরোধে অনুষ্টুপ ছন্দে তিনি রামায়ণ রচনা করেন। কিংবদন্তী, তিনি ছিলেন পূর্বে দস্যু এবং তাঁর আগেকার নাম ছিল রত্নাকর (যদিও আর্ষ রামায়ণে নেই)। সুদীর্ঘ ৬০ হাজার বছর ধরে তিনি কঠোর তপস্যা করেন এবং তাঁর সর্বাঙ্গ বল্মী বা উই-এ ছেয়ে যায়। এ জন্য তাঁর আর এক নাম বাল্মীকি।

পাণিনি : সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রাচীনতম আচার্য। জন্ম খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গান্ধারের (বর্তমান আফগানিস্তান) শালাতুর গ্রামে। তাঁর মার নাম ছিল দাক্ষী। এ জন্য তাঁকে দাক্ষীপুত্রও বলা হয়। পাণিনির রচিত অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ সংস্কৃত ভাষার অপূর্ব গ্রন্থ। পাণিনি ব্যাকরণে ১৮৬৩টি সূত্র আছে এবং এর উপর পঞ্চাশ ষাটখানির বেশি টীকাটিপ্পনী গ্রন্থ রয়েছে।

পতঞ্জলি : পাণিনি ব্যাকরণের মহাভাষ্যকার; বিখ্যাত যোগশাস্ত্র প্রণেতা। খৃঃ পূঃ ১৫০ অব্দে শুঙ্গরাজ পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে তিনি জীবিত ছিলেন। মহামুনি কাত্যায়ণ পাণিনি সূত্রের ভুল দেখিয়ে যে বার্তিক রচনা করেন, পতঞ্জলি তা খণ্ডন করে এক মহাভাষ্য রচনা করেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্য সংস্কৃত সাহিত্যের অদ্বিতীয় গ্রন্থ অনুকরণীয় রচনশৈলীর দিক থেকে।

বিষ্ণুশর্মা : 'ভারতের পদহীন কাহিনী' 'পঞ্চ তন্ত্রের' লেখক। বনের সিংহ, বাঘ, হাতী, শৃগাল প্রভৃতি জীব-জন্তু নিয়ে লেখা পঞ্চতন্ত্রের এরূপ আখ্যায়িকাগুলি বিষ্ণু শর্মা রচনা করেছিলেন রাজপুত্রদের শিক্ষার জন্য সহজ ভাষায়। কবে প্রথম রচিত হয়েছিল সঠিক জানা যায় না।

আর্যভট্ট : প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ গাণিতিক। 'সূর্যসিদ্ধান্ত' ও 'বীজগণিত' তাঁর দুখানি মূল্যবান গ্রন্থ।

যাজ্ঞবল্ক্য : সংহিতাকার। যোগশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্তা। বেদব্যাসের শিষ্য। যাজ্ঞবল্ক-সংহিতা তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ স্মৃতিগ্রন্থ। 'শতনাম-ব্রাহ্মণ' ও 'বৃহদারণ্যকের' সংকলিতা। মহর্ষি শাকল্যকে তিনি তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করে জনকরাজ-সভায় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলে প্রতিপন্ন হন। বাণপ্রস্থ অবলম্বন ও যোগাভ্যাস যাজ্ঞবল্ক্যের শিক্ষার মূল মন্ত্র। তিনি তখনকার প্রচলিত নীতি ও ধর্মের বিরোধী ছিলেন। মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী—তাঁর দুই বিদুষী পত্নী। ['জীবনী কোষ' পৌরাণিক অভিধান : সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত]

চার্বাক : নাস্তিক মত প্রবর্তক দার্শনিক ঋষি। বৃহস্পতির শিষ্য। চার্বাক দর্শন মতে সুখই পরম পুরুষার্থ; সচেতন দেহ ছাড়া আত্মা নেই; প্রত্যক্ষমাত্রই প্রমাণ; পৃথিবী জল, বায়ু, অগ্নি হতে সৃষ্টি।

মৈত্রেয়ী : যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির পত্নী। ব্রহ্ম বাদিনী। ব্রহ্মবিদ্যা অনুসরণ করে

স্বামীর পথ অবলম্বন করেন। তাঁর কাছে 'ধন তুচ্ছ, বিত্ত তুচ্ছ, তুচ্ছ এ গ্রহ-সংসার যদি অমৃতত্বের সন্ধান না পাওয়া যায়।'

তোলকপ্পীয়ার : প্রাচীন তামিল বৈয়াকরণিক। তোলকপ্পীয়ারের 'তোলকপ্পীয়াম' সেকালের তামিল ভাষায় প্রাচীনতম ব্যাকরণ গ্রন্থ। পাণিনির মত তাঁর স্থান। 'তোলকপ্পীয়াম' কেবল শব্দশাস্ত্র নয়। দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিফলনও হয়েছে তার মণিমুকুরে।

তিরুবল্লুবর : 'কুরুলে'র কবি। 'কুরুল' বা মুপ্পাল দাক্ষিণাত্যের 'তামিল-বেদ'। কুরুলে 'আরুম' (ধর্ম), পুরুল (অর্থ) ও 'ইনবাম' (কাম) বিষয়ে নানা উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ আছে। কবি তেরুবল্লুবরের জন্ম মাদ্রাজের নিকটবর্তী এক অচ্ছ্যুৎ সম্প্রদায়ে।

কাম্বান : প্রাচীন তামিল কবি। কাম্বান কোন্ যুগের কবি, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ মনে করেন তিনি খ্রীস্টীয় নবম শতকের কবি। আবার কেউ মনে করেন দ্বাদশ শতাব্দীর কবি। তামিলনাড়ুর থেরেজহুন্দুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন বলে প্রকাশ এবং তাঁর কাব্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সেকালের বিশিষ্ট কোন এক সাদায়াপ্পা। 'রাম অবতার' মহাকাব্যের রচয়িতা। বাল্মীকির রামায়ণ থেকে গল্পাংশ গ্রহীত হলেও তামিল ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এ মহাকাব্যের উৎস।

অণ্ডাল : কবি অণ্ডাল হলেন 'দাক্ষিণাত্যের মীরাবাঈ'। মীরাবাঈয়ের মতো তিনিও ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী। অণ্ডালের পদাবলীতে তাঁর ভগবৎ প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখা যায়।

নাক্কিবার : সংঘম যুগের প্রাচীন তামিল কবি। বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ তিরুমুরুগারুপদাই। প্রাচীন তামিল সাহিত্যের এক অপূর্ব কাব্য-সম্পদ।

অশ্বঘোষ (খ্রীঃ আনুঃ ১০০) : সংস্কৃত নাট্যকার ও বৌদ্ধ দার্শনিক। জন্ম ব্রাহ্মণকুলে। তাঁর বাসস্থান পাঞ্জাব-সাকেত বলে জানা যায়। এবং কথিত আছে তিনি রাজা কনিষ্কের সভাপতি ছিলেন। তাঁর প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি হলো সংস্কৃত কাব্য 'বুদ্ধ চরিত', 'মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা', 'সুন্দরনন্দ' কাব্য, 'মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্রম', 'ব্রজসূচী', 'আণ্ডী স্তোত্র,' 'শারিপুত্র প্রকরণ'। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধ চরিত' রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদ করেন বাংলায়।

গুণাঢ্য : ভারতীয় কথাসাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ 'বৃহৎ কথার' রচয়িতা। জন্ম দাক্ষিণাত্যের প্রতিষ্ঠান রাজ্যের সুপ্রতিষ্ঠান নগরে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে। বৃহৎ কথার মূল গ্রন্থের সন্ধান আজ পাওয়া যায় না। মূল গ্রন্থখানি বিন্ধ্যগিরি পৈশাচী কথ্য ভাষায় লিখিত। সোমদেব ও ক্ষেমেন্দ্র গুণাঢ্যকে অবলম্বন করে যথাক্রমে 'কথসরিৎসাগর' ও 'বৃহৎ কথা মঞ্জরী' রচনা করেন।

ক্ষেমেন্দ্র : কাশ্মীররাজ অনন্তের সভাকবি। তিনি গুণাঢ্যের 'বৃহৎ কথা' অবলম্বনে 'বৃহৎ কথামঞ্জরী' রচনা করেন।

সোমদেব ঃ কাশ্মীররাজ অনন্তের (১০২৯-১০৬৪ খ্রীঃ আনুঃ) সভাকবি। পৃথিবীর বর্তমান প্রাচীনতম ও বৃহত্তম গল্পসঞ্চয়ন 'কথাসরিৎ-সাগর' রচনা করেন গুণাঢ্যের বৃহৎকথা অবলম্বনে রাজমহিষীর চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে।

বাণভট্ট ঃ সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি। মহারাজ হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলেন। জন্ম সপ্তম শতকে। 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক।

ভবভূতি ঃ সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাট্যকার। কনোজ রাজ যশোবর্মার সভাকবি ছিলেন। পরে কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্যের সভাকবি হন। জন্ম অষ্টম শতকে দাক্ষিণাত্যের বিদর্ভ প্রদেশের পদ্মপুর নগরে। তাঁর রচিত প্রধান নাটক—'মালতীমাধব', 'মহাবীর চরিত' ও 'উত্তররাম চরিত'। নাট্যকার হিসেবে কালিদাসের পরই ভবভূতির স্থান।

শূদ্রক ঃ সুবিখ্যাত সংস্কৃত নাট্যকার। বিদিশার রাজা বলে কথিত। তাঁর 'মৃচ্ছ কটিক' একখানি শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নাটক। শূদ্রক নতুন নাট্যরীতির প্রবর্তক। তিনিই প্রথম নীচের তলার পাত্র-পাত্রী নিয়ে নাটক রচনা করেন। তাঁর নাটকে প্রেম, ত্যাগ, রাষ্ট্রবিপ্লব চিত্রিত হয়েছে নিপুণতার সঙ্গে।

ভাস ঃ সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাট্যকার। জন্মকাল আনুমানিক খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতক। দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী বলে জানা যায়। 'স্বপ্ন বাসবদত্তা' তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

বিশাখাদত্ত ঃ সংস্কৃত নাট্যকার। জন্ম খ্রীস্টীয় দশম-একাদশ শতকে। নামান্তর ভাস্কর দত্ত। আজমীরের চৌহান সর্দার পৃথরায়ের পুত্র। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'মুদ্রা-রাক্ষস'। সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে নতুন ধারার প্রবর্তক।

ভট্টি ঃ সংস্কৃত 'ভট্টিকাব্যের' রচয়িতা। ভট্ট নামধারী একাধিক কবি ছিলেন বলে জানা যায়। এ কাব্যে রাবণ বধ কাব্য বর্ণিত হয়েছে রাজকুমারদের পাণিনিসূত্র শিক্ষা দান কল্পে।

বাৎসায়ন ঃ 'কামসূত্রের' প্রখ্যাত রচয়িতা-মহামুনি।

পুশতো

আমীর কেরো পহলভি ঃ প্রাচীন পুশতো কবি। ঘোর অঞ্চলের বাদশাহ। খুব সাহসী ও বীর। তাঁর কাব্যও তাই বীরত্বব্যঞ্জক।

আকবর জামিন্দারু ঃ তৈমুর লঙ্গের সমসাময়িক অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুশতো কবি। ঘোর ও গজনভীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে তিনি বাস করতেন।

বায়েজিদ আনসারী ঃ মধ্যযুগীয় পুশতো সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাধক কবি ও আলেম। জন্ম ওয়াজিরিস্তানে। পাঠানেরা তাঁকে 'পীর-ই-রওশন' বা উজ্জল পীর বলে অভিহিত করতেন। তাঁর 'খারুল বয়ান' সে যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনা। খারুল-বয়ান' ইসলামী জীবনধারা নিয়ে রচিত হয় ১৫৩৯ খ্রীঃ।

খোশহাল খান খটক: পুশতো ভাষার জাতীয় কবি। জন্ম পেশওয়ারের অন্তর্গত আকোড়া নামক স্থানে। তিনি কমবেশী ৩৬০ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'দাস্তারনামা' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। স্বাধীনতা-প্রিয় বীর পাঠানদের বীরত্বকাহিনীই তিনি এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর 'দিওয়ানে' প্রায় ১৪ হাজার বয়াত আছে। এবং দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, নীতি-কথা, দেশাত্মমূলক কবিতা, বিরহ মিলন কথা—কোনটাই বাদ পড়ে নি। 'আয়ার-ই-দানেশ' গ্রন্থে সহজবোধ্য পুশতো ভাষার নিদর্শন। কবি খোশহাল খানকে শেষ বয়সে দিল্লীর বাদশা গ্রেফতার করে রাজধানী দিল্লীতে অন্তরীণ করে রাখেন।

মীর্জা খান আনসারী: 'পীর-ই-রওশন' আনসারীর সার্থক উত্তর-সাধক। সিদ্ধ সুফী। কেবল কবি ছিলেন না, প্রবন্ধকারও ছিলেন। খৃস্টীয় ১৬২০ সাল নাগাদ দাক্ষিণাত্যের এক যুদ্ধে নিহত হন।

আবদুর রহমান বাবা: পুশতো সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সুফী কবি। খোশহাল খান খটকের সমসাময়িক। জন্ম পেশোয়ারের অনতিদূরে বাহাদুরকুলি নামক স্থানে। শিক্ষা শেষ করে তিনি আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য সাধনা করেন এবং সংসার জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে উঠেন। সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিতে দর্শন ও তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। পাঠানদের জাতীয় সত্তা তাঁর প্রতিটি দিওয়ানে আর গজলে অনুরণিত।

আবদুর হামিদ বাবা: সেকালের পুশতো সাহিত্যের মরমী সাধক কবি। তাঁর দিওয়ানগুলি মানব মনের সূক্ষ্ম অনুভূতির আত্মপ্রকাশ। আবদুর রহমান বাবার মত তিনিও ভাবী কবিদের প্রভাবান্বিত করেছিলেন।

সৈয়দ রসুলখান রেসা: আধুনিক পুশতো সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ। 'দীপডিয়া' রসুলখান রেসার উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থ। সামাজিক গলদ তিনি তাঁর কাব্যে তুলে ধরেছেন ব্যঙ্গচ্ছলে শিক্ষিত সমাজের কাছে।

সমন্দর খান বাবেশুরী: আধুনিক পুশতো কবি। তাঁর চিন্তাধারায় ইসলাম ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয় ঘটেছে। তাঁর কাব্যে পাঠানদেব জাতীয় সত্তার প্রতিফলন দেখা যায়।

আরবাব হেদায়েতুল্লাহ্ খান: পুশতো কবি। হেদায়েতুল্লাহ খানই সর্ব প্রথম পুশতো কাব্যে ছান্দিক রচনার সূচনা করেন।

হামজা খান শেনওয়ারী: পুশতো কবি। পুশতো গজলের প্রবর্তক। সেকাল ও একালের চিন্তার সমন্বয় সাধক।

আজম খান খটক: দরদী পাঠান কবি। তাঁর কাব্যে কৃষক শ্রমিক মেহনতি জনতার বাণী মূর্ত হয়েছে।

আবদুল কাদীর খান: পুশতো গীতি কবি।

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

ক

ভ

য

র

ল